"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

সম্পাদকীয়

না।

ঠিক আর পাঁচটা সাময়িক পত্রিকা অর্থ উপার্জনের জন্য যে লোলুপ পৈশাচিক নিয়ে প্রকাশিত হয়ে চমক্ সৃষ্টি করে আমাদের সে উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য রাজনীতি ও যৌননীতি বিবর্জিত বিশুদ্ধ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির চর্চ্চা করা। এতে যোগদান করবেন নতুন পুরনো লেখক লেখিকাগণ। আমাদের পত্রিকাতে তাই থাকবে না বিয়ে বাড়ীর ব্যাপক রসালু খাদ্য সামগ্রীর বিচিত্র সমাবেশ এবং পরিশেষে মাত্রাতিরিক্ত আহারের পর পরিবেশিত পাঁপর ভাজার মত ডাক্তারী প্রেসক্রপশনের হজ্‌মিগুলি। আমরা ভালভাবেই জানি যে উলংগ চিত্রাভিনেত্রীর নগ্ন দেহের ছবি না ছাপালে এবং নির্লজ্জ সাহিত্যিক-দের রাত জাগরণের ফলশ্রুতি সাহিত্য না প্রকাশ করে আমরা ছন্দিতাকে বাঁচাতে পারবো না। ছন্দিতা না বাঁচে মরুক ক্ষতি নেই—কিন্তু তাই বলে ওকে বাঁচাবার জন্য তো আমাদের চিন্তায় দৈন্য ঘটিয়ে বুদ্ধিকে ভ্রান্তপথে চালিত করে, রুচিকে বিকৃত করে ওর অসম্মান করতে পারবো না। আমরা আরও জানি যে বাংলা দেশে বর্ত্তমানে যে গতিতে যৌন-সিনেমা পত্রিকার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তার জঘন্য ঘৃনিত প্রতিযোগিতায় ছন্দিতা বাঁচতে পারে না—যদিনা দেশের রুচিশীল পাঠক পাঠিকাদের সমর্থন ও সহযোগিতা আসে। নিরাশার মধ্যেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। তাই আমরা ছন্দিতার কলেবর বৃদ্ধিতে ও স্বাদে মেজাজে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা দেশে এমন কোন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হলো না—যিনি একদিকে বাংলা সাহিত্যের নোংরা ও দুষ্ট ক্ষত সমালোচনার তীক্ষ্ণ ঘায়ে পরিষ্কার করে অন্যদিকে সুনীতি ও সুরুচির পরিবেশ সৃষ্টি করে সব্যসাচীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। আজকের যে সমস্ত সাহিত্যিকগণ ফাঁকি দিয়ে মহৎ হবার চেষ্টা করছেন, মহেঞ্জদারো হরাপ্পা বা কোনারকের মন্দির গায়ের নিপুণ শিল্প সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক জীবন যাত্রার একটা নির্লজ্জ সমন্বয় ঘটাবার কাজে সাহিত্য সৃষ্টি করে শাড়ী বাড়ী-গাড়ী করার অন্যায় প্রয়াস চালাচ্ছেন—ছন্দিতা এদের মৃত্যু কামনা করছে। তবে আমাদের একার এই কামনা ফলপ্রসূ হবে না। আমরা তাই সকলকে সবিনয়ে আহ্বান জানাতে চাই।

ছন্দিতা

উমা ভট্টাচার্য্য

নগ্নবাহার বিপনী

রাজ্য জোড়া হাট বিপনী—
পান বেচে খাও, ধান বেচে খাও
খাও বেচে খাও মানের ডালি।
জানবাজারে রথের মেলা
পুতুল খেলা,
মূল্য নিলাম পাঁচ কড়ি,
ইচ্ছে মনে স্ফূর্তি করি।
ক্ষণেক পরেই বিভোর হয়ে
ভাই রে ভাই,
হায়রে হায়।
ভাপ্সা চোখে হোচট্ খেয়ে
ধোঁয়ার নেশায় সঙ দেখি।
ঘরের চালে ঝোলাই নিশান,
বুলাই তুলি,
পিসার টাওয়ার রইলো পিছে,
পাঁচ প'সাতে নিজের দেশেই
প্যারিস দেখি।
উল্টে দিলাম ত্নিয়াটা,
পাল্লা দিয়ে আজব খেলি,
বুড়ো খোকার টুপির চুড়োয়—
ন্যাংটো খুকির ভেল্কি খেলি।
জন্ পথেতে, ডুগডুগিতে
বাজাই ভেরী,
হয়নি দেরী,

গুড় বড়িয়ে মাটির ঢিবির
কণ্ঠে পরাই মোতির মালা,
গালায় দিয়ে রঙ এর ঝালা,
চুনি পান্নার স্বপ্ন দেখি।
ঐতিহ্য,
আর কৃষ্টি এযে,
বেরিয়ে আসে পুরাণকালের
কবর কেটে ?
নগ্ন কণ্ঠ, নগ্ন গ্রীবা,
লগ্ন হৃদয়, জঙ্ঘা মাজা,
এই কি তবে প্রাচীন যুগের
কৃষ্টি ভরা লাস্য-কলা ?
এমনি কত শতেক নারী
চলতো ফিরতো হাটে বাটে ?
হরাপ্পার ঐ দীঘির তটে ?
তাইতো আমি চলছি ফিরি
উল্টো রথে।
তথ্য আমি খুজে পেলাম,
বিজ্ঞাপনের কলা এ যে।
এবার আমি মডার্ণ হলাম।
ঘরের নারী—
লজ্জা, ব্রীড়া
পাঁচ কড়িতেই বিকিয়ে দিলাম

অনিবার্য কারণবশতঃ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা একই সংগে প্রকাশিত হল। এই অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতির জন্য আমরা দুঃখিত। আগামী সংখ্যা বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হবে।

সঃ দুঃ

শান্তনু দাস

বাজনা বাজে

আকাশ জুড়ে মেঘ জমলে
বুকের মধ্যে বাজনা বাজে
আদিম ইচ্ছে মেঘলা হাওয়ায় ভাসতে থাকে তুলোর মতো
অলংকৃত হৃদয়-প্রধান জানলা ভেঙে বাইরে আসে
মগ্ন মনে অন্তরঙ্গ শব্দ শুনি চারি পাশে :

যে দিকে চাই দুনিয়া জুড়ে
সেতার বাজে ব্যঞ্জনাময়
সবাই যেন লুপ-লাইনের ব্যস্ততাময় রেলের গাড়ি
বৃষ্টি-ধূসর ইষ্টিশনে মুখ বাড়িয়ে কোন আনাড়ি
কাকেই খোঁজে মনের ভুলে শুভ্র-নরম চালচিত্রে

ভালো লাগেনা
ভালো লাগেনা
আকাশ জুড়ে মেঘ জমলে
বুকের মধ্যে বাজনা বাজে।

অরবিন্দ কুমার দে

আত্ম-জিজ্ঞাসা

ধলাছন্ন পৃথিবীর এক প্রান্তে অন্ধকারে বসে
আপনারে খুঁজিতেছি আমি ; বিদগ্ধ মনের তীরে
আমার রক্তের স্রোতে—কথা কয় হারানো অতীত।
রক্ত শূন্য দেহখানা ভগ্নপ্রায় হৃদয়ের খাঁচা
শুনিনা সেথায় আজ প্রভাতী পাখির কলগীতি
পাখি তার উড়ে গেছে চিরন্তন চলাপথ ধরে
শূন্য খাঁচা পড়ে আছে হতাশার অনন্ত গভীরে।
কল্পনার দেশ থেকে কিছু রঙ কিছু মোহ নিয়ে
পুতুল সাজালো যেন বিধাতার নিপুন তুলিতে
সেই রঙ মুছে গেছে—গত তাই স্বপ্নালী যৌবন।
কি অসহ্য বেদনায় অহরহ মাথাকুটে মরে
আমার বীনার সুর। আপনারে দেখি আর ভাবি
আমাকে আমিই যেন এতদিন পারিনি চিনিতে
শুভ্রতর দিবালোকে। তমিস্রা-গহ্বরে বসে একা
তাইতো খুঁজিয়া ফিরি জীবন রহস্যে ভরা ঘট—
কেবা আমি, কোথা যাবো, কোথা থেকে এসেছি হেথায় ?

সুদত্তা সেনমজুমদার

মন ভরবে না

আকাশের কোলে ওকে দেখে কিগো, আত্মীয় বলা চলবে না ?
ছোট শিশু কিগো ওকে ডেকে হায় 'চাঁদমামা' বলে ডাকবে না ?
ধরার কবিরা ওকে নিয়ে কেউ কবিতা কি আর লিখবে না ?
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে উছলি আলো কি পড়বে না ?
কোনও তিথিক্ষণে রাহু কি তার প্রবল গ্রাসেতে ধরবে না !
চাঁদ শুধু আজ শুষ্ক শুষ্ক, বুড়ী বসে সুতা কাটবে না ?
চাঁদ শুধু আজ আগুনের গোলা মায়া ফাঁদ সে কি পাতবে না ?
শুধু সে আজ রাসায়নিক ক্রীয়া মানুষের মন ভরবে না ?

রবীন সুর

উপশম

বিপ্রতীপ লোকাচারে তুমি কার করুণা প্রয়াসী ?
ডানার কাতর শব্দে শোণিতাক্ত পাখি
উদ্রিক্ত করে নি শ্লোক, নির্বিকার আত্মস্থ সন্ন্যাসী :
সূর্যের বিকল্প শুধু সাতলক্ষ স্তিমিত জোনাকি ।

প্রাচীন বটের স্নেহ, অন্তরঙ্গ স্রোতস্বতী, মধ্যাহ্ন কাকলি
এখন বিস্মৃতপ্রায়, জল নেই নিষ্পাদপ ধূসর ভূগোলে,
কোথায় হরিৎ ছায়া আদিগন্ত রম্য রণস্থলী,
নির্ঝরের প্রতিধ্বনি উৎসারিত কেউ নেই পাহাড়ি ফাটলে ।

গুহায় আশ্রিত বোধ, বৃত্তাকারে গাঢ় অন্ধকার
এখন কোথায় তুমি চন্দন রৌদ্রের তৃপ্তি পতঙ্গের উড়ন্ত বিলাস,
প্রতিশ্রুত দীপ্তি তুমি উত্তরঙ্গ ইচ্ছার আকাশ—
কেন যে জাগো না স্মৃতি উপশম নীল যন্ত্রণার ?

দেমোস্তেনে বোতেজ

অবাক

শুরু থেকে শেষ
অনেক মানুষ—
কে আর চেনা !
এইখানে একা একা হাঁটি
পায়ে পায়ে বালিয়াড়ি ।
ডুবে আছি তোমার গভীরে
সারাক্ষণ তোমাকেই ভাবি ।
ভীষণ অবাক হই :
এখনো দেখিনা কেন
তোমাকে কোথাও
আমার দুপাশে ॥ —অনুবাদ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

রুমানীয় কবি Demostene Botez এর Surprise নামক কবিতার ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ ।

সুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

দৃষ্টিকোণ

ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা দেওয়া হচ্ছিল না। অনেকদিন ধরেই দেব দেব করছিলাম। সময়ের অভাব, ঝক্কি ঝামেলা। একটা না একটা লেগেই আছে। তারপর সব সময় হাতে টাকাও থাকে না। প্রতি কোয়ার্টারেই তাই গ্রেস পিরিয়ড পেরিয়ে যাবার পর প্রিমিয়মটা জমা দিতে হয়। তাতে ফাইন দিতে হয়। কিন্তু উপায় কি?

আজ তাই অফিস থেকে রিসেসেই বেড়িয়ে পড়েছিলাম। ছাব্বিশ টাকা উনিশ পয়সা সঙ্গেই ছিল।

একতলা তিনতলা করেও বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই টাকাটা জমা দিয়ে রসিদ হাতে নিয়ে এসে সেন্ট্রাল এভেনিউতে বাসের অপেক্ষাতে দাঁড়ালাম।

অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু ন-নম্বর বাস তার লেট সার্ভিসের বদনাম ঘুচিয়ে কেন জানিনা, খুব তাড়াতাড়িই এলো।

বাসে অসম্ভব ভীড়। তিলধারণেরও জায়গা নেই। ফুটবোর্ডে লোক দাঁড়িয়ে। ঝুলছে অনেকে হ্যাণ্ডেলে। কিন্তু আমার দেরী করবার অবসর নেই। এদিকে অনেক কাজ। অগত্যা একজনের পা মাড়িয়েই বাস ধরলাম।

হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংটা পিছনে ফেলে বাসটা ছুটে চলল। গতিটা যতটা দ্রুত হওয়া উচিত ততটা দ্রুত হওয়া বাসটার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যাত্রীর অসামান্য ভারে বেশ কিছুটা মন্থরই ছিল বাসের গতি। পথে কোথাও বাধা না পেতেঅচিরেই বাসটা এগিয়ে এসে পার্ক করেছিল এসপ্লানেডে কল্পনা নামের পোষাকের দোকানটার পাশেই।

এখানে দু'চার জন যাত্রী নামলো। উঠলো সম্ভবতঃ দু'ডজন। অধিকাংশই কলেজের মেয়ে। হাতে বইখাতা থেকে সেটাই জানান দেয়। তার সঙ্গে কলকূজনও ঘোষণা করছিল পরিচিতি। ডঃ সান্যাল একটা হামবাগ। পড়াচ্ছেন কলকাতার কলেজে, কিন্তু কেম্ব্রিজের কথা বলছেন প্রতিটি মুহূর্ত্তে। কিন্তু তুইতো ফাস্টক্লাস পাবি ওরই হাতে ভাই……… ।

লেডিসসীট আর একটিও খালি ছিল না। মেয়েরা রাজ্যের রেফারেন্সের পাহাড় বহন করে কষ্টে দেহভার সমর্পন করেছিল হ্যাণ্ডেলে।

আমার ভাগ্য ভাল। কিছুটা আগে আরোহন করার জন্য বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। না হলে আমারও বোধহয় দীর্ঘপথ দাঁড়িয়েই থাকতে হতো।

ঠিক আমার মুখের কাছে বই হাতে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ছাত্রী। নিটোল, সুশ্রী মুখশ্রী। ওর হাতের বইপত্তর বলছিল ওর নাম ও শ্রেণী।······রবীন্দ্রনাথের ক্যামেলিয়া পড়েছিলাম একদা ছাত্রজীবনে। এখন লাইনগুলো মনে নেই। কেবল কাহিনীটি মনে পড়ে। তাও অধিকাংশই অস্পষ্ট। আর এন নোট, ক্লিয়ার রিসিব, ভাউচার, চালান সব স্মৃতিকেই চালান করে দিয়েছে কোন এক বিস্মৃতির দেশে।

কর্তব্যপরায়ন স্টেটবাসের কণ্ডাকটার এসে যথারীতি টিকিটের জন্যে তাগাদা লাগিয়ে গেলেন।

হাতে রাজ্যের রেফারেন্সের ভলিয়ুম নিয়ে অসুবিধে বোধ করলে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হ্যাণ্ডেল আরোহিনী। কষ্টে চেষ্টা করলো ভ্যানিটিব্যাগের বন্ধনমুক্ত করে ভাড়া মেটাতে। চলন্ত বাসের দুলুনিতে দেহের ভারসাম্য রাখা প্রাণান্তকর। অথচ সন্দারুন মুখে রা নেই যে অভদ্র কণ্ডাকটারকে আপাততঃ তার টনটনে কর্তব্য প্রকাশ থেকে বিরত করবে। ব্যাগের বন্ধনমুক্ত ভাড়ার পয়সা মেটাতেই তৎপর হলো মেয়েটি। সামনে বসেছিলাম আমি। একেবারে মুখোমুখি। অগত্যা বলতেই হলো—দিন।

হাত বাড়াতেই হস্তান্তরিত করলো হাতের বইগুলোকে। হাঁপছেড়ে ভাড়া মেটালো কণ্ডাকটারকে। বিষয়টা সামান্যই। কিন্তু এতটুকুতেই লক্ষ্য করলাম ওর দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় উজ্জল।

বাস এগিয়ে চললো। আমার হাতে রেফারেন্সের বোঝা চারিদিকে তটভাঙা নদীস্রোতের মতনই মানবস্রোত। কোনরকমে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আমার পাশের মেয়েটি। তবে পূর্বাপেক্ষা অনেকটাই যেন স্বচ্ছন্দ। অনেকটাই যেন সাবলীল। স্বতস্ফূর্ত্ত।

আমারই একাসনে জেনসসীটে বসা পাশের লোকটি নেমে গেলেন থিয়েটার রোডে। খালি জায়গাটাতে বসবার প্রেফারেন্স ছিল একজন আরোহী ভদ্রলোকের কিন্তু একটু চাতুরী করে সরে বসতেই সেখানে সুযোগ পেল দণ্ডায়মানা মেয়েটি।

মেয়েটি চালাক। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুলল না। আমার পাশেই একাসনে বসলো।

ছোট্ট আসন। ব্যবধান বাঁচিয়ে অচ্ছুৎনীতি মেনে বসা শক্ত। তবুও চেষ্টার ত্রুটি হলো না আমার। হাতের বইগুলোকে হস্তান্তরিত না করেই বসে রইলাম বাইরে চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে। ঝাঁকুনিতে মেয়েটির শাড়ীর আঁচল আমার গায়ে লাগছিল। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু আরও প্রবল হলো ঝাঁকুনি। মেয়েটির সঙ্গে আমার ব্যবধান রাখার কোনই সুযোগ রাখলো না ভীড় ও যান্ত্রিকতা। গায়ের উপরেই গা পড়লো। কিন্তু মেয়েটি অকুণ্ঠিতা আভিজাত্যের চিহ্নগুলি স্পষ্ট ওর দেহাবয়বে। মার্জিতা ও শিক্ষিতা: প্রমান হাতের বইগুলি। যেগুলি কর্ত্তব্যপরায়ণ কণ্ডাকটারের তাগাদায় তখন পর্যান্ত আমার হাতেই।

ক্রমশ ট্র্যাফিকের আলো পার হয়ে এসে এলগিনরোডে পৌঁছালো বাস। এখানেও যথারীতি অনেকের ওঠা নামা ঘটলো।

আরোহীদের মধ্যে একজন উঠলো আমার বন্ধু। একদা যখন আমি কলেজে পড়তাম তখনকার। অনেকদিন বাদে দেখা মৃন্ময়ের সঙ্গে। বেশ কয়েক বছর পর।

মৃন্ময় আমাকে চেনে। দেখা না হলেও আমার খবর রাখে। কি করছি, কেমন আছি, ইত্যাদি কোন' খবর ওর অজানা নয়। আমার সিটের দিকে তাকাতেই মৃন্ময়ের চোখগুলো কেমন বড় বড় হয়ে গেল। কেমন বিস্মিত, অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু মৃন্ময় আমার চেয়ে বেশী করে দেখছিল আমার পাশে বসা মেয়েটিকে। এবং আমার সঙ্গে ওর একটা............। মৃন্ময় কী যেন সব আকাশ পাতাল ভাবনা ভাবছিল হয়তো।

—কি খবর মৃন্ময়? আমিই প্রশ্ন করলাম মৃন্ময়কে। উত্তর দেবার আগ্রহমাত্র প্রকাশ না করে মৃন্ময় তখনও আমারই দিকে তাকিয়ে।

কি দেখছিল অমন করে মৃন্ময়? আমাকে? আমার মধ্যে কি দেখবার আছে মৃন্ময়ের? আমার শরীর আরো জীর্ণ হয়েছে। গায়ের কালো রঙটা আরও নিকষ। চোখ দুটো আরও কোঠারাগত। চিন্তার বলিরেখা আরও গভীর মুদ্রিত আমার কপালে। সময় অভাবে কি পয়সার অভাবে, দু'টোর যে কোন একটাই সত্য হোক—আমার গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি।

কপালের দু'পাশ থেকে ক্রমশ সীমানা বাড়াচ্ছে মাথার টাকটা।

—কেমন আছো মৃন্ময়? কোথায় চললে? আবার জিজ্ঞাসা করলাম মৃন্ময়কে।

একটা গভীর ভাবনাবৃত্তের কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মৃন্ময় আমাকে বললো—তোমার সঙ্গে একটা প্রয়োজনীয় কথা ছিল অনিল।

—বল। আমি আগ্রহ দেখালাম।

মৃন্ময় সামনে তাকিয়ে বললো—না থাক্। তুমি এখন বড ব্যস্ত। অন্যসময় বলবো।

মৃন্ময়কে অভয় জানিয়ে বললাম—না, না এখুনি বলতে পারো।

—বলা উচিত হবে না। কেমন গম্ভীর গলায় উত্তর দিল মৃন্ময়। গাম্ভীর্যটা যে ওর স্বতস্ফূর্ত নয়, যান্ত্রিক; বাসের প্রতিটি যাত্রীই সেটা অনুভব করলো। এবং ওর দিকে তাকালো। তারপর কয়েকডজন জোড়া চোখ মৃন্ময়ের উপর থেকে পিছলে পডলো আমার দিকে। সব চোখেই এক প্রশ্ন। এক জিজ্ঞাসা। কী করে হলো, কী করে হলো!!.........কী করে ফুটলো এই শুকনো নীরস ডালেতে ফুল.........কী করে সম্ভব হলো এটা?

অথচ কী যে হলো, আমি জানিনা। অবসর নেই জানবার।

—কোথায় যাচ্ছো তুমি মৃন্ময়? আবার আমিই শুধালাম।

—ঢাকুরিয়া।

—তুমি?

—সাদার্ণ এভেনিউতে নামবো। তোমার সেই প্রয়োজনীয় কথাটা বললে না? চাওতো, তোমার সঙ্গে যাই।

—সে অন্য একদিন হবে। এখন তুমি ব্যস্ত।

সামনে একটা জেনস সীট খালি হতে মৃন্ময় তাতে বসলো। আমার উল্টোদিকে মুখ রেখে।

মৃন্ময় কোথা থেকে আমার ব্যস্ততা লক্ষ্য করলো আমি জানিনা।

বাসটা সাদার্ণ এভেনিউর মোডে দাঁডাতেই আমি আসন ছেডে উঠে দাডালাম। হাতের বইগুলি এতক্ষণ পর পাশে বসা সহযাত্রিনীর দিকে তুলে ধরে বললাম—এবারে আপনার বইগুলি ধরুন। আমি এখানে নামবো।

—ধন্যবাদ। মেয়েটির দু'চোখে কৃতজ্ঞতার আলো।

—প্রয়োজন নেই।

আমি সাদার্ণ এভেনিউর স্টপে বাস থেকে নেমে পড়লাম। এক্ষুনি একটা টিউশানি যেতে হবে। একদিন কামাইয়ের কমপেন শেসান।

রনজিৎ দাস

বৌ কথা কও

পার্কের একফালি বাগানটায় দুটো অসময়ের গোলাপ নীচুস্বরে কি যেন বলাবলি করছিল। ঘাসেরা সবাই গায়ে গা লাগিয়ে খুব উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চাইছিল ওদের নিভৃতালাপ, কিন্তু একটা চটুল প্রজাপতি বারে বারে ফর্ ফর শব্দে এদিক-ওদিক উড়ে গিয়ে তাদের মনোযোগ নষ্ট করে দিচ্ছিল। ঘাসেরা, সত্যি বলতে কি, এজন্যে প্রজাপতিটার ওপর বিরক্ত হচ্ছিল খুব। একটু পরে, কি মুস্কিল, আবো দুটো চ্যাংড়া ভ্রমর যেন কোত্থেকে এসে জুটল। ঘাসেরা বুঝল, এ আর কিছু নয়, স্রেফ প্রজাপতিটার সাথে একটু ফষ্টিনষ্টি করার মতলব। ওদের একটানা ভ্রঁ র্‌ র্‌ শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড় হল। রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল ঘাসদের, ইস্, ওই বিচ্ছিরি ভ্রমরদুটো আর ন্যাকা প্রজাপতিটা মিলে ওদের বিকেলটাই মাটি করে দিলে; গোলাপ দুটোর নীচুস্বর ফিসফিসানি আর শোনা যাচ্ছে না একটুও! কিন্তু ঘাসেরাও সোজা পাত্র নয়। আজ দু'পহরের সময় একটা ঘুমকাতুরে ডেঁপো ডেঁয়ো পিঁপড়ে কামরাঙা গাছের মগডাল থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছিল, ঘাসেরা ওকে যত্ন করে শোবার জায়গা করে দিয়েছিল, সবাই জড়াজড়ি করে ওকে ওম্ দিচ্ছিল এতক্ষণ ধরে। এইবার বুদ্ধি করে ঘাসেরা ওকে ডেকে তুলে গোলাপদের খবর আনতে পাঠাল। একটা বুড়ি ঘাস শিখিয়ে দিল,—গোলাপ-দুটো খুব গলা খাটো করে যে সব কথা বলবে, সেগুলি খুব ভালো করে শুনে আসবি, বুঝেছিস্? মাথা দুলিয়ে রওনা হল ডেঁয়ো পিঁপড়ে। অনেকক্ষণ তোফা আরামে ঘুমুতে পেরে খুব ফুর্তি হচ্ছিল ওর, বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, যদিও বাঁ পাশের তিন নম্বর পা-টা টনটন করছিল এখনও। আঃ একটু তাড়া-তাড়ি পা চালা না বাপু! চাপা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল একটা ঘাস। ডেঁয়োপিঁপড়েটা চমকে গিয়ে চটপট ঘুম-ঢুলু চোখদুটো রগড়ে নিল শুঁড় দিয়ে, তারপর তরতর করে দিব্যি উঠে গেল ছোট্ট গোলাপ গাছটার একেবারে মাথায়, সেই গোলাপ দুটোর কাছে। খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল কয়েকটা কচি ঘাস। একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ডেঁয়োপিঁপড়ে পরিস্থিতিটা আঁচ করল।

বড়ো গোলাপের গলা বেশ ভরাট, কথাগুলো স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ছোট গোলাপ পাপড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে এতো লাজুক সুরে কথা বলছে যে শোনা যাচ্ছে না কিছুই। দুত্তোর, এখন কি করি! এক পলক মাথা চুলকে ভাবল ডেঁয়ো পিঁপড়ে। ট্যারচা চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল ঘাসেরা ওকে দেখতে পাচ্ছে কি না না, বড়ো একটা গোলাপ পাতা ওকে আড়াল করে দিয়েছে। কি ভেবে ডেঁয়োপিঁপড়ে পাতার আড়ালে আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ছোট গোলাপের ওপরে উঠে এল, তারপর পাপড়ির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে একেবারে ছোট গোলাপের নরম-গরম বুকের মধ্যিখানে এসে গুটি সুটি মেরে রইল চুপচাপ। ডেঁয়োপিঁপড়ের পায়ের স্পর্শে সুড়সুড়ি লাগাতে কিছুক্ষণ হেসে কুটিপুটি হল ছোট গোলাপ, যদিও খানিক পরে সয়ে গেল ওটা। ভারি সুন্দর গন্ধ তো—খুশিমনে ডেঁয়োপিঁপড়ে ভাবল, আর ভাবতে ভাবতে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

ওদিকে প্রজাপতি আর ভ্রমরদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে একটা সদ্যফোটা চামেলি ফুল শরমে রাঙা হয়ে উঠল। ত্রস্ত চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল কেউ দেখছে কি না, তারপর চামেলি টুক করে পাশের কচি ডালে লুকিয়ে একটুখানি গাল ঘষে নিল।

শেষ গোধূলির কনে-দেখা আলো স্বপ্নের মতো মিহিন হয়ে আলগোছে ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

ঘাসেরা গোলাপদের কথা ভুলে গিয়ে পুরনো রূপকথায় মজলিশ জমিয়ে তুলল। প্রজাপতি আর ভ্রমরদুটো ক্লান্ত হয়ে একটু নিরিবিলির জন্য কলাবতী ঝোপের ভেতরে গিয়ে ঢুকল। ছোট-গোলাপের মোলায়েম বুকের মধ্যে নিঃসাড়ে ঘুমোতে লাগল ডেঁয়োপিঁপড়ে। কথার ফাঁকে ফাঁকে গোলাপের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে এল আরো। সুবিধে বুঝে চামেলি ফুল এবার পাশের কচি ডালে নিবিড় করে গাল মিশিয়ে দিয়ে দারুণ তৃপ্তির আবেশে চোখ বুঁজে রইল।

'ইস, দেখেছো কি সুন্দর গোলাপ দুটো!' উচ্ছ্বাসে রিণরিণ করে উঠল মেয়েটির গলা।

'দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।' বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মস্‌মস্ করে ঘাসেদের মাড়িয়ে এগিয়ে গেল ছেলেটি, সবল লোমশ হাত বাড়িয়ে পট্‌পট্ কড়ে ছিঁড়ে আনল ফুল দুটি। 'এই নাও'।

'বড়ো গোলাপটা আমার খোঁপার ডানপাশে গুঁজে দাও না!' আদুরে স্বরে আব্দার জানাল মেয়েটি।

'দিচ্ছি। পেছন ফিরে দাঁড়াও।' সযত্নে সন্তর্পনে নিপুণ হাতে খোঁপায় ফুল পরিয়ে দিল ছেলেটি। তারপর আবেগতপ্ত আঙুলগুলি খুব নরম করে মেয়েটির মরাল ধবল গলা ছুঁইয়ে সাবলীল ভঙ্গীতে নামিয়ে নিয়ে এল কবোষ্ণ কাঁধের নিষিদ্ধ সীমান্তে। 'এ্যাই! কি হচ্ছে!' মধুর রোমাঞ্চে শিহরিত হল মেয়েটি। 'কিছু না!' ছেলেটি আবেশ ছড়িয়ে হাসল। ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। মুখোমুখি। ছোট গোলাপটা ছেলেটির টেরিলিন শার্টের ওপরের দিকের একটা খোলা বোতাম ঘরে গুঁজে দিল ভালো করে।

'দিব্যি দেখাচ্ছে তোমাকে!' কোন কথা খুঁজে না পেয়ে ছেলেটি বলল। যাঃ! অকারণে মেয়েটি ব্লাশ্ করল একটু।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ছোট গোলাপের বুকের মধ্যে ডেঁয়োপিঁপড়ে এই আকস্মিক ভূমিকম্পে ভীষণ ভরকে গিয়েছিল, ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁপছিল এতক্ষণ, এখন অবস্থা শান্ত দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে এল। তেলতেলে টেরিলিন শার্টে হাঁটতে ওর কষ্ট হল খুব, একটু পরে একটি কর্কশ জমিতে পা দিয়ে ডেঁয়ো-পিঁপড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আরে, গন্ধটা কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? মহানন্দে শুঁড় বাগিয়ে ডেঁয়োপিঁপড়ে ভাবল, অনেকটা সেই বুড়ো মালীটার গায়ের গন্ধের মতন! তাহলে তো একবার আচ্ছাসে হুল ফুটিয়ে পরখ করতে হয় ব্যাপারটা—ডেঁয়োপিঁপড়ে সিদ্ধান্ত নিল।

ছেলেটি তখন মেয়েটিকে বলছিল, 'অন্ধকার হয়ে গেছে। এসো চুমু খাই।'

জয়ন্তী সেন

স্বপ্নের শেষে

স্মৃতির আবছা পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে মিনতি ভালো বাসে-আর পাঁচজন মানুষের মতোই। স্মৃতির যে দিকটা উজ্জ্বল, আলো আলো, সে দিকেই তার গোপন চোখ একলা হবার মুহূর্তে লোভীর মত এগিয়ে যায়। এক বাক্স মনিমুক্তা যেন তার আঙুলের ছোঁয়ায় ঝলমল করে ওঠে যখন তখন। হয়তো সকাল বেলায় আমডালে রোদের হলুদ ঢেউ দেখে তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় পুরীর সমুদ্রের কথা। নীল জল, ঝিনুকের রাশি, উথাল পাথাল ভয়।
আবার কখনো পাহাড়ের অনেক উঁচুতে এক থোকা হলুদ ফুল, হাত বাড়িয়েও যার নাগাল পাওয়া যায়নি। কত কান্না কেঁদেছিলো ফ্রক পরা অবুঝ মন অবুঝ চোখ সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে কান্না এখনো মাঝে মাঝে তার বুকের কাছে লুকোন ঝর্ণার মত কুল কুল করে ওঠে। এক ঝলক রোদ্দুরের মত সেই হলুদ ফুল কটি বুঝি তার নাগালের বাইরে থেকেই গেল। মনের চোখ তৃপ্তিতে ভরিয়ে মিনতি অন্ধকারে কতদিন সেই হলুদ ফুলের স্বপ্ন দেখেছে। সুধানন্দ সে কথা জানতেও পারেনি ঘুনাক্ষরে। তার পৃথিবী যে দেয়াল কটি ঘিরে, সেখানে মোটা তুলিতে আঁকা সহজ হাসি কান্নার ছবি দেখেই সে মুগ্ধ। কারখানা থেকে ফেরার সময় কখনো মিনতির মাথার সুগন্ধী তেল, কখনো বা রঙ্গিন শাড়ীর মোড়ক যখন তখন কিনে আনে সে। বিয়ের পর তখন গড়িয়ে গড়িয়ে দুটো বছর চলে গেল, তবুও মিনতিকে পেয়ে সে আজও দিশাহারা অবস্থায় রয়েছে। সমস্ত পৃথিবী কিনে আনতে পারলেও বুঝি ওর শখ মেটেনা।

কি চাই তোমার মিনু—বল লক্ষীটি—' জানলার বাইরে চোখ ফিরিয়ে রাখা উদাসিনী বউকে কাছে টানতে চায় সে।

"কিছুনা—" মিনতির ফর্সা গালে মিষ্টি টোল পড়ে—"সবই তো আছে আমার।"

তুমি কখনো কিছু চাওনা। তার মানে আমার মতো কালো কুচ্ছিত বর তোমার পছন্দ হয়নি।' কপট অভিমানে সুধানন্দ আলগা হয়ে সরে যায়।

তুমি একটা আস্ত পাগল—ঝাঁকড়া চুল ভরা অত বড় মাথায় কিচ্ছুটি নেই—।'

সুধানন্দের বুকের কাছে মাথা গুঁজে মিনতি হেসে ফেলে—।

'তবে একটা কিছু চাও—। তোমার প্রাণে কি কোন শখ নেই—।'

'হুঁ—আছে একটা নয়, তিনটে। তোমার যখন মাইনে বাড়বে, অনেক উন্নতি হবে—তখন আমার আবদার কিন্তু তোমায় রাখতেই হবে। তখন বোলনা, পারবনা, সময় নেই—।'

সত্যিই তিনটি অদম্য শখ মিনতির বুকে পোষা পাখীর মতো হঠাৎ খেয়াল খুশীতে ছটফট করে ওঠে—। সাজানো সুন্দর ঘরে দক্ষিণের জানালায় বসে একা একা প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখে আর একবার পুরীর সমুদ্রের নীল ঢেউ এর আদরে বাড়ানো দুহাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। সুধানন্দর নিজের হাতে গড়া কারখানা, ওর ছুটি নেই, সময় নেই এমন কি অন্য কোন নেশা খেয়ালও নেই। তাই মিনতির বিকেল সন্ধ্যা একলাই কেটে যায়। নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়ির টিক টিক শব্দ বাজে। হাওয়ায় এলোমেলো পর্দা উড়তে থাকে। মিনতি আবার ভাবে পাহাড়েও একবার তাকে যেতে হবে। এবারে কারো বাধা কারো নিষেধ না শুনে দুরন্ত চড়াই এর পথ বেয়ে সেই হলুদ ফুলগুলো নিজের হাতে ছিঁড়ে নিয়ে আসবে সে। কবে সুধানন্দের সময় হবে, কবে সে যেতে রাজি হবে, কে জানে!

তাছাড়া প্রসাদদার কাছেও একবার হাসি খুশী ভরা এক গা গয়না পরা সুখী চেহারাটা দেখিয়ে আসবে—মিনতি সব শেষের ইচ্ছাটুকু ভেবে নিজের মনেই হাসল। উত্তর পাড়ায় মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়ে প্রসাদদাকে দেখে মিনতি সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। পুরুষ মানুষ যে এত সুন্দর হয়, তা সত্যিই সে কল্পনাও করতে পারেনি। কত বয়স তখন মিনতির এগার কিংবা বারো—। ফ্রক তখনও ছাড়েনি, বড় হবার লজ্জা মাঝে মাঝে তাকে একটু সচেতন করে দিয়ে যায় মাত্র। প্রসাদদা অনেক বড়, এমন কি তার ছোট মামার চেয়েও বেশী। মিনতিকে দেখে তার রিবণ বাঁধা বিণুনী টেনে আদর করে প্রসাদদা ছোটমামাকে বলেছিলো—বেশতো ফুটফুটে মেয়েটি—'

'স্বভাবে কিন্তু ধানী লঙ্কার মতো—' ছোট মামা জিভ ভেঙ্গচে জবাব দিলো, 'ভুলে যেওনা বন্ধু, চক্ চক-করলেই সোনা হয়না—'

"যাও—তোমার সঙ্গে আড়ি—" লাল হয়ে রেগে কেঁদে মিনতি ছুটে পালিয়েছিল। কিন্তু প্রসাদদার প্রতি আকর্ষণ একটুও কমেনি। পরে বাড়ীর সকলের কাছে গর্ব করে প্রসাদদার গল্প শুনিয়েছে। কত বড় চক মেলানো

পুরোণ বাড়ী ওদের, দেওয়ালের কার্ণিশে পায়রার দল পেখম মেলে আপন মনে বকম বকম করছে। শ্বেত পাথরের বারান্দায় বড় বড় টবে নানা রঙের গোলাপ ফুল। রং চঙে পরীর মতো চারদিক আলো করে আছে। প্রসাদদা সেখানে বসে ছবি আঁকে, গান করে। প্রসাদদা বলেছে মিনতি বড় হলে খুব সুন্দর দেখতে হবে। দেওয়ালে টাঙ্গানো মেমসাহেবের ছবির চেয়েও সুন্দর। প্রসাদদা তাকে চুপি চুপি বলেছে—"তুমি বড় হয়ে আমার কাছে একবার এসো মিনুরাণী—তখন তোমার দেওয়াল জোড়া ছবি এঁকে দেবো।"

প্রসাদদার সেই রাজপুত্তুরের মতো রূপ এখনও মিনতির মনের মধ্যে দাগ কেটে আছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটুও মলিন হয়ে ওঠেনি। আয়নায় নিজের ছায়া দেখে মিনতির মনে হয় ও যেন প্রসাদদার চোখে দেখা প্রসাদদার হাতে আঁকা দেওয়াল জোড়া ছবি একটা।

"এই শুনছ?" প্রায় ঘুমন্ত মানুষটাকে ঠেলা মেরে মিনতি জাগিয়ে দেয়—"সকালে জানতে চেয়েছিলে না আমার কি শখ—। আমাকে একবার উত্তর পাড়ায় নিয়ে যাবে?"

"উত্তরপাড়া?" আচমকা ঘুম ভেঙ্গেও সুধানন্দ হো হো করে হেসে ওঠে—'আমি মনে করলাম হিল্লি দিল্লী কোথাও যাবার শখ হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ উত্তরপাড়া কেন? তোমার মামারা তো ওখানে আর থাকেনা—।'

থাকেনা বলেই আমার বুঝি যেতে নেই। ছোট বেলার কত স্মৃতি ওখানে। পাঁচিলের গায়ের জামরুল গাছে পাতা দেখা যায়না একেবারে। আর খেতে যেন মিষ্টি গুড়। টক কামরাঙ্গা নুন মেখে খেয়েছ কখনো?"

পরের জিনিষে লোভ করলেও পাপ—'সুধানন্দ গম্ভীর হবার ভাণ করে—মামার বাড়ী এখন অন্যলোক কিনে নিয়েছে, তারা তোমায় তাদের এলাকায় ঢুকতে দেবে কেন?"

না দিলো তো বয়েই গেল—'মিনতি অন্যমনস্ক হয়ে যায়—দু চোখ দিয়ে দেখে আসব একবার। ঠিক পাশেই হলদে রঙের চক্‌মেলানো পুরোণ বাড়ী ছিল একটা। ওদের বাড়ীর কুল গাছে এই এত বড় বড় নারকোলী কুল।"

উত্তরপাড়ায় গিয়ে কেবল পরের বাড়ীর কোথায় কুল জামরুল—এই বুঝি তোমার মতলব। তারপরে আমার বউ এর হাতে যদি হাতকড়া পড়ে, তখন কে বাঁচাবে—। আচ্ছা উত্তরপাড়ায় যাওয়া ছাড়া আর দুটো শখ আছে বলেছিলেনা—।

"হুঁ—আছেই তো—।"

'বলে ফেল—দেখি এ অধমের ক্ষমতায় কুলোবে কিনা—।'

'সমুদ্রে স্নান, আর পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা—' মিনতি এক নিশ্বাসে বলে ফেলে—মাত্র এই তিনটে শখ। কি ভালোই বউ পেয়েছিলে গো—হীরের গয়না নয়, সাতমহলা বাড়ী নয়—মাত্র কয়েকশ টাকা খরচ করলেই খুশী করে দেবে।'

সুধানন্দ অনেকবার ভেবেছে কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে মিনতির শখ সাধগুলো মিটিয়ে দেয়। কিন্তু বছরের পর বছর কেটেই চলে—সুধানন্দের সময় আর হয়ে ওঠেনা। একটা কারখানার বদলে সে এখন তিন তিনটে কারখানার মালিক। ভাড়া বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছে। সিন্ধুক ভরা গয়না হয়েছে মিনতির। তার সুখী সুখী চেহারায় কোথাও কোন অভাবের বা আকাঙ্খার ছোঁয়া লাগেনা। তবু সুধানন্দ জানে মনের কোণে এখনও না তিনটি শখ মিনতিকে প্রায়ই অস্থির করে তোলে।

"জানো মিনু, এবারে তিরিশ লাখ টাকার অর্ডার পাচ্ছি। যে লাভ হবে, তাই দিয়ে তোমাকে অনেক সমুদ্র অনেক পাহাড় ঘুরিয়ে আনব।" ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসা চোখে সুধানন্দ মিনতির নিরাসক্ত মুখের দিকে তাকায়। তলে তলে সত্যিই সে এক মাসের ছুটির ব্যবস্থা করেছে। প্রথমে পুরী, তারপর দার্জিলিং এর টিকেট কাটা হয়ে গেছে। যাবার মাত্র একদিন আগে মিনতিকে চমকে দেবার মতো করে খবরটা শোনাবে সুধানন্দ। কাজ করে করে সে যে এখনও একেবারে পাথর হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ দেবার জন্যে কদিন ধরে মনে মনে অনেক প্ল্যান করেছে।

মিনতি শুনে খুশী হয়ে বাক্স তোরঙ্গ গোছাতে বসল। উত্তরপাড়ার কথা সুধানন্দ যদিও বলেনি, কিন্তু দার্জিলিং থেকে ফিরে তিন দিন সময় হাতে থাকবে। সুধানন্দকে জোর করে টেনে নিয়ে যাবে সেখানে। তাহলেই মিনতির সব আকাঙ্খার শেষ।

গায়ে উড়ন্ত আঁচল জড়িয়ে নুলিয়ার হাত ধরে সমুদ্রে নামল মিনতি। সুধানন্দই জোর করল।

পুরী দেখব, সমুদ্রে নাইব—বিয়ের পর আঠারো বছর ধরে সেই এক কথাই শুনে আসছি। আর এখন বলছ ভাল লাগছেনা। দেখোতো, তোমার চেয়েও বড় কত মেয়েরা কেমন ঢেউ এর সঙ্গে লুটোপুটি খেলছে—'

'যদি পড়ে যাই—' মিনতি তার ভারি হয়ে আসা অনিচ্ছুক শরীর নিয়ে কিছুতেই এগোতে চাইল না। কড়া রোদে এমনিতেই মাথা ধরে উঠেছে। অল্প জলে পা ডুবিয়ে বসার ফলে সারা গায়ে রাশি রাশি বালি। নীল ঢেউ সাদা ফেণার মুকুট পড়ে গর্জন করে এগিয়ে আসছে। কোথায় সেই নীল স্বপ্নের হাল্কা দোলা—এত বছর যার কোলে শুয়ে অফুরন্ত আনন্দের স্বাদ পেয়েছে। চারদিকের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে সংকোচে লজ্জায় মিনতি জলের থেকে দূরে আসতে চাইল—কি গো, শখ এর মধ্যেই মিটে গেলো—' অনেকক্ষণ জলে থেকে সুতৃপ্ত সুখী চেহারা নিয়ে সুধানন্দ তাকে ঠাট্টা করতে বসল।

অত লোকের সামনে আমার খুব খারাপ লাগছিল—' মিনতি ঝাঁজিয়ে ওঠে, তাছাড়া তোমার কথা শুনে এগোতে গিয়ে তখন এমন জোরে ঢেউ এর ধাক্কা খেয়েছি, বুকে পিঠে ব্যথা ধরে গেছে। ছবি দেখে সমুদ্রকে এক রকম মনে হয়, কিন্তু আসলে খুব ছাই।'

তাহলে চলো দুদিন আগেই দার্জিলিং চলে যাই—'

তোমার শরীর এখানে খুব ভাল আছে কিন্তু—' মিনতি সুধানন্দর বাদামী ছোপ ধরা উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল।

আমার লোহায় পেটা শরীর, যেখানেই যাই ভালো থাকব। এবারে তোমার জন্যেই আসা। কিন্তু অত ভয় পেলে কেন বলত ?"

মিনতি যে প্রথমেই একটা বড় ঢেউ এর ধাক্কায় বালিতে আছড়ে পড়ে প্রচণ্ড শক খেয়েছে, সুধানন্দ তা টের পেয়ে ওর ভয়টা ভেঙ্গে দিতে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মিনতির মনে যে ধাক্কা লেগেছে, তা আরও মারাত্মক। সুধানন্দ তার পরিমাণ বুঝতে পারবেনা, শুনলে ঠাট্টা করবে।

সমুদ্র পর্বের পরে পাহাড়। সুধানন্দ ভোর হতে না হতেই লেপের মায়া ত্যাগ করে হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে কোর্ট মাফলার গরম মোজা পরে তৈরী। জানলা দিয়ে সোনালী কাঞ্চনজঙ্ঘার সবটুকু দেখা যাচ্ছে। উঁচু টিলার গায় শুধু হলুদ নয়, রং বেরঙের ফুলের গুচ্ছ। লাখো প্রজাপতি উড়ন্ত ফুলের মতন আশে পাশে ঘুরছে।

সাতটা বাজতে চললো এখনও ঘুমোবে—" গরম চায়ের পেয়ালা হাতে সুধানন্দ বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল। এরপরে আর বেড়াতে যাবে কখন ?"

ঠাণ্ডায় হাত পা জমে আসছিল মিনতির। শুয়ে শুয়ে অনেক বছর আগে

মা বাবার ঘুম ভাঙ্গার আগেই গরম জামা গায়ে না দিয়ে নেপালী মালির ফুটফুটে মেয়ে কাঞ্চির হাত ধরে উঁচু পাহাড়ে ফুল তুলতে যাওয়ার গল্প মনে পড়ে গেল। ঠাণ্ডায় তার ফর্সা মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল। কাঁটা ঝোঁপে লেগে ফ্রকের তলা ছিঁড়ে কুটি কুটি। মা তারপরে গরম কম্বল ঢেকে এক বাটি ফুটন্ত দুধ জোর করে গিলিয়েছিলেন। বকাবকি করেছিলেন কত। রোগা মেয়ে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে। তাছাড়া সাত জন্মে চান করেনা এখানকার লোকগুলো তাদের সঙ্গে মাখামাখি করলে কি ফল হবে?

অসুখ করেছিলো ঠিকই, আর পাহাড় ভ্রমণেরও সেইখানে ইতি। কিন্তু মনে মনে কতবার আক্ষেপ করেছে মিনতি, যদি আর একটা দিনও পাহাড়ে উঠতে পেত।

'কি ভাবছ গো? চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে মিনতি ধড়মড় করে উঠে বসল। গরম ফুলহাতা ব্লাউজ কোট, ওভার কোট, পায়ে মোজা, হাতে দস্তানা, কাণ ঢাকা পশমের স্কার্ফ। তবু যেন ঠাণ্ডা হাওয়া বরফের ছুরির মতো হাড়ে বিঁধছে। প্রতি পদে পায়ে হোঁচট লাগে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পেটার শব্দ। সুধানন্দের হাত ধরে কোন রকমে অর্ধেকটা পথ পার হয়ে শেষ পর্য্যন্ত মিনতি ধপ করে বসে পড়ল শ্যাওলার ছোপ ধরা একটা পাথরের গায়ে।

ব্যাস, এই পর্য্যন্ত দৌড়েই খতম্—। আমার তো শরীরই গরম হোলনা। চল তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি—'

'তাই চল—' হাঁপাতে হাঁপাতে মিনতি বলল—।

ফুল তুলবে বলেছিলে না—'

"তুমিই তুলে আননা। আমার গায়ে ফোস্কা পড়েছে, ভয়নক লাগছে।"

শেষ পর্য্যন্ত সুধানন্দ মিয়োন একগোছা ফুল নিয়ে অনেক বেলায় হোটেলে ফিরে এল। হলুদ রং এখানকার কুয়াশার মতই ম্লান হয়ে এসেছে। এই ফুল কটি দিয়ে এতকালকার উপোসী মনের কতটুকু ভরিয়ে তুলতে পারবে?

"কোথায় রাখবো গো—ফুলদানীতো মালির তোলা ফুলেই ভর্ত্তি—।"

"একটা গ্লাস টাস দেখে নাওনা—" ম্যাগাজিনের পাতা নাড়াচাড়া করতে করতে মিনতি অন্যমনস্ক হয়ে উঠল।

'তোমার যেন মন টিঁকছেনা এখানে—' সুধানন্দ চিন্তিত মুখে তাকালো।

"না, না, আমি বেশ আছি—। তুমি কদিনে শরীর সারিয়ে নাও।

কলকাতায় গিয়েইতো আবার কাজের যাঁতা কলে—।”

মিনতির দুটো ইচ্ছার এখানেই অপমৃত্যু হোল। ভেবেছিল তৃতীয়টির কথা ভুলেও উচ্চারণ করবেনা সুধানন্দের কাছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সুধানন্দ নিজে থেকেই একদিন বলল—উত্তরপাড়ার ওদিকে নতুন ফ্যাকটারির জমি কিনতে যাচ্ছি—। দুটো তিনটে ভালো অফার রয়েছে। চলোনা, সেই সঙ্গে তোমার জামরুল, কামরাঙ্গার খোঁজ করে আসা যাবে।’

সকাল থেকে তিনটে হট কেস ভর্ত্তি খাবার তৈরীর তোড়জোড়—তা সত্বেও মিনতি বার বার আয়নার সামনে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখেছে। মাঝখানে অনেক-গুলো বছরের ঢেউ তার শরীরে ওঠানামা করে অনেক ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেছে। এখন তাকে দেখে ক্যানভাসে ছবি আঁকার কথা কি প্রসাদদার মনে পড়বে। তবুওঅনেক যত্নে ফর্সা রঙ্গের মানাবে এমন একখানা হালকা গোলাপী রঙ্গের শাড়ী বেছে নিল মিনতি। মুখের চামড়ায় গোলাপী আমেজ ফুটিয়ে তোমার কৃত্রিম উপায় অনেক আছে। নতুন কেনা সেণ্টের বোতল খুলে আজই প্রথম চুলে, গলায় হাতে মাথার ত্রুটি সে রাখলনা।

‘আজ যে নতুন করে প্রেমে পডতে ইচ্ছে হচ্ছে গো—’ সুধানন্দ হেসে ফেলল। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। মামাবাড়ীর দেশের লোকেরা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বলে ঠাট্টা করলে কিন্তু আমার সইবেনা।’

কে কোথায় চেনা লোক বসে আছে যেন। আজ মামারা প্রায় বার বছর ও দেশ ছেড়েছে। তোমার যত সব আদিখ্যেতা—’ রাগ দেখালেও মিনতি মনে মনে তার রূপ চর্চার সাফল্যে খুশী হোল। সুধানন্দের চোখে সহজে কোন তারতম্য ধরা পড়েনা। সেও যে লক্ষ্য করেছে আর বোকার মত তখন থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে তাকে দেখছে, এতে তার বুকের ভেতরে খুশীর ঢেউ ছলাৎ করে উঠল।

মামা বাড়ীর নতুন বাসিন্দা চার দিকে উচু পাঁচিল তুলছেন, সেই জামরুল গাছের চিহ্নও দেখা গেলনা। এসব ব্যাপারে হতাশ হবার জন্যে নিজেকে মনে মনে তৈরী রেখেছিল মিনতি। যে পথ দিয়ে মানুষ চলে, তার পেছন দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বিড়ম্বনা। একটা অদৃশ্য হাত দিনরাত সব কিছুর উপরে অমোঘ স্পর্শের ছাপ ফেলছে, আর সমস্ত রং রস সুধা গন্ধ শুষে নিংড়ে মরুভূমির মত রিক্ত করে ফেলছে। তার চেয়ে মুখ ফিরিওনা। যেটুকু আলো সব সামনে, অথবা মনের ভেতরে।

'এ বাড়ীটা কার গো ?' এই যে গেটে মার্বেল ফলকে লেখা, প্রসাদ মিত্র। খুব হোমড়া চোমড়া কেউ একজন হবে ?'

ভাবনায় হোঁচট খেয়ে মিনতি সেই ভাঙ্গা চকমেলানো বাড়ীটার রূপান্তর দেখল। পুরোণ ছাঁদ এখনও রয়েছে, কিন্তু নতুন পালিশের জেল্লায় চেনা যায়না। ভেতরে ছিমছাম, বাগান, শীতের মুখে মরশুমী ফুল ঝাঁকে ঝাঁকে উকি মারছে। ফটকের ভেতরে দু তিনটে নতুন গাড়ী, অনেক মানুষের ভীড়।

'এটাতো প্রসাদদার বাড়ী। আমার ছোট মামার বন্ধু—'

'ছোট মামার বন্ধু! তাহলে তুমি চেন নাকি ভদ্রলোককে ?'

ওমা, রোজই তো খেলতে যেতাম তখন—। প্রসাদদা কত চকোলেট বিস্কুট ছবির বই দিতো। নিরাসক্ত গলায় মিনতি বললো।

'মনে হচ্ছে মস্ত বড়লোক—' সুধানন্দর চোখ দুটো চক চক করে উঠল— আর এখানকার জায়গা জমি সম্পর্কে খবরা খবর দিতে পারবে। চলোনা পুরোণ আলাপ ঝালিয়ে নেওয়া যাক।"

সাধারণতঃ সুধানন্দের অতি উৎসাহের মুখে মিনতি ভাঁটার টান বইয়ে দেয়। যখন তখন যায় তার সঙ্গে বিনা আমন্ত্রণে যেচে আলাপ করতে তার সংকোচ ও লজ্জার অবধি থাকেনা। তাই সুধানন্দ মিনতিকে কোন বাক্য ব্যয় না করে পায়ে পায়ে মাধবীলতা ঘেরা ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে অবাক না হয়ে পারলনা। সুধানন্দ নয়, মিনতি নিজেই হাসি মুখে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তাঘাট চেনা, মুখস্থ।

"এখানে মস্ত বড় পেতলের দাঁড়ে কাকাতুয়া থাকত। আহা, পাখীটা বোধহয় মরেই গেছে। ওখানে কৃষ্ণচূড়ার ডালে দোলনাটা এখনও রয়েছে। ইস্, কত দুলতাম ছেলেবেলায়। এখানে বসে কত সিনারি আঁকত প্রসাদদা। আবার মানুষের মুখও। একটা ভিখিরির ছবি দেখে সত্যি ভেবে একদিন চমকে উঠেছিলাম।" মিনতি পথ চলতে চলতে নিজের মনেই বলে চলেছে, এমন সময় বারান্দা থেকে এক ভদ্রলোক তাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'কাকে খুঁজছেন ?' চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল কথার সঙ্গে সঙ্গে। টাক মাথা, দামী শান্তিপুরী ধুতি, সিল্কের পান্‌জাবী। বিশাল আয়তন দেখলে এ বাড়ীর মালিক বলে চিনতে ভুল হয়না।

'প্রসাদদা আছেন ?' মিনতি নিজেই বলে ফেলল—

"আপনি—আপনারা—ঠিক চিনতে পারছি না তো। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই প্রসাদ মিত্র।"

এবারে মিনতি কথা হারিয়ে ফেলল। এতখানি বদল দেখবে বলে সে কোন মতেই তৈরী ছিলনা।

আমার স্ত্রী মিনতি ছেলেবেলায় আপনাকে চিনতেন।" সপ্রতিভ সুধানন্দ মিনতিকে চুপ করে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি কথা জোগালো।

"আমাকে উনি চিনতেন?" চুল উঠে যাওয়া চওড়া বাদামী কপালে পর পর অনেকগুলো ঘাঁজ পড়ল।

'ওর ছোটমামা মানে বিমলেন্দু বাবু—এই যে এই পাশের বাড়ী থাকতেন—। আমার নাম সুধানন্দ চৌধুরী।'

"আপনি বিমলেন্দুর ভাগ্নী—। কি আশ্চর্য্য আসুন আসুন। আর সুধানন্দ বাবু, আপনি তো আমাদেরও জামাই তাহলে। বিমলেন্দু আমার নিজের ভাই এর মতন ছিলো। সে সব দিন কি ভাবেই না কেটে গেছে। শুনেছিলাম বেচারীর স্ত্রী মারা গেছে। একটি ছেলেও মিলিটারীতে ছিলো, সেও নিখোঁজ।—মানুষের বরাতই সব—।"

প্রসাদ মিত্রের বিরাট বিজনেস্, তাছাড়া সামনের ইলেকশনে দাঁড়ানোর তোড়জোড় চলেছে। সুধানন্দ এমন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে কৃতার্থ হয়ে গেল। এত বড়লোক কিন্তু কি বিনয়ী। এর সঙ্গে যোগা-যোগ রাখলে ভবিষ্যতে অনেক সুবিধা হতে পারে।

মিনতি চারদিকের দেওয়ালে চেয়ে চেয়ে সেই সব ছবিগুলো খুঁজল। প্রসাদদা তার শখ, তার স্মৃতি সবই হারিয়ে ফেলেছেন। মিনতিকে তিনি মিনতি বলে চিনতেই পারলেন না। বিদায় নেবার সময় হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে শুকনো হেসে গাড়ীতে উঠে বসল, সুধানন্দের উচ্ছ্বাসে একেবারেই যোগ দিলনা। পেছনে ফেলে আসা রাস্তার ধুলোয় ঝরা পাতার রাজ্যে তার মনের শেষ স্বপ্নটাও কোথায় হারিয়ে গেল। অবসাদে মিনতি চোখ বুঁজল।

যাঁদের গ্রাহক চাঁদার মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে তাঁদেরকে পুনরায় গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানাই।

—সম্পাদক

ডালিম কুমার ঘোষ

লক্ষ্যভ্রষ্ট

—"চোখখাকীর বাচ্চা আবার কথা!

লাথী মেরে পিঠের হাড় গুঁড়ো করে দিব, শালা যতসব বেজন্মা!" উন্মত্ত ক্রোধে ফুঁসতে থাকে প্রৌঢ়া শশীবালা।

গম্ভীর রাতের এক ঘেয়ে বিশ্রী নিস্তব্ধতাকে শশীবালার খনখনে কণ্ঠস্বর যেন চিরে ফেলতে চায়।

হোটেলের তেতলার অপ্রশস্ত সংকীর্ণ ঘরটার ভেতর থেকে স্বপ্নেন্দু বেশ স্পষ্টই দেখতে পায় গলির ভেতরের চেহারাটা, যেন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের নগ্ন প্রকাশ।

নাঃ, বিরক্তি বোধ করে না স্বপ্নেন্দু।

সাজানো সৌন্দর্য্যের ভেতরের দৈন্যতা এতটুকুও পীড়া দেয় না ওর চোখ দু'টোকে। এরকম একটা নোংরা গলির মোড়ে হোটেল খোলার জন্য বিন্দুমাত্র অভিযোগও নেই ওর। এ সব ব্যাপারে একেবারে অভ্যস্ত না হলেও খুব একটা আনাড়ী বা অনভ্যস্তও নয় ও। বরং এরকম একটা কৃত্রিমতার তকমা আটা রঙ্গীন জগতের কাছাকাছি থাকতে পারার জন্য বেশ একটা আলগা রোমাঞ্চের মৃদু শিরশিরাণী অনুভব করতে থাকে স্বপ্নেন্দু। হোটেলটা এরকম একটা নোংরা আর ঘৃণ্য পরিবেশে হলেও চার্জটাও সে অনুপাতে কম।

ঘড়ি আর চশমার রিপ্রেজেনটেটিভ্ স্বপ্নেন্দুর কাছে এটাও একটা কম সুবিধার কথা নয়।

—"মেরে প্যারী খুপসুরত হাসিনে, তুঝকো তো ম্যায়"·······সহসা আবার মাঝরাতের গম্ভীরতাকে ব্যঙ্গ করে কোন এক মাতাল এ পাড়ারই কোন এক হতভাগীকে যেন রাণী বানাতে চাইল।

স্বপ্নেন্দু দূর থেকে ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

নাঃ, এবারও আশ্চর্যের এতটুকু আঁচড় পড়ল না ওর চোখে। স্বপ্নেন্দু জানে। বোঝেও সব।

সারারাতই তো এখানে এরকমটা হয়।

এটাই এ গলির বৈশিষ্টা।

স্বপ্নেন্দু এ গলি দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করে।

দিনের আলোয় এদের বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু সন্ধ্যে হলেই সব ভিড় করে এসে দাঁড়ায় নিজেদের দরজায়। ভোবড়ানো গাল আর ভাঙ্গা চোয়ালে সস্তা পাউডারের বিরক্তিকর আর বিশ্রী প্রলেপে কেমন যেন বীভৎস দেখায় ওদের।

পোষাকের কারিকুরী ওদের আরও অস্বস্তিকর। বুঝি বা ক্লান্তিকরও।

স্বচ্ছ ব্লাউজের ভেতর থেকে সুস্পষ্ট আর সুউচ্চ একই মাপের অস্বাভাবিক একজোড়া অত্যাচারক্লিষ্ট বুক।

ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে ওঠে স্বপ্নেন্দুর।

গলার ভেতর থেকে বমির মত কি যেন একটা বেরিয়ে আসতে চায় ওর।

তবু ওদের চোখদুটো—

স্বপ্নেন্দু ভাবতে থাকে—

সত্যি, ওদের চোখদুটো কিন্তু সবসময়ই একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে জ্বলতে থাকে ধিক্ ধিক্ করে।

আশা আর আকাঙ্ক্ষায় চোখ দুটো ঘোরাঘোরি করে ইতঃস্ততঃ এদিক ওদিক। কি করুন আর বিভ্রান্তিকর বাঁচার প্রয়াস ওদের। সত্যি অবাক না হয়ে পারে না স্বপ্নেন্দু।

গলিটা টানা লম্বা।

সংকীর্ণ গলিটার দুধারেই সারি সারি পুরানো আমলের সব জীর্ণ ভাঙ্গা বাড়ী। আর ঐ বাড়ীর ঘরগুলোর বাসিন্দারাও বেশ পুরানো।

গলিটার এ প্রান্তে প্রথমেই এই তিনতলা "শিবদুর্গা হোটেল," আর তারপরে একটা ভাঙ্গা পড়ো বাড়ী। এ পাশে একটা পুরানো অব্যবহৃত ইঁদারা। আর সারি সারি ঘর ওদের।

গলিটার ডানদিকে অবশ্য দু'চার ঘর ভদ্রলোক থাকে।

স্বপ্নেন্দু অবশ্য এর আগেও এসেছিল এ সহরে।

এ হোটেলেই উঠেছিল।

এবারও তাই।

কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নি এ অঞ্চলটার।

গলিটার এদিক ওদিক দুচার ঘর ভদ্রলোক এখানে যে থাকে কি করে

সেটাও যেন স্বপেন্দুর কাছে মস্ত এক দুর্ভেদ্য রহস্য।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল ও।

এবারে নূতন আরেকটায় অগ্নিসংযোগ করল স্বপেন্দু। মুখখানা ক্রমশ: বেশ থমথমে হয়ে উঠছে ওর।

জ্রজোড়া আর মসৃণ প্রশস্ত ললাটের বেশ খানিকটা অংশ অনেকক্ষণ ধরেই কুঁচকে উঠেছে।

চিন্তার একটা বিষাক্ত সরীসৃপ অনেকক্ষণ ধরেই ওর মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্রে যেন কিলবিল করে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

ভাবনা বা চিন্তাটা এমনিতে ওর সত্যিই কুৎসিৎ, নোংরা, আর জঘন্য। অন্যসময় এসব কথা ভাবতেই সমস্ত শরীরটা একটা অপরিসীম ঘৃণায় গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু এখন, হঁ্যা ভেবেও যেন সুখ পাচ্ছে স্বপেন্দু।

একটা দুষ্প্রাপ্য সুখানুভূতির আবেশে বিভোর হয়ে উঠছে ও। সত্যিই আশ্চর্য মেয়েটা।

স্বপেন্দু আবারও ভাবতে থাকে মেয়েটির কথা। একটা যেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম। অস্পষ্ট আঁধারের রহস্যময় কুহেলিকায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি। আর কোন মানুষের সাড়া পেলেই দুটো বড় বড় বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে। একটা মাত্র সাধারণ শাড়ী আর ব্লাউজে যে এত সুন্দর আর এতটা মোহময়ী করে তুলতে পারে নিজেকে মেয়েট, সত্যি না দেখলে ভাবতেও পারত না স্বপেন্দু।

দুটো বড় বড় গোল চোখে যেন ভীতা সন্ত্রস্তা হরিণীর বিক্ষিপ্ত চাহনী। তারপরে—হঁ্যা, তারপরেই মেয়েটির যৌবনোজ্জল উচ্চ বুকের রঙ্গীন হাতছানি।

উঃ

সত্যি, স্বপেন্দুর সমস্ত শরীরটায় উন্মত্ত কামনার বন্য সরীসৃপটা আবার একটা পাক দিয়ে ওঠে।

চোখে আর রক্তে আগুন ধরায়।

কথাটা ভাবতেই কেমন যেন—

—"উঃ না",—

ও আর কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারছে না ওর ভেতরের কামোন্মত্ত আদিম জানোয়ারটির বর্বরোচিত তীব্রতাকে।

স্বপেন্দু বেশ অনুভব করতে থাকে।

ওর বুকের ভেতরে নারীমাংসলুপ একটা ক্ষুদিত আদিম বন্য পশুর তীব্র আর সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাত।

গত কয়েকদিন ধরেই ভাবছে ও।

এবারে বোধহয় নিজের ভেতরের আদিম জানোয়ারটাকে আর কিছুতেই আয়ত্তে রাখতে পারছেনা স্বপ্নেন্দু।

কিন্তু তবুও—

মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে কথাটা ভাবতে। কোথায় যেন একটা মিথ্যা আর অবিশ্বাসের খোঁচা হুল ফোটায়।

হ্যাঁ,

এ মেয়েটিও এ গলির আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই সামান্য একটা দেহোপজিবীনী। তুচ্ছ ক'টা টাকার বিনিময়েই ওর দেহের অধীশ্বর হওয়া যায়।

আশ্চর্য বৈকি!

অথচ মেয়েটির চেহারা থেকে শুরু করে কোন কিছুই এ পাড়ার মেয়েদের মত নয়।

শিবদুর্গা হোটেলের ঠিক পাশের পুরানো জীর্ণ একতলা বাড়ীটাতেই থাকে ও। ছোট ঘরটির সামনে একটা টিনের শেড দেওয়া বারান্দা আছে। আর বারান্দার ঐ মাঝের থামটির উপরেই দেহের সমস্ত ভর দিয়ে মেয়েটি এসে দাঁড়ায় বিকেল না হতেই।

স্বপ্নেন্দু মাত্র দিন দুয়েক দেখেছে মেয়েটিকে।

হ্যাঁ আর তাতেই ওর রক্তে নেশা ধরেছে।

নাঃ,

কিছুতেই পারেনি স্বপ্নেন্দ।

মেয়েটির ঐ সুন্দর রূপ আর দেহের মিষ্টিমধুর একটা জৈবিক আবেদন কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেনি স্বপ্নেন্দু।

শেষ পর্য্যন্ত—

অন্ততঃ—হ্যাঁ, অন্ততঃ একটা রাত ওর ঘরে কাটাতেই হবে ওকে। দেখবে এবার স্বপ্নেন্দু।

রূপে রসে টইটুম্বুর, না মিথ্যে বিষাক্ত রংকসহীন একটা নোংরা আস্তাকুঁড়।

গত দুদিনের একটি মুহূর্ত্তও স্বাভাবিকভাবে কাটেনি ওর।

সর্বদাই একটা অদৃশ্য অথচ জোড়াল আকর্ষণ অনুভব করছে স্বপ্নেন্দু মেয়েটির

কাছ হতে।

সামান্য ক'টা টাকাই তো—

দেখাই যাক না—

তাতে যদি ওর ভেতরের বৃৎসিৎ আর নোংরা পশুটার কণ্ঠনালী রোধ করা যায়।

● ● ●

পরের দিন সন্ধ্যা ৭টা।

স্বপ্নেন্দু আর একবার দেখে নিল ওর মনিব্যাগটা। মেয়েটিকে খুশী করার মত রেস্ত আছে কি না ব্যাগটায়।

হ্যাঁ এবারে নিশ্চিন্তমনে সিগারেটটা ধরিয়ে নীচে নেমে এল ও। ঘন ঘন সিগারেটটা টানতে শুরু করল।

কিন্তু—কিন্তু—

এত ঘামছে কেন স্বপ্নেন্দু!

বুকের ভেতর কে যেন একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে বারবার। ভেতরটা যেন দাপাচ্ছে।

উত্তেজনায় ওর শ্বাস যেন আটকে আসছে।

অজানা একটা আশংকা এসে সহসা স্বপ্নেন্দুকে তীব্রভাবে জড়িয়ে ধরে। নিজের অজান্তেই কখন যেন পিছিয়ে আসে ও। রুমাল দিয়ে মুখটা ঘসতে থাকে বারবার।

নাঃ, সমস্ত ভয় আর সঙ্কোচের তীব্রতা জোর করেই যেন এবারে ঝেড়ে ফেলে ও। বেশ জোরেই এগোতে শুরু করে স্বপ্নেন্দু।

গলির মাঝামাঝি ল্যাম্পপোষ্টের অনুজ্জ্বল আলোর একটুখানি রশ্মী তির্য্যক-ভাবে এসে পড়েছে মেয়েটির বারান্দায়।

তাতেই বেশ স্পষ্ট দেখা যায় মেয়েটিকে।

আবছা অন্ধকারে একরাশ দুর্বোধ্য রহস্যের মতই মনে হয় ওকে। বড় বড় দু'টো অসহায় চোখে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝিলিক হেনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি।

সহসা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে স্বপ্নেন্দু। মনে মনে দ্রুত গতিতে কি যেন ভেবে নেয়।

এবারে সোজা মেয়েটির ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়ায় একটা আকস্মিক বিস্ময়ের মতই। মুহূর্তের জন্য মেয়েটি বুঝি চমকে ওঠে, বুঝি বা একটুখানি নড়ে ওঠে ও।

—"কি ব্যাপার, কি চান কে আপনি?" সহসা ভীতা মেয়েটি একসাথে এতগুলো কথা বলতে পেরেও যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। —"হ্যাঁ"— চমকে ওঠে স্বপ্নেন্দু। কণ্ঠস্বর বুঝি আটকে যায়। তবুও চেষ্টা করে—"মানে কৈ, চল ভিতরে চল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো আর, মানে,"—

—"Shut up." বিষাক্ত কালনাগিনীর মতই গর্জে উঠল মেয়েটি দৃঢ়কণ্ঠে।

—"না, না,"—কি যেন বলতে চায় স্বপ্নেন্দু তবুও।

—"Please gate out, এটা একটা ভদ্রলোকের বাড়ী।"

সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি ভেতরে চলে যায়।

আর ঠিক তক্ষুনি স্বপ্নেন্দুর চোখে পড়ে জীর্ণ দেওয়ালটার গায়ে ততোধিক জীর্ণ একটা নেমপ্লেট। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারল না ও।

অপরিসীম একটা লজ্জা আর গ্লানির যৌথ দহনে ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করেছে ও।

—"এটা তবে কোন স্বৈরিণী বা দেহোপজীবিনীর বাড়ী নয়!"

রবীন অধিকারী

দীপান্বিতা

বর্ণিল চিত্র এক,—দৃশ্যত নিখুঁত

নিয়নে ভাস্বর রম্য ড্রইংরুম,
আত্মঘোষী মহার্ঘ আসবাব,
মজলিশী মিত্রদের সফেন আলাপে
সহাস্যে সস্ত্রীক আমি,—সুখীমন
কফির আতিথ্যদানে সদা অকৃপণ।

বাড়ে রাত ; স্তব্ধ ভিয়েৎনাম,
লুনার স্লিপ্ স্লিপ্, বন্ধুদের অজস্র প্রলাপ।
নিশ্চিন্ত নির্ভর ঘুমে বধূ অচেতন।
ফিস্‌ফিস্ রাত্রি কথা বলে, শ্বাস রুদ্ধ যেন।
হা-হুতাশী ঝাউবনে, টিপ্ টিপ্ জোনাকী বিধুর।

বিসর্পিল আঁধারের উত্তুঙ্গ চূড়ায়
স্থির এক মুখশশী,—আজো বড় চেনা।
সুদূর দেওয়ালী জ্বলে স্মৃতির দেউলে,
যথের গোপন ধন, প্রতিরাত্রে নিভৃতে লালন
অথচ নিতান্ত সুখী বধূসঙ্গে পরিতৃপ্ত মন।

মঞ্জু মিত্র

সমুদ্রের স্বাদ

কিছু ছুটি পাওয়া গিয়েছিল।
তোমরা বললে : চলো বেড়িয়ে আসি, তুমি তো
জীবনে সমুদ্র ছ্যাখোনি।
সেই ভালো। আমি উল্লসিত হ'য়ে বললুম : না—
সমুদ্র স্বপ্নে আর ছবিতে ছাড়া
দেখা আর হ'লো কই!

তারপর লটাবহর বেঁধে তৈরী। সুপ্রিয় ক্যামেরা, আর
পরিমল বেহালা নিয়েছে। আমি
কালো চশমা।

খুব ভোরে শেষ ঢুলুনিতে চম্‌কে উঠতেই সকলে বললে-
আমরা এসে গিয়েছি, এই তো ধূধূ দিগন্ত ছোঁয়া জল।
বালুময় বিস্তির্ণ চত্বর, ঝাউবনে ফিস্‌ফাস্‌ কানাকানি।
আকাশ সিঁদুর মেখে তৈরী, নাকি সূর্যোদয় হবে।
সুপ্রিয় ক্যামেরা নিয়ে রেডি, আমি দারুন জোরে
ছুটে গিয়েছি কিনারে। এই সমুদ্র!

মন্টেসরির একপাল ছেলের মতো ঢেউ আছড়ে পড়লো
পায়ের কাছে। যেন কত খুশী, আমি এসেছি বলে।

ওদের আদর করছি ভেবে এক আঁচলা জল
গণ্ডুষেই আমি চমকে উঠেছি। এ্যাতো লোনা!
মনে পড়লো জীবনে জলের লোনা স্বাদ পাইনি কি?
তাহলে সমুদ্র? ত্র্যাতো কান্না কোথা থেকে আসে?

তারপর আমি আর কখনো সমুদ্রে যাইনি।

পার্থসারথি রায়চৌধুরী

কৃত্রিম

একটার পর একটা—
রাজপথ কাঁপিয়ে,
দানবগুলো ছুটছে।
অবসর নেই—
তাই অন্ধটা দাঁড়িয়ে,
ওর পাশে আরো অনেকে আছে—
তবে, হাতগুলো গুটিয়ে।
হঠাৎ দু'টো হাত এগিয়ে এল,
সবটা নয়—শুধু ক'টা আঙুল,
আলতো ভাবে—যেন সবটা না ছুঁতে হয়।
চোখটা ওর দিকে নয়,
মুখে একটু হাসি—একটু আগে চোখ পড়েছে,
ওদিকের বাস স্ট্যাণ্ডে—
ক্লাশের মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে।
আস্তে আস্তে রাস্তাটা পেরিয়ে এলো।

জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়

সুখের বড় কাছে

আজকের দিনের ঘরণীদের সামনে অনেক সমস্যা। জীবনধারণের উপযোগী বাসস্থান, আহার, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কোনটাই আর আজ সহজভাবে পাওয়া যায় না যেমন—তেমনি ব্যবস্থা করাও সহজ সম্ভব নয়। এই সমস্যা শঙ্কুল যুগে পুরুষের সমস্যা থেকেও নারীর সমস্যা ও দায়িত্ব অনেক বেশী। নারী তার পরিবার ও সংসারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকেন। তবে জীবনযাত্রাকে যুগপোযোগী করে না তুলতে পারলে মানুষ পদে পদে আঘাত পাবে এবং জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। আজকের দিনে কোন স্বচ্ছল পরিবারের ঘরণীও কল্পনা করতে পারবেন না যে বাড়ীর দাসদাসী ঘর সংসার সাজিয়ে রাখবে আর ঘরণীর কাজ হবে শুধু রান্নাঘরের সুপারভাইজ করা। অর্থনৈতিক কারণে আজকের দিনের অনেক ঘরণীকেই বাইরের কাজে যেতে হয়। যে যেমনই কাজ করেন না কেন তাঁরা যদি ঘরে-বাইরের কাজ সম্বন্ধে একটা ছক্ মনে ঠিক করে নেন—কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করে উঠতে পারবেন। প্রয়োজন পরিকল্পনার। বাইরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যদি আমরা অল্প সময়ও ঘর সাজাবার জন্য ব্যয় করি—তাতে শুধু ঘর সাজানোর স্বপ্নই সার্থক হয় না—সুরুচির স্নিগ্ধ পরশে স্বাদে মেজাজে পরিবারের অন্যান্যদের মন ভরে উঠে। ক্লান্তদিনের শেষ ক্ষণে বাড়ীর কর্তা অফিস শেষে ফিরে এসে সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ করেই তৃপ্তি পাবেন আর ঘরণীর প্রতি প্রশংসায় মুখর হবেন। এ প্রশংসা ঘরণীর পুরস্কার।

খুব অল্প পরিশ্রমে ও সময়ে আমরা আমাদের বাড়ীর টুকিটাকি কাজ করতে পারি। অব্যবহৃত পুরনো কাপড়ে এমব্রয়ডারী নক্সা তুলে সুন্দর টেবিল ক্লথ তৈরী করতে পারি। ঘরের নানা আসবাব-ঢাকাগুলির মধ্যে দু' একটি উজ্জ্বল রং (যথা হলুদ কমলা লেবু) রাখলে ঘরটিও উজ্জ্বল হয়। জানলার পাশে ফুলদানীতে ক'টি পাতাসহ ফুল অথবা শুধু ফুলের ডালা সমস্ত ঘরটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তা ছাড়া বদ্ধ ঘরে প্রকৃতির স্পর্শ পেলে মানুষের মনে জেগে ওঠে ছন্দ—প্রাণ মেতে ওঠে আনন্দে। আমাদের তীব্র

সম্পাদকের দপ্তরে

প্রতিভা থাকলেও প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব নয় যদি না সে প্রতিভাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়। তরুণ লেখক-লেখিকাগণের প্রতিভা স্ফুরণে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ছন্দিতা সম্পাদক বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন মারফৎ গল্প পাঠাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—তার উত্তরে প্রনিদিনই আমাদের দপ্তরে গল্প-কবিতা আসছে। সব রচনা প্রকাশ করা যাবে না কারণ—রচনার শোচনীয় অসঙ্গতি। আধুনিক বাংলা ছোট গল্পের গতিপ্রকৃতির ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এ যুগের অধিকাংশ তরুণ লেখক-লেখিকাগণের চিন্তা-ধারায় স্থান পাচ্ছে একদিকে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব এবং অন্যদিকে মার্কসীয় চিন্তাধারা—আর এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে তাদের রচনার খেই হারিয়ে ফেলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর দপ্তরে সম্প্রতি পাওয়া কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনার উপর মন্তব্য রাখছি। উদ্দেশ্য, লেখক-লেখিকাগণকে যথাযথ ভাবে সচেতন করে তোলা।

পুরুলিয়া লোকশেড পাড়া থেকে পাওয়া শ্রীবিশ্বজিৎ ঘোষের "আকাশ নীল সাগর নীল" গল্পটি নিতান্তই মামুলি প্রেমের ফ্রেমে বাঁধা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা উপস্থাপনের সঙ্গে ভাষা ব্যবহার, শব্দচয়ন ও ভাব ব্যঞ্জনায় শোচনীয় অসঙ্গতি রয়েছে। অবশ্য নামকরণের মধ্যে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে॥

* * * *

কোক ওভেন, থার্ড এভিনিউ, দুর্গাপুর থেকে শ্রীমতী আরতি সেন মোট দুটি গল্প পাঠিয়েছেন। "শ্রাবন সন্ধ্যা" গল্পটি আঙ্গিকের দিক থেকে ভাল হলেও ছোট গল্পের অন্যান্য গুনাগুন ও বৈশিষ্ট্যহীন। তাঁর গল্প বলার টেকনিকটি মন্দ নয় তবে চরিত্র-চিত্রনে সুগভীর অন্তদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম জীবন বোধ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নি। শ্রীমতী সেনের 'প্রেম' আমাদের ভাল লেগেছে—ভবিষ্যতে প্রকাশের ইচ্ছা রইল॥

* * * *

পদ্মপুকুর স্কোয়ার, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩ থেকে শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায় 'সিঁড়ি' নামক একটি গল্প পাঠিয়েছেন। স্বাদে মেজাজে নতুন হয়েও

গল্পের মর্যাদা সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হয় নি। তবে গল্প বলার ষ্টাইলটি ভাল লেগেছে। নামকরণে [illegible] না॥

গরবেতা, মেদিনীপুরের ডাক্তার কৃষ্ণপ্রসাদ দে দুটি কবিতা পাঠিয়েছেন দুটি কবিতাই ভাষায় অশ্লীল এবং ভাবে উচ্ছৃঙ্খল। ছন্দিতায় প্রকাশের অনুপোযোগী॥

পরিশেষে জানাই, পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের সম্পাদকীয় বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে রচনা নিশ্চয়ই পাঠাবেন। নমস্কার—

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম	ছন্দিতা
প্রকাশের সময় ব্যবধান	মাসিক
মুদ্রক	গৌরগোপাল দাশ, বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর কলি-১৮
প্রকাশক	ঐ
সম্পাদক	ঐ
সত্বাধিকারী	ছন্দিতার সম্পাদকমণ্ডলী

আমি গৌরগোপাল দাশ ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর
গৌরগোপাল দাশ

ছন্দিতা

শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৫

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের ছন্দিতা বিশেষ পূজা সংখ্যারূপে
মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।

গল্প, রম্যরচনা, রসরচনা, প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য রচনা, খেলাধুলা এবং সিনেমা পর্যায়ে বহু প্রতীক্ষিত বাংলা ও হিন্দিছবির বহির্দৃশ্যের রোমাঞ্চকর মুহূর্তের ছবিসহ পরিচিত চিত্রতারকাদের জীবনী, সিনেমা শিল্পে ভিন্নরূপী মন্তব্য, পরিচালকের এবং শিল্পির দায়িত্ব ইত্যাদি অনাস্বাদিতপূর্ব সংযোজন—এ সংখ্যার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।

এ সংখ্যার মূল্য বাড়বে
গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য লাগবে না
এজেন্টগণ যোগাযোগ করুণ।

নিয়মাবলী

ছন্দিতা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

- প্রতি ইংরাজী মাসের ২০ তারিখে প্রকাশিত হয় (বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহ)।

বার্ষিক সডাক ৫.০০টাকা। ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য .৪০ পয়সা।

- বছরের যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়। এপ্রিল থেকে বর্ষ সুরু।
- গ্রাহক গ্রাহিকাদের উচ্চমানের লেখা সাদরে গ্রহণ করা হয়।
- প্রয়োজন বোধে লেখা সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। ফুলস্কেপ কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত না হলে গ্রহণ করা হয় না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট সমেত লেখা পাঠাতে হয়।
- দশ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সি জমা প্রতি সংখ্যার জন্য ২৫% কমিশন বাদে ½ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।

কমিশন বাদে ভি, পি, পি যোগে কাগজ পাঠানো হয়। ডাক খরচ এজেন্টদের দিতে হয় না।

বিঃদ্রঃ চিঠিপত্র, টাকাপয়সা সব সময়ই সম্পাদক : 'ছন্দিতা', বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা১৮ ঠিকানায় পাঠাতে হয়। কোন ক্ষেত্রেই কারো ব্যক্তিগত নামে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই।

পত্রোত্তোরের জন্য সব সময়ই উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো প্রয়োজন। অন্যথায় কোন রকম যোগাযোগ করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৪র্থ বর্ষ, ২য় ৩য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৫

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

করুণা করো

সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে আর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখবো না— মোটামুটি এই ছিল আমাদের সিদ্ধান্ত। ভেবেছিলাম, অশ্লীল সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যিক-গণের ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ দেখছি তা হয়নি। বরং উল্টোই হয়েছে। সম্প্রতি নবপর্যায়ে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিকে বাংলা দেশের একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের জনৈক প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য অভিযানকারীদের প্রচেষ্টাকে সোজাসুজি বাঁদরামি এবং বদমায়েসী বলে অভিহিত করে তাদের উপর এক হাত নিয়েছেন। সেই সুপণ্ডিত—সাহিত্যিক—সবজান্তা সাংবাদিক মহাশয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা নিয়ে বাগ বিতণ্ডা করার কোন সুস্থ স্পৃহা আমাদের নেই। শুধু তাঁর নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের জবাব আমরা দিতে চাই—নিছক গালাগালি দিয়ে নয়, সংগত যুক্তির অবতারণা করে।

তাঁর আলোচনা পাঠ করে আমরা বুঝতে পারলুম তিনি শ্লীল এবং অশ্লীল সাহিত্যের মধ্যের আদর্শগত পার্থক্যটি বুঝতে পারেন নি। আর বুঝতে পারেননি বলেই অভদ্রভাবে আন্দোলন কারীদের উদ্দেশ্যে ঘেউ ঘেউ করেছেন। শুধুমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করছি—সাহিত্যের দুটি উদ্দেশ্য থাকে, প্রথম তথ্য অন্বেষণ, দ্বিতীয়টি রস অন্বেষন। প্রথমটির উদ্দেশ্য সত্যকে জেনে নির্ভয়ে প্রকাশ করা—দ্বিতীয়টির শৈল্পিক সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি রাখা। যেহেতু রস সাহিত্য সাধারণ সাহিত্য থেকে পৃথক সুতরাং তথ্য অন্বেষণমূলক সাহিত্যকে আমরা রস সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলতে পারিনা— আর তথ্য অন্বেষণমূলক সাহিত্যে যৌন জীবনের তথ্য এমন নির্লজ্জভাবে প্রকাশিত হয় যা পাঠ

(৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কলকাতা দর্পণ

'এই কোলকাতা শুধু ভুলে ভরা।' দাদাঠাকুরকে ধন্যবাদ। তিনি কোলকাতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে গেছেন। জব চার্ণকেরও ভাগ ভাল। ভদ্রলোক আজ বেঁচে থাকলে যে কি হতো তা বলা যায় না। কারণ কোলকাতার রূপ দেখে হয়ত স্যুই সাইডই করে ফেলতেন। এই কোলকাতার সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব দুটি লাল কুঠিরের। একটি সুরেন বাড়ুজ্যে রোডে। আর একটি লাল দিঘির পাড়ে। প্রথমটিতে পৌর-ঠাকুর্দা, পৌরপিতা, পৌর জেঠা-কাকাসহ হাজার কয়েক সেবক (!) আছেন—যাঁরা কোলকাতার পরিচ্ছন্নতার জন্য অহোরাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে চলেছেন। নাগরিকগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা অতন্দ্র সৈনিকের মত দেশসেবার জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। আর একটি লালকুঠি? সে তো ৩৫০ পৃঃ একখানি ইতিহাস। সে ইতিহাসের নায়ক ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী, প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ। এঁরা নাকি কোলকাতার জন্য অনেক নিদ্রাহীন রজনী যাপন করেছেন। কোলকাতা—সত্যিই তুমি অনন্যা।

অবশেষে কোলকাতার জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। জঞ্জাল নিয়ে কোলকাতার বুকে এরমধ্যে অনেক নাটকই অভিনয় হয়েছে। তোলপাড় হয়েছে পৌর ভবন। ঘেরাও মিছিলও হয়েছে দিনের পর দিন। এমনি করে একটা পুরোদস্তুর সুন্দর নাটক আমরা (কোলকাতার নাগরিকরা) দেখেছি। এ দেখার যেন শেষ নেই। না, এ নাটক দেখার প্রয়োজন নেই কোলকাতাবাসীর।

কোলকাতার সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রূপটি আর কি ফিরে আসবে না! এ যেন অনেক দিনের আশা, আকাঙ্খা—হায়রে কোলকাতা! কোলকাতাবাসীর এ প্রশ্নের জন্য কারোমাথা ব্যথা নেই (পৌরকর্তাদের)। আমরা তো তাই লক্ষ্য করলুম। তাঁরা অধিবেশনের পর অধিবেশন করেছেন। হাতাহাতি করে এক হাত নিয়েছেন—তাই যথেষ্ট। কি হবে হতভাগ্য নাগরিকদের পরিচ্ছন্ন জীবনের কথা চিন্তা করে!

যাঁরা বছরের পর বছর পৌরকর্তাদের পেটের খোরাকী যোগাচ্ছেন তাঁদের জন্য মাথা ব্যথার কি দরকার। তাঁরা রোগ মহামারীতে নিঃশেষ হয়ে যাক—এই তো তাঁদের ইচ্ছা।

প্রবন্ধ

অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

নজরুল

যৌবন অসহ্য। কিছুতেই বাগ মানে না, পোষ মানে না। যৌবন পেরিয়ে এসে যাঁরা বিনম্র সাংসারিক তাঁরা যৌবনকে মনে করেন ত্রাস, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংগঠনগুলি প্রকৃতপক্ষে যৌবন বিরোধী এবং মৃত্যুমুখী। আবহমান-কাল ধরেই পৃথিবীর এই নিয়ম, এই ইতিহাস। তবু মানুষের জীবনে যৌবন আসে, ভাঙার মন্ত্র শুনতে পায় সে, নিজে ভেসে যায়, ভাসিয়ে নিতে চায়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কতবার দিগন্তকে ছুঁতে হয়, অলস মধ্যাহ্নে ঘোড়া ছুটিয়ে হারিয়ে যেতে হয়। নজরুল সাহিত্যও সেই যৌবন। যৌবনের যেমন কোন পিতৃপুরুষ নেই, উত্তরাধিকারী নেই, নজরুল সাহিত্যেরও তেমনি কোন পিতৃপুরুষ নেই আজও তার কোন উত্তরাধিকারী দেখি না। নজরুল নিজেই বলেন—

> আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ
> মহাবিপ্লব হেতু।

এখন প্রশ্ন হল তিনি যুগোত্তীর্ণ কিনা। বিজ্ঞেরা এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত। 'হুজুগের কবি' নজরুল কি কালের সঙ্গে কালের একটা যুগমানসের সঙ্গে আর একটা যুগমানসের সহিতত্ব সম্পাদন করতে পেরেছেন কি? কৃতী সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বলেছেন "রবীন্দ্রযুগে জন্মে, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কাছে এসেও এমনিভাবে সবচেয়ে বড় অরাবীন্দ্রিক হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তার যুগোত্তীর্ণতার বলিষ্ঠতম প্রতিশ্রুতি। সে দাঁড়িয়ে আছে স্বতন্ত্র, একক একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব ও শক্তি।" অনন্যতাই কিন্তু যুগোত্তীর্ণতার নিরিখ নয়। মানুষ প্রতিনিয়ত পরিবেশ-নিষ্পেষিত হয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। নিত্য নতুন মানসিক বিস্ফোরণ মানুষকে অস্থির করে তুলছে। সামাজিক অবস্থার বহু পরিবর্তন হল এবং হবেও কিন্তু মানুষের মূলে যন্ত্রণার যে বীজ তা কোনদিনই নড়চড় হচ্ছে না। যন্ত্রণা এবং ক্রোধ চিরন্তন। তাই নজরুল যখন বলেন—

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল

আমি দলে' যাই যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।

তখন যে শুধু একালের ব্যক্তি-মানুষের মনকে রসাবিষ্ট করে তা নয় অনাগত কালের মানুষের জন্যও রেখে যায় দীপ্ত হবার প্রতিশ্রুতি। অবর্তমান অনাগত কালেও মানুষের মনে এই অনুভূতির, এই তীব্রতার স্ফুরণ ঘটবে। এখানেই নজরুল সাহিত্যের যুগোত্তীর্ণতার ভিত্তিভূমি। যেমন অক্টোবর বিপ্লবের পরেও গোর্কীর 'মা' উপন্যাসের মূল্যে বিন্দুমাত্র হানি ঘটেনি, যেমন ঘটেনি 'নীলদর্পণে'। কিন্তু জারের রাশিয়াও নেই, অত্যাচারী নীলকরও আজ বাংলাদেশে নেই।

তাই 'হুজুগের কবি' পরাধীন ভারতের বিদ্রোহী কবিমাত্র নন আজ এবং অনাগত কালেরও পরমাত্মীয়। যখন দেখি দারিদ্র লাঞ্ছনা আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং যৌবনকে ঘিরে ধরেছে—তখনই নজরুল আমাদের স্মরণে আসে—

আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্ব্বনাশী

আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।

আমাদের রক্তের মধ্যে শুনতে পাই নতুন জীবনকে পুষ্পিত করবার আহ্বান, স্বপ্ন দেখি সর্ব্বনাশের শেষেই বাঞ্ছিত স্বদেশ।

সব সাহিত্যিকের মতই নজরুলের সৃষ্টিতেও বহু দুর্ব্বল অংশ আছে। এই প্রসঙ্গে Arnold এর Essays in Criticism এর কথা স্মর্তব্য। Arnold

It is important, therefore to hold fast to this :
that poetry is at botton a criticism of life ;
that the greatness of poet lies in his powerful
and beautiful application of ideas to life—
to the question how to live নজরুল কাব্যে দেখি—

……..দারিদ্র অসহ

পুত্র হয়ে, জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ

আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী ?

কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?

কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা গেলাস

ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্য্যাস।

আমরা এতেই দেখি Criticism of life কত তীব্র, কত রসোত্তীর্ণ। নজরুল সাহিত্যে সর্বত্রই দেখা যাবে এই Criticism of life. কিন্তু নজরুলের 'সঞ্চিতা' পড়েই যদি বিচারের দণ্ড তুলে নিই তাহলে আমাদের ভাগ্যে প্রবঞ্চনাই জোটে। কিন্তু যদি একবার চেয়ে দেখি তাঁর 'কুহেলিকা' 'বাঁধনহারা'র দিকে তাহলেই বুঝতে পারি জীবনের কত গভীরে নজরুল যেতে পারেন। এই সঙ্গে আমরা আরো লক্ষ করি সংগ্রামী মানুষের জন্য শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অক্লান্ত ব্যারিকেড্ রচনা।

নজরুলই সংবাদপত্রের স্তম্ভে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রথম প্রকাশ্য দাবীদার। ১৩২৯ সালের ২৬শে আশ্বিনের ধূমকেতুতে লিখেছিলেন "ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।" পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার পর কি নজরুল আমাদের কাছে ফুরিয়ে গেলেন? অন্নদাশঙ্কর যথার্থই বলেছেন—

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিক নজরুল।

দুটো বাংলা সৃষ্টি করেও দুটো নজরুল করা সম্ভব হল'না। বাংলাভাষার জন্য রক্ত ঝরিয়ে পূর্বপাকিস্তান রবীন্দ্র-নজরুলের সৃষ্টির জন্য অকৃপণ ত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। যেখানেই সংগ্রাম সেখানেই যৌবন, যেখানেই যৌবন সেখানেই নজরুল। হাজার হাজার গানে বাংলাদেশের মাটী, নদী, প্রান্তর নিবিড় করে জড়িয়ে রেখেছেন নজরুল। শার্ঙ্গদেব বলেছেন "নজরুলের আর একটি মহৎ গুণ, তিনি বাংলা গানে বাঙালীর স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণ-প্রবণতা রক্ষা করেছিলেন।"

বেঁচে থাকবার জন্য নতুন ভবিষ্যতের জন্য নজরুল আমাদের সাহস, আমাদের ঔদ্ধত্য। বাংলাদেশের উচ্ছল বেহিসাবী যৌবন যখন অচলায়তনকে ভাঙে, যখন জীর্ণ-পুরাতণকে সরিয়ে দিয়ে নতুন সৃষ্টির মুখোমুখি হতে চায়— নজরুল তখন পথিকৃত। তাই নজরুল চিরকালের—নজরুল যুগোত্তীর্ণ।

অনিবার্য কারণ বশতঃ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা একই সঙ্গে প্রকাশিত হল। —সঃ ছঃ

হেনা রায়চৌধুরী

ব্যথার কাব্য শেষের কবিতা

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'শেষের কবিতা' কবির এক মাধুরীপূর্ণ কাব্যময় উপন্যাস। কবির সাহিত্য সৃষ্টির মূলকথাই 'সীমার সহিত অসীমের মিলন।' আদশলোক এবং বাস্তব দ্বয়ের সমন্বয়ে ভালবাসার এক আদর্শ জীবনকাব্য 'শেষের কবিতা।' অমিত ও লাবণ্য ভালবাসার দুই মুক্ত বিহঙ্গ প্রেমের মুগ্ধতায় নিজেদের কোরল আবিষ্কার—যার শেষ নেই। যে লাবণ্য এতকাল জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে বিচরণে ছিল তৃপ্ত অমিতের ভালবাসার বন্যায় সে ছুটে চলল বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় দুর্বার গতিতে, তার নারীসত্ত্বা উঠল জেগে নিজের সম্বন্ধে ভাঙ্গল তার ভুল। ভালবাসার জন্য সে যে মরতেও পারে তার একটি উক্তি স্মরণ করায় তার অন্তরের গভীরতা কি নিবিড় বোঝা গেল। আর অমিত রায় যে এতকাল গড়ঠিকানা জানা মেয়ের প্রত্যাশায় মনে মনে ব্যর্থ ঘটকালী কোরছিল সেই অতুলনীয়ার দেখা পেল শিলং পাহাড়ের নির্জন পরিবেশে। ড্রইংরুমে দেখা সুন্দরীদের চেয়ে সে যে আলাদা—এ স্বাতন্ত্র্য তার চেহারা, ব্যক্তিত্বে, সাজপোষাকে এবং কণ্ঠস্বরে। তাই রূপ গুণ বুদ্ধির কোথাও নেই অস্পষ্টতা। মন বুঝি বা বোলে উঠল এই সেই—আপন পরিচয়েই যার পরিচয়।'

সুরু হোল হৃদয় বিনিময়ের পালা—অমিত সুরু কোরল আত্মজীবনী লিখতে আর নিবারণ চক্রবর্ত্তী এই ছদ্মনামে সুরু কোরল কবিতা লিখতে। লাবণ্যর প্রেমে আত্মভোলা অমিত রায় তার জীবনের পথ খুঁজে পেলো। ভুলে গেল সে তার অতীতকে। শিলং পাহাড়ের শ্রী তার সবটুকু মাধুরী দিয়ে রচনা কোরল কত অপরূপ আপনকরা সন্ধ্যা এবং নির্জন বর্ষণ মুখর দিনের মিলনের ইতিহাস। এমনি কোরে ভরে উঠল দুটি হৃদয়ের জীবনপাত্র। ঠিক হোল আগামী অগ্রহায়ণ মাসে তাদের বিয়ে। তাই এবার শিলং পাহাড় থেকে অমিতের বিদায় নেবার পালা। সেই বিদায়ের আগে শেষ মিলন সন্ধ্যায় লাবণ্যর মনে কোথায় যেন একটা ব্যথা জেগে উঠল—কেবলি মনে হোতে লাগল—'জীবনের মহোৎসবের দিন শেষ হোয়ে গেল।'

কে জানত তার মনের এই বেদনাপূর্ণ আকাঙ্খাই সত্যি হোয়ে উঠবে—কোন্ কালের প্রেমের দাবী নিয়ে এসে দাঁড়াবে কেতকী মিত্র (ওরফে কেটি) যারা প্রয়োজন হোলে ছিনিয়ে নিতেই জানে। যে ভালবাসার স্মৃতি অমিতের মনে বিন্দুমাত্র আবিষ্ট ছিলনা বাস্তববাদিনী কেতকী সেই ভালবাসাকেই বোসল দাবী কোরে। একদিন অমিতের দেওয়া হীরের আংটিকে সে খুলে দিয়ে গেলো। সে জানতনা দামী পাথর দিয়েই হৃদয়ের মূল্য যাচাই হয়না তার স্থান অন্য জায়গায়। তাই লাবণ্য পেরেছিল তারই দেওয়া আংটিকে আবার অমিতের আঙ্গুলে পরিয়ে দিতে। সে বোলেছিল, 'আমার' প্রেম থাক নিরঞ্জন বাইয়ের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বেনা। আসলে কোন পার্থিব মহার্ঘ বস্তু দিয়েও হৃদয়ের গভীর প্রেমের পরিমাপ করা যায় না—লাবণ্যর প্রেমিক হৃদয় এ সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি কোরেছিল।

এরপর লাবণ্যরই অনুরোধে অমিত কেতকী এবং তার দলবল নিয়ে গেলো চেরাপুঞ্জিতে। আর লাবণ্য শিলং পাহাড়কে শেষ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল। বিদায় বেলা তার দেখা আমরা পাইনি তবুও অনুভব কোরতে পারি এই অপরূপ মেয়েটির হৃদয় বেদনা।

যে শোভনলাল একদিন ভীরু প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে লাবণ্যর হৃদয় দুয়ার হোতে বিতাড়িত হোয়েছিল আজ তার সাড়া পেয়ে লাবণ্য তার ভালবাসার প্রতিদান দিতে স্থির সঙ্কল্প কোরল। কারণ নিজের ভালবাসার বেদনায় সে উপলব্ধি কোরেছিল শোভনলালের হৃদয় বেদনা। আর অমিত চেষ্টা কোরল কোন এক অতীতের ভালবাসার প্রতিদান দিতে। অমিতের কথায় সৃষ্টির গতির আকস্মিকতার ধারায় দুটি হৃদয় এসেছিল কাছাকাছি। আবার বাস্তবের আঘাতে তারা দূরে সরে গেলো কিন্তু এই প্রেমের আবির্ভাব দুটি হৃদয়ে যে নবজন্মান্তর ঘটাল তাতো কোনদিন হারাবেনা। অমিত লাবণ্য মর্ত্তের মাটিতে প্রেমের যে অমৃতলোক সৃজন কোরেছিল তা সমাজ সংসারের সীমাকে অতিক্রম করে চির অভিসার কোরল অসীমের পথে—যেখানে এলে সব কথা ফুরিয়ে যায়—নদী এসে সাগরে মেসে কিন্তু সাগরের তো পরিমাপ নেই। জীবনের প্রয়োজনে বিয়ে তারা কোরেছিল কিন্তু তাদের মৃত্যুঞ্জয় প্রেম সে তো চিরদিনের, তাই অমিত বোলতে পেরেছিল 'ভালবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরও বেশী জ্যান্ত।'

কিন্তু উপন্যাসের মূলতত্ত্ব দিয়ে জীবনকে কি সান্ত্বনা দেওয়া যায়—'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি শেষ করার পর কবির এই কথাটি বারেবারে মনে পড়ে—

"প্রেমের আনন্দ থাকে স্বল্পক্ষণ
কিন্তু তার বেদনা থাকে সারাজীবন।"

তাই উপন্যাসটির তত্ত্বকে অতিক্রম করে দুটি প্রেমিক হৃদয়ের বেদনার অশ্রু হৃদয়কে ব্যথিত কোরে তোলে। দিঘী ও ঘড়া, ডাঙ্গা ও আকাশ এ দুয়ের প্রেম কি অমিত রায়ের জীবনকে সুখী কোরেছিল? একদিন যার প্রতি বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সেই কেতকী কি পেরেছিল অমিতের অশান্ত মনকে শান্ত কোরতে, কেতকীর মত লিলি গাঙ্গুলী, বিমিবোস এবং হয়ত আরও অনেক মেয়েই এসেছিল অমিতের জীবনে। অমিত নিজেই একদিন বলেছিল "তাতে দেখাশুনা হয় চেনাশোনা হয় না।" লাবণ্যর মত কোরে কেউ পারেনি তার হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে।

তাছাড়া কেতকী উগ্র আধুনিকা মেয়ে, একজনের কাছ থেকে অমিতকে ছিনিয়ে আনার আনন্দে আজ হয়ত সে তার সব পাপড়ি খসাতে রাজী—কিন্তু পাওয়ার মোহ ফুরিয়ে গেলে এরা আবার নিজের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ কোরবে—কারণ নিজেদের সমাজ (society) কে ছেড়ে এরা বাঁচতে পারে না। লাবণ্যর প্রতি প্রথম সাক্ষাতেই কেতকীর যে ব্যবহারের পরিচয় পেয়েছি তাতে মনে হয়না অমিত ওকে বোঝাতে চাইলেও ও মেনে যে লাবণ্যর কাছে সারাজীবন ঋণী। তাই অমিত লাবণ্যর কাছ থেকে যা পেয়েছিল কেতকীর কাছ থেকে তা কোনদিনই পাবেনা। একদিন অমিত লাবণ্যর উদ্দেশ্যে লিখেছিল :—

'পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী—
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়ে
নিজেরে চিনি।'

লাবণ্যকে সে আবিষ্কার কোরেছিল শুধু স্বাতন্ত্র্যতায় নয় জ্ঞানের গভীর আলোকে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে যে প্রেয়সীকে জীবনকে কোরেছিল স্বর্গের চেয়েও সুন্দর অমিতের মন তাকে ভুলবে কেমন কোরে।

আর লাবণ্য যে প্রেমের স্পর্শে পাষাণী অহল্যার মত জেগে উঠেছিল একজনের চোখের জল দেখে প্রেমিককে দূরে সরিয়ে দিলেও এ প্রেমকে ও ভুলবে কেমন কোরে ? সে নিজেই একদিন কর্ত্তামাকে বোলেছিল, 'এতদিন যা ছিলুম সব আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর এক আরম্ভ এ আরম্ভের শেষ নেই।' তাই সেই নিরঞ্জন প্রেমের স্মৃতি কি কোন নির্জন সন্ধ্যায় ওর চোখে জল আনবেনা। 'তবু বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হোতে পূজাস্মৃতি ধরি' যে প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে সেই বেদনার শক্তিকে সম্বল কোরে এগিয়ে চলা ছাড়া কোন পথ নেই।

এমনি কোরে মর্ত্তসীমার মধ্যে দুটি তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় পরস্পরকে পেলোনা কিন্তু মর্ত্তের সীমানা ছাড়িয়ে অসীমলোকের পথে শাশ্বত হোয়ে রইল দুটি প্রেমিক হৃদয়ের ভালবাসার অঞ্জলিতে ভরা ব্যথার গান। বাস্তবকে জয়ী কোরতে আদর্শ পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছে, এই তত্ত্বের সঙ্গে মিলে আছে বেদনা তাই শেষের কবিতা শেষ কোরলে মনে হয় এ কেবল প্রেমের স্বর্গলোক নয়—বেদনার জয়গান।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে

অতীতের গর্ভগৃহ ছেড়ে যদি আজ ফিরে আসতাম বর্ত্তমানের আয়নায়, তা হলে কি বল্‌তে আজকের মানুষের কাছে?

বড্ড ভাবনায় পড়ে গেছ, না? ঠিক্ করতে পারছো না কি বল্‌বে আজকের মানুষের কাছে? অত ভাবনার কি আছে? বলবে, মরার পর কোন মানুষই আর ফেরে না। তবু যদি ফেরেন কবি, তাহলে আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখে আর একবার মৃত্যু হবে তাঁর।

দেখ, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং সেই স্বাধীন ভারত জগতকে দেবে নতুন আলো এই আশা ব্যক্ত করেছিলাম শেষ বক্তৃতা 'সভ্যতার সঙ্কটে।'

হ্যাঁ, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে বটে; অবশ্য পূর্ব ও পশ্চিমের বৃহৎ দু-ফালা মাটি বিসর্জন দিয়ে। শুধু কি তাই, আদর্শ ও ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে। সেই ইংরেজদের তৈরী কাঠামো এবং তার প্রহরায় সেই পুরাণো সরকারী মহলকে জীইয়ে রেখে, আর সেই পুরানো পাপের শিকড় না উপড়েই স্বাধীন হল ভারতবর্ষ। কি বলছ? বল্‌ছো "তোমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা নাওনি, বোঝাপড়ার ভিত্তিতে স্বাধীনতা নিয়েছো, তাই আদি ছকটা আমূল পাল্‌টে ফেলনি।" আহা—হা—আমিও সেই কথাই তো বল্‌ছি! বিদেশী শাসনের যা ছক, তার ওপর কি স্বদেশী শাসনের ইমারত দাঁড়ায়? তার নৈতিক বনিয়াদটা আপোক্ত না হয়ে পারে না। বিদেশীরা তাদের প্রয়োজনে এক রকমের ধনিক ও বনিক শ্রেণী তৈরী করেছিল, তৈরী করেছিল এক রকমের চাকুরে মহল। ইংরেজ চলে যাওয়া মাত্র তারা চরিত্র বদলে দেশপ্রেমিক হতে পারে কি?

কি বল্‌লে? "পারতো; যদি তোমরা ব্যবস্থাটা আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে। কিন্তু তোমাদের অভিজ্ঞতা ছিলনা, তোমরা ঐ দুই শ্রেণীর সততার উপর

নির্ভর করেই যাত্রা শুরু করলে, তাই দপ্তরে দপ্তরে দুর্নীতি, আর বাজারে জাল ভেজাল ও বঞ্চনা...”

হ্যাঁ, ঠিক তাই। অনিবার্য নিয়তির মতো ঘিরে ধরল, এখন ইচ্ছে করলেও এ থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত। বলা হচ্ছে বটে সমাজতন্ত্র সরকারের লক্ষ্য, হয়তো চাওয়া হচ্ছে তাই। কিন্তু রাষ্ট্ররথ যেপথে চলেছে তা তার বিপরীত মুখে। কি বল্‌ছো? আজ যদি আমি থাকতাম, কি করতাম? এই অনাচার, অন্যায়, অপ্রেম ও অসাধুতার এই সর্ব্বগ্রাসী প্রতাপ দেখে দুঃখ পেতাম কিনা? এবং আমার কণ্ঠে তার প্রতিবাদ স্বরূপ বজ্র নির্ঘোষ বেজে উঠতো কিনা? আমার সে আহ্বান সকলকে কি উদ্দীপ্ত করতো?

বিশ্বাস হয় না! আমার কতকগুলো গান নিয়ে যেখানে তোমরা জলসার আয়োজন করো আর খান কয়েক নৃত্যনাট্য নিয়ে করো উৎসব। এরই নাম দিয়েছো তোমরা কালচার। এর বাইরে কোথায় আমি? কি বল্‌ছো, আমি অবিচার করছি তোমাদের প্রতি? তোমরা জাতীয় সঙ্গীত করিয়েছ জনগণকে। ঘরে ঘরে আমার বাণী ছড়িয়ে দিয়েছো সুলভ রচনাবলী ছাপিয়ে। শহরে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়...

হ্যাঁ তা বটে! রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করে মন্ত্রীদের দিয়ে তার উদ্বোধন করাও. আর বাংলার প্রফেসারদের ডেকে বক্তৃতা দেওয়া....এই ত? (বিদ্রূপের সুরে) আমি কিন্তু বন্দী বইয়ের কারাগারে। সে বই কেউ খোলে না, তোমাদের উদ্বোধকরাও না, বক্তারাও না। কি বললে? “দিনকাল এখন অন্য রকম হয়েছে। বেঁচে থাকার ধান্দায় চব্বিশ ঘণ্টা এত ব্যস্ত থাকতে হয় মানুষকে যে পড়াশুনার সময় হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের প্রাণের গভীরে শেকড় নিয়েছে।”

তা নয় বুঝলাম। কিন্তু আমি যে আড়াই হাজার গান লিখেছি, আর তাতে সুর বসিয়েছিও আমি, তার কটা তোমরা জানো বা গাও? আর কটা গাও নির্ভুল সুরে? আকাশবাণী নামটা আমারই দেওয়া, সেখানে যারা গায়...কি বল্‌লে, ‘তার মধ্যে গুণীকণ্ঠ থাকে কিনা....’মানে বাজারে যাঁদের পাবলিশিটি আছে.... (ভ্রূ কুচকিয়ে) দেখ আমার গান তো শুধু সুর নয়, তার অনুভূতির বাণীরূপ। এই অনুভূতি মর্ম্ম পর্যন্ত পৌছতে হলে গলা ছাড়া আরো কিছু চাই। সেই কিছুটার আবাদ আজ আছে কি? কি বল্‌লে, তোমার যুক্তিটা? “তা ঠিক। আসলে বিজ্ঞান ও কারিগরী-

বিদ্যা বেশী উপার্জনের সহায়ক বলে মেধাবী লোক সবাই আজ সেদিকে যাচ্ছেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস যার নাম হয়েছে মানবিক বিদ্যা, এখন পড়তে জান পিচুওয়ালা মানুষরা।"

(সন্দেহ জড়িত কণ্ঠে) তাই যদি হয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমাদের কাণাকড়ি দানও নেই কেন? আর সাহিত্যে তোমরা যা করছো, তার কথা কিছু না বলাই ভালো। তোমরা আজ রম্য রচনা নামে যে পদার্থটি খাড়া করেছো, তা দেশের মানসিক দেউলে দশারই পরিচায়ক। গল্প লিখতে লাগে জীবনবোধ, প্রবন্ধ লিখতে লাগে পাণ্ডিত্য। রম্যরচনা এ দুইয়ের জগাখিচুরী, তাই এতে কিছু লাগে না। কথার পর কথা জুড়ে গেলেই হয়। হয়তো বলবে, "আমরা কি উপন্যাস লিখছি না? লিখছি না কি ভারী ভারী প্রবন্ধের বইও? বারো পনেরো বিশ পঁচিশ টাকা দামের বাংলা বই কি আজ কম বেরিয়েছে? এর কোনটায় কিছু নেই বললে বড্ড অকরুণ মন্তব্য হয় নাকি তা?"

হুঁ—হুঁ—হুঁ.. করুণ অকরুণের প্রশ্ন নয়, সত্যে পৌছুতে চেষ্টা কর।

আজ তোমরা যা লেখো তাই ত উপন্যাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ঐতিহাসিক কল্পকথা, সবই লেখা হয় উপন্যাস এর ঢঙে। আর বিশুদ্ধ উপন্যাস যা লেখা হয় তার পনেরো আনাই...

কি বললে? "জলো উপন্যাস ঢের লেখা হয় ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু ভালো জিনিসও হয় বৈকি। আমাদের দেশে এমন অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁরা প্রতি পূজোয় এক ডজন করে উপন্যাস লিখে ভাষা জননীকে সমৃদ্ধ করেন।" (নাক সিঁটকে) রাম রাম! দেখ, আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক। কামশাস্ত্রটা অনুশীলন করিনি। তাই মনস্তত্ব অনুধ্যানের নামে অকর্ম কুকর্মের পাঁকে গড়াগড়ি দিতে আমার গা ঘিনঘিন করে। ওসবের দ্বারা পৃথিবীর কি কাজ হয় জানিনা। পঁচিশ টাকা কেন পাঁচশ টাকা দাম হলেও ও জিনিষ অস্পৃশ্য।

কি বললে? এ সব বইই আমার নামাঙ্কিত পুরস্কার পায়, পায় একাডেমী পুরস্কার। পায় কবিতার বইও। তার কোন কোনটা আমি দেখেছি কি না? কি ধারনা আমার আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে? তা গ্রাহ্য না ত্যাজ্য?

হাঃ—হাঃ—হাঃ! দেখেছি হে দেখেছি! পড়েছি ও. বুঝতেও চেষ্টা

করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকটাই বাংলা কবিতার সাড়ে সর্বনাশ করে গেছে। সে দিয়েছে ছন্দ, দিয়েছে অর্থ, দিয়েছে তার মধ্যে কোন একটা ব্যঞ্জনা। এর কোনটা নিয়েই আজ আর কবিতা হয় না।

কি বললে? আজ আমি যদি তোমাদের মধ্যে থাকতাম কিংবা আবার ফিরে আসতাম, তাহলে আজকের পরিবেশকে কি চোখে দেখতাম? কি মনে হত আমার আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে? তোমরা এগোচ্ছো, না পেছোচ্ছো? আছো না মরেছ?

তা হ'লে শোন। গোড়াতেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। ও দুয়েরই আদি মৃত্তিকা। তা যদি সুস্থ হত, তাহলে ও দুটির আসন অসুস্থ প্রকাশ হতনা। সমাজে আজ মূল প্রেরণা হয়েছে টাকা, যেন তেন প্রকারে টাকা করার মত্ততায় মানুষ আজ ন্যায় অন্যায়কে একাসনে বসিয়েছে।

তাই দেখছি, কোথাও মানুষের জন্যে মানুষের দায় নেই, দরদ নেই, সহযোগিতা নেই। মুখ খিঁচিয়ে ছাড়া কথা কয় না আজ কেউ। মার পিট, ঝগড়া বন্দ, হুড়োহুড়ি, এই হল প্রতি মিনিটের চিত্র। এ সমাজ আর যাই হোক রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নয়। লিখেছিলাম আবার যদি ইচ্ছা করো ....না, আর ইচ্ছা নেই।

কি বলছ? এ থেকে বাঁচতে চাও? আমাকে বলছো টেনে তুলতে এই পঙ্ককুণ্ড থেকে তোমাদের? তোমরা আবার ফিরে পেতে চাও তোমাদের সেই মানুষের অধিকার, যা দিয়ে একদিন গোটা ভারতবর্ষকে দুনিয়ায় বড় করেছিলাম।

(উত্তেজিত ভাবে) মিথ্যা কথা! প্রতারক তোমরা। তোমরা বলো 'জনগণ' আমি লিখেছিলাম পঞ্চম জর্জের বন্দনা হিসাবে। তোমরা বলো, একদল বাস্তব বিমুখ বেকুব ছেলেমেয়ে তৈরীর জন্য আমি বিশ্বভারতী তৈরী করেছিলাম। তোমরা বলো, আমার গল্প কল্পনা-সর্বস্ব, উপন্যাস ভাব-সর্বস্ব, আমি প্রবন্ধে যুক্তির চেয়ে উক্তির ওপর দিই বেশী ঝোক...বলতে পারো, আজ তোমাদের মুক্তি কোথায়? মুক্তি মনুষ্যত্বের পুনরুজ্জীবনে। সে মনুষ্যত্ব বিনা সাধনে আসবে না। যাচ্ঞা করে স্বাধীনতা পেয়েছো, সাধনা দিয়ে তাকে বাঁচাতে হবে। সে সাধনার উপায় কি? উপায় বলেছি আমার সারা জীবনের রচনায়।

জয়ন্তী লাহিড়ী

মানবিক

চা আর গরম গরম চপের পর্ব্ব সমাধা হলে বিনয় প্রস্তাব করল, "আজ আমরা হিমাংশুদার মুখ থেকে কিছু শুনব।"

শীতের সন্ধ্যে, শনিবার। ক্লাবঘরের বাইরে আমাদের জমজমাট আড্ডা বসেছিল। ঘরের বাইরে বইছিল হাড়ে হাড়ে কাঁপন জাগিয়ে তোলা ঝোড়ো বাতাস, যদিও ঘরের ভেতরটা ছিল বেশ গরম।

আমাদের কথায় হিমাংশুদা চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে বললেন— "সেকি, আমি আবার কেন? আমি এসেছি শ্রোতা হয়ে।" এবার অমল বলল, "না না হিমাংশুদা, সে আমরা শুনব না। অনেক জায়গা তো বেরিয়েছেন আপনি, কোন অভিজ্ঞতার কথা বলুন।"

জয়ন্ত এবার গলা খুলল, "হ্যাঁ কোন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প হোক।"

অজয় সতরঞ্চিতে একটা ঘুষি মেরে তাকে নস্যাৎ করে দিলে "দূর, আমরা কি বাচ্চা নাকি? তার চেয়ে আজ একটা প্রেমের গল্প হোক।"

লাইটারের সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করতে করতে হিমাংশুদা বললেন, "দুঃখিত, তোমাদের কোন অনুরোধই রাখতে পারলাম না। আমার গল্পকে প্রেম বা অ্যাডভেঞ্চার কোন সংজ্ঞায়ই বোধহয় ফেলা যায় না। নিতান্তই সাধারণ একটা ঘটনা।"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ হোক।"

হিমাংশুদা শুরু করলেন—"ভ্রমণের সঙ্গে কোন কালেই আমার পেশার সংযোগ নেই, সেটা আমার একটা নেশা। আর নেশাটা যে কি ভয়ঙ্কর নেশা, সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। বছরের মধ্যে অন্ততঃ তিন চারবার অফিসে বেতনহীন ছুটির ক্ষতি সহ্য করে আমাকে ছুটে যেতে হয়েছে ভারতের কোন না কোন প্রান্তে।

সেবার গরমের সময় গিয়েছিলাম পুরীতে। জায়গাটা নেহাত দূরে নয় এবং ভ্রমণ বিলাসীদের কাছে ব্যয় এবং সৌন্দর্য্য দুইদিক থেকেই লোভনীয়।

সমুদ্রের ওপর ছোটবেলা থেকেই আছে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। একটা সপ্তাহ তাই সেই নীল সমুদ্র দেখেই কাটিয়ে দিলাম। আর একটা সপ্তাহ পরেই ফেরবার পালা।

সেদিনও বিকেলবেলা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সমুদ্রের তীরে। বিকেল গড়িয়ে কখন যে আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, খেয়াল করিনি। একটা পাথরের ওপর বসেছিলাম। সূর্য্যাস্তের অপরূপ বর্ণ বিন্যাসের পর সমুদ্র কখন কালো ওড়নায় মুখ ঢাকা দিয়েছে!

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল, "বাবুসাহেব।"

"কে"—চমকে তাকালাম।

"আমাকে চিনবেন না, আমি জলিম মহম্মদ, বাবুসাহেব।"

জলিম মহম্মদ! চমকে তাকালাম। গায়ে সাদা আচকান আব বাদামী জোব্বা। মাথার টুপিটার রং অন্ধকারে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। বুক পর্য্যন্ত নেমে এসেছে মেহেদীর ছোপে রাঙান দাড়ি। অবাক হলাম। এ আবার কে? কি জন্যে এসেছে? রোমান্টিক কোন উপন্যাসের শুরু তো এমনি করেই হয়। এও কি কিছু বলতে চায় নাকি?" সাদা ধবধবে দাঁত প্রসারিত করে লোকটা হাসল, "ভয় পাবেন না বাবুসাহেব। অন্ধকারে আপনি একলা বসে আছেন, তাই বলছিলাম জায়গাটা খুব ভাল নয়। রাত বিরেতে দু-একটা খুন-খারাপিও হয়। লুট তো হামেসাই হয়।" চমকে উঠলাম। অজান্তেই পকেটের ভেতরে হাতটা চলে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। নির্জন সমুদ্রতীরটা একেবারে থমথম করছে। সেই অন্ধকারে এই বিজাতীয় লোকটার দিকে চেয়ে বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছমছম করে উঠল।

লোকটা বোধহয় বুঝতে পারল। তাই বোধহয় আমার ভয় ভাঙাবার জন্যে বলল,—"চলুন বাবু, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।"

অন্ধকারটা চোখে সয়ে এসেছে। চেয়ে দেখলাম, জলিমের চোখ দুটো বেশ স্নেহ প্রবণ। কাঁচা পাকা চুল আর বড় বড় লাল দাড়ি মনে ভয় জাগায় না, ভরসাই আনে। বললাম, "চল।"

দুজনে এগিয়ে চললাম। অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে আমি প্রশ্ন করলাম, "কোথায় থাক তুমি, জলিম?"

"এই যে বাবু, ওইখানে" দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করে দেখাল জলিম।

পুরী শহরের ভেতরটা বড্ড নোংরা। কিছুদূরে যেখানে নোংরা জীর্ণ বাড়ীগুলো ছিল, সেদিকেই জলিম দেখাল। তারপর বলল, "চলুন বাবু, যাবেন আমার বাড়ীতে?" ওর কণ্ঠে আগ্রহের সুরটা ফুটে উঠেছিল, সেটা আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও শঙ্কিত করল। কি চায় লোকটা? হঠাৎ অত আলাপ জমাতে চায় কেন? মন বলে উঠল, অপরিচিত একটা লোক, তোমার সাথে ওর কিসের খাতির?"

জলিম মহম্মদ প্রথমবারের মত এবারেও একটু হাসল। আমার দ্বিধাটা বুঝেই যেন প্রশ্ন করল, "বাবুর বুঝি এখনও ভয় যায় নি?" এবার পৌরুষে আঘাত লাগল। বললাম, "নাঃ ভয় কিসের, চল।" দুজনে চলতে শুরু করলাম। নোংরা রাস্তাটা দুর্গন্ধে ভরা। নিজের অজান্তেই নাকে রুমাল চাপা দিলাম। জলিম এবার একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "বাবুর বোধহয় কষ্ট হচ্ছে।"

লোকটা দেখছি বেশ বুদ্ধিমান। অন্ধকারে আমার রুমাল চাপা দেওয়াটাও চোখে পড়েছে। নিজেকে একটু অপরাধী বলে মনে হল।

আবার জলিম বলল, অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। একদিন নাহয় দেখেই যান, গরীবেরা কেমন করে থাকে।"

আমাকে কি খুব বড়লোক মনে করেছ জলিম? মনে হল বলি, জলিম, আমি কেউকেটা কেউ নই, সওদাগরী অফিসের একজন সেকেণ্ড ক্লাস কেরানী মাত্র। নেহাত বিয়ে করিনি, তাই অভাব এসে এখনও ঘিরে ধরেনি। কলকাতার মত বস্তীপ্রধান শহরের বাসিন্দা আমি, দারিদ্রের রূপ আমার কাছে অপরিচিত নয়।

"এই যে বাবু, এই আমার বাড়ী।"

চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি সামনেই একটি ছোট বাড়ী, দরজায় সবুজ বিবর্ণ পর্দা ঝোলান।

পর্দা সরিয়ে জলিমের পেছন পেছন ভেতরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। ছোট কক্ষটায় একটা কেরোসিনের বাতি জ্বালানো। আমাদের আগমনে স্বল্পালোকিত কক্ষে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল, আমার দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আয়ত চোখে প্রশ্ন ভরে তাকাল জলিমের দিকে।

অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি নয়, কিন্তু সেই স্বল্পালোকিত কক্ষে আলো-

আঁধারীর মধ্যে ওকে উপন্যাসের রহস্যময়ী নায়িকার মতই লাগছিল। তাই হয়ত জলিমের পরিচয় দেওয়ার পর মেয়েটি যখন হাত জোড় করে বললে, "নমস্তে বাবুজী," বুকের ভেতরটা হঠাৎ শিরশিরিয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরটা অদ্ভুত সুন্দর আর মার্জিত।

কিছুক্ষণ সম্মোহিতের মত বসে রইলাম। জলিমের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল, "বাবুজী সংসারে এই একটি মেয়ে, মমতাজ ছাড়া আমার আর কেউ নেই! চার বছরের মেয়েকে রেখে ওর আম্মা ওকে ছেড়ে চলে গেছে।" একটা বিষণ্ণ সুরে ঘরটা ভরে গেল। চমক ভাঙল আমার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "একটু জল দিতে পারো জলিম?"

"আমি আনছি বাবুজী।" দ্রুতপদে ভেতরে চলে গেল মমতাজ।

ঘরটা ছোট, একপাশে পুরোন একটা চৌকীতে জীর্ণ বিছানা। একটা রঙ্-ওঠা টেবিলের ওপরে দুটো পুরোন ফুলদানি। দেয়ালে ঝুলছে একটা ক্যালেণ্ডার, খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি। আর একদিকে বোধহয় জলিমেরই যৌবনের একটা ফটো।

জল খাবার পর ঘণ্টাখানেক বোধ হয় ছিলাম। তারপর চলে গিয়েছিলাম আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

আর বোধহয় সাতদিন পুরীতে ছিলাম। তার মধ্যে তিন-চারদিন ওদের বাড়ী গিয়েছি। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আমায় নিয়ে গেছে। দিনের আলোয় দেখেছি মমতাজকে। রাত্রে যাকে অপরূপা মনে হয়েছিল, দিনের আলোয় তাকে ভারী মিষ্টি ভারী ভালোলেগেছে।

আয়ত চোখ দুটোয় একটা নিঃসঙ্কোচ প্রশান্তি। ঘন কালো চুলের দীর্ঘ বেণী জড়িয়ে একটা পুরোন চুমকী ওঠা নীলচে ওড়না। শুভ্র কপালটা অজস্র কালো চুলে ঘেরা, নরম ওষ্ঠাধরে কোমলতার সঙ্গে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা।

মমতাজ আমাকে কোনদিন অসংযত হতে দেয়নি। ওর শান্ত কালো চোখের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি আমার সব আবেগ দমন করিয়েছে।

আজ কত বছর হয়ে গেল। অনেক কথাই ভুলে গেছি। মনে পড়ছে কেবল শেষ দিনের কথাটা।

বিদায় নেওয়ার সময় গেলাম ওদের বাড়ী। সকাল বেলা। আমি জানতাম জলিম বাড়ী নেই, ফল বেচতে বাজারে চলে গেছে এতক্ষণে।

সেজন্যই কি আমার অবচেতন মন আমায় ওদের বাড়ী যেতে প্রেরণা দিয়েছিল? কে জানে!

ছোট্ট একফালি বারান্দায় মমতাজ রান্না করছিল। আমার পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকাল। আগুনের তাপে ইষৎ আরক্ত হয়ে উঠেছে ওর মুখ, নাকের ওপর, ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মুগ্ধ হয়ে আমি তাকালাম। মমতাজ চোখ নামাল। দীর্ঘ চক্ষের রাশ আরক্ত গালে ছায়া ফেলল। মৃদু কণ্ঠে আমি বললাম, "আমি যাচ্ছি মমতাজ।"

চমকে ও তাকাল—বলল, "খাবেন না আজ?" এর আগে একদিন ওদের বাড়ীতে খেয়েছিলাম। আজও খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ভুলে গেছি সে কথা। অনুতপ্ত স্বরে বললাম, "টিকিট যে কাটা হয়ে গেছে!"

"তবে থাক," চোখ নামাল মমতাজ।

ওর বিষণ্ণ স্বরটা ব্যথার ছোঁয়াচ জাগাল। ওর একটা হাত চেপে ধরে মৃদুকণ্ঠে ফিসফিস করে বললাম, "মমতাজ!"

"বাবুজী!" চোখ তুলল ও। দেখলাম আয়ত চোখদুটো জলে ভরে এসেছে। ওড়নার প্রান্ত দিয়ে মুছে বলল, "আবার আসবেন তো বাবুজী?

"হ্যাঁ মমতাজ আসব।"

"কথা দিলেন তো?"

"হ্যাঁ।"

চলে এলাম। কিন্তু কথা রাখা হল না। পুরী শহরের সেই অদ্ভুত মনের অবস্থাটায় যেটাকে সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, কলকাতায় ফিরে সেটাকেই অবাস্তব ও হাস্যকর ঠেকল। কে মমতাজ? মুসলমান একটা অশিক্ষিত মেয়ে, আমার জীবনে কতটুকু স্থান ওর? স্বাভাবিক ভাবেই ভুলে গেলাম ওর কথা।

তারপর কেটে গেল পাঁচটা বছর। পাঁচ বছর পরে গেলাম পুরীতে। সস্ত্রীক, ছোট শালীর খুব অসুখ, মরনাপন্ন অবস্থা। ছয়দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর একটু সুস্থ হয়ে উঠল ও। তিন চারদিন পর রোগমুক্তির আনন্দে শালী-শালা পরিবৃত হয়ে বেড়াতে গেলাম সমুদ্রের তীরে। সন্ধ্যের সময় ফিরবার উদ্যোগ করছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, কিছুটা দূরে বসে আছে একটা ফকীর। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে চমকে উঠলাম। কোথায় যেন দেখেছি এমুখ! সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই ও-ও তাকাল। এক

মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পরক্ষণেই শ্রান্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনলাম, "বাবুসাহেব?"

"কে?"

"চিনতে পারলেন না বাবুসাহেব? আমি জলিম।"

জলিম! মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সেই দুটো সপ্তাহের স্মৃতি। ফকিরের দিকে একবার তাকালাম কুঞ্চিত রেখাঙ্কিত মুখ, জ্যোতিহীন চোখ। সাদা দাড়ি আর সাদা চুলে মুখ ঢাকা। বিস্মিত স্বরে বললাম, কিন্তু তুমি—এখানে এমন অবস্থায় কেন?" না, কান্না নয়—বড় করুণ একটা হাসি ফুটে উঠল জলিমের মুখে। "বাবুসাহেব, আমার মমতাজ আর নেই। দুবছর আগে চিরদিনের মত আল্লার কাছে চলে গেছে। যাবার আগে অনেকবার আপনার নাম ও করেছিল। আর কি জন্যে সংসারে থাকব? তাই আল্লাকে সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছি।" কোঠরাগত চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল বৃদ্ধ জলিম মহম্মদের।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল আয়ত দুটো কাল চোখ। অদ্ভুত একটা কণ্ঠস্বর যেন প্রতিধ্বনিত হল বুকের ভেতরে, "আবার আসবেন তো বাবুজী? কথা দিলেন?"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে চলে এলাম।

বড় শালা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল "লোকটা কে?"

বললাম, পাঁচ বছর আগে পুরীতে আলাপ হয়েছিল।"

মেজশালী জিজ্ঞেস করল, "মমতাজ কে?"

কি মনে হল, বললাম, "জলিমের বৌ, আমাকে ছেলের মত দেখত।" একটুও কাঁপল না গলাটা।

স্ত্রীর মুখ দিয়ে সহানুভূতি সূচক শব্দ বেরোল, "আহা! বুড়োটাকে দেখলে কষ্ট হয়।" তিন দিন পর ফিরে এলাম কলকাতায়।"

চুপ করলেন হিমাংশুদা। সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ। মিনিট খানেক পরে বিজয় বলল "how tragic a back ground you have!

সত্যি হিমাংশুদা আপনাকে দেখে কিন্তু এ বোঝার উপায় নেই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হেসে উঠলেন হিমাংশুদা, "তোমরা কি গল্পটাকে সত্যি বলে মনে করলে নাকি?

This is nothing but a Story—আমার এক বন্ধুর মুখ থেকে শোনা। তোমাদের বিশ্বাস করার শক্তি দেখছি সত্যিই প্রশংসনীয়। আচ্ছা—অনেক রাত হোল—এবার যাওয়া যাক"—উঠে দাঁড়ালেন হিমাংশুদা।

আরতি সেন

প্রেম

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে প্রেম শব্দটার নানা ব্যাখ্যা নানা মুনি করে গেছেন। এখনও বেশীর ভাগ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রম্য রচনার প্রাণ ভোমরা প্রেম।

প্রেম কী বরনীয়? প্রেম কী রমনীয়? প্রেম কী সেই রক্তমুখী নীলা যার প্রভাবে কেউ রাজা হয় আর কেউ বা ফকির?

সেদিন মেঘলা দুপুরে গত রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে চোখ আবার সেই 'প্রেম' রম্য রচনায় এসে ঠেকল। কিন্তু মনোযোগ দেবার আগেই দরজায় কড়া নড়ে উঠল। এমন অসময়ে কে এল ভাবতে ভাবতে উঠে দরজা খুললাম। আমার 'মাহাড়ি' (উত্তর প্রদেশের অনেক জায়গায় ঝিকে 'মাহাড়ি' বলে) রামেশ্বরীর মা হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠল। আমি ব্যস্ত হয়ে জিগেস করলাম—"ক্যা হুয়া, কিঁউ রো রহী হো?" সে কেঁদে কেঁদে থেমে থেমে নিজের ভাষায় যা বল্ল তার সারাংশ হল—তার ছোট মেয়ে যমনিয়াকে তার স্বামী আবার মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ব্যাটা এমন পাজী যে এবারও বাচ্ছাটাকে দেয়নি।

আবার ডুকরে ওঠে রামেশ্বরীর মা—"অব বহুজী ক্যা করুঁ? যমনিয়া হমারী তবসে ছাতি পিট পিটকে রো রহী হৈ। অব তো একটুকরা চাঁদী ভী নেহী হৈ। তুম হমে পাঁচঠো রুপেয়া দে দো জী, নেহী তো যমনিয়া হমারী রো রোকে মর জায়েগী।"

যমনিয়াদের সম্প্রদায়ে এধরণের মারপিঠ বা এ ওর স্বামীর সাথে ঘর করে কিংবা পালিয়ে যায়—এ যেন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যদিও দু-চারদিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সময়ে আপনি আবার শান্ত হয়। কিন্তু যমনিয়াদের ব্যাপারটা অন্য ধরণের। ওর স্বামী অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত নয় কিন্তু যমনিয়াকে কাছে পেলেই তাকে উৎপীড়নে

অতিষ্ঠ করে তোলে। আজ ক'বছর হল দেখছি মাঝে মাঝে প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত করে তোলে।

ইদানীং নতুন চাল চালছে, বাচ্চা ছেলেটাকে আটকে রেখে যমনিয়াকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। যমনিয়া যখন নিজের হাঁসুলী বা মায়ের মল বাঁধা দিয়ে তাকে কিছু টাকা দেয় তখন উদার চিত্তে বলে—"অব লে যা তেরে বচ্চে।" কষ্টে সংগৃহীত ঐ টাকাগুলোর সদ্গতি হয় কোন তাড়িখানায়।

যমনিয়া কিছুদিন মায়ের কাছে থাকে, গায়ের ব্যথা কমলে আবার হাতে পায়ে মেহেদী রং লাগিয়ে একমুখ পান খেয়ে ছেলে কোলে স্বামীর ঘরে যায়। প্রথম প্রথম ওর মত সুশ্রী, অল্পবয়সী মেয়েকে কষ্ট পেতে দেখে দুঃখ হত। একদিন বলেও ছিলাম—"ও আবার স্বামীর ঘরে যায় কেন? ও তো তোমার সাথে খেটে খেতে পারে কিংবা ছাড়ান নিয়ে অন্য কাউকে বিয়েও করতে পারে। আমার বুড়ি মাহাড়ি ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলেছিল—নেহী, বহুজী—ইন দোনোমে ছুটপনসে হী মহব্বত হৈ।"

হরি হে, দীনবন্ধু! এই কী ছুটপনের মহব্বতের নমুনা। বুড়ীকে প্রশ্ন করে জানলাম ওরা ছুটিতে ছোট বেলায় দেবদাস-পার্বতী ছিল। পরিণতিটা বিয়োগান্ত না হয়ে মিলনান্ত হয়েছে। কিন্তু শাদীর কিছুদিন পর—গাওনার (দ্বিরাগমনের মত, সাধারণত মেয়ে একটু বড় হলে এটা হয়) পর থেকেই এই দেবদাসটি প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে আর যমনিয়া মার খেয়েও ফিরে ফিরে ওরই কাছে যায়। এই যে রাগ অনুরাগ মিশ্রিত বিচিত্র মনোভাব এই কী প্রেম?

ফিচার

নীলনিমেষ

চোখের আলোয় দেখেছিলাম

—"কোন্ শুভক্ষণে যে তোমাদের দেখা হয়েছিল জানিনে বাপু!"

এই বলে রাণুবৌদি জয়ন্তীর দিকে তাকালেন। আমরাও সবাই তাকালাম কিন্তু তাতেও জয়ন্তীর সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই গম্ভীর ভাব। কোন কথা নয়; শুধু আনমনে বসে একটার পর একটা তাস হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখছে। মাঝে মাঝে রাণুবৌদি ও সুব্রতদা ওর গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গাবার জন্য চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু কোন ফল হলো না। ট্রেন ছুটে চলেছে পুরীর দিকে। আমরা চারজন। আমি সুব্রতদা, রাণুবৌদি আর জয়ন্তী, যাচ্ছিলাম অবকাশের আনন্দ উপভোগ করতে। আমি বললাম—

—সত্যিই ও যদি চিরিতন না ফেলত তবে আমাদের এরকম হারতে হতনা।

—আচ্ছা ঠিক আছে আর একদান খেলা যাক্। সুব্রতদা বলে উঠলেন।

—"ঠিক আছে হোক।" রাণুবৌদি তাস সাফল করতে সুরু করলেন।

—কিন্তু আমি ওর সঙ্গে খেলব না, পাটনারশিপ পাল্টাতে হবে। এতক্ষণে জয়ন্তীর মুখে কথা ফুটল। আমি বললাম, জানেন বৌদি, আমার আবার জয়ন্তী না হলে হয় না। আমাদের পাটনারশিপটা ম্যাচিউড।

—মোটেই না, কখনই না, তাহলে আমি আর খেলবনা…জয়ন্তী আরও রেগে গেল।

—তবে খেলা থাক্ তোমরা দুজনে ঝগড়া কর।

বলেই সুব্রতদা বাঙ্কের উপর ঘুমোতে গেলেন।

না ঠিক ঝগড়া নয়। ঐ নামে অন্য কিছু। জয়ন্তী আমার কথা শুনতে পারে না, আমার ছায়াও দেখতে পারে না! অথচ জয়ন্তীকে না হলে আমার এক মুহূর্ত্তও চলে না। এহেন অবস্থায়ই আমাদের সব জায়গায় যেতে হয়। জয়ন্তী মানে রানু বৌদির একমাত্র ছোটবোন। লাল ব্লাউজের সঙ্গে

হলুদ রংএর শাড়ী পরিহিত। ফিলজফি পড়া জয়ন্তীকে প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলেছিলাম। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সুব্রতদাদের বাড়ীর ছাদে শ্রাবণের বর্ষণমুখর কোন এক সন্ধ্যায়। গোল টেবিলের চারপাশে আমরা বসে। রাণু বৌদি সাজতে পারেন ভাল। খোঁপায় পরেছিলেন বেলফুলের মালা। জয়ন্তীর শাড়ী থেকে সেণ্টের গন্ধ ভিজে বাতাসের সঙ্গে মিশে মাতাল করেছিল পরিবেশটিকে। রাণুবৌদি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"জানিস, উনি কাগজে লেখেন, রেডিওতে বলেন, য়ুনুভার্সিটির নামকরা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ইত্যাদি।" আমি সলজ্জ হাসি হেসে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলেছিলাম, "সাহিত্য আমার ভাল লাগে, সাহিত্যের আমি ছাত্র—আর কিছু নয়।" তারপর সেই শ্রাবণ সন্ধ্যায় নিভৃত ছাদে সমান বয়সী দুটি যুবক যুবতীকে একা রেখে বৌদি চলে গেলেন নীচে !

—অনু ঠাকুরপো, তোমরা গল্পকর—অমি একটু আসছি।

—আপনার কোন্ সাবজেক্ট ছিল ? আমি বললাম।

—ফালোজফি। পরিস্কার ইংরেজী উচ্চারণ করে জয়ন্তী বলে উঠলো।

—বি, এতে ?

—হিষ্ট্রি ইকনমিক্স ফালোসফি।

—আমার মনে হয় আপনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়লেই ভাল করতেন। আপনার চেহারাটা ঠিক যেন রবি ঠাকুরের মানসী কাব্য গ্রন্থের ধাঁচে গড়া।

—মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। ওসব সাহিত্য ফাহিত্য আমার আসে না... তাছাড়া—

—তাছাড়া কি বলুন ?

—বাংলা সাহিত্য পড়ে কি সোস্যাল রেসপেক্ট পাওয়া যায় ?

—বলেন কি ? শ্রীকুমারবাবু, আশু ভট্টাচার্য, নারায়ন গাঙ্গুলী, বিষ্ণু দে, বিজন ভট্টাচার্য,সাধন ভট্টাচার্য এরা কি অশ্রদ্ধেয় :

—এদের হয়ত বাংলাদেশ জানে কিন্তু সারা ভারতে:কেও জানে না, অথচ—

—অথচ দার্শনিকদের পৃথিবী জুড়ে খ্যাতি আছে তাই না ?

—একস্যাক্টলি।

—আমি কিন্তু উল্টোটা শুনেছি ?

—কেমন ?

—দার্শনিকদের নাকি রাতে ঘুম হয় না—মস্তিষ্ক বিকৃতি অনিবার্য। অর্থাৎ শেষ বয়সে রাঁচি যেতেই হয়।

—ননসেন্স!

—এই রে আপনি যে ভীষণ রেগে যাচ্ছেন ?

মেয়েদের চটাতে আমার খুব ভাল লাগে, তাই ভেবেছিলুম আর একটু চটাবো জয়ন্তীকে—কিন্তু হলো না। রাণুবৌদি কফির ট্রে আর গরম পাপর ভাজা নিয়ে ছাদে এলেন।

—তোমরা এখন কোন্ স্টেজে ? আমি উত্তর দিলাম,

—গৌরচন্দ্রিকাতে।

—বেশ। তারপর জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

—নে, অন্তু ঠাকুরপোকে ঢেলে দে, আমি একটু টেলিফোনটা এটেণ্ড করে আসছি। রানুবৌদি চলে যাবার পর কফির পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে বললাম—

—জানেন কফি, যতই তেতোই হোক না কেন, কাঁকন পরা হাতের স্পর্শ পেয়ে তা যেন অমৃত হয়ে ওঠে।

—চিনি চাইলেই তো পারতেন, হেঁয়ালী করছেন কেন। বাংলা সাহিত্য পড়া ছেলেগুলোই যেন কেমন ন্যাকা ন্যাকা....রাবিশ্।

—আর ফ্যালোসফি পড়া মেয়েরা কেমন জানেন ? ভীষণ ওভার স্মার্ট। এই ধরুন পেটে খিদে, তবু খাবে না। সব সময় কৃত্রিমতার আবরণ দিয়ে সহজ সরল সুন্দর রূপকে আরও অপরূপ করার ব্যর্থ প্রয়াসে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় চর্চ্চা করেন।

—প্লীজ, একটু থামবেন ? অবশেষে থামতেই হলো। একদিকে আকাশে তখন সন্ধ্যারাগের প্রস্তুতি অন্যদিকে শ্রাবণের ধারার আবির্ভাব। পরের ঘটনাগুলো আরও সুন্দর।

বাড়ী ফিরে সুব্রতদা বললেন অফিসের কাজে একবার শান্তি নিকেতনে যেতে হবে—রানুবৌদি বললেন, আমরাও যাবো। জয়ন্তী গম্ভীর গলায় বললো উনি গেলে আমি যাবো না। আমি বললুম জয়ন্তীদেবী না গেলে ট্যুরটাই ড্রাই হয়ে যাবে। শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হলো আমরা চারজনই যাবো।

কিন্তু এবার বাধা। আবার জীপ গাড়ীতে বসা নিয়ে। আমি বললুম, সুব্রতদা যখন ড্রাইভ করছেন তখন রাণুবৌদিরই পাশে বসা উচিত। পেছনে না হয় আমরা দুজনে বসবো। জয়ন্তী শুনে রেগে ফেটে পড়ল— ইম্‌পসিবল, এমন একটা উটকো গেঁয়োর সঙ্গে পাশাপাশি বসা যায় না। 'আমি তাহলে যাচ্ছি না।' মনে আছে সে যাত্রায় সুব্রতদার হস্তক্ষেপের ফলেই শান্তিনিকেতন যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। পেছনের সিটে আমি আর রাণুবৌদি বসে শান্তিনিকেতনের অতীত স্মৃতির চর্চ্চা করছিলুম। রাণু বৌদি বলছিলেন সমাবর্ত্তনে ডিগ্রী নেবার সময় নেহরুজী মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। উত্তরে আমি আচার্য নন্দলালের অটোগ্রাফ লাভের ইতিহাস বললুম। সুব্রতদা গাড়ী চালাচ্ছিলেন জি টি রোড ধরে। কালো চশমা পরিহিত জয়ন্তী পাশের সিটে গম্ভীর হয়ে বসে ইংরেজী ম্যাগা-জিনের ছবি দেখছিল। আর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এসে ওর স্যাম্পু করা চুলগুলিকে এলোমেলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

—কি রে তোরা কি চুপচাপ বসেই থাকবি। সুব্রতদা ব্যঙ্ক থেকে আওয়াজ দিলেন। পরিবেশ পরিবর্তনে রাণুবৌদির জুটি পাওয়া খুব ভার। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—

—আচ্ছা অনু ঠাকুরপো—রোহিণী—বিনোদিনী—অচলা—লাবণ্য—এদের মধ্যে কাকে তোমার ভাল লাগে?

—রোহিণী আর বিনোদিনী যেন একই চরিত্রের। ওদের জন্য দুঃখ হয়। আমাদের সহানুভূতি পাবার যোগ্য—অচলাকে আমি মোটেই সইতে পারি না....চঞ্চলতার জন্য দুটি পুরুষ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—লাবণ্যকেই আমার সব চাইতে ভাল লাগে—ফিলজফি পড়া মেয়েরা ভীষণ চাপা... দেখুন না অমিত রায়কে ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। লাবণ্য সত্যিই ভীষণ হিসেবী। ওরা যেন...ওরা যেন....

জয়ন্তীর দৃষ্টিতে যেন কোথায় একটু পরিবর্ত্তন হলো। বাইরে জানালা দিয়ে উদাস অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকালো। মুখে তবু কোন কথা নেই। শুধু স্থির দৃষ্টির সামনে রয়েছে দুপাশের ছুটে চলা গ্রামগুলি।

আমি বললুম—বৌদি একটা গান শোনান না—আপনি তো সুন্দর গান জানেন। বেশ জমবে। বাইরে দেখছেন চাঁদ গলা জ্যোৎস্না! রাণুবৌদি সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, "এক সর্তে গাইতে পারি...সবাইকেই গাইতে

হবে।" রাণুবৌদির দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বলে উঠলো—ওসব রোমান্টিক ননসেন্স আমার ভাল লাগে না ছোড়দি। গাইতে হয় তোমরা গাও। আমি সবিনয়ে বললুম, আপনার কি ভাল লাগে? বোম্বাই মার্কা হিন্দি ছবি? শর্মিলা ঠাকুরের ইভনিং ইন প্যারিস ড্রেস? ফিল্ম জার্ণাল? রাণুবৌদি আমায় থামিয়ে বলে উঠলো—এই নাও এদের আবার ঝগড়া শুরু হলো। চলন্ত ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে আমার পিঠের ওপর বা হাত দিয়ে তাল দিতে দিতে রাণুবৌদি শুরু করলেন—জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে—বসন্তেরই মাতাল সমীরণে...।" আমি তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম। সত্যিই ভাল লাগে রাণু বৌদিকে। পড়াশুনোয়—গানে—নাচে—রান্নায় ব্যবহারে কথায় এমন বৌদি জীবনে আর কখনও দেখিনি। গান শেষ করে বল্লেন, কই অনু ঠাকুরপোর এবারে পালা। মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন, নাও শুরু করো।

ঘুম ঘুম চোখে জয়ন্তী হাই তুলে বললো, তাহলেই হয়েছে, বাংলার ছাত্রদের আবার ওবিদ্যাও আছে! আমি বললুম, "ফরমাস কিজিয়ে মেমসাব।" জয়ন্তী মুখ ভেংচিয়ে বলে উঠলো, আমার বয়ে গেছে অমন হাঁড়ি গলার গান শুনতে। সুব্রতদার ওয়াটার বটল থেকে একটু জল নিয়ে গলাটা ভিজিয়ে মোটা গলায় শুরু করলাম।

"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে
ফুল ফুটানোর খেলায় কেন ফুল ঝরানোর ছল
ও তুই কী এনেছিস বল...।"

জীবনে আর কোনদিন এত দরদ দিয়ে রবি ঠাকুরের গান গাইনি। দেখলুম সুব্রতদা পা দিয়ে তাল দিচ্ছেন, রাণুবৌদি সোজা হয়ে উঠে বসলেন। অন্য সীটের যাত্রীরাও এদিকে মনোযোগ দিলেন। জয়ন্তী যেন কখন্ সকলের অজান্তেই মাথাটা আমার বা কাঁধের উপর রেখে দিয়েছে। কেউ সেদিকে লক্ষ্য করেন নি। ট্রেন তখনও চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে ঝাড়গ্রামের প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

সে সব সূর্যাস্তে দেখি

এত দূরে আছ তুমি
তবু আছ কাছে দ্বিধাহীন।

যখন সূর্যাস্ত হয়
ছাতিমের প্রশস্ত পশ্চিমে
মুছে ফেলে দক্ষ কেউ
আকাশের পিঠ থেকে
দিনের আলোর কারুকাজ—

সে সব সূর্যাস্তে দেখি
অন্য এক পটীয়ান শব্দহীন হাত
একে একে গৃহস্থের বন্ধদ্বার চোরা কুঠুরির
তালাগুলি অনায়াসে খুলে দেয় রোজ
সূর্যাস্তে স্তম্ভিত চরাচরে।

স্পষ্ট দেখি সে সময়ে তুমি খুব কাছে
ফুটে আছ স্থির সর্বাঙ্গীন।

নির্মলেন্দু গৌতম

ভাসতে ভাসতে

গল্প বলতে বলতে যখন ক্লান্ত হলো নদী,
পাটাতনের শীতলতায় শরীর রেখে একা,
ভাসতে ভাসতে কখন আলোর সমুদ্র অবধি
হাসতে হাসতে পৌছে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখি
জলের ভেতর সমস্ত ডুবে সোনালী রঙ মাছ :
অমনি নিটোল শরীরে তার চিরকালের রোদ
ঠিক্‌রে ওঠে রূপোর মতো, নদী তখন ফুলে
মহাসাগর হয়ে হঠাৎ একান্ত নির্বোধ !

আমি কেবল ভাসতে ভাসতে একা একাই হাসি !
নদীকে ফের ফিরতে বলা একান্ত অভদ্রতা।
কাজে কাজেই বুকের মধ্যে ঘুমন্ত যে বাঁশী
তাকেই হঠাৎ বাজিয়ে বলি, 'এইখানে আজ খেলা !'

শিলাদিত্য ভট্টাচার্য্য

স্বপ্ন

স্বপ্ন একটা অনভিপ্রেত কিছু,
কারণ, আমি তোমার স্বপ্ন দেখিনা।
তুমি বাস্তব।
এই তোমাকে আমি ছুলাম,
তুমি আকাশের
রঙীন ফানুস নও,
বাতাস কিংবা ধূমো ;
তোমাকে আমি ছুঁতে পারি,
তুমি বাস্তব।
বাস্তবের স্বপ্ন মানুষ দেখে না,
তা কোমল, কঠিন, ক্রুর কিংবা শক্ত।
চোখে দেখি।
আকাশের স্বপ্ন তুমি দেখো,
কিন্তু পথের স্বপ্ন কেউ দেখে না।

অলক কুমার চৌধুরী

স্মৃতির চাবুক

রাত্রির যৌবনে—

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বাঁশবন মটমট

আঙুল মটকায় গাছের পাতা ঘন ঘন কড়ি

চালে খেলা কার সাথে

কে জানে ! সপাৎ স্মৃতির চাবুক সে মুখ

চিবুক সে বুক

নির্জন নীল-চিঠি-ছেঁড়া

হাওয়ায় ওড়া

দামাল বাতাস আকুল ব্যাকুল

কালো চুল হাওয়ায় ওড়ে

একগোছা ভুল

শীতার্ত হৃদয় ফেটে চৌচির রক্তাক্ত

মুখ বুক চুল

চিবুক থিরমূরতি

চোখে রাখতে রাখতে

নির্জন নীল-চিঠি-ছেঁড়া হাওয়ায় ওড়া

রাত্রির যৌবনে

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া

স্মৃতির চাবুক ॥

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কোন্‌টি সম্মুখ ?

আমাদের সমস্ত যাত্রা তো সম্মুখের দিকে
গতি বলতে শুধু অগ্রসর হওয়া—
অথচ কোনটি সম্মুখ আমরা জানি না, মুখ ঘোরালে
সম্মুখের সংজ্ঞা বদলে যায় !

তাই এক-একসময় ইচ্ছে করে
ছুটে যাই পিছনের দিকে, অর্থাৎ
যে দিকে ছোটা যায় না—
মৃত্যু থেকে বাসগৃহে
ফিরে আসি, বাসগৃহ থেকে মাতৃগর্ভ,
গভীর রাতে গোপনে এক শতাব্দী পার হয়ে জেনে আসি
সাত বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কী পরামর্শ করছে ডাকহরকরার সঙ্গে ।

তাপস ব্যানার্জী

শেষ পত্র

হৃদয় দিয়ে শেষ কথা শোন--
স্মৃতির যা কিছু ঝুল জমে আছে মনে
ভস্ম শেষের সাথে ঘোলা গঙ্গাজলে
আমার জীবনের কি মূল্য তুমি পাবে ?
হামাগুড়ি দাও যদি জীবন ইতিহাসে ।
অনড় আমার ঘর বোবা, বেইমান হয়ে আছে বোঝা,
সর্পিল মনের গতি নেই ঠিকানা তাহার ।—

একান্ত মিনতি সমীপে তোমার
মৃত্যুসাথে মুছে ফেল মোর স্মৃতি ভার
পঙ্কিল বেদনাময় বিবস্ত্র জীবন
রমণীয় হতে পারে অসম্পূর্ণ মন ।

আলোচনা

সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা—একটি পত্র

স্নেহাস্পদেষু

তোমাদের মনোজ্ঞ চিঠিখানি ঠিক সময়েই পেয়েছি। আমি ৪ দিনের জন্য বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে বাইরে গিয়েছিলাম। সেখানে অধিবেশন ভালই হয়েছে!

তোমাদের পত্রে যে প্রশ্নগুলি তুলেছ তার উত্তর আমি প্রবন্ধটীর মধ্যে সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করেছি। তোমরা কি মন দিয়ে বিবর পড়েছো? যৌন সাহিত্যে অবশ্যই ব্যাভিচার থাকতে পারে—কিন্তু তার উদ্দেশ্য সমাজের ঐ কুৎসিত কদর্য দিকটাকে জনপ্রিয় করবার জন্য নয়,—তার ফলে সমাজে কিরূপ ক্ষতি হয়; স্বাস্থ্য সুখ ও শান্তি হানি হয়—জাতির ভবিষ্যৎ অধঃপতিত হয় তাই দেখবার জন্য। মানুষের ভাষায় কটূক্তি প্রয়োগের যদি কোন লক্ষ্যস্থল থাকে, তবে তা 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'বুনো ওল' প্রভৃতির লেখা ও লেখকের প্রতিই হওয়া উচিত।

এগুলি Criticism of life নহে! ইহারা নিছক pornography সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা অনেক সময় সূক্ষ্ম বিচারের বিষয়—অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভাগে পড়ে। এগুলি তা নয়। এগুলি যৌন ব্যাভিচার বা adulliry নামক Sexual crimeকে সমাজ কলেবরে সংক্রামিত করে দেশে সুস্থ বীর্যবান বলিষ্ঠ সন্তান লাভের পথ প্রশস্ত না করে—জারজ সন্তান উৎপাদনের দ্বারা দেশকে জাতিকে নিবীর্য লুব্ধ দেহ চরিত্রহীন ঘৃণ্য পশুবৎ করে তোলে। পুরুষ পৌরুষ লাভ করে সিংহবৎ না হয়ে—ছাগবৎ যৌন পশুতে পরিণত হয়। সৃষ্টির সত্য দেখাতে যদি drain inspectors report লিখতে হয়—তাহলে তাকে সেই সঙ্গে পঙ্কোদ্ধারের পথ নির্দেশ করতেই হবে....না হলে সাহিত্য হবে না।

তোমাদের যেগুলি সার্থক প্রশ্ন তার উত্তরের জন্য তোমরা রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম বইটী পোড়ো। মানুষের জন্যই সাহিত্য। 'ভাব হতে রূপে—তার অবিরাম যাওয়া আসা,—তার প্রয়োজন সুখ শান্তি ওআনন্দপ্রদ– রসসৃষ্টি করা। অমৃত পাক করা—বিষ পরিবেশন করা নহে। শুভার্থী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
লেক টাউন, কলি-৫৫

পাঠকের কলম

পাঠকের নিজস্ব মতামত

সবিনয় নিবেদন,

ছন্দিতার বৈশাখ সংখ্যা (১৩৭৫) নির্দ্ধারিত মাসের পরে পেলাম। দীর্ঘ দু'বছর ধরে আমি ছন্দিতার গ্রাহিকা। ইদানীং ছন্দিতায় যে সব লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা সত্যিই উচ্চমানের। আশা করব লেখার মান নির্ণয়ে আরো একটু দৃষ্টি দিলে প্রথম শ্রেণীর লেখাই আপনারা প্রকাশ করতে পারবেন। এই বিষয়ে স্মরণ করি যে, নতুন লেখক লেখিকাদের লেখা অবশ্যই প্রকাশ করবেন, কিন্তু তার জন্য তাঁদের জলো লেখা প্রকাশ করে পত্রিকার মানকে নীচে নামাবেন না।

গত সংখ্যার কয়েকটি লেখার উপর মন্তব্য রাখব—আমার বিচার বিবেচনার মাপকাঠিতে। মূল রুমানিয়ান থেকে অমিতা রায়ের অনুবাদ 'একদিন জলপথে' ভাল লাগল। আরো অনুবাদ গল্প চাই। মানস সেনগুপ্তর 'ইতিহাসের ওপার থেকে' যতটা প্রাণবন্ত হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। মোটামুটি-ভাবে বলতে গেলে গল্পগুলো ভাল লাগল।

গত সংখ্যার জনৈক পত্র লেখকের একটি লাইন উদ্ধৃত করে আমিও বলব, 'আরও বেশী ভাল প্রবন্ধ প্রতি সংখ্যাতেই থাকা উচিত।' যদিও এ সংখ্যার গর্কির উপর লেখা প্রবন্ধ দু'টি এবং বেলা দে-র প্রবন্ধটি পাঠকের মন জয় করে। কবিতাগুচ্ছের কয়েকটি কবিতা ভাল লাগল। এদের মধ্যে কবিরুল ইসলাম, শংকর দে এবং কালীপদ কোঙার-এর কবিতা ছন্দিতার পাতা থেকে আরো পড়তে চাই।

বাংলাদেশের অজস্র পত্র পত্রিকার ভীড়ে ছন্দিতা নিজের আসনটি গুছিয়ে নিতে যে ব্যস্ত—তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে বিজ্ঞাপন প্রয়োজন তা থেকে এখন আপনারা বঞ্চিত কেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নমস্কারান্তে

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতাপ আদিত্য রোড, কলিকাতা—২৬

পুস্তক-সমালোচনা

আমরাও স্বপ্ন দেখি: যতীন্দ্রনাথ পাল, অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী, অমিতা রায়, অনূদিত।
প্রকাশক: প্রফুল্ল বসু, ২৪এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলি ৬। মূল্য—দুই টাকা।

আন্তর্জাতিক কবিতা পাঠের জন্য আমাদের কবিমনকে অতৃপ্ত হয়ে যখন দেশী কবিতার বাসরেই আনাগোনা করতে হচ্ছে ঠিক তখনই রুমানিয়া কবিতা গুচ্ছের এই অনুবাদ সংকলনটি প্রকাশ করে অনুবাদকগণ আমাদের প্রীতিসিক্ত ধন্যবাদহ্য হয়েছেন। প্রতিটি কবিতাই অতি উচ্চাঙ্গের অনূদিত। কবিতাগুলির মধ্যে আজকের রুমানিয়ার শুধুমাত্র জীবনযাত্রার সর্ব্বাঙ্গীন ছবিই প্রতিফলিত হয়নি—অতি আধুনিক যুগের তরুণ কবিদের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

জানতে পারলুম আন্তর্জাতিক কবিতাবাসরে এই কবিতাগুলি অতি উঁচুমানের এবং যে কোন দেশের কবিতার মানের সঙ্গে সমান আসনে মর্য্যাদা পাবার সঙ্গত দাবী রাখে। কবিতাগুলির অনুবাদ হুবহু না হলেও মূল সুরটি অতি নৈপুণ্যের সাথে ধ্বনিত হয়েছে—তাই অনুবাদকদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতাকে সুচিন্তিত করেছে—তার মধ্যে বেদনা যদি থাকে, তারও মূল গভীরে। রুমানিয়ান কবিতার দিগন্ত আজ প্রাঙ্গণের সেই চেরী শাখার স্তবক থেকে প্রসারিত হয়েছে মহাকাশের সুবিস্তৃত কক্ষপথ পর্যন্ত। আর এই সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে ওদের সুন্দর সহজ সরল মনের স্বাভাবিক অভি-ব্যক্তির স্বচ্ছ প্রকাশের জন্য। তাই বোধ হয় ভাল লাগলো কবিতা-গুলিকে। মনোরম প্রচ্ছদপট সম্বলিত নতুন মেজাজে নতুন আঙ্গিকে সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থটি যে ভিনদেশী কবিতাপিপাসু-পাঠকের মনকে বিস্ময়ে-বিমুগ্ধ করবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। এমন একটি সুন্দর সুস্নিগ্ধ উপহারের জন্য অনুবাদকগণকে প্রাণখুলে অভিনন্দন জানাই। অ: চ:

(৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকের দপ্তরে

'দোহাই আপনাদের—এ দপ্তরটিতে তালা লাগাবেন না।' —জনৈক পাঠকের এ উক্তিটি দিয়ে আজকের আলোচনা সুরু করলুম। বুঝতে পেরেছি, দপ্তরটির উদ্দেশ্য ছন্দিতার পাঠক গোষ্ঠীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এ দপ্তরে প্রতিদিনই গল্প কবিতা আসছে। সঙ্গে প্রকাশ করার অনুনয় বিনয়। আপনাদের রচনা প্রকাশ করাই আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি।

গল্প

গ্রাম নারায়ণপুর, পোঃ বাহিরগড়, হুগলী থেকে শ্রীঅমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "অশ্রুজল" নামে একটি বড় আকারের ছোট গল্প পাঠিয়েছেন—সঙ্গে রয়েছে দীর্ঘ একটি পত্র। প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন, "জীবনের এই প্রথম গল্প লেখা...তাই হয়ত প্রচুর ভুল ভ্রান্তি হতে পারে।" আপনার গল্পটিতে ছোট গল্পের কোন লক্ষণই নেই। সেই সঙ্গে প্লটের দুর্বল পরিকল্পনা। আপনার জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশ করতে পারলে খুশীই হতুম—কিন্তু বিশ্বাস করুণ—ছোট ছন্দিতার অনেক জায়গা জুড়ে নেবে। তাতে অন্য লেখকদের প্রতি অবিচার করা হবে। ভবিষ্যতে ছোট গল্প যখন পাঠাবেন—দয়া করে ছোট করেই লিখবেন।

* * * *

বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭ থেকে শ্রীরাধানাথ রক্ষিত "মূল্যায়ণ" নামে একটি ছোট গল্প পাঠিয়েছেন। এটি একটি ব্যর্থ প্রেম পর্যায়ের গল্প। স্বাগতা হল নায়িকা। একজনের প্রকৃত ভালবাসাকে প্রত্যাখান করে অন্য আর একজনের মোটা অঙ্কের মাইনের মোহে তাকেই বিয়ে করল। তারপর যা হয়। এখানেও হল। স্বাগতার চেহারা আরও সুন্দর হলো। (বিয়ের পর সব মেয়েদেরই দেখতে সুন্দর লাগে। পূর্ব্ব প্রণয়ীর সঙ্গে সাক্ষাত হলো, ট্যাক্সীতে করে ভ্রমণ, কফি হাউসে যুগল কফি পান ইত্যাদি সবই হলো—হলো না প্রনয়ীর প্রতি ভালবাসার স্বীকৃতি দেওয়া। মোটামুটি এই হলো মূল্যায়ণ। গল্পটি রিরাইট করা যেতে পারে। স্বাগতার চরিত্রটি আরও

জীবন্ত হ'ত। যদি অতীত জীবনের কিছু স্মৃতি-সংলাপ উচ্চারিত হতো। পটভূমিকা ও পরিবেশ গল্পের অনুকূলে নয়।

* * * *

লিলুয়া, হাওড়া থেকে শ্রীস্নেহাশীষ শুকুল "ঝড়ের পরে" নামে একটি ছোট গল্পের সঙ্গে বড় একটি পত্রও পাঠিয়েছেন। সেই একই বিষয়। প্রকাশের অনুরোধ। আপনার গল্পটি বোধ হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা, তাই না?—আমাদের ছন্দিতায় তো ছোটদের বিভাগ নেই—তাই প্রকাশ করা গেল না।

শ্রীসুব্রত কাঞ্জিলালের ছোট গল্প "জানলাটা" পড়লুম। আইডিয়া নতুন সন্দেহ নেই। কিন্তু লেখক আর একটু সংযত হয়ে যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে লিখলে গল্পটি সত্যিই মানবিক গুণে পাঠকের মন জয় করতো। বহুদিনের বন্ধ জানলাটা খুলে লেখক পাশের বাড়ীতে একটি মেয়ে ও তার স্বামীর যে দৃশ্য দু'চোখে দেখলেন তাতে মন উত্তেজিত হবারই কথা। যাই হোক, জায়গায় জায়গায় নারীদেহ উপভোগের বর্ণনায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। সুব্রতবাবু মনে রাখবেন জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য এক নয়। নারীকে পুরুষ নানাভাবে উপভোগ করে—এটা জীবনে হয়ত সত্য কিন্তু তাকে সাহিত্যের পাতায় রূপ দিতে গেলে সংযমবোধের প্রয়োজন। আমার মনে হয় আপনি এখানে বর্ণনায় ঔচিত্যের সীমানা পেরিয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছেন যেখানে আমরা আপনাকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারি।

কবিতা

বিপ্রদাস পাল চৌধুরী জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া থেকে শ্রীদীনেশ চন্দ্র দে একটি ইংরেজী কবিতা পাঠিয়েছেন। বাংলা পত্রিকাতে ইংরেজী কবিতা প্রকাশ করতে অসুবিধা আছে। দীনেশবাবু, ছন্দিতার জন্য ভবিষ্যতে বাংলায় লিখবেন, কেমন?

* * * *

বাটানগর, চব্বিশ পরগণা থেকে শ্রীদীপক ঘোষ দুটি কবিতা পাঠিয়েছেন। তুলনামূলক বিচারে "চঞ্চলছায়া" কবিতাটি উচ্চাঙ্গের। শব্দচয়নে ভাবকল্পনায় এবং আঙ্গিকে কবিতাটি "অভ্যর্থনা" কবিতা থেকে অনেক উঁচুস্তরের। কবিতার সঙ্গে আপনি একটি ছোট্ট পত্রে সম্পাদকীয় দপ্তর ও আলোচনা

বিভাগের প্রশংসা করেছেন। মন্তব্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমাদের পাথেয়।

* * * *

মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া থেকে শ্রীমতী ভাস্বতী রায়চৌধুরী "কোনদিন পুনর্বার" নামে একটি ছোট কবিতা পাঠিয়েছেন। কবিতাটি অনেকবার পাঠ করেও কোন অর্থ উপলব্ধি করতে পারলুন না—জানিনা, এটা কবির অক্ষমতা না আমার অযোগ্যতা! অর্থের বিচার না করলে (শুধু শব্দচয়নের দোহাই দিলে) অবশ্য কবিতাটিতে তীব্র আধুনিকতার গন্ধ রয়েছে। ভাস্বতী দেবীর কাছে অনুরোধ দয়া করে আর একটি কবিতা পাঠান, কেমন? এজন্য ভুল বুঝবেন না যেন।

* * * *

নতুন আধুনিক কবিদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে চাই:

কবিতা বড় করবেন না—দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করবেন না। আবেগকে সংযত করে ভাবকে সম্প্রসারণ করুন, কবিতার শৈল্পিক মূল্যবোধের (এসথেটিকস ভ্যালু) প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। একথা বললাম—এগুলিকে জ্ঞান হিসাবে নেবেন না—সরল বন্ধুর সহজ পরামর্শ হিসাবেই গ্রহণ করবেন।

সকলের উদ্দেশ্যেই আন্তরিক ভালবাসা প্রীতি শুভেচ্ছা নমস্কার পাঠাচ্ছি।

আগামী সংখ্যায়

মিহির রায় চৌধুরীর

একটি বিশেষ রচনা প্রকাশিত হবে

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

করে আমরা কোন শিল্প-রস উপভোগ করি না—যা করি তা হলো অতৃপ্ত যৌন কামনার স্বাদ। যাই হোক সংক্ষেপে এর বেশী আর কিছু বলা বোধ হয় সমীচিন নয়। সাহিত্যে স্বাধীনতা এবং সাহিত্যিকের কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই—গালাগালি দেওয়ারও একটা সীমানা থাকা উচিত,—ঔচিত্যের সেই সংযত সীমানা লঙ্ঘন করলে (আর্থিক ক্ষমতার বলে) সস্তা রুচির বাহবা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনার জন্য চাই উচ্চাঙ্গের মননশীল রচনা। এ যুগে যার একান্তই অভাব। সাংবাদিক মহাশয় সেই অভাব পূরণ করে অনায়াসেই ইতিহাসের পাতায় তার আসন (?) দখল করে নিতে পারতেন—কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম সেই পথে তিনি না গিয়ে অশ্লীল সাহিত্যের আদালতে একজন ভণ্ড উকিলের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের সকলের করুণার পাত্র। তাঁকে সকলে করুণা করুণ।

(৩৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মনোবিলাস : গৌরী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

মনোবিলাস গৌরী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা-গ্রন্থ। কবি জীবনের চাওয়া পাওয়া সুখ দুঃখের অনুভূতিকেই তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ ১০৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে মোট ৭৫টি কবিতা পাঠকহৃদয়কে জয় করবে—এই আশা রাখি। সুঃ দাঃ

Regd. No. C-384 ● CHHANDITA ● June-July [illegible]

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

জন্মদিন

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, প্রবীণ ও সমসাময়িক কালের নবীন কবিগণের জন্মদিনের মানসিক অনুভূতি বিষয়ক একটি অভিনব সঙ্কলন গ্রন্থ 'জন্মদিন'।

প্রকাশনায় :
শ্রীসু[illegible],
ষ্টুডেন্টস্ বুক হাউসের পক্ষে
মথুরাপুর ষ্টেশন রোড,
পোঃ—দক্ষিণ বিষ্ণুপুর,
জেঃ - ২৪ পরগণা

সম্পাদনায় :
শ্রীঅনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
এ/২০, রবীন্দ্রনগর
কলিকাতা-১৮

[illegible]লাল দাশ কর্তৃক এস. টি. প্রিন্টার্স, কলি-১২ হইতে মুদ্রিত ও [illegible] কর্তৃক, বি-৫০, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮ হইতে প্রকাশিত [illegible]।

ছন্দিতা

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭

প্রচ্ছদ

নিখিল বিশ্বাস

যুগ্ম সম্পাদক

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

গৌরগোপাল দাশ

সম্পাদকীয়

বিগত বছরের শরৎকালে কলকাতার সংবাদ পত্র-গুলিতে প্রকাশিত একটি সংবাদের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সংবাদটি হলো কলকাতার কয়েকজন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে নাকি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, যে তারা আর অশ্লীল ও যৌন সর্বস্বমূলক কোন রচনা তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করবেন না। খবরটি পাঠ করে আমরা খুব উৎসাহ বোধ করছিলাম এজন্যে যে সাহিত্যে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এদেশের জনমতই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বছর ঘুরে যেতে না যেতেই আবার দেখছি সেই অতি মুনাফালোভী সাহিত্য ব্যবসায়ীগণ অশ্লীল এবং যৌন সর্বস্ব কেচ্ছা প্রকাশ করে দু পয়সা করার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের এই উক্তির সততা এবং সত্যতা প্রমাণিত হবে যদি কোন সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আপাততঃ কলকাতার কোন বুক ষ্টলে গিয়ে সরেজমিনে সব প্রত্যক্ষ করেন। ইদানীং বুকষ্টল গুলিতে উদ্ভিন্না যৌবনা ও কামোন্মত্তা নারীর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহের ছবির প্রচ্ছদপট সম্পাদিত পত্র পত্রিকাগুলি এমন ভাবে সাজান থাকে যে সাধারণ পথচারী ও মানুষের নিরপরাধ দৃষ্টি সহজেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। সে সমস্ত পত্র পত্রিকা গুলিতে আবার এমন ধরণের যৌনসমস্ত রচনা থাকে যা পাঠ করলে দেহমন উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। আমাদের প্রশ্ন : এই যৌন ও অশ্লীল পত্র পত্রিকা প্রকাশ কি বন্ধ করা যায় না। শুনেছি আমাদের দেশে নাকি সেরকম কোন আইন নেই। অথচ আবার সংবাদ পত্রেই দেখে থাকি যে পুলিশ মাঝে মাঝে বুকষ্টলে হানা

দিয়ে অশ্লীল পত্র পত্রিকাগুলি বাজেয়াপ্ত করে থাকে। ব্যাপারটা আমাদের কাছে আজও অস্পষ্ট। আইন যদি নাই থাকে তবে পুলিশ কখনও কখনও এমন ভাবে বুকষ্টল গুলিতে হানা দেয় কেন ? আর যদি সত্যিকারের কোন আইন থেকেই থাকে তবে তা মেনে চলার পথে বাধা সৃষ্টিকারীদের টাইট করতে পুলিশের এত দ্বিধা কেন ? আসল কথা, দিনে দিনে আমরা নিজেরাই নিজেদেব অলক্ষ্যে যৌন ও অশ্লীলতাব পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়ছি। কারণ প্রতিবাদের ঝড় কিঞ্চিৎমাত্র কোথাও উঠে থাকলেও বজ্র বিদ্যুতের মত কঠিন কঠোব নিনাদ শুনতে পাই নি। এই প্রতিবাদ আবার তীব্র ভাবে পুরুষ মহলেব কাছ থেকে প্রত্যাশা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ নগ্ন নারীদেহেব ছবি দিয়ে এই বজ্জাতি ও বেসাতির বিরুদ্ধে এ দেশেব কল্যাণী মা-বোনগণকেই গর্জে উঠতে হবে। নারীত্বেব এতবড় অপমান অমর্য্যাদাকে কি করে এ দেশের মেয়েরা নির্বিচারে হজম করে নিচ্ছে তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হই।
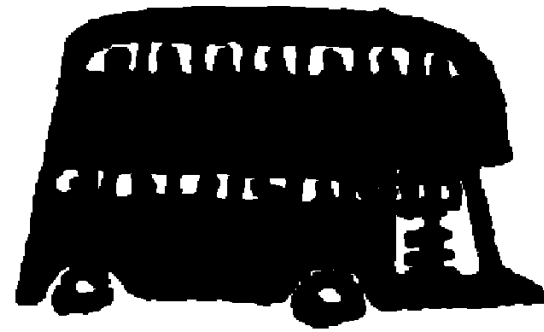
প্রবন্ধ

অভিনয় প্রসঙ্গ

সুরেশ হালদার

সৃজনশীল অভিনেতা মহান শিল্পী। মহান শিল্পীর গুণগত বিচারে ও মাত্রাগত বিচারে সমান দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি মঞ্চের মুক্ত অংশে মায়া সৃষ্টি করেন সত্য কিন্তু সেই মায়া যেন দর্শকের কাছে সত্য বা বাস্তবকল্প হ'য়ে ওঠে। মহান শিল্পীর বিশেষ গুণ হ'ল তাঁর অন্তর্মুখীনতা। তাঁর চিত্তের 'inner preparetion' না থাকলে তিনি চরিত্রকল্পনায় কর্তৃত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন না। এজন্য তাঁকে ধ্যানের জগতে শিল্পের সত্য অন্বেষণে বিচরণ করতে হয়। অভিনয় শিল্পের সত্যতা যাচাই করতে হ'লে যাদের নিয়ে নাটক তাদের কথা আগে ভাবতে হবে এবং নাট্যকার সৃষ্ট সেই চরিত্রটির শারীর-মানস ভাবের গভীরে ডুব দিয়ে সমাজজীবনের ও অন্যান্য পরিবেশগত দিকের অন্বেষণে অন্তর্লীন করে আসল সত্য অর্থাৎ সার্বজনীন আবেদন জনিত সত্যকে আহরণ করতে হবে। কেবলমাত্র নাট্যকার সৃষ্ট অভিনেতব্য চরিত্রটির একক চিন্তায় অভিনেতাকে বিভোর হ'লে চলবে না, সামগ্রিকভাবে সমস্ত নাটকটির মূল সুর ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরিত্রের কথাও সৃজনশীল অভিনেতাকে চিন্তা করতে হয়। বাহ্যিক চিন্তায় ধরা সহজ হ'লেও বিচিত্র ধারা ও বহুবিধ দৃষ্টি ভঙ্গীতে অন্তর সত্তায় অনুভব করতে হয়। তবেই প্রাথমিক পর্য্যায়ের প্রাথমিক অংশটুকু অভিনেতার আয়ত্তাধীন হয়।

সমগ্র নাটকের মনন ও চিত্তবোধের পর অভিনেতা যে চরিত্রে অভিনয় করবেন সেই চরিত্রের আসল ভাবটিকে মানবায়িত চরিত্ররূপে আপন সত্তার ছাঁচে ফেলে, নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ—অপ্রত্যক্ষ চিন্তা-ভাবনা কল্পনা, গতি-প্রকৃতি, কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন-সাধনাকে স্বীকরণের মধ্য দিয়ে অনুশীলন করে একটা সামগ্রিক চিত্তবোধে রূপায়িত করবেন। অভিনেতা প্রয়োজন বোধে বার বার আপন মনে প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন—অভিনেয় চরিত্রটির মত তিনি যদি সেরূপ পরিবেশে কিংবা কোন বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত

হ'ন তাহ'লে কি করবেন। বাস্তব জগতে বিভিন্ন উত্তেজনার মধ্যে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও করণীয় কি থাকতে পারে। কোন একটি উত্তেজক বস্তুর সামনে তিনি নিজে কি করবেন ইত্যাদি চিন্তার মধ্য দিয়ে চরিত্রোপযোগী ভাবগুলি ও প্রতিক্রিয়াগুলিকে আয়ত্তে আনবেন।

বিভিন্ন উত্তেজক বস্তুর সামনে উপস্থিত হলে অভিনেতার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেকথা চিন্তা করে তিনি অঙ্গ ভঙ্গীকে দমন করার চেষ্টা করবেন। অযথা অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনায় অধিক পরিমাণে যেন দৈহিকপেশী সঞ্চালনে আসল রস ও ভাবের অভিব্যক্তি ঘটাতে বিঘ্ন উপস্থিত না করে। সেজন্য অভিনেতা একাগ্র মনে মুখ্য সত্তায় অভিনয় করে গৌণ সত্তায় যেন বিচারের অবকাশ রাখেন। অভিনেতার মনোযোগ একাগ্রভাবে নিবিষ্ট না হ'লে ফাঁক থেকে যাবার সম্ভাবনা বেশী। মনঃসমীক্ষণের মধ্য দিয়ে অভিনিবেশ সহকারে চরিত্রের বৃত্তিগত দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি যেন এগিয়ে যেতে পারেন towards to an end, অর্থাৎ চরিত্র কি চায় এবং তার লক্ষ্য কী সেই স্থানে পৌঁছবার জন্য অভিনেতাকে কোন মাধ্যমে অভিনিবেশ নিবদ্ধ করবেন সে ভাবনা থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় গতির প্রতিও তাঁর অভিনিবেশ একাগ্র হওয়া একান্ত কাম্য হয়।

দৈনন্দিন জীবনের ভাব, আবেগ বা emotion অভিনয়ে যথাযথ আরোপিত হলে সহচরিত্রগুলির সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে সেজন্য প্রাত্যহিক জীবনের emotion-কে স্মরণে রেখে, অভিনয়কালে সামগ্রিক সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি রেখে তার কপট প্রয়োগ অর্থাৎ আয়ত্তাধীন ভাবের স্বেচ্ছা প্রনোদিত প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ঘটান একান্ত প্রয়োজন। এ সমস্ত বিষয়ে অভিনেতার বিচার ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হওয়া উচিত। তিনি যে চরিত্রের রূপ দান করতে চাইবেন তা যেন সাধারণ সামাজিকবর্গের বিচার ও বিশ্বাসে আঘাত না করে অর্থাৎ তাঁরা যেন অভিনেতার কল্পিত চরিত্রের সঙ্গে নিজেদের বিচার ও বিশ্বাস দিয়ে বাস্তব কল্পরূপ বলে মনে করেন।

অভিনেতা কল্পনার মায়াজালে অভিনেতাকে যেন পেছনে রেখে চরিত্র-টিকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হন অর্থাৎ অভিনেতার ব্যক্তিসত্তা যেন চরিত্রের সত্তার সঙ্গে পৃথক হ'য়ে না যায়। এমনভাবে যাদুকরের মত মায়াজাল বিস্তার করতে হবে যেন মঞ্চের পরিবেশটি চরিত্রের environment-এ

রূপায়িত হয়। চরিত্রের আসল সত্যের মধ্যে সামাজিক বর্গ নিজেদের ভাবনাকে নিবিড় করে উপলব্ধি করেন। অভিনেতার সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশ সার্থক হবে সেখানে সামাজিকবর্গ যেখানে কপট চরিত্রের বাস্তবানুরূপ কপটসত্যকে অনুমোদন করে নিতে পারবেন। ক্ষণিকের জন্য তাঁরা যেন ভুলে যান যে এটা অভিনয় হচ্ছে। সামাজিকবর্গের চিন্তায় যখন অভিনয় ও বাস্তবচিন্তা এক হয়ে যায় সেখানেই অভিনেতার সৃজনাত্মক প্রতিভার প্রকাশে সার্থকতা। অতএব অভিনেতা বস্তব চরিত্রের মধ্যে ডুবে না গিয়ে তিনি যেন সামাজিকবর্গকে বাস্তবের দিকে বেশী করে এগিয়ে নিয়ে যান।

অভিনেতার কতকগুলি ব্যবহারিক বিষয়ে অনুশীলন করতে হয় যেমন অঙ্গভঙ্গী, কথোপকথন, চলাফেরা ইত্যাদি। এগুলি এমন কৌশলে তিনি ব্যবহার করবেন যার একটা গূঢ় অর্থবোধ সামাজিকবর্গের চিত্তে সাড়া জাগাবে। স্বরের মাধুর্য যেমন থাকবে তেমন তার মধ্যে বৈচিত্র্য আরোপ করতে না পারলে সাধারণ কথায় বলা যায়—ভাল লাগে না। এই ভাল লাগানর জন্য বিভিন্ন বাস্তব চরিত্রের অঙ্গভঙ্গী, স্বর ইত্যাদির অনুকরন করা অভিনেতার একান্তভাবে যেমন প্রয়োজন তেমন কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে তাকে আরও মধুর করে তোলার কৌশল অভিনেতাকে অর্জন করা দরকার। সংলাপের কোন অংশে দেহের কিরূপ রূপান্তর ঘটান যায় তাও অভিনেতা চিন্তা করবেন। আমরা যেমন প্রাত্যহিক জীবনে অল্প জিনিষ বোঝাতে গিয়ে হাতের আঙুলগুলোর ডগা কাছা কাছা নিয়ে দেখাই সেরূপ অভিনেতা চোখ মুখ ইত্যাদির সাহায্যে সংলাপকে প্রাণবন্ত করবার জন্য দর্শনীয় শারীরবিকাশ বা অঙ্গভঙ্গীর আরোপ করবেন। স্বরের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তিরও রূপান্তর ঘটানোর জন্য অনুশীলন করবেন তবেই হবে সার্থক অভিনয়। প্রাণপণ চীৎকার করে বলে গেলেও ভাবের অভিব্যক্তি স্বরে ও দেহে সমপর্য্যায়ে না ঘটান পর্যন্ত অভিনয়ে সাফল্য অর্জন করা দুরূহ। অবশ্য মূখাভিনয় ও বেতার বা রেডিও অভিনয়ে এগুলির সমন্বয় হয়ত নাও হতে পারে তবে সার্থক মূখাভিনয়ে দর্শকের মনে সংলাপ অংশ স্বাভাবিকভাবে জাগ্রত হয়। সেরূপ বেতার বা রেডিও অভিনয় শুনতে শুনতে স্বরের বৈচিত্র্য কল্পনায় অভিব্যক্তির ভাবটি শ্রোতার চিত্তে উদ্ভাসিত হয়।

মঞ্চাভিনেতার পক্ষে মঞ্চভীতি একটি বিপজ্জনক ব্যাপার। কিভাবে মঞ্চে চলাফেরা করবেন কিংবা কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে কথা বললে সবাই শুনতে পাবেন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ভীতি থাকে। অভিনেতাকে সেগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় বড় বড় নাম-করা অভিনেতা কিংবা নাট্যাচার্যগণ যদি প্রেক্ষকের আসনে বসে থাকেন তাহলে অনেক ভাল অভিনেতার অভিনয় খারাপ হ'য়ে যায়। সেজন্য অভিনেতাকে এসমস্ত চিন্তা ও ভীতিকে মন থেকে মুছে ফেলে অভিনয় করতে হবে নতুবা তিনি ভাল অভিনয় করতে সক্ষম হবেন না।

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—"দেহাত্মকং ভবেৎ সত্বং"। অর্থাৎ দেহের একটি মূল বস্তু হচ্ছে "সত্ব"। চিত্তে যে ভাবগুলির উদয় হয় তা যদি অভিনয় কালে শারীর-মানস অনুরূপ প্রকাশ করা যায় এবং রসের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটে তাহলেই তাকে সাত্বিক অভিনয় বলা যায়। যিনি এই সাত্বিক অভিনয়ে পারদর্শী তিনিই সার্থক সৃজনশীল অভিনেতার পর্যায়ে পড়েন। সাত্বিক অভিনয়কালে অভিনেতাকে যোগীর ন্যায় ধ্যান যোগে চিত্তের ভাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারীর রূপান্তর ঘটাতে হয়। এ জন্য সাত্বিক অভিনয় কলা সবচেয়ে কঠিন এবং শ্রেষ্ঠ।

পরিশেষে সৃজনশীল অভিনেতা সম্পর্কে একথা বলা যায় যে সমগ্র নাট্যবস্তুর একটি ঘনীভূত সার্থক স্বভাবজ অভিনয় যিনি অনুভাবন, সহানুভূতি, মনন ও সংবেদন ইত্যাদির সাহায্যে অভিনয় মাধ্যমে সামাজিক বর্গের হৃদয়ে সার্বজনীন ভাবসত্তোর সাড়া বা আবেদন জাগাতে সক্ষম তিনিই প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল প্রতিভাধর অভিনয় শিল্পী।

আমরা (মেয়েরা) কেমন ছেলে পছন্দ করি

পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়

সবার আগেই আমি ছন্দিতার পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শুধুমাত্র পাঠিকাদের অনুরোধে বহুবিতর্কিত একটি প্রশ্ন নিয়ে টালবাহানা করতে করতে এই ছোট্ট বক্তব্যটি রাখছি। যদি কারুর এ ব্যাপারে বাড়তি বা পাল্টা কিছু বলার থাকে তিনি যেন বলেন। আমার বক্তব্যটি হল, আমরা কেমন ছেলে পছন্দ করি। বৈশাখের প্রথম থেকেই আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে বিয়ের একটা প্লাবন জাগে। যারা বিবাহিত তারা নিজেদের স্বামীকে মিলিয়ে দেখেন—যাদের মনের কুড়ি এখনও পাপড়ি মেলেনি তারা চুটিয়ে সমালোচনা করে আর ভাবে জানিনা নিজের ভাগ্যে কি আছে। একবার সম্পর্কে এক মাসীকে বললাম—কোথায় রেখেছ বেঙ্গল কেমিক্যাল কে ? (ভদ্রলোকের নাম কুমারেশ) উত্তর দিলেন কি আর দেখবি বল, সে যে ছোট্ট শিশিটার মাপে একেবারেই ৪ ফুট। কত হাল্কা ভাবে ব্যাপারটা নিলেন ! অথচ সম্প্রতি একটি বিয়ে বাড়ীতে বরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বেশ আত্মপ্রসাদ বোধ করলাম, কারণ সে আমার কাধ ছাড়িয়ে বেশী দূর যেতে পারেননি। নব বিবাহিতা পাত্রীটি যখন জিজ্ঞাসা করল কেমন হয়েছেরে (স্বামীরত্নটি) ?--তখন লম্বার কথাটা না বলে পারলাম না—নতুন হলেও এবং আমার থেকে বয়সে ছোট হলেও বঙ্কার দিল ও, আমার বাবা তো লম্বা দেখেননি—ছেলে দেখেছেন। ছেলেটি ইন্‌জিনিয়ার। অথচ বিয়ের আগে আমরা এক সঙ্গে বসে চুটিয়ে সমালোচনা করেছি। সুতরাং আমাদের প্রথম বক্তব্য হল লম্বা ছেলে চাই। কথা বলার সময় যেন মুখটা একটু তুলে কথা বলতে হয়। সমান সমান দৃষ্টি যেন না হয়।

তেল মাথা রোগটা আরেকটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। হয়তো অনেকের মতে তেল না মাখলে মাথা ধরবে। কিন্তু তাই বলে বিকেল বেলায় কেউ যদি খানিকটা জবাকুসুম মাখে তা চলবে না। চায় তো হালকা ধরণের তেল মাখতে পারে। প্রয়োজন পড়লে হয়তো বা মারামারিই দরকার হল, চুলের মুঠি ধরলে হাতে তেল লেগে গেল—তখন ? তাই এ রোগ বিচ্ছিরি।

ছেলেরা প্রচুর নেশা করে। পান, বিড়ি, মদ, মস্তি না ব্যবহার করে সিগারেট খাওয়া ভাল। তাতে অনেক স্মার্ট লাগে। তাই বলে সর্বদাই নয়।

বেশীর ভাগ ছেলেই নোংরা হয়—এরোগ ত্যাগ করে মেয়েদের সাহায্য-কারী হতে হবে। দরকার পড়লে মেয়েদের যেন সর্বতোভাবে সাহায্য করতে পারে।

একজনের হয়তো কিছুই নেই কিন্তু গলার স্বর ও কথা বলার ভঙ্গীতে অনেককে ঘরছাড়া করতে পারে। মেয়েরা বাক্ পটু হয়। সেখানে যদি ছেলেরা তোমায় কি ভাল দেখতে প্রভৃতি দিয়ে প্রেম নিবেদন করে তাহলে বড়ই বোকা বোকা লাগে ছেলেদের। বাজে কথার ফুলের চাষ করে বা টুকরো টুকরো কথাকে বিনি সুতোয় গেথে যদি মনের ভাবকে প্রকাশ করা যায় তাহলে অনেক সহজেই মন কেড়ে নেয়।

ধুতি পড়লে সবাইকেই ভাল লাগে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে কেন যে ছেলেরা ধুতি পরে না ভেবে পাই না। যেমন বাজে লাগে বাংলা বা সংস্কৃতের অধ্যাপককে প্যান্ট পরলে।

মোট কথা—উগ্র আধুনিক (যেমন কষ্ট করে পরা প্যান্ট, বড় ঝুলপি বা অকাল বার্দ্ধক্যে পীড়িত না হয়ে প্রাণ চঞ্চল ও আবেগপূর্ণ জীবনকে যারা সহজ ভাবে গ্রহণ করে তেমন ছেলের মর্যাদা আধুনিকাদের কাছে অনেক বেশী। প্রসঙ্গত: একটি কথা বলে শেষ করছি—ফর্সা নাড়ুগোপাল চেহারা মায়েরা পছন্দ করে—কিন্তু শ্যামবর্ণ আকর্ষণীয়কে মেয়েরা।

ছন্দিতার আগামী সংখ্যাগুলোর জন্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, রম্য রচনা ও সমালোচনা চাই। লেখক/লেখিকা যোগাযোগ করুন।

লেখা সবসময়ই সম্পাদক : 'ছন্দিতা' এই নামে পাঠাবেন।

কবিতার নাম আত্মহত্যা

যুগল রায়

আমি আর জীবন,
জীবন আর আমি
আমি অর্থ জীবন,
আমার মধ্যে জীবন জীবিত অনন্তকাল ধরে।
উদ্দেশ্য ; উপনিষদ স্বর আর সুরে
বেধে দিলো, বিশ্বাস আর ভালোবাসা।

তারপর বয়স নিয়ে বিশ্বাস
একদিন গেল পালিয়ে,
ভালোবাসা যতটা কাছের
ঠিক ততটাই দূরের
ডুবুরীর নাগালের বাইরের
মুক্তোর মতো জলজলে।
ভালোবাসা কাঁদলে,
সমস্ত শরীরটা ঝাকানি দিয়ে
ক্ষুধা ওঠে হেসে
ভালোবাসা হাস্‌লে
চাঁদটা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে মিলিয়ে যায় আকাশে।

তবু জানি রাত্রি হ'লে আকাশে
আর একটি তারাও জলবে না
কারণ তারারা সবাই আমার পাকস্থলীতে।

এ মুহূর্তে আকাশ অন্ধ হতাশা
যার আরেক নাম দুর্ভিক্ষ,
অর্থ ক্ষুধার্ত, হিংস্র সিংহের পেটের খোল।
ভালোবাসা আর ঈশ্বর,
ঈশ্বর আর ভালোবাসা
শুধু পাতার এপিঠ আর ওপিঠ।
ক্ষুধার কোনো ঈশ্বর নেই,
ক্ষুধার কোনো ভালোবাসা নেই,
আছে শুধু জ্বালা, আছে বিদ্রোহ

মূর্খ—গালে এক কঠিন চড় মেরে
সময় বললো,
কবিতাটার নাম রেখো আত্মহত্যা।

পঁচিশের স্বপ্ন

অপূর্ব পোদ্দার

স্বপ্নের ঘুমথেকে জেগেই দেখেছি শিমুলফুলের মালা
হাজার ঘোড়ার খুরের শব্দে আমি অলৌকিক রাজ্যে
গভীর রাতের কুয়াশা শেষে আকাঙ্খিত সবুজ সকাল
খুঁজে পেয়েছি।

এখানে আমি আমারই প্রতিদিনের পোষাক বদল করছি
এখানে সকল শরীরে হরিণ হরিণীর বর্ণ
এখানে এক চিত্রিল ঝর্ণাতীরে
তৃষ্ণা মেটাবার সফলতা খুঁজি।

আমি কি এগুতে পারি ঘুমচোরা মনচোরা সেই পথে ?

তুমি আসবে, সেই সঙ্গে দিগন্তে বর্ণাঢ্য টাইগার হিলে
সূর্যের খেলা।

আমরা তো খেলতেই চাই।
খেলার অপর নাম জীবন।

হেথায় তোমাকে দেখে

গৌর কিশোর দাস

সবুজ শ্যামলিমা শালবীথি নয়
কিংবা শালবীথির নীচের লাল রাস্তায়
বিদায়ী রবির অকারণে ছড়িয়ে
দেওয়া আবীর নয়,
দেখবো শুধু তোমাকে
কেননা চোখে আমার
তরঙ্গময় উদ্বেগের ফেনিল আবর্ত্ত।
দেখছি, পদ্মকলি ঐ নয়নে
সীমাহীন টিয়ারং প্রত্যাশা ;
দেহবল্লরীতে যৌবনের সুন্দর উদ্ধত বিস্ময়
যেন শালবীথির শ্যাম-শোভার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সবুজের আসরে পাতার নাচ, বাতাসের গান
আনন্দিত তবে আমার চোখে তোমার
চলার সাবলীল ভঙ্গি আর কথার সুর
আরো সুন্দর মনে হয়।

শিমুল কামনাফুলে আমি ভরপুর,
আমি প্রণয় পূজারী,
হৃৎপিণ্ডের কমণ্ডলুতে আছে উত্তেজনার অমৃত।
মনের আকাশে জোনাকী আশা
বার বার জ্বলছে নিবছে ;
দু চোখের নীল সাগরে হলুদ নরম কল্পনার
চূর্ণ চূর্ণ ঢেউ সময়ের বেলাভূমিতে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

আর নয়, এবার প্রবোধের বেড়া টপকে
অটল বিশ্বাসে কঠিন যুক্তির কাঁটা মাড়িয়ে
তোমার দৃষ্টিতে জ্বালবো প্রেমের প্রদীপ।
অচেনা হৃদয়ের সৌরভ নিয়ে আমি
কুড়িয়ে পেতে চাই সোনালী ভালবাসার নুড়ি।

আমিও

শান্তি রায়

পবিত্র স্বপ্নের লোভে একেক সময় ঈশ্বরও হয়ে যেতে হয়।
বস্তুত: অলৌকিক স্বর্গীয় দ্যোতনা নিয়ে
আমিও দু'দণ্ড বেঁচে থাকি,
জীবনের বিপর্যস্ত বিবর্ণ-বিধ্বস্ত তীরে
হৃদয়ের পারিজাত তুলি।
—আমিও কবি, দার্শনিক, মাতাল, সম্রাট
আমিও ঈশ্বর হয়ে নির্ভেজাল নীহারিকা জয় করি,
মণিময় ফুলের লোভেতে হৃদয়কে শ্মশান বানাই।

সার কথা

সমরেশ ঘোষ

যদিও জানো তোমার জুতো
বাজার থেকে অনেক দামে কেনা
তবুও সেটা গলিয়ে পায়ে
জলের মধ্যে হেঁটেছো কয়জনা !
পায়ের থেকে জুতোর কদর অনেক বেশী কিনা !

অন্যদিকে কত মশাই
কড়ি গুণে গুণে অঙ্ক মেলায় বড়
কর্ত্তা-গিন্নি তবেই নাকি
ছেলের মুখে দুধের বাটি ধরো।
এ জীবনের কত কি দাম হিসেব দিতে পারো ?

সংখ্যা তথ্যে যতই উঠবে তোমার কামের দড়ি
মেয়ে-মদ্দা বুঝবে ততই তোমার দামের কড়ি।
অন্যথায় বুড়বাব, তুমি গাধার টুপি পরো,
এ জীবনের কত কি দাম অঙ্ক কষতে পারো !
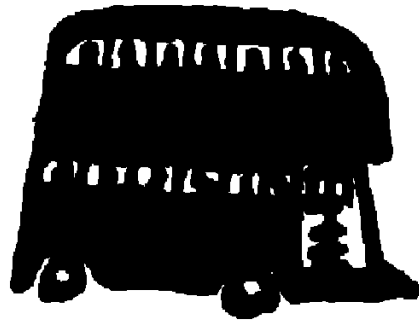
চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক,

আবার একরকম প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই ছন্দিতার একটি সংখ্যা হাতে এসে পৌঁছেচে। মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ভেবেছিলাম আর ক'টা পত্রিকার মত ছন্দিতারও বুঝি অকাল মৃত্যু হয়েছে! যাই হোক, ছোট্ট হলেও এমন একটি সহজ সুন্দর সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পেছনে আপনাদের অকৃত্রিম ও নিরলস প্রয়াসকে অভিনন্দিত না করে পারছি না। এ সংখ্যায় দেখছি আবার একটি নতুন বিভাগ যুক্ত হয়েছে। একদিন আপনারা সম্পূর্ণ নতুন ও অখ্যাত লেখক লেখিকাদের পাঠক পাঠিকাদের চোখের সামনে তুলে ধবার কাজে নিবত ছিলেন এখন আবার তরুণ প্রতিভাবান শিল্পী সাহিত্যিকদের পরিচয়ও প্রকাশ করেছেন দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছি। এসংখ্যায় অল্প হলেও প্রতিটি কবিতাই সুনির্বাচিত ও সুসম্পাদিত। রুশ গল্পের অনুবাদটিও মন্দ হয়নি। তবে মাঝে মাঝে কয়েকটি বানানেব ভুল মনকে পীড়া দেয়। পত্রিকাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার সবই রয়েছে কিন্তু মেয়েদের ঘবকন্নার বা ফেশনের উপর কিছু লেখা প্রকাশ কবতে পারলে আরও ভাল হয়। বিষয়টি দয়া করে ভেবে দেখবেন।

ইদানিং কালের সাহিত্য জগতে যে সমস্ত মিনি অথবা সেমি মিনি পত্রিকা সৎ ও সততার মূলধনকে ভিত্তি করে পরিচ্ছন্ন সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করে আমাদের অর্থাৎ পাঠক পাঠিকাদের সকরুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আপনাদের ছন্দিতা তাদের মধ্যে অন্যতম।

প্রীতিসিক্ত নমস্কারান্তে—

সুদীপা সান্যাল

আগরতলা, ত্রিপুরা

অনামিকা

সন্ধ্যা শীল

নিতান্তই আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল অনামিকার সঙ্গে। সেই কবে কোন্ সুদূর অতীতে দেখা হ'ত দুজনে দুবেলা—আর আজ আবার দেখা হয়ে গেল ঠিক সেই পথের বাঁকেই। কত মধুর ছিল সেই কলেজীয় দিনগুলো—আজও যেন জ্বল জ্বল করছে স্মৃতিপটে। দুজনায় ছিলাম একই ক্লাসের ছাত্রী—সতীর্থ। সেদিনের সেই কত সুখের দিনগুলো ফুরিয়ে গেছে—একথা যেন বিশ্বাসই হয় না। মনে হ'ল যেন কিছুদিনের জন্য লুকিয়ে ছিল—হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল।

প্রথমে দুজনে দুজনকে যেন চিনতে পারিনি। পরে যেন হঠাৎ কিছু পাওয়ার আনন্দে দুজনই চমকে উঠলাম। যুগপৎ বিস্ময় আর আনন্দে প্রশ্ন করে উঠলাম—"কিরে তুই? কোথা থেকে? কেমন আছিস ইত্যাদি··· ইত্যাদি······"

আমার প্রথমে যেন বিস্ময় লাগছিল। সেই অনামিকা—যার সঙ্গে দু-দুটো বছর এক সঙ্গে একঘরে কাটিয়েছি—থেকেছি-শুয়েছি প্রায় এক সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে চলেছি—সেই তাকেই চিনতে এত দেরী হল? অবশ্য তার চেহারায় অনেক বৈষম্য এসেছিল। আগের চেয়ে মোটাও হয়েছে অনেক—আর সেরকম চাঞ্চল্যও আর নেই—যেন আগের থেকে বয়স অনেক অনেক বেড়ে গেছে—তার উপর কপালে সিঁদুর। বিয়েও করেছে বোধ হয়······

আমার চিন্তার মাঝে ছেদ টেনে বলে উঠল—"কিরে, কি দেখছিস আর ভাবছিসই বা কি? চল্ এই পার্কটায় গিয়ে একটু বসি। অনেকদিন বাদে তোর দেখা পেলুম, আর তোকে ছাড়ছি না।" বাধ্য হয়েই যেতে হ'ল ওর পিছু পিছু। হাটার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকল প্রশ্ন আর উত্তরের একটানা অনেক কথাই—জানা গেল ওর সম্বন্ধে অনেক কিছু।

কতদিন অতীত হয়ে গিয়েছে। এত দিনের যে ব্যবধান অবিচ্ছেদের প্রাচীর তুলেছিল—তা' যেন এই মুহূর্ত্তের আলাপনে মুছে গেল। স্মৃতির

রোমন্থন করতে করতে ডুবে গেলাম সেই অতীত দিনের স্মৃতিসাগরে। অনামিকা, আমি আর অশোকা। কত আন্তরিক বন্ধুত্ব আমাদের। ভুলে গেছে—মুছে গেছে—উড়ে গেছে সব—অস্পষ্ট হয়ে এসেছে সেদিনের স্মৃতি। কলেজের করিডর—মেয়েদের 'কমনরুম'—ক্লাসের লাষ্ট বেঞ্চ। মেয়েরা ঈর্ষা করত, হিংসা করত আর ছেলেদের সশব্দ হাসির বিদ্রূপ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেদিনের প্রত্যেকটি কথার রোমন্থন করতে ইচ্ছা করল, বিগত দিনের একটা অসম্পূর্ণ স্বপ্ন মন্থন করতে আনন্দ লাগে। পরিবর্তে পাঁজরে গুমরে মরে অসহ্য এক ব্যথিত বাস্পের কুয়াশা।

অনামিকা আর অমিতেশ। ক্লাশের সবচেয়ে স্মার্ট ছেলে অমিতেশ গাঙ্গুলী। সেজন্য মেয়ে মহলে সুনামও ছিল প্রচুর। আর কার কাছে সুনাম কতটুকু ছিল জানা নেই—তবে অনামিকার কাছে যে একটু বেশী পরিমানেই ছিল—তাতে একটুও সন্দেহ নেই। ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী অনামিকা তার জন্য গর্বও অনুভব করত কম নয়। অমিতেশের কাছে প্রত্যুত্তর ও পেয়েছিল। ছুটিতে তারি ভাব। থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে তাদের পরিচয় হয়েছিল—সে পরিচয় ঘনীভূত হতে দেরী হয়নি।

হঠাৎ অমিতেশ ক্লাসে আসা বন্ধ করল। ক্লাসের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। শোনা গেল অমিতেশ নাকি বিলাত যাবে। উচ্চ শিক্ষার অজুহাতে সে তার পৈতৃক সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করবে। আর এর কিছু দিন পরে অনামিকাও কলেজ ছাড়ল। তার পর থেকেই ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ। পরে অবশ্য তার সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা গিয়েছিল—কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই আজ চাক্ষুস অনামিকার দেখা পেয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিল। পার্কের বেঞ্চে বসে সে-ই প্রথম কথা বলল—"অশোকার খবর কিরে? কিছু জানিস?" বললাম—"আগে তোর কথা বল। অশোকার খবর পরে হবে।" "আমার আর খবর কি বল? অতীত স্মৃতির আবর্তনে নিঃশেষে পুড়ে যাওয়া জীবনের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা—এছাড়া আর কি বল?" শেষের দিকে কথাগুলো গভীর বেদনা প্রসূত বলে মনে হল।

বললাম—"অমিতেশ কেমন আছে? তোদের বিয়েতে জানালিও না একবার। না হয় একটু বেশী করেই নিমন্ত্রণ খেতুম। তাই বলে একদম বাদ দিলি কি বলে?"

অনামিকা কিন্তু এ উপহাসে একটুও আনন্দ পেলনা। বরঞ্চ মনে হ'ল একটা গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে। এক নিমেষে চেয়ে রইলাম তার দিকে। কিছুই বুঝতে পারলুম না। একটু আগে তাকে যেমন খুসী দেখেছিলুম এখন যেন শোকের ছায়া দেখলুম তার মুখে।

আমায় বিস্ময় কাটিয়ে সে-ই প্রথম বলল—"তুই সত্যিই অবাক হয়ে গেছিস নারে? তবে শোন—যেদিন থেকে অমিতেশ ক্লাসে আসা বন্ধ করল সেদিন থেকেই আমার মনে সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করেছিল। পরে শুনলাম সে চলে যাচ্ছে। তার যাওয়ার পথে বাধা হয়ে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। কিন্তু এমন করে আমায় ভাসিয়ে যাবার তার কি অধিকার?

তাই বাধ্য হয়েই গেলুম তার কাছে, স্পষ্ট করে জেনে নিতে, কি তার অভিপ্রায়। কিন্তু এমনই ভীরু সে—যে সেদিন আমায় বিয়ে করার অক্ষমতা জানাল। সে বাড়ীর অভিভাবকদের ক্রীড়নক মাত্র। একথা জানাতে তার একটুও বাধলো না। তাকে সাহসী বলেই জানতুম—কিন্তু সেদিন দেখলাম তার কাপুরুষতার চেহারা। বিলেত যাবার পর সে খান কয়েক চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোন খোঁজ খবরই সে রাখেনি। পরে শুনেছিলাম, যে সে সেখানকার এক শ্বেতাঙ্গী সুন্দরীকে বিয়ে করে সেখানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে।"

এক নিঃশ্বাসে শেষ করল তার কাহিনী। আর আমিও বিদ্রোহী হয়ে গেলুম। বললাম—"তুইও বিয়ে কর অনু। অমিতেশের এ কাপুরুষতার সমুচিত জবাব দে অনু।"

প্রশ্নোত্তরে সে শুধু বলল—"না, ভাই সে অনুরোধ আর করিস না। জীবনে যাকে একবার ভালবেসে ফেলেছি—তার জায়গায় অন্য কোন পুরুষকে ভালবেসে ভালবাসার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারব না।"

হঠাৎ চোখে পড়ে গেল তার সিঁথির দিকে।—এক চিলতে সিঁদুর তখনও জ্বল জ্বল করছে সেখানে। আমি তখন দ্বিধায় পড়ে গেছি।

আমায় বিব্রত দেখে সে নিজেই বলল—"ওটা অমিতেশের স্মৃতিপটের অমলিন সাক্ষ্য রে—ওখানে কোন ভেজাল নেই।"

সূর্যমুখীর রঙ

আরতি সেন

বীণা বুঝতে পেরেছিল অলোক আজও আবার সেই কুখ্যাত গলির মেয়েটার কাছে গিয়েছিল। বুলা তার বাপী ঘরে ঢুকতেই দুহাত বাড়িয়ে দৌড়ে গেল, আমার বাপী এসেছে রে—আমার বাপী এসেছে। কিন্তু অলোক বিষাক্ত সর্পের ছোঁয়াচ লাগার ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে বললো, "দাঁড়াও আগে স্নান সেরে আসি।" শমিতার কাছ থেকে ফিরে এসে অলোক মেয়েকে কোলে নেবার আগে শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে স্নান করে। দেহটা শুদ্ধ করে নেয়। আশ্চর্য এই মনোবিকার। বীণা ভাবে অলোক যেন স্নান করে নিজেকে সর্ব কলঙ্ক মুক্ত করে। শরীরটা পরিষ্কার হলেও মনটাও কি পরিষ্কার হয় এই সাথে। কি জানি, বুঝি হবেও বা তাই।

পাতা ছেঁড়া উপন্যাসের মত টুকরো টুকরো ভাবে অনেক কথা তার কানে এসেছে নানা ভাবে নানা সূত্রে। সেই নতুন বৌ হয়ে অলোকের সংসারে আসার পর থেকেই যে এসব দেখে শুনে যেন ক্লান্ত। পরিশ্রান্ত। এই অনেক সমালোচিত বিখ্যাত উপন্যাসটির নায়ক যে তার স্বামী অলোক, একথা মনে হলেও বীণা আর এখন আত্মহত্যার কথা ভাবে না। দুঃখে চোখে জল আসাটাও যেন যন্ত্রবৎ ঘটে।

বিয়ের দুবছরের মাথায় মেয়ে হয়েছে। মেয়ের প্রতি অলোকের স্নেহ অকৃত্রিম, কিন্তু শমিতা যেন অমোঘ নিয়তির মতো। তার আকর্ষণ, তার প্রভাব যেন কথার নয়।

অলোক স্নান সেরে বেরিয়ে এল। বীণা স্বামীর পরিত্যক্ত ভিজে জামা, কাপড় ওঠাতে গিয়ে দেখল একটা জুয়েলারী শপের ক্যাশমেমো। মুদী দোকানের ধার। লাইটের বিল, তিন মাসের বাড়ী ভাড়া, ঝি-এর মাইনে সব অঙ্কগুলোর যোগফল যেন একসাথে তাড়া করে এল বীণাকে। অনেক দিনের প্রায় ভুলে যাওয়া অসুস্থা বীণার সব চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে নেবে এল। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, মুখটা ব্যথায় নীল। পৃথিবীর সব রং-এর ওপর নেমে এল বিবর্ণ ধূসর একখানা অচৈতন্য চাদর।

"মা, মাগো, ছাখো মা, ছাখো বাপীটা আমাকে দুষ্টু বলেছে। মা, তুমি আমাকে সোনা বল মা।" বুলা পেছন থেকে প্রায় চেতনাহীন রীণার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চৈতন্যর দড়জায় পৌছে দেয়। সেই সর্বগ্রাসী কালো পর্দাটা সরে যায়। সবুজ ফ্রকপরা, ঝাঁকড়া চুল। দুরন্ত মেয়েকে অসীম মমতায় বুকে চেপে ধরে রীণা। যেন মৃত্যুর কোন সীমাহীন অতলে ডুবে যাবার আগে বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য দেওয়ালে বিখ্যাত কোম্পানীর ক্যালেণ্ডারে নানা রঙের সূর্যা মুখীব ছবি। অফুরন্ত হলদে রংএ প্রাণের ঐশ্বর্য্য বিতরণ করছে। রীণা বাঁচবে—রীণা বাঁচবে।

রীণা ভাবে, বাঁচার মধ্যেই তো জীবনের সকল মাধুরী।

বিভ্রান্তি

ডালিম কুমার ঘোষ

সাবর্ণও ভেবেছে কথাটা।

খুব গভীরভাবে পর্ণার কথাগুলোকে যুক্তি, বুদ্ধি আর স্বাভাবিক একটা বিচারবোধ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছে বৈকি সাবর্ণ।

কিন্তু কই কোথাও তো ও তেমন কোন জোরাল সমর্থন পায় নি নিজের কাছ থেকে।

সত্যিই তাই।

সাবর্ণ নিজের মনের দিক থেকে সমর্থন করা তো দূরের কথা পর্ণার যুক্তিগুলোকে নিছক একটা ছেলেমানুষী আর বুদ্ধিহীন স্থূল একটা রঙচঙে কথার বুননীর মতই মনে হয়েছে।

সাবর্ণ নূতন করে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে।

একটা হাল্কা আর সূক্ষ্ম ক্লান্তিবোধ করতে থাকে ও।

পর্ণা এখন পাশের ঘরে।

ও ঘরটা পর্ণারই। প্রায় নিজস্ব।

দশ বারোদিন ধরে খুব ব্যস্ত পর্ণা।

বোধ হয় নূতন একটা কিছুতে হাত দিয়েছে। একটু হাসল সাবর্ণ।

একটা চাপা দুঃখ, আর আর কিছুটা অভিমানের সুর ছিল ওর ছোট্ট হাসিটুকুতে।

আশ্চর্য! পর্ণা তলিয়ে যাচ্ছে।

ভেসে যাচ্ছে ও।

একটা ভয়ঙ্কর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের বিক্ষুব্ধ আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে পর্ণা একটু একটু করে।

ওর সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত চিন্তাধারা, বুদ্ধি বিবেক আর স্বাভাবিক বিচারবোধ এখন আচ্ছন্ন।

একটা রঙীন নেশার অন্ধ মোহে মারাত্মক ভাবে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে পর্ণা।

অথচ সাবর্ণ নির্বিকার, নিঃস্পৃপ।

বিশ্রী লাগছে ব্যাপারটা ওর কাছে।

নিজেকেই কেমন যেন অপরাধী অপরাধী লাগছে ওর।

অথচ কিই বা করতে পারে সাবর্ণ?

সাবর্ণ কি এখন পর্ণার চিন্তাজগতে অপাংক্তেয় নয়?

মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করতে থাকে সাবর্ণর।

ঐতিহাসিক উপন্যাস!

নবাব বাদশাদের হারেমের বেওয়াবিশ আর দেশী বিদেশী রক্ষিতাদের যৌবনের কামনা আর বাসনার একটা উত্তেজক যৌন লালসার সকরুণ কান্নার স্বপ্নিল হাতছানি! কোথাকার কোন এক অখ্যাত জনপদের সাধারণ সামান্য এক বাঁদী শুধুমাত্র তার যৌবনের বিষাক্ত পসরার সাহায্যেই কামার্ত নবাবের চোখে পড়ে রাতারাতি বেগম হ'তে পেরেছিল, তারই বর্ণাঢ্য আর চকচকে রঙীন বর্ণনা পর্ণার সৃষ্ট উপন্যাসের প্রতি ছত্রে। সত্যিই অদ্ভুত পর্ণার সাহিত্য মেজাজ, আর অপূর্ব ওর সৃষ্টি।

ভেঙে যাচ্ছে যেন সাবর্ণ

সমস্ত অন্তরাত্মা কে যেন সজোরে চেপে ধরেছে সাবর্ণর।

একটা অদ্ভুত সূক্ষ্ম যন্ত্রণাবোধ আর মৃদু একটা অস্বস্তি ওকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

অথচ আগের সেই পর্ণা।

খাঁটি ইস্পাতের তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত শানিত বুদ্ধি আর ধারালো চিন্তাধারা সমন্বিত বলিষ্ঠ আর নির্ভীক সেই মেয়েটাকে যে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখন।

ওর সমস্ত তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির গভীরতা আর চিন্তাধারার নূতনত্ব সব, সবই হারিয়ে গেছে।

পর্ণার সমস্ত সত্ত্বাই মরে গেছে।

একটা শুধু প্যাচপ্যাচে উত্তেজক যৌন বিকৃতি আর সস্তা আবেগেরই জড়াজড়ি এখন ওর লেখায়।

জীবনের গভীর জটিলতা, সমাজের রূঢ় সমস্যার কথা বা আজকের দিনের খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের নিয়ত অশান্ত অস্থির ও অভিশপ্ত জীবনের সুষ্ঠু বা স্পষ্ট প্রতিবাদের কণামাত্রও সোচ্চার হয়ে উঠছে না পর্ণার ইদানিং কালের লেখার মধ্যে।

উঃ! চীৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে সাবর্ণর—

—পর্ণা তুমি মিথ্যে, তোমার সাহিত্য মিথ্যে, তোমার লেখাগুলো তোমার সাথেই প্রতারণা করছে।

না, না, এভাবে মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

হারেমের সুন্দরী বেগমদের যৌবনের আকর্ষণে আর কামার্ত নবাবদের বন্য আচরণের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের যৌন অতৃপ্তি আর ক্ষুধারই উদ্রেক করে মাত্র।

কোন নূতন আর বলিষ্ঠ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না মোটেই। এ শুধু সস্তায় হাততালি পাওয়া আর বাজীমাৎ করার একটা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

ককিয়ে ওঠে সাবর্ণ।

একটা উষ্ণ আর অসহিষ্ণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও।

রাত বোধ হয় এখন অনেক।

পর্ণা কি আজকাল রাত্রে ঘুমায়ও না। আর কত লিখবে ও? অথচ বিয়ের আগে, সাবর্ণ যখন লেখার জগতে একটু একটু নাম করতে শুরু করেছে তখন—তখন কিন্তু পর্ণা এসব লিখত না।

খুব অল্প, মাত্র দুটো একটা ছোট গল্প লিখত শুধু। আর সেগুলো কেবল সাবর্ণই পড়ত।

পর্ণার মাত্র ঐ একজনই পাঠক ছিল।

সাবর্ণ কিন্তু অবাক আর বিস্মিত না হ'য়ে পারত না পর্ণার লেখাগুলো পড়ে।

ভেবেই পেত না ও, কি করে পর্ণার মত একটা সাধারণ ঘরের মেয়ে এসব লিখতে পারে।

জীবন সম্বন্ধে কি সুস্পষ্ট ধারণা, মানুষ সম্বন্ধে কি সুগভীর জ্ঞান আর সর্বোপরি এই বিষাক্ত আর ক্ষয়িষ্ণু সমাজের তীব্র যন্ত্রণার এক নির্মম গ্লানির কথা কত সুন্দর করে লিখতে পারে মেয়েটা।

সত্যিই শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে সমস্ত মনপ্রাণ।

প্রতি মুহূর্তে ওকে লেখার জন্য তাগিদ দিত তখন সাবর্ণ। অথচ পর্ণা তখন লিখত খুব অল্প।

কিন্তু আজ!

রাতারাতি মানুষের এই আমুল পরিবর্ত্তন কি করে সম্ভব ? কি করে মানুষের চিন্তাধারা আর মতামত এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে ভেবে পায় না সাবর্ণ।

তবে, তবে কি পর্ণা সস্তা হাততালি, হাল্কা পিঠচাপড়ানি আর একটা খেলো গাড়ী বাড়ী সবস্ব লেখিকা হ'তে চায় ? স্থুল প্রতিষ্ঠা আর যশঃ লাভে উন্মনা হয়ে পড়েছে মেয়েটা। আশ্চর্য! এ পর্ণাকে তো ও কোনদিনই চায়নি।

প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

সবুজ অবুজ : সম্পাদক—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, গ্রাম : আমিনপুর, পোঃ দেগংগা, ২৪ পরগণা।

নবাহ : যুগ্ম সম্পাদক—রমেন আচার্য, শিবেন গুহ, ৩৪সি, হরিশ নিয়োগী রোড, কলিকাতা—৪।

অরণ্যে দিন বদলাচ্ছে ঃ শ্রীঅর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

শ্রীবিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুক্তপত্র প্রকাশনী, ক্যালকাটা লিটার-এ সোসাইটির পক্ষে বি-৪৮, রবীন্দ্রনগর কলিকাতা আঠারো থেকে প্রকাশিত : মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

এ দশক মুক্তির দশক কিনা জানিনা কিন্তু ইতিমধ্যেই চারিদিকে মুক্তির জন্য মানুষের মনে আকুলতার যেন আর শেষ নেই। তাই গর্জে উঠেছে মানুষ, শ্রেণী নির্বিচারে। মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে কলকারখানায় মানুষের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি অবহেলিত নিপীড়িত অত্যাচারিত শোষিত মানুষের কণ্ঠনিনাদ। অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে এবং উপবাসের কান্নায় এরা ফেটে পড়েছে। বোধ করি তাই এরা চায় মুক্তি। সেই মুক্তির জন্য সংগ্রামী মানুষ যেমন বেছে নিয়েছে আন্দোলনের পথ তেমনি শিল্পী সাহিত্যিক কবিকেও স্বেচ্ছায় নিতে হবে সংগ্রামী মানুষকে পথের নিশানা দেখাবার দায়িত্ব। সে দায়িত্ব নেবার মত কবি সাহিত্যিক শিল্পী আমাদের দেশে ক'জন আছেন? আবার যাও দু'একজনের সঙ্গে কদাপি আমাদের সাক্ষাৎ মেলে, তারাও আবার মিথ্যা সর্বস্ব উদ্দেশ্যহীন শ্লোগানের আড়ালে কথার ফুলঝুড়ি আর তত্ত্বের কচকচানিতে মুখর। সেদিক থেকে কবি অর্দ্ধেন্দু সমস্তরকম চিরাচরিতকে অস্বীকার করে সংগ্রামী জীবনের জয়গান গাইতে নেমেছেন এই মাটির পৃথিবীতে। অবসাদে ও আত্মহননের অভিশাপে কলঙ্কিত গোটা মৃত সমাজটাকে লক্ষ্যহীন নৈরাশ্যের বদ্ধজলাভূমি থেকে টেনে এনে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ব্যাপক ও বিরাট প্রস্তুতি চলেছে এদেশে, তার সার্থক রূপায়নে যে ক'জন মাত্র কবি রোমান্টিক ভাবালুতার নেশায় ও মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে তাদের বিদ্রোহী মনের অর্ঘ রচনা করে চলেছেন, কবি অর্দ্ধেন্দু নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। শুধুমাত্র ধন্যবাদ দিয়ে এ ঋণ শোধ করা যায় না।

—অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

স্বভাব ও সংস্কার

হেনা চৌধুরী

নারী প্রগতির জয়যাত্রায় আজ আকাশ বাতাস মুখর—প্রশ্ন জাগে মনে সত্যি কি আমরা আধুনিক যুগের মেয়েরা অতুলনীয়া হয়ে পড়েছি! চলনে, বলনে, সাজ সজ্জায় আমরা অনেক advance হয়েছি সত্যি, বিশেষ করে সাজ সজ্জায় তো আমরা সব দেশের মেয়েদের প্রায় ছাড়িয়ে গেছি। কোন বড় পার্টিতে গেলে আমার এ উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে—সেখানে সবাই যেন এক একটি মডেল। মাথায় চড়িয়েছে দশ কেজির খোঁপা, কানে পাঁচকেজির দুল, কোয়ার্টার মিটারের গাত্রাবরণ, শাড়ীর আঁচলটা রুমাল সদৃশ কোন রকম ভাবে পিঠে ফেলা, তার ওপর চিত্রাভিনেত্রীর অনুকরণে চোখের ওপরের পাতা কাজলে টানা, ঠোঁটে উৎকট রং এর লিপষ্টিক, টেনে টেনে ইংরেজী বলা, বিনাদ্বিধায় তুলে নিচ্ছে বিয়ার, হুইস্কীর গ্লাস—অতি উচ্চ আধুনিক সমাজে drink করাটা মেয়েদের মধ্যে প্রায় fashion হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন fashion হয়ে দাঁড়িয়েছে smoke করা। এতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। লজ্জিত হয়না—প্রশ্ন করলে উত্তর আসে ও দেশের মেয়েরা তো করছে—কিন্তু ও দেশের মেয়েরা আমাদের অনুকরণ করছে কি? আমার মনে হয় পাশ্চাত্য দেশের fashion এর একটা elesticity আছে তাই সেটাকে style নামে অভিহিত করা যায়—কিন্তু আমাদের fashion ঝড়ের মুখে ডিঙ্গী নৌকোর মত একবার এদিক আর একবার ওদিক করছে।

আধুনিকা আমরা হয়েছি সাজ পোষাকে কিন্তু স্বভাব কি ছাড়তে পেরেছি, এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য মেয়েদের মধ্যে আছে সেগুলো ছেলেদের মধ্যে দেখা যায়না—যার জন্য লোকে একটা serious কাজ ছেলেদের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। Lady doctor এর অভাব নেই কিন্তু মরণকালে কজন তাঁদের হাতে রোগী ছেড়ে দেন। মেয়েরা আজকাল ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ছেন কিন্তু কোন বিত্তবান লোক কি একটি নারী ইঞ্জিনিয়ারের হাতে তার অট্টালিকার ভার ছেড়ে দিয়ে ভাবনাহীন হতে পারবেন? কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে দেখেছি অধ্যাপিকাদের চেয়ে অধ্যাপকরা সব সময়ই ভাল পড়ান। অনেকেই বলেন যেখানেই মেয়ে সেখানেই গণ্ডগোল। তার কারণ অগ্রগতির ফলে

আজ হয়ত প্রায় সব রকম কাজই মেয়েরা করছেন কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব বোধ এবং কাজ সম্পর্কে গুরুত্ব বোধ চিরকালই পুরুষদের তুলনায় কম। অবশ্য যে দেশে নারী প্রধানমন্ত্রী সে দেশের মেয়েদের এভাবে অভিযুক্ত করাটা হয়ত আমার অনুচিত কিন্তু ইন্দিরাগান্ধী তো আর সবাই নন।

মেয়েদের কতকগুলো বাজে কৌতূহল আছে যেমন কেউ একটা সুন্দর শাড়ী পরলে নিতান্ত স্বল্প পরিচিতাকেও তাঁরা অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তা কোথা থেকে কেনা, কত দাম, শাড়ীটার কি নাম। আমার কাছে Question টা খুব অদ্ভুত লাগে। ভাবি ছেলেরাও তো অনেকে dress সম্পর্কে বেশ সচেতন এবং দামী পোষাক পরেন কিন্তু তাঁদের তো এরকম উৎভট প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞেস করেনা। আর একটা জিনিষ মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে বর্তমান ছাত্রীসমাজের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, সেটা হচ্ছে নিজেকে express করবার ব্যাকুলতা। একদিন ২বি Bus-এ করে ফিরছি, University'র কাছ থেকে একদল মেয়ে উঠল। বাসটায় অসম্ভব ভীড় এবং তা দেখেই ওরা উঠেছিল। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি মেয়ের ঝগড়া বাঁধল—মেয়েটি দম্ভভরে জানিয়ে দিল আমি M. A. পড়ি আমার সম্মান রেখে কথা বলবেন। ভদ্রলোকের বিদ্যে বুদ্ধি বোধ হয় কম তাই মেয়েটির এই নিদারুণ বিদ্যের কথা শুনে চুপ করে গেলেন। সম্মান জিনিষটা প্রার্থী হয়ে আদায় করা যায় না—সাজসজ্জায় চালচলনে যদি আভিজাত্য থাকে তবে সে নারীকে পুরুষ নিজেব থেকেই সম্মান করেন। আর মানুষের বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড়টা তার সঙ্গে কথা বলে বা তার আচার আচরণের প্রকাশ হয়। কিন্তু এটা মেয়েদের স্বভাব—ছেলেরা দেখেছি কখনো এমন করে আপনাদের জাহির করে না। মেয়েরা মানে that they are created to surve the only purpose of god— সেটা হচ্ছে বিয়ে—সেটা না হওয়া পর্য্যন্ত এক অস্থির জগতে বাস করে এবং ধীরে ধীরে উশৃঙ্খলতার স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। পুরুষ তাদের দ্বারা tempted হবে এটাই তাদের জীবনের ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে আছে—ফলে মেয়েরা নিজেদের সত্তা ও মূল্যহীন করে ফেলছে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মূল্যবোধের প্রয়োজন সে আর অনুভব করেনা। কারণ স্বভাব-ধর্মকে সে ছাড়তে পারে না। কিন্তু এই বোধটুকুকে মন [illegible] ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে যদি পুরুষের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে তার পাশে দাঁড়ায় [illegible]য়েরই মঙ্গল হতে পারে। মেয়েরা নিজেই জানে আমরা তো মেয়ে

সুতরাং আমাদের serious হবার প্রয়োজনটা কোথায়! একদিন National Library তে কাজ করছি আমার টেবিলের উল্টোদিকে বসে দুটি মেয়ে গল্প করছে, তাদের কোন্ বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে—মা, ঠাকুমা, পিসিমা কে কোন্ গয়নাটা দিয়েছে; ড্রেসিং টেবিলটা কি সুন্দর হয়েছে। বাবাকে বলেছি আমার বিয়ের সময় ঐ রকম একটা ড্রেসিং টেবিল চাই। কি অসহ্য! এসব কথা বলবার জন্য তো অনেক জায়গা পড়ে আছে, এমন একটা serious জায়গা বেছে নেওয়া কেন! বললাম ভাই তোমরা বাগানে বসে এসব আলোচনা করনা কেন, আমার অসুবিধা হচ্ছে। মনে মনে বোধ হয় আমার চৌদ্দ পুরুষকে মুণ্ডপাত করতে করতে তারা চলে গেল। এসব ঘটনার ফলই স্বভাব—কিছুতেই ভোলা গেল না আমরা মেয়ে। আমরা লেখাপড়া করছি, চাকরী করছি এগুলো আমাদের কাজ নয়—ছেলেমেয়ে আর সংসার নিয়ে জড়িয়ে বিব্রত হয়ে থাকাটাই life.

স্বভাবের সংগে আর একটা জিনিষ মেয়েদের মধ্যে জড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে সংস্কার—বাইরের খোলসে উগ্র আধুনিকা কিন্তু ভেতরের শাঁসটা সংস্কারে পরিপূর্ণ। তাই অনেক উগ্র আধুনিকাদের মুখেও শুনতে পাই আজ নীলের উপোস, কাল অমুকষষ্ঠি; পরশু দিন জয়-মঙ্গলবার; শীতলষষ্ঠি এমন আরও কত কি ব্রতকথা তার ঠিক নেই। পাঁচালী ও ব্রতকথার যুগ বহুদিন অতিক্রান্ত—মা ঠাকুমার আমলে এসব চলতো, কিন্তু এই আধুনিক যুগে এইসব Society Lady দের কাছে এগুলো কেমন বেমানান ঠেকেনা? সবই সংস্কার! এই সংস্কার থেকে মনের মুক্তি না ঘটলে আধুনিকতা কোথায়! এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল, আমার এক বান্ধবীর বাড়ীতে দেখেছিলাম তার husband এর ছবির পাশে তারকনাথের ছবি—তার মানেটা তাকে জিজ্ঞেস করিনি—হয়ত হবে পতি ভক্তির চরম নিদর্শন। যেমন আগের দিনের অনেক মেয়েদের স্বামীর ছবি তাদের ঠাকুরের আসনের সংগে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মানুষকে কি ভগবানের গণ্ডী দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায়! আর যাকে মানুষ ভালবাসে সেই তো মানুষের জীবনের সবচেয়ে পরমদেবতা।

তাছাড়া মঙ্গল, অমঙ্গল, নানা রকম সংস্কার, পরনিন্দা, সমালোচনা, অন্যের কুৎসারটনায় মেয়েদের জুড়ি নেই।

তাই আমরা advance হয়েছি, শিক্ষিতা হয়েছি। কিন্তু জ্ঞানের [illegible] আমাদের জীবনে আজও সত্য ও সুন্দরের পূজাবেদী তৈরী কর[illegible] তার কারণ আমরা স্বভাব ছাড়তে পারিনি, ছাড়তে পারিনি সং[illegible]

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সমাজের উপর চাপ

গীতা বসু

বর্তমান সমাজের উপর জনবিস্ফোরণের চাপ বেশ অনুভব করা যায়। বিস্ফোরণ কীভাবে ঘটে? ধরুন কোন একটি পাত্রে তা সেটি যত বড়ই হোক্ ক্রমাগত জিনিষপত্র দিয়ে ভর্তি করে বন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করলে সেই পাত্রটী ফেটে যাবে। সব জিনিষ পত্র চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়্‌বে—সব নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তখন সেই পাত্রের আর ধারণ করবার শক্তি থাকে না। তেমনি ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে ভারতবর্ষ বা সমগ্র পৃথিবীর ধারণ শক্তি ছাড়িয়ে গেলে কোন এক সময়ে বিস্ফোরণের মত হবেই এবং দেশ ও জাতির, সমগ্র মানব জাতির সমূহ ক্ষতি হবে। ভাবতে প্রতি দেড় সেকেণ্ডে একটি করে শিশুর জন্ম হচ্ছে। চল্লিশ বছর আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সমস্যা ছিল না। কারণ তখন জন্ম ও মৃত্যুর হার প্রায় সমান ছিল। এমন কি ১৯৫০ সালে প্রতি হাজারে জন্মের হার ছিল ৪৯·২ আর মৃত্যুর হার ৪৮·৬। অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর হার পাশাপাশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। ১৯২১ সালে প্রতি হাজারে যেখানে মৃত্যুর হার ছিল ৪৮·৬, ১৯৬৮ সালে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৪তে; কিন্তু একই সময়ে জন্মের হার প্রতি হাজারে ৬৯ থেকে মাত্র ৩৯টীতে নামানো গেছে। কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির দরুণ মহামারি সংক্রামক ব্যাধি আরো নানা রোগের সুচিকিৎসার দরুণ মৃত্যুর হার কমে গেছে। বন্যা খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি পালন করার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করার জন্য আমাদের আয়ু ১৯৫০ সালে গড়পড়তা ৩২ বছরের যায়গায় ১৯৬৮ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ বছরে। যারা জন্মেছে তারা সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হোক্ তাই কাম্য কিন্তু অনাগতদের এই ভিড়ের মধ্যে আর ডেকে না আনাই শ্রেয়। জনসংখ্যা ভয়াবহ প্লাবনের মত দ্রুত এগিয়ে এসে সমাজ জীবনের অর্থনীতি শিল্প প্রসার বাণিজ্য সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যদি আমরা এই প্লাবন রোধ করে [illegible] ও জাতিকে রক্ষা করবার চেষ্টা না করি। এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী [illegible]ইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি [illegible]।"

শিশুর সংখ্যা ও পরিবারের দায়িত্ব

শিশুসংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিবারের নিশ্চয় দায়িত্ব আছে। শিশুর আহার নিদ্রা, সুষ্ঠু পরিবেশ, স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতির দিকে নজর দিতে হবে। না হলে তারা ভবিষ্যতের সুস্থ নাগরিক হবে কী করে? ধরুন উপযুক্ত স্বামী স্ত্রীর একটি মাত্র সন্তান জন্মালো এই হিসেবে প্রতি হাজারে জন্মের হার দাঁড়াবে ৯টি। আর প্রতি দম্পতির দুটী করে সন্তান হলে হাজারে দাঁড়াবে ১৭টি করে এবং তিনটী করে সন্তান হলে প্রতি হাজারে দাঁড়াবে ২৫টী করে। কাজেই প্রতিটি পরিবারকে মনে রাখতে হবে সমষ্টিগত সমাজের কথা। একটি ছোট ঘরে গুতোগুতি করে বসবাস করলে দেহের স্বাস্থ্য মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। বহু সন্তান প্রসবের দরুণ মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। দিনরাত পরিবারে খিটমিট অশান্তি চলতে থাকে। মা বাবার অশান্তি সন্তানের পক্ষে বড়ই গ্লানিকর ব্যাপার। মা বাবা থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি তাদের ঘৃণা এসে যায়। তারা সুস্থ নাগরিক না হয়ে সমাজবিরোধী হয়ে সমাজের ঘৃণার পাত্র হয়ে দেশের ও দশের বহু অনিষ্টের কারণ হয়। এইভাবে প্রতিটি পরিবারকে মনে রাখতে হবে শিশুসংখ্যা বৃদ্ধি করে তারা নিজের ও দেশের কতটা ক্ষতি করেছেন। ছোট পরিবার হলে, পরিবারের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল, অর্থনীতির ক্ষেত্রে মঙ্গল শুধু মা বাবার নয় শিশুর পক্ষেও যে কতটা মঙ্গল হয় সেটিও বুঝে দেখা উচিত। আগের দিনে একান্নভুক্ত পরিবারে পরস্পরকে সাহায্য করবার কেউ না কেউ থাকতো। মাতৃপিতৃহীন শিশুকে পালন করা, রোগীর সেবা করবার জন্যও নানাভাবে অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত। যুক্ত পরিবারের উপার্জিত অর্থ সবাই মিলেমিশে ব্যবহার করতো সেই অর্থ ছিল সবাই-এর অধিকারে। কিন্তু এখন আর যুক্ত পরিবার প্রায় নেই। সহরে অর্থোপার্জনের জন্য এসে ছোট ছোট ঘরে বাস করতে হয়; সীমিত অর্জিত আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারকে অনেক অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়—সেই ক্ষেত্রে ছোট পরিবার হলো সুখী পরিবার—এতে বিবাহিত জীবন সুখের হয় ও ছেলে মেয়েরাও শান্তিতে থাকে। পরিবার পরিকল্পনার সাহায্যে নিজের আয় অনুযায়ী চালিয়ে নিলে সংসারের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। *

---

* প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, গভঃ অফ ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে।

Regd. No. C-384 ● CHHANDITA ● May-June '70 ● ·40 P.

নিয়মাবলী

- ছান্দিতা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।
- প্রতি ইংরাজী মাসের ২০ তারিখে প্রকাশিত হয় (বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহ)।
- বার্ষিক সডাক ৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যার মূল্য ·৪০ পয়সা।
- বছরের যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায় বৈশাখ থেকে বর্ষ সুরু (ইংরাজী এপ্রিল)।
- গ্রাহক গ্রাহিকাদের উচ্চমানের লেখা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

প্রয়োজন বোধে লেখা সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত না হলে গ্রহণ করা হয় না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট সমেত লেখা পাঠাতে হয়। পত্রালাপের জন্য সব সময়ই উপযুক্ত ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

- দশ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সি জমা প্রতি সংখ্যার জন্য ১৫% কমিশন বাদে ৪ টাকা অগ্রিম দিতে হয়
- কমিশন বাদে ভি, পি, পি যোগে কাগজ পাঠানো হয়। ডাক খরচ এজেন্টকে দেয় দিতে হয় না।

গ্রাহক চাঁদা গ্রহণ করা হচ্ছে

গৌরগোপাল দাস কর্তৃক বি-২৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮ হইতে [illegible]
[illegible] কর্তৃক ২৮ নং পী ষ্ট্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা-৩১ হইতে মুদ্রিত

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

বৈশাখ ১৩৭৭

যুগ্ম সম্পাদক
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরগোপাল দাশ

এ সংখ্যায় আরো যাঁদের লেখাপ্রকাশের প্রতিশ্রুতি ছিল অনিবার্য কারণবশতঃ তাঁদের লেখা প্রকাশ করতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত। এ সংখ্যায় 'পুস্তক সমালোচনা' বিভাগটি প্রকাশিত হল না, আগামী সংখ্যা থেকে আবাব নিয়মিত প্রকাশিত হবে। যুঃ সঃ

সম্পাদকীয়

"হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে।"

চৈত্র অবসান ও রুদ্র বৈশাখের কঠোর কঠিন দিনগুলি নিয়ে এল শুভ নতুন বৎসরের বারতা। নতুনের এই শুভ লগ্নে আমরা আমাদের পরম প্রিয় পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে আমাদের প্রীতি ও শুভ কামনা জানাই। বৎসরটি সকলের সুখ সমৃদ্ধি আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠুক।

গত সংখ্যায় আমরা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমাদের চরম দৈন্যের কথা লিখেছিলাম। আমাদের সেই সহজ সরল স্বীকৃতির আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। এই অভূতপূর্ব সাড়াতে আমরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করছি।

এ সংখ্যায় রুশ সাহিত্যের একটি ছোট গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করা হ'ল। অনুবাদ করেছেন ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির প্রাক্তন সদস্য শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। মূল রুশ ভাষা থেকে এই সর্ব প্রথম একটি গল্প আমরা প্রকাশ করলাম। ভবিষ্যতে আরও করবো।

এ সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা লিখেছেন সর্বশ্রী গোপাল ভৌমিক, জয়ন্তী সেন, উষা ভট্টাচার্য এবং রবীন সুর।

নাটকের উপরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হ'ল। এটি লিখেছেন নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা শ্রীসুরেশ হালদার।

এ সংখ্যার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হ'ল শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত গুপী গায়েন বাঘা বায়েন খ্যাত নেপথ্য শিল্পী শ্রীঅনুপ কুমার ঘোষালের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির একটি সাক্ষাৎকার। এবার থেকে প্রতি সংখ্যাতেই শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীদের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

অভিনয়ে যান্ত্রিকতা

সুরেশ হালদার

অভিনয় বলতে আমরা বুঝি 'হৃদগতভাবাদীন্ প্রকাশয়তি' অর্থাৎ মানুষের হৃদয়স্থিত ভাবভঙ্গী, লোভক্রোধাদির শারীরিক চেষ্টা লোক চক্ষুর সমক্ষে উপস্থাপিত করা। এবং 'ভবেদভিনয়োবস্থানুকারঃ' অর্থাৎ অনুকরণের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা। সামাজিক মানুষের জীবন ও কার্যকলাপ অনুকরণ করে হৃদয়ের সঞ্চিত ভাবভঙ্গী প্রকাশের জন্য আমাদের মানসিক বৃত্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করতে হয়। মানুষ এককভাবে জীবনযাপন না করে সমাজবদ্ধ জীবরূপে বাস করে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় সামাজিক মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুরূপ কার্য সম্পাদন করবার চেষ্টা করে। এই অনুরূপ কার্য সম্পাদন করতে অভিনেতা অনুকরণের আশ্রয় গ্রহণ করে সত্য, কিন্তু এই অনুকরণের পেছনে মানসিক প্রবৃত্তির অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ যুক্ত থাকে।

প্রথমত হৃদগত ভাবের অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্য অভিনেতা নিজের মনস্থিত আবেগের যেমন সাহায্য প্রত্যাশা করে তেমন সহজাত-প্রবৃত্তিগুলোও সমসূত্রে কাজ করে। এই আবেগ জাগানর ক্ষেত্রে সাধারণত একটা উদ্দীপক বস্তু বা বিষয়ের কল্পনা করা হয় এবং মানসদৃষ্টিতে সেই কাল্পনিক উদ্দীপক বস্তু দর্শনে শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তা অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু অভিনেতার কাজ হ'ল সেই আবেগ দমন করা এবং যথাযথ প্রয়োগের জন্য সচেতন থাকা। অভিনেতার মনে সর্বদা একটি সৃজন প্রয়াস কাজ করে এবং তার সমস্ত অভিজ্ঞতার ফসল স্বরূপ অনুকার্য বিষয় সামাজিকবর্গ অর্থাৎ শ্রোতা দর্শকের সমক্ষে উপস্থাপিত হয়। অভিনেতা যে চরিত্রের রূপদান করবেন তাঁকে সেই চরিত্রের সম্পর্কে ভাবতে হবে যে আমি সেই'—'সোহস্মীতি মনসা স্মরণ'। যাঁর মনে ঐ চিন্তার অভাব তিনি সৃজনশীল অভিনেতা হতে পারেন না। তাঁর অনুকরণ কাজ তখন যান্ত্রিক হ'য়ে ওঠে অর্থাৎ সচেতনভাবে বাচিক, আঙ্গিক ও আহার্য্য অভিনয় করতে অসমর্থ হন। সাত্ত্বিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার অবকাশ থাকে না কারণ সত্ত্ব সত্ত্বত অভিনয়ে মনের ক্রিয়াই প্রাধান্য লাভ করে।

সার্ত্ত্বিক অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য ত্রিবিধ অভিনয়ে মন সক্রিয় থাকলে অভিনয়ে কিছুটা স্বাভাবিক অনুরূপ হ'য়ে ওঠে। অভিনেতার মানস চিন্তায় সহানুভূতির সাহায্যে অপরের ভয়ভাবনা, সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হয়। সহানুভূতির কাজ প্রক্ষোভ ও আবেগের সঙ্গে সমীভবনের মাধ্যমে সম্ভব। অপর পক্ষে অভিভাবন দ্বারা অপরের চিন্তা, ভাবধারা প্রভৃতি নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলে অভিনেতার চরিত্র বিকাশে কৃত্রিমতা স্বাভাবিক-প্রকাশের মত হয়ে ওঠে। এই অভিভাবন অভিনেতার মনন কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে। সবশেষে সামগ্রিকভাবে অনুকরণের সাহায্যে অপরের ক্রিয়াকলাপ নিজের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে হয়। অভিনেতা সমাজ জীবন থেকে অন্ধ অনুকরণের সাহায্যে আত্মসচেতন অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন এবং এই আত্মসচেতন অনুকরণ শেষ পর্যন্ত জটিলতর হয়ে একটা শিল্পের বস্তু গড়ে তোলার পক্ষে সহায়করূপে কাজ করে। প্রাথমিক পর্যায়ের অন্ধ অনুকরণ প্রক্রিয়াকে আমরা যান্ত্রিক অনুকরণ আখ্যা দিতে পারি। কেবল-মাত্র যথাযথ অনুকরণ ও তার প্রকাশ শিল্প আখ্যা পেতে পারে না। কারণ শিল্প হ'ল পুনরুদ্‌পাদন (Art is reproduction), মনীষি Aristotle এর কথায় Real না হয়ে as if real হবে। এক্ষেত্রে আমরা অভিনেতার মধ্যে সেই পুনরুদ্‌পাদনের কাজ দেখতে পাই না। অতএব অভিনেতা সেখানে কেবলমাত্র যান্ত্রিক অনুকরণ করেই ক্ষান্ত হলেন, তাঁর সহানুভূতি, অনুভাবন ও অনুকরণ একই সঙ্গে সমীভূত হয়ে কাজ করতে অক্ষম। সামাজিকবর্গের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে ব্যবধান থেকে যায় এবং অভিনেতার অভিনয় কাজ বাস্তবের মত না হয়ে কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

অনুকরণ ব্যতীত যেমন সহানুভূতি ও অনুভাবন সম্ভব নয় তেমন ঐ ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন না করে অভিনেতার পক্ষে অভিনয় করাও সম্ভব নয়। অভি-নেতার প্রাথমিক কাজ হ'ল সমাজজীবনের কোন চরিত্রের অনুরূপ নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে এক ভাবনার অনুকরণ করা। এই অনুকরণ কাজের জন্য অভিনেতা দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করতে পারেন—তাকে সাধারণত আমরা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ বলতে পারি। প্রথম পর্যায়ে মানসিক স্তরের অবেদন ব্যতীত বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গী, স্বরক্ষেপ, শারীরিক রূপান্তর, অনমনীয় ভাব ও ধারার আরোপ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার সাহায্য নিয়ে অভিনয় করা অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে জোর করে ধাক্কা দিয়ে যাওয়া ; কোন বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক

পথে অগ্রসর না হয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুরূপ রূপ সৃষ্টির চেষ্টা করা। বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ও পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে যথাযথ অনুকরণ করা হ'লে রাজার পোষাক সংগ্রহ করলে, এবং অনুরূপ কোন চরিত্রের অভিনয়ে যথাযথ কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ ইত্যাদি করলে,—অশোভন ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। সামাজিক চরিত্র অভিনয় করতে কণ্ঠস্বরের মধ্যে যথাযথ শব্দের উচ্চারণ রীতি বা অবিকল সাধারণ মানুষের কথা বললে আমরা সহজে গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের রসাবেদন ব্যাহত হয়; কারণ বাস্তবের চরিত্র দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত, তার যথাযথ রূপ দেখার জন্য মঞ্চে বা প্রেক্ষাগৃহে আসার প্রয়োজন হয় না। আমরা মঞ্চের উপর অভিনেতার মায়াসৃষ্টির কৌশল দেখে আনন্দ পাই; অতএব অভিনেতা মায়াসৃষ্টি করতে অসমর্থ হ'য়ে আমাদের আনন্দরস গ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়। অভিনেতা যদি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে চরিত্র রূপায়ণ করতে না পারেন; তিনি যদি শিল্পের ধার না ধারেন,—কেবল বাস্তবকে মঞ্চে তুলে ধরতে চান তাহলে সেটা নিছক প্রাণহীন চেতন বস্তুর মত মনে হয় যেন ব্যাঙ নাচায় অধ্যাপকের মত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মরা ব্যাঙকে নাচানর মত মনে হয় অর্থাৎ সেখানে অভিনয় হয় নিষ্প্রাণ। অভিনেতা এরূপ অভিনয়ে যান্ত্রিকতার মাত্রা বাড়িয়ে যাদু সৃষ্টি করতে যতই কৌশল আরোপ করতে চেষ্টা করুন না কেন তা অসংলগ্ন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরূপ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অভিনয় ক্রিয়াকে সম্পাদন করে সমীকরণ করার চেষ্টা মানে অভিনেতাকে দেখে মনে হয় 'A warm heart and a cool head' অভিনেতার অভিব্যক্তির মধ্যে মনে হয় আবেগের স্তরে পৌঁছানোর পূবে তা ব্যক্ত হচ্ছে। তিনি নিজের চেতন মনের মধ্যে বিষয়ীকৃত চরিত্র বা বস্তুর স্থান গৌণ করতে চাইছেন। অভিনেতা মনকে ফাঁকি দিয়ে হৃদয়কে গৌণ রেখে প্রাণের উজ্জ্বল তরঙ্গে ভেসে যেতে চাইছেন। সাগরের তলার মণিমানিক্যের সন্ধান না নিয়ে ওপরের তরঙ্গের চাঞ্চল্য দিয়ে মন ভোলাবার চেষ্টা করছেন। ফলত স্বরের মধ্যে কৃত্রিমতা, অভিনয়ে একটা যান্ত্রিকতার ভাব ফুটে উঠছে। অনুকৃত বস্তু অভিনেতার প্রাকৃচেতনে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই অর্ধপথ থেকে বাধা পেয়ে ফিরে আসছে। তখন অভিনেতা আপন সত্তা ও চরিত্রের সত্তার পার্থক্য বিচারে অসমর্থ হ'য়ে পড়ছেন এবং সার্বিক সাফল্যের পথে অভিনয় হ'য়ে উঠছে যান্ত্রিক।

শিশু ও কল্পনা

পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব মনে কল্পনার রঙ লেগেছে ছোট থেকে। মানব শিশুর জগৎ হল তার কল্পনার জগৎ। শিশু তার শৈশব থেকেই বড়দের অনুকরণ করে চলে। তাকে যখন খেলনা দেওয়া হয়, সেই খেলনা নিয়ে সে মেতে ওঠে। মাটির পুতুলের সঙ্গে সে মায়ের ভূমিকা করে। খেলাঘরে সে হয়ে ওঠে কর্ত্তা। ঠাকুমা দিদিমার কাছে শোনা রূপকথার রেশ টেনে নিজেকে পাঠিয়ে দেয় অজানার উদ্দেশ্যে। কল্পনায় মনকে উদার উন্মুক্ত করে তুলতে সাহায্য করে। কোন এক সাহিত্যিকের জীবনীতে পড়েছিলাম ছোট বয়সে অনবরত মিথ্যা বলতেন। পরবর্ত্তীকালে সেইগুলি গল্পের আকারে দেখা দিল। সুতরাং শিশুর মনের কল্পনা বিকাশে কখনও বাধা দিতে নেই। অবশ্য অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণতা শিশুর মনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। তাই জন্য বলা হয় শিশু যখন কোন একটি বর্ণনা করবে তখনই তাকে বলা উচিত তুমি এটা লেখ। ঘটনার টুকরো টুকরো বর্ণনা যদি সে লিখতে থাকে তাহলে তার লেখার মধ্যে বৈচিত্র্য আসবে। লেখার প্রতি অনুরাগ জন্মাবে এবং হয়তো বা দেখা যাবে সে ধীরে ধীরে লেখার প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে মিথ্যা বলা বন্ধ করে দেবে। সাধারণত অবহেলিত অনাদৃত শিশুরা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অনেক শিশু নিজেকে প্রকট করার জন্যও ছলনার আশ্রয় নেয়। অবহেলিত শিশুও সমাজের একটি দুষ্ট ক্ষত। এদের প্রতি প্রথম থেকে নজর না দিলে এরা ক্রমশ: খারাপ পথেই যেতে থাকবে। অতিবুদ্ধিমান শিশুদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তাদের বুদ্ধিটাকে নষ্ট করার সুযোগ আসে সহজেই। কিন্তু ভাল পথে নিতে পারার সুযোগ কম আসে। প্রসঙ্গত: দুটি শিশুর উদাহরণ দিয়ে আজ আমি শেষ করব ; একটি সাড়ে তিন বছরের শিশুর বাড়ীতে তার পিসতুতো বোনের ঠাকুমা বেড়াতে এসেছেন। বাড়ীর সবাই একটু ব্যস্ত। বাচ্চাটি তখন বলল—আসুন আপনার সঙ্গে আমি একটু গল্প করি। এবং গল্প সুরু করল ঠিক সেই ধরণের যাতে দু'জনেরই মন আকৃষ্ট হয়। যেমন—আপনাদের বাড়ীটা কতটা এগোল ? আমাদেরটা তো

শেষ হবার পথে প্রভৃতি। এখানে লক্ষণীয় একজন অতিথির সঙ্গে কোন্ ধরণের কথা বললে তাকে আকৃষ্ট করা যায় ও সম্বোধনের গুরুত্ব। এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা সহজেই বেপথে যায় এবং ভাল হলে ভীষণ ভাল হয়। এবার যাদের কথা বলা হচ্ছে তাদের ঘটনা যদিও অনেক দিন আগে ঘটেছিল তবুও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে বুদ্ধিটুকু সৎপথে না নিতে পারার জন্য আজ তারা ভীষণভাবে অবহেলিত। একটি চার বছরের বোন ও পাঁচ বছরের ভাই একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করল তাদের কেউ ভালবাসে না— সুতরাং পালাতে হবে। মার বাক্স থেকে টাকা নিয়ে তারা স্কুলের টিফিনের সময় লজেন্স খাবার নাম করে বাইরে গিয়ে পালায়। একটা রিক্সা করে সোজা হাওড়া ষ্টেশন। সেখানে গিয়ে ঠিক করল হাজারিবাগে মামার বাড়ী যাবে। হাজারিবাগের টিকিট চাইতে কাউন্টার বলল সন্ধ্যে বেলায় ট্রেন। তোমরা অপেক্ষা কর। টিকিট কালেকটার নজর রাখলেন। টাকাও তিনি নিয়ে নিলেন। বিকেল বেলায় খিদে পেলে তারা কেঁদে ফেলল। ক্রমশঃ পরস্পরকে দোষারোপ করে রিক্সায় আবার উঠে সোজা বাড়ী। বাড়ীর নম্বরও জানেনা। রিক্সাওয়ালাকে বলেছে ল্যান্সডাউন রোডে অমুক জায়গায় চল তাহলে বাড়ী খুঁজে পাব। বাড়ীতে কান্নাকাটি। থানা, পুলিস—তারা জানল হাওড়া থেকে খবর! নেহাৎ বাইশ বছর আগের ঘটনা বলেই বাচ্চাদুটি রক্ষা পেল। নতুবা প্রাণ নিয়ে ফেরা দায় হত। পরবর্ত্তীকালে শিশু দুটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং বলা যায় কল্পনা ভাল কিন্তু লাগামছাড়া কল্পনাকে ধরতে নেই।

সাম্পদকীয় দপ্তর
বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮

সকল প্রকার যোগাযোগের জন্য উপরের ঠিকানায় লিখতে হয়।

– ছন্দিতা

অনুবাদ গল্প

ঝিনুক

ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে একটি ছোট্ট সহর। মারিয়া মিখাইলাভ্‌না মিয়েল্‌নিকাভা ও তাঁর পুত্রবধু লিদিয়া ক্‌সিয়েভালাদাভ্‌না এই সহরে থাকেন। লিদিয়া এখানকার আঞ্চলিক যাদুঘরে চাকরী করেন। বাড়ীতে এই দুই মহিলা ছাড়া অন্য কেউ থাকেন না। মারিয়া মিখাইলাভ্‌নার একমাত্র পুত্র আলেক্‌সেই যুদ্ধে মারা যান। সে সময় লিদিয়ার বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বছর। এর পর দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেছে, লিদিয়া ক্‌সিয়েভালাদাভ্‌নার চুলে বেশ পাক ধরে গেছে। প্রতি সন্ধ্যায় এই দুই পক্ককেশা রমণী বারান্দায় বসে সমুদ্রের শোভা দেখেন।

বারান্দা থেকে সমুদ্রকে স্পষ্টই দেখা যায়—কখন শান্ত নীল কখন সুউচ্চ কৃষ্ণ তরঙ্গে কল্লোলিত।

লিদিয়া ক্‌সিয়েভালাদাভ্‌না বাসে করেই নিয়মিত যাদুঘরে যাতায়াত করতেন।

—তারপর, আজকের খবর কি? —মারিয়া মিখাইলাভ্‌না জিজ্ঞাসা করতেন তার অফিস প্রত্যাগতা পুত্রবধু লিদিয়াকে।

—অনেক দর্শক এসেছিলেন, — লিদিয়া ক্‌সিয়েভালাদাভ্‌না ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিতেন।

তারপর তারা রাত্রির আহার সারতেন ও এরপর মারিয়া মিখাইলাভ্‌না বিশ্রাম করতেন। লিদিয়া হয় কিছু পড়াশুনা করতেন বা বসে বসে কিছু ভাবতেন। কিন্তু মারিয়া মিখাইলাভ্‌না সর্ব্বদাই জানতেন তাঁর পুত্রবধু লিদিয়ার চিন্তার বিষয়বস্তু কি।

সকালে মারিয়া মিখাইলাভ্‌না বাজার করতে বেরোতেন। ফেরার সময় বাজারভর্তি ভারী থলে নিয়ে পাহাড়ী চড়াই পথে উঠতে হতো। একদিন যখন মারিয়া মিখাইলাভ্‌না বাজার থেকে ফিরছিলেন, রাস্তায় একটি বছর দশেকের ছেলেকে দেখতে পেলেন। ছেলেটার কাঁধে একটি থলে ঝোলানো

ছিল আর হাতে ছিল ভূ-তাত্ত্বিকের হাতুড়ি। ছেলেটি হঠাৎ থেমে গেল, কি যেন একটা পাথর কুড়িয়ে ছোট্ট হাতুড়িটা দিয়ে ঠুকতে লাগল। মারিয়া মিখাইলাভ্‌নাও হঠাৎ থেমে গেলেন, তাঁর বুকের ভিতরটা এত জোড়ে ধরাস ধরাস করে উঠল যে তাঁর পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়া অসুবিধা হতে লাগল। তাঁর ছেলে ছোটবেলা থেকেই ভূ-তাত্ত্বিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। ওর বাবা ওকে একটা ভূ-তাত্ত্বিকের হাতুড়ি কিনে দিয়েছিলেন আর তিনি নিজে একটা ঝোলা সেলাই করে দিয়েছিলেন। আলেকসেই সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে থলে ভর্ত্তি পাথর নিয়ে আসতো। এখনও বাড়ীতে লেখার টেবিলের উপর রাখা আছে তাঁর ছেলের হাতুড়িটা আর তার সংগ্রহ করা পাথরগুলি.........

তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন কিভাবে ছেলেটা পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—তুমি হয়ত বড় হয়ে ভূ-তাত্ত্বিক হতে চাও, তাই না? —তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যা, কোনও একদিন হব নিশ্চয়ই,—বেশ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ছেলেটি উত্তর দিল।

—আমার ছেলেও ভূ-তাত্ত্বিক ছিল,—মারিয়া মিখাইলাভ্‌না বললেন। —সে যুদ্ধে মারা গেছে। ওর সংগ্রহ করা পাথরগুলি সবই আমাদের কাছে আছে। আমরা এ সহরে অনেকদিন ধরে আছি। কিন্তু তুমি হয়ত এ সহরে সম্প্রতি এসেছো?

—হ্যা, তবে আজকাল আমি এখানেই থাকি।। এর আগে অবশ্য মার কাছে এসেছিলাম।

ছেলেটার কাল কাল চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। যে মার ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে সম্ভবতঃ সে তার মনোভাব বুঝতে পারল।

—মা আর বাবা এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরী করতেন। আচ্ছা, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? —ছেলেটা বলল। মারিয়া মিখাই-লাভ্‌নার ভারী থলিটি নিয়ে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

—তোমার নাম কি?—মারিয়া মিখাইলাভ্‌না জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভাসিয়া ঝুধিনাভ্।

ছেলেটি বলতে থাকে, ওর মা বাবা মারা গেছেন। আর যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওঁরা চাকরী করতেন সেখানকার বড় ডাক্তার ওকে কিছুদিন সেখানে থাকতে

অনুমতি দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা মারিয়া মিখাইলাভ্‌নার বাড়ীর কাছে এসে পরতে তিনি বললেন—

—আমাদের বাড়ীতে এসো। আমার ছেলের সংগ্রহগুলি দেখতে পাবে।

—আসব, —ছেলেটি উত্তর দেয়, —কিন্তু কখন আসতে পারি বলুন তো?

তিনি তখনই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন,—সবসময়, ভাসিয়া, যে কোন সময়। তোমাকে ঠিক যেন আমার ছেলের মতন দেখতে। এর পর চিন্তা করে বললেন,—কাল সন্ধ্যা ছটার সময় এসো। কেননা, এই সময়ের মধ্যে লিদিয়া বাড়ীতে এসে পড়বেন এবং এই ছেলেটিকে সম্ভবতঃ তাঁর ভালই লাগবে।

সেদিন সন্ধ্যায় মারিয়া মিখাইলাভ্‌না ছেলেটির বিষয় লিদিয়াকে বললেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর লিদিয়া ফ্‌সিয়েভোলাদাভ্‌না আর কাউকে ভালবাসেন নি। উনি আসলে আর কাউকে ভালবাসতে চান নি। আলেকসেইর সঙ্গে উনি মাত্র দু বছর সংসার করেছিলেন কিন্তু উনি এরকম লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁরা জীবনে একবারই মাত্র ভালবাসে।

এর পরের দিন সারা সময়টা মারিয়া মিখাইলাভ্‌না নিজের ছেলের চিন্তায় মশগুল থাকলেন— কিভাবে সে পাহাড়ে উঠত, কি করে পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে বাড়ী ফিরত আর ছেলে কথা না শুনলে তিনি কি রকম অসন্তুষ্ট হতেন। .... এই দিনই ঠিক সন্ধ্যা ছটার সময় ভাসিয়া গ্রদীনাভ্‌ এসে হাজির হল।

মারিয়া মিখাইলাভ্‌না ওকে তাঁর ছেলের ঘরে নিয়ে আসলেন। আলেক্‌সেই পাথরগুলিকে যেভাবে সাজিয়ে রেখেছিল সেইভাবেই ছিল।

—যখন আমি বড় হব, নিশ্চয়ই তখন বড়গোছের খোঁজে বের হব—ছেলেটি বলল। —কিছু একটা আবিষ্কার করা কি মজার!

—তুমি নিশ্চয়ই কিছু একটা আবিষ্কার করবে। —মারিয়া মিখাইলাভ্‌না বললেন। —জীবনে একজনের পক্ষে কত কিছু আবিষ্কারের বিষয় থাকতে পারে— একজন ভাল লোককে খুঁজে পাওয়া—একটা আবিষ্কার, একজন মহৎ লোককে খুঁজে পাওয়া সেটাও একটা আবিষ্কার। সুতরাং তোমার সামনে আবিষ্কার করার মত অনেক কিছুই পড়ে আছে।

মনের দুঃখ চাপতে চাপতে উনি দেখলেন কিভাবে ভাসিয়া পাথরগুলির উপর দিয়ে চোখ বুলাচ্ছে। উনি ভাবতে লাগলেন যে তাঁর আলেকসেইর

এ রকম একটী ছেলে থাকতে পারতো। কি দুঃখের বিষয়, এখন তাঁর একটি নাতী নেই। ....

এর মধ্যে লিদিয়া ক্‌সিয়েভালাদাভ্‌না এসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা একত্রে খেতে বসলেন।

—দেখুন, আপনাদের যাদুঘরে আমি কখনও যাই নি,—ভাসিয়া বলল।

—কিন্তু কেন? —লিদিয়া উত্তর দিলেন। তাঁর স্বর অন্যান্য দিনের মত ক্লান্ত লাগছিল না। —চলে এসো। আমাদের ওখানে অনেক কিছু দেখার আছে।

মারিয়া মিখাইলাভ্‌না মাংস ও পাউরুটী কাটতে কাটতে নিজের মনে চিন্তা করছিলেন— হতে পারে যে লিদিয়া পর্য্যন্ত কল্পনা করছেন যে তাঁরও এ রকম একটি ছেলে থাকতে পারতো। সেই একমাত্র ব্যক্তির সন্তান যাঁকে সে ভালবেসেছিল।—মারিয়া মিখাইলাভ্‌না, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আপনার জন্য রোজই আমি বাজারে অপেক্ষা করব।—প্রস্তাব করে ছেলেটি।—

—আজকাল আমার ছুটি আছে, আর এছাড়া আমি রাস্তাতেই পাথর খুঁজে বেড়াই।

—বেশ,—মারিয়া মিখাইলাভ্‌না রাজী হলেন। —তুমি বাজারে আমার জন্য অপেক্ষা করো আর রাস্তায় যেতে যেতে আমরা নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলব।

—আর আপনি যদি চান তবে আপনার সংগ্রহের জন্য কিছু পাথর নিয়ে আসব। যে সব পাথর আপনার কাছে নেই, সেগুলিই আনতে চেষ্টা করব। —এটা খারাপ হবে না। —মারিয়া মিখাইলাভ্‌না অনুমোদনের স্বরে বললেন।

আর লিদিয়া হঠাৎ বলে উঠলেন,—কাল সোমবার, আমাদের যাদুঘর বন্ধ। পরশু সকাল দশটায় বাসষ্টপে এসে দাঁড়িও, আমি নিজে সঙ্গে করে তোমাকে নিয়ে যাব। এই সহরে থাকো অথচ যাদুঘর এখনো দেখনি—এটা ঠিক নয়!

লিদিয়া এতগুলি কথা বললেন, এটাও অস্বাভাবিক—উনি ছিলেন নীরব প্রকৃতির আর মারিয়া মিখাইলাভ্‌নাও এতে অভ্যস্তা হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের ভিতরেও ওঁরা খুব কমই কথাবার্ত্তা বলতেন।

—বেশ ভাল হবে;—ছেলেটি বলল।

—পরশু দশটার সময় আমি আসব। যাদুঘরে পাথর আছে?

—আমাদের ঐ অঞ্চলে যে সব পাথর পাওয়া যায়, সেগুলি আছে।

মঙ্গলবার ভাসিয়া ঠিক দশটায় চলে আসল। লিদিয়া ফসিয়েভালাদাভ্না তাকে সঙ্গে করে যাদুঘরে আসলেন। যাদুঘরে লিদিয়া ছেলেটিকে পাশে নিয়ে চলতে লাগলেন। পক্ককেশা দীর্ঘদেহা-সৌন্দর্য্যময়ী রমনী কিন্তু মুখমণ্ডলে রয়েছে একটি দুঃখের ছায়া। তিনি ঘুরে ঘুরে ছেলেটিকে বিভিন্ন রকমের পাথর দেখালেন।

এরপর তিনি ছেলেটিকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে আইসক্রীম খাওয়ালেন।

—কাল আবার আমাদের বাড়ীতে এসো,—লিদিয়া ফসিয়েভালাদাভ্না বললেন ফেরার সময় বাস থেকে নামতে নামতে। —ছ'টার মধ্যেই আমি বাড়ী ফিরে আসি।

—আসব। আমি আপনাদের বাড়ীতে আজকাল প্রায়ই আসব যতদিন না আপনারা বিরক্ত হন।

ভাসিয়া হাসিমুখেই কথাটা বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলতে গিয়ে গলার স্বরটা কি রকম ভারী ভারী হয়ে গেল। কিন্তু কেন যে এরকমটা হল সেটা সে নিজেও বুঝতে পারল না।

এর পরের দিন ভাসিয়া আবার এলো ওঁদের বাড়ীতে।

—আপনার সংগ্রহের ভিতর সবুজ চাল্‌সিদনু পাথর নেই…… আমি একটা টুকরো খুঁজে পেয়েছি, অবশ্য আমার কাছে আরো একটি আছে।

…সত্যিই তো! চমৎকার একটি সবুজ চাল্‌সিদনু পাথর, —মারিয়া মিখাইলাভ্না বললেন। উনি পাথরের ব্যাপারে কিছুই বুঝতেন না। কিন্তু সে যাই হোক, পাথরটি তিনি তাঁর ছেলের পাথরগুলির পাশে রেখে দিলেন।

– আমি আরো কিছু নিয়ে আসব। আমি এখন থেকে প্রায়ই কিছু না কিছু নিয়ে আসব যতক্ষণ না আপনারা বিরক্ত হন,—ছেলেটি বলল আর কেন যেন বলতে গিয়ে তাকে বিষন্ন দেখাল।

—কেন আমরা বিরক্ত হব? —মারিয়া মিখাইলাভ্না জিজ্ঞাসা করলেন।

—তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর, আমি কেবল আনন্দিতই হব। যে রকম, আমি বসে বসে রান্না করব, আর তুমি বসে বসে আমাকে পাথরের গল্প শোনাবে।

—কিন্তু এখনো আমি পাথরের বিষয়ে সব কিছু জানি না,—বিনয়ের সঙ্গে ছেলেটি বলল,—তবে হ্যাঁ, অল্প বিস্তর একটু জানি।

—সেই যেটুকু জান তাই বলবে। ছেলেটি গল্প বলতে শুরু করল, মারিয়া মিখাইলাভ্না এক প্লেট পাকা ষ্ট্র বেরী ফল রেখে দিলেন ছেলেটির সামনে। ছেলেটি ফলগুলির দিকে চোখ রেখে একটু চিন্তা করে বলল :

—আমি আপনাদের কাছে আসব কিন্তু দয়া করে প্রত্যেকবারে কিছু খাবার কথা বলবেন না। এ রকম হলে আপনি হয়ত ভাববেন আমি এরজন্যই আপনার কাছে আসি।

—না, আমি এ রকম ভাবব না,—মারিয়া মিখাইলাভ্না উত্তর দিলেন। ফলগুলি খেয়ে নেও আর আজে বাজে বকো না। আর এসো নিশ্চয়ই। এতে লিদিয়া ফ্সিয়েভোলাদাভ্না খুসী হবেন। যাদুঘরে কত লোকের মেলা আর বাড়ীতে উনি একলা। বাড়ীতে একজন মনমত সঙ্গী পেলে উনি আনন্দ পান।

একদিন লিদিয়া ফ্সিয়েভোলাদাভ্না অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেন বই হাতে নিয়ে।

—পাথরের বিষয়ে এটা একটি চমৎকার বই, —বললেন তিনি।

কিন্তু তিনি জানালেন না কার জন্য বইটি কিনেছেন আর মারিয়া মিখাই-লাভ্নাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

এর পরের দিন সারাটা সময় ভাসিয়া রান্নাঘরে বসে বসে পাথরের গল্প করল, আর সন্ধ্যার দিকে বাসের আওয়াজ শুনতেই প্রায় দৌড়ে লিদিয়া ফ্সিয়েভোলাদাভ্নার সঙ্গে দেখা করতে গেল। মারিয়া মিখাইলাভ্না দেখলেন যে লিদিয়া, যে প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে চুপচাপ থাকতেন, বেশ হাসিখুসী মেজাজে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছেন।

—এই বইটি আমি তোমার জন্য কিনেছি। পাথরের ব্যাপারে যা জানা দরকার সবই এর ভিতর আছে।

ভাসিয়া আজকাল সর্ব্বদাই বাজারে গিয়ে মারিয়া মিখাইলাভ্নার সঙ্গে দেখা করে আর বাজারের থলিটি বয়ে নিয়ে আসে। দুবার সে লিদিয়ার সঙ্গে যাদুঘর দেখতে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার যাদুঘর দেখে ওরা সহরে ঘুরে বেরাল, আইসক্রীম্ খেলো ও এক সঙ্গে বাসে করে ফিরল।

সময় কেটে যায়, ছেলেটি এতদিনে এ বাড়ীতে আসা যাওয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সেই বাড়ীটি যেখানে দুই মহিলা একান্তে বাস করেন। মারিয়া

মিখাইলাভ্না ও লিদিয়া ক্সিয়েভালাদাভ্না ছেলেটিকে কিছুটা তার মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আগষ্টের শেষ। আর কিছুদিনের ভিতর স্কুল খুলবে, পড়াশুনা শুরু হবে। ছেলেটি ভাবে, তখন তো আর এ বাড়ীতে আসার সময় পাবে না।

আগষ্টের শেষের দিকে একদিন রাত্রে মারিয়া মিখাইলাভ্না কি একটা আওয়াজ শুনে জেগে উঠলেন। তিনি উঠে জানালার কাছে আসলেন। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল আর শোনা যাচ্ছিল সমুদ্রের গর্জ্জন। লিদিয়াও জেগে উঠলেন।

—হ্যা, গ্রীষ্মকালের এই শেষ। —লিদিয়া বলে উঠলেন, শীঘ্রই বর্ষাকাল আসবে। তখন আমাদের এখানে আসা যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি বললেন না কার পক্ষে এখানে আসা যাওয়া কঠিন হবে, কিন্তু মারিয়া মিখাইলাভ্না তাঁর কথা ঠিকই বুঝতে পারলেন। কেননা, তিনি নিজেও একথা চিন্তা করেছিলেন।

সকালেও বৃষ্টি চলতে থাকল। মারিয়া মিখাইলাভ্না আর বাজারে বেরুলেন না; খাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। ভাসিয়া এসে গেছে। ওর গায়ে জড়ানো মহিলাদের একটি বর্ষাতি কোট।

আপনার জন্য আমি কিছুক্ষণ বাজারে অপেক্ষা করলাম। তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে আসছি। দেখুন, আপনার জন্য কিরকম একটা ঝিনুক এনেছি। আপনার কানের কাছে ধরে তারপর শুনুন।

ভাসিয়া মারিয়া মিখাইলাভ্নার হাতে গোলাপী রঙের একটি ঝিনুক দিল। তিনি সেটাকে তাঁর কানের কাছে ধরলেন। তিনি শুনতে পেলেন ঝিনুকটার থেকে যেন সমুদ্রের গর্জ্জন ভেসে আসছে। মারিয়া মিখাইলাভ্না একটু চিন্তা করে বললেন—

—এই শীতের দিনে আমাদের আর ছাড়াছাড়ি হয়ে দরকার নেই। এতে করে তোমার এই ঝিনুকটাও তোমার কাছে থাকবে। আর হ্যা, আমিও কখনও কখনও ঝিনুকের আওয়াজ শুনতে পারব।

ভাসিয়া এর কিছু উত্তর দিল না। কিন্তু ওর মুখভাব এরকম হল যে মারিয়া মিখাইলাভ্না মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও যে টেবিলের উপর সংগৃহীত পাথরগুলি রাখা ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—এখন থেকে এটা তোমার টেবিল,—ছেলেটিকে বললেন তিনি।—আমরা এর উপর একটা ল্যাম্প রেখে দেব। শীতের দিনে তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়, ল্যাম্পের আলোয় তখন লেখাপড়া করবে! কিন্তু মার্চ্চ মাস থেকে আবার দিনের আলোয় পড়াশুনা করবে।……

তিনি টেবিলের উপর একটি ল্যাম্প রাখলেন। তার পাশে তিনি রেখে দিলেন সেই ঝিনুকটা, যার ভেতর থেকে সর্ব্বদাই ভেসে আসে সমুদ্রের

যুবতী স্বাস্থ্যবতী মার কোলে স্বাস্থ্যবান সন্তান—জগতে এর চেয়ে চিত্তাকর্ষক আর কোন বস্তু আছে কি?

—ই. তুর্গেনিভ

* রুশ লেখক ভি. লিদিনের 'রাকাভিনা' গল্পের সরাসরি বাঙলা অনুবাদ।

নিমন্ত্রণে বিয়ে বাড়ীতে

বেলা দে

আজকের দিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সত্যিই কষ্টকর—বিশেষ করে নিমন্ত্রণটা যদি সামাজিক হয়। বেশীর ভাগ জায়গাতেই যাবার ইচ্ছে থাকে না—তারপর এই প্রচণ্ড গরমের দেশ—ঝাল তরকারী—উপরোধে অতিরিক্ত আহার—বেশী রাত পর্য্যন্ত রাত জাগা—তারপর গাড়ীর অসুবিধা ত আছেই। সবচেয়ে বড় হচ্ছে উপহারের টাকার অঙ্ক। সব মিলিয়ে এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দাঁড়িয়েছে আজকাল। সব সময় অসুখের এবং কাজের অজুহাত দিয়ে কাটানো যায় না—বিশেষ বিশেষ জায়গায় যেতেই হয়।

কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা বলি শুনুন—আমার এক পিসশাশুড়ির মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। কর্তা কলকাতায় ছিলেন না, কাজেই, সমস্ত সামাজিকতা একা আমার কাঁধের ওপর দিয়েই গেল। বিশেষ যাওয়া আসা নেই অতীতে—বিয়ে হওয়ার পর গত পাঁচ বছরে দু'বার দেখা হয়েছে—খুব দূর সম্পর্কের গুরুজন—তবু সামাজিক ব্যাপারে আত্মীয়তাটা উথলে উঠেছিল—বাড়ী বয়ে পিসশাশুড়ী নিজে এসে পত্তর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—কর্তা নেই কলকাতায়—তবু ছাড়লেন না—আমি যদি না যাইও ভুল বুঝবেন সারাজীবন—কাজেই ভুল বুঝাবুঝির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে যেতে আমাকে হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যে সাতটা আন্দাজ একজন চাকরকে বাহন করে ট্যাক্সির সাহায্যে এ প্রান্তর থেকে রওনা হলাম ও প্রান্তরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে আছে একটা কানের গহনা—সামান্য হলেও কিনতে ৪৮ টাকা পড়েছে। কুটুম্ব বাড়ী, সোনা না দিলে নাকি সম্মান থাকবে না অন্ততঃ কর্তার তাই হুকুম ছিল। তারপর সেকেলে বাড়ী—সোনা ছাড়া নাকি কোনও জিনিষের দাম নেই। যাই হোক চলেছি ত চলেছি—পৌঁছতে পাক্কা ৪৫ মিনিট লাগলো—শ্যামবাজার থেকে বেহালা! শেষ পর্য্যন্ত বড় রাস্তা শেষ করে গলির পর গলি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ঠিকানা খুঁজে বার করলাম অতি আপনার কুটুম্ব বাড়ী। তাও সাধ্য হতো না

যদি না বেসুরো সানাইএর আওয়াজ কানে আসতো। দূর থেকে সেই আওয়াজ আর তেরপোল ঢাকা ছাদ দেখে গেটের সামনে হাজির হলাম। বিশেষ কাউকে চিনি না সে বাড়ীর লোকেদের তবু বিয়ে বাড়ী এবং আধুনিক মেয়ে বলে সাহস করে নেমে পড়লাম ট্যাক্সি থেকে। চাকরের হাতে দশটাকার নোটটা দিয়ে সোজা বাড়ীর অন্দরের দিকে পা বাড়ালাম।

বাড়ীর সামনে একটু ফাঁকা জায়গা ঘিরে বরযাত্রীদের বসবার জায়গা করা হয়েছে—কটা ভেনাস্তার চেয়ার ছোট ছেলেমেয়েরাই ভর্ত্তি করে রেখেছে—সবাইর হাতে ছোট ছোট ফুলের মালা আর নানা রঙের পদ্যের কাগজ—একমুখ পান সকলের—তার জের পাঞ্জাবী এবং কাপড়েও সর্ব দিচ্ছে—সমস্ত সাইজের ছেলে ও মেয়ে রয়েছে—বোঝা গেল বাড়ী শুদ্ধ সব বাড়ী থেকেই এসেছেন—মায় ঝিরাও ঘুরছে আরও ছোটগুলোকে কোলে নিয়ে মানে বাড়ীর ফটকে তালা লাগিয়ে সবাই এসেছেন আর কি। করবার কিছু নেই কারণ নিমন্ত্রণটা সপরিবারে এবং সবান্ধবে। মাঝে মাঝে যাকে যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকা হচ্ছে। বর তখনও আসে নি—বাড়ীর কর্ত্তা ব্যক্তিরা বাইরে ছোটাছুটি করছেন আর চেঁচাচ্ছেন নানা ফরমাস নিয়ে—কেউ শুনছে না কারুর কথা—কাজেই সবাইয়েরই মেজাজ গরম আর রুক্ষ। ছোট মেয়েরা শাঁখ হাতে করে বাড়ীর গেট জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বর আসার অপেক্ষায়, আসার ইঙ্গিত পেলেই ফুঁ দেওয়া সুরু করে দেবে। তখনও নাকি দই এসে পৌছায়নি। সে কথাও কানে ভেসে এলো—ছুটলো দুজন। যাই হোক অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখে সোজা ওপরে উঠে গেলাম। বাঁ দিকের একটা বড় ঘরে দেখলাম ঢালোয়া সতরঞ্চি পাতা—ঘর ভর্ত্তি নানান বয়েসের মেয়েরা বসে আছে—বুঝলাম এইটেই মেয়েদের বসবার জায়গা। তার মধ্যে কিছু ছোট ছেলেমেয়ে ঘুমুচ্ছে একপাশে—মায়েরা যাদের কাছে নেই তারা চেঁচাচ্ছে—সবাই চিৎকার করে কথা কইছে। ঘরে একটা পাখা নেই কাজেই বুঝতে পারছেন সবাইর এই অল্প সময়ের মধ্যেই মুখের প্রসাধন সব গলে শাড়ীতে পড়েছে মায় কপালের সিঁদুরের টিপ পর্য্যন্ত। একে জরীর কাপড়, তার ওপর এক গা সেকেলে গয়না—ঘরে হাওয়া নেই—লোকেদের ভীড় আর চিৎকার—সবাই ঘামছেন প্রচুর। আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইর চোখ যেন সব আমার দিকে ঘুরে গেল—সবাইর অপরিচিতা আমি—আমার সাজ পোষাক এবং গহনাও ওঁদের সঙ্গে মিলছে না—কাজেই সবাই যেন হঠাৎ চুপ করে

আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত খুব লজ্জা পেলাম। আস্তে আস্তে একটা ধার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কাউকেই চিনি না আমি—আমাকেও কেউ চেনেন না—কিছুক্ষণ বেশ রবাহূত মনে হোল নিজেকে। এমন সময় পিসীমার ছোট মেয়ে দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলো—তারও চেনা সম্ভব হোত না যদি না নিমন্ত্রণ করার দিন তার মা'র সঙ্গে আমাদের বাড়ী যেত। যাই হোক আমি যে অনিমন্ত্রিত নই সে দু'একটা কথা আমার সঙ্গে বলে ঘরের বাকী লোকদের প্রমাণ করে দিয়ে গেল। এমন সময় নিচে বর আসার আওয়াজ পেলাম—প্রায় ঘরের সবাই দৌড়লেন নীচের দিকে আগে বর দেখার জন্য। দু'একজন বুড়ী বিধবা মানুষ তারাই রইলেন ঘরে আমার সঙ্গী হয়ে। তারও কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে ঘরে এলো পিসীমার মেয়ে মানে কনে। বেশ মোটা—বয়েসও বেশ গড়িয়ে গেছে—রঙটা পেন্টে বোঝা না গেলেও শ্যাম-বর্ণেও পৌঁছতে পারেনি আন্দাজে বুঝলাম। সামনের দু'টো দাঁত অনেক চেষ্টা করেও ঠোঁট দিয়ে ঢেকে রাখতে পারছে না। বড় দু'টো কানের গহনা, মোটা হার আর মাথায় মুকুট আপনিই তার ঘাড়কে নীচু করে দিয়েছে। তারপর প্রচণ্ড গরমে মুখের পেন্ট ছোপ ধরতে সুরু করে দিয়েছে। লাল চিকচিকে বেনারসী আর মোটা বেনারসীর জামা তাকে আরও ঘামাচ্ছে। পিসেমশায়ের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ-তার গহনার আকারে ধারণ করেছে শরীরে। অনেক রাত্রে বিয়ে কাজেই মেয়েদের তাড়াও নেই। সবায়ের মুখে এককথা—'লক্ষ্মী'কে আজ বেশ দেখাচ্ছে এখন 'নারায়ণ' কেমন হয় এই যা মেয়েদের চিন্তা। বুঝলাম এই রূপবতীকে পার করতে পিসেমশাইএর সব অর্থই চলে গেল। জামাই নাকি ব্যবসাদার—দোকান আছে লোহাপট্টীতে—গত যুদ্ধে বেশ পয়সা করেছেন—ব্যবসায় ব্যস্ত ছিলেন বলে এতদিন বিয়ে করেন নি তিনি, এখন একটু মোন্দা যাচ্ছে বলে সেই ফাঁকে ছুটী পেয়ে বিয়েটা সেরে নিচ্ছেন। যাই হোক বর দেখার সখ নেই এখন খেতে দিলেই সরে পড়ি। অনেক খুঁজে পিসীমার দেখা পেয়ে গহনাটি হাতে জোর করে গুঁজে দিলুম। সেকেলে বাড়ী কাজেই সব ব্যবস্থাই সেকেলে ধরণের। আগে বরযাত্রীরা খাবেন তারপর সেই জায়গা পরিষ্কার হলে মেয়েরা বসবে। বসে আছি ত' আছিই। রাত দশটা বেজে গেল তবু খাওয়ার কথা বলে না—কারুর তাড়াও নেই, মনে হোল সবাই বোধ হয় রাত্রি:ত থাকবেন। সারা বাড়ীটা জলে প্যাচ প্যাচ করছে—মাটীতে বসে খাওয়া কাজেই শাড়ীটার যে বারোটা বাজবে

তা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। যাই হোক ডাক পড়লো খাওয়ার এগারটা আন্দাজ—ধাক্কাধাক্কি করে সারের একটা জায়গা দখল করলাম। মাঝামাঝি মেন্থ—তবু পরিবেশকদের সুন্দর পরিবেশনের ফলে খাওয়া শেষ করতে প্রায় ৫০ মিনিট লাগলো। একে এত রাত্রি তার ওপর ঝাল তরকারি—কাজেই নামে মাত্র খেতে বসেছিলাম। ফিরে এসে জুতোটার খোঁজ পেলাম না। অনেক জুতো ঘেঁটেও নিজের জুতোর কিনারা না করতে পেরে সোজা বাড়ীর বাইরে এলাম খালি পায়ে। চাকরটা রকে বসে ঢুলছে দেখলাম—বেচারা! একে অত রাত্রি তার ওপর খায়নি। ওর খাওয়ার কথা আর তুললাম না—সোজা হাঁটতে শুরু করে দিলাম। প্রায় মোর বরাবর আসতেই একটা খালি টাক্সি পেলাম—সোজা বাড়ী ফিরলাম প্রায় একটা। যাওয়া আসায় ১৪ টাকা Taxi ভাড়াও গেল।

আলোয় ভুবন ভরা

নীলনিমেষ

—অসভ্য ছোটলোক, ইতর! কিভাবে মেয়েদের সঙ্গে বিহেভ করতে হয় জানেন না?

—জানি, কিন্তু উপায় ছিল না। মনোজ আমার সঙ্গে বাজী রেখে...... বলেছিল তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে......

...ড্যাম ইওর রেষ্ট্রেন্ট। আপনাকে ভদ্র বলেই জানতাম এখন দেখছি আপনি একটি স্কাউণ্ড্রেল।

—ইস্ খুব রেগে গেলে যে......। আগে জানলে তোমার ব্যাগ থেকে লজেন্স তুলে নিতাম না শেলী ...... বিশ্বাস করো।

ডোণ্ট আটার মাই নেম। আমি আপনার নামে কমপ্লেন করবো।

রেগে গিয়ে শেলী আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা আর হয়ে উঠলো না। ক্লাশে অধ্যাপক এলেন। তবে রাগে ওর সর্বাঙ্গ তখনও কাঁপছিল। ধবধবে ফর্সা রং নিমেষের মধ্যে লাল টুকটুকে হয়ে গেল। আমার কিন্তু ভীষণ ভাল লাগলো। রেগে গেলে অভিমানী শেলীকে দেখে মনে হত যেন এক গামলা দুধের মধ্যে এক সাঁজি রক্ত পলাশ ভেসে রয়েছে। ক্লাশে ওর সেই রাগ আর অভিমান ভাঙাবার জন্য কতো কাগজের স্লিপ পাঠালাম—কতোবার লিখেছি—লক্ষ্মীটি, রাগ করো না, একটু জোক করেছি মাত্র। কিন্তু তাতেও রাগ ভাঙলো না।

বেশীদিনের কথা নয়—এই তো মাত্র বছর কয়েক আগের কথা। আমরা তখন মহর্ষি ভবনের ছাত্র। ক্লাশে অধ্যাপক আসতে দেরী হলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হলো। সকলেই কথা বলতে ব্যস্ত। বিশেষ করে মেয়েরা। ওদের মুখে যেন খই ফুটেই চলেছে। ছেলেদের কথা বলার মধ্যে তবু বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য থাকে। কিন্তু মেয়েদের মুখে সেই এক কথা। সনাতন যুগ থেকে শুরু করে আজও এক কথাই ওদের মুখে শোনা যায়—'শাড়ীটা তোকে কি সুন্দর মানিয়েছে, কোথায় পেলি রে? সেদিক থেকে ছেলেদের কিন্তু আমার অনেক

অনেক ভাল লাগে। ওরা পলেটিক্সের জটিল তত্ত্ব থেকে শুরু করে পাঁচুর দোকানের চপের গুণাগুণ পর্যন্ত সব কিছুই খোলাখুলি মনে আলোচনা করে। আমাদের ক্লাশেও তাই চলছিল। আমি মনোজ আর কল্যাণীদি অন্যান্য দিনের মত সেদিনও লাষ্ট বেঞ্চের এক কোণে বসে ক্লাসের আসন্ন আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। শেলীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনোজ বলে উঠলো,

—এতটা রিজার্ভ থাকার কোন মানে হয় কি ?

একটা গম্ভীর নিশ্বাস ফেলে কল্যাণীদি বল্লেন,

—মেয়েদের যথাসম্ভব রিজার্ভ থাকাই ভালরে। তাতে তাদেরই মঙ্গল। সব সময় সকলের কাছে সরলভাবে আত্মপ্রকাশ করে বলেই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

কথাটার মধ্যে একটা চাপা বেদনা অনুভব করলাম। মনে পড়ে গেল কল্যাণীদি জীবনে প্রতারিতা। তাই খুব সত্বর প্রসঙ্গটা প্রত্যাহার করে মনোজ আবার বলে উঠলো—

—আমাদের ক্লাশেও একজন আছেন, কারণে অকারণে ভীষণ রিজার্ভ থাকেন। তিনি ধরা দিয়েও যেন দেন না!

—তোরা যে কেন শেলীর সঙ্গে এমন করিস জানি না বাপু; ও যদি কারও সঙ্গে কথা নাই বলে তবে তোদের এত মাথা ব্যথা কেন ?

আমি সজোরে প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম

অসম্ভব। ও আর কারুর সঙ্গে কথা না বললেও আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই বলবে।

মনোজ—বেশ বাজী রইল

আমি—বেশ, কতো ব'ল।

মনোজ—তুমি যদি ওর সঙ্গে কথা বলতে পার তবে ট্যাক্সী-রেষ্টুরেন্ট সিনেমা সবই আমার খরচা।

শেলী সব দিক থেকেই স্বতন্ত্র। এতদিন একসঙ্গে ক্লাশ করলাম। অথচ একদিনও ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। আপন মনে আসতো ক্লাশ করতো আর ক্লাশের শেষে ওর বাবার বড় একটা কালো রং এর ডিসোটো গাড়ীতে করে চলে যেত। কাজল কালো দুটি চোখে, বাসন্তী রং এর ছাপান শাড়ী আর স্লীভলেজ ব্লাউজে শেলীকে ভারী সুন্দর দেখাত। ও যখন ক্লাশে এসে বসতো সারা ক্লাশটি ভরে উঠতো সুগন্ধি সেন্টের সুমিষ্ট সুরভিতে। মেয়েরা

ঈর্ষা করতো, বক্র দৃষ্টিতে তাকাতো আর ছেলেরা হেলেন অব ট্রয় বলে মন্তব্য করতো। আমি কিন্তু কিছুই বলতাম না। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতাম আর……। শেলার খোপায় কোনদিন থাকতো চন্দ্রমল্লিকা আবার কোনদিন দেখতাম যুঁইএর মালা জড়ান। কপালে কুমকুমের ছোট্ট একটি টিপ। অসম্ভব রকমের গাম্ভীর্য্যের জন্য ওর সঙ্গে কথা বলতে সাহস করতো না। সেই গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গাতে গিয়ে আধুনিক কবি সুবীরকে চরম অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। শেলী একদিন ক্লাশে বসে পড়তে পড়তে হঠাৎ সোনার তরীর ভেতরে একটি চিঠি আবিষ্কার করলো। সুবীর লিখেছিল, "শেলা তুমি এদেশেরই মাটিতে ঝড়ে পড়া শেফালী না হয়েও দেশের কবি হ'তে গেলে কেন? জানিনা তুমি কবিতা লেখ কিনা কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার সারা দেহটি যেন একটি মিষ্টি কবিতার আবরণে ঢাকা। তোমার ঐ শান্ত ঘন কালো চোখ দুটির মধ্যে আমি আমার অনাগত ভবিষ্যতের আস্বাদ পেয়েছি।" পরে জানতে পারলুম শেলী সুবীরকে ক্লাশের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নাটকীয়ভাবে বলেছিল, "আপনার ঐ চিঠিটা ফেরৎ নিয়ে যান। আর শুনুন, আমার চোখে আপনার ভবিষ্যৎ না দেখে অন্য কারো চোখে দেখুন—তাতে আমি ভীষণ খুসী হবো।" এরকম একটা মারাত্মক শক পেয়ে সুবীর বহুদিনই আর ক্লাশে আসেনি। শুনেছিলাম পরে নাকি ও কবিতা লেখাই ছেড়ে দিয়েছে। এমনি করে ক্লাশের প্রায় অধিকাংশ ছেলেকেই ওর জন্য অল্প বিস্তর শক পেতে হয়েছিল। কাজেই কমপ্লেন করার কথায় সত্যিই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। চিন্তিত হবার রীতিমত কারণও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রমহলে ইতিপূর্বেই আমি নানা কারণে পরিচিত ছিলাম। তারাও সকলে জানতেন আমার ব্যবহারের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত কোন অসংগতি থাকলেও ইচ্ছাকৃত কোন দুর্বলতা ছিল না। একটা দুশ্চিন্তা নিয়েই তার পরের দিন ক্লাশে গেলাম। প্রথম পিরিয়ড আশঙ্কা আর উদ্বেগের মধ্যে কাটালাম। দ্বিতীয় পিরিয়ডে ডিপার্টমেন্টাল হেড্ নিজে ক্লাশে এলেন। সাধারণত তিনি ক্লাশ নিতেন না। কাজেই তার আগমনে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়লাম। এত ছাত্রছাত্রীর মাঝে……। কি ভুলই না করেছি। সামান্য একটু রসিকতার যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারে তা আগে জানলে নিশ্চয়ই করতাম না। নিজের উপর একটা প্রচণ্ড অভিমান এলো। কেন মনোজের কথায় বাজী রাখতে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল শেলীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলি 'প্লীজ কমপ্লেন করো না।' কিন্তু ততক্ষণে ডিপার্টমেন্টাল হেড্

নিজেই পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আসন্ন যুব উৎসবে যোগদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে আমার নিযুক্তিকরণের সংবাদ ঘোষণা করে সস্নেহে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পরে সহপাঠিনীগণও একে একে এসে আমায় অভিনন্দন জানালেন। এলো না শেলী। বোধ করি রাগ তখনও কমে নি। পরের দিন ক্লাশের শেষে বাইরে বেরুতেই কল্যাণীদি বল্লেন—নিমু, একটা নিউজ আছে। তোর অনারে আমরা একটা ফাংসানের এরেঞ্জ করেছি। চল। মনোজ আর কল্যাণীদির সঙ্গে কিছুটা পথ হেটে ওদের বাড়ীর একতলার ড্রইং রুমে ঢুকেই দেখি ক্লাশের প্রায় সব ছেলেমেয়েরাই উপস্থিত। একটা রূপোর থালাতে কিছু ফুল আর মিষ্টি। এক কোণে পিয়ানোর টেবিলে বসে রীডে হাত রেখে শেলী গেয়ে চলেছে "আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা ......। গান শেষ না হতেই কল্যাণীদির সঙ্গে আমিও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও তখনও গেয়ে চলেছে।

ফুলদানী নেই

সেন

কাজের মধ্যে সহস্রবার কাজকে ভুলে
সময় নামে বাগান ভরাই একটি ফুলে।

ফুলদানী নেই, ফুলদানী নেই
রাখবো কোথায় পরক্ষণেই
বেঁচে থাকার বিষয় বুদ্ধি
কৈফিয়তের উপায় ভুলে—
সমস্ত মন ভ্রমর হয়ে রইল বসে
একটি ফুলে।
দেওয়াল হাসে ধুসর ঠোঁটে
প্রতিধ্বনির ঘনিষ্ঠতায় হৃদয় হঠাৎ
চমকে ওঠে।

ফুলদানী নেই, ফুলদানী নেই
ফুল পুড়ে যায় সেই আগুনেই
সূর্যের দেহ যার হৃদয়ের
ভাবের কণা,
ফুলকে চিনেই অনিত্যতায় হারাবোনা।

বন্ধু

গোপাল ভৌমিক

এমন বন্ধু যায় না পাওয়া সহজে।

বিদ্যাবুদ্ধি সবটা মুখে
মনটা পোরা মগজে।

দেখা হলে দুহাত দিয়ে কথার ঝুড়ি খুলে
আপন মনে আসর জমায়
সময়-সীমা শালীনতা শিকায় রাখে তুলে।

আমি তখন চাই বা না চাই
সে তার আপন প্রিয়
ঘুরিয়ে চলে বনবনিয়ে কথার সূক্ষ্ম লাটাই।

একটা সময় আসে যখন আমি খুঁজি তাকে
তখন সে যায় দৃষ্টান্তরে
কে জানে কোন চন্দ্রলোকের ডাকে।

রং-বাহার

উষা ভট্টাচার্য

এ্যাসেম্ব্লীর বাগানে
মন্দার ফুটেছে,
জোড় বেঁধে অলিকুল
ঘুরে ঘুরে জুটেছে,

নীল রং আর লাল রংএ
কুড়িটিকে ছুঁয়েছে,
ঘোলাটে এ চোখগুলি
ফুল রংএ ধুয়েছে,

রং রং মাঠ ঘাট
বাতাসে সুবাস,
থাকনা টেবিলে কাজ
মনপ্রাণ হয়েছে উদাস,

ডুবু ডুবু স্মৃতিগুলি
নিশ্চয় গোলাপী,
খুশি খুশি মনগুলি
হয়েছে আলাপী।

এবার

রবীন সুর

এতদিনে তোর মুরোদের কতখানি বহর জানা হয়ে গেছে
এখন নিজেই নাস্তানাবুদ
তাই খামোকা নিজের নাক কেটে
পরের যাত্রায় হরঘড়ি গণ্ডগোল পাকাবার ধান্দা।

আমি কি কখনও কারও পাকাধানে মই টেনে
সর্বনাশ করার মত মারাত্মক ইচ্ছে লালন করেছি ?
কাউকে না জ্বালিয়ে
আমি একান্তভাবে নিজের স্বভাবে
সব কিছু পুরনো হিসেবের জের মিটিয়ে
বিমুক্ত জীবনের নোতুন স্বাদ নিতে চেয়েছিলাম !

অথচ তুই একে একে হাড় খেলি মাস খেলি
শেষতক চামড়া খুলে ডুগডুগি বাজিয়ে
সারা গ্রাম ঢেড়া দিয়ে এলি ······

তখনও কিছু বলিনি !

এর পরেও তুই আমার ঘরের মধ্যে
আমার বুকের পাঁজর খুঁড়ে
নিশুতি রাতের অন্ধকারে সন্দেহের বল্লম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
ট্রাঙ্ক শুটকেস ড্রয়ার তোরঙ্গ হাঁটকে
সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে তল্লাসী চালালি
কিন্তু সনাক্ত করার মত কিছুই পেলি না ঃ

এবার তোকে টিট করবো !

শিল্পী অনুপ ঘোষালের সঙ্গে

এবার থেকে প্রতি সংখ্যায় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীদের পরিচিতি তুলে ধরা হবে। এ পর্যায়ে বর্তমান সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের গুপী গায়েন বাঘা বায়েন খ্যাত নেপথ্য শিল্পী শ্রীঅনুপ কুমার ঘোষালের সংগে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল। (যুগ্ম সম্পাদক)
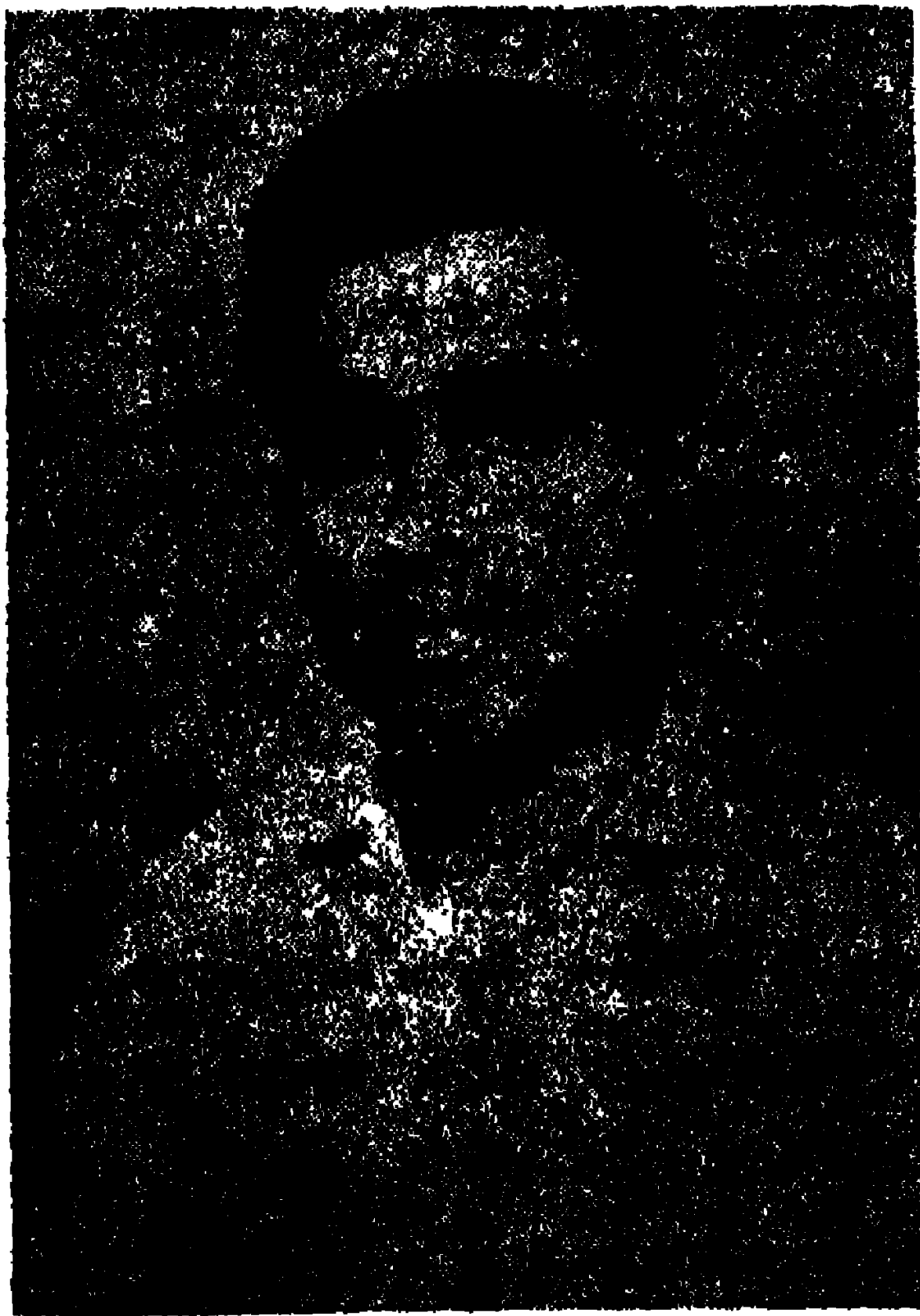
চৈত্রের কমলা রং এর বড় বিকেলটা কখন যেন ধীরে ধীরে সন্ধ্যার কোলে লুটিয়ে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই। কাছেই রেল লাইনের ওপারে রবীন্দ্র সরোবরের দুপারে শিমূল পলাশ আর দেবদারুর শাখায় শাখায় লেগেছে

দক্ষিণা হাওয়ার ঢেউ। বিরাট আকাশটায় কখন যেন শুরু হয়েছে চৈত্রী রাতের পূর্ণিমা চাঁদের জাগরণ। আর রূপোলী আলো এসে ঠিকরে পড়ছে অনুপের টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে। মুখোমুখি বসে আমরা কথা বলছিলাম। অতি আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন কায়দায় সুসজ্জিত বৈঠকখানাতে রয়েছে বুক শেলফ্, শেলফে রবীন্দ্র-রচনাবলী। দেওয়ালে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গুণী গায়েন বাদ্য বায়েনের নিউজ কাটিং। পাশে তাকিয়া সহ একটি চৌকি; দেওয়ালের কোণে রাখা একটি তানপুরা। এক কথায় সুন্দর পরিবেশ। আরও সুন্দর লাগলো অনুপকে। যে অনুপকে প্রথম দেখেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যানটিনে তন্ময় হয়ে ইমন কল্যাণ রাগে খেয়াল গাইতে। সেদিনও ওকে ভাল লাগতো; আজও ওকে ভাল লাগছে। সেদিন ও ছিল শুধু অনুপ; আজ হলো শিল্পী অনুপ। সেদিন স্বপ্নেও আমরা ধারণা করতে পারিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এই তরুণ সঙ্গীত শিল্পী যশ ও খ্যাতির শীর্ষাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের ফরিদপুর জেলায় ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী অনুপ জন্মগ্রহণ করে। বাবা শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র ঘোষাল একজন শিক্ষক। মায়ের কাছ থেকেই প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা শুরু। সাধারণ শিক্ষা আরম্ভ হয় বাড়ীতে। তারপর চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে এবং শেষে আশুতোষ কলেজ মারফৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (কলা) হয়ে ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সংগে সঙ্গীতে এম. এ. পাশ করে। বর্তমানে অনুপ সঙ্গীতের উপর নন্দনতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছে। অনুপের সঙ্গীতের প্রেরণা মা ও দিদির কাছ থেকে এলেও সঙ্গীত শিক্ষার বিষয়ে শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী, দেবব্রত বিশ্বাস ও মনীন্দ্র চক্রবর্তীর নাম শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে স্মরণ করে।

অনুপের জীবনে ১৯৬৬ সালে সঙ্গীত ভারতী উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ এক বিশেষ ঘটনা। ঐ বছরই অনুপ ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সঙ্গীতে গবেষণার জন্য মাসিক ২৫০ টাকা হারে জাতীয় সাংস্কৃতিক মেধা বৃত্তি লাভ করে। একই সঙ্গে ওর দিদি শ্রীমতী নমিতাও [বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী] রবীন্দ্র সঙ্গীতে গবেষণার জন্য অনুরূপ একটি বৃত্তি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার ঐ বছরে ভারত সরকারের ঐ দুটি সাংস্কৃতিক বৃত্তি লাভ করার পর আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের শ্রীযুক্তা ঊষা ভট্টাচার্যের উদ্যোগে অনুপ নমিতা এবং

শর্মিষ্ঠার [আকাশবাণীর অভিনেত্রী ও রবীন্দ্রভারতীর নাটক বিভাগের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায়] একটি সাক্ষাৎকার আকাশবাণীর যুবগোষ্ঠীর আসরে প্রচারিত হবার পর অনুষ্ঠানটি ভারতীয় যুব মানসে গভীর রেখাপাত করেছিল। ঘটনাটি আজও অনুপের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছে।. হাল্কা মেজাজ ও বৈঠকী কায়দায় ওই সাক্ষাৎকারটি পরিচালনা করেছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা শ্রীঅনিমেষ চট্টোপাধ্যায় (অধুনা ছন্দিতার সম্পাদক)।

ছোটবেলা থেকেই চলচ্চিত্রে গান গাইবার একটা স্বপ্ন অনুপকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই ১৯৬৬ সালে গুপী গায়েন বাঘা বায়েনে গান গাইবার জন্য সত্যজিৎ বাবুর কাছ থেকে আমন্ত্রণ এলে এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও রোমাঞ্চে অনুপের মন ভরে উঠলো। সত্যজিৎবাবুর লেক টেম্পল রোডের বাড়ীতে শুরু হলো নিয়মিত রিহার্সাল। সঙ্গে ওর রবিদা (রবি ঘোষ)। সত্যজিৎবাবুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুপ বললো, "উনি শুধুমাত্র একজন কৃতি শিল্পীই নন—একজন অসাধারণ সুরকারও বটেন।" গুপী গায়েন বাঘা বায়েনের গান রেকর্ডিং এর কথা উল্লেখ করে অনুপ বললো সেদিনের সেই সকাল আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবো না। নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরে ঢুকেই দেখি সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

প্রথমে শুরু হলো 'ভূতের রাজা দিল বর' গানটি দিয়ে। যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমি গাইতে লাগলাম আর আমার ঠিক বিপরীত দিকে এসে দাঁড়ালেন রবিদা। কারণ আপনারা সকলেই জানেন ঐ গানটিতে ওর কণ্ঠেও কিছুটা অংশ আছে। আমি প্রত্যেকবারই ঠিক গাইছিলাম কিন্তু মুশকিল হলো রবিদাকে নিয়ে। কারণ আমার গানের সঙ্গে সমান তাল দিয়ে রবিদা "আহা ভূত—বাহা ভূত—কিবা ভূত—কিম ভূত" অংশটির স্বর নিক্ষেপ করতে পারছিলেন না। রিহার্সেল ঠিক হচ্ছিল কিন্তু রেকর্ডিংএর সময়ে ঠিক হচ্ছিল না। এমন সময় সত্যজিৎবাবু নিজে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসে রবিদার কাঁধে হাত দিয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে গেলেন—ভূতের রাজার বরে যেমন গুপীর গলা খুলে গেল ঠিক সত্যজিৎ বাবুর স্পর্শে রবিদাও নিমেষের মধ্যে ঠিক হয়ে গেলেন। রেকর্ডিং ও. কে হ'ল। কথার মাঝে অনুপের দিদি চা নিয়ে এলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গুপী গায়েনের পর আর কোন ছবিতে গান গাইছ কিনা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে

অনুপ বলে চললো,—তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো ছবিতে গান গেয়েছি। গুপী গায়েন না মুক্তি হতেই ও ছবিতে গান গেয়েছি। তপনদার ব্যবহারও আমার খুব ভাল লেগেছে। এ ছবিতে আপনারা দিলীপকুমারের মুখে আমার গান শুনতে পাবেন। আমার মনে হয় "ছোটিসি পঞ্চী ছোট্ট ঠোঁটেরে" লোকের অসম্ভব ভাল লাগবে। বর্তমানে মুক্তিপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের শাস্তি ছবিতেও গান গেয়েছি। এ ছাড়া অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত মৃগয়া ছবিতেও তারই দেওয়া সুরে একটি গান গেয়েছি। গানটির সুর খুব ভাল হয়েছে। মহাকবি কৃত্তিবাস ছবিতেও শেষ গানটি আমি গেয়েছি। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর যদুবংশতেও গান রেকর্ডিং করেছি।

সভ্য সমাজে বসবাস করতে গেলে প্রয়োজনভিত্তিক অর্থের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই অনুপ সঙ্গীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রতিভা থাকলেও প্রতিষ্ঠা লাভ আজকের দিনে সম্ভব নয় যদি না সে প্রতিভাকে সর্বজন সমক্ষে তুলে ধরা হয়। সত্যজিৎবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি একজন সত্যি-কারের প্রতিভাবান ও নিষ্ঠাবান শিল্পীকে আমাদের সামনে তুলে ধরে তার অনন্যসাধারণ প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করলেন। অনুপ আকাশবাণীতে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে লোকগীতি নজরুল গীতি এবং আধুনিক গান গেয়ে থাকে; এ ছাড়া জলসাতে গাইবার জন্য এত বেশী অফার আসছে যে সবসময় তা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অনুপের আরও নাম হবে—হউক। যশ হবে হউক। তার মধ্যের সেই অজেয় শিল্পীসত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ হউক—এই শুভ কামনা রইল।

আগামী সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হবে

নিয়মাবলী

- ছন্দিতা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।
- প্রতি ইংরাজী মাসের ২০ তারিখে প্রকাশিত হয় (বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহ)।
- বার্ষিক সডাক ৫·০০টাকা। ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ·৪০ পয়সা।
- বছরের যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়। বৈশাখ থেকে বর্ষ সুরু (ইংরাজী এপ্রিল)।
- গ্রাহক গ্রাহিকাদের উচ্চমানের লেখা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

প্রয়োজন বোধে লেখা সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত না হলে গ্রহণ করা হয় না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সমেত লেখা পাঠাতে হয়। পত্রালাপের জন্য সব সময়ই উপযুক্ত ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

- দশ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সি জমা প্রতি সংখ্যার জন্য ২৫% কমিশন বাদে ১ টাকা অগ্রিম দিতে হয়।
- কমিশন বাদে ভি, পি, পি যোগে কাগজ পাঠানো হয়। ডাক খরচ এজেন্টদের দিতে হয় না।

গ্রাহক চাঁদা গ্রহণ করা হচ্ছে

গৌরগোপাল দাশ কর্তৃক বি-৫৩, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ২৮ নং পী জী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা-৩২ হইতে মুদ্রিত।

ছাঁদেতা

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

আশ্বিন ১৩৭৭

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতা

সূচীপত্র

কবিতা

অনুবাদ গল্প

ফিচার

সাক্ষাৎকার

প্রচ্ছদ শিল্পী : নিখিল বিশ্বাস

যুগ্ম সম্পাদক :— অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরগোপাল দাশ

রচনার রীতি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান প্রবন্ধে আদর্শ রচনা রীতির কি গুণ থাকা চাই, সে বিষয় একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। রচনা রীতি অর্থে আমরা ইংরেজিতে যাকে 'স্টাইল' বা 'ডিকশান' বলা হয় তাই বুঝব। এ বিষয় ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে এবং বর্তমান যুগে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় পশ্চিমের একাধিক মনীষীর কিছু চিন্তা আছে। তাদের তুলনার মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচনাটি নিয়ে যাবার প্রস্তাব করি।

বিখ্যাত আলংকারিক দণ্ডী তার কাব্যাদর্শে দুটি মূল সাহিত্যিক মার্গের কথা উল্লেখ করেছেন—গৌড়ীয় মার্গ ও বৈদর্ভমার্গ। বৈদর্ভমার্গ বেশী জনপ্রিয়। কালিদাসের রীতিকে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই বৈদর্ভমার্গ বা রীতির দশটি গুণের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমরা তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এই আলোচনা আরম্ভ করতে পারি।

বৈদর্ভমার্গ যে দশটি গুণের দ্বারা চিহ্নিত তাদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল :

১। শ্লেষ—এই গুণটি রচনার ঘন সন্নিবদ্ধ ভাব বোঝায়।

২। প্রসাদ—যে রচনা সহজবোধ্য ও স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল তাতে এই গুণ আছে।

৩। সমতা—পদ যোজনায় সামঞ্জস্য। এটির বিশেষ প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে; কারণ সেখানে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ প্রশস্ত।

৪। মাধুর্য—এই মাধুর্য শ্রুতির। বর্ণের অনুপ্রাস বা যমকের প্রয়োগ হতে তা পৃথক। যে রচনা কানে ভালো লাগে তার এই গুণ আছে।

৫। সুকুমারত্ব—তা ফোটানো যায় শ্রুতিকটু নয় এমন শব্দের প্রচুর ব্যবহার করে। যেমন দন্ত্যবর্ণ ব্যবহার করে তালব্যবর্ণ এবং শ্রুতিকটু যুক্তবর্ণ বর্জন।

৬। অর্থব্যক্তি—এর অর্থ সুস্পষ্ট। যে রচনার অর্থ সহজগ্রাহ্য তার এই গুণ আছে।

৭। উদারত্ব—যে রচনা আমাদের মনকে উন্নত ভাবাপন্ন করে বা যার পাবণী শক্তি আছে।

৮। ওজঃ—সমাসযুক্ত পদের অতিপ্রয়োগ। অর্থাৎ লম্বা লম্বা গাল ভরা কথার প্রয়োজন মত ব্যবহার।

৯। কান্তি—এই গুণ হল অতিশয়োক্তির বিপরীত, অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের যা ঠিক তা যেমনটি তেমন ছবি ফোটায়।

১০। সমাধি—রূপকের প্রয়োগ এই গুণের লক্ষণ।

বর্তমানে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের মধ্যে ও আলোচনায় রচনা শৈলী নিয়ে চিন্তা হয়েছে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা দুজন বিখ্যাত মনীষীর অভিমত উল্লেখ করতে পারি। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সমরসেট মম্ এবং অপর জন হারল্ড অসবর্ণ। মম্ একজন বিখ্যাত রসসাহিত্যিক। প্রথম জীবনে নাট্য লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। পরে উপন্যাস লিখে এবং বিশেষ করে ছোট গল্প লিখে বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান রসসাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অসবর্ণ একজন বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিদ। সুতরাং একজন রস-সাহিত্যিক এবং অপর জন শিল্পতাত্ত্বিক। উভয়েরই রীতি সম্বন্ধে মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

সমরসেট মম্ বলেন রচনা রীতির তিনটি গুণ থাকা উচিত: ভাষার প্রাঞ্জলতা, সরলতা এবং শব্দমাধুর্য (on taking thought, it seems to me that I must aim at lucidity, simplicity and enphony. On summing up, Chap. X)। তিনি বলেন কঠিন বিষয়কেও প্রাঞ্জল করে বোঝানো যায়। সুতরাং রচনায় অস্পষ্টতা সর্বদা পরিহার করতে হবে। তিনি বলেন সরলভাবে লেখা সহজ নয়, তা রীতিমত সাধনা সাপেক্ষ। শেকসপীয়ার-এর গদ্য কত সরল অথচ কত শক্তিধর। শব্দ মাধুর্য অর্থে তিনি বলেন তা অনুপ্রাসাদি শব্দালংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার ব্যাপ্তি অনেক বেশী। প্রতিটি শব্দের একটি ওজন আছে, শব্দগুণ আছে এবং আকৃতি আছে। এই তিনটির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশেই রচনা শ্রুতিমধুর হয়।

অসবর্ণও আদর্শ রচনা রীতির তিনটি মৌলিক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হল সুস্পষ্ট নির্দেশনা (Precision), বর্ণনার সংক্ষেপ (Conciseness) এবং

শব্দযোজনায় শ্রুতিমাধুর্য (Enphony)। এই প্রসঙ্গে তাঁর Aesthetics and criticism, Chap X, Anatomy of literature দ্রষ্টব্য।

উপরের আলোচনায় এই তিন জন মনীষীর আদর্শ রচনারীতির কি গুণ থাকা উচিত সে বিষয় অনেকখানি মতের ঐক্য দেখা যায়। সেগুলি নীচে দেখানো যেতে পারে:

মম্-এর প্রাঞ্জলতার (Lucidity) সঙ্গে দণ্ডীর প্রসাদ এবং অর্থব্যক্তি গুণের তুলনা চলতে পারে।

মম্ ও অসবর্ণ-এর শব্দমাধুর্যের (Enphony) সঙ্গে দণ্ডীর মাধুর্য ও সুকুমারত্ব গুণ মিলে যায়। তিনিও শ্রুতি মাধুর্যের ওপর জোর দিয়েছেন।

অসবর্ণ এর সুস্পষ্ট নির্দেশনার (Precision) সঙ্গে দণ্ডীর অর্থব্যক্তি ও কান্তিগুণের তুলনা চলে। অর্থব্যক্তির অর্থ সুস্পষ্টতা। কান্তি বলতে বুঝি অত্যুক্তির বিপরীত। উভয়েই সুস্পষ্টতা ইঙ্গিত করে।

অসবর্ণ-এর বর্ণনা সংক্ষেপের (Conciseness) সঙ্গে দণ্ডীর শ্লেষগুণের তুলনা চলে। যে বর্ণনা নিরেট হয় তা সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

সুতরাং দেখা যায় দণ্ডী বর্ণিত আদর্শ রীতির দশটি গুণের ছয়টি গুণ এঁদের দুজনের তালিকায় স্থান পেয়েছে। তারা হল প্রসাদ, মাধুর্য, সুকুমারত্ব, অর্থব্যক্তি, কান্তি এবং শ্লেষ। তিন সাহিত্যরসিকের মধ্যে যেখানে এমন ঐকামত্য সেখানে নিশ্চয় আমরা নির্ভরযোগ্য নির্দেশ পাই। এগুলি বিনা দ্বিধায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রীতির গুণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।
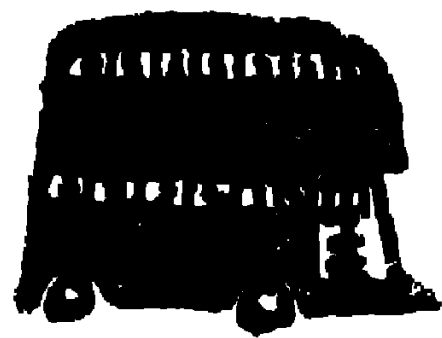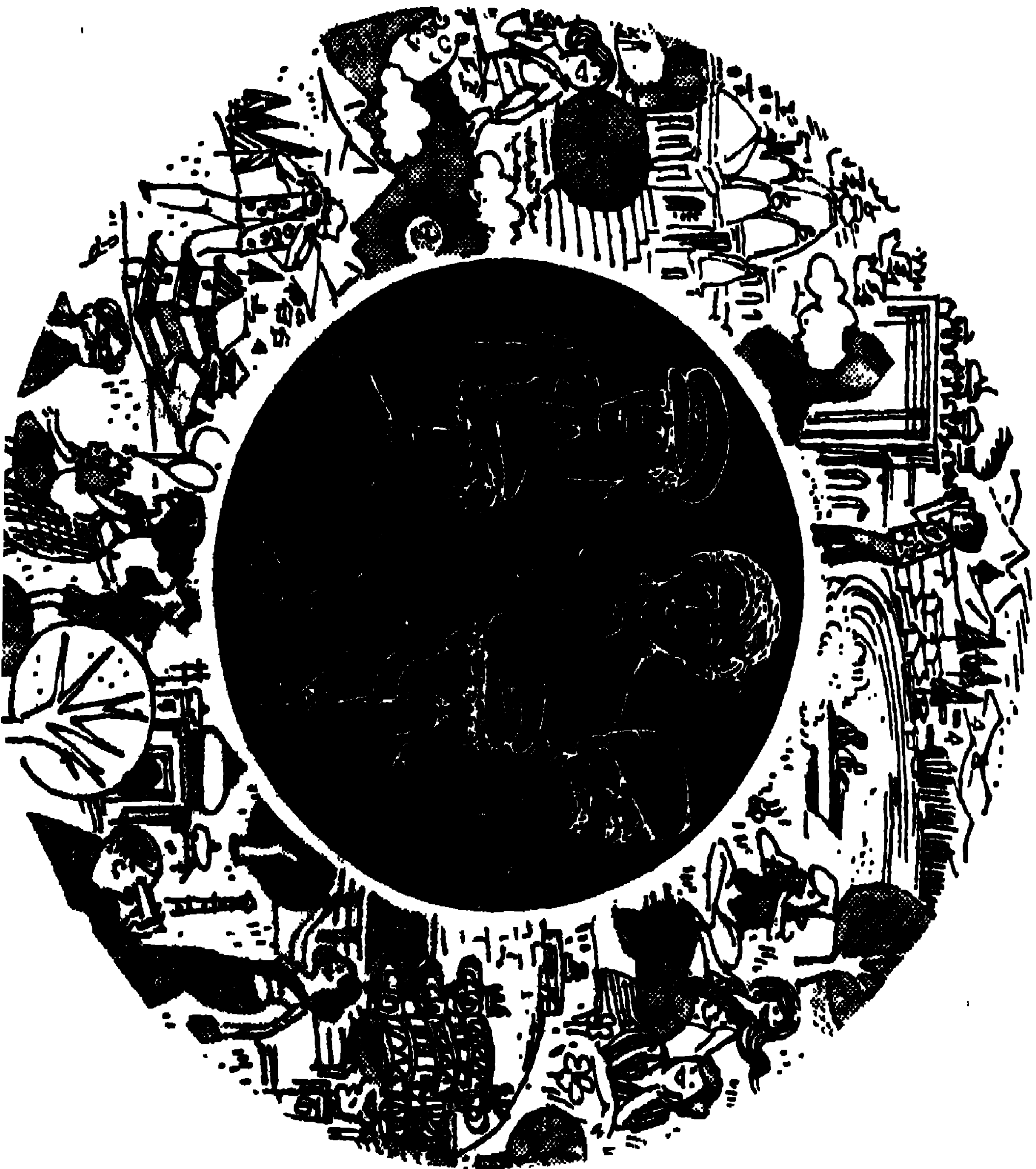
"দুর্বল পৃথিবী কাঁদে জটিল বিকারে"
সুকান্ত-সমীক্ষায় দু-চার কথা
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সুকান্তর সংক্ষিপ্ত কবিজীবনকে যখনই বিশ্লেষণ কোরতে বসেছি, তখনই আমার একটা কথা ধারাবাহিকভাবে মনে স্থান পেয়েছে, সুকান্ত যুগচেতনায় বিশেষ কোনো একটা 'স্লোগান'কে কখনো গুরুত্ব বা যোগ্যতা দেয়নি কিংবা প্রচারধর্মী কোরে তার স্বচ্ছ কাব্যচিন্তাকে কখনো কলঙ্কিত করেনি। এটা বোধ-হয় সুকান্তর প্রতিভাকে সমাদর ও স্বীকৃতি জানাবার প্রথম ও শেষ কথা। সাধারণভাবে সুকান্ত একটা নিছক বক্তব্যের কবি, হয়তো বা একটা আদর্শেরও ; কিন্তু সে আদর্শের বক্তব্যটাকে সুলভ 'স্লোগান' ব'লে ভাবলে ভুল করাই হবে। সাম্যবাদ তার 'স্লোগান' নয়, স্বপ্ন ; প্রচার নয়, একটা প্রচণ্ড বলিষ্ঠ ঘোষণা।

সুকান্তর কবিতা ছকে-কাটা বাঁধা-ধরা 'পদলালিত্যের ঝংকার' নয়, এতে অনুভূতির বিলাসও নেই ; কবিতা তার কাছে হাতিয়ার, আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তোলার কড়া হাতুড়ি। 'মিথ্যার ভিতে কল্পনার মশলায় গড়া' পৃথিবীটাতে চেতনার সঞ্চার করার জন্য তাকে কবিতায় বিদ্রোহ আনতে হয়েছিল, টাইফুনের সংকেত দিতে হ'য়েছিল। তাই তার কবিতার মধ্যে জ্বলে উঠল সংঘাত, বিপ্লব আর হাহাকার। মা-কে লেখা একটা চিঠিতে তার স্পষ্টোক্তি : "সমস্ত জগতের সংগে আমার নিবিড় অসহযোগ চলছে। এই পার্থিব কৌটিল্য আমার মনে এমন বিস্বাদনা এনে দিয়েছে, যাতে আর আমার প্রলোভন নেই জীবনের ওপর।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন সুকান্তকে অনুশীলন করি, তখন একটা ধারণার জন্ম হয়,—সুকান্ত বোধহয় অনেক কিছুর কবি। সাধারণের জন্য ভাবতে গিয়ে তার কবিতা অসাধারণ হয়ে উঠেছে, নিরন্ন সর্বহারাদের কাছে পূর্ণিমার চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি' হিসেবে পরিবেশন কোরতে হ'য়েছে, আর রক্ত-ঘাম চোখের জলের ধারায় জন্ম নিয়ে বিদ্রোহের দূত আখ্যা স্বীকার কোরে নিতে হ'য়েছে অকুণ্ঠভাবে। সবচেয়ে বড় কথা, 'অনৈক্যের চোরা-

বালি'তে ক্রেদাক্ত বর্তমানকে ছাপিয়েও তার আশাবাদী কণ্ঠের নির্ভীক ঘোষণা :
"পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের।"

সারাজীবন দারিদ্র্যের আঘ্রাণ নিয়ে 'দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল'-কেই সর্বত্র প্রত্যক্ষ কোরেছিল সুকান্ত :

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়।"

সুকান্তই দেখেছিল 'খাদ্যশস্য আঁকড়ে-ধরা জনতা'-র চোখে 'বেআব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন'। তারপর 'বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ' নিয়ে লিখেছিল 'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।' ক্ষুধার আগুনে-পোড়া কাস্তে হাতে কবিতা লেখবার সময়ে দেখেছে লাল আগুনে জনতার খাদ্য ঝল্‌সে উঠতে। কবিতা আর কবিতা থাকল না, কামান হয়ে উঠল।

স্পীডোমিটারের মতো উদ্দাম হৃৎপিণ্ড নিয়ে 'গৃহযুদ্ধের কালো রক্তের বান' রুখতে হয়েছে সুকান্তকে। তাই তার দু-হাতে বেজে উঠেছে 'প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা'। পাণ্ডুর পৃথিবীর বুকেই বিদ্রোহের পুরাতন হাতিয়ারকে খুঁজে ফিরেছে সে। নিজেকে আদিম হিংস্র মানবিকতার অংশীদার কোরে তুলে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে সে 'বোধন' কবিতায় :

"প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস্ তোরা
ভেঙেছিস ঘরবাড়ী,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুল্‌তে পারি ?"

বাস্তব কবিতার রাজ্যে সুকান্ত একটা অনির্বাণ বিদ্রোহ, একটা জলন্ত আগুন; তার প্রত্যেক ভাবনা বারুদে-ঠাসা, স্ফুলিঙ্গ-সঞ্চারী। বিদ্রোহের মাটিতে সুকান্ত চেয়েছিল সাম্যবাদের বীজ পুঁততে আর বিপ্লবের নেশা ধরিয়ে দিতে গরীবের হাড়ে। জীবনের সংক্ষিপ্ত আয়ু তাতে সম্মতি জানালো না। সুকান্তর কাব্যকীর্তির সামগ্রিক ব্যাখ্যায় তার একটা দৈন্য বেশ চোখে পড়বার মতো। প্রেমের উষ্ণতা থেকে একটা নিরাপদ দূরত্ব সে বরাবর বজায় রাখতে চেয়েছিল বেশ প্রচ্ছন্ন সচেতনতার সংগে। তার প্রেম-বিষয়ক কবিতার সংখ্যাল্পতার বোধহয় এটাই একতম কারণ। প্রেম সম্বন্ধে তার দৃষ্টি ছিল খুব অকপট, অনাড়ম্বর, প্রয়োজনের তাগিদে খানিকটা আবার তা বাস্তবমুখী।

মনে হ'তে পারে এই দৃষ্টিভংগীর পেছনে প্রত্যাখ্যানের একটা বিয়োগান্ত ইতিবৃত্ত হয়ত অগোচরে কিছুটা কাজ করেছে। সত্যি কথা। তার অভিজ্ঞতা অনুভূতির একটা নির্দেশকে সবসময়েই অনুসরণ করে চলেছে। আর সেটাই তার রোমান্টিকতা থেকে বাস্তবতায় উত্তরণের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হিসেবে আমরা পেয়েছি। বন্ধুকে লেখা তার বিশেষ একটা চিঠির কয়েকটা পঙক্তির উদ্ধৃতিই আমার বক্তব্যকে সমর্থন কোরবে, আশা করি। তার নিজের ভাষায়:

"………শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, আমার মনের অন্ধকারে ফুটে উঠেছিল একটি রৌদ্রময় ফুল। তার সৌরভ আজো আমায় চঞ্চল ক'রে তুলছে থেকে-থেকে। ওর চলে যাবার দিন দেখেছিলাম ওর চোখ, সে চোখে যেন লেখা ছিল 'হে বন্ধু বিদায়, তোমাকে আমার সান্নিধ্য দিতে পারলাম না, ক্ষমা কর।' সে ক'দিন কেটেছিল যেন এক মূর্ছার মধ্যে দিয়ে, সমস্ত চেতনা হারিয়ে গেছল কোনো অপরিচিত সুরলোকে। তোমরা একে পূর্বরাগ আখ্যা দিতে পারো, কিন্তু আমি বলব এ-আমার দুর্বলতা। তবে এ থেকে আমার অনুভূতির কিছু উন্নতি সাধন হ'ল। কিন্তু এ ঘটনার পর আমি কোনও প্রেমের কবিতা লিখি নি, কারণ প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে লজ্জারজনক বলে মনে হয়।"

বাস্তবতায় শান দিয়ে প্রেমের ধারণাকে সে এইভাবে ধারালো করতে চেয়েছিল। তাতে সে প্রেমের অবমাননা করেনি, বরং দূর থেকে তাকে যথোচিত অভ্যর্থনাই জানিয়েছে; সে অভ্যর্থিত দূরত্বের মধ্যেই ছিল তার প্রেমের নির্বিবাদ স্বীকৃতি, একটা বাস্তবান্বিত চেতনা আর একটা অসাধারণ বৈদ্যুতিক প্রচণ্ডতা। আরেক জায়গায়:

"মানুষের যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন কোনো একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচাতে সে উৎসুক হয়, তাই এই রকম দুর্বলতা দেখা দেয়। তোমার চিঠি না পেয়ে আমার উপকারই হয়েছিল, আমি অন্য কাজ পেয়েছিলাম।"

এই হল সুকান্তর প্রেম,—অন্য রাজ্যের স্বতন্ত্র এক অনুভূতি। আর তার সে রাজ্যেও ছিল আলোড়ন, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ। প্রেম তার একধরণের চেতনার যুদ্ধ, প্রেমকে অস্ত্র কোরেই তার 'সৈনিকের কড়া পোষাক।' "প্রিয়তমাসু" তার প্রেমের একমাত্র অনুপম কবিতা। শত্রুর পদক্ষেপ শোনার প্রতীক্ষার অবসরে,' 'গোলা ফাটার মুহূর্তে,' 'যুদ্ধজয়ের ফাঁকে ফাঁকে' কবি

তার প্রিয়তমাকে নিয়ে স্বপ্নবিভোর হ'য়েছে ; বারেবারে মনে পড়েছে তাকে সে ফেলে এসেছে 'দারিদ্র্যের মধ্যে,' 'ঝড়ে আর বন্যায়, মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে,' হয়তো বিপন্ন হ'য়েছে তার অস্তিত্ব 'দুর্ভিক্ষের আগুনে'। তারপর কবি-যোদ্ধার 'ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে।' মালায় আর পতাকায়, প্রদীপে আর মঙ্গলঘটে কেউ প্রতীক্ষা কোরে নেই তার পথের ধারে। তবু সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে প্রেমিকার এতটুকু প্রণয়সম্বর্ধনার জন্য। যুদ্ধে বিতৃষ্ণা জেগেছে কবি-সৈনিকের :

"আর সামনে নয়,
এবার পেছন ফেরার পালা।
পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।"

সীমান্তের প্রহরীর তাই 'ঘরে ফেরার তাগাদা।' যুদ্ধ কোরে তার প্রেমকে মনে পড়েছে ; এবার প্রেম দিয়ে তার আসল যুদ্ধের শুরু,—অস্তিত্বের যুদ্ধ, ক্ষতবিক্ষত জীবনের যুদ্ধ, ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়ার জন্যে যুদ্ধ।

শেষ কথায় আসি। সুকান্ত 'অবাক পৃথিবী'র কবি, যে পৃথিবীটাকে পুরনো ভাঙা চশমা দিয়ে দেখলে মনে হত খুব ঝাপ্সা, যে পৃথিবীতে 'সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা', যে পৃথিবীতে 'বিফল চিৎকার তোলে বুভুক্ষার কাক'—সুকান্ত সেই পৃথিবীর কবি, তাকেই সেলাম জানিয়েছে। বিদ্রূপের সেলাম। তাই উপহাসের ভঙ্গীর মধ্যেও ঘরেতে অভাব জেনে উদভ্রান্ত পৃথিবীটাকে পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে 'কালো ধোঁয়া'। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' হয়ে উঠেছে। তবু এই ধোঁয়াটে অস্তিত্বের মধ্যেই সুকান্ত দূরাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে, পটপরিবর্তনের কথা ভেবেছে :

"রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।"

দূরচারী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে 'সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে'। বর্তমানকে উপলক্ষ্য কোরে আগামীকে সে জানিয়েছে সাদর অভিনন্দন :

"আজকের দিন নয় কাব্যের—
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের।"

সুকান্ত তাই 'দিনবদলের পালা'র কবি, তার গান 'ঘুমভাঙার গান', তার ঘোষণায় 'জাগবার দিন আজ', আর তার কবিতায় বলিষ্ঠ বিদ্রোহের 'ছাড়পত্র।'

বিকৃত আধুনিক নারী সমাজ

হেনা চৌধুরী

নারী প্রগতির ভাল ও মন্দ নিয়ে আজ তর্কের শেষ নেই। কেউ বলেন এ ভাল কেউ বা বলেন মন্দ! পুরুষরা নিজেদের দায়দায়িত্ব এর ফলে স্ত্রীদের ঘাড়ে তুলে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন! অবশ্য তাই বলে তার'ও সমালোচনা করতে ছাড়েন না! আমার বক্তব্য হচ্ছে আধুনিক যুগে নারী সমাজের এই শিক্ষা এবং অগ্রগতির ফলে আমাদের সমাজ জীবনে ব্যক্তি জীবনে যেমন এসেছে কল্যাণ ও শান্তি তেমনি এই প্রগতির সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর মেয়েরা যাদের শিক্ষিতা নামে অভিহিত করা যায় না তারা সমাজকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছেন আর এই অধঃপাতে যাবার কারণ তাদের উগ্র আধুনিকা হবার মোহ। এই মোহের ফলে আজ যৌবন উত্তীর্ণা নারীরাও নিজেদের অপরূপ করে তুলতে চাইছেন—ফলে তাদের ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে মেয়েরা ঠিকমত মানুষ হচ্ছে না। কারণ মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা তারা পায় মার কাছ থেকে। এই সমস্ত আধুনিকা নারীরা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত, যে নিজেদের সন্তানদের প্রতিও তাদের দৃষ্টি দেবার সময় নেই! ক্লাব, পার্টি করে দিব্যি মনের আনন্দে তারা দিন কাটিয়ে দেয়! কিন্তু মেয়েরা যেদিন 'মা' হয় সেদিন থেকেই আমার মনে হয় তারা নিজেকে অতিক্রম করে যায়। সুতরাং ছেলেমেয়েকে ঠিকমত মানুষ করে তোলাই একটি বিবাহিতা মেয়ের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব! কিন্তু এমন অনেক বিবাহিতা মেয়েকে আমি দেখেছি যারা তাদের এই কর্তব্য ভুলে যায়। এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে তারা বলবে আমরা এ যুগের মেয়ে তবে কি ঘরে বসে রান্না করবো! উত্তর হচ্ছে আমরা প্রগতিবাদী, আমরা আধুনিকা, আমরা শিক্ষিতা সবই, কিন্তু আমরা মেয়ে—তাই প্রয়োজন হলে রান্না নিশ্চয় করতে হবে। তাছাড়া রান্নাটা একটা art! যে মেয়ে যত আধুনিকা এবং উচ্চশিক্ষিতাই হোন না কেন, ভাল রান্না করে প্রিয় পরিজনকে পরিবেশন করে যতখানি তৃপ্তি পাওয়া যায় তেমন আর কিছুতেই তৃপ্তি মেলেনা বলে আমি বিশ্বাস

করি। আধুনিকা এবং প্রগতিবাদী হিসেবে একটি মেয়ে তখনই সকলের প্রশংসা অর্জন করবে যখন সে বাইরের এবং ঘরের জীবন এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারবে। আর এই সমন্বয়ের নামই প্রকৃত শিক্ষা। আজকের দিনে একজন প্রকৃত শিক্ষিতা মেয়ের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ গুণ আছে; কিন্তু আমাদের এই যে অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত অথচ অতি উগ্র আধুনিকা নারী সমাজ এরাই সমাজের অভিশাপ আর এদের জন্যেই আজ আমাদেরও অভিযুক্ত হতে হয়।

বাইরে দরকার থাকলে নিশ্চয় যেতে হবে—কিন্তু তাই ব'লে একজন বিবাহিতা মেয়ের জীবনকে পুরুষের মত বাইরের জীবন সর্বস্ব করে ফেললে হয় না। কারণ গৃহজীবনে প্রতিপদে জড়িয়ে থাকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ। সাংসারিক দায়িত্ববোধটা মেয়েদের জীবনে পুরুষদের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী। অতএব সংসারকে উপেক্ষা করে কেবল বাইরে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। আগে সন্তানকে উপযুক্ত ভাবে মানুষ করে সামাজিক কর্তব্য পালন কর তারপর নিজের কথা ভাব। তাই বলে আমি বলছি না যে কেবলমাত্র সন্তান পালন বা সংসারের কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকতে হবে, তা এ যুগের মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়—কিন্তু সিনেমা দেখা এবং পরচর্চা বা নেহাৎই যেলো বিষয়ে আড্ডা মারাটা খুব আধুনিকতার পরিচয় নয়—আজকের পৃথিবীতে মানুষের জানবার এবং জানাবার অনেক কথা আছে। এ সব মেয়েরা তা নিয়ে একটুও বিচলিত নয়। তারা শুধু জানতে চায় নিজেকে, পেতে চায় নিজেকে আর তার ফলে সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষের স্নেহ ভালবাসা এরা হারিয়ে ফেলছে। তাই আধুনিকা নারীদের প্রতি অনেকেই মনে ভয় বা বিদ্বেষ পোষণ করেন।

আমার বক্তব্য বাইরের সাজ পোষাকে উগ্র আধুনিকা হলেই আধুনিকা হওয়া যায় না—কিন্তু এই শ্রেণীর মেয়েরা তাই—হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে যেন এদের চিত্ত ঝলমল করে উঠেছে। অবশ্য একটু ভুল হল চিত্ত ঝলমল করলে ভাবনার কথা ছিলনা কিন্তু বাইরের ঝলমলানি, যোগা ক্লাস, আর Spoken English Class এ ভর্তি হয়ে দু চারটে ইংরেজী বুলি শিখে তারা জীবনকে জয় করে নিয়েছেন বলে মনে করেন—সুতরাং আপন আলোয় তারা কেবল নিজের মুখই দেখছেন—অন্যে সে আলোয় তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছেনা। মাঝবয়সেও অনেক ভদ্র মহিলাকে দেখেছি যারা আগে ছিলেন

নিতান্ত সাদাসিদে আজ তারা হঠাৎ উগ্র আধুনিকা হয়ে পড়েছেন। একদিন এই ধরণের এক ভদ্র মহিলার সংগে দেখা হয়েছিল, খুব চমকে গিয়েছিলাম—সংগে ছিলেন আমার এক বন্ধু তিনি বলেছিলেন, "জানেন এরা হচ্ছে 'pervarted women' বয়স হয়েছে অথচ আজও তৃষ্ণা মিটলনা।" এদের এই রূপান্তর দেখলে সত্যি খুব দুঃখ হয়। বললাম ভয় হয় বয়স হলে আমিও না অমনি হয়ে যাই। উনি বললেন, আপনি তা পারবেন না কারণ আপনার ভেতরে যে real education আছে তা আপনাকে বাধা দেবে। অবশ্য আমার একটা ভয়ে কেউ যেন আবার না আমাকে শিক্ষার গর্বে গর্বিতা বলে ভাবেন। কথাটা মনে পড়ল এবং ওঁর কথাটা শোনার পরই আমার এ প্রবন্ধটি লিখবার ইচ্ছে জেগেছিল বলে ওঁর বক্তব্যটা লিখলাম।

আমার অনুরোধ, যে যা নয় তাকে তা হবার জন্ম প্রয়াস না করে, যার জীবনে জ্ঞান বুদ্ধি বিত্তে culture যতটুকু আছে তাই দিয়েই জীবনকে সংসারকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলে পৃথিবীটা তো অনেক সুন্দর হয়ে উঠতে পারে!

কিন্তু আমরা চাই রূপান্তর—আজ নির্বিচারে প্রগতিবাদের সুযোগ নিয়ে সবাই চাইছেন অপরিসীম স্বাধীনতা—আর এই স্বাধীনতার ফলে সংযম হারিয়ে বিকৃত নারী সমাজ নিয়েছেন স্বেচ্ছাচারের পথ বেছে। তাই তাদের মেয়েরা, আজকে যাদের ১৫।১৬ বছর বয়স তারাও হয়ে উঠছে এক ইঙ্গ, বঙ্গ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবকিছুর সংমিশ্রণে বিশেষ এক ধরণের জীবই বলা যায়।

কিন্তু এটা হতনা যদি নারী সমাজ নিজেদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতো। নিজেরাও সাজ পোষাক দিয়ে নিজেদের যুগের প্রতিনিধি করে তুলতে চাইছেন—মেয়েদেরও সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন কিন্তু আমার মনে হয় নারী সমাজকে এ ধ্বংস এবং অকল্যাণ থেকে না বাঁচাতে পারলে মানুষের জীবনে সুখ শান্তি নেই।

নীল রক্ত

নীহার রঞ্জন গুপ্ত
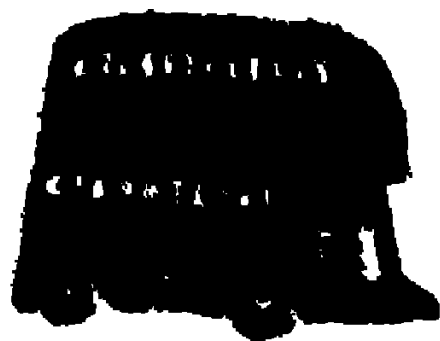
একটা যুগ।

বাইশ বছর। তা একটা যুগ বইকি।

বাইশ বছরে বিশাখার মন থেকে যদি সব ধুয়ে মুছে গিয়ে থাকে নিশ্চয়ই তাকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। সেও ভুলেই গিয়েছিল বাইশ বছরে সিদ্ধার্থ নামে তার সঙ্গে জীবনে কোন দিন কোন যোগাযোগ ছিল।

ভুলে গিয়েছিল ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জী স্ট্রীটের সেই তিনতলা লাল রংয়ের বাড়িটার কথা, মুখুজ্যেদের সেই বিরাট পরিবার।

বাড়ির কর্তা বনমালী মুখুজ্যে। সেই বিরাট লম্বা চওড়া পুরুষটি—যার আভিজাত্য ও টাকার অহংকারে মাটিতে পা পড়তো না।

হাইকোর্টের বাঘা এ্যাড্ভোকেট বনমালী মুখুজ্যে।

তিন ভাই—বনমালী, হৃদয়কালী ও সত্যকালী—প্রত্যেকেই কৃতি। একজন এ্যাড্ভোকেট, একজন ডাক্তার ও ছোটজন কনট্রাকটার।

যদিও বনমালীর স্ত্রী রাধারাণীই ছিল বাড়ির বড় বৌ ও গিন্নী—তাহলেও অন্য দুই ভায়ের স্ত্রী সুধাময়ী ও বিরজার দাপটও কম ছিল না।

বড় ভাই বনমালীরই বড় ছেলে সিদ্ধার্থ!

ইউনিভারসিটির উজ্জ্বল রত্ন।

এম, এ ক্লাশে বিশাখার সহপাঠী। কেমন করে ভাব হয়ে গেল, ঘনিষ্ঠতাও হলো—তারপরই দুজনে একদিন রেজিষ্ট্রী অফিসে গিয়ে বিবাহ করল।

সন্ধ্যার দিকে সিদ্ধার্থর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে মুখুজ্যে বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করেছিল বিশাখা। বনমালী সবে তখন আদালত থেকে ফিরে তার বসবার ঘরে বসে একটা জরুরী মামলার নথিপত্র দেখছিলেন—সিদ্ধার্থ তাকে নিয়ে গিয়ে বাপের সামনে দাঁড়াল। বাবা—

কে। সিদ্ধার্থ—এ কে?

আমার স্ত্রী—বিশাখা—

তোমার স্ত্রী !

হ্যাঁ—

তা বিয়েটা করলে কবে !

আজই রেজিস্ট্রি করে—

আমাদের এ বিয়ে জানানও প্রয়োজন বোধ করনি !

সিদ্ধার্থ মাথা নীচু করে।

তা মেয়েটির পরিচয় কি ? কার মেয়ে ?

আমাদের জীবনবাবু স্কুল টিচার তারই মেয়ে—

কোন্ জীবন !

জীবন চট্টোপাধ্যায়—

তোমার মা জানেন ?

না। বিশাখা প্রণাম করো বাবাকে—

বিশাখা এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বাধা দিয়েছিলেন বনমালী মুখুজ্যে, থাক, থাক-গোড়া কেটে আর আগায় জল নাই বা ঢাললে—

কথাটা সমস্ত মুখুজ্যে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে আধঘণ্টাও লাগল না। তারপর চারিদিক থেকে সে কি বক্রোক্তি।

স্থান হলো বটে মুখুজ্যে বাড়িতে কিন্তু সে রকম স্থান না হলেই বোধহয় ভাল হোত। ·

সিদ্ধার্থ যে একটা অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছে সেটা যেন প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

তথাপি বিশাখা টিকে থাকতে পারত—তিন তিনটে বছরও তারপর ত টিকে ছিলই—হয়ত বাকী জীবনটাও টিকে থাকতে পারত কিন্তু তা পারেনি বিশাখা কারণ শেষ পর্যন্ত স্বামী সিদ্ধার্থও ঐ দলে গিয়ে ভিড়েছিল।

প্রথম প্রায় বিশাখা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রহার জর্জরিত কোণঠাসা বিড়ালের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল একদিন রাত্রে।

তুমি—তোমরা সকলে ভেবেছো কি! তোমরা এই ভাবে চিরটাকাল অত্যাচার করে যাবে—আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাবে আর আমি তাই সহ্য করবো।

বেশত না পোষায় পথ দেখলেইত পার ? বলেছিল সিদ্ধার্থ।

· কি বললে ?

ঘরের দরজাটাত কেউ বন্ধ করে রাখেনি—খোলাইত আছে—আমারই ভুল হয়েছিল—

ভুল।

হ্যাঁ ভুল বৈকি? নচেৎ হাঘড়ের ঘরের একটা স্কুল মাষ্টারের মেয়ের যে মুখুজ্জ্যে বাড়ির বৌ হওয়ার যোগ্যতা কোন দিনই থাকতে পারে না সেটা আমার বোঝা উচিৎ ছিল—যেমন নীচ ঘরে জন্ম—যেমন দরিদ্রের মধ্যে জন্ম তেমনিই হবেত!

ভালই হলো—স্পষ্ট করে কথাটা বলে দিলে—নচেৎ আরো হয়ত অনেক দিন এই পাঁকের মধ্যেই আমাকে পড়ে থাকতে হতো—বলতে বলতে এগিয়ে গিয়েছিল বিশাখা পাশের শয়ন কক্ষে—একবছরের শিশু কন্যা কণা শয্যায় ঘুমচ্ছিল তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগুতেই সিদ্ধার্থ বলে উঠেছিল, ভুলো না ও আমার মেয়ে—যেতে হয় তুমি একলা বের হয়ে যাও—তারপরই এক প্রকার জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল কণাকে।

কণা—প্রেক্ষণা—মেয়ের নাম রেখেছিল বিশাখাই।

ও মেয়ে আমার—

না—ওর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই—সিদ্ধার্থ বলেছিল।

বিশাখা আর দাঁড়ায়নি।

বের হয়ে গিয়েছিল মুখুজ্জ্যে বাড়ি থেকে।

বাপ জীবন লাল তখনো বেঁচে।

ফিরে গিয়েছিল বিশাখা বাপের কাছেই।

তারপর তিন বছর বাদে এম. এ. ল পাশ করে হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করে।

পিছন দিকে আর কখনো ফিরে তাকায় নি।

বাইশ বছর আগেকার সমস্ত স্মৃতিই জীবনের পাতা থেকে যেন মুছে গিয়েছিল।

বছর দশেকের মধ্যেই বিশাখার প্র্যাকটিশ জমে উঠেছিল। মানুষের জীবনে অত্যাশ্চার্য অনেক সময় ঘটে। অত্যাশ্চার্য ভাবেই যেন বাড়ি গাড়ি ব্যাংক ব্যালেন্স সবই হয়েছিল—আলাদীনের প্রদীপ যেন বিশাখা খুঁজে পেয়েছিল জীবনে। অন্য দিকে সেই মুখুজ্জ্যে বাড়িতে যে ভাঙ্গন চলেছিল সেই ভাঙ্গনের মুখে মুখুজ্জ্যেদের বিরাট পরিবার ও সেখানকার মানুষগুলো বন্যার মুখে

টুকরো টুকরো কথার মতো এদিক ওদিক ভেসে গিয়েছিল। ছন্নছাড়া—লক্ষীছাড়ার মত বনমালীর আকস্মিক মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই।

সে বাড়িও বিক্রী হয়ে গিয়েছিল।

ডিভোর্সে'র মামলা সিদ্ধার্থ ই আদালতে তুলেছিল—বিশাখা কোন সাড়া দেয়নি—প্রতিবাদ জানায় নি—ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল।

তারপরই সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে চন্দনাকে।

বড় লোকের বাপের পছন্দ করা মেয়ে।

চন্দনার পরামর্শ ও তার বাপের অর্থ সাহায্যেই অধ্যাপনার কাজে ইতি দিয়ে সিদ্ধার্থ ব্যবসায় নেমেছিল।

কিন্তু কয়েক বছর পরেই সে ব্যবসায় লোকসান শুরু হলো।

মুখুজ্যে বাড়িতে তখন ভাঙ্গন শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু টাকার নেশা এমনই এক বিচিত্র নেশা যে যতই তা হাত পিছলে চলে যায় মানুষ ততই যেন তাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। আর সে কারণে মানুষ তখন যে কোন মূল্য দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। সিদ্ধার্থও হয়েছিল তাই।

সৎ অসৎ নানা উপায়ে নানা ফিকিরে সিদ্ধার্থ তার ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় যেন মরীয়া হয়ে ওঠে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হলো।

জাল শেয়ার ব্যংকে জমা দিয়ে অনেক টাকা ব্যংক থেকে তখন নিয়েছিল সিদ্ধার্থ—সেই জাল শেয়ারের মামলাতেই শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেল সিদ্ধার্থ।

পুলিশ সিদ্ধার্থকে এ্যারেষ্ট করল।

চন্দনা আগেই স্বামীকে ছেড়ে গিয়েছিল—

প্রেক্ষণা যেন চারিদিকে অন্ধকার দেখল।

মামলা চালাবার মতও অর্থ নেই। তবু কিন্তু সে হতাশ হয় না।

জেলে গিয়ে বাপের সঙ্গে দেখা করে বলে, কিছু তুমি ভেবো না বাবা। আমি যেমন করেই হোক ব্যবস্থা একটা করবো।

কি করে করবি মা? কিছুইত আর আমাদের নেই—

বাড়ি ব্যবসা সব বিক্রী করে দেবো।

তাতেও বাজারের দেনা শোধ হবে না—তাছাড়া তুই সর্বশান্ত হবি—

আমার জন্ম তুমি ভেবো না বাবা।

তোর জন্যইত আমার আজ ভাবনা মা। তোর জন্য আমি কি রেখে গেলাম—পথের ভিখারী করে দিয়ে গেলাম তোকে। সিদ্ধার্থ বলে।

তুমি ফিরে এলে আবার সব হবে—তুমি ভেবো না বাবা।

তোর মার কাছে গিয়েছিলি।

গিয়েছিলাম।

কি বললো সে ?

সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে এসবের মধ্যে সে নেই।

এই কথা বললো চন্দনা।

হ্যাঁ—আচ্ছা বাবা।

কি রে ?

আমার মাকে কখনো তুমি বলোনি, জানতে দাওনি। তার পরিচয় আর ঠিকানাটা দাও বাবা—তার কাছে একবার আমি যাবো—

কোন লাভ হবে না মা। সে হয়ত তোর সঙ্গে দেখাও করবে না।

বেশত, দেখা না করে চলে আসবো।

মিথ্যে কেন অপমানিত হবি মা।

মার কাছে মেয়ের আবার অপমান কি বাবা। ঠিকানাটা তুমি দাও—

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই সিদ্ধার্থ বিশাখার ঠিকানাটা মেয়েকে দিল।

বিশাখার বিরাট লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রেক্ষণা যেন অবাক হয়ে যায়।

তার মা এতবড় একজন ল-ইয়ার।

বিশাখা একরাশ পুঁথি পত্র নিয়ে টেবিলটার 'পরে ছড়িয়ে বসেছিল—রগের দুপাশের চুলে পাক ধরেছে। চোখে চশমা।

তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে কেন ?

প্রেক্ষণা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

বোস—

প্রেক্ষণা বসলো।

কি দরকার বলত আমার কাছে ?

আমার বাবা—

কি হয়েছে তোমার বাবার ?

আমাদের এখন টাকা নেই যাতে করে বাবার মকোদ্দমা চালাতে পারি—আপনি যদি অনুগ্রহ করে—তার মামলাটা—

কিসের মামলা ?

প্রেক্ষণা ধীরে ধীরে সব বলে গেল।

বিশাখা একটি কথাও বলে না। চেয়ে থাকে তার সন্তানের মুখের দিকে—দীর্ঘ বাইশ বছর আগে যে মেয়েকে ছেড়ে তাকে একদিন চলে আসতে হয়েছিল এবং তারপর যাকে সে আর একটিবারও দেখেনি—

মেয়ে—তার সন্তান। আজ এত বড় হয়েছে।

তোমাব নাম কি ?

প্রেক্ষণা মুখার্জী।

কতদূর পড়াশুনা করেছো।

এম. এ. পড়ছিলাম—

পড়া ছেড়ে দিয়েছো।

ছাড়তে ত হবেই—

তুমি কার পরামর্শে এখানে এসেছো ?

কারো না।

তোমার বাবা বলেছিলেন আসতে ?

না, আমি নিজেই এসেছি—

আমার পরিচয় তুমি জান।

জানি। আপনি আমার মা—

মা—

কতকাল—কতকাল ধরে ঐ ডাকটি শুনবার জন্য বিশাখার মনটা তৃষিত হয়েছিল ঐ শব্দটি কানে যেতেই যেন সে উপলব্ধি করে।

কিন্তু বাইরে বিশাখা সেটা প্রকাশ করে না।

বলে কে মামলা দেখা শোনা করছেন তোমার বাবার,

অবনীবাবু একজন জুনিয়ার উকিল আমাদের পাড়ার—

তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও কালই পত্র নিযে-

আচ্ছা—আমি তাহলে এখন উঠি—

কোথায় আছো এখন।

আমাদের বাড়িতেই—

সেখানে আর কে আছে ?

আমার এক বুড়ি পিসিমা—আর একজন চাকর—

আর কেউ নেই।

না—সব চলে গিয়েছে।

প্রেক্ষণা চলে গেল।

পাথরের মত বসে থাকে বিশাখা।

কেন সে বলতে পারল না, এখানেই থাক।—এ বাড়ি তোমার—তুমি আমার মেয়ে—আমি তোমার মা—

আদালতে আর কেস উঠলো না।

বিশাখা পাওনাদারদের সব টাকা দিয়ে—ব্যাংকের সঙ্গে মিটমাট করে নিল—ব্যাংক মামলা তুলে নিল।

হাজত থেকে বের হয়ে সিদ্ধার্থ তার মেয়ের হাত ধরে যখন বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে এলো, দরোয়ান বললে, মেমসাব্ ত নেই—

নেই—

না।

কোথায় গিয়েছেন, সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করে।

বিলাত চলে গিয়েছেন।

বিলাত। কবে আসবেন ?

মালুম নেহি—

সুখের জন্য

রজত রায় চৌ

তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামান্য একটা সরু প্যাসিজ্ পার হলেই সেই দরজাটা পাওয়া যাবে। আর কড়া নাড়ার শব্দ হবার পর অতনুই হয়তো দরজাটা খুলে দেবে।

তিনতলার সিঁড়িমুখে দাঁড়িয়ে সুমেধা অন্যমনস্ক হল। সিঁড়িটা খাড়া নেমে গেছে দোতলায়। পূর্ব দিকটা সম্পূর্ণ খোলা। হাওয়া বইছে জোরে। খোলা চুলের দু'চারটে ছিটকে এসে পড়ছে চোখের ওপর। গ্রাহ্য করল না সুমেধা।

এখন ক'টা। বারোটা হবে। কী সাড়ে বারোটা! হাতে অবশ্য একটা ঘড়ি আছে তার। সে তা-ও দেখল না। রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে বোধহয় তার তাপ বোঝবার চেষ্টা করল।

অতনুর বাড়ি থাকবার কথা নয়। অথচ সে ছিল। অন্তত জনা বলে সপ্তাহটা অতনুর ডে ডিউটি।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল অতনু, বলল, আসুন আসুন—জনা নেই? চোখ তুলে প্রশ্ন করল সুমেধা।

—আছে। বোধহয় ঘুমুচ্ছে। ওর—দরজাটা বন্ধ করতে করতে অতনু বলল।

ভেতরের ঘরে চলে গেল সুমেধা। এবং অল্পক্ষণ পরেই এ ঘরে ফিরে এসে ডিভানের ওপর শুয়ে একটা বই চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। সুমেধা বিছানায় উঠে বসল। বলল, ঘুমোচ্ছে! না! সারা রাত ঘুমোতে পারেনি—ছটফট করেছে।

পাশের ঘরে আগের রাতে ঘুমোতে-না-পারা রুগী। অতএব মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল ওরা। খবরের কাগজের আফিসে কাজ করে অতনু। খবরের কাগজ নিয়েই কথা উঠল। অতনু বলল, ভালো লাগছে না এ কাজ। সাব এডিটরির কাজ অত্যন্ত জঘণ্য—কেবল অনুবাদ আর সারানুবাদ। আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। এই দেখুন না, রাতের বেলায় যেদিন বাড়ি থাকি না,

সেদিন জনা একা থাকে। দিনের বেলার ডিউটিও দু'রকম। সন্ধ্যে বেলা প্রায় দিনই বাড়ি থাকতে পারি না। বড্ড খারাপ লাগছে।

সুমেধা হাসল। বলল, সব কাজই সমান। ওনারটাই দেখুন না! সকাল সাড়ে আটটায় বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফিরতে সাতটা-আটটা-নটা—কিচ্ছু ঠিক নেই।

আস্তে আস্তে সরু একটানা সিঁড়িটা পেরিয়ে দোতলার চাতালে নেমে এল সুমেধা। এখান থেকে ঘাড় ফেরালে সেই প্যাসিজ্‌টা দেখা যায়। সেদিকে তাকাল সুমেধা।

অতনু বেশ গাল্পিক। কত রকমের গল্প করে। যতক্ষণ ও থাকে সময়টা যেন হু হু করে কেটে যায়। সেদিন একটা টেলিফোন এল জনার। সুমেধা ডেকে পাঠাল জনাকে।

এখন বসবার ঘরের বাইরের তিনতলার সিঁড়ির মুখের চাতালে দাঁড়িয়ে সুমেধা আকাশের চিল দেখছিল।

জনা কাছে এসে দাঁড়াল; এই কি করি বল্‌ তো! বাবার না হঠাৎ ষ্ট্রোকের মতন হয়েছে। ও আজ এখনও ফেরেনি। সারারাত জেগে আসবে। অথচ আমার না গেলেই নয়—

সুমেধা অভয় দিল। তুই চলে যা। অতনুবাবু আসলে চা-টা খাইয়ে তারপর তোর ওখানে পাঠিয়ে দেব।

এই চাতালের কোণায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল সুমেধা। এক সময় অতনু এল। দরজায় তালা দেখে অবাক হল। বোধহয় কিছু সে ভাবতে চেষ্টা করছিল, সুমেধা এসে দাঁড়াল পাশে।

—সরুণ, আমি দরজাটা খুলছি—

—কী ব্যাপার, জনা কোথায়?

—হারিয়ে নিশ্চয় যায়নি—বলে মুচকি হেসে ঘরে ঢুকল সুমেধা। চা করল। এবং অতনুকে মুখ ধুতে পাঠিয়ে নিজের ঘর থেকে কিছু খাবারও নিয়ে এল।

—সব কিরকম আশ্চর্য আশ্চর্য ঠেকছে, অতনু খেতে খেতে বলল, জনা তো এরকম কখনও করে না—

—আজ যখন করেছে, তখন নিশ্চয় তার সঙ্গত কারণ আছে—সুমেধা নিজের কাপে চুমুক দিল।

—আচ্ছা, মিঃ সেনগুপ্ত, রাতে একদম ঘুমুতে পারেন না?—সুমেধা প্রশ্ন করল।

—আইনত নয়, তবে কাগজের বাণ্ডিল বা মোটা খাতা মাথায় দিয়ে টেবিলের ওপর একবার শোওয়া যায় বৈকি?

চা-পর্ব মেটার পর সুমেধা সব খুলে বলল। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অতনু।

—এখন আবার বেলঘরিয়ায় যাবেন তো?

হাসল অতনু। যেতে তো হবেই, বলে উঠল সে।

সুমেধাও উঠে দাঁড়াল। বলল, ফিরবেন তো?

—অবস্থা বুঝে। তবে, মনে হয়, আমি ফিরব। কাল আমার অফ্ ডে। একটু ঘুমও দরকার।

এবার অতনুই দরজায় তালা বন্ধ করল। তারপর সুমেধার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আপনার আন্তরিকতাটুকুতে বড় তৃপ্তি পেলাম—আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারলে বোধহয় খুশি হতাম। অনেকদিন, একটু থামল অতনু, এমন তৃপ্তির আস্বাদ পাইনি—

সুমেধার চোখে সেদিনের দৃশ্যটা ভেসে উঠল। ও ঘরে একজন রুগী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এ ঘরে বই পড়ছে অতনু।

হ্যাঁ। এবার স্পষ্ট হচ্ছে সব। সেদিন ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল জনা। নাহলে সে পরের দিন বলতে পারত না, অতনু শুধু কাজেই অসুখী নয় সুমেধা, ও মানুষটা নিজেই জানে না, ও কিসে সুখী হতে পারবে!

অতনু চলে গেছে। সুমেধা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। এ ঘরে সোফায় বসল কিছুক্ষণ। ওঘরে বিছানায় গড়াল একবার। উঠে রেডিওটা খুলল। খানিক পরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

ঘুরে ফিরে অতনুর কথা মনে পড়ছে। ঐ হাসিখুশি মিস্‌কে লোকটাকে নিয়ে জনা সুখী হতে পারছে না,—আশ্চর্য। একবার সুনিপুণের কথা মনে পড়ল। আপিস ছাড়া লোকটা বোঝে কি? সুমেধা কি কেবলমাত্র তার রাতের সঙ্গিনী হতেই জীবন কাটাবে!

মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যে বেলাটা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। রোজ রোজ কোথায় যাবে সে। একা একা যেতে ভালোও লাগে না।

হয়তো সাতটায় ফোন করবে সুনিপুণ, মেধা, আমার ফিরতে রাত হবে, তুমি খেয়ে নিও—

ঝুঁকে পড়ে দেখল সুমেধা। না, দরজায় তালা লাগানো নেই। অতনু তাহলে ফিরেছে।

চটপট নেমে এলো নীচে। সরু প্যাসিজ্‌টা পার হতেই ক' মুহূর্ত। আস্তে আস্তে দরজার কড়াটা নাড়ল সুমেধা।

অতনু হয়তো ঘুমজড়িত চোখে দরজাটা খুলবে। সুমেধা বলবে, আপনার শ্বশুরমশাই কেমন আছেন? তারপর—

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। হ্যাঁ, অতনুই দরজাটা খুলেছে। বলল, কী ব্যাপার, এই দুপুর বেলায়। আসুন—

ভেতরের ঘর থেকে জনা বেরিয়ে এল। সুমেধা শুধু বলল, তোর বাবা কেমন আছেন?

—বাবা। বাবা একটু ভাল। তুই কি কোথাও বেরুচ্ছিস? জনা প্রশ্ন করল।

—আমি? হ্যাঁ—বিশ্রাম কর তোরা—বলে আস্তে আস্তে চলে এল সুমেধা।

পেছনের দরজাটা বন্ধ হল। ওরা একবারও বলল না, আবার আসিস। জোর করল না বসবার জন্য।

সুমেধার হঠাৎ মনে হল, সে বড় একা। নির্জন। নিঃসঙ্গ।

সামাল-সামাল

আরতি সেন

বিধান চন্দ্র রায় রোডের মোড় ঘুরে বাস ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল অদূরের শালবনের ধারে পথচারী মানুষের একটি ছোট জটলা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আকাঙ্খিত বাসটি পেলাম না। সময় কাটাবার জন্য একটু এগিয়ে গিয়ে শালবনের ধারে ভীড়ের কারণটা জানবার জন্য চেষ্টা করলাম।

সমারোহে ভরা লক্ষ কোটি টাকা ছড়ান শিল্প নগরীর শোভা সৌন্দর্য্যর অন্যতম বস্তু এই শালবন—এই সাজান সৌন্দর্য্যের মাঝে আমি গুটি কতক ক্ষয়িষ্ণু মানুষকে দেখলাম। এদের আমি জানি।

সুধাই মণ্ডল পরপর কয়েক বছর অজন্মার পর কোন এক অখ্যাত গ্রাম থেকে এই শহরে খেটে খেতে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল তার বালিকা বধূ আর বৃদ্ধা মাকে। সাতপুরুষের ভিটের মায়া আর তাদের বেঁধে রাখতে পারেনি।

সুধাই মণ্ডলের গায়ের রং কালো, হাবা মুখটি নিয়ে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ঘুরে বেরিয়েছে— যদি কোথাও আশা, আর আশ্বাস পায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! এ শহরের মানুষগুলোর মনও বোধহয় ইটের পাজরে তৈরী। হৃদয় কঠোর হলেও এদের প্রবৃত্তির লাগাম বড়ই শিথিল। সুধাই মণ্ডলের খেত বছরের পর বছর খরায় শুকিয়ে গেলেও বৌটা কিন্তু না খেয়েও নধর আর তাজাই ছিল। শহরের কামোন্মত্ত মানুষগুলি বন্য লালসায় তাদের লোভী হাত সেই সবল গ্রাম্য মেয়েটির দিকে বাড়িয়েছিল।

বৌটা প্রথম প্রথম খিদের কষ্ট যে একেবারেই সহ্য করেনি—তা বল্লে অন্যায় হবে। কিন্তু দিনের পর দিন শুধু নিজের ক্ষুধার্ত পাকস্থলীর পাক দেওয়া যন্ত্রণাই নয়, বৃদ্ধা শাশুড়ীর মাটি আঁছড়ে আঁচড়ে কঁকিয়ে কথা বলাও সহ্য করে ছিল—"ও বৌ" মোকে দুটি খেতে দেনা। ও বৌ, গেলি কোথা ?"

লোল চামড়ায় ঢাকা, অন্ধপ্রায় চোখের ওপর হাত রেখে প্রখর তাপে জ্বলমান সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়ি দগ্ধপ্রায় পৃথিবীর এক কোণে বসেও সরস শ্যামল বৃষ্টি ভেজা মাঠের স্বপ্ন দেখত। বিড় বিড় করে বলে উঠতো,—"জল এলো? জল এলো নাকিরে বৌ?"

সুখাই মণ্ডল গাঁ থেকে নিয়ে আসা সঞ্চিত স্বৎ সামান্য অর্থর সাথে অনেক স্বপ্নও এনেছিল, কিন্তু হতাশা আর বঞ্চনায় তাও ফুরিয়ে যেতে সে কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গেল। সব সময় এক মুখ দাড়ি, মাথা ভরতি চুল আর শত ছেঁড়া জামা নিয়ে বন্য রক্তাক্ত চোখ মেলে কাকে যেন হেঁকে হেঁকে বলত,—"সামাল,—হেই সামাল।"

বৌটা আমাদের বাড়ী আর আশপাশের কোয়ার্টারে ভিক্ষে করে সংসার চালানর চেষ্টা করেছিল। ইদানীং বেশী আসতনা। কিছুদিন আগে সকালের দিকে গেটের বাইরে আবার ওর শুকনো গলার আওয়াজ শুনলাম—"মাগো, দুটি ভিক্ষে পাই মা।"

আমি বাসি রুটি দুখানার ওপর একটু গুর দিয়ে বাইরে এসে ডেকে বল্লাম—"ভিক্ষে কর কেন? দু-চার ঘরে বাসন মাজলেও তো পার! গৃহস্থের বাড়ী কাজ করলে তো তোমারই সুবিধে—কিছু আয় হবে।" ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় অভাগী। দেখলাম আসন্ন মাতৃত্বের ভারে ভরপুর ওর দেহটি। ম্লান কণ্ঠে জবাব দিল—"আমি কাজে বের হলে আমার শাউড়ি যে একা থাকইতে লাড়বে মা। মোর সোয়ামীও যে পাগল পারা মা। তাই তো আজ মোর এই দশা।" শীর্ণ কোঠরাগত চোখ বেয়ে উপছে পরা জল দেখে আমি আর কিছু বলিনি সেদিন।

শালবনের ধারে ছোট কুঁড়ে ঘরটার দিকে আবার নজর গেল। দেখলাম দরজার কাছে ছড়ান শীর্ণ পা-দুটি আবার একটু নড়েই স্থির হয়ে গেল। এতক্ষণ তারস্বরে চীৎকার করা যে সদ্য জাত শিশুর কান্না কানে আসছিল সেটাও একটু স্তিমিত মনে হল। হঠাৎ পেছনে একটা হুঙ্কার শুনলাম—"এই শালারা, এইখানে দাঁড়াইয়া কোন্ তামসা ত্থাখস? মায়ের দুধ খাস নাই মায়ের পোলারা?"

অপেক্ষমান জনতাকে আত্মীয় সম্বোধনে আপ্যায়িতকারীকে এক নজরেই চিনলাম। ও সেই রিফিউজী বলে পরিচিত লোকটা। এখানকার কারখানাতেই সামান্য মায়নায় কাজ করত। তারপর একদিন ছাঁটাইর কবলে পরে

বেকার হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে দমে যায়নি। অফুরন্ত প্রাণশক্তি ওর। দেখেছি কখনও লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে শ্লোগান দিয়ে সভা সমিতিতে যোগ দিতে। আবার কখনও দেখেছি মুখে ভাটিয়ালী গানের করুণ সুর ভাজতে ভাজতে রিক্সায় যাত্রী নিয়ে দ্রুত প্যাডেল করতে।

হঠাৎ সেই লোকটি নীচু হয়ে কুঁড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। বের হয়ে আসে সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে; জনতার দিকে তাকিয়ে বলে, "মা'টা তো আর নাই ছাখলাম, তাই বইল্যা কী ছাও থাকবে! লইয়া যাই—মধুর মায়ের কোলে দেই—আমার নিজের দুইটার লগে এইটারেও মানুষ করুক।"

ভিড় হয়ে যাওয়া জনতার মধ্যে কৌতূহল দেখা দিল, গুঞ্জন উঠল চারিদিকে।

সেই বুড়িটা তখনও চোখে মুখে কৃষ্ণ মেঘের সন্ধান করছে—"জল! জল এল নাকিরে বৌ?"

সুধাই মণ্ডলও জানিনা কোন্ অদৃশ্য নিয়ন্তাকে লক্ষ্য করে হেঁকে উঠল—"সামাল—হেই সামাল।"

অসুখ

নির্মলেন্দু গৌতম

অবিনাশবাবুর রুগ্নছেলেটা গোটা সংসারটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে ক্রমশঃ রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যখন ভালো ছিলো, তখন একটা স্পষ্ট এবং সুন্দর নাম ছিলো ছেলেটার। নামটা এখন সবার বিরক্তি আর অবহেলায় ক্ষয়ে গিয়ে সত্যেন্দু থেকে স্যাতা হয়ে গেছে। একমাত্র মা এখনও সতু বলে ডাকেন। সতু দিনরাত বিছানার ওপর ঝিমিয়ে প'ড়ে থাকে। সবার নিষেধ সত্বেও মাঝে মাঝে উঠে আসে জানালার ধারে। আকাশ দেখে, রোদ দেখে। তাও খুব সামান্য সময়ের জন্য। কারণ জানালার সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ। চলে আসতে হয় বিছানায়।

সংসারটা বুকের মধ্যে নিয়ে সত্যি সত্যি ছেলেটা রুগ্ন হচ্ছে ক্রমশ। যদি বাইরে পাড়ার রকে তার সকালটা কাটতো, দুপুরটা কাটতো স্কুলে, সন্ধ্যে বেলাটা কোনো সিনেমা হলের দোরগোড়ায়, তাহলে সংসারটা তার বুকের মধ্যে পাথরের মতো ভার হয়ে উঠতো না এমনি ক'রে। আর তারই জন্য ক্রমাগতঃ এমনি রুগ্ন হয়ে যেতো না।

যতোদিন যাচ্ছে; ততোই যেন সবাই নির্বোধ ভাবছে, অস্বীকার করছে সতুকে। অথচ সতু কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে সবার ভাবনা চিন্তা ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গ্রাস করছে। এখন কম পাওয়ারের আলোয় দেয়ালের ওপর কারো ছায়া দেখলে সে তার রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে যে মন, সেই মনের খবর ব'লে দিতে পারে। কিন্তু তা প্রকাশ করে না সতু। করে না এই ভেবে, নির্বোধ থাকবার মতো সুখের বিষয় আর কিছু নেই। তাছাড়া এভাবেই আরো অনেক দিন সতুকে বেঁচে থাকতে হবে। না হলে হাতেতালি দেয়া পুতুলটার মতো সবার কৌতুহল মেটাতে গিয়ে এক সময় বিকল হয়ে স্থির হয়ে যাবে সে।

ঠিক এই মুহূর্তেও এসব কথা ভাবছিলো সতু।

শীলা এলো। শীলা সন্তুর ঠিক ওপরের বোন। বয়সের পার্থক্য বছর দেড়েকের। সামান্য এই পার্থক্যটুকুর জন্যে সন্তু তাকে নাম ধ'রেই ডাকে।

শীলার দিকে তাকিয়ে শীলাকে ভালো ক'রে দেখলো সন্তু। খুব সাজগোজ ক'রে বেরোচ্ছে শীলা। এই বিকেল বেলায় এমনি সাজগোজ ক'রে বেরোবার অর্থ সন্তুর অনুভূতির মধ্যে স্পষ্ট। একটা দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ ছেলে শীলার পাশে পাশে হাঁটবে। পার্কে বসবে এক সময়। গল্প করবে, এ ওর হাতে হাত রাখবে। শীলা সবুজ রঙের ঘাসের ওপর একটুখানি শোবার মতো ভঙ্গি করে বসবে। ইস্—শীলার কি সুখ! সেই ছেলেটার কী সুখ! সুখ—সুখ, চারদিকে সুখ!

খ্যাপাটে গলায় সন্তু বললো, 'আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে যা শীলা।'

'তোর গ্লাসে তো জল আছেই।'

'গ্লাসের জল গরম হয়ে গেছে।'

শীলা একবার দরজার দিকে তাকালো। তারপর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বললো, 'এখুনি এনে দিচ্ছি। বাব্বা, খুব মেজাজ হয়েছে তোর—,

ভেতরে চলে গেলো শীলা।

একটু সময়ের জন্য উঠতে ইচ্ছে হলো সন্তুর। শীলার ব্যাগের ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে হলো। মুঠ ক'রে তুলে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে যা আছে সব। কিন্তু উঠতে পারলো না। বাঁপাটা ঝিঁ ঝিঁ ধরে আছে। তাছাড়া এখুনি শীলা এসে পড়বে জলের গ্লাস নিয়ে। বাইরে যাবার তাড়া আছে ওর।

ভাবতে ভাবতেই শীলা এলো।

'এই নে জল—আর কিছু লাগবে নাকি?'

'না।'

দ্রুত হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়েই শীলা চলে গেলো। ব্যাগের সঙ্গে শীলার যেন একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মনে হলো সন্তুর।

বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সন্তু ভাবলো, এখুনি বাবা ফিরবেন। বাবার জীর্ণ চেহারাটা মনে পড়লো সন্তুর। জীর্ণ এই ঘরের মধ্যে ভারী মানায় বাবাকে। পুরোনো ক্যালেণ্ডারের মতো সময়ের ভারে জীর্ণ চেহারা হয়ে গেছে বাবার। বাবার পাশে মাকে মানিয়ে যায় আশ্চর্যভাবে। পাশাপাশি দুটো পুরোনো ক্যালেণ্ডার যেন।

এ সব কথা মনে হলেই সতুর মনে হয় শীলা কিংবা দাদা দু'জনে যতোই সুখের জন্য ছুটছে ততোই অসুখী হচ্ছে। দাদার সঙ্গে নীরু নামের একটা মেয়ের ভালোবাসার কথা দাদা তো স্পষ্টই বলে। সিনেমা দেখা, পার্কে যাওয়া, ইত্যাদি দাদার প্রত্যেক দিনের কাজ। একটা চাকরী পেলে দাদা ওকে বিয়ে করবে এবং একটা ভালো বাসায় উঠে যাবে। শীলা যে কবে বিয়ে করে চলে যাবে তা সতু বুঝতে পারে না। তবু মনে হয় শীলা একদিন বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরবে না—যেদিন ফিরবে, সেদিন অসম্ভব কাঁদবে অভিশাপ দেবে সেই ছেলেটাকে—এবং এই ঘরের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। তারপর পুরোনো ক্যালেণ্ডারের মতো কেবল পুরোনো হওয়া।

সেদিক থেকে সতু সুখে আছে। তার ভালোবাসা তার বুকের মধ্যে। প্রাচীন চেহারা তার। অচেনা শরীরকে নিয়ে তা ঘরের মধ্যে থৈ থৈ করে। তা ব্যর্থ হয়ে যাবার ভয় নেই, জীর্ণ হয়ে যাবার ভয় নেই। কেউ তার জন্য কাঁদবে না, অভিশাপ দেবে না।

সত্যি সত্যি বাইরে বাবার কণ্ঠস্বর। সতু একটুখানি জল খেয়ে উঠে বসবার ভঙ্গীতে রইলো বালিশটা বুকের তলায় চেপে।

সকালবেলা দাদা আর শীলা তার ঘরের মধ্যেই মুখোমুখি হলো। দাদাকে অসম্ভব বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে। ভালো জামাটা দাদার গায়। পরণে চমৎকার রঙের চাপা প্যাণ্টটা। এ দুটো সতুর ভারি পছন্দ। শরীরটা ঐ রকম হলে নিশ্চয়ই একবার পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতো। কিন্তু সতু জানে এমন একটা আশা তার কোনোদিনই পূর্ণ হবার নয়।

এ দুটো দাদা নিজেই তৈরী করেছে। কোথা থেকে তৈরী করেছে তা বাড়িতে কেউ শুধায় নি। দাদার কাছে যে সদুত্তর পাওয়া যাবে না সবাই তা জানে। তবে সতু জানে এ পয়সা উপায়ের পথ আছে দাদার। সে পথটা সতুর মনের মধ্যে অস্পষ্ট, তবু একটা হাল্‌কা ধারণা করতে পারে সতু। আর তখুনি বাবা মায়ের মুখ মনে পড়ে। 'অসহায়' শব্দটা যেন ভারী পর্দার মতো বাবা মায়ের মুখের ওপর বিস্তৃত হয়ে দম বন্ধ হবার মতো একটা কষ্ট দেয় তাদের। আর সেই কষ্টের ছবিটা সতুকে আরো রুগ্ন করে। সতু তখন ছুটতে ছুটতে চলে যেতে চায়। চলে যাবার একটা জায়গা তার মনে আছে। সবুজ রঙের আলোয় টল্‌মলে একটা মাঠ। ইস্, যদি হাত ধরে ঘরদোর জিনিসপত্র বাবা মা দাদা শীলা সবাইকে নিয়ে সেই মাঠে যেতে পারতো সতু।

শীলার গলার স্বরে এবার চমক ভাঙলো সতুর।

শীলা দাদার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার পেছনে পেছনে সিনেমা হল পর্যন্ত গিয়েছিলে নিশ্চয়ই।'

'না গেলেও খবর পেতে পারি।' দাদা বিশ্রিভাবে হাসলো।

'জানি, ওই বদমাস ছেলেটা তোমার চর। দু'চোখে দেখতে ইচ্ছে করে না ছেলেটাকে।' রাগে লাল হয়ে উঠেছে শীলার মুখ।

দাদা একটু সময় চুপ করে থাকলো, তারপর বললো, 'টিকিট দুটো আজ আমায় দে শীলা, কাল তোকে এর দ্বিগুণ দুটো টিকিট দেবো।'

শীলা বললো, 'দ্বিগুণ দামী টিকিটের দরকার নেই আমার।'

'ট্যাকসি ভাড়াটাও পেয়ে যাবি।'

'তুমি নিজেই তো টিকিট পেতে পারতে!'

'আমি যখন গেছি, তখন হাউসফুল।'

'তাহলে যাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে কথা দিয়েছো তাকে হাউসফুলটা দেখিয়ে দিয়ে এসো।' বলে চলে যাচ্ছিলো শীলা।

দাদা চাপাগলায় বললো, 'শীলা—'

শীলা ফিরলো। বললো, 'টিকিট ছাড়া আর সব কথা শুনতে রাজী।'

দাদা বিমর্ষ গলায় বললো. 'তাহলে থাক—.

শীলা চলে গেলো।

দাদা হঠাৎ সতুর দিকে তাকালো, খিঁচিয়ে উঠলো, 'এসব কথা শুনছিলি বুঝি।'

কিছু বললো না সতু।

ফের খিঁচিয়ে উঠলো দাদা, বললো, 'ইডিয়েট কোথাকার। দিনকে দিন অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে।'

তারপর মুখ ভেঙচে চলে গেলো।

সতু জানে এই মেজাজটুকু শীলার পাওনা। কিন্তু শীলাকে এই পাওনাটুকু দেবার সাধ্যি নেই। ওরা একে অন্যকে ভয় করে। নাহলে দাদা শীলার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে অবলীলায় টিকিট দুটো বের করে নিতে পারতো।

তবে দাদা আজকে সিনেমা দেখবেই। নীরুকে নিশ্চয়ই কথা দেয়া আছে। সুতরাং যে কোনো একটা হলে আজ ঢুকে পড়বেই।

দাদা নিরুকে বিয়ে করে বাড়িতে থাকলেই ভালো হতো। শরীরের মধ্যে তীব্র একটা অনুভূতিকে অনুভব করতে করতে সতু ভাবলো। নীরু নিশ্চয়ই বউ সেজে দিনে বার দুয়েক এ ঘরে তার পাশে আসতো, তাকে ছুঁতো—

সতু ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হলো। নতুন বৌয়ের গন্ধ বোধহয় মদের গন্ধের মতো। মাতাল করা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। দাদার গায়ে দু'দিন সেই গন্ধ পেয়েছিলো। দু'দিনই মা দাদাকে অসহায়ভাবে বকেছিলেন। আর মদ খেয়ে ফেরেনি দাদা।

এবার সতুর কেমন ঝিমুনি এলো। শুয়ে চোখ বুজে নতুন বৌয়ের গন্ধের ভেতর একটু একটু ক'রে ডুবে যেতে চেষ্টা করতে থাকলো সতু।

আজকে সতুর জন্য মাংস এসেছে। সপ্তাহে একদিন সতুর জন্য মাংস আসে। ডাক্তারের নির্দেশ। খাটের পাশেই একটা গোল টুলের ওপর খাবারের থালা রেখে বিছানার ওপর বসে বসেই খাওয়া সেরে নেয় সতু। রান্নাঘর অব্দি যেতে হয় না ওকে। খাওয়া শেষে মা সব কুড়িয়ে নিয়ে যান। সতুর অবশ্য এমনিভাবে খেতে ভালো লাগে না। তবু খেতে হয় মা বাবার জন্য।

মাংসটাই বেশী পছন্দ করে সতু। যেদিন মাংস হয় সেদিন বেশ চেটে পুটে খায়। খাওয়াটা একটু যেন বেশীই হয়। ঘুমে ঢুলে আসে চোখ। বিকেল পর্যন্ত টেনে ঘুমোয়।

আজও খেতে খেতে ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখ। মুখ ধুয়েই লম্বা করে একটা হাই তুললো সতু।

মা সব কুড়িয়ে নিচ্ছেন থালার ওপর। ঘুমের আমেজে চোখের সামনে মা অস্পষ্ট হয়ে গেলেন। সতু ঘুমের আমেজটুকু উত্তীর্ণ হয়ে মাকে এই কথাটাও বলতে পারলো না যে মেঝেতে ছোট্ট একটা হাড়ের টুকরো চুষে ফেলেছে সে। এবং মা সবটুকু কুড়িয়ে থালায় তুলবার আগেই ছোট্ট ছেলের মতো বালিশের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে এক মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙতেই সতু চোখ খুলে দেখলো, ছাদমুখো হয়ে ঘুমোচ্ছিল সে পাশ ফিরে শু'লো এবার। জানালা চোখে পড়লো। বিকেলের ম্লান আলোয় বাইরেটা ভরে আছে। বিষণ্ণ হল সতু। ঘরে এককোণায় মেঝের ওপর একটা মাদুর পেতে মা শুয়ে আছেন। মাকে ভীষণ রোগা, এবং অসুখী

দেখাচ্ছে। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো সতুর। মাকে সুখী দেখলে সতু তার সব যন্ত্রণা থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায়।

'সতু এবার বুকের মধ্যে বালিশটা চেপে ধরে মেঝের দিকে চোখ রাখলো। চোখ রেখেই অবাক হলো। মেঝের ওপর একসার পিঁপড়ে তার দুপুরবেলা খেতে খেতে ফেলে দেয়া মাংসের এক টুকরো হাড় নিয়ে খুব আস্তে আস্তে চলেছে খাটের নীচের দিকে। হাড়ের টুকরোটাকে অনেকটা সময় ধরে চুষে তারপর ফেলে দিয়েছে সতু। ওর মধ্যে আর বিন্দুমাত্র রস ছিল না। তার মধ্যে আরো কী রস থাকতে পারে যাতে এতোগুলো পিপঁড়ে মহামূল্যবান জিনিসের মতো পাহারা দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সতু আরো ঝুঁকে পড়ে দেখলো, হাড়ের টুকরোটা সাদা হয়ে আছে। আরো খুঁজলো সতু। মনে করতে চেষ্টা করলো হাড়টাকে ভালো মতো চুষেছে কিনা। মনে করতে পারলো না। রাগ হলো হঠাৎ। আর রাগ-টাকে বুকের মধ্যে নিয়েই ভেতরে ভেতরে ছটফট্ ক'রে উঠলো। তারপর অদ্ভুত একটা কাণ্ড ক'রে ফেললো। হাত বাড়িয়ে একরাশ পিঁপড়ে মেরে ফেলে হাড়ের টুকরোটা তুলে নিয়ে মুখে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার সামনে শীলার কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো, 'এ্যাই কি মুখে দিলি মাটি থেকে?

নির্বোধের মতো এবার শীলার দিকে তাকালো সতু। একটা আশ্চর্য আত্মপ্রসাদে সতুর বুকটা ভ'রে উঠেছে। ছিনিয়ে নেবার শক্তি তার পেশীর মধ্যে গরম সিসের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যে শক্তি দাদার মধ্যে নেই। সতু তো আর কেউকে ভয় করে না। কিন্তু এতোকালের অভ্যেসের জন্য সে নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে এতোবড়ো উত্তেজনা, এতোবড়ো সংবাদটাকে চেপে রাখলো মাথায়, জিহ্বায়, কণ্ঠস্বরে।

'কিরে, বললি না? সত্যি, দিন দিন তুই অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিস।' সতুকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে শীলা মুখিয়ে উঠলো।

একটু সময় সতুর নির্বাক নির্বোধ মুখের দিকে তাকিয়ে হন্ হন্ ক'রে ভেতর ঘরে চলে গেলো শীলা। সিনেমায় যাবার তাড়া আছে ওর। এক পলক তাকে যেতে দেখলো সতু। তারপর ঝুঁকে পড়ে মৃত পিঁপড়েগুলোর দিকে তাকিয়ে আরামে হাড়টাকে চুষতে থাকলো।

চুষতে চুষতে সতু অনুভব করলো, তার পেশীর মধ্যে খুব দ্রুত কাজ চলেছে। বালিশটা বুকে চেপে ধরে নিজেকে স্থির রাখলো সতু। আজ বিকেলে সে উঠে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই। শীলার ব্যাগ থেকে সিনেমার টিকিট নিয়ে নেবে। দাদাকে এবং শীলাকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ ক'রে রাখবে। গোটা সংসারের অসুখটাই যেন তার হাতে বন্দী হয়ে যাবে। তারপর—না বড় বিস্বাদ লাগছে হাড়ের টুকরোটা। বড় স্বাদহীন লাগছে।

গোটা শরীরটা কেমন পাক দিয়ে উঠলো সতুর। আর মুখে রাখা যাচ্ছে না। থু থু ক'রে টুকরোটা মেঝের ওপর ফেলে দিলো। পাশের গ্লাসটা থেকে একমুখ জল নিয়ে অনেক কষ্টে উঠে জানালা দিয়ে জলটা ফেলে দিলো কুলকুচো করে। তারপর এসে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর।

বালিশটা বুকে চেপে ধরে দুর্বলভাবে অনেক কথা ভাবলো সতু। ভাবতে ভাবতে অসহায়ভাবে চোখ বুঁজলো। চোখ বুঁজেই অনুভব করলো সে যা চিবিয়েছে এতোক্ষণ, তা তার নিজেরই উচ্ছিষ্ট জিনিস। আর যাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আদৌ তারা ছিনিয়ে নেবার জীব নয়। গোটা সংসারের রুগ্ন চেহারাটা তাকে যে রুগ্ন মন দিয়েছে, সেই রুগ্ন মনটাই তাকে বিভ্রান্ত করেছিলো কয়েকটা মুহূর্তের জন্য। মৃত পিঁপড়েগুলোর জন্য কষ্ট বোধ করলো সতু। আর সেই কষ্টেই সম্ভবতঃ সতুর দুর্বল শরীরটা হঠাৎ কান্নায় অসম্ভব করুণ হয়ে গেলো। এবার চোখের সামনে সতু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গোটা সংসারটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে আরো দ্রুত রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে সে।
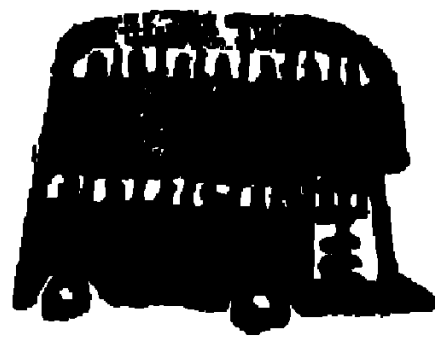
দৈনন্দিন

ঊষা ভট্টাচার্য

সুকুমারী মামীমার ঐ হাসি ঝলমল চোখের তারা দুটি চুইয়ে জলজলে ফোঁটাগুলি যখন তার রুজ পাউডারলিপ্ত কপোলদ্বয়ের ওপর দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো, তখন আমরা যেন কেমন হকচকিয়ে বোবা মেরে গেলাম! জাফরানী রং, ফ্রিলের ঢেউ-খেলান ফ্রকের ওপর, সাদা নাইলনের ঘোমটা অর্থাৎ 'ভেইল' পরা টুকটুকে এক জোড়া খুকু, সুকুমারী মামীমার এই ব্যাপার দেখে, হাউমাউ করে কঁকিয়ে কেঁদে মাকে ঝাপটে ধরে ফোঁপাতে লাগলো—"মা মণি গো আমাদের কি হবে গো, সে কি আর আসবে না গো, বাবামণির কি হলো গো। মা মণি গো বলো না গো।" দুটি বোনে সুর করে কেঁদে কেঁদে মায়ের জলোনীল চান্দেরী সিল্ক-শাড়ীটিকে একেবারে চোখের জলে জলে চুপসে দিতে লাগলো।

সুকুমারী মামীমা কিন্তু তেমনি স্থির। কন্যাদ্বয়ের এই দারুণ বিলাপ তাকে একটুও বিচলিত করতে পারলো না। তাঁর চোখের ধারা তিনি নীরবে বিসর্জন করতে লাগলেন আর মাঝে মাঝে তাঁর কিঞ্চিত-স্থূল দেহটি এক একটি ঝাকুনি খেয়ে কেঁপে উঠেই আবার স্থির হয়ে যেতে লাগলো। সমস্ত ব্যাপারটাই এক অতি গম্ভীর শোকের অভিব্যক্তি।

একটু আগেই আমরা ঘন্টা তিনেকের চেষ্টায় আমাদের উৎসবোপযোগী সাজ শেষ করে তিন বোনে মামীমার ঘরে এসে একেবারে হতচকিত। অতি করুণ মুখ করে সুকুমারী মামীমার চোখের দিকে চোখ রেখে আমরাও প্রহর গুণতে লাগলাম। ভাল করে নজর করতেই দেখলাম সুকুমারী মামীমার চোখের ধারায় কোন বিরতি নেই। তিন বোনের কেউ কক্ষের নীরবতা ভাঙ্গতে সাহস পেলাম না।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদেরও চোখ টন্ টন্ করতে লাগলো। হঠাৎ চমকে উঠলাম আমি, একি! ভুল দেখছিনা ত? না আমার চোখের পাতা ভিজে

ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি! সুকুমারী মামীমা কি শেষে শোকে পাগল হলেন নাকি? না এ রাগের চরম পরিণতি!

বিয়ে বাড়ী যাবার জন্য ঐ মনভোলান শাড়ীটিত পরেছেন। শাড়ীর গায়ে যেন সাগরের নীল ঢেউ খেলে খেলে যাচ্ছে। হালকা নীলে জরির ঝলক ওর সমস্ত দেহটিকে ঘিরে ঘিরে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। আহা চোখ জুড়ান শাড়ীর রংটি। তেমনি সুন্দরী আমাদের সুকুমারী মামীমা। ও মুখে একবার চোখ পড়লে, একবার স্থির দৃষ্টি হানতে হবেই। বড় মিষ্টি ওর মুখের গড়নটি। আর তেমনি হালকা গোলাপ পাপড়ি রং যেন গায়ে লিপে রয়েছে। বিয়ের সময় অনেকেই বলতো, 'কলকাতার বড় বাড়ীর মেয়ে, বিয়ের কনে সাজাবার আগেই তাকে সারা গায়ে রং করে আনা হয়েছে। সবাইকে শুনিয়েই এ কথাগুলি বলেছিল ওঁর ননদিনীরা, আমার মা, মাসীমারাও এ দল থেকে বাদ পড়েন নি। পরে দশবর্জনের দিন অহেতুক কয়েক ঘড়া বেশী জল ঢেলেও যখন গায়ের রং একটুও ফিকে হলো না, ননদিনারা সবাই কেমন একটু থাবড়ে চুপসে গেলেন। সবাই ভাবলেন বিয়ের খাটাখাটুনিতে গলা বসে গেছে তাই আর নব বধুর গায়ের রং-এর কৈফিয়ত নিয়ে আর কেউ গলা তুলছেন না।

তারপর, পর পর ঐ সুকুমারী মামার দুটি খুকু হল। কিন্তু রং এর একটুও শেড্ বদলাল না, না হ'ল মুখের গড়নের এতটুকু নড়ন চড়ন। তখন ননদিনীরা আবার মুখ খুললেন—বলেছিনা সাহেব বাড়ী থেকে যত সব বিলেতী রং আর কত সব অসুধ বিসুধ একেবারে সব কায়েমা করে দিয়েছিল মায় দেহের গড়নটি। অবশ্যি তখনও প্ল্যাস্টিক সাজারীর চলন হয়নি আমাদের দেশে। ননদিনাদের দুরদৃষ্টির তারিফ করতে হয়।

কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। হায় হায় এ কি? শাড়ীর নাচে শুধু ব্রা…। ব্লাউজ কোথায়! আজকাল অবশ্যি হাতকাটা ব্লাউজ সবাই পরেন, কি উৎসবে, কি বাড়ীতে। কিন্তু সুকুমারী মামীমা! নাঃ। সে হবার জো-টি নেই। আমরা একটু ছোট হাত পরলেই মামীমার চোখ এড়াবার উপায় থাকে না। অমনি দরজি বৌকে ডেকে সমস্তগুলো ব্লাউজ তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলবেন—"শুনেছ দরজি বৌ! তোমার কর্তাকে বলবে, এমনি হাতকাটা জামা যেন এ বাড়ীতে না ঢোকে। সবগুলি ব্লাউজই অন্ততঃ ইঞ্চি তিনেক করে হাতের ঝুল বাড়িয়ে দিয়ে তবে পাঠাবে। আমায় দেখিয়ে তবে মেয়েদের দেবে।" যখন জামাকটি ফিরে এলো প্রত্যেকটির সে এক রূপ। লাল

ব্লাউজে তিন ইঞ্চি কটকটে হলুদ, হলুদে তিন ইঞ্চি গোলাপী— সে এক কাণ্ড। তারপর আর আমরা 'ম্যাগীয়ার' বা 'স্লীভলেস্' ব্লাউজের দিকে ঝুকতে সাহস করি নি। এ হেন স্বকুমারী মামীমা আমাদের ওপর টেক্কা মেরে একেবারে 'টপ্‌লেস্' ধরবেন ? না সে কখনোই হতে পারে না। কিন্তু নিজের চোখকে কেমন করে অবিশ্বাস করব। দুতিনবার জোরে জোরে চোখ দুটো দুহাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চটকে নিলাম। না সেই একই অবস্থা। স্থির মূর্ত্তি মামীমা, কিন্তু শাড়ীর নীচে সত্যিই ব্লাউজের লেশমাত্র চোখে পড়ছে না।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে অগত্যা আমার ছোট বোন, ডান পাশে সোফায় বসে পড়েছিল, ডান কনুই দিয়ে ওর হাড় জাগানো পিঠের কোণে এক গুঁতো দিতেই চমকে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। দেখলাম ওর চোখেও ঐ একই জিজ্ঞাসা, "মামীমার হ'লো কি ?"

এত ভুলো মন ত নয় মামীমার। চোখের কাজল ঠোটের হালকা গোলাপী রং আর দুটি রঙ্গীন বাঁকা ধনুকভ্রু দেখে মনে হলো আমাদের চাইতে কম যায় না। ঘণ্টাভর সযত্নে সাজগোজ হয়েছে, তবে ? তবে ব্লাউজ পরতে ভুল হবে কেন ? এবারে বাঁ পাশ থেকে আমার কনুইতে আলতো একটি চিমটি। উঃ বলতেই উৎকণ্ঠা মুক্ত হবার আশায় মেজোর অর্থাৎ মেজো বোনের চোখে চোখ হতেই আবার হতাশা। নাঃ, একি বিপদ ! মামীমা শেষে পাগল হয়ে গেলেন —অথচ এই তার শোকপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাকে কি করেই বা স্মরণ করিয়ে দিই যে, কী নির্লজ্জ ভুলের মাসুল তিনি দিতে চলেছেন।

এদিকে ততক্ষণে জোড়া খুকুর ফুঁপিয়ে কান্না বন্ধ হয়েছে। মায়ের আদর পাবার আশায় ছোট খুকু মায়ের বুকে মুখ গুঁজতে গিয়েই চমকে উঠলো। আমরা তিন বোনে একসঙ্গেই একটু নড়ে বসলাম উৎকণ্ঠায়। যদি কিছু সুরাহা হয়। আর সুরাহা ! ছোট খুকু তার আধ আধ আদুরে গলায় বলে উঠলো, ও মামণি গো, ছিঃ ছিঃ গো। এমা তুমি এন্টু।

বড় খুকু ছোট বোনের সুর নকল করে বলে উঠলো—ও মামণি গো ছিঃ ছিঃ ! তোমার এলো গা, তুমি ব্লাউজ পড়তে ভুলে গেছ গো।

হঠাৎ যেন হিমালয়ের হিম প্রবাহ গলে গেল। সমস্ত ঘরের নীরবতা ভেঙ্গে আচমকা সুকুমারী মামীমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

বললেন, "সবই ত আমার কপাল ! সেবারে রানাঘাটে দাদার মেয়ের ননদের বিয়েয় গিয়েই ত আমার এই বিপদ ! মাথাটা আমার আর ঠিক রইল

নারে। 'তুমি, অমি আর নমি তোরাভাই তিন বোনে মিলে আমায় একটু ধরে নিয়ে ও ঘরে খাটে শুইয়ে দে রে। তোদের সেজ মামা এসে যেন আর আমার জ্যান্ত মুখ না দেখেন।" বলেই তড়াক্ করে উঠে গিয়ে নিজের দুগ্ধ-ফেননীভ পাখীর পালকের তৈরী তোষকের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন।

আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ওঁর পিছু পিছু গিয়ে ওঁর শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম, একে একে। যাক, তা হলে সেজোমামার কিছু হয় নি। বাঁচা গেল !! সেই যে ছোট খুকু বড় খুকু কেঁদে কেঁদে বলছিল সুর করে—'বাপী মাণর কি হল গো ? আমরা ও আর দেখতে পেলেম না গো' ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত বিলাপ কথা। ও সব তা হলে সেজমামাকে উদ্দেশ করে নয়!

মেজ কিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলো—'তা হলে সেজমামার কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।' মামামাকে বললে—'তাহলে মামী তুমি এত কাঁদছ কেন ? দেখলে ত কেঁদে কেঁদে নতুন চাঁদেরী শাড়ীটা তোমার কি হয়ে গেল ? "খুকুমানদের আর তোমার চোখের জলে আর কাজলে মেখে শাড়ীর গায়ে ছোপ ছোপ দাগ ধরে গেলো মামীমা।" ছট করে বলে ফেললে ছোট বোনটা। আমার মুখ থেকে কথা না বের হতেই, বড় খুকু বলে উঠলো—"মামণি গো এখনো সময় আছে গো, তুমি উঠে ব্লাউজটা পড়ে নিয়ে শুয়ে থাকগো, যেন বাপামণি এলেই আমরা রওনা হয়ে যেতে পারি গো। কখন্ আর আমরা নিত কনে সাজব গো !!"

এবারে আবার আমার মেজো বোনের কথা শোনা গেল। "মামিমা জড়োয়া গুলিও চাপিয়ে নাও। অনেক সময় ত নেই ই, তাছাড়া একটা একটা করে মিলিয়ে মিলিয়ে গহনা পড়তে পড়তেও ত তোমার সময় লাগবে অনেক।"

এবার অনেক দুঃখেও যেন মামীমার গালে টোল খেয়ে সেই পরিচিত হাসিটি ভেসে উঠলো।

"শোন তবে বলি", মামীমার কণ্ঠে যেন মধু ঢালা—মিষ্টি নরম গলায় বলে গেলেন—'সেবারে যখন রাণাঘাটে যাই—দাদার মেয়ের ননদের বিয়েতে, গৃহস্থ বাড়ী পয়সাওয়ালা লোক ওরা, একটা গহনাও বাদ দিইনি। গ্রামদেশে বিয়ে বাড়ী, সেখানে গহনার চলন আজো আছে। যে যত পরতে পারে, সেই তত বড়লোক। আর অল্প সল্প সোনা কারো চোখেই লাগে না। আর পয়সাহীনকে কেই বা মানে বলো। এই ভেবেই সবগুলি ভাল জামা কাপড় বাছাই করে, আর পেটরা ধরে সব গহনা নিয়েই দাদার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম।

বিয়েত চুকে গেল। শেষ রাত্রিতে সমস্ত পুরী ঘুমন্ত। এমনি সময় দাদার মেয়ের পিসশাশুড়ীর এক বুক ফাটা চীৎকার সমস্ত বাড়ীতে হৈ হৈ—চোর এসেছিল! সেজ পিসির গরম বেশী, পাড়া গাঁয়ে বিজলী পাখা নেই, গা খুলে মেঝেতে শীতল পাটিতে গা এলিয়ে দিয়েছেন—হঠাৎ মনে হল কে যেন গলায় ফাঁস দিয়ে টানছে। আসলে ফাঁস নয়, দোরের নীচে চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে লম্বা বিশভড়ি ওজনের চন্দ্রহারটি গড়িয়ে খানিকটা বাইরে ঝুলে পড়েছিল। চোর সেই হারটি ধরে টানছে, কিন্তু হার নয়ত যেন 'কাছি'। মোটা হার টেনে বেচারা চোর ত ছিঁড়তে পারলই না, মাঝখান থেকে সেজ পিসির গলায় চিরকালের জন্য একটা কাটা দাগ বসে গেল।

ব্যাস্ ওর ত গলায় দাগ বসলো—আর বাড়ী ভর্ত্তি মেয়েদের দাগ বসলো বুকে। দাদার বেয়াই মশাই রাসভারী লোক। সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত সবাইকে বিছানায় বসেই রাতকাটাবার হুকুম দিলেন। নিজে বন্দুক উঁচিয়ে নিয়ে সারা বাড়ীর আনাচে কানাচে টহল দিয়ে চললেন। সকাল হতেই হুকুমজারি, মেয়েরা সকলেই গহনা খুলে ফেলুক, একমাত্র বিয়ের কনে ছাড়া। তাকে পাহারা দিয়ে সসস্ত্র অবস্থায় সন্ধ্যায় শ্বশুরালয়ে পাঠান হবে। অন্যরা যে যার পোটলা বেঁধে, প্যাক করে আমার কাছে, অর্থাৎ দাদার বেয়াই মশায়ের ঘরে, নিজ নিজ নাম লিখে, পাঠিয়ে দিক।'

সকাল আটটায় সদর থেকে পুলিশ আসবে তাদের প্রহরায় ভিন্ন ভিন্ন নামের কাঠের বাক্সে সব মেয়ে-বৌদের, মায় গিন্নিদের দামী কাপড় জামা বন্দী হয়ে বড় কাঠের সিন্দুকে ভর্ত্তি হয়ে সদরের কাছারী বাড়ীতে লোহার সিন্দুকে নিরাপদে মজুদ রাখতে পাঠান হবে। হল বিপদ! কুটুম্ব বাড়ী, আমি ত আর অমান্য করতে পারি না—কর্ত্তা ব্যক্তির হুকুম! ওরা কি আমার জন্য বিপদগ্রস্থ হবেন? আর গহনার মর্ম ওঁরা কিই-বা বুঝবেন? হতেন মেয়ের জাত, তা হলে বুঝতেন শাড়ী আর গহনার আকর্ষণ কি? স্বামীর চাইতে প্রিয় কিনা? একে বাদ দিয়ে মেয়েদের জীবনের কী-বা সৌন্দর্য্য আছে বল!

দাদার হুকুম হ'ল, 'সুকু তুমি গহনা নিয়ে ট্রেনে যাবার কথা ভেবো না। আজ কাল এ লাইনে ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে। আর গাড়ীতে, অর্থাৎ

মোটরে সর্বদাই লেগে আছে দুর্ঘটনা। তোমার গহনার বাক্সে দামী শাড়ী জামাও রেখে দাও। তোমার খুকুদের দামী পোষাকও রেখে দেবে। তোমার বৌদির কাছ থেকে আটপৌরে সুতির কাপড় পরে বাড়ী যেও। আগামী চৈত্রে, জমিদারীর টাকা ব্যাঙ্কে, ট্রেজারীতে পাঠাবার সময় বেয়াই মশায়ের বাড়ীর মেয়েদের জিনিসের সঙ্গে তোমার জিনিসও কলকাতায় যাবে। সেখান থেকেই তোমার জিনিস তুমি ফিরে পাবে। জিনিসের জন্য তোমার কোন ভয় নেই!'

মর্ম বেদনা মনেই চেপে নিরাভরণ হয়ে একবস্ত্রে নিজের গৃহে ফিরে এলাম। যেন কোন দুর্দিন এসেছে হঠাৎ আমার জীবনে। দাদার ওপর কথা বলা চলেনি শিশুকাল থেকেই। আজ এই কুটুম্ব বাড়ীতে তার অন্যথা হতে পারে কি?

জানিস অমিতা, নমিতা, শমিতা, তোরা তখন লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়েছিলি, তোদের কলেজ ছুটি হতে বাবা মার কাছে। এখবর তোদের কাছে আর দেবে কে? আর এই ত দশদিন হ'ল ফিরে এলি। ভীড়ে ভারে আর একথা তোদের বলতেও পারি নি।

উৎকন্ঠিত কণ্ঠে বলে উঠলাম তিন বোনে, 'এখন উপায়?'

'সেই উপায় করতেই তো তোদের সেজ মামা গিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় কল্যাণীতে বিয়ে, আমার ন' নন্দাই-এর খুড়তুত বোনের। কলকাতায় হলেও না হয় গিল্‌টি বা রোল্ড গোল্ড কিনে চালিয়ে দিতাম। কিন্তু ওসব যায়গায় মেকি গহনা পরে যাই কি করে! এই দেখ, শাড়ীটা আছে, এর জামাটা অর্থাৎ ব্লাউজটা নেই। শাড়ীর ম্যাচিং ব্লাউজটা, সেই টমির যখন দাঁত উঠেছিল। একদিন রাত্রি বেলা অসাবধানে মেঝেয় পড়ে যায়। সারা রাত জেগে টমি আরো তিন পাটি চটির সঙ্গে, দাঁতে কেটে কেটে তুলো পেঁজা করে রাখে। আমার এত সখের জরির চান্দেরী বুটিদার ব্লাউজটা গেল তো, আর শাড়ীর কি বাহার রইলো বল তোরা।'

আমাদের তিন বোনের গলা দিয়ে গলিয়ে গেল একটি শব্দ "আহা!!"

'আর আহা, তোদের সেজোর এখন ব্যবসা মন্দা, বললাম ঠিক আছে—আর পয়সা খরচ করে নতুন ব্লাউজ করে কাজ নেই। ফিকে নীল বেনারসীর ব্লাউজটা দিয়েই কাজ চালিয়ে দেব। তখন আর

কি মনে ছিল যে গহনার পেটরায় দামী শাড়ীর দোসর হয়ে নীল সাচ্চা বেনারসীর সঙ্গে ব্লাউজটিও মজুদ রয়েছে।—আর পড়বি ত পড় যেন নির্মেঘ আকাশে বজ্রনির্ঘোষ। এটা যে বিয়ের মাসরে! তা কম করে দশটি নেমন্তন্ন আস্‌ছে। যাক্‌, একই শাড়ী পরে ত আর দুটো বিয়ে সামলান যায় না। আর দুম্‌ করে এই নেমন্তন্ন,—আগে থেকে তৈরী হবার সময়ই কি দেয় এরা। রবি দাদার এই শেষ কাজ ন' নন্দাই লিখেছেন—না গেলে কি হয়? আর ন' দিদিরা কল্যাণীতে বাড়ী করবার পর আমরা ওদের বাড়ী এর আগে যেতেই বা পারলাম কোথায়! তাই রাত পোহাতেই তোদের সেজমামা পাঁচটার গাড়ীতেই চলে গেছেন রাণাঘাট। বিকেল তিনটের এখানে পৌঁছে যাবেন! ফিরতি ট্রেনে সাড়ে চারটায় আবার আমরা রওনা হয়ে যাব।

"আর এখন? এখন হলো রাত আটটা! কখন যাব বল? আর গাড়ীই বা কোথায়? শেষ গাড়ী ত ন'টায় ছাড়বে! তাই একেবারে কাপড়টা পরেই রয়েছি! উঁ ফিরে এলেই যেন ব্লাউজটা পরে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে পারি। কোন মতে গহনাগুলো পরে নিতে পারলেই হল।

'ঐ ছাখ্‌, সদর দরজায় বেল বাজলো না! এসেছেন এসেছেনরে তোদের সেজমামাবাবু, এসে গেছেন। ওরে ও বড় খুকু? ও ছোট খুকু! ওঠ্‌, ওঠ্‌,—। ঘুমোলি নাকি রে! ওঠ্‌, ওঠ্‌, উনি এসে পড়েছেন! আহা কাঁদতে কাঁদতে শিশু দুটো ঘুমিয়ে পড়লো! খাওয়াও হবে না। সেই চারটে থেকে......অপেক্ষা করছি, আর কত সয়। ন'পিসের শখ আমার খুকুরাই টুকটুকে বলে নিত্‌ কনে হবে আজ বিয়ে বাড়ীতে। হায়রে আশা! "ওগো তুমি তৈরী হয়েছ ত? তৈরী হয়েছ ত?" বলতে বলতে আমাদের নাদুস্‌-নুদুস্‌ সেজ মামা ঘাম্‌তে ঘাম্‌তে হাত খানেক চওড়া আর দেড়হাত লম্বা একটি কাঠের বাক্স প্রায় ঘাড়ে চাপিয়ে এনে ঢিপ্‌ করে ঘরের মেঝেতে ফেলেই খাটের ওপর প্রায় নিজেকে ছুড়ে দিয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে রইলেন।

"বুঝলে তোমরা সেজে নাও। আমি ততক্ষণে একটু হাত পা টান করে নি। কি বল খুকু?"

মামীমা ততক্ষণে বাক্স হিঁচড়ে টেনে ড্রেসিং রুমে ঢুকে পড়েছেন।

আমরা নীচু গলায় মামাকে বল্লাম—বেশ একটু রাগত কণ্ঠেই—"তোমার কি জ্ঞান সেজ মামা? এই রাতে কি করে এখন যাই বলত আমরা বিয়েতে?

বিয়েত শেষও হয়ে গেল বুঝি! দশটায় আর পৌঁছন হ'ল না। এত রাতে মোটর গাড়ী করে যাওয়াও হবে না।

মেজো বোন ফোঁস করে উঠলো—"তুমি সকাল পাঁচটায় বেরিয়ে রাত আটটায় এলে? আমি হলে চার বার যাওয়া আর আসা শেষ করতে পারতাম।"

ছোট বোন কান্নাভাঙ্গা স্বরে বললে—"বিয়ে ত দেখতেই পারলাম না, খাওয়ার পাটও চুকে গেছে। আমার বন্ধুরা সবাই বাড়ী ফিরেও গেছে! তুমি কোথায় ছিলে সেজ মামা! 'অ্যা'! কি কথা বলছ না যে! ঘুমিয়ে গেলে নাকি? ও সেজ মামা, কথা বলছ না কেন.........! ঘুমিয়ে গেলে নাকি খুকুমণিদের মত...... !

"নারে না!' ক্লান্ত কণ্ঠে মামা বলে উঠলেন "নারে, না—ভাবছি.........!"

নমি রেগে উঠে বললো—

"রাত কাবার করে এলে, এখন আবার ভাবছ?"

"ভাবছি সারাটা দিন কি করে কাটলো। সে এক মজা...।

"হাঁ, মজাতো তোমার পায়ে পায়েই। সে কি আর আমরা জানি না? না এটা কোন নতুন খবর?—ছোট বোন শমিব কণ্ঠে অভিমানের সুর "বলই না কোথায় ছিলে, পোনের ঘণ্টা হলো বাড়ী ছাড়া তুমি। সেই উধাউ হয়েছ আর এখন আবার চোখ বুজে ভাবছ? কার কথা ভাবছ—বল দেখি?"

সেজ মামা চোখ বুজে বুজেই বলতে লাগলেন—

"জানিস ত গহনা আর কাপড়ের বাক্স ব্রজেনবাবুর কাছারী বাড়ীতে জমা পড়েছিল। সুতরাং প্রথমে কাছারী বাড়ী হয়ে সাত মাইল দূরে গ্রামে যেতে হল গরুর গাড়ী করে বেয়াই মশায়ের Counter Signature আনতে। সিন্দুক খোলবার জন্য তার লিখিত হুকুম চাই। তার পর আবার সাত মাইল গরুর গাড়ী করে কাছারী বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন। জমিদার বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আহার না করে এলে তাঁদের 'মানে'

লাগে। সুতরাং পুকুরের তোলা মাছের মুড়ি দিয়ে মুড়ি ঘন্ট, রুই মাছের মাথা, আর বাগানের সবজীর সঙ্গে গোয়ালের গরুর দুধে ক্ষীরের সন্দেশ আর পাতলা ক্ষীর পাতে না পড়লে আভিজাত্য থাকে না। আমার ক্ষীণ উচ্চারিত আপত্তি বেয়াই মশায়ের দরাজ গলার আপ্যায়নে নিমিষেই তলিয়ে গেল।

"বেশ রান্না হয়েছিল রে! মনে হ'ল বিয়েবাড়ীর নেমন্তন্ন তা হলে এখানেই সেরে নেওয়া যাক।"

তারপর বেলা তিনটে নাগাদ ত কাছারী বাড়ীতে এসে পৌঁছান গেল। সেখানে তখন গোলাপে করে সরবৎ এলো। জমিদার বাবুর বেয়াই আমি, খাতির চাই। না করবার উপায় নেই।

সর্বপর্ব শেষ করে আবার সেই সিন্দুক খোলার পালা। জল পাহারার ব্যবস্থা, তারপর বেছে, মিলিয়ে, হিসেব করে, নাম পড়ে, সিল মেরে— ; তবে বাক্স এলো আমার আয়ত্বে। বাক্স নিয়ে এলাম ষ্টেশনে, তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে—পাঁচটা বাজে বাজে। গাড়ী আসতে আরো আধ ঘন্টা দেরী। হঠাৎ দেখি, কলকাতা থেকে আসা গাড়ী প্ল্যাটফরমে ঢুকতেই একদল লোক হৈ হৈ করে নেবে এলো—প্ল্যাটফরম ভরে গেল নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রে। সামনে আমার ছোটবেলার বন্ধু ধীরেন, আমার নাম ধরে তারস্বরে চীৎকার করছে। বললাম, "কি রে? ব্যাপার কি? চীৎকার করছিস কেন? এই সমারোহ কিসের!!"

যা বললো, তার মর্মকথা হ'ল আমাকে সে কিছুতেই ছাড়বে না এখন, তার বাড়ীতেই জলসা, আর সেই বাড়ী এই ষ্টেশনের গায়েই—এখান থেকেই বাড়ীর ছাত আর পূব কোণের নারকেল গাছের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।—ওস্তাদরা হাজির, সুতরাং বুঝতেই পারছিস আমার অবস্থা, গানে আমায় পেয়ে বসলো।

আসরে স্বরং কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করে যখন সম্বিৎ ফিরে এলো, তখন ও দিকের Train আসবার আর মিনিট কয়েক দেরী। অগত্যা কোন রকমে ছুটতে ছুটতে এসে চলন্ত গাড়ীর হাতল ধরে ঝুলে পড়লাম। একটা সিট খুঁজে বসেও পড়লাম। ওস্তাদের গানের কলি আর সুরের তানগুলো তখনও কাণের পাশেই ঘুর ঘুর করছে। মৃদুকণ্ঠে নিজেও সুর ভেজে চলছি। গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে আসছে। Next Station-এ গাড়ী in করছে। অনেক ঠেলাঠেলির মধ্যে, অনেক কুঁচো কাঁচা নিয়ে আর গিন্নীকে নিয়ে এক ভদ্রলোক

হুমরি খেয়ে একেবারে আমার ঘারের ওপর এসে পড়েছেন। পেছনে দাঁড়িয়ে কুলির মাথায় মস্ত একটি ট্রাঙ্ক।

ট্রাঙ্ক!! 'বাক্স' এর এদিক ওদিক দেখেও অন্য কোন ট্রাঙ্ক আবিষ্কার করা হল না—আর বাক্সই বা কোথায়, সবই ত জনগণ উপড়ে নিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে।

হঠাৎ স্মৃতির দোর খুলে গেল।

বন্ধু পত্নীকে বলেছিলাম, বাক্সটা আপনার ঘরে সাবধানে রাখুন, যাবার সময় নিয়ে যাব। যাবার সময় অতি ব্যস্ততায় আর তাঁর কাছে বিদায় নেওয়া হয় নি।

তড়াক্ করে নেমে পড়লাম প্ল্যাটফরমে। ভাগ্যিস আর—Train Pass করছিল বিপরিত লাইনে। কোন রকমে মরি কি পড়ি করে উঠে পড়লাম। আবার Next Station এ অবতরণ।

বন্ধুর বাড়ীতে তখন সবাই গানে ডুবে গেছে। নিজেকে কোনমতে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে এসেছি। এই নাও তোমাদের শাড়ী গহনা!...আহা!! কি ওস্তাদী মেজাজ!!...' আহা! জান সুকু এখনো সুরে সুরে কাণ আমার ভরে...॥

সুকুমারী মামীমা গহনা এবং ব্লাউজ চাপিয়ে এতক্ষণে হাজির। "হয়েছে আর তোমার মেজাজে কাজ নেই—এবার সুর কেটে ওঠে পড় আবার!! চল্ চল্ ওরে ও অমি! খুকুদের তোল না!

আমি অবাক হয়ে ভাবছি আমার সুকুমারী মামীমা কি করে এই "গানে পা ওয়া" মামাকে নিয়ে—এমনি শান্ত মেজাজে সংসার করেন?

মেজো বোন নমি এবার ধৈর্য্য হারাল—প্রায় চেঁচিয়েই বলল—"মামী—তুমি রাগ করনা?" মামী হেসে উত্তর দিল—"এতো আমার দৈনন্দিনের কাহিনী! রাগ করলে আর বিয়ে দেখা হয় কি?"

আর এক ঝলক হাসির সঙ্গে মামীর গৌর নিটোল গালের ওপর টোল দুটি আবার জেগে উঠলো।

সহজ

কৃষ্ণ ধর

খুব সহজে কথা বললে ওরা বুঝতে পারে
খুব সহজে ওদের ঘুম আসে খুব সহজে ঘুম ভাঙে
এরা কেউ বড় চিন্তাভাবনা মগজে নিয়ে চলাফেরা করেনা
এরা কেউ অনিদ্রায় ভোগেনা
সহজ সূর্য ওঠার মতো ওদের জাগা এবং
দিনভর জ্বলন্ত ডায়নামো সূর্যের মতোই ওদের বিস্তর কাজ।
ঘামে শরীর নেয়ে ওঠে খিদেয় পেট কুঁকড়ে যায়
অবসাদে শিরদাঁড়া টনটন করে
ওরা সহজ কথাটাই বোঝে
ভাতের দাম কত বেশি,
অথচ ভাতের বীজ ওরাই বুনেছিল
আজ একথালা ভাত পেলে ওরা গোগ্রাসে গিলত
যেন চুরি করে পাওয়া।
এমনি ওদের কপাল
ওরা সহজ বলেই সহজ অধিকারটা
ওরা নিতে পারে না।

ফুলের বন্দর

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কথার ফুলেরা যদি গন্ধ নিয়ে ছোটে
একদিনে ভালোবাসা প্রেম-প্রীতি-লো
জীবনের অস্তিত্বের গোলাপি আভায়
হাজারো প্রাণের রাজ্যে অধিকার পায়

একটি কথার কলি রঙ-রূপ-গন্ধে
আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আনন্দিত ছন্দে
মৌমাছি প্রাণের তীরে পরাগ সংযোগ
আগ্রহের আতিশয্যে সুমিষ্টি সম্ভোগ।

মধুর কথার বানী মনে মনে ফেরে
প্রিয়ভাষী প্রীতিপায় শত বাধা ছেড়ে
আনন্দ সেখানে স্থিত অতন্দ্র নিশীথে
জীবন-বান্ধব নিয়ে নিবিড় প্রীতিতে।

বানীর ধ্বনিটি শুনি ফুলের বন্দরে
ভিড় জমে মধু ঘ্রাণে যখন অন্তরে।

পুতুলনাচ

রবীন সুর

এতদিন যা যা বলেছ সব তোমাদের কথামত করেছি
চোখবাঁধা কলুর বলদেরও এতখানি নিষ্ঠা থাকেনা
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম জেনে
এতদিন ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু শুধু পুতুল নেচেছি
মাঝে মাঝে বলেছ : চমৎকার !

অনেক মহৎ ভনিতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুদ্রাদোষ
ক্রমাগত সচেষ্ট আত্মীকরণে এখন এতই স্বাভাবিক
যে তাকে আর কেউ নকল ভাবে না
কিন্তু আরশিতে অতিকষ্টে নিজেকে চেনা যায়
তবু তোমরা মাঝে মাঝে চরিতার্থ আত্মপ্রসাদে
প্রবল উৎসাহে বলেছ : চমৎকার চমৎকার !

অর্জিত অভ্যাসে জ্যামিতিক রূপের বিস্তার
সুখাবহ ধ্বনির মার্জিত সংলাপে
আমরুল পাতায় ঘষা পুরনো পয়সায় হঠাৎ ঔজ্জ্বল্যের মত
সিন্দুকভাঙা বেশ কিছু চিত্রকল্প প্রকার ও প্রকরণে
সব ত্থাখো ব্যাকরণ সম্মত
মৃতকল্পের স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড বদলে দিয়ে
তার বুকের ভিতর নোতুনভাবে নিজের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন রেখেছি
কৃতজ্ঞতা নাকি আশীর্বাদে মাঝে মাঝে বলেছ : চমৎকার !

এতদিন যা যা বলেছ সব তোমাদের কথামত করেছি
এবার যে যা বলে বলুক
আমি কারও প্রতিবিম্ব না হয়ে
আরশিতে নিজের যথার্থ ছবি দেখতে চাই।

সময় ১

তুষার রায়

সময়ের অক্সিজেন ট্যাঙ্কে অদৃশ্য কোন ফুটো
একটা ফুটো করে দিন কাটছে থরথরিয়ে, যেন
আয়নাও তোমাকে ভুল দ্যাখাবে, উল্টোপাল্টা
মালদহ থেকে মান্টা পর্য্যন্ত একই হালৎ।

সেই মহান ক্লাউন এখন বিষন্ন, সেই কবি
জঞ্জাল থেকে শব্দ খুঁজতে ক্লান্ত, সুপ্ত
সাপেদের ঘুম ভাঙছে একে একে, লাল নীল
রং উবে যাচ্ছে ফুল থেকে, ধুসর এখন ছবি।

সময় ২

সময়টাকে কেউ চিবিয়ে ছিবড়ে করেছে এমন
যাতে শব্দগুলো চিৎপাত, গন্ধও দেখি বিমর্ষ
উল্টো বেভুল, পূর্ণ কলসীও ক'রে যে ঢন ঢন
ভূগোলে ইতিহাসে এখনো তুমি ভারতবর্ষ,

এর পর তোমার নামটাও পাল্টে দেবে কেউ
পাশার দানে এবার দ্রৌপদীর বদলে তুমি
চুয়াল্লো কৌরব এখন কামড়া কামড়ি ঘেউ
আর কাজের নামে কানের কাছে বাজাবে ঝুমঝুমি

সূর্যমুখী

সমীর বসু

তুমি পারলেনা।

যতোবারই জ্বালাতে গেলে
প্রান্তরী হাওয়ার মুখ নিভিয়ে দিলই
হাতের প্রদীপ তোমার নিভিয়ে দিলই
পাথুরে বিদ্রূপে।

তুমি প্রান্তরের কাছে
কান্নায় ভেঙে বললে,
"পায়ে পড়ি,
আমায় একটু আলো দাও—"
তুমি না চেয়েছিলে রোদের শিখর বেয়ে
সূর্যমুখীর মতো
আলোর দিগন্তে উচ্ছ্বাসে চমকাবে ?
অথচ চকিতে আকাশ ভরা অন্ধকার এলো
তোমার আকাশ ভরা অন্ধকার—
তুমি অন্ধকারের বন্দী হলে।

তুমি আলো জ্বালাতে গিয়েও
পারলেনা
আর অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখলে
তোমার রোগা আশা
নিষ্ঠুর অন্ধকারে
মাঘের পাথুরে হিমে
থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে॥

কানাগলির বাসিন্দা

গোপাল ভৌমিক

হৃদয় খুঁজি না আর
চিত্তের বৈভবে হয়ে দীন ;
মুখোসের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে
দেখে নিয়ে কোন অর্বাচীন
আমাকে নস্যাৎ করে মূঢ় অবজ্ঞায় :
প্রয়োজনে ডাণ্ডা মারি শীতল মাথায়।

প্রীতির পরাগ হাতে
আসা যাওয়া ভুলে একেবারে
ভীতির আসবে মত্ত
কানাগলি দিয়ে চুপিসারে
দুবেলাই যাতায়াত করি :
হৃদয় অজান্তে হয় মৃত্যু-সহচরী।
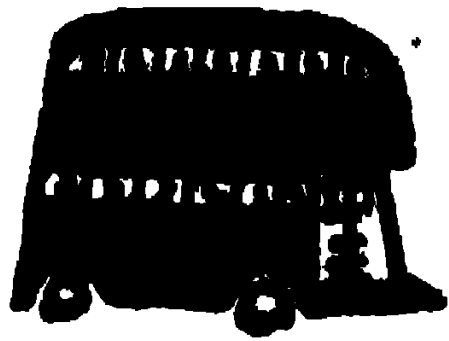
নক্‌শা ২৬

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দেশলাই-এর বাক্সটা খুলতে ভয় করে।
এতগুলো সারবন্দি কালো মাথা
যদি পুরনো অভ্যেস
ভুলে গিয়ে দল বেঁধে বেরিয়ে আসে একদিন
আমার আরামের সিগারেটটার দিকে ?
পালিয়ে যাবো তখন
না, কাঠি হয়ে মিশে যাবো ওদের সঙ্গে ?
নাকি তার চেয়ে ভালো
বাক্সটার ভেতর ঢুকে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ?
পরের কথা পরে
আজকে আপাতত
বাক্সটা বন্ধ করে রাখো।

তাপ

শ্যামলকান্তি দাশ

অচিকিৎস্য দেয়ালব্যাপী
সুষম ভালোবাসা ;
অনামিকায় আত্মবৎ
অধ্যুষিত পাপ।

উত্তরংগ ডাকছে আজ
ত্বদীয় চাইবাসা ;
এখন ভালো দারুব বুকে
রমণী—উত্তাপ ॥

নির্বেদ

কাজী আমিনউদ্দিন আহমদ

তুমি আমাকে চিরদিন বুঝি
কোন এক নির্বেদে আশ্রয় দিয়েছো
তা না হলে কেমন করে আমার এই সংসার
রৌদ্রময় হয়ে ওঠে
কেমন করে গোধূলির বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে
আমার আত্মজার চোখে মুখে
কিংবা আমার প্রিয়ার মুখে
হাসির উপসর্গের লাল ছোপ লাগে
আমি ঘরে ফিরে এসে সেই হাসি
গোধূলির বেলাশেষের সেই গান শুনি
মনে মনে ভাবি বুঝি নির্বেদ একেই বলে
সংসারের রূপময় শ্রী
যৌবনের ধর্ম
ঈশ্বরের দিনরাত্রি
নক্ষত্রের উৎসব
সমস্ত একত্র হলে নির্বেদ জীবনের চাবিকাঠি।

অতএব সঞ্চারিত হোক জীবনে আমার
তোমার চরণে নিবেদিত সেই পুষ্পদল
যা তোমার বৃক্ষকে আরও ছায়া দিবে
আরও রৌদ্রময় হয়ে উঠবে এই নর্তকী পৃথিবী

বড়বাবু-ছোটবাবু

অমিতাভ চৌধুরী

বয়সে প্রায় একুশ বছরের তফাৎ, কিন্তু দুই ভাইয়ে প্রাণের টান ছিল সবচেয়ে বেশি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি। বাল্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর সবচেয়ে বেশি থাকলেও দীর্ঘকালের মধুর সম্পর্ক ছিল বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেই। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিন পুরুষ নিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে যান দ্বিজেন্দ্রনাথ। পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। আর 'বড়বাবু' দ্বিজেন্দ্রনাথ ? তিনি তো ছিলেন সেখানকার প্রাণস্বরূপ।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যেতেন মাঝে মাঝে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবত কোনদিনই সেখানে যান নি। অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথ আশ্রম জীবনের সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনেই দেহত্যাগ করেছেন।

তার বাসস্থান 'নীচু বাংলা' সেকালে ছিল সত্যিকারের আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের সুবাদে গান্ধীজীও তাকে ডাকতেন বড়দাদা বলে। আর জওহরলাল নেহেরু প্রথম শান্তিনিকেতন যান রবীন্দ্রনাথ নয়, দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধীজী যেমন 'বড়দাদাকে' নিজের দাদার মতই শ্রদ্ধা করতেন তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথেরও গান্ধীজীর প্রতি প্রীতি ও আস্থা ছিল অপরিসীম। তাঁর ধারণা ছিল গান্ধীজী কিছুতেই ভুল করতে পারেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন রাজনৈতিক কোন কোন বিষয়ে গান্ধীজীর উক্তির সমালোচনা করেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'রবি ছেলে মানুষ, কিছুই বোঝে না।'

ছেলেমানুষই বটে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি "বৃদ্ধ" কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে "ছেলেমানুষ" বলেই গণ্য করে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের যখন ৬৫ বৎসর পূর্ণ হল, তখন বিস্ময় ও স্নেহভরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছড়া বানিয়েছিলেন—

"সেদিনের সেই রবি পয়ওষট্টি হইল পার,
চমৎকার চমৎকার কিবা চমৎকার।"

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন এবং বড়দাদাকে প্রণাম করতে গেলেন, তখন বড়ভাই স্নেহের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের হাত ধরে বল্লেন, "রবি এ জিনিস তোমার অনেক আগেই পাওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু দেখো, এই কারণে তোমার মনে যেন কোন অহংকার না জন্মে।"

সবচেয়ে বিষণ্ণ এবং সবচেয়ে মধুর দৃশ্য সম্ভবত শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র বালক বয়সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যান মুঙ্গের। সেখানে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। প্রিয়তম পুত্রের শেষ কাজ করে রুদ্ধবাক রবীন্দ্রনাথ যখন ভগ্নহৃদয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মত ঘনিষ্ঠ লোক কেউ কাছাকাছি ছিলেন না। খবর পাওয়া মাত্র উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এলেন বৃদ্ধ বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। এসেই ছোট ভাইয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কেবল বলতে লাগলেন—'রবি, রবি।'

রবীন্দ্রনাথ এতবড় শোকেও স্তব্ধ হয়েছিলেন। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপস্থিতি ও স্নেহসান্নিধ্যে সেই স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের দুই চোখ জলে ভরে উঠল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাইয়ের হাতটি ধরে চুপটি করে বসে রইলেন।

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দবৈশিষ্ট্য

সুচিত্রা মিত্র

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা এবং সুরের অঙ্গাঙ্গী মিলনে এক সার্থক সুন্দর ভাবরস মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে বহুজন বহুবিধ আলোচনা করেছেন। তাই সে প্রসঙ্গ এখানে মুলতুবি রেখে তাঁর গানে আর একটি যে বস্তু কথা ও সুরের অন্তরালে থেকে গানের ভাবরসকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে সেই তাল অথবা ছন্দ সম্পর্কে দু' একটি কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব। কথা ও সুরের একাত্মতায় রবীন্দ্রসংগীতে 'রামধনু'র যে বিচিত্র ছটা উদ্ভাসিত—তাল সেখানে সামঞ্জস্য রেখে গানের শোভা বৃদ্ধি করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নাট্যগীতিগুলিতে সুরের চেয়েও তালের ব্যবহার গানের ভাবরসকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও প্রস্ফুটিত করেছে। সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে তাল ও লয়কে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর গানকে কোনো কোনো ওস্তাদ অবশ্য 'কাব্যগীতি' বলে থাকেন। তাতে দোষাবহ কিছু দেখিনা কারণ রবীন্দ্রনাথের গানের মাঝখানে আসন জুড়ে বসেছে কথা। কিন্তু তার একদিকে সুর আরেকদিকে তাল—একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তী—প্রয়োজনমতো ভাবনাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য নিজেদের ভূমিকাটুকু পালন ক'রে চলেছে; তারা অতিরিক্ত নয়। অবান্তরও নয়।

অর্থাৎ গানের বক্তব্যটি ছাড়িয়ে তাল কখনই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়নি। কথা, সুর, তাল ও লয়—এই মিলিয়ে তাঁর গানের এক সম্পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু গানের উল্লেখ ক'রে আমার আলোচনা শেষ করব।

একই গানে দু'রকম তাল ও লয় ব্যবহার মেজাজ বা পরিবেশের ভিন্নতা কেমন ক'রে রচনা করে—'আজি ঝরঝর মুখর বাদরদিনে' এই বর্ষাসংগীতটি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গানটি দু'টি বিভিন্ন তালে গঠিত হ'লেও রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে একটিই—মিশ্রমল্লার। চতুর্মাত্রিক ছন্দে গঠিত গানটিতে বৃষ্টির 'ঝরঝর' শব্দকেই শুধু ধরা হয়নি—'উদভ্রান্ত মেঘে'র ডাকে এই ক্রন্দলয়ের

গানের সঙ্গে আমাদের মনও 'বলাকার পথখানি' চিনে নিতে ছুটে যায়। সমস্ত গানটিতে বর্ষার উদ্দাম রূপটিই ধরা পড়েছে ছন্দের মাধ্যমে। আবার ষষ্ঠীতালে যখন এই গানটিই গাওয়া হয় তখন 'উদাসী মেঘ'কে যেন নিরালায় বসে উপভোগ করতেই ভালো লাগে। অন্তরের অন্তর্লোকে যে চিরদিনের বিরহী বাসা বেঁধে আছে সেও যেন এই গানের উদাসীনতায় অসীমশূন্যে নিজেকে মেলে দিতে চায়। মন সেখানে সত্যিই শুধু 'চায়'—যাবার তাড়া নেই, হয়তো বৃষ্টি থেমে গেছে, হয়তো ক্ষীণ হয়ে এসেছে ধারাপতনের শব্দ—চারিদিকে মল্লারের বিষণ্ণতা—গভীরতা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, আবিল ক'রে তোলে।

প্রেম পর্যায়ের একটি বিখ্যাত গান 'হে নিরুপমা'। এখানে গীতকার চপলতার জন্য প্রতিটি স্তবকের প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সে চপলতার বৈচিত্র্য এবং বর্ষার বিভিন্ন রূপকে মূর্ত ক'রে তুলতে বিভিন্ন রাগিণীর সঙ্গে বিভিন্ন তালও ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন স্তবকে—কাহারবা, দাদরা ও তেওড়া। কিন্তু শেষ স্তবকে প্রার্থনা অথবা মিনতির ঘনীভূত অংশে গভীরতা আনবার জন্যই তালছাড়া গীতরূপ দেওয়া হ'ল। তালের বিচিত্র প্রয়োগের পরই ভাবগাম্ভীর্যের অনুরোধে তালকে অতিক্রম করা, আমার তো মনে হয়, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

'আমার নিশীথরাতের বাদলধারা'—আরও একটি বর্ষার গান। গানের রাগিনী একরেখেও কেবলমাত্র ভিন্ন ছন্দ প্রয়োগে কেমন ক'রে গানের ভাবরসটির পরিবর্তন ঘটানো যায়—এটি তার আর একটি উদাহরণ। দাদরা তালে অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ে বাঁধা গানে বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষনের রূপটি ধরা পড়ে। এখানে মিনতি অথবা ব্যক্তিগত বেদনা নেই—নৈর্ব্যক্তিক উচ্ছলতা আছে। ছন্দ এবং লয়ের জন্য গানটির বাইরের রূপটি সাবলীল ভাবে প্রবাহিত—অন্তরের গভীরতায় দৃষ্টি পৌঁছয় না। কিন্তু কাহারবা তালে মধ্য লয়ে বাঁধা গানে 'নিশীথরাতের বাদলধারা'কে 'স্বপনলোকে দিশেহারা' হ'য়ে আসবার আর্তি জানানো যায়। এ যেন বর্ষার সজল ঘন অন্ধকারে আপনার অন্তরের ভিতরে গাইবার গান। এর মধ্যে আবেদন আছে, মিনতি আছে, কিন্তু চাহিদা নেই।

'নৃত্যের তালে তালে', গানটির প্রতি স্তবকে যথাক্রমে দাদরা, কাহারবা। ষষ্ঠী ও ঝাপতালের যথাযথ ব্যবহারে নটরাজের নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গী চিত্রায়িত—

সেই সঙ্গে প্রতি স্তবকের শেষে 'নমো নমো নমো' অংশতে দাদরার ঢিমে লয়ের প্রয়োগে নিবেদনের বিনম্র গাম্ভীর্য।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাট্যগীতিতে এই তাল ও লয়ের ব্যবহার যে কী বিচিত্র ও ভাবানুসারী তা অল্প কথায় বোঝানো সম্ভবপর নয়। তবু তারই মাঝে দু' একটি উদাহরণ দিই। ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় নাট্যগীতি হ'ল, 'চণ্ডালিকা'। কথায়, সুরে, ছন্দে 'চণ্ডালিকা'র নাটকীয়তা এমন এক স্তরে পৌঁচেছে—যা তুলনাহীন। এই 'চণ্ডালিকা' গীতিনাট্যে প্রকৃতির প্রথম গান—'যে আমারে পাঠালো এই অপমানের অন্ধকারে'। এই গানটিতে তাল ও লয়ের বিচিত্র প্রয়োগ একই সঙ্গে প্রকৃতির জন্মের বিড়ম্বনা আর সেই বিড়ম্বনাকে অস্বীকার করবার বিদ্রোহ। তাব বাঁচবার আগ্রহকে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সমস্ত গীতিনাট্যটিতেই প্রকৃতির চারিত্রিক দ্বন্দ্ব তালের বিবিধ প্রয়োগে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—প্রকৃতি যখন তার মায়ের কাছে আনন্দের আবির্ভাব বর্ণনাকালে, দাদরা তাল এবং দ্রুতলয়ে চকিতে ব'লে উঠেছে 'এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার'—এবং তারপরে অপেক্ষাকৃত ধীরলয়ে কাহারবা তালে যখন সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়েছে তখনকার নাটকীয়তা কেবলমাত্র সুরের বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত হয়নি। স্মৃতিচারণ এবং পরমুহূর্তে সেই স্মৃতিবাহী মনে আত্মোপলব্ধির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—তাল এবং লয়ের পরিবর্তনে এমন রসঘন হ'য়ে এক আশ্চর্য নাট্যমুহূর্তের জন্ম দিয়েছে—নাটকের ভাবচূড়া (Climax) সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই 'চণ্ডালিকা'তেই যেখানে আনন্দকে মায়াবলে ছায়া অভিনয়ে ধরা হয়েছে সেখানে বিস্মিতা এবং ভীতা মা বলছেন 'ওরে পাষাণী, কী নিষ্ঠুর মন তোর, কী কঠিন প্রাণ'। উন্মত্তা কন্যাকে মার এই তিরস্কার একমাত্র যেন ঝাঁপতালের গুরুগাম্ভীর ছন্দেই ঠিক ফুটে ওঠে। আর এরই উত্তরে প্রকৃতির 'ক্ষুধার্ত প্রেম, তার 'নাই দয়া, তার নাই ভয়, নাই লজ্জা'—এক আন্তরিক অথচ নির্মম সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন লয়ে এই সংলাপকে কাহারবা-তে বেঁধে দিলেন। এই কথাগুলি ঝাঁপতাল। তেওড়া অথবা চৌতালে বললে এর মর্মান্তিক বেদনা উপলব্ধি হ'ত না। সহজ কাঠামোর মাধ্যমে এমন একটি গভীর অনুভূতি প্রকাশের পন্থা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মত সংগীত স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভবপর। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়

প্রকৃতি ও তার মা-র কথোপকথনে যে চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়, যার মধ্য দিয়ে নাটকের গতি অনেক বিক্ষুব্ধ উত্তাল সংঘাতের পর এক শুভস্থির পরিণতিতে পৌঁচেছে সেখানে সুরের চেয়েও বাণীকে সহায়তা করেছে তাল।

আজ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে কথা ও সুরের একাত্মতায় রবীন্দ্রসংগীত মহিমামণ্ডিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর গানে তাল ও লয়ের যথাযথ এবং সুচিন্তিত ব্যবহারও অস্বীকার্য নয়। আমার তো মনে হয় কথা, সুর, তাল ও লয়ের সার্থক সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের গান নাটকীয়তা লাভ করেছে। তাঁর গানের ভাবরসটির প্রকাশে এই চারটি বস্তুরই প্রয়োজন ছিল। এদের কোনো একটির বর্জনে অথবা অসংযমী প্রয়োগে রবীন্দ্র-সংগীতের উপলব্ধিতে অথবা রূপায়ণে সার্থকতা আসা সম্ভবপর নয়।
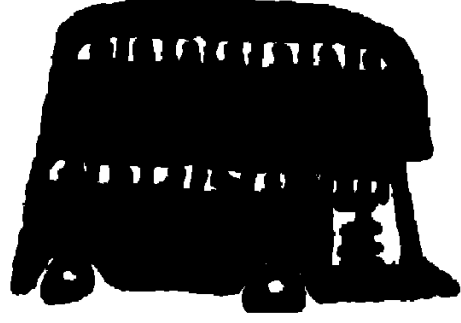
ছাত্র ও যুব-বিক্ষোভের ভাবনা

নিরঞ্জন হালদার

সারা পৃথিবীতেই ছাত্র ও যুব বিদ্রোহের কথা শোনা যাচ্ছে। কম্যুনিষ্ট দুনিয়ায় এ-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে পোলানডে ছাত্র ও যুব বিদ্রোহের ফলে গোমুলকা পুনরায় পারটি-নেতৃত্বে ফিরে আসেন, রুশ-কম্যুনিস্ট পারটির সদস্যকে পোলানডের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। তারপর পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঐ বিদ্রোহের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিদ্রোহের শেষ সার্থক পরিণতি দেখতে পাই ১৯৬৮ সালের চেকোস্লোভাকিয়ায়, ডুবচেকের ক্ষমতারোহণের মধ্যে। ইতিমধ্যে কিন্তু রাশিয়া সমেত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নূতন সুযোগটুকুও বিদায় নেয়। নেতারা যুব-সমাজকে অধিক পরিমাণে ভদকা ও মদ্যপানের জন্য অভিযুক্ত করতে থাকেন। গত দশকের প্রথম দিকে পোলিশ-লেখক ও অকটোবর বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক লাসকো বলেছিলেন, "আমরা মদ খাই নিজেদের ভুলে থাকবার জন্য।"

কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে যুব-বিক্ষোভের আগে থেকেই এশিয়ার দেশগুলিতে অর্থাৎ ভারতে, পাকিস্তানে, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফিলিপিনে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে প্রায়ই ছাত্র-বিক্ষোভ ঘটত। শিল্পোন্নত অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে এক জাপান ছাড়া আর কোন দেশেই ঐ সময়ে ছাত্র-বিক্ষোভের কথা বড় একটা শোনা যেতনা। কিন্তু গত কয়েক বছরে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যানড, ফ্রানস, জারমানি প্রভৃতি দেশে ছাত্র-বিক্ষোভ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মারকিন দেশে যে-সব ছাত্র ও যুবক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বীটনিক, হিপি হচ্ছিল, ভিয়েতনামের যুদ্ধ এদের সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রদের রাজনীতি-সচেতন করে তুলল। কারণ যে-যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নেই, যে-দেশ থেকে মারকিন সরকার সৈন্য অপসারণের কথা শোনাচ্ছে, সেই ভিয়েতনামে গিয়ে ছাত্র ও যুবকেরা শুধু প্রাণ দেবে কেন? তা ছাড়া, মারকিন দেশে একসময়ে কমিউনিজম রোধের জন্য সব কিছু করা পবিত্র-কর্তব্য বলে গণ্য

হত। কিন্তু কমিউনিজম আন্তর্জাতিক একটি শক্তি হিসাবে যে দিন ভেঙে পড়ল এবং সোভিয়েত কমিউনিজমের বিপক্ষে যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় কমিউ-নিজমকে মারকিন সরকার সাহায্য করতে আরম্ভ করল, সেইদিন থেকেই মারকিন দেশে কমিউনিজম রোখার যুক্তি অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেল। কমিউনিষ্ট চীনের আগ্রাসী ভূমিকা আটকানোই এশিয়ায় মারকিন নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়াল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, ভিয়েতনাম চীনের তাঁবেদার হবে না, বরং কয়েক শতাব্দীর চীন-বিরোধী ঐতিহ্যের জন্য শক্তিশালী ভিয়েতনাম চীনের আগ্রাসী ভূমিকা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। ভিয়েতনামকে শক্তিশালী করার জন্য মারকিন সরকারকে তাই ভিয়েতনাম থেকে সরে আসা দরকার। মারকিন দেশে ভিয়েতনাম-যুদ্ধ বিরোধী অভিযানের মূল বক্তব্য অধ্যাপক প্যালব্রেথের "হাউ টু গেট আউট অফ ভিয়েতনাম" পুস্তিকায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও ইংল্যানডে ভিয়েতনাম-যুদ্ধের ঢেউ নূতন করে ছাত্র-বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফরাসী দেশের ছাত্র নেতারা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সে-ব্যাপারে ঐ দেশের কমিউনিষ্ট পারটির ন-পুংসকভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেন। আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-আন্দোলন ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নূতন মোড় নেয় ১৯৬৬ সালে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে প্রচুর বই ও প্রবন্ধ বেরিয়েছে। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-আন্দোলন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও, এ-বিষয়ে আলোচনা তেমন হয়নি। এর অবশ্য একটা কারণ এই যে, অন্য দেশের ছাত্র নেতারা যেমন নিজেদের বক্তব্য নিজেরাই বলার চেষ্টা করেছেন, ভারতের অন্য রাজ্যের ছাত্র-আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা সমাজ-বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে কোন কথা লুকোতে চাননি। পশ্চিমবঙ্গের বহুধা-বিভক্ত ছাত্র-আন্দোলনের নেতারা তাদের বক্তব্য বলার চেষ্টা করেননি, তাদের আন্দোলনের উচ্চারিত শ্লোগানগুলি নিয়ে যুক্তি ভিত্তিক আলোচনার মধ্যে যেতে চাননি। একদল তো কারও সঙ্গে কোন আলোচনার মধ্যেই যেতে চান না। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ছাত্র ও যুব বিক্ষোভের ভিত্তিভূমি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একদল তো স্পষ্টই এদেশে ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে চান। কারণ তাদের মতে, ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যা, ভূমিহীন

কৃষকদের সমস্যা, শিল্পে মন্দা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সমাধান সম্ভব নয়। ভোটের রাজনীতিতে যারা গদি দখল করে আছেন, তারাও সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না, করতে পারবেন বলে এমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। গত বাইশ বছর ধরে পরিকল্পনার নাম করে দেশকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন পথই সরকার দেখাতে পারছেন না, চতুর্থ যোজনাকালে বেকার-সমস্যা কমার বদলে মারাত্মক আকারে বেড়েই চলেছে। কাজেই এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কোন অর্থ নেই। যত তাড়াতাড়ি এই সমাজ ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। সরকারের হাতে সেনাবাহিনী আছে, বর্তমান কারিগরি-যুগে সৈন্য বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র দ্রুত পাঠানোর সুযোগ বেড়েচে, তাই প্রকাশ্য আন্দোলনের মারফত সরকারের পতন ঘটানো অসম্ভব। সেজন্য গেরিলা-যুদ্ধের পথেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টাতে হবে। এ ব্যাপারে হো-চি-মিন, মাও সে-তুং, গুয়েভারা, দেবরে, কানন, মারকিউস, মারলো-পোঁতি এবং আরও অনেকের রচনা, ডায়েরি ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। এরা স্বীকার না করলেও, অর্থনৈতিক অমোঘ-নিয়মে সমাজে পরিবর্তন আসবে, এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করতে অনেক কমিউনিষ্ট তত্ত্ববিদরা আর সাহস পাচ্ছেন না। তাই তারা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে চান। মারলো-পোঁতি দেখিয়েছেন, শান্তি আন্দোলন কী ভাবে অ-প্রতিরোধ্য কমিউনিষ্ট বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।...হিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিবেশে চলাফেরা করলে অনেকেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়বে। দেবরে, গুয়েভারা এই গেরিলা-যুদ্ধের তালিম দিয়েছেন, গ্রামাঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধের কলা-কৌশল তো মাওয়ের রচনার মধ্যেই মিলবে। যারা মাওকে গুরু বলে স্বীকার করতে রাজী নন, তারা ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম করেই দেশে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চান।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও যুবকদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার কোন কারণ নেই। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার-সমস্যা সম্পর্কে শাসক-মহল একেবারেই চিন্তিত নন। চিন্তিত হলে গতমাসে লোকসভায় শ্রমমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া তিন বছর আগেকার বেকারের সংখ্যার কথা শুনাতেন না। গত তিন বছরে দেশে বেকারদের ব্যাপকভাবে কাজ দেওয়ার কোন কর্মসূচীই

গ্রহণ করা হয় নি, এখনও এ-ব্যাপারে কোন কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য হাতে নেওয়া হচ্ছে না। গোটা দেশের কয়েকটি সেচ-এলাকায় বছরে একাধিকবার অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহারের জন্য দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতি অনেক কমেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে ঐ সব এলাকা ছাড়া গোটা দেশের কোটি কোটি দরিদ্র কৃষকের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি, বরং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তাদের দুঃখ দুর্দশা আরও বেড়েছে। জমির মায়া পরিত্যাগ করে অনেকে শহরে বা শহরের আশেপাশে এসে ভিড় করেছে, বস্তির সংখ্যাও বাড়িয়েছে। গ্রামের গরিব দিন-মজুর বা চাষীদের ছোট ছোট ছেলেরা শহরে ও গঞ্জের হোটেল-রেষ্টুরেনটে পেটে-ভাতের বিনিময়ে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজেও নীচের লোকদের উপরে ওঠার যে-সুযোগ থাকে, বর্তমান ভারতে সে-সুযোগ কম যুবকের ভাগ্যেই ঘটছে। এ রাজ্যে নকশালপন্থীদের বিক্ষোভের পিছনে আদর্শগত কারণের কথা চাপা দিয়ে অনেকেই এটাকে কেবল বেকার-সমস্যা জনিত বা আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসাবে দেখছেন। জগজ্জীবনরাম তো কিছুকাল আগে পুলিস দিয়েই এদের শায়েস্তা করা সম্ভব হবে বলে রায় দিয়ে গিয়েছেন। কাজেই এই রাজনৈতিক অলিগারকিরা যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন যে কোন সমস্যার সমাধান হবে না, সে-কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। পরিকল্পনার নাম করে যে-দেশের লোককে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে, কলকাতার ছাত্রেরা সে-কথা প্রথম রাজপথে এসে বলেছিল বলে তাদের ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। তথাকথিত সমাজতন্ত্রী শাসকদের বদলে অন্য কোন দলীয় শাসকরা এসে যে অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হবে না, পশ্চিমবঙ্গে দুইবারের যুক্তফ্রন্ট শাসনই তার প্রমাণ। উত্তরবঙ্গে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হলে যে ঐ অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির অজস্র পথ খুলে যেত এবং তাতে কয়েক হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত, সে-কথা তো সকলেরই জানা আছে। কিন্তু নকশালবাড়িতে ১৯৬৭ সনের ঘটনার পরেও যুক্তফ্রন্ট বা রাষ্ট্রপতির শাসনে উত্তরবঙ্গে কোন কিছু করতেই সরকার উদ্যোগী হলেন না। বিভিন্ন এলাকায় কৃষক জমি দখল করেছে, সুন্দরবন এলাকায় ভেড়ি দখল হয়েছে, কিন্তু তাতে কি গত এক বছরে দরিদ্র চাষী বা মৎস্যজীবী কিংবা মজুরের অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে ?

কোন সমস্যারই সমাধানের একটি মাত্র পথ থাকে না। আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র পথ নেই। গুয়েভারা যে লাতিন-আমেরিকায়

জন্মেছিলেন, সেই মহাদেশের একটি দেশেও গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না বা এখনও নেই। সেখানে শক্তির জোরে, সৈন্যবাহিনীকে পক্ষে এনে বা নিরপেক্ষ রেখে কাউকে ক্ষমতায় আসতে হয়। ঐ সব দেশে গুয়েভারার পথ গ্রহণযোগ্য হলেও হতে পারে। তাও তো বলিভিয়ার চাষীরা জমি পেয়ে বা শ্রমিকেরা মজুরি বেশী পেয়ে গুয়েভারাকে পাত্তা দেয় নি। ভিয়েতনামে এক বছর ধরে, প্রথমে চীনা, পরে ফরাসীদের রাজত্বকালে ভিয়েতনামীরা দিনের বেলায় সরকারকে মানতো, রাত্রিবেলায় নিজেদের মত অনুসারে চলত। উত্তর থেকে তাড়া খেয়ে খেয়ে তারা প্রায় হাজার বছর ধরে দক্ষিণাভিমুখী অভিযান অব্যাহত রেখেছিল। এবং সে-দেশে রাজনৈতিক প্রশ্নে সাধারণ মানুষের মতামত প্রকাশের সুযোগ কোনদিন হয় নি। কিন্তু ভারতের অবস্থা তো তা নয়। ১৯৬৭ সনের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ও রাজ্যগুলিতে যে ধস নেমেছিল, সেই ধসের ধাক্কা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা আজও সম্ভব হয় নি।

কংগ্রেসের সঙ্গে প্রয়োজন হলে অন্য নেতাদেরও আগামী নির্বাচনে বিদায় দেওয়ার ক্ষমতা এদেশের নাগরিকদের আছে। গেরিলা যুদ্ধের পথ কেবল রক্ত-ক্ষয়ীই নয়, একটা নিষ্ঠুর একনায়কত্ব শাসনের পথ প্রশস্ত করে। যে-ডাঙ্গেচক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে মারকসবাদী কমিউনিষ্ট পারটি গঠিত হয়েছিল বা মারকসবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তরুণ কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা বিদ্রোহ করেছিলেন তা কি কোন কমিউনিষ্ট রাজত্বে সম্ভব হত। এই সব "সাচ্চা" কমিউনিষ্টদের সকলকেই কি প্রতি-বিপ্লবী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে খুন করা হত না? জামবিয়ার সভাপতি কেনেথ কাউনডা হিংসার পথ পরিহারের কারণ হিসাবে বলেছিলেন যে, হিংসাত্মক আন্দোলনের মারফত এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, সংগ্রামে জয়লাভের পর সেই সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাই প্রথম পদদলিত হয়। যে-কোন সমাজে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবেই। কিন্তু সমাজে সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের অবাধ সুযোগ না থাকলে নিরীহ, নিরপরাধ ও অবহেলিত সাধারণ মানুষকে 'জনগণের শত্রু' আখ্যা পেয়েই এই পৃথিবী থেকে নীরবে নতমুখে বিদায় নিতে হবে।

আমার প্রশ্ন এ-সবও ছাড়িয়ে। এদেশে ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে হবে কেন? গুয়েভারা দেশে দেশে একটি, দুটি বা অজস্র ভিয়েতনাম সৃষ্টি করতে

বলেছেন বলে? যে-সব সমস্যার সমাধানের জন্য এদেশে ভিয়েতনাম সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে; ভিয়েতনামে কি সেইসব সমস্যার সমাধান হয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে ভিয়েতনামে পুরুষ-যুবক সমাজের একটি বড় অংশ মারা গেছে। সরকারকে ঐ মৃত যুবক সমাজের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হয়নি। হিটলার একভাবে সমরাস্ত্রকরণের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করেছিলেন, হো-চি-মিন অন্য ভাবে ভিয়েতনামের যুবকদের কাজ দিয়েছিলেন। ওদের কাজ দেওয়ার জন্য নূতন কল-কারখানা খুলতে হয়নি, কল-কারখানার জন্য কাঁচামালের কথা ভাবতে হয়নি, দেশের গণ আয় থেকে একটি অংশ নিয়ে শান্তির পরিবেশে মূলধন সংগ্রহ করতে হয়নি। কলিকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজের মত লক্ষ লক্ষ লোক বস্তি বাড়িতে বাস করেনি। এত লোকও হ্যানয় শহরে বাস করেনি। তাই কয়েক মিলিয়ন লোকের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ ও জল-নিকাশী ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি তাদের কর্মসংস্থানের কথা হ্যানয়ের কোন শাসককেই ভাবতে হয়নি। বছরে এক কোটিরও বেশী নূতন শিশুর কথাও এক চীন ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশকে ভাবতে হয়নি। অন্যান্য অনেক দেশ আমাদের দেশের সমস্যার মত তাদের দেশের সমস্যারও সমাধান করেছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সেইসব দেশের সাফল্য বা ব্যর্থতা থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের বদলে আমরা শুধু ভিয়েতনামের নাম জপ করব কেন?*

---

*লেখকের মতের সংগে যুগ্ম সম্পাদক প্রবন্ধটির কোন কোন অংশে একমত নন। এই বিষয়ে পাঠক পাঠিকাদের মতামত আহ্বান করা যাচ্ছে। যুঃ সঃ

দিদির বিয়ে

জাহারিয়া স্তানকু

[জাহারিয়া স্তানকু (Zaharia Stancu) রোমানিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। এই শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ জমিদারি আমলের রোমানিয়ার গ্রামের জীবনের ছবি স্তানকুর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য।]

দিদি, তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

দামে যাচ্ছি।

আমায় নিয়ে চল।

না।

আমি তোর পেছু পেছু যাব।

ইস। দেখ না একবার এসে—কান ছিঁড়ে দেব না।

হুঁ:—দিদি আবার কান ছিঁড়বে। বড় জোর দু'একবার কান মলে দিতে পারে। দিলে আমিও ছাড়ব নাকি ? লাগাব না কনুই দিয়ে এক গোঁত্তা। বাড়িতে সবাইকেই তো দরকার মতন গুঁতো দিই—খালি মাকে আর বাবাকে ছাড়া। মা-বাবার গায়ে হাত তুললে আর রক্ষে আছে ? কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত সবটা হাত শুকিয়ে যাবে না ?

দিদি দেখছি আজ খুব সেজেগুজে বেরিয়েছে। চুলে ফুল গুজেছে—রঙকরা শুকনো বুসুইয়োক ফুল।

এ বছর হেমন্তে দিদির পোনেরো বছর পুরেছে। আর তার পরে এই ক'মাসেই যেন দিদির চেহারাটা কেমন লম্বা আর ছিপছিপে হয়ে গেছে। চোখের চাউনিটা এখন কত গভীর দেখায়! দিদির বড় বড় চোখ দুটো ঠিক মায়ের চোখের মতন—বড় বড় পালক আর সরু সরু টানা ভুরু।

আমাকে নিয়ে যাবি তো দিদি ?

বলছি না নেব না।

দিদি আবার বেদেনীদের মতন গালে রং-ও দিয়েছে। আয়না ধরে সাজ-গোজ করেছে নিশ্চই। কিন্তু আয়না পেল কোথা থেকে ও? আমাদের বাড়িতে তো কোন আয়না ছিল না—মা কস্মিনকালেও আয়নায় মুখ দেখে না। দেখবার আছেই বা কি? দিন দিন কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছে তাই দেখবে? সে তো আমরাই দেখছি। মার নিজের আর দেখার কি দরকার?

আমি মার কাছে গিয়ে নালিশ করলুম—মা, দিদি আমাকে দামে নিয়ে যাচ্ছে না।

তা না-ই বা গেলি।

না মা, আমি যাব।

যাবি তো যা।

বাস—এবারে আমি দিদির পেছু পেছু চললুম। দিদি একটু করে যায় আর রাস্তা থেকে বরফের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে।

দাড়িয়ে, বাড়ি যা বলছি।

না যাব না।

এবারে দিদি তাড়া করে এল। ধরতে পারলেই মাটিতে ফেলে মারবে। কিন্তু পারলে তো! আমার সঙ্গে দৌড়ে কেউ পারে না। দিদিও শেষ পর্যন্ত অন্য পথ ধরল—লোভ দেখাতে গেল।

তুই যদি বাড়ি যাস না দাড়িয়ে, তাহলে ফেরবার সময় ঠিক তোর জন্যে কোভরিগ রুটি কিনে নিয়ে যাব।

ইস, বললেই হল। তোর কাছে পয়সাই নেই।

দিদি হাল ছেড়ে দিল। ও চলল—সঙ্গে সঙ্গে আমিও। দাম আর কিছুই না। গাঁয়ের সীমানায় একটা পোড়ো ঘর—তার জানলা-দরজা কিছুই নেই। বড় বড় ছেলেমেয়েরা ওখানে এসে 'ছোরা' নাচ অভ্যেস করে। ওদেরই মধ্যে একজন বাঁশি কি ক্লারিওনেট বাজায়।

দিদির সঙ্গে সঙ্গে আমিও দামে ঢুকলুম। এতক্ষণে অনেকে এসে গেছে। খুব হৈ-চৈ চলছে।

এক একবার নাচ থেমে যায়—বাঁশি বাজায়, সে না থামলে নাচ থামে না অবশ্য—আর ছেলেরা মেয়েদের কোমর জড়িয়ে কোনে চলে যায়। আমাদেরও তাই দেখে প্রাণে শখ জাগে। আমরা যারা দাদা-দিদিদের সঙ্গে নাচ দেখতে আসি তারাও ওদের নকল করি। তাই দেখে বড়রা ধমক দেয়।

এই, ও কি হচ্ছে? তোদের লজ্জা করে না?

তোদের করে না?

আমরা বড় হয়েছি।

আমরাও একদিন হব।

যখন হবি তখন হবি। তাই বলে এখন থেকে—

সন্ধে হয়ে এল। কী কুয়াশা! বড়দিন পেড়িয়ে গেছে, তবু বরফ গলে নি, কুয়াশা কমে নি। চারিদিক এমন ধোঁয়াটে হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে যেন মাটির নিচে কোথাও আগুন জ্বলছে। কুয়াশা কি আকাশ থেকে নামে, না, মাটির ভেতর থেকে ওঠে? কে জানে! কিন্তু যখন কুয়াশা করে, তখন যেন চারিদিক থেকে এসে আকাশবাতাস সব ছেয়ে সারা দিনটাকে থমথম করে দেয়।

দামের আড্ডা ভাঙতে যে যার বাড়ির পথ ধরল। যে ছেলেটা বাঁশি বাজাচ্ছিল, সে বাজাতে বাজাতেই চলে গেল।

দামের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা চার ঘোড়ার গাড়ি। তার ভেতরে বসে ছিল তিনটে ছেলে—দাদার তিন বন্ধু। আমরা গাড়িটার পাশ দিয়ে আসছি, এমন সময় আলভিৎসা বলে ছেলেটা ঠোঁটের কোনা থেকে সিগারেট নামিয়ে দিদিকে ডাকল—ইভাঞ্জেলিনা, এদিকে শোন—একটা কথা আছে।

দিদি দাঁড়িয়ে পড়ে ওর দিকে চাইল।

এদিকে এস না—কানে কানে একটা কথা বলব।

দিদি এগিয়ে গেল—সেই সঙ্গে আমিও। কিন্তু গাড়ির কাছ অবধি যেতে না যেতেই আলভিৎসা কোমর ধরে দিদিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে দুহাতে জাপটে ধরল। দিদি চীৎকার করে উঠল। আলভিৎসা হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে বলল—ও কি হচ্ছে? চেঁচাচ্ছ কেন?

দেখতে না দেখতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল ওরা। আলভিৎসা পকেট থেকে পিস্তল বার করে গোটাকতক ফাঁকা আওয়াজ করল। চারটে ঘোড়া যেন চোখের পলক পড়ার আগে পাহাড়ের বাঁক দিয়ে গাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

মেয়েচুরি, মেয়েচুরি—সবাই হল্লা করে উঠল—চল চল আলভিৎসার বাড়ি যাই—কী দারুণ মজাটাই না হবে ওখানে।

আমি ছুটলুম বাড়ির দিকে।

মা, মা, দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে।

কে রে?

আলভিৎসা।

মা তাড়াতাড়ি জামা জুতো পরে নিয়ে বলল—চল দারিয়ে। বাবাকে খুঁজি গে।

বাবা তোমা ওকি-র মদের দোকানে বসে ছিল। মা বাইরে থেকে হাতছানি দিতেই বাবা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

মা কখনো এ সব জায়গায় আসে না তো।

কি ব্যাপার কি?

ইভাঙ্গেলিনাকে দাম থেকে ধরে নিয়ে গেছে।

কে গো?

আলভিৎসা।

বাবা ভাবনায় পড়ে গেল। কোন কথা না বলে গোঁফে তা দিতে লাগল। ভেতরে ভেতরে এতখানি ব্যাপার গড়ালই বা কবে? সেই কথা ভেবেই বাবা আরো চটে গেল। মা তখন বুঝিয়েসুঝিয়ে বাবাকে ঠাণ্ডা করল—আহা, এমন তো আখছারই হচ্ছে। তাছাড়া এক দিকে তো ভাল হল—খরচা বাঁচল। এখন তো আর জামাই দর হাঁকতে পারবে না।

কি বললে? খালি হাতে মেয়ে বিদেয় করব? সে হবে না। ধরেই নিক আর যাই করুক, আমার যা দেবার তা আমি ঠিকই দেব।

তখন মা-বাবা পরামর্শ করতে বসল। দিদির জন্যে জামার কাপড় কিনতে হবে। সে ধারে কেনা যাবে। ছোট বোনেরা বাড়িতেই জামা সেলাই করে দেবে। তার জন্যে ভাবনা নেই। কিন্তু তা ছাড়াও তো জামাই, ধর্মবাপ, নিতবর—এদের সবায়ের জামা চাই। শহর থেকে জুতো কিনতে হবে। জমিদার বাড়ি থেকে টাকা ধার করতে হবে। সেই টাকা গতর খেটে শোধ করার জন্যে গ্রীষ্মকালে অনেক বাড়তি কাজ করতে হবে। তা সে আর কি করা যাবে? যেটা দরকার তা তো আর ফেলে রাখা যায় না।

আলভিৎসাদের বাড়ির দিক থেকে পিস্তলের আওয়াজ, চীৎকার, চেঁচামেচি শোনা গেল। ওদের উঠোন ভর্তি লোক। আমি এর তার পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে ওদের বাড়ির রকে গিয়ে উঠলুম। বাইরে কজন মেয়ে বসে বসে হাঁস কাটছিল। তাদের জিজ্ঞেস করলুম—আমার দিদি কোথায়?

ভিৎসার বৌ বলল—ঘরের ভেতর, আলভিৎসার কাছে।

ঘরের ভেতর থেকে দিদির হাসি শুনতে পেলুম। খুব ভাল লাগল। খালি একটা কথা মনের ভেতরে খচখচ করতে লাগল। এখন থেকে আবার ঐ আলভিৎসা-টাকে নেনেয়া ইয়ন বলে খাতির করতে হবে। ওর আসল নাম তো ইয়ন, বেশি চালবাজি করে বলে গাঁয়ের লোকে আলভিৎসা নাম দিয়েছে। ভারি অসভ্য ছেলেটা! আমাকেও কেন গাড়িতে তুলে নিল না? আমিও একটু বেড়াতুম। গাড়ি চড়তে এত ভাল লাগে আমার! কিন্তু সে কথা আর বোঝে কে।

দিদিকে যেদিন ধরে নিয়ে গেল, তার এক সপ্তা পরে একদিন আলভিৎসা ওকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল। দিদি যেন এই কদিনেই আরো রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। আলভিৎসা সিগারেট টানতে টানতে এল—কী সিগারেটই না খেতে পারে ছেলেটা! মা আবার এসব পছন্দ করে না।

নমস্কার মা। নমস্কার বাবা।

এস ইয়ন, বস—মা বলল—আমাদের মেয়েটিকে চুরি করলে তুমি?

না করে চলে কি করে মা? যদি আর কেউ নিয়ে পালাতো!

তাই বলে ঐটুকু মেয়ে—

তা আমার যদি ছোট মেয়েই পছন্দ হয়।

হলেই ভাল বাবা।

দিদি ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বিয়ে হয়ে অবধি ও যেন আলভিৎসা-কে চক্ষে হারায়। দিদি বাবাকে বলল—

বাবা, আমার মুস্তা* করবে না?

করব বৈকি। কবে দিন ঠিক করেছিস তোরা?

দু' হপ্তা পরে।

সে কি রে! এখনো যে আমার জোগাড় যন্ত্র কিছু হয়নি।

ও হয়ে যাবে—দিদি বলল।

কাকে ধর্মবাপ করছিস?

গাইনা-র ছেলেকে।

গাইনা-র ছেলে ওদেরই এক পড়শি। বাবা শুনে খুশি হল। বলল—বেশ বেশ। লোক ভাল। তা ইয়ন, তুমি জমিটমি কি চাও বল?

দিদি তো মায়ের আগের পক্ষের মেয়ে। ওর বাবার দরুণ ওর কিছু জমি আছে।

ইয়ন বলল—ইভাঙ্গেলিনার যে জমি আছে, তার থেকে আদ্ধেক আমাকে দিও। বাকি আদ্ধেক এখন তোমাদেরই থাক। পরে যদি ছেলেপুলে বেশি হয় তো, নেব।

এতটা আমরা আশা করি নি। তখন কাপড়জামার কথা শুরু হল। আলভিৎসা বলল—বাবা, তোমাকে এক জোড়া বুট জুতো দেব। তোমার বড় ছেলেকেও এক জোড়া জুতো দেব। ইভাঙ্গেলিনার বড় ভাই গেওর্গেকে এক জোড়া জুতো ডাকে পাঠিয়ে দেব। বোনেদের সবাইকে দেব এক জোড়া করে চটি। আর ছোট বোনটাকে জামা জুতো দু-ই দেব।

বাবা বলল—বেঁচে থাক বাবা। আমরা মেয়েকে ওর ভাগের জমি সবটাই দিয়ে দেব। তারপর জামাকাপড় যা পারি দেব। বর-কনের বিয়ের পোষাক। ধর্ম মা-বাপের জামা সবই দেব। তোমার মাকেও জামা দেব।

সুস্তার দিন এসে গেল। রবিবারে সুস্তা আর শুক্রবার সন্ধে থেকেই আমাদের বাড়িতে লোকজন আসতে শুরু করল। তাতি গোষ্ঠীরা সব আমাদের বাড়িতেই রইল। খাওয়া দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ চলল পুরো দমে।

আলভিৎসার বাড়িতেও ওর আত্মীয়কুটুমরা এল। ধর্ম-মা এখনো এসে পৌঁছায় নি। তাই নিতবর ভের্দে-ই কাঠের ঘটিতে মদ ভরে নিয়ে পাড়ায় ঘুরে নেমন্তন্ন করল।

শনিবার সারা রাত ধরে বরের বাড়িতে গান আর হল্লা চলল। শহর থেকে গানের দল এসেছিল ওখানে। তারা থামলে পরে তবে আমরা ভোর বেলায় একটু চোখ বুজতে পারলুম।

রোববার সকাল থেকে উৎসব শুরু হল। দুপুর থেকে সন্ধে অবধি জোর ধুমধাম। আমি সব সময়েই দিদির কাছে কাছে ছিলুম। কী সুন্দর দেখাচ্ছে দিদিকে! ওকে যে এত সুন্দর দেখাত তা কে জানত!

দিদির বন্ধুরা সবাই এসেছে। ভের্দে একটা চেরিগাছের ডাল ভেঙে এনেছে—মস্ত বড় একটা ডাল। মেয়েরা সেটাকে জরি, ফিতে আর বুনুইয়োক ফুল দিয়ে সাজাল। জরিগুলো রূপোর মতন ঝলমল করতে লাগল।

আমার ছোট বোন রিৎসা বলল—দেখছিস কেমন সুন্দর করে কনের গাছ সাজাচ্ছে! আমারও বিয়ে হবে—তখন আমার জন্যেও এমনি করে গাছ সাজাবে।

সাজানো হয়ে গেলে পর গাছটাকে রক থেকে নামিয়ে সামনের রাস্তায় রাখা হল। সারা গাঁয়ের লোক দাঁড়িয়ে গেল গাছ দেখতে।

বাঃ, সুন্দর গাছ হয়েছে।

মেয়েরা সবাই মিলে দিদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সাজাতে বসল। নতুন সেমিজের ওপর পরাল সাদা ফুরফুরে পাতলা বিয়ের জামা। পায়ে পরাল সাদা জুতোমোজা। চুল আঁচড়ে বিনুনি বেঁধে দিল। তাতে লাগাল নানান রকম রঙে রাঙানো বুনুইয়োক ফুল। মাথায় পরাল ওড়না। ঠিক যেন পরী।

দিদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন জুতো পরে পায়ে খুব লাগছে দিদির। গাঁয়ের সব মেয়েরই বিয়ের দিনে পায়ে ফোস্কা পড়ে। সারা জন্ম খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে পায়ের পাতা চওড়া হয়ে যায়। আঙুলে গিঁট পড়ে যায়। তখন কী আর ঐ সব সরু সরু গোড়ালি তোলা শহরে জুতো পায়ে লাগে!

দিদির ওড়নাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। মাথায় সাদা মুকুট—তাতে সবুজ, হলুদ, লাল, নীল নানা রঙের কাগজের ফুল। এখন ওর চেয়ারে বসা চলবে না। যতক্ষণ না রাতে শোবার সময় হয়, ততক্ষণ এমনি কাঠের পুতুলের মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

মেয়ের সাজ হয়ে গেছে। গাছও তৈরি। এবারে নিতবর এসে কনেকে হাত ধরে কুয়োতলায় নিয়ে চলল। এবার থেকে ঐ কুয়োয় তো দিদি সংসারের জন্যে জল তুলতে আসবে—সেইজন্যে।

গাছটাকে উঁচু করে তুলে ধরা হল। আগে আগে চারজন গাইয়ে চলল গান করতে করতে। সারা গাঁ যেন গমগম করছে। এর আগে আর গাঁয়ের কোন বিয়ে বাড়িতে শহর থেকে গানের দল আসে নি।

দিদির কাঁধে একটা জলতোলা বাঁক। তার থেকে ঝুলছে দুটো ভারি ভারি ঘড়া। একটা সামনে একটা পেছনে। সামনের ঘড়াটার গায়ে ফুলপাতা-খোদাই করা। এ দুটো হল দিদির বিয়ের যৌতুক।

কুয়োর ধারে এসে দিদি ঘড়া দুটো নামাল। তারপরে কুয়োর বালতিটাকে একেবারে তলা অবধি ডুবিয়ে দিয়ে জল তুলে দুটো ঘড়া ভরে নিল। তারপর বাঁকটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে কুয়োর ধারে হেলিয়ে রাখল। কনেকে নিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা আর নিতবর এবারে হোরা নাচবে। সবাই হাত ধরাধরি করে ঘড়া দুটোকে তিনবার ঘুরল।

দিদি আবার ঘড়া দুটো বাঁকে লাগিয়ে বাঁকটা কাঁধে তুলল। বড় বড় দুটো জল ভর্তি ঘড়ার ভারে পিঠটা নুয়ে পড়তে চাইছে। ঐতেই বুঝিয়ে দিচ্ছে সংসারের কত ভার! তবে দিদি মাথা নোয়াল না। সারা শরীরের শক্তি দিয়ে মাথা সোজা রেখে গটগট করে হেঁটে চলল।

শ্বশুর বাড়ির দরজায় দিদির শাশুড়ি রুটি আর নুন হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল। দিদি এসে ঘড়া দুটো নামাতে শাশুড়ি ওর মুখে একটু নুন আর রুটি দিল। আর সেইটা মুখে দিয়েই দিদি একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ভারি বোকা দিদিটা।

এবার নিতবর গানের দল নিয়ে ধর্ম মা-বাপকে আনতে চলল। আর দিদিকে টঙায় চড়ানো হল। আমিও উঠে ওর কোল ঘেঁষে বসলুম।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির দরজায়। মা দিদির যৌতুকের জিনিসপত্র—একটা লাল রং-করা কাঠের সিন্দুকের মধ্যে জামা কাপড় আর তার ওপরে বিছানাপত্র গাড়িতে তুলে দিল। তারপর টঙাটা সারা গাঁয়ে ঘুরতে লাগল—বিকেল অবধি এমনি ঘুরবে।

বিকেল বেলা বরের বাড়ির উঠোনে আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ওদের বাড়ির লোক সবাই মিলে হোরা নাচতে শুরু করল। নাচের পর চলল নাচ। গাইয়েদের গলা ভেঙে গেল গান গাইতে গাইতে।

সূর্য পাটে নেমে গেলে পর ধর্ম মা-বাবা বরকনেকে নিয়ে মেয়রের আপিসে গেল। সেখানে বরকনের নাম খাতায় উঠল। এবার গির্জায় যাবার পালা। সেখানে পাদ্রী বিয়ে দিয়ে দিল। তারপর আবার ওরা বাড়ি ফিরে এল।

কনে এসে দাঁড়াল হোরার মাঝখানে। তার ডান দিকে দাঁড়াল বর, বাঁদিকে নিতবর। তাদের দু পাশে মোমবাতি হাতে দাঁড়াল ধর্মবাপ আর ধর্ম-মা। সবাই হাত ধরাধরি করে তিনপাক ঘুরল ওদের মাঝখানে রেখে। আবার শুরু হল নাচ।

ভোরা ভাঙবার ঠিক আগে চলে এল একদল বেদে। তাদের সঙ্গে শেকল-বাঁধা বারোটা ভাল্লুক। এবারে ভাল্লুক-ওলারা ঢাক বাজাতে শুরু করল আর সেই সঙ্গে ভাল্লুকগুলো নাচ দেখাতে লাগল।

ভাল্লুকওলা দুস্থাউ বুড়োকে গাঁয়ের সবাই চেনে। বুড়ি ভাল্লুক দিদিনা-কেও। নাচ শেষ হতেই 'মুস্তার ভালো হোক' বলে দুস্থাউ বুড়ি ভাল্লুকের হাতে ওর টুপিটা দিয়ে দিল। অন্য বেদেরাও মাথার টুপি খুলে বাচ্চা ভাল্লুকগুলোর হাতে দিল। টুপির মধ্যে যার যা খুশি সে তেমনি পয়সা দিল।

চল দিদিনা, কনে হবি চল—বুড়ো বুড়িকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। বুড়ো ঢাক পিটিয়ে গান ধরল আর বুড়ি ভাল্লুকটা খাটে উঠে কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়ে নেমে এল।

কনে বৌ, বুড়ি তোমার খাট বৌনি করে দিল, এবারে অমনি খোকাখুকি হবে তোমার—বেদে বুড়ো দিদিকে বলল।

দিদির শাশুড়ি সব কটা ভাল্লুককে খেতে দিল আর বেদেদের দিল মাটির ঘটি ভর্তি মদ।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলভিংসার বাড়িতে অনেক লোকের নেমন্তন্ন। খুব ভিড় হয়েছে আর তেমনি আসছে উপহার। লোকে খাচ্ছে আর খেতে খেতে উঠোনে এসে এক পাক নেচে নিচ্ছে।

খাওয়ার পরে যৌতুক দেবার পালা। ধর্মবাপ আর ধর্ম-মা একটা করে জামা আর একটা করে তোয়ালে পেল। বরকনের যৌতুকের থালায় ধর্মবাপ আগে রাখল একটা রুপোর রুবল। তারপর আর সবাই যে যা পারে তাই দিল। ঐ টাকাতেই বিয়ের খরচ উঠে যাবে।

রাত কেটে গেল। সকালের সূর্য ওঠার আগেই দুজন মেয়ে আর দুজন পুরুষ গাইয়েদের নিয়ে আমাদের বাড়ি এল বাসর রাত ভালভাবে কাটার খবর দিতে। ওদের আগে মদ খাওয়ানো হল তারপরে দেওয়া হল দুটো সাদা হাঁস। হাঁস দুটোকে লাল রং করে ওরা বরের বাড়িতে নিয়ে এল। তখন আমরা বর বৌ, নিতবর, ধর্ম মা-বাপ সবাইকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলুম।

এর মধ্যেই মা খাবার জোগাড় করে ফেলেছে। 'রাকিউ' মদ খেতে হয় এখন। সারা রাত হৈ চৈ করে সকলেরই খিদে পেয়েছে। সবাই খেতে বসল।

বরের বাড়িতেও খাওয়াদাওয়া চলছে পুরোদমে। তন্ত্বার পরদিন বিকেল পর্যন্ত দু বাড়িতেই খাওয়া আর মদ খাওয়া চালিয়ে যেতে হল।

সোমবার সন্ধেবেলা লোকজন সব চলে গেলে দু দিকের শ্বশুর শাশুড়ি হিসেব করতে বসল মোট কত কি পেয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা বসে দিদি তিনটে উপহারের ডালা সাজাল। একটা দিল আমাদের বাড়িতে মা-বাবাকে। একটা নিয়ে গেল ধর্ম মা-বাপের বাড়ি। আর একটা পাবে নিতবর।

এর কদিন পরেই দিদি এসে আমাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। রোগা হয়ে গেছে। মুখ শুকনো। ডান চোখের ওপর একটা মস্ত বড় কালসিটের দাগ। আস্তে আস্তে দরজাটা টেনে বাড়ির ভেতর ঢুকল ও।

একি দশা হয়েছে তোর? মা ছুটে এল।

দিদি কোন কথা না বলে খাটের ওপর বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। মা ওর পাশে এসে বসল। কি হয়েছে তাই বল না। ঝগড়া করেছিলি?

না মা। ও কাল রাত্তিরে মদ খেয়ে এসে মেরেছে। দোষের মধ্যে জিজ্ঞেস করেছিলুম এত রাত অবধি কোথায় ছিলে। তাই মেরে একেবারে হাড় ভেঙে দিয়েছে। চোখটা বেঁচে গেছে অল্পের জন্যে।*

---

*মূল রোমানিয়ান থেকে অনুবাদ— অমিতা রায়

আমি তোমায় ভালবাসি

ই. মিন্তুকা

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা সকলেই প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু আমি তাড়াহুড়া করিনি। আমি ডাকটিকিট জমাতে মশগুল ছিলাম। অবসর সময়ে দোকানে গিয়ে ভাল ডাকটিকিট খুঁজতাম, তাই প্রেম করার সময়ও পেতাম না। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রেম করেছিল। এটা আমার কাছে একরকম সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে এ বিষয়ে আর দেরী করা উচিত হবে না। প্রথমত:, বন্ধুদের কাছে আমি সহজ হ'তে পারতাম না; দ্বিতীয়ত:, একটি খুকীও আর হয়ত আমার জন্য অবশিষ্ট থাকবে না।

এজন্য আমার মনে হ'ল প্রেম করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু কার সঙ্গে? আমাদের স্কুলে সুন্দরী কিশোরীর অভাব ছিলনা। অবশেষে, দীর্ঘদিন ধরে ইতস্তত: করে আমি লিউসিয়া তিমোনিনাকে বেছে নিলাম। আমি আমার এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করে দেখেছিলাম। বিপক্ষে একটিমাত্র যুক্তি ছিল; লিউসিয়া খুব সুন্দরী ছিল না। ওর লম্বা লম্বা ঠ্যাং ছিল আর গাল দুটি ছিল উজ্জল গোলাপী। "স্বপক্ষে" ছিল অনেক যুক্তি—প্রথমত:, ও ছিল আমারই প্রতিবেশিনী, দ্বিতীয়ত:, সপ্তম শ্রেণীতে পড়ত, এ ছাড়া, লিউসিয়া লং জাম্পে চ্যাম্পিয়ান ছিল—এটা তৃতীয়, এবং সবচেয়ে প্রধান যুক্তিটি ছিল—এখনও কেউ ওর সঙ্গে প্রেম করেনি। অতএব, তাড়াতাড়ি করতে হবে।

এখন আমার কাছে একটি জটিল প্রশ্ন দাঁড়াল, সেটি হচ্ছে—কোথা থেকে এর শুরু করতে হবে? কি করে ওকে এই সব বলতে হবে?

এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আমার সেরা বন্ধু গিয়েঙ্কা'র শরণাপন্ন হ'লাম। ও এরই মধ্যেই ক্লাশের সুলাঙ্গিনী কাত্যুর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ওর কাছে গিয়ে বল্লাম—গিয়েঙ্কা, আমি প্রেমে পড়েছি।

গিয়েঙ্কা আমার দিকে তাকিয়ে নিরুৎসাহপূর্ণ স্বরে উত্তর দিল—

হ্যা, উপযুক্ত সময়।

গেল। আমার বুকে কে যেন ঘা মারতে লাগল। ওর কাছ থেকে চিঠি! হয়ত, কেন আসেনি তাই বলতে চেয়েছে। অথবা, ক্ষমা চেয়ে লিখেছে। বা অন্য কোন তারিখ ঠিক করেছে? আর এও হতে পারে যে লিখেছে সে আমাকে খুব ভালবাসে? আমি তাড়াতাড়ি চিঠিটার কোণের দিক খুলে ফেললাম। পাতার মাঝখানে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে দুটি শব্দ লেখা ছিল—"তুমি বোকা।" নীচে কোন স্বাক্ষর ছিল না। কেন জানি না, দৌড়াতে দৌড়াতে আমি স্কুলে গেলাম; ক্লাসে গিয়ে আমার ডেস্কে বসে মনের দুঃখে ভাবতে বসলাম। ওরা অবিশ্বাসিনী, ওরা হৃদয়হীনা মেয়ে! এরপর আমার পেন্সিল কাটা ছুড়ি বের করে অতি কষ্টে ডেস্কে আঁচর কেটে লিখলাম—"লিউসিয়া+স্তিয়পা=প্রেম। আর চোখের জল বেয়ে বেয়ে এই লেখাটুকুর উপর পরতে লাগল। আমার নিজেকে মনে হচ্ছিল কখনও বিষণ্ণ, কখনও উৎফুল্ল আবার কখনও অন্য রকম—আমি জানতাম না, যে এটা আমার শৈশবের শেষ, আর সূচনা করছে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের এক নুতন ও অজ্ঞাত অধ্যায়ের।*

---

* সোভিয়েত লেখক ই. মিনুতকা লিখিত রুশ গল্পের সরাসরি বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক: ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

অধুনা

দুর্গাদাস সরকার

'কেমন আছেন ?'

গলির মধ্যে হঠাৎ দেখা।
প্রশ্ন-বিনিময়।

রাজপথে কার রক্ত ছিল ঢাকা—
তারি ওপর নামহীন এক স্তব্ধ চিহ্ন আঁকা।

ঊর্ধ্বমুখে হাঁটেন যেন সবাই।
আমার কিন্তু ভীষণ রকম ভয়।

'বলুন দিকি কোন্ গলিটা ফাঁকা ?'

ঝুলমাখা নীল পর্দাটাতে কাঁপছে দুঃসময়।
থমকে থেকে বলি : 'কোন্ পথ আজ দেবেন জলাঞ্জলি।'
মাথার ওপর মাংসলোভী কাক করে কা কা।

এই পৃথিবীর সমস্ত পথ বাঁকা॥

কোথায় ঘোড়া

শান্তনু দাস

সাজিয়ে ছিলাম বুকের পাঁজর ধোপ দুরন্ত রঙিন জামায়,
তুই উরুতে পছন্দসই আমার হাতের বর্ম সোনায়,
জড়িয়ে ছিল
শিরস্ত্রাণও
তবু আমার ঘোড়-সওয়ারী মাইল থেকে মাইল মাইল থেকে মাইল...
বেপোট উধাও।

কোথায় উধাও দূরপাল্লার জোয়ান ঘোড়া ?
সমস্ত রাত ক্ষুরধ্বনি কপাট থেকে হৃদয় জোড়া,
শুখনো খোলস শরীর থেকে আছড়ে পড়ে প্রবল ঝড়ে
অন্ধকারের চাদর মুড়ে দিক থেকে এক দিগান্তরে।

দিগান্তরে সূর্য নামে অগাধ জলে মাছরাঙা-ডুব
হয়তো জীবন এপার থেকে অন্ধকারের আরেক সরূপ,
অমোঘ আদেশ মাথায় নিয়ে সপাট ঘোরে গোলোকধামে।

যত্নে তবু সাজিয়ে ছিলাম সাজাতেই হয় রঙিন জামায়,
তুই উরুতে পছন্দসই আমার হাতের বর্ম সোনায়,
তবু আমার ঘোড় সওয়ারী মাইল থেকে মাইল
মাইল থেকে মাইল বেপোট উধাও ॥

যাযাবর যন্ত্রণায়

জয়ন্তী সেন

আমার চোখের থেকে সরে যায়—আমি প্রচলিত
বিশ্বস্ত সঙ্গীকে ডাকি—নাম ধরে এবং আবেগে।
মেঘকে সূর্যের পাশে শুতে বলি, হাওয়াকে বোঝাই,
গোলাপের চারা বুনি উর্বরতা যদিও থাকেনা,
ফসল ফুরিয়ে গেলে, জোরে হাততালি
দিয়ে বলি যবনিকা আজো নয়, আরো দৃশ্য থাক ;
বিমুখ ঋতুর কাছে লজ্জাহীন হাত পেতে রাখি,
আস্থা রাখি হৃদয়ের যত্নশীল বিমুখতা ভুলে।
আমার চোখের থেকে সরে যায় তবুও সময় ;
যাযাবর যন্ত্রণায় সে আমারই সুযোগ্য দোসর।
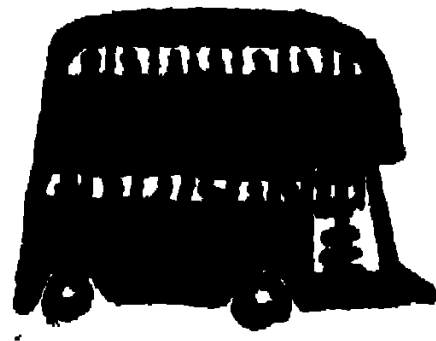
প্রস্তাবনা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কোমল কুসুমগুলি—আমার দেখিতে বড় সাধ,
বাসনার উদ্যানে আমার এ অন্তহীন হাত
অন্ধকারে অনিমেষ। তবু দ্যাখো ঘটে পরমাদ।
সাজায়েছি বার বার সন্ধ্যার অঞ্জলি
দিবসের অস্তরাগে। কৃষ্ণচূড়া পলাশের কাল
কবে তারা অস্তমিত। তবুও যে সখি-সংবাদ,
অভিনীত হতে চায়। ফুলের মতই সব অবাক উজ্জ্বলি
রয়েছে এ সহজিয়া সৃষ্টির উদ্যান।
ফুলের মতই মুগ্ধ চেয়ে দেখি—চন্দন—পাপড়িতে
ঢাকা দ্রুত অন্ধকার। সময়ের উজবুক মালীটা
আহাম্মক—রাখে না সে ফুলের সম্মান।
একটি দুটি পাপড়ি ঝড়ে পড়লে মাটিতে
বর্ণ কিছু ম্লান হলে, বের করে নির্মম কাঁচিটা।
দুপায়ে মাড়িয়ে যায় নগ্নফুল—শবাধারে তুলে দেয় গান।

অথচ আমার বুকে পূরবীর অবিরাম ব্যথা।
ঝরিতে দেখেছি আমি বহুফুল নষ্ট অন্ধকারে
ধীরে ম্লান হয়ে যেতে, সুকোমল পাপড়ি ঝরাতে।
তাদের বিদায়ী ব্যথা সর্বাঙ্গে আমার
রেখে গেছে কী যন্ত্রণা, ছায়া নামে রৌদ্রের দুয়ারে।
আমি এ উদ্যানে আর থাকব না, ফুলের জলসাতে
ফুলগুলি ঝরে যায়, হেলেনের ফুলগুলি ঝরে গেছে কখন ব্যথায়
স্তনের কুসুমগুলি নুয়ে পড়ে, দ্রৌপদীর দ্রুপদী জ্যোৎস্নায়
অন্ধকার নামে ধারে, মোনালিসা কাঁদে যন্ত্রণায়।
আমিও অঝোরে বহু কাঁদিয়াছি, ফুলেদের করুণ আর্তনাদ
শুনিয়াছি—, ফুলেদের নীরব যন্ত্রণা।
মালীটা বিবিক্ত, যার উদ্যান তাকেও দেখেনি।
আমারও ফুলের জলসা নষ্ট হবে, অথচ সেখানে কোনো হাত
নেই আমাদের, আমরা শুধু প্রস্তাবনা।
অথচ এ নষ্ট দূতী পৃথিবীর কাছে আমরা অসহায় ঋণী ॥

জল পড়ে, পাতা নড়ে

শান্তি রায়

একেক সময় স্বপ্নের ভেতর অকস্মাৎ জল পড়ে, পাতা নড়ে ;
অদ্ভুত মন্ত্রবলে যাজ্ঞবল্ক্য সকল হৃদয়
খুঁটে নেয় পৃথিবীর সব ভালোবাসা...
হৃদয় শূন্য করা রিক্ত দীর্ণ ভূতপত্রী খাঁ-খাঁ
সব হৃদয়ের মাঠ :
ঘুমে ভাসে তেপান্তর সমস্ত উঠোন,
প্রেমের ব্যস্ততা শুধু একে একে
দ্বার খুলে রাখে—
গোপন মনন রক্তে সেই চিরঞ্জীব শিল্প গড়ে
অজন্তা ইলোরা কিংবা টেরাকোটা আশ্চর্য্য প্যানেল !

একেক সময় স্বপ্নের ভেতর অকস্মাৎ
জল পড়ে; পাতা নড়ে... !

সাঁকোর নীচে

তৃপ্তি ভট্টাচার্য

এখন অনেকদিন সূর্যহীন প্রহরের মত
আমাদের রক্তের ভিতর
এখন ফুলের মাসে শিশুদের সশব্দ হৃদয়ে
কথারা ফেরারী
গম্বুজের ঋজুতায় বিচ্ছুরিত ভালবাসা নেই
হৃদপিণ্ড সাপের শীতে ক্রমাগত আচ্ছাদন টানে
তবুও আমার এই ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের মূলে
প্রাচীন অশ্বত্থ গাছে নক্ষত্রের আলোক নেমেছে
প্রাচীরে আশ্চর্য্য ফুলে সমুদ্রের সবুজ বাতাস।

আমরা গভীর রাতে যে বর্ণনা মাটীতে মেখেছি
উত্তপ্ত গর্ভের নীচে শিশুদের যা-কিছু বলেছি
সব কিছু কাটা-ছেঁড়া অসনাক্ত মৃতের মতন
ভয়ার্ত ধূলায় শুয়ে
চুঁয়ে চুঁয়ে সভ্যতাকে দেখে ?

অন্তহীন অসীমের হাতে যতক্ষণ অন্ধকার থাকে
তখনও জ্যোৎস্নায় বসে বহুদূরে হরিণের ঝাঁক
অরণ্যের নিবিষ্টতা দেখে
তখনও বরফ গ'লে নীল জল
সমতলে আসে
তখনও সাঁকোর নীচে বহমান সচ্ছন্দ প্রবাহ ॥

অনন্ত আশ্রয়

সমরেশ ঘোষ

নাম নয় যশ নয় অর্থ নয়
অন্য কোন অন্য কোন প্রার্থিত প্রত্যাশায়
অন্বেষণে যতদূর দেখা যায়
হাজারো ইচ্ছার শব ছুঁয়ে ছুঁয়ে
অতলান্ত সাগরের নাবিকী হৃদয়
সঙ্গহীন-প্রজ্ঞায় নির্মম :
একাকী অন্বেষায়
আরো এক হৃদয়ের তরে আশ্রয় যাচে
আশ্রয় যাচে, চিরন্তন...
কোন এক দীপ্ত আঁখীর বিম্বিত নীড়ে...

নিভৃত মরমে এমনি অনন্ত আশ্রয়
খুঁজে ফেরে খুঁজে ফেরে মানুষের হৃদয় ।।

ঘণ্টা বেজে গেলে

তাপস কুমার দাশগুপ্ত

প্রতীক্ষায়মান ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠলে, এখনো
অনেক দূরে চলে যাই দণ্ডকারণ্যের সীমানা পেরিয়ে,
লোনা-জল, মিঠে মাটি সুস্বাদু আকাশ,
সোনালী ধানের শীষে কৃষকের গান।
প্রতি পদক্ষেপে দূরাগত বাতাসের সুর,
ঈর্ষায়ে কম্পিত হলেও
পথ হেঁটে চলি।

গ্রাম থেকে গ্রামান্তর,
পায়ে পায়ে দেশ মহাদেশ।
সময়ের পানপাত্র অবিচল থাকে।
দৃশ্যপট ম্লান হলে,
আমার জীবাশ্ম পৃথিবীর বুকে ঘষে মুখ
তবু ছুটে চলে।
তাই বর্ত্তমান পায়ে হেঁটে চলি।

এখন ফিরাও মোরে—
চতুর্দ্দিকে তোমার প্রেমিক দেওয়াল।
ক্লান্ত প্রহর বাড়ি ফিরে চলে গেলে একে একে
এখন সময় কত ?
আমার হাতে সময়ের পানপাত্রে
সোমরস অবিচল থাকে।
আমাকে ফিরায়ে লও
ক্লান্ত বাহু পাশে।

কবিরুল ইসলামের সঙ্গে কবিতা বিষয়ক এই 'সাক্ষাৎকার'টি সম্প্রতি গৃহীত হয়। আমাদের পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশে সেটি এই সংখ্যায় উপহার দেওয়া গেল।

....

১। প্রশ্ন: কেন লেখেন ?

উত্তর: 'কেন লেখা' এই প্রশ্নে সম্প্রতি একটি ইংরেজি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলুম: He writes simply because he cannot escape writing. এইটেই সত্যি যে না লিখে পারিনে ব'লেই লিখি। অথচ কাগজ কলম নিয়ে বসলেও অনেক সময় এক লাইনও লিখতে পারিনে। সেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। ভেতরে ভেতরে তৈরি হ'তে হয়।
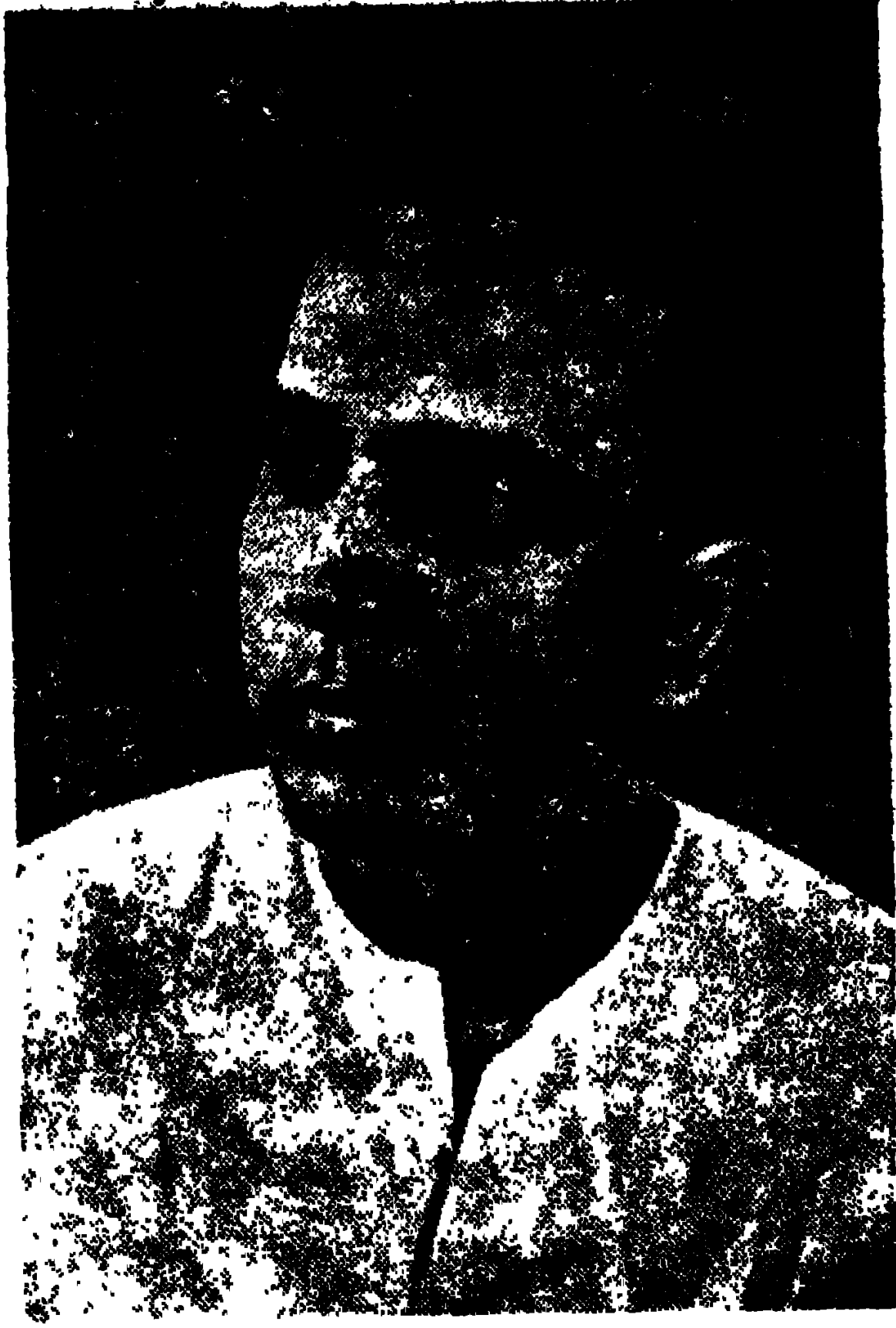
সাক্ষাৎকার

কবিরুল ইসলাম

তারপর ঠিক সময় সাহস ক'রে কলম নিয়ে বসতে হয়। আমার কবিতা লেখা এই রকম। গল্পের বেলাও অনেকটা তাই। আবার অনেক সময় এমনও হয় সাহস ক'রে বসতে পারিনে বলে অনেক লেখা শেষ পর্যন্ত আর হ'য়ে ওঠে না। অবশ্য যাকে automatic writing বলে তা'ও নয়। তবে

কোথাও এই রকম একটা ব্যাপার থেকেই যায়। অনেক সময় এক লাইনও লিখতে পারা যায় না। সামান্য একটা শাদা মাঠা চিঠিও দিনের পর দিন শেষ ক'রে উঠতে পারা যায় না। এবং যা লিখি তা তো দেখতেই পান। যদি একে লেখা বলেন তাহলে তাই।

২। প্রশ্ন: কি ক'রে লেখক হলেন?

উত্তর: লেখক আর হ'তে পারলুম কই! অথচ গত কুড়ি বছরে খুব একটা কমও কিছু লিখিনি। মাত্র একটা কবিতার বই ছেপেছি। দশটা না হোক অন্তত পাঁচটা তো ছাপতে পারতুমই। এবং যা গদ্য লিখেছি তাতে ক'রে হেসে খেলে অন্তত একটা প্রবন্ধের বই। অথচ দেখুন দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটি এখনও যন্ত্রস্থ পর্যন্ত করতে পারি নি। আমার নিজের তো কোনো পত্রপত্রিকা নেই, তথাকথিত কোনো গোষ্ঠী নেই, ঢাকঢোল, লোকলস্করও নেই! অবশ্য 'নেই' বলে কোনোই দুঃখ নেই। অবশ্যই নেই। আপনার প্রশ্নের উত্তরে এই মুহূর্তে ভাবলুম মাত্র। আপনাদের কাছে কোনো আড়াল নেই। সবই তো জানেন। সুতরাং···

৩। প্রশ্ন: লিখে তৃপ্তি পাচ্ছেন কি?

উত্তর: না, পাইনে। মাঝে-মাঝে হঠাৎ-ই কোনো-কোনো লেখা লিখে উঠতে পেরে একটু ভালো লাগে এই যা! তারপর দুচার দিন যেতে না যেতেই আর পছন্দ হয় না। নিজের ওপর রাগ ধরে। এবং যা লিখি তার খুব কমই ছাপতে দিই। অনেক লেখা ছেপেও তৃপ্তি হয় না। এই অহরহ অতৃপ্তি নতুন লেখার দিকে নিয়ে যায়। অনেক লিখতে ইচ্ছা করে।

৪। প্রশ্ন: কি ধরণের পাঠক সাধারণত আপনি আশা করেন?

উত্তর: এক কথায় সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়। serious পাঠক। কেননা লেখা তো শেষ পর্যন্ত পাঠকের জন্যেই, নচেৎ ছাপতে দিই কেন? বই করি কেন? একটা লেখার জন্যে যে প্রতীক্ষা এবং পরিশ্রম, ভেতরে-ভেতরে যে রক্তপাত, কেউ না কেউ কিংবা হয়তো অনেকে পড়বেন ব'লেই তো! তাই আশা, তিনি একটু মন দিয়ে, খুঁটিয়ে পড়বেন; তাঁর কল্পনা এবং বুদ্ধিকে একটু দৌড় করাবেন। একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করবেন। লেখকে-পাঠকে অলক্ষ্যে একটা সমঝোতা তৈরি হতে হবে। ধন নয়, মান নয়, এইটুকু আশা।

৫। প্রশ্ন: সম্প্রতি রব উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জনজীবন থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। আপনি কি বলেন?

উত্তর: না, আমি এমন কথা মানিনে, বরং এহেন উক্তিকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় মনে করি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জনজীবন থেকে কি ক'রে সরে গেলেন? এই সব থেকে সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথ অপঠিত থেকে গেলেন! তাঁর বিশাল গদ্য সাহিত্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—তাঁর কবিতারও আমরা খোঁজ রাখিনে। এ জন্যে দুঃখ হয়। রবীন্দ্রনাথের মত করে আমাদের জন্যে আর কে ভেবেছেন? সর্ব বিষয়ে, জগৎ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মনোযোগ ও অভিনিবেশ প্রসারিত ছিল। সংক্ষেপে বলতে হয়, তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা নয়, রবীন্দ্রনাথই এখনও আমাদের ত্রাতা হ'তে পারেন।

৬। প্রশ্ন: এদেশের সাহিত্যের, বিশেষ করে, কবিতার ভবিষ্যৎ কি?

উত্তর: আমি দুমর আশাবাদী; ইংরেজিতে যাকে বলে diehard optimist. তাই আমাদের সাহিত্য, বিশেষ করে আমাদের কবিতা সম্পর্কে আমার প্রত্যাশার অন্ত নেই। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের পরে এখনও আমরা একটা প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে চলেছি। তবে এরি মধ্যে গদ্যে, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে গব করার মত কিছু কিছু কাজ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গেলেন ১৯৪১-এ; আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৭১-এ তাঁর লোকান্তরের ৩০ বছর পূর্ণ হবে। ৫০ বছরে অর্থাৎ ১৯৯১-এ খতিয়ে দেখার সময় হবে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কি রকম কাজ হয়েছে। কি পাইনি, কি পেয়েছি তার হিসেব মেলাতে হবে। এবং আমার মনে হয় সেই সময় তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মহিমা আরও স্পষ্ট ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে।

৭। প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ 'ঐকতান' কবিতার মাধ্যমে আধুনিক কবিদের উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন শ্রমিক কৃষাণের শরিক হ'তে তাঁরা যেন দ্বিধা না করেন। রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান ক'জন আধুনিক কবি গ্রহণ করেছেন?

উত্তর: কবুল করা ভালো রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান বাংলা কাব্যে সাহিত্যে এখনও তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। 'সৌখিন মজদুরির কাল মনে হয় এখনও হয় নি অবসিত। একবার হঠাৎ-ই স্ফুলিঙ্গের মতো সুকান্ত এসেছিলেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ-প্রত্যাশিত সাহিত্যের রূপরেখা তাই এখনও আমাদের সামনে প'ড়ে রয়েছে। অবশ্য এ কাজ যে একেবারে কিছু হয়নি এমনও নয়। তবে তেমন উল্লেখ্য কিছু না। লেখকদের সেই দিকে যেতে হবে। অর্থাৎ যেখানে আবহমান কালের বাংলা দেশ প্রসারিত হয়ে আছে।

৮। প্রশ্ন: আধুনিক কবিতার লেখক ও পাঠক সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর: আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমার অশেষ প্রত্যাশার কথা তো বললুম। সমস্যাও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান তো আমাদের সামনে আছে এই ২৯ বছর ধ'রে। 'ঐকতান' লেখা হয়েছিল ১৯৪১ সালের ২১শে জানুয়ারি। আমরা সূর্যের দিকে পিছন ফিরে চুপ করে আছি। তার পর কত সব ঘটনা ঘটে গেল: '৪২এর আগষ্ট বিপ্লব, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অর্থনৈতিক টালমাটাল, বেকারী, রাজনৈতিক অস্থিরতা, চতুর্দিকে সার্বিক নৈরাশ্য। এ সবের মধ্যেই কবিদের কাজ করতে হবে, কাজ করতে হয়, রাস্তা খুঁজে-পেতে হাতড়ে নিতে হয়। তবে এরি মধ্যে যখন কাউকে চীৎকার করতে শোনা যায়: আমাদের 'সশস্ত্র আধুনিকতা' চাই, তখন সত্যি বলছি বুঝতে পারিনে। এই সব তথাকথিত স্লোগান, আমার মনে হয়, কবিতার কোনো উপকার করে না। নিছক stunt ছাড়া কিছু না। তখন শিল্পীর সততায় সন্দেহ লাগে।

আগেই বলেছি সহৃদয় এবং সৎ পাঠক চাই। অনেকে বলেন কবিতার পাঠক বেড়েছে। পাঠক খুব একটা কিছু বেড়েছে ব'লে আমার তো মনে হয় না। আমি দেখেছি 'শিক্ষিত' লোকেরাও কবিতা পড়েন না। যদিও আমি মনে করি কবিতা আমাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে। আমি আরও মনে করি যে কবিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত।

যেমন কবিতা লেখা তেমনি কবিতা পড়াও চর্চা-সাপেক্ষ। তাই পাঠকের দায়িত্বও কম নয়। তাঁরও প্রস্তুতি প্রয়োজন। লেখকে-পাঠকে মধ্যপথে দেখা হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে:

> 'একাকী গায়কের নহেতো গান, মিলিতে হবে দুইজনে—
> গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।'

৯। প্রশ্ন: দেশের বর্তমান অস্থির পরিবেশে লেখকদের কর্তব্য কি?

উত্তর: লেখকের কর্তব্য এই অস্থির পরিবেশের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করানো, এর গভীর মূলে দৃষ্টি চালানো। অর্থাৎ সমস্যাটির শিকড়ে যেতে হবে। তাঁর সময় ও সমাজ অবশ্যই তাঁর লেখার বিষয় হবে কেননা কবিও সামাজিক মানুষ। তবে তিনি শিল্পী: এই তাঁর একমাত্র পরিচয়; তিনি সমাজ-সংস্কারক নন, তথাকথিত 'লড়িয়ে' তো ননই।

অবশ্য তাঁর রচনা সমাজ-সংগ্রামে ব্যবহৃত হতে পারে। 'শিল্পের জন্তে শিল্প' এই তত্ত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। তাঁর রচনার একটা যাকে বলে deep social purpose থাকতে হবে। এবং অবশ্যই তা হ'তে হবে শিল্পের শর্ত মেনে কেননা শিল্পের জন্তই শিল্পীজন্ম। আমি এটুকু খুব বড় করে মানি।

১০। প্রশ্ন: পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলবেন?

উত্তর: পূর্ব বঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে কিছু না বললে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত যে-কোনো আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। উভয় বঙ্গে পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দুঃখ এই, পাশাপাশি কিন্তু পাশে নয়, কাছাকাছি তবু কাছে নয়। মাঝখানে একটা অদৃশ্য দেয়াল: দুস্তর আড়াল। কিন্তু এপারে ওপারে একটা অনুকূল আবহাওয়া গড়ে উঠছে। সেই দেয়াল একদিন অপসৃত হবে। আমরা সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আছি।

ওপারে কিছু-কিছু অসাধারণ কাজ হচ্ছে, বিশেষ করে গছে। কবিতাও পিছিয়ে নেই। অজস্র লেখা হচ্ছে। এ পারে তার সামান্তই 'কলতান উঠে'। এই দম-আটকানো অস্বাভাবিক অবস্থা একদিন শেষ হবে—আলো-হাওয়ার অবাধ চলাচলে। সেই দিনকে অগ্রিম স্বাগত জানাই।

১১। প্রশ্ন: অনেকতো হ'লো, এবারে যদি নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন? আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

১২। প্রশ্ন: আপনি যদি আপনার পাঠকক্ষে আমাদের নিয়ে যান এক মিনিট?

১১। উত্তর: এই প্রশ্ন ছুটি আমার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর, বিশেষ ক'রে প্রথমটি। এতক্ষণ যা বললুম তাইতো আমার নিজের কথা। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কি বলবো? আমার জন্ম বীরভূমের একটি গ্রামে মাতুলালয়ে ৮ই ভাদ্র ১৩৪১। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি পড়াই। গত ২০ বছর লিখছি: মূলত কবিতা, কচিৎ কদাচিৎ গদ্যও লিখি। বি. এ. পড়ার সময় কয়েকটি গল্প লিখেছিলুম; তারপর আর চেষ্টা করিনি। অবশ্য মাঝে মাঝে লিখতে ইচ্ছা করে। বলবার সব কথা তো কবিতায় ধরতে পারিনে, তখন অন্য মাধ্যমের দিকে মন টানে। কিন্তু কবিতা যেহেতু শ্রেষ্ঠ শিল্প তাই কবিতাই আমার মুখ্য মনোযোগের বিষয়।

আমি একটা কবিতার বই—আমার প্রথম কবিতার বই ('কুশল সংলাপ') ছেপেছিলুম ১৯৬৭-এ আমার অগ্রজপ্রতিম কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ

প্রবর্তনায়। বইটা ছেপেছিল পূর্বাশা প্রকাশন। এই বছরের (১৯৭০) মধ্যে আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('তুমি রোদ্দুরের দিকে') ছেপে বার করতে চাই ; বইটির এই নাম সন্তরদা অনুমোদন ক'রে গিয়েছেন। কোনো সময় একটা প্রবন্ধের বই করারও ইচ্ছা। কলকাতায় থাকিনে ব'লে নানান রকম অসুবিধে হয়। তবে সুবিধে এই যে কলকাতার কলুষ এবং হৈ হল্লা আমাকে স্পর্শ করে না। আমার সৌভাগ্য এই যে অধিকাংশ পত্রপত্রিকার সম্পাদক-সম্পাদিকা আমার লেখা ছাপানো ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারে আমার পোষকতা করেন। কলকাতা রেডিও কখন-সখন আমন্ত্রণ করেন। এজন্যে আমি তাঁদের সকলের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমি কোনো দল কিংবা গোষ্ঠীতে নেই। অবশ্য এ রকম অনেকেই আছেন।

১২। উত্তর: 'পাঠকক্ষ' ব'লে আলাদা আমার কিছু নেই। একটা ছোট্ট ঘর—স্তূপীকৃত বইপত্র, মেঝেতেই বেশি। ঘরে ঢুকেই দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ। একটা পেল্লাই র‍্যাক আছে, ছোট-ছোট চার-পাঁচটা, একটা আলমারিও আছে। সর্বত্রই বই এবং পত্র পত্রিকা। ঘরে একটুও জায়গা নেই। ওরি মধ্যে আবার শোবার জন্যে একটা ছোটখাটো এক পাশে, এবং লেখার জন্যে টেবিল-চেয়ার। বইপত্রের অগোছালো ভীড়ে আমি খুব সন্তর্পণে থাকি। তবে এতেই অভ্যস্ত ব'লে চোখ বুঁজেও চলাফেরা করতে পারি। অন্য লোক পায়ে-পায়ে ঠোক্কর খান। আমার ঘরের এহেন অব্যবস্থা আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার একটা স্থায়ী কলহের বিষয়! বইএর মধ্যে সামান্য কিছু কলেজে পড়ানো পাঠ্যপুস্তক ও তদ্‌সংক্রান্ত 'অবশ্য পাঠ্য' বইপত্র। বাকি বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি-বাংলা বই পত্রিকা, অধিকাংশই কাব্য কবিতা বিষয়ক। পূর্ববঙ্গের বেশ কিছু বই পত্র পত্রিকা আমার সংগ্রহে আছে। ওখানকার বন্ধুরা প্রায়ই পাঠান। প্রায়-প্রতি সপ্তাহে পাই। এই নিয়ে আছি।

তবে এই দূর মফঃস্বলে থাকি ব'লে বইপত্রের ব্যাপারে সব সময়েই পিছিয়ে থাকি, কালে-ভদ্রে কলকাতা যাই তখন অনেক জানালা হঠাৎ খুলে যায় এক সঙ্গে ; নতুন-নতুন বই আসে, অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়: সিউড়ি ফিরে মনে হয় যেন এক আকাশ আলো হাওয়া ভালোবাসা সঙ্গে করে নিয়ে এলুম ॥

মেখলা পাল রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবে একটি উজ্জ্বল নাম। প্রতিভাময়ী এই শিল্পীর সংগে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির এই সাক্ষাৎকারটি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে হাজির করলুম। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে, ছন্দিতার বৈশাখ ১৩৭৭ সংখ্যায় 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' খ্যাত তরুণ সংগীত শিল্পী অনুপ কুমার ঘোষাল-এর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার

মেখলা পাল

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। সুসজ্জিত মঞ্চের উপর বসে মেয়েটি এক হাতে তানপুরা নিয়ে বিভোর হয়ে গাইছিলেন—'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এদেশে'। বহুদিনের কথা; কলেজের শারদোৎসব। একে একে এলেন শিল্পীরা। অনেকে পরিচিত। কেউবা অপরিচিত। এদের মধ্যে মেখলাও ছিল আমার কাছে অপরিচিতা। কিন্তু সেদিন ওর কণ্ঠে একটির

পর একটি গান শুনে মনে হ'ল ওর সঙ্গে যেন বহু যুগের ওপার হতে পরিচয় ছিল। সেদিনই মনে মনে বলেছিলাম এমন সুললিত কণ্ঠের অধিকারিণী এ মেয়ে একদিন বাংলার সঙ্গীত জগতে নিশ্চয়ই তার স্থানটি দখল করতে পারবে। পেয়েছেও। মেখলা আজ একজন খ্যাতনামা শিল্পী হিসাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ওর এই প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে তার নিষ্ঠার কথা জানবার জন্যই গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। দক্ষিণ পশ্চিম কলিকাতার উপকণ্ঠে গার্ডেনরীচ অঞ্চলের মেটিয়াব্রুজ থানার অন্তর্গত মুদিয়ালী রোডে ওদের নিজস্ব বাসভবনে বসে আলোচনা চলছিল।

জিজ্ঞাসা করতেই—মেখলা শোনাল তার কথা। "ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত চর্চ্চা করতাম। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম মায়ের কাছ থেকেই আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ পেয়েছি। বাবা শ্রীযামিনীমোহন পাল এখন দক্ষিণ পশ্চিম রেলের একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মী। গার্ডেন রীচের একটি অখ্যাত গার্লস হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ. (মিউজ) ও বি.এ. (মিউজ) সহ ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষ পত্র সহ সঙ্গীতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করি। তারপর ১৯৬৬ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্ত্তৃক রবীন্দ্রসঙ্গীতে গবেষণার জন্য মাসিক ২৫০৲টাকা হারে জাতীয় সাংস্কৃতিক মেধা বৃত্তিটি লাভ করি। এবং সুচিত্রাদির [শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র] কাছে উচ্চতর রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে চর্চ্চা করি।" -

আলোচনাকালে বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মেখলা বললো,—"বলতে পারেন সঙ্গীতের ব্যাপারে সুচিত্রাদিই আমার বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। এখনও ওঁর কাছে নিয়মিত শিক্ষা নিচ্ছি।" মেখলা ১৯৬৮ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সঙ্গীত বিশারদ উপাধি লাভ করে এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

১৯৬৬ সাল থেকেই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করে আসছে। এ ছাড়া নিয়মিত ফ্যাংশনে যোগদানের জন্য প্রচুর আহ্বান আসে।

প্রশ্ন করলাম—শিল্পীর পক্ষে কাউকে অনুকরণ করা শোভন সম্মত কি? অনেকেই মনে করেন আপনি সুচিত্রাদিকে ভীষণভাবে কপি করেছেন?

সলজ্জ হাসি হেসে মেখলা জবাব দেয়—"একটু একেও করছি—অনুকরণ নয়—তবে সুচিত্রাদিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকি। গুণীদের অনুসরণ করাটাই বোধ হয় শোভন সম্মত।

১৯৬১ সালে হিজ মাষ্টারস ভয়েস কোম্পানী থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি রেকর্ড প্রকাশের আহ্বান এলে মেখলা তাদের কথা রেখে দুটি গান রেকর্ড করে। "এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এ তরী" এবং যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে"। গান দুটিতে শিল্পীর নিজস্ব ঢং ও গায়কী কায়দায় এক অপূর্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া গান দুটি বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে।

আর কারও কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নিচ্ছেন কি—এ প্রশ্ন করাতে মেখলা মৃদু হেসে বললো—

"রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুচিত্রাদি ছাড়াও শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শ্রীদেবীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিয়মিত শিক্ষা নিচ্ছি।"

এখন কি করছেন ?

"কমলা গার্লস হাই স্কুলে কাজ করছি—তাছাড়া কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিত গান শেখাতে হচ্ছে।"

আমার পরের প্রশ্ন—ভবিষ্যতে কি করবেন ?—জবাব এলো—,

"দেখি সুযোগ ও সুবিধে পেলে উচ্চতর গবেষণারও ইচ্ছে রয়েছে।" ওর সেই ইচ্ছা সার্থক হউক। মেখলাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পথে বেরিয়ে বাসে উঠে আবার মানসপটে ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য—এক হাতে তানপুরা—কণ্ঠে তার বিলম্বিত লয়ে গাওয়া গান, সার্থক জনম মাগো···জন্মেছি এই দেশে······

রিপোর্ট যাই হোক চার্লস ল্যাম্ব সিগারেটের সাপোর্টার

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন দেশে সরকারী উদ্যোগে ধূমপানের অপকারিতার মাপকাঠি আবিষ্কারের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি দলকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। দীর্ঘ পনের বছর ধরে অনুসন্ধান করে নানা তথ্য সংগ্রহ করে, যে তত্ত্বে তাঁরা উপনীত হয়েছিলেন তা সাংঘাতিক। তাদের সেই সাংঘাতক রিপোর্টটি (৩৮৭ পৃষ্ঠার) প্রকাশিতও হয়েছিল। রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দিচ্ছি:

সিগারেট খান না এমন লোক যখন ১০০জন মারা যাচ্ছেন, তখন ধূমপানকারী এক হাজার জনের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার শতকরা এক হাজার।

ফুসফুস এবং গলায় ক্যান্সার হওয়ার অন্যতম কারণ সিগারেট খাওয়া। ক্রনিক ব্রংকাইটিস হলেও ধরে নিতে হবে ধূমপানই তার কারণ। করোনারি হার্টের অসুখ হলেও মানতে হবে রোগীর সিগারেট খাওয়ার বাতিক আছে। অনেকের আবার নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়, তার কারণও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধূমপান।

মেয়েরা যদি সিগারেট খায় তাহলে (বিবাহিত হলে) তাদের বাচ্চার ওজন অস্বাভাবিক ধরণের কমে যাওয়ার আশংকা থাকে।

আপনি যতই সিগারেট খাবেন, ততই অসুখ অথবা রোগের সংখ্যা বেড়ে যাবে; আবার ধূমপান যখনই কমিয়ে দিতে থাকবেন ততই রোগ পালাতে থাকবে, ওষুধ খেলে যেমন অসুখ সারে।

ধূমপানের নেশা ছেড়ে দিন ,(যে কোন বয়েসেই হোক না কেন) আপনার আয়ু নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে।

রিপোর্টের এক জায়গায় আশার কথাও বলা হয়েছে। ধূমপানকারীরা শুনলে আশান্বিত অথবা আনন্দিত হবেন যে, হুঁকো অথবা গড়গড়ার ধোঁয়া পান করলে নাকি সিগারেট খাওয়ার মত ক্ষতি করতে পারে না। ইংরেজদের পাইপও সেদিক থেকে খানিকটা এক জাতের জিনিস।

সিগারেট যখন টানা হয় তখন তার জ্বলন্ত অংশের তাপমাত্রা থাকে ৮৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা ১৫৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট। সেই সময়েই তামাকটা ভেঙে যায় এবং ধোঁয়ার সংগে অন্তত পাঁচশ' রকমের রাসায়নিক বস্তুর আবির্ভাব হয়। তামাক পাতার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের অনেককেই পাওয়া যায় না।

সিগারেটের ধোঁয়া, যেটা টানা হয় তার মধ্যে বহু ধরণের গ্যাসীয় পদার্থ এবং লক্ষ লক্ষ জলীয় পরমাণু থাকে প্রতি ঘন ইঞ্চিতে। এদের মধ্যে সাতটি পদাথ ক্যানসার হওয়ার অনুকূলে সাহায্য করে। আর সব চাইতে আশ্চর্যের কথা সিগারেটের ধোঁয়ার সংগে মিশে এই পদার্থের ক্ষতি করার ক্ষমতা চল্লিশ গুণ বেড়ে যায়।

সিগারেট টেনে সেই ধোঁয়া যদি পাঁচ সেকেণ্ড ফুসফুসের মধ্যে ধরে রাখা হয় তাহলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের মতে সিগারেট খাওয়াটা যতটা নেশার ব্যাপার, তার চেয়েও বেশি মানসিক ব্যাপার। সিগারেট খেয়ে নেশা হয়েছে এমন লোক তাঁরা খুঁজে পান নি। অবকাশ যাপনের জন্যে, খানিকটা সময়ের ফাঁককে পূরণ করার জন্যে অথবা এমনি ধরণের কারণে আমরা মাঝে মাঝে সিগারেট টানি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সেই ফাঁকে সিগারেটে ছুটো টান দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাদের মতে এসব ক্ষেত্রে 'চিউইং গাম' চিবোলেও সিগারেট টানার বিকল্প কাজ দিতে পারে।

আমেরিকার সিগারেট কোম্পানিগুলো দেশের লোকেদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্যে সিগারেটের ওপর সাবধান-বাণী সেঁটে দিচ্ছে—'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক'। জার্মানিতে তো কিছুদিন আগে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মারা হয়েছিল, "ধূমপান করা বিষ পান করার সামিল।'

ধূমপান করার অপকারিতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে আরো বলা হয়েছে, মারাত্মক রোগ ক্যান্সার আক্রমণের অনেক কারণ থাকলেও সিগারেট খাওয়াকে অন্যতম কারণ বলে হুঁসিয়ারি দিয়েছেন একালের বিজ্ঞানীরা। তামাক দ্রব্যের নিকোটিনের বিষক্রিয়া শুধুমাত্র ক্যান্সারকেই সাহায্য করে এমন নয়; হৃদযন্ত্র, শরীরের রক্তধারা, পরিপাক যন্ত্র, শিরা-উপশিরার নিয়মিত কার্যক্রম প্রভৃতিকেও ব্যাহত করে দিতে পারে ক্রমান্বয়ে। অনেক বিজ্ঞানীর বিশ্বাস অতিরিক্ত ধূমপান ক্ষয় রোগেরও সহায়ক।

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, যে-সমস্ত নারী-পুরুষ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ধূমপানকারী।*

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এত সব কর্মকাণ্ডের পরেও ধূমপানকারীর সংখ্যাও কমেনি, সিগারেটের চাহিদাও হ্রাস পায়নি। বরং বেড়েই চলেছে। তিনশ' বছরের অভ্যাস (আমেরিকাতে) অত সহজে যাবার নয়।

আসল কথা ধূমপানের আনন্দটিকে কোন ধূমপানকারীই অস্বীকার করতে পারেন না। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক চার্লস ল্যাম্ব তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছাটি জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আহা, মৃত্যুর পূর্বে যদি শেষ নিঃশ্বাসটুকু তামাকের সংগে টানতে পারতুম!'

যাঁরা ধূমপান করেন তাঁরা বোধ হয় সকলেই ল্যাম্বের সংগে একমত। তাই হাজার পোস্টার মেরে, বুলেটিন ছেপে, সাবধান-বাণী শুনিয়ে মানুষের সমাজ থেকে সিগারেটকে হটানো যাবে কিনা সন্দেহ। দেখা গেছে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ধূমপান করেন। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ক্যান্সারের প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। তখন আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ থাকবেনা যদি দেখি যিনি এই জটিল অসুখের ওষুধ আবিষ্কার করেছেন তিনি 'চেইন স্মোকার'।

---

* এই নিবন্ধটি লেখার সময় আমাকে অন্তত পাঁচটি সিগারেট খেতে হয়েছে।

জব্বলপুরে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারা

হেনা হালদার

জব্বলপুরের বঙ্গ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেটা ছিল ১৯৩৮ সাল। হঠাৎ শোনা গেল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জব্বলপুরে আসছেন। স্থানীয় বাঙালি সমাজে সে কি বিপুল উৎসাহ। স্থির হল বাঙালি সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল। বাংলা স্কুলের হেডমাষ্টার মণিলাল চৌধুরী মহাশয় অনেক খেটেখুটে এক দীর্ঘ মানপত্র রচনা করলেন। আমরা মেয়েরা বন্দেমাতরম গানের সঙ্গে পুষ্প বর্ষণ প্রাকটিস্ করতে লাগলুম। মুস্কিল বাধলো সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি মহাশয়কে নিয়ে। অনেক চেষ্টা করেও তাঁর হিন্দি উচ্চারণের বাংলাটা কিছুতেই শোধরানো গেলনা। শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অবশ্য চেষ্টা চলতে লাগল। যাই হোক যথাকালে নেতাজী ত' বেঙ্গলী ক্লাবে পদার্পণ করলেন। তুমুল শঙ্খধ্বনি পুষ্প বর্ষণ মাল্যদানের পর নেতাজী মঞ্চে উপবেশন করলেন। এইবার মানপত্রের পালা। সভাপতি মশাই খদ্দরের ধুতির উপর জিনের কোট পরে মাথায় গান্ধীটুপি লাগিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর ঘর্মাক্ত কলেবরে থেমে থেমে হিন্দিটানের বিশুদ্ধ বাংলায় মানপত্রটি কোনোরকমে পাঠ করলেন। প্রতিক্রিয়া অবিশ্বাস্য হল। নেতাজী দারুণ খুশী হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বক্তাকে প্রচুর সাধুবাদ দিয়ে বললেন 'এই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটির চমৎকার বাংলা ভাষণে আমি চমৎকৃত এবং অভিভূত হয়েছি। এখানে আসার আগে আমার জন্যে এমন এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে ভাবতেই পারিনি। কী যে আনন্দ পেলুম বলার নয়।' হলের মধ্যে যেন বজ্রপাত ঘটে গেছে। দর্শকরা স্তম্ভিত, বক্তা অধোবদন। অবশ্য নেতাজীকে আর সরল সত্যটা জানতে দেওয়া হলনা। তাতে উভয় পক্ষেরই লজ্জাটা বাড়ত বই কমতনা।

এখন অবশ্য জব্বলপুরের আর সে দিন নেই। বছর ভরে বারো মাসে তের পার্বনের মচ্ছব লেগেই আছে। সিদ্ধিবালা বসু লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েসনের

(সিটি বেঙ্গল ক্লাব) অনুবর্তী বাংলা স্কুল, পাঠাগার, নারী মঙ্গল সমিতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার ক্লাস, নৃত্যকলা মন্দিরের নিয়মিত অনুশীলন ত' চলছেই, তাছাড়া দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, নামকীর্তন, মহাপুরুষদের জন্মোৎসব তিথি পালনের মধ্য দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাও বর্তমান। এই প্রতিষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট বাঙালি গণনেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, গায়ককে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে এবং মানপত্র নিয়ে আর অসুবিধায় পড়তে হয় নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সাধক দিলীপ কুমার রায়, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, সত্যেশ্বর ঘোষ, চট্টগ্রামের অম্বিকা চক্রবর্তী, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেব বর্মন, শিল্পী অসিত কুমার হালদার, নন্দলাল বসু, নৃত্য বিশারদ উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্কর, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নিয়ে যাদুকর পি. সি. সরকার, অশোক কুমার প্রমুখকে আমরা যথাযোগ্য সমাদরে সম্বর্ধিত করার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৫৮ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এ সহরের বাঙালী অবাঙালীকে আলোড়িত করে গেছে। রবীন্দ্র জন্ম শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, নাটকাভিনয় গীতি আলেখ্য, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করেছিলুম। প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ সিটি বেঙ্গলী ক্লাবে রবীন্দ্র-আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া আমাদের বিচিত্রা সাহিত্য বাসরের তত্ত্বাবধানে বাংলা দেশ থেকে প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করে আনাও হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই জব্বলপুরে বাঙালির সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের কারখানা, ডাক ও তার বিভাগ এবং নানান বিভাগের গভর্মেন্ট কলেজের স্থাপনার জন্যে বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালির সংখ্যা এখন পঁচিশ হাজারেরও বেশী। সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে তিন মাইল দূরে গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরী এষ্টেটের বাঙালিরা "দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাব" নামে ঐ অঞ্চলের বাঙালিদের জন্যে একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের পত্তন করেছেন। এখানে বাংলা পাঠাগার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ক্লাব আছে। এ ছাড়া সহরের থেকে আট মাইল দূরে খামারিয়ার পশ্চিমাঞ্চল বা west land এর বাঙালিরা "আনন্দ

পরিষদ" নামে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র খুলেছেন। এ অঞ্চল অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর জন্যে প্রসিদ্ধ।

আরও দূরে খামারিয়ার পূর্বাঞ্চল বা East land এর বাঙালিরা সহরের বহু নিত্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাঁরা বিশেষ উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় একটি বাংলা পাঠাগার এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে বাঙালির শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে গড়ে ওঠা খামারিয়া অঞ্চলে আরো একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হল "শিল্পশ্রী"। প্রবাসী বাঙালির দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্র জয়ন্তী, সুভাষ জয়ন্তী, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সব কিছু এঁরা পরম উৎসাহে পালন করে থাকেন।

এঁদের রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যাভিনয় এবং একাঙ্কনাটক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর থেকে পটুয়া এনে এঁরা প্রতিমা নির্মাণে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। কলকাতার ঢাকী এসে আরতির সময় ঢাক পিটে উপভোগ্য করে তুলেছে দর্শকদের উৎসবের মুড। খামারিয়া অঞ্চলের বাঙালিদের সৌজন্যে নিষ্ঠায় ও উদ্যোগে জব্বলপুর সহরের বাঙালিরাও সর্বপ্রথম "যাত্রা" দেখবার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত। খামারিয়ার বেশীর ভাগ বাঙালিরাই কলকাতা বা বাংলাদেশের নানাস্থান থেকে সমাগত। এ অঞ্চল তাঁরা বঙ্গভাষা, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান করে রেখেছেন। এবং সহরের আরেক প্রান্তে "যান পরিবহন কারখানার" নবাগত বাঙালিদের উৎসাহে আরেকটি সাহিত্য সংস্কৃতির সংস্থা সদ্যঃপাতী ফুলের মতন ফুটে উঠেছে যার নাম "বিবেক"। আশা করা যায় এঁদের জাগ্রত বিবেক ঐ অঞ্চলের হিন্দুস্থানী বনে যাওয়া বাঙালীদের দংশন করে চৈতন্য ফিরিয়ে আনবে।

প্রসাধনে রংয়ের প্রভাব

বেলা দে

আমাদের দেহে ও মনের উপর প্রত্যেকটিরই কোনো না কোনো প্রকারে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে রংয়ের একটা সম্পর্ক আছে। আবার রূপের সঙ্গে রংয়ের ও একটা সম্পর্ক আছে। প্রসাধনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এ পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। যেমন দেহের রংয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির রং নির্বাচন করা হয়। অঙ্গরাগের বর্ণ নির্বাচনেও এ বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য থাকে এ ছাড়া নানা ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনো একটি বা একাধিক রংকে নিজের রুচি অনুযায়ী প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কোনো একটা নির্দিষ্ট রং নিয়ে যদি আমরা এ বিষয়ে পরীক্ষা করি, তবে দেখতে পাব যে ঐ রংয়ের প্রতি দীর্ঘ দিনের পক্ষপাতিত্বের জন্য আমাদের দেহ ও মনের উপর কতকটা উপকার বা অপকার সাধিত হয়েছে।

মানুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী কোনো না কোনো একটা বিশেষ রংয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেই জন্যেই একজনের অতি প্রিয় রং অপরের কাছে অস্থির হয়ে ওঠে।

সমস্ত রংয়ের মধ্যে সবুজ রংয়ের প্রভাব স্নিগ্ধকর। এই রংটা চোখের স্বাস্থ্য ও দৃষ্টিশক্তি রক্ষার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। সবুজ রংয়ের সংস্পর্শে বেশীদিন থাকলেও দেহ ও মনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না।—সবুজ রং দেহকে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে। রোগী বা দুর্বল মানুষের পক্ষে সবুজ রং খুবই উপকারী।

সারাদিনের পরিশ্রমের ভার যখন মস্তিষ্কে একটা অবসাদ বা ক্লান্তির ভাব দেখা দেয় তখনো এই সবুজ রংয়ের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ থাকলে ক্লান্তি দূর হয়।

হলদে রং স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতাজনক। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে সবুজ রং ও অবসাদক বলে মনে হয়, সেখানে হলদে রংয়ের ব্যবহারে মনটা অনেকখানি খুশীতে ভরে ওঠে। বর্ষাকালে যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, চারদিকে কেমন একটা অন্ধকার এবং থমথমে ভাব এসে মনটাকে উদাস করে দেয় সেই

সময় কিন্তু হলদে রং স্বভাবতঃই ভাল লাগবে। গুমোট ভাবটাও চলে যাবে।

লাল রং উত্তেজনাবর্দ্ধক। গরম দেশে গরম কালে লাল রংয়ের কাপড় জামা পড়তে নেই। পরলে আরো বেশী গরমবোধ হবে। বরং শীতকালে পরা যেতে পারে।

নীল রংও মস্তিকের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সময় দেখা যায় ক্ষাণদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা নীল রংয়ের বিশেষ পক্ষপাতী।

সাদা রং অল্পদিনের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করে দেয়।

এবারে স্থান ও সময় বিশেষে কি রংয়ের পোষাকের পার্থক্য করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে দু'চার কথা উল্লেখ করছি।

ভোরের দিকে এবং দিনের প্রথম ভাগে ফিকে হলদে, ফিকে সবুজ এগুলো যাদের রং ফর্সা তাদের ভালই মানায়। দুপুরে হালকা রং। রাত্রে গাঢ় রংয়ের শাড়ী ব্যবহার করা যায়। দেহের রং অনুযায়ী যেমন শাড়ীর রং হওয়া দরকার তেমনি শাড়ীর রং অনুযায়ী ব্লাউজের ও জুতোরও রং হওয়া চাই।

মোটকথা রং সম্বন্ধে আমাদের যেন মোটামুটী একটা জ্ঞান থাকে। কেননা রংইতো বিশেষভাবে পোষাকের রূপ দেয়। কাজেই রং সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে আপনার রূপ বা সৌন্দর্যকে ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না।

নাটকে স্বকালের বিষয় ভাবনা

সুরেশ হালদার

বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে আজকাল বেশ আলোচনা চলছে, কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু যে কি তার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা দুরূহ অর্থাৎ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনার ক্রম নির্বাচিত হবে সেদিকে বিশেষ কোন সতর্কতা দেখা যায় না। দুর্বোধ্য হলেই যে বিষয় নেই বা থাকা সম্ভব নয় এমন কথা চিন্তারও অগোচর। মানুষের ব্যবহারিক জগতের সম্পদ নিয়েই শিল্পের কারবার তা না হলে নিরালম্ব বায়ুভুক্ ইত্যাদি অনেক আখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। মতের বিতণ্ডায় প্রবেশ না করে একথা বলা যায় যে মানুষের কল্পনারাজ্যে কি বস্তুজগতের চিন্তাভাবনার বাইরের কোন অশরীরী সংলাপ অথবা বস্তুর বাধা বন্ধন অতিরিক্ত অতিলৌকিক কোন মনোজগত? তা হয় না, এবং হতেও পারে না। দৃশ্যে কিংবা অদৃশ্যে আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য লাভ করে সমগ্র বস্তুজগত, আর তারই প্রকাশ খুঁজে পায় শিল্প মাধ্যম। আমাদের কাছে যা দুর্বোধ্য তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে কিংবা অতিরিক্ত কোন বিষয়। মানুষ জন্ম অবধি সব কিছু জেনে বা শিখে পৃথিবীর চলমানতায় মিশে যায় না। সহজাত কিছু বৃত্তি আছে সত্য, তাকে সম্বল করে বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে পঞ্চভূতের সাহচর্যে এক একটা পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের, শিল্পী মানুষের অগ্রগামী চিন্তা প্রকাশিত হয়। অতএব বিষয় নিরপেক্ষ রূপ কল্পনা ও তার প্রকাশের ভাবনা নিছক শূন্যতা।

শিল্পে, সাহিত্যে মানুষের বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঘটে। মানুষের স্থায়ী ভাবগুলি চিরকালের কিন্তু সঞ্চারী ভাবগুলি নিত্য পরিবর্তনশীল। যুগের হাওয়া লেগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয় এবং সেই রুচির তারতম্য অনুসারে সঞ্চারীভাবেও রূপান্তর একান্তভাবে সত্য। সুতরাং প্রকাশ শিল্প মাধ্যম হলেও শিল্পের অভিব্যক্তির জ্ঞান এবং মননশীলতা সৃষ্টির সার্থকতা খুঁজে পায়। জটিল হতে জটিলতর সমস্যার দিকে জীবন যখন এগিয়ে চলেছে এবং বিজ্ঞান ও অপরাপর বিদ্যা মানুষের চিন্তা ভাবনা একটা

কিছু করবার প্রেরণায় উন্মুখ তখন মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বৃহত্তর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। সুতরাং সেই নবীন পরীক্ষার মধ্যে মানুষের আজ একান্ত সজীব বাস্তব অভিসার। একটা কিছু করতে হবে; প্রচলিত রীতি বা ধারাকে ভেঙে নতুনকে আনতে হবে, অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে এমন কিছু করা উচিত নয় যা করতে চাইব না যা শিল্পের পর্যায়ে পড়বে না বা মানুষের সামগ্রিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। এখানেও জিজ্ঞাসা অবশ্যই থাকবে—কি ভাল? কি মন্দ? কি ক্ষতিকারক অথবা শিল্পের পর্যায় বলতে কি বুঝি? তবে এ বিষয়ে একটা কথা বলা যায় যে মানুষের খাদ্যের মধ্যে বিষকেও খাওয়া যায় বলে যদি খাদ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তা হলে মৃত্যুও কাম্য এ কথা স্বীকার্য। সে রকম শিল্পের ক্ষেত্রেও মন, স্বাস্থ্য, ও (আনন্দ, বেদনা, দুঃখ) ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে যদি শিল্পের প্রকাশ হ'য়ে ওঠে বিষের মত তা হ'লে বলবার আর কিছুই থাকে না; এ দ্বন্দ্ব চিরকালের এবং এর সমস্যা কোনদিনই মিটবে না, অন্তত বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংঘাতের মত অস্তিত্ব ও অনাস্তিত্বের বিবাদ যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত চলবে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চলমান বৃত্তের পরিধি নতুন নতুন ভাবনা চিন্তায় বিকশিত হ'য়ে উঠছে। সেরূপ নাটকের বিষয়বস্তু এককাল থেকে আর এককালে পরিবর্তিত হ'তে হ'তে নতুনের দিকে এগিয়ে চলেছে। (যেমন পৌরাণিক ঐতিহাসিক, সামাজিক, সংকেতিক, কাল্পনিক ইত্যাদিতে নিবদ্ধ ছিল এবং সামগ্রিক ব্যক্তি ও মানব জীবনের প্রতিচ্ছবিকে সরল ভাবে বলা হত।) ক্রম অগ্রসরমান জীবনের জটিলতা বিচ্ছিন্ন করে দেখতে ও জীবন যন্ত্রনা মুক্তির সমাধানের পথ খুঁজে চলতে খণ্ড ঘটনার মধ্যে অখণ্ডের জীবন দর্শনে ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠছে। সে ক্ষেত্রে যে বিষয় বস্তু নেই এ কথা বলা যায় না। দর্শক বা শ্রোতাকে বর্তমানকালে নিছক দেখে ভাললাগা মন্দলাগার সমালোচনা গ্রহণ করতে আজকের নাট্যকার ও নাট্য শিল্পীরা বিশেষভাবে আগ্রহী নয়। শিল্পীর ভাবনার অংশভাগী হয়ে সামাজিকবর্গও কিছু ভাবনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন এমন আশা করা অবাঞ্ছনীয় নয়। এর মানে এই নয় যে দুর্বোধ্য বিষয়ের সাহায্যে রীতির বদল করে সামাজিকবর্গকে ধোঁকা দেওয়া বা তাঁদের প্রতি গর্বিত পাণ্ডিত্যের ঝুলি খুলে দেওয়া। বিষয়কে বোধ্য করতে গিয়ে কেউ মধ্যভূমিতে দাঁড়াতে চায় না। দুর্বোধ্য হ'লেও সূত্র একটা থাকবেই এবং

ছকে বাঁধা অঙ্কের মতো সেটুকু ধরতে বা বুঝতে পারলেই সমস্ত বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে তো উঠবেই সঙ্গে সঙ্গে রসিকজনের চিত্ত আনন্দ রসে ভরে উঠতে বাধ্য। সুতরাং আজকের নাট্য জগতে যে অভিসার চলেছে তার মিলন নাট্য শিল্পী ও সামাজিকবর্গের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে যে অবশ্যম্ভাবী একথা অনিবার্য সত্য এবং আশাপ্রদ।

সম্পাদকীয়

॥ শিশিরে ভেজা শিউলি ফোটা শারদায় উৎসব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি চেনা অচেনা সকলকেই—যে,যেখানে আছেন প্রত্যেককেই জানাই আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা ও শুভেচ্ছা। যাত্রাপথে যাঁরা আছেন—হউক তা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে অথবা নীলাকাশের স্বচ্ছ রজতশুভ্র মেঘমালার আড়ালে—তাদের যাত্রা হউক নিরাপদ। রোগশয্যায় যাঁরা আছেন তাঁরা অবিলম্বে নিরাময় হয়ে উঠুন। নিশীথের নির্জন অন্ধকার যাদের কাটে উৎকণ্ঠময় প্রতীক্ষায়—ঊষা তাদের বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি দূর করে নব সবিতার প্রদীপ্ত রশ্মিতে মনে জেলে দিক কল্যানের শুভ পঞ্চপ্রদীপটি। জীবন যাদের ভরা, শুধু চোখের জল—হাহাকার—আর অশান্ত ঘৃণীর তাণ্ডবে—মায়ের আশীষে তাঁরা যেন ফিরে পান শান্তি ও সমৃদ্ধি ॥

॥ আজ নানা কারণেই আমরা অত্যন্ত অশান্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। চারিদিকের অস্থির ও

অনিশ্চিৎ পরিবেশ আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে বেদনাময়। তার উপরে রয়েছে সাম্প্রতিক কালের রেকর্ড পরিমান বৃষ্টি ও বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডব। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের স্থায়ী দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হলো সাময়িক কালের বিপর্যয়। তাই এ সময়ে সকলের উদ্দেশ্যেই আমরা আবেদন রাখতে চাই—সহায় এবং সম্বল অনুযায়ী যে যেমন পারেন দুর্গতের যথাসম্ভব সাহায্য করুন। সহানুভূতির স্নিগ্ধ করস্পর্শে অসহায়দের দুর্দশার সামিল হোন। তবেই শারদীয় উৎসবের তাৎপর্য সার্থক হবে॥

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সার্ধ শতাব্দী জন্ম জয়ন্তী। এ উপলক্ষ্যে প্রথমেই আমরা এই মহান শিক্ষকের উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। উনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের তিনিই মূল উদ্গাতা। তিনিই বিধবা বিবাহ প্রথা, জাতীয় শিক্ষা সংস্কার, এবং দেশপ্রেম ও জাতীয়তা-বাদের বীজ বপন করেছিলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর সম্পূর্ণ কাজের উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। অবহেলিত দরিদ্র মানুষের প্রতি অসীম মমত্ব বোধের জন্যই তিনি দয়ার সাগর খ্যাতি পেয়েছিলেন—এ যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের কি কিছুই নেই ?

অন্যান্য বারের মত এবারেও ছন্দিতার শারদীয় সংখ্যায় প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ফিচার, সাক্ষাৎকার প্রভৃতির ডালি সাজিয়ে দিলাম। আশা করি আমাদের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এ সংখ্যাটি পেয়ে খুশী হবেন। ছন্দিতার লেখক সূচীতে এবারের বিশেষ সংযোজনা হলো শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী। শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীচৌধুরী শান্তিনিকেতনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উপর একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছেন। এ ছাড়া তরুন সমালোচক শ্রীনিরঞ্জন হালদার সাম্প্রতিক কালের যুব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। উভয়ের উদ্দেশ্যেই আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল।

সাম্প্রতিক কালের বৃষ্টিপাত, বন্যা, ঘটনা ও দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণাম জানাই॥

৭ম বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ১৩৭৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
নিখিল বিশ্বাস

যুগ্ম সম্পাদক
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরগোপাল দাশ

ছন্দিতা

৭ম বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা

সাহিত্যে রাজনীতি

সম্পাদকীয়

কথাটা পুরোনো। তবে নতুন করে শোনালেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সম্প্রতি তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে অনুরাগীদের দেওয়া সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন যে বর্তমান সাহিত্যের এই অবস্থার জন্য রাজনীতিই দায়ী। সাহিত্যে প্রত্যক্ষ

রাজনীতির ব্যাপক প্রয়োগ হউক এটা আমরা অবশ্যই কামনা করি না। কিন্তু কি অবস্থায়, কবে থেকে আমাদের সাহিত্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা অবশ্য তারাশঙ্কর বাবু খুলে বলেন নি। না বলে ভালই করেছেন কারণ খুলে বললে হয়ত নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়তেন। এই যুগে যখন প্রতিদিন মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটছে—রাজনীতি যখন মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে প্রতি পলে নিয়ন্ত্রিত করছে তখন আমাদের সবকিছুতেই রাজনীতির প্রভাব পড়বে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ভয়েরও কোন কারণ নেই। এ যাবৎকাল ধরে আমাদের সাহিত্যে স্থান পেত শুধুমাত্র বেগম-বাইজী ও বারবনিতাগণ। সাহিত্য-সেবীরা ওদের অন্দরমহলের খোঁজ খবর নিতে যতটা উৎসাহ দেখাতেন সাধারণ মানুষকে নিয়ে সাহিত্যের কারবার করতে ততটা ভরসা পেতেন না। অথচ যুগের পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করে যদি সাহিত্যিকগণ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাভিত্তিক সাহিত্য রচনা করতেন তবে হয়ত আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের এই হাল হতো না। "সংসারে যারা শুধু দিল, পেল না কিছুই"—সেই অবহেলিত, বঞ্চিত, অত্যাচারে লাঞ্ছিত, অপমানে জর্জরিত মানুষগুলিকে নিয়ে সাহিত্য করা কি একেবারেই অসম্ভব ? তারাশঙ্কর বাবু নিজে কি বলেন ? তাঁর উপর তো এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অনেক আশা ছিল, তিনি কি কবি-গুরুর সেই প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হয়েছেন ? কিছুদিন পূর্বেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সে সময়কার সাহিত্য রচনাতে রাজনীতির প্রভাব পড়ে নি এটা কি হলপ করে বলা যাবে ? নিজে রাজনীতি করবেন, তাতে দোষ নেই, দোষ শুধুমাত্র সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটলে ? চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে, নীতি ও রীতির সঙ্গে এমন অসামঞ্জস্য বলেই না আজকের সাহিত্যের এই হাল। কাজেই সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব পড়লেই সাহিত্যের অবনতি হয় না—সাহিত্যের অবনতির মূল কারণ হলো সাহিত্য সেবীদের অসৎ মনোবৃত্তি ও অসংগত দৃষ্টিভঙ্গি।

আজকের বাঙলা নাটক প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

সমরেশ ঘোষ

বাঙলার অনেক নাট্য-সমালোচক ও সেই সঙ্গে অনেক নাট্য সংস্থার আক্ষেপ যে এখনো পর্যন্ত বাঙলায় তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে মৌলিক নাটক লেখা হচ্ছে না। কথাটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে কিছু ভালো নাটক যে লেখা হয়নি বা হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু অসংখ্য নাট্য সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী বেশ কিছু ভালো নাটক যে লেখা হচ্ছে না, সে কথা ঠিক। বিভিন্ন একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় অনেক নাট্য সংস্থাকেই মৌলিক নাটক মঞ্চস্থ করতে দেখেছি, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে গুণগত বিচারে সে সব মৌলিক নাটক উঁচু দরের নয়। এ ছাড়া এমনও অনেক নাট্য প্রতিযোগিতা হয় যেখানে মৌলিক নাটকের জন্ত কোন পুরস্কার থাকে না; বলা বাহুল্য, মৌলিক নাটক অভিনয় করার বাধ্যবাধকতা না থাকায় বহু অভিনীত নাটকই মঞ্চস্থ হতে থাকে। মৌলিক নাটক বলতে এখানে পাণ্ডুলিপির কথাই বলছি—ভাব ও রূপের মধ্যে এই মৌলিকতা অবশ্যই বিচার্য।

বর্তমানে বাঙলায় নতুন মৌলিক নাটকের অভাবের জন্ত নাট্য সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা বিদেশী নাটকের অনুসরণে নাটক মঞ্চস্থ করছেন, কখনও স্বীকৃতি সহ, কখনও বেমালুম স্বনামে। প্রত্যক্ষ অনুবাদে মর্যাদা আছে, কিন্তু আত্মসাৎ করার মধ্যে আছে হীনমন্যতা। বাঙলা নাটকের এই সমস্যার কথা নাট্য শিল্পের সঙ্গে যারা গভীর ভাবে জড়িত তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কেউ কেউ অগ্রণী হয়ে মৌলিক নাট্যরচনায় হাতও দেন, কিন্তু নাট্য রচনা-রীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না হওয়ার ফলে সেই সব মৌলিক নাট্যরচনার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য ভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে না। এ পর্যন্ত কলকাতা ও মফস্বল বাঙলার বিভিন্ন মঞ্চে সাধারণ প্রদর্শনী ছাড়াও প্রতিযোগিতা উপলক্ষে অভিনীত বিভিন্ন মৌলিক নাটক দেখে আমার কয়েকটা কথা মনে

হয়েছে। বলাবাহুল্য, আজকের মৌলিক নাটকগুলোর দুর্বলতা কোথায়, সেটা বলাই আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠলে সার্থক মৌলিক নাটক রচিত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রথমত, আজকের অধিকাংশ নাটকই শিল্পমুখ্য না হয়ে প্রচার-মুখ্য হয়ে উঠেছে। যদিও সব সাহিত্যই কোনো না কোনো ভাবে প্রচার, কিন্তু সব প্রচারই সাহিত্য নয়। সাহিত্যের তথা নাটকের বক্তব্য থাকবেই, কিন্তু নাট্যকার শিল্পের ন্যায়কে মেনে তাঁর বক্তব্যকে শিল্পান্বিত বক্তব্যে রূপায়িত করেন। কিন্তু দেখা গেছে, আজকের অধিকাংশ নাটকগুলো শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদে প্রত্যক্ষভাবে প্রচার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে দেখলে আমরা দেখব যে দেশের কি বিদেশের যে কোন খ্যাতনামা নাট্যকারের নাটকে একটা না একটা বক্তব্য থেকেই থাকে। খুব চেনাজানা নাটকের মধ্যে যেমন ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'রাজারাণী'; এ নাটকে মানুষের অন্যতম জীবন-সত্য সম্পর্কে একটা বক্তব্য আছে। 'রাজারাণী'তে রাজার কর্তব্য জ্ঞানহীন সর্বনাশা প্রেমের শোচনীয় পরিণতির মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রেমের আদর্শ কি হওয়া উচিত এমন একটা বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন। আর একটি বহুপঠিত ও অভিনীত ইংরিজী একাঙ্ক নাটক হল লেডি গ্রেগোরীর 'Rising of the Moon'—এই নাটকে জেল থেকে পালানো এক দেশ প্রেমিক নেতা আর তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য কর্তব্যরত এক পুলিশ সার্জেন্টের দ্বন্দ্বময় হৃদয়বৃত্তির এক আশ্চর্য আলেখ্যে দেশপ্রেমের মহত্বকে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে সে প্রচার কখনই প্রচার বলে মনে হবে না। অনুরূপভাবে ইবসেনের অনেক নাটকই সামাজিক বক্তব্যে সোচ্চার হলেও শিল্প হয়ে উঠেছে শিল্পীর গুণে। এখানে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে নাটককে আগে নাটক হতে হবে; অর্থাৎ শিল্পহিসেবে উত্তীর্ণ হতে হবে; তারপর অন্য কথা। কারণ রাজনৈতিক বা সামাজিক বা দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বা অন্য যে কোনো সত্য বা মতবাদ জানার জন্য প্রবন্ধ বা শাস্ত্র সাহিত্য পড়লেই হবে, কিন্তু কোন সত্য বা মতবাদকে জীবন রসে জারিত করে আস্বাদ্য রূপে উপস্থিত করলে তবে তা শিল্প বা রস সাহিত্য হয়ে উঠবে। কেননা, শিল্প সাহিত্যে নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ সত্যকে বিশেষের আশ্রয়ে রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন ধরুন, মানুষের

মরণশীলতা একটা সাধারণ সত্য; এই মৃত্যু রহস্য নিয়ে অনেক প্রবন্ধ বা শাস্ত্র লেখা হতে পারে, কিন্তু মানুষের এই মরণশীলতার সত্যকে শিল্প সাহিত্যে যখন রূপ দেওয়া হবে, তখন তা বিশেষ মানুষের অর্থাৎ একজন ব্যক্তির জীবন অবলম্বন করেই দিতে হবে, অর্থাৎ রামবাবুর বা শ্যামবাবুর জীবনকে একটা সংহত ঘটনার পারম্পর্যে গেঁথে তার মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর এই অনিবার্যতা দেখাতে হবে। এটা একটা স্থূল উদাহরণ মাত্র। আসলে নাটক শিল্প হিসেবে সার্থক হয় তখনই যখন প্রাসঙ্গিক সংলাপে ও চরিত্র চিত্রণে কার্যকারণ পরম্পরায় সংহত ঘটনাকে একটি ভাবকেন্দ্রের লক্ষ্যে তাৎপর্যপূর্ণ চরম মুহূর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হবে।

সেই কারণেই আজকের মৌলিক নাটকের দ্বিতীয় দুর্বলতা হল নাটকের ফর্ম বা রূপ সম্পর্কে। এটা নিঃসংশয় যে আজকের নতুন নতুন ভাবনা ও চেতনার সূচনা হয়েছে পরিবর্তিত ও সমাজপারিপার্শ্বিকে, কিন্তু ফর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা না থাকায় নতুন ভাবনাগুলোর সার্থক শিল্পায়ণ হয়ে উঠছে না। সমাজে অবজ্ঞাত, শোষিত মানুষের শ্রেণী আজকের নাটকে প্রত্যক্ষভাবে প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে—তারাই প্রধান পাত্রপাত্রী। মনুষ্যত্বের এই নবমূল্যায়ণ নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। কিন্তু সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য যখন লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, বা রসিকের হৃদয়ে সাহিত্যকারের ভাব-ভাবনা সঞ্চার করা, তখনই সাহিত্যকার কেমন বললেন তার গুরুত্ব এসে পড়ে অনেক বেশী। নাটকের ক্ষেত্রেও দর্শকের মধ্যে বক্তব্যকে সঞ্চার করে দেওয়ার দায়িত্ব নাট্যকারের। তাই নাট্য-কারকে এমনভাবে নাটকের চরিত্র ও ঘটনাকে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে দর্শক গ্রহণ করতে পারেন, এই গ্রহণ অর্থ যে কোনভাবে গ্রহণ নয়, শিল্পের আশ্রয়ে গ্রহণ। এখানে আগের কথায় জের টেনে বলতে চাই যে নাটকের কেন্দ্রীয় ভাব সম্পর্কে সচেতন থেকেই চরিত্র-ঘটনাও সংলাপকে কার্যকারণ পরম্পরায় ও নৈয়ামিক শৃঙ্খলায় সংহত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের দুটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়—একটি বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও অন্যটি হল প্রস্তাবিত নাটকের নাট্য-চরিত্রগুলির আচার-আচরণ তথা চরিত্রের জ্ঞানবৃত্তি, অনুভববৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি (Knowing, feeling, willing) সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মনন-অনুধ্যান। নাটকের চরিত্রগুলি কখনও যেন যান্ত্রিক বা নাট্যকারের হাতের পুতুল না হয়ে পড়ে—চরিত্রের

শিক্ষা জগতে সমস্যা—পিছিয়ে পড়া শিশু

রাধারমণ দে

শিক্ষা জগতের কেন্দ্রে অবস্থান শিক্ষার্থীর—তাকে নিয়ে সমস্যার অন্ত নেই। নেই বলেই চলছে নানা ভাবে বিভিন্ন সমস্যাকে অতিক্রম করার প্রয়াস। পিছিয়ে পড়া শিশু বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটা।

শিশুদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক। তা থাকা সত্বেও যদি দেখা যায় যে পরিবেশের সঙ্গে সকলের মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে তাহলে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু সামঞ্জস্য বিধানের অভাবে যদি বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের থেকে পিছিয়ে পড়ে তাহলে সে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

পিছিয়ে পড়া শিশুদের আমরা শিক্ষাজগত থেকে দূরে সরিয়ে রাখব না নিশ্চই, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের তা বলে না। আমরা শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করব। অনুসন্ধান করে জানতে হবে শিক্ষার্থীর সমস্যার মূল কারণ কি? সেই সঙ্গে খুঁজতে হবে সমাধানের পথ। কি কি কারণে শিশু তার সহকারীদের থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে? কোন প্রকৃতগত কারণে কোন শিশু পিছিয়ে পড়তে পারে। কোন শিশু হয়ত জন্ম থেকেই স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন বা কোন অঙ্গ বিকৃত। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্যালয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

পিছিয়ে পড়ার দ্বিতীয় কারণ হিসাবে শিশুর অমনোযোগের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর নানা কারণ থাকতে পারে। শিশুর সাময়িক অসুস্থতা, গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশের কারণে অথবা বিষয়ানুরাগের অভাবে।

অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব পিতামাতার। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে চিকিৎসার সুযোগ নেই। যদি দুই তিনটি বিদ্যালয় এক সঙ্গে হয়ে শিশুদের চিকিৎসার জন্য কোন পরিচালনাগার স্থাপন করতে পারতেন তা'হলে পিতামাতার কিছুটা সাহায্য করা হত। কিন্তু আমাদের দেশে সুষ্ঠু ভাবে এইসব কাজ করবার প্রয়াস খুবই অল্প।

গৃহ পরিবেশের জন্য শিশুর অমনোযোগ দূর করতে হলে পিতামাতাকে প্রধানত সচেষ্ট হতে হবে। পিতা বা মাতার অবহেলা, তাঁদের মধ্যে নিত্য কলহ, প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন এইসব কিছুরই প্রভাব পড়বে শিশু শিক্ষার্থীর ওপর এবং তার মনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হবে। প্রথমে সে অমনোযোগী হবে পরবর্তী কালে সে সমস্যা শিশু (**Problem children**) ও অপরাধ পরায়ণ শিশু (**Deliuquent Children**) হয়ে উঠতে পারে। পিতামাতার যত্ন শিশুর একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন তার সার্থক বিকাশের জন্যে। পিতামাতা যদি শিশুর সামনে সার্থক আদর্শ তুলে ধরতে পারেন তা'হলে সেটা হবে তার পাথেয়। শিশুর পাঠে উৎসাহ প্রদর্শন করলে সেও উৎসাহী হয়ে উঠবে।

বিদ্যালয়ের পক্ষে পিছিয়ে পড়া শিশুর প্রতি অনেক কর্তব্য। বিদ্যালয় পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যেখানে শিশু যেন গৃহ পরিবেশের সঙ্গে তার তফাৎ অনুভব না করতে পারে। বিদ্যালয় পরিবেশের কৃত্রিমতা যদি শিশুর মনকে ভয়াক্রান্ত করে তা'হলে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা পড়বে এবং কোন বিষয়েই মনোযোগ দিতে পারবে না। বিদ্যালয়কে উদ্যানে রূপান্তর করার চেষ্টা সেই কারণে হয়েছিল। কর্মভিত্তিক ও খেলা ভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্তন করে শিশুর চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রীয় যাতে পাঠের কাজে লাগান যায় তার প্রচেষ্টাও হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিশু যখন প্রথম প্রবেশ করছে সেই সময় তার সামর্থ অনুসারে সঠিক শ্রেণীতে ভর্তি করাও বিদ্যালয়ের কর্তব্য। যা তার সামর্থের বাইরে সেই সব বিষয় যদি তার ওপর প্রথম থেকেই চাপিয়ে দেওয়া যায় তা'হলে সে পিছিয়ে পড়বে। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বোঝাপড়া যদি সার্থক না হয় তা'হলেও অনেক সময় শিক্ষার্থীর পাঠে অমনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি ও তাঁর আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

পিছিয়ে পড়ার অপর কারণ নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহের অভাব। হয়ত ঐ বিষয় যে শিক্ষক পড়ান তাঁর কোন আচরণ কোন সময় শিক্ষার্থীর মনে অহেতুক ভীতির সঞ্চার করেছে, সেই ভয় তাকে নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে অমনোযোগী করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীর ওপর জোর খাটিয়ে

তাকে মনোযোগী করা যাবে না। তার সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করে তার ভয় দূর করাই হবে বিদ্যালয়ের যথার্থ কর্তব্য।

মোটামুটি ভাবে একথা বলা চলে যে পিছিয়ে পড়া শিশুর সমস্যা অতিক্রম করতে হলে অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়ের ধৈর্যবান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, অনেকটা ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যই শিশুকে পরিচালনা করবার মত দক্ষতা আমাদের নেই। শিশুরাও পিছিয়ে পড়ছে। যখন তারা যৌবনে পদার্পণ করে তাদের অক্ষমতা বুঝতে পারছে সেটাকে উপেক্ষা করবার জন্য এমন পথ বেছে নিচ্ছে যেটা আমরা পছন্দ করছি না।

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

॥ তিন ॥

রাত এগারটা।

স্বামীজি পূজোর ঘর থেকে কখন রান্নাঘরে চলে গেছেন, গীতা টের পায়নি।

স্বামীজির ডাক কানে এল,

—"এখানে একলা বসে আছ যে ? বিমলবাবু কি ঘুমিয়ে পড়লেন ?" গীতা বিমলকে ডাকল।

বিমলের ঘুম ভাঙ্গার মধ্যে সেই উদাসীনতা। ও যে নতুন জায়গায় এসে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ওর ভাব ভঙ্গির মধ্যে কোথাও তা ফুটে ওঠেনি।

—"রাত হয়ে গেছে, চলুন খেয়ে নেওয়া যাক্।"

স্বামীজির ডাকে লক্ষ্মী ছেলের মত উঠে গিয়ে খেতে বসল বিমল।

গীতার মনটা ঠিক নিজের অধীনে ছিলনা। কোথা থেকে পুরনো ভাবনাগুলো এসে ওর মনটাকে ভারী করে তুলেছে। না না, এ ভাবনাগুলোকে ও কিছুতেই প্রশ্রয় দেবেনা। স্বামীজির আগ্রহে ও এসেছে, এই সব ভাবনা থেকেই মুক্তি পাবার জন্যে। কেন যে বিমল এল ওর সঙ্গে, এল যদি থেকে গেল কেন ? ও ভাবতেই পারেনি যে বিমল আসবে ওর সঙ্গে আর এ ভাবে থেকেই যাবে। কি মতলব তার ? ওর তো চিরদিনের স্বভাব, যা, কোরতে চায় তা কোরবেই। হয়তো মুখে কিছু বলবেনা কিন্তু অদৃশ্য এক শক্তিতে সব পণ্ড করে দেবে।

স্বামীজিও ওদের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন। খুবই সাধারণ খাওয়া। এক বাটি করে ডাল, একটা কুমড়োর তরকারী, একটু চাটনী আর লাল আটার রুটি। গীতার খুব লজ্জা করছিল। আটা মেখে দেওয়া, রুটিনো রুটে দেওয়া এগুলোও তো সে করতে পারতো জোর করে। তা না করে আবোল তাবোল ভেবে কাটিয়ে দিল সারা সন্ধ্যাটা।

খাওয়া শেষ হতেই স্বামীজি জিজ্ঞাসা করলেন

—"খেয়ে উঠেই ঘুমানো অভ্যাস নাকি ?"

বিমল উত্তরে জানাল যে কোনদিনই রাত দুটোর আগে তার শোওয়া হয়না। ওঠে অবশ্য খুব বেলা করে। আর উঠেই দৌড়তে হয় স্কুলে।
গীতার যদিও রাত করে খাওয়া অভ্যেস আর খেয়ে উঠেই শুয়ে পড়া।
আজ কিন্তু স্বামীজিকে সে কথা সে জানাতে পারলো না।

বকুল গাছের তলাটা নিপুন করে মাটি দিয়ে নিকোন। স্বামীজি মাদুরটা নিয়ে সেখানে গিয়ে বসলেন, বললেন,

—"আসুন বিমলবাবু গল্প করা যাক।"

গীতা খুসীই হল। সে প্রশ্ন করল

—"অন্যদিন খেয়ে উঠে আপনি কি করেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি শুধু হাসলেন জবাব দিলেন না।

গীতা একটু অপ্রস্তুত হল। স্বামীজিকে ও ভাবে প্রশ্ন করাটা অন্যায়।

স্বামীজি ওকে প্রশ্ন করলেন

—"গীতা, মা, কি মনে হচ্ছে তোমার? এই নির্জন জায়গায় ভাল লাগবে তো? কাল থেকেই কিন্তু তোমার কাজ শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা তোমার গুরুমন্ত্র নেওয়া হয়েছে কি?"

গীতা সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল,—

—"না, ওতে আমার এখনও কোন স্পৃহা তৈরী হয় নি।"

—"যার যা মত তার সেই পথ—স্বামীজি খুব সহজ ভাবেই কথাটা বল্লেন।

—"দীক্ষা না হলে কি আমার এখানে থাকা হবে না?"

স্বামীজি এ কথায় হা হা করে হেসে উঠলেন

—"দূর পাগলী, তা কেন? দীক্ষা হল মনের, আর কাজ হ'ল বাইরের।"

গীতার বুকের ভেতরটা বিদ্রোহ করে ওঠে ইচ্ছে হয় চিৎকার করে বলে ও সব দীক্ষা টিক্ষা আমি মানি না। বিশ্বাস করি না। কিন্তু পরক্ষণেই সংযত করে নেয় নিজেকে। ওতো এখানে এসেছে চাকরী শুধু চাকরী করতেই নয়, ও এসেছে আসলে একটু শান্তি পেতে আর নিজের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে। কারো গলগ্রহ হয়ে যেন থাকতে না হয়।

এখানকার আশ্রমের দেখাশুনো করা, লাইব্রেরীর উন্নতি করা, পাঠচক্র, স্কুল, এইসব গড়ে তুলতে ও এসেছে। এখানে তো ভগবৎ-বিশ্বাসের কোন প্রশ্নই আসে না। তবে সে অত উত্তেজিত হবে কেন? আর স্বামীজিও তো সে ধরণের কোন বাধ্যবাধকতার আভাস দেন নি।

বিমল প্রশ্ন করে—

—এখানে কোন উৎসব হয়?" স্বামীজি উত্তর দিলেন,

—"বছরে দুবার। কালীপুজোর দিন প্রায় সারারাত কালী কীর্ত্তন। সেদিন একটু বিশেষ ভোগরাগ হয়, দুর্গা পুজোর কদিনও মায়ের সেবা একটু ভালমত হয়। ছোট খাট মেলাও বসে। আর মশাই, গরীবরা এসে জড়ো হয় যখন সে দেখবার মত। এত কাঙ্গালও আছে মায়ের এই কাঙ্গাল রাজ্যে।"

—"মেলা কতদিন থাকে?" বিমল জানতে চায়।

"চার দিন। বিজয়াদশমীর দিনে ভেঙ্গে যায়। ঐ দিন যাত্রা গান হয়। গ্রামের লোকদের ঐ কদিনই যা আমোদ আহ্লাদ। এই অজ পাড়া গাঁয়ে আর কিইবা আছে? ক'ঘরই বা বাসিন্দা।"

—এখানে সিনেমা হল নেই?

—না, ওইটি এখনও এসে পৌছয়নি। সিনেমা যেতে হলে পরের ষ্টেশনে গিয়ে নামতে হবে, সেখান থেকে আবার মাইল দু এক পথ বাসে করে গিয়ে তবে সেই "রাধা টকিজ"। বিমলের মনে পড়ল ষ্টেশান থেকে নেমে অনেক খানি পথ সাইকেল রিক্সা করে আসতে হয়েছে। সাইকেল রিক্সা মাত্র ঐ একখানি, নমাসে ছমাসে একদিন হয়ত ভাড়া হয় আর ভাড়া হয় হয়তো উৎসবের দিনে।

—এ বিগ্রহ কি আপনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন?

—"হ্যা অনেকটা তাই, তবে, সে মশাই অনেক কথা। প্রথমেই বলে রাখি আমি কিন্তু পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যিসী হইনি। কাজেই আমার পূর্বাশ্রমও নেই পরাশ্রমও নেই। আমার একটাই আশ্রম সে আমার এই জীবন। সংসারে ছিলাম, বাবা, মা আমি আর একটা ছোট ভাই। পড়াশুনো করছিলাম। ছাত্র হিসাবে একটু ভাল বলেই নাম ডাক ছিল কিন্তু নন্‌কো অপারেশানের ডাক এল সারা বাংলা জুড়ে, আমি তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র। দিলাম ছেড়ে লেখাপড়া। রক্ত গরম, কাঁচা বয়েস ঝাঁপিয়ে পড়লাম রাজনীতিতে।

প্রথমে হলাম গান্ধীমহারাজের চেলা কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাজনীতির পাকে পাকে আমার বোধ বুদ্ধি জড়িয়ে পড়ল অহিংসাবাদের সেই শান্ত নরম বুলিতে আর মন ভরল না, অন্য পথ নিলাম, ধরাও পড়লাম, মারো ইংরেজের হুজুগে। ঠেলে দিল আন্দামান, সেখানে থেকেই খবর পেলাম বাবা গত হয়েছেন। কুড়িটা বছর কেটে গেল সেই আন্দামানের জেলখানায়—ফিরে এসে দেখি বাড়ী ফরসা। লোকের মুখে শুনলাম খেতে না পেয়ে মা আর ভাইটা আধমরা হয়েই ছিল। দেশে মড়ক লেগেছিল কলেরার—তাতেই খতম।

জানেন মশাই! মনটা কিরকম বিগড়ে গেল। দেশ দেশ করলাম অথচ নিজের ঘর দেখলাম না। না পারলাম দেশের কোন ভাল করতে না পারলাম ঘরের ভাল করতে।

বেরিয়ে পড়লাম ভিক্ষের ঝুলি সম্বল করে পথে, জুটে গেল এক সাধু মহারাজ। সাধু মহারাজের ঝোলার মধ্যে থাকতো আমার এই মায়ের মূর্তিটি—অষ্টধাতুর। সে বেটাচ্ছেলে সাধু একদিন তার ঝোলা ফেলে রেখে কোথায় যে উধাও হল আজও তার সন্ধান পাইনি। ভাবলাম দিই ঝোলা গঙ্গার জলে ফেলে কিন্তু কেমন যেন মায়া হল, ও বেটিকে নিয়েই ঘুরি। সে এক বোঝা। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম এই চণ্ডীপুরে। এখানে ধারে কাছে কোথাও দেবমন্দির নেই অথচ নাম চণ্ডীপুর।

থেকে গেলাম এইখানেই আমার এই চণ্ডীমাকে নিয়ে। গ্রামের লোকের দয়ায় ধীরে ধীরে এই ছাউনিটুকু গড়ে উঠলো। এখন পোষ মাসে পোষকালী দর্শন করতে অনেকে আসে আর আসে চৈত্র মাসে—সেই সময় বড় মেলা বসে। সে মেলায় ভারী ধুমধাম।

অষ্টধাতুর চণ্ডীমূর্তি বড একটা দেখা যায় না। গীতা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল এতক্ষণ। একটাও প্রশ্ন করেনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন—

—পাঠচক্রে কতজন আসেন স্বামীজি?

—এই আমাকে নিয়ে পাঁচ জন, তুমি এলে ছজন আর বিমলবাবু যদি আসেন তো সাতজন, হেসে উঠলেন।

—কবে কবে হয়?

—'মাসে একবার' তাই সবাই এসে উঠতে পারেন না।

—"কোন চাঁদা আছে নাকি?"

—"হ্যাঁ, অল্প লাইব্রেরীর চাঁদা আছে।"

—"লাইব্রেরী কেমন চলে?

—"মাসে চার আনা চাঁদা তাও ঠিকমত আদায় হয় না।

—"বই কত আছে?"

—"তা শ দুই তো বটেই।

—"সব আপনার নিজের বই?

—"নিজের আর বলি কি করে? কিছু আমার নিজের কেনা কিছু পাওয়া আর কিছু ধার করা।"

বিমল প্রশ্ন করে—

—"আপনি কি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের মতাবলম্বী?"

—আরে না না মশাই, আমি কোন সেবাশ্রমেরই নই—গেরুয়া পরি ময়লা কম হবে বলে আর নানা লোকের নানা প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্য, মাকে এনে এখানে বসিয়েছি, মায়েরই কোলে থাকতে পারব বলে, মা-ই আমাকে দেখবে। বুঝলেন বিমলবাবু! মা আমাকে বড় শান্তি দিয়েছে বড় অসময় কোলে টেনে নিয়েছে।

"গীতা মা, যদি মাকে চাও তাহলে মা, মা বলে ডেকো, মা সাড়া দেবে। অবশ্য সে তোমার যেমন খুশী।"

গীতা প্রশ্ন করে;

"—আপনি কি সত্যিই শান্তি পেয়েছেন, স্বামীজি? তাহলে কোনটা আপনার বড়? কেন এই লাইব্রেরী?" এই পাঠচক্র ও স্কুল গড়া; গ্রামের উন্নতি করা?

—ওঃ সেটা নিজের জন্য। নিজের স্বার্থের জন্য। বেঁচে থাকতে হলে খাওয়াটা আছে, পরাটা আছে, তাছাড়া দিনরাত মায়ের কোলের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে ঘুরলে মাও তো চড়টা চাপড়টা বসিয়ে দিয়ে বলবে, যা কাজ করগে যা। তখন?" বিমল জোরে হেসে ওঠে, কি সহজ সুন্দর অকপট কৈফিয়ৎ। স্বামীজি বললেন

—"এবারে ওঠা যাক্ কেমন? রাত অনেক হল। আপনারাও তো ক্লান্ত! কি বলেন?"

স্বামীজি উঠে পড়লেন বিমলকে নিয়ে চলে গেলেন। গীতার ইচ্ছে করছিল কিছুক্ষণ একলা বসে থাকে ঐ বকুল গাছের তলায়। কিন্তু কি ভাববেন স্বামীজি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়তে হল। মুখে, চোখে জল

দিয়ে শুয়ে পড়ল। বালিশে মাথা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কেন এই কান্না, তা ও নিজেই বুঝতে পারল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তারপরে কখন নিজেরই অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল গীতা।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে গীতা দেখে স্বামীজি পূজোর ঘরে আর বিমল সামনের মাঠটাতে পায়চারী করছে। ঠিক এ ভাবেই পায়চারী করতো বিমল অনেক আগে, যখন ওদের মধ্যে খুব তর্কাতর্কি হ'ত। মুখের ভাষায় কোন উত্তেজনা ওর প্রকাশ পেত না শুধু পায়চারী করতো।

মুখ ধুয়ে বিমলের কাছে গেল গীতা। বিমল প্রশ্ন করল,

—"তুমি কি ফিরে যাচ্ছ না?"

—ফিরে যাব বলে তো আসি নি।

- অনিমেশ জানে, তুমি এসেছ?

—হ্যা, তাকে জানিয়েই তো এসেছি।

—সে মত দিয়েছে?

– বাধা তো দেয় নি।

—টুটুল?

—তাকে তো হষ্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছি।

– চিরদিন তো সে সেখানে থাকবে না। তাছাড়া ছুটি ছাটাগুলো?

—প্রথম প্রথম আমাকেও তখন এখান থেকে ছুটি নিয়ে ওখানে যেতে হবে।

—খুব ভাল করে সব কিছু ভেবে দেখেছ?

—খুব ভাল করে সব কিছু ভেবে দেখার সময় বা সুযোগ তো আমার জীবনে কখনও এল না? আমার টলমলে সিদ্ধান্তের সুযোগে অনেক কিছুই ঘটে যায়। বিমল বুঝলো, এ খোঁচাটা তারই উদ্দেশে।

—"গীতা যেদিন বিমলকে জানিয়েছিল যে তাকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয় তারপর আর খুব বেশী দিন অপেক্ষা করে নি বিমল। চলে গেল কোলকাতা ছেড়ে গীতাকে কিছু না জানিয়েই। বিমলের নিজের মনের মধ্যেও যে না, না, প্রশ্ন উঠেছিল। ওর

মনে হত গীতার ভালর জন্তেই গীতাকে ওর বিয়ে করা উচিত নয়। এই ভাবনাটা প্রবল হলেই ও আবার ভাবত যে নিজেকে স্তোকবাক্য দিচ্ছে না তো, না একটা অনিশ্চিত অবস্থা থেকে সরে পড়তে চাইছে? নিজের এই পালিয়ে যাওয়াটাকে সে সূক্ষ্ম বিচারে তন্ন তন্ন করে দেখেছে কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পায় নি।

—"গীতাকে নিয়ে যতখানি অসন্তোষ তার নিজের ছিল গীতার কিন্তু ততখানি ছিল না; গীতার যেটুকু অসন্তোষ তৈরী হয়েছিল সেটার জন্য দায়ী বিমল নিজে। গীতার কাছ থেকে এমন একটা শক্তি দাবি করেছিল যে শক্তিতে ওর চরিত্রের অসঙ্গতিগুলো থেকে ওকে মুক্তি দেবে। গীতার আনুগত্য ওর কাছে অসত্য। গীতা কেন জোর করে না? কেন রাগে ফেটে পড়ে না? আগাগোড়াই ওর মতে সায় দিয়ে এল, তবে, কোথায় তার ব্যক্তিত্ব; বিমল যে ভাবে আঁকতে চাইতো গীতাকে তার সঙ্গে মিলাতে পারত না আসল গীতাকে। গীতার পক্ষেও ঠিক একই সমস্যা। গীতা কাতর হয়ে বলতো

—"আমি যা আছি সেই আমাকে তুমি চিনে নাও, তুমি তৃপ্ত হও। আর বিমল বলতো,—"তুমি যা সেই তোমাকেই আমি চাই। তোমার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তাকে তুমি বিকশিত করে তোল। তুমি যা আছ সেইটাই সত্য নয়, তুমি যা হতে পার সেইটাই সত্য।"

—"তুমি বলে দাও কি হ'তে হবে।"

—"কেউ কি কাউকে তা বলে দিতে পারে গীতা?

তৈরী হয়ে উঠতে হয়।"

আজ সেই সব কথা আবার গীতার মনের মধ্যে আনাগোনা করে। যতবার ভাবে ভাববে না আর পুরনো কথাগুলো ততোবারই ভাবনার স্রোতঃ বন্যার মতো বয়ে আসে।

স্বামীজি পূজোর ঘরে।

গীতা বিমলের সঙ্গে কথা বলে নিয়েই স্নানের ঘরে গেল। স্নানের সব ব্যবস্থা তৈরী। পাশে ইঁদারার পাড়ে একটা ছোট্ট বালতি দড়ি দিয়ে বাঁধা। ইঁদারার পাশেই স্নান ঘর। স্নান ঘরটা ছেঁচা বেড়া দিয়ে

সত্ত তৈরী করা হয়েছে। দুটো বড় মাটির গামলায় জল ভরতি। এ জল স্বামীজিই তুলেছেন নিশ্চয়ই। ওঁর তোলা জলে স্নান করতে মনের মধ্যে কেমন যেন সংকোচ এল। স্নান করে নিয়ে ও যদি আবার নিজে জল তুলে রাখতে পারতো তাহলেও বা হত কিন্তু জল কি ও তুলতে পারবে?

একবার চেষ্টা করে দেখলো, কিন্তু ভীষণ ভয় করতে লাগল। ও মনে মনে ঠিক করে নিল এর পর থেকে পুকুরেই যাবে স্নান করতে। স্বামীজির মুখে শুনেছে পাঁচুর মা, এক জন বুড়ো মানুষ। স্বামীজি তাকে আজ থেকে এখানে এসে থাকতে বলেছেন তার সঙ্গে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবে গীতা। আজ না হয় বিমলকেই বলবে ওর স্নানের পর মাটির পাত্র দুটোয় জল ভরে দিতে।

গীতা জানে বিমলের বেড টি খাওয়া অভ্যাস ছিল কিন্তু তা হলেও গীতা ওকে এখন চা করে দিতে পারবে না। স্নান না সেরে স্বামীজির রান্নাঘরে কিছুতেই ও যেতে পারবে না। ওর মনে পড়ল বিমলের কথা, বেড টি না হলে 'যে আমি বিছানা ছাড়তে পারি না'। আচ্ছা বিমল যদি বলে, 'নিজে জল তোলা অভ্যাস কর।' ওর জল তুলতে না পারাটা যে এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মানায় না এ কথাটা নিয়ে বিমল যদি ওকে খোঁচা দেয়—যাক্‌গে ও তো চেষ্টা করবে জল তোলা অভ্যাস করে নিতে। ওর নিজেরও তো চিরকালের অভ্যাস সকালে উঠে আগে চা খাওয়া তারপরে স্নানে যাওয়া কিন্তু এখানে এসে তো স্বামীজির ব্যবস্থাই অভ্যাস করার চেষ্টা করছে।

স্নান করে এসে বিমলকে ডেকে বললো—।

—"চট্‌ করে দু'বালতি জল তুলে দাও তো। আমি তোমার চা করে আনি।" বিমল কিছু বলল না। নির্বিবাদে ইঁদারার দিকে চলে গেল। চা না পাওয়ার জন্য ওর কোন অস্বস্তি হচ্ছে কিনা সেটাও বুঝতে দিল না। ও যখন বালতি করে জল তুলে পাত্র দুটো প্রায় ভরে এনেছে তখন স্বামীজি পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন—বিমলকে জল তুলতে দেখে বললেন,—

—"কি ব্যাপার; জল তো তোলা আছে।"

বিমল জবাব দিল

ইঁদারা আর বালতি দেখে জল তুলতে ইচ্ছে হল, মামার বাড়ীতে দাতন মুখে দিয়ে মামাতো ভাইর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জল তুলতাম। আপনার এখানে এসে মামার বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। 'সোঁদা সোঁদা নিম ফুলের গন্ধ। মাটি দিয়ে নিকোন ইঁদারার পাড় বেশ লাগছে।"

গীতার কানে সব কথাগুলোই গেল।

সে যেন মরমে মরে গেল।

দুকাপ চা করে স্বামীজির সামনে নিয়ে এসে বিমলকে ডাকলো। স্বামীজির ঘরে নারকোল নাড়ু ছিল বিমলকে এনে দিলেন। স্বামীজি জিগ্যেস করলেন,

—"তুমি চা খাবে না মা?"

—"হ্যাঁ খাবো।"

"কৈ নিয়ে এস। এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাক। তুমি তো দেখছি রান্নাঘরের ভার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছ। ও বেটি তো আর রান্না ক'রে দেয় না। ছেলেকে দিয়ে রাঁধাবে। আমার ও মা হল সৎমা। এবারে আমার নিজের মা এল বুঝলেন বিমলবাবু! আর হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না।"

বিমল জিগ্যেস করল,—

—"ট্রেন কটায়?"

স্বামীজি রিক্সাওয়ালাকে আসতে বলেছিলেন। বেলা এগারটা তেইশ মিনিটে ট্রেন আছে একটা। গীতা আর দাঁড়াল না। বিমলের রান্নার যোগাড় করতে চলে গেল। আনাজ পাতি ডালায় ছিল, স্বামীজির কাছ থেকে চালের খোঁজটা নিয়ে ভাত বসিয়ে দিল তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে কুটনো কুটতে সুরু করল। হঠাৎই ওর মনে হল আজ ও বিমলের জন্যে রান্না করছে। কতদিন নিজের হাতে রান্না করেনি। বিমলের খাওয়ার খুব বাচ বিচার। বরাবরই সব ব্যাপারে বিমল বড় ছিমছাম। খাদ্য বস্তুর চেয়ে খাদ্যবস্তুর পরিবেশনের ওপরেই বেশী নির্ভর করে ওর খাওয়ার রুচি। বাংলা দেশের রাগালো রোগালো রান্না ও পছন্দ করে না। সব কিছুর মধ্যে বিদেশীয় ছিমছাম ভাবের ও পক্ষপাতী। গীতা পড়লো মহা বিপদে। স্বামীজি কি খান তা ও জানে না আবার বিমলের পছন্দমত রান্না করে যদি ও স্বামীজিকে খুশী করতে না পারে। অনেক

সাজ তৈরী করা হয়েছে। দুটো বড় মাটির গামলায় জল ভরতি। এ জল স্বামীজিই তুলেছেন নিশ্চয়ই। ওঁর তোলা জলে স্নান করতে মনের মধ্যে কেমন যেন সংকোচ এল। স্নান করে নিয়ে ও যদি আবার নিজে জল তুলে রাখতে পারতো তাহলেও বা হত কিন্তু জল কি ও তুলতে পারবে ?

একবার চেষ্টা করে দেখলো, কিন্তু ভীষণ ভয় করতে লাগল। ও মনে মনে ঠিক করে নিল এর পর থেকে পুকুরেই যাবে স্নান করতে। স্বামীজির মুখে শুনেছে পাঁচুর মা, এক জন বুড়ো মানুষ। স্বামীজি তাকে আজ থেকে এখানে এসে থাকতে বলেছেন তার সঙ্গে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবে গীতা। আজ না হয় বিমলকেই বলবে ওর স্নানের পর মাটির পাত্র দুটোয় জল ভরে দিতে।

গীতা জানে বিমলের বেড টি খাওয়া অভ্যাস ছিল কিন্তু তা হলেও গীতা ওকে এখন চা করে দিতে পারবে না। স্নান না সেরে স্বামীজির রান্নাঘরে কিছুতেই ও যেতে পারবে না। ওর মনে পড়ল বিমলের কথা, বেড টি না হলে 'যে আমি বিছানা ছাড়তে পারি না'। আচ্ছা বিমল যদি বলে, 'নিজে জল তোলা অভ্যাস কর।' ওর জল তুলতে না পারাটা যে এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে মানায় না এ কথাটা নিয়ে বিমল যদি ওকে খোঁচা দেয়—যাক্‌গে ও তো চেষ্টা করবে জল তোলা অভ্যাস করে নিতে। ওর নিজেরও তো চিরকালের অভ্যাস সকালে উঠে আগে চা খাওয়া তারপরে স্নানে যাওয়া কিন্তু এখানে এসে তো স্বামীজির ব্যবস্থাই অভ্যাস করার চেষ্টা করছে।

স্নান করে এসে বিমলকে ডেকে বললো—।

—"চট্‌ করে দু'বালতি জল তুলে দাও তো। আমি তোমার চা করে আনি।" বিমল কিছু বলল না। নির্বিবাদে ইঁদারার দিকে চলে গেল। চা না পাওয়ার জন্য ওর কোন অস্বস্তি হচ্ছে কিনা সেটাও বুঝতে দিল না। ও যখন বালতি করে জল তুলে পাত্র দুটো প্রায় ভরে এনেছে তখন স্বামীজি পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন—বিমলকে জল তুলতে দেখে বললেন,—

—"কি ব্যাপার ; জল তো তোলা আছে।"

বিমল জবাব দিল

ইঁদারা আর বালতি দেখে জল তুলতে ইচ্ছে হল, মামার বাড়ীতে দাঁতন মুখে দিয়ে মামাতো ভাইর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জল তুলতাম। আপনার এখানে এসে মামার বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। 'সোঁদা সোঁদা নিম ফুলের গন্ধ। মাটি দিয়ে নিকোন ইঁদারার পাড় বেশ লাগছে।"

গীতার কানে সব কথাগুলোই গেল।

সে যেন মরমে মরে গেল।

দুকাপ চা করে স্বামীজির সামনে নিয়ে এসে বিমলকে ডাকলো। স্বামীজির ঘরে নারকোল নাড়ু ছিল বিমলকে এনে দিলেন। স্বামীজি জিগ্যেস করলেন,

—"তুমি চা খাবে না মা?"

—"হ্যাঁ খাবো।"

"নিয়ে এস। এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাক। তুমি তো দেখছি রান্নাঘরের ভার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছ। ও বেটি তো আর রান্না ক'রে দেয় না। ছেলেকে দিয়ে রাঁধাবে। আমার ও মা হল সৎমা। এবারে আমার নিজের মা এল বুঝলেন বিমলবাবু! আর হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না।"

বিমল জিগ্যেস করল,—

—"ট্রেন কটায়?"

স্বামীজি রিক্সাওয়ালাকে আসতে বলেছিলেন। বেলা এগারটা তেইশ মিনিটে ট্রেন আছে একটা। গীতা আর দাঁড়াল না। বিমলের রান্নার যোগাড় করতে চলে গেল। আনাজ পাতি ডালায় ছিল, স্বামীজির কাছ থেকে চালের খোঁজটা নিয়ে ভাত বসিয়ে দিল তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে কুটনো কুটতে সুরু করল। হঠাৎই ওর মনে হল আজও বিমলের জন্যে রান্না করছে। কতদিন নিজের হাতে রান্না করেনি। বিমলের খাওয়ার খুব বাচ বিচার। বরাবরই সব ব্যাপারে বিমল বড় ছিমছাম। খাদ্য বস্তুর চেয়ে খাদ্যবস্তুর পরিবেশনের ওপরেই বেশী নির্ভর করে ওর খাওয়ার রুচি। বাংলা দেশের রাগালো রোগালো রান্না ও পছন্দ করে না। সব কিছুর মধ্যে বিদেশীয় ছিমছাম ভাবের ও পক্ষপাতী। গীতা পড়লো মহা বিপদে। স্বামীজি কি খান তা ও জানে না আবার বিমলের পছন্দমত রান্না করে যদি ও স্বামীজিকে খুশী করতে না পারে। অনেক

ভেবে ও মাঝামাঝি পন্থাটাই নিল। ও যে আজ বিমলের জন্যে রান্না করছে এই কথাটাই বেশী করে মনে হতে লাগল আর সেই সংগে অনিমেষের কথা মনে পড়ে সমস্ত পরিস্থিতিটাই ওকে মাঝে মাঝে অস্বস্তি আর মাঝে মাঝে ভাললাগার ঘূর্ণীপাকে অন্ধের মত ঘোরাতে লাগল কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে বিমলের কথাই ওর মনের মধ্যে একমাত্র ভাবনা হয়ে রইলো।

ধোয়ায় চোখ দুটো জলছে অপটু হাতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে যাতে হেবে না যায়।

বিমলের জন্যে যে কোনদিনও ওকে রান্না করতে হবে তা ভাবতেই পারে নি। একদিন ছিল যেদিন ওর মনের মত রান্না করে, ওর রুচি মত পরিবেশন করে ওকে খুসী করতে পাবার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ ছিল। বিমলের সঙ্গে শেষ কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই সে সব চিন্তা ও মন থেকে মুছে ফেলেছিল আজ নিতান্ত অকারণেই সেই কথাগুলো মনের মধ্যে উদয় হযে ওকে বিপর্যস্ত করে তুললো। ভাগ্যস কাঠের জ্বাল ছিল তাই চোখের জলের কৈফিয়ৎ থেকে বাঁচা গেল।

রান্না শেষ করে বিমলের ভাত বেড়ে বিমলকে খেতে ডাকল। বিমল দ্বিরুক্তি না করে খেতে বসল। স্বামীজিও বসলেন কারণ স্বামীজি যাবেন বিমলকে পৌছে দিতে। রিক্সায় প্রায় এক ঘন্টার পথ। ফিরতে দেরী হবে কারণ কিছু দরকারী জিনিষপত্র কিনে আনতে হবে। আজ হাটবার। দুজনে প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে উঠলেন। স্বামীজি যখন ব্যস্ত থাকেন তখন বড় একটা কথা বলেন না। এটা সে কাল থেকেই লক্ষ্য করছে।

বিমল যাবার সময় ওকে বলে গেল,

—"আমি আবার শিগ্‌গিরই আসব। ভাল করে সব কিছু ভেবে দেখ।"

ওদের রিক্সা চলে গেল।

চোখের দুকূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ল গীতার

কি আশ্চর্য্য। কেন এ কান্না?" বাড়ী থেকে, আসার সময় তো এমন হয়নি। এমন ভাবে চোখের জল তো তাকে ব্যতিব্যস্ত করেনি। আজ সকাল থেকে নতুন পরিবেশে নতুন কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে সময়টা হু হু করে কেটে গেল কিন্তু এখন ওর আশ্রমের সমস্ত কিছুতে উপেক্ষা

ক্ষার উদাসী বাতাসে ওর মনও বৈরাগী হয়ে উঠ্‌লো। চোখের জল আপনিই শুকিয়ে গেল।

দুপুর এগিয়ে আসছে।

নিমফুলের গন্ধে কাঠঠোকরা আর শালিখের ডাকে বাউল বাতাসের চির উদাস একতারাটায় ভোলা মনের সুর বেজে উঠ্‌ছে; সেই সুরে গৃহস্থ বধূর মনও উচাটন। পাঁচুর মা আজ এসে পৌঁছয়নি, কাজেই অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

বিমল চলে গেছে তার এঁটো থালাটা পড়ে রয়েছে। স্বামীজি কিছুতেই শুনলেন না, নিজের থালা বাসন নিজেই মেজে রেখে গেছেন। বল্লেন.

"না, মা, অভ্যাসটা নষ্ট করে আমায় খোঁড়া করে দিওনা।" খাওয়া সেরে নিয়ে বাসনগুলো মেজে ফেলে রান্নাঘরের কাজ সেরে নিজের ঘরে গেল গীতা।

(ক্রমশঃ)

অনেক রাত এবং একটি সকাল

সুনীত রায়

এখন এই মুহূর্তে আমি একটু একলা থাকতে চাই। ইচ্ছে করছে সবাইকে বলি—"দয়া করে তোমাদের কান্না একটু বন্ধ কর। সুন্দর সুন্দর দুঃখের কথা গুলো আমার সামনে তোমরা আর বোলো না। আমার ভাল লাগছে না।" জানি বলতে পারব না। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করছে। সবাই আমাকে ঘিরে বসে রয়েছে। ছোট ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার একমাত্র মেয়ে আমারই খুব কাছে শুয়ে রয়েছে। ওর শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠ্ছে। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। একটা অদ্ভুত গন্ধে আমি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। গন্ধটা কীসের? বুঝতে পেরেছি। ওষুধের গন্ধের সঙ্গে আমার পরনের নতুন থান কাপড়ের গন্ধে একটা অদ্ভুত গন্ধের সৃষ্টি হচ্ছে। আমার পরনের আধ ময়লা শাড়ীটা ছাড়িয়ে সিঁদুরটা মুছিয়ে যখন এই থান ধুতিটা ওরা আমায় পরিয়ে দিল তখন মনে হোল আমার গলায় কী যেন একটা আটকে রয়েছে। যেন এখুনি ঠেলে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই হোল না। ওরা আমাকে এই ঘরের মধ্যে এই এখানে বসিয়ে দিল। কী আশ্চার্য্য তারা সব গেল কোথায়? যারা এতক্ষণ বিচিত্র স্বরে আর বিচিত্র সুরে কাঁদছিল আর সুন্দর সুন্দর সব দুঃখের কথা বলছিল। সেই সব বয়স্কা আত্মীয়ার দল? হাসি পেল। সদ্য বিধবার মুখ দর্শন করতে নেই। করলে নাকি স্বামী বেশীদিন বাঁচেনা। এটাই নিয়ম। হাসতে পারলাম না। বারো বছরের ছোট ছেলেটার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। কেমন বোকা বোকা দৃষ্টি মেলে ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে কাছে ডাকলাম। ও আমার পাশে চুপ ক'রে বসল আর অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ল। বোধ হয় আবার ঘুমিয়েই পড়ল। সেই অদ্ভুত গন্ধটা কিন্তু এখনও রয়েছে। ওষুধের শিশি গুলো বোধ হয় ভাল করে বন্ধ

করা হয় নি। বন্ধ করার আর প্রয়োজনও নেই। চার পাঁচদিনের মধ্যে এত ওষুধ একজনের প্রয়োজনে লাগতে পারে আমার ধারণা ছিল না। ওষুধের শিশির পাশে ওটা কী? দলা পাকান একটা কাগজ? মনে পড়েছে। আধখানা সন্দেশ আছে ওর মধ্যে। কাল রাত তুটোর সময় আধখানা সন্দেশ ও খেয়েছিল, বলতে গেলে প্রায় কিছুই ও খায়নি এই চার পাঁচ দিনের মধ্যে। কী আশ্চর্য্য কালরাতে যে মানুষটা অত কথা বলল, সন্দেশ খেল সেই মানুষটা কী না……আবার সেই গন্ধটা আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মনে হচ্ছে একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হোত। ঘুম হবে না জানি…কিন্তু কেমন জানি একটা ঘুম ঘুম ভাব। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে আমার ইচ্ছে করছে না। নিজেকে কেমন জানি নেশাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে।… ঘরের মানুষগুলো কেমন সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে… আলনার ঐ লালপাড় শান্তিনিকেতনী শাড়ীটা যেন মিটিমিটি হাসছে। আচ্ছা, স্বামী মারা গেলে শুধু লাল পাড় শান্তিনিকেতনী শাড়ীই নয় আরো যে সব জিনিস মেয়েরা ব্যবহার করে তার মধ্যে লাল রং পরিত্যাজ্য কেন? সিঁদুরের রং লাল, তাই? তা হলে ত' রক্তের রঙ ও লাল? সেটার কী হবে?… আবার সেই গন্ধটা… আজ কী বার?… কত তারিখ?… কত বছর হোল? —প্রায় তিরিশ বছর। তিরিশ বছর? কিন্তু……মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক দিন। কে যেন হাসছে…কে? লাল পাড় শান্তিনিকেতনী শাড়ীটা কী? কে হাসছ তুমি?— তুমি কে? ওঃ বৌদি…"বৌদি আমি কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু আমি নই।— তোমার স্বামীকে শেষ দিন পর্য্যন্ত বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করেছি। তোমার তুই ছেলেকে তুমি দেখ—ওরা কত বড় হয়েছে। ওদের বিয়ে দিয়েছি। যদিও জানি ওরা কোনো দিন আমাকে মা বলে মেনে নেয়নি। আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি। বৌদি, আর যাই করো আমাকে অভিশাপ তুমি দিতে পার না। তুমি মারা যাওয়ার পর তোমার জায়গা আমাকে পুরণ করতে হবে, বিশ্বাস করো, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু সেই বয়সে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম দীপুদা তোমায় ভালবাসে না…।" দীপুদা? কত বছর? মনে পড়ছে

মা ...কাল রাত ছুটোর সময় আধখানা সন্দেশ—দীপুদা— আমার স্বামী......আমার, না কি বৌদির ?—

ভীষণ অন্ধকার—শান্তিনিকেতনী শাড়ীর লাল পাড়—সিঁদুরের রং—রক্তের রং— আলতার রং— সব কিছু লাল...নতুন থান ধুতি— ওষুধের গন্ধ— সন্দেশ...ডাক্তার— অক্সিজেন— কান্না— বল হরি হরিবোল—।

বৈশাখে প্রতি প্রভাতে অভুক্ত রহিয়া,
পূজেছ মহেশে তুমি বিল্ব অর্ঘ দিয়া।
এই সে সুদিন মাগো মধুর মিলন।
মহেশে তুষিতে করে করহ বরণ।
জীবনের সাথী সনে নতুন জীবন তরে।
যেতে তোরে হবে আজ তোরই মা আপন ঘরে।—

একটা মিষ্টি গন্ধে ,ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্ন দেখছিলুম। আমার বিয়েতে আমার মা এই পদ্যটা ছাপিয়েছিল। চোখ মেলে দেখলাম একটা বলিষ্ঠ হাত আমাকে জড়িয়ে রয়েছে। ঢং ঢং ক'রে কোথায় চারটের ঘন্টা পড়ল। বাবা ঘুম থেকে এবার উঠেছে। কত দিন বাবাকে বলেছি—"এত ভোরে তোমাকে চাকরী করতে যেতে হবে না।" বাবা মিষ্টি ক'রে হেসে বলত—"তোকে একদিন আমার manager-এর কাছে নিয়ে যাব। তোর কথা শুনে manager নিশ্চয় রাজি হবে। "মা বলত— অতই যদি তোমার ঘুম না উঠলেই পার, কাজের বেলায় ত' অষ্ট রম্ভা। শুধু বাপের পেছনে ঘুর ঘুর।" কোনো একটা factory-র সাইরেন বেজে উঠল। জানালা দিয়ে সকালের আলো এসে পড়ছে। আস্তে আস্তে হাতখানা সরিয়ে উঠে বসলাম। দীপুদা ঘুমুচ্ছে। খুব নির্লিপ্ত। খুব নিশ্চিন্ত। ধীরে ধীরে খাট থেকে নামলাম। আমার ফুলশয্যার রাত শেষ হোল। ঘরের কোণে ফুলদানীতে একগুচ্ছ রজনী গন্ধা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রজনীগন্ধার শরীরে খুব আলতো ক'রে হাত রাখলাম। দু-একটা ফুল ঝড়ে পড়ল। বিছানার দিকে তাকালাম। দীপুদা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দীপুদা ? ও নামে আমার আর ডাকা চলবে না। উনি আমার স্বামী। আমার স্বামী ? নাকী বৌদির? আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এলাম। কে যেন আমার

কানে কানে সেদিন বলছিল, "দেখিস যেন মুখ ফস্কে দীপুদা বলে ডেকে ফেলিসনি।"

আচ্ছা, আসার সময় আমি কী কেঁদেছিলাম? মা কিন্তু খুব কেঁদে ছিল। আমার কিন্তু খুব কান্না পেয়েছিল। চলে আসার জন্য নয়। বাবা ঐ সময় অনুপস্থিত ছিল তাই। আমার ভীষণ অভিমান হয়েছিল। বাবা কেন উপস্থিত রইল না? বার বার বাবাকে খুঁজেছিলাম। কিন্তু পাইনি। আমি কিন্তু জানি বাবা ইচ্ছে করেই ঘরে বসেছিল? বাবা নিশ্চয় কাঁদছিল। বাবার প্রচণ্ড অভিমাণ হয়েছিল। ভীষণ দুঃখ পেয়েছিল। এই বিয়েতে বাবার বিন্দুমাত্র মত ছিলনা। কিন্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। পরিবেশ আর পরিস্থিতির জন্য মায়ের সিদ্ধান্তই বাবা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু কি একা মায়েরই সিদ্ধান্ত? আমার সিদ্ধান্ত? সেটার কী হবে? সেটা কী কিছুই নয়? কোনো মূল্যই কী তার নেই?

—আমার সিদ্ধান্ত? আমি কী বলব?

—তোমাকে আমি ভালবাসি।

—কিন্তু আমি আপনাকে দাদা বলে ডাকি, সম্মান কবি। ভক্তি করি।

—আমি অসহায়। তোমার বৌদির অবর্তমানে ছেলে দুটোর কি গতি হবে? ওরা তোমাকে ভীষণ ভালবাসে।

—কিন্তু তবুও, এটা অসম্ভব।

—please, আমার অবস্থা চিন্তা কর।

—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই কোঁটায় আপনাকে কোঁটা দিয়ে আমি জল খাই।

—আমি কিন্তু সে সম্পর্কে কখনো বিশ্বাস করিনি।

—সে কী? কত দিন?

—বহুকাল। বোধ হয় জন্ম জন্মান্তর

—কিন্তু বৌদি—আপনার ছেলেরা ···।

—মা বাবার ইচ্ছা। মনের সাড়া বিন্দুমাত্র ছিল না।

—আপনি অন্যায় করেছেন।

—আমি ভুল করেছি।

—কিন্তু আমার পক্ষে এ অসম্ভব।

—please

—"না না, এ আমি পারব না। ছোট বেলা থেকে আপনাকে আমি দেখছি। আপনি এ বাড়ীর একজন অতি আপন জন। বাবা-মা আপনাকে ছেলের মত ভালবাসেন। আপনি এ বাড়ীর অনেক উপকার করেছেন। আপনি বয়সে আর সম্মানে অনেক বড়। আপনি খুব ভাল। আপনি আমার দাদা। বৌদিকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। আপনার ছেলেদের আমি খুব ভালবাসি। বৌদি মারা যাওয়ায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি খুব কেঁদেছি। আপনার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়েছে। হচ্ছে। কিন্তু দোহাই। এ আমি পারব না। কিছুতেই না।"

দীপুদা মাথা নিচু ক'রে সেদিন চলে গিয়েছিলেন। এই চলে যাওয়াটা দেখে সেদিন কিন্তু আমার খুব কষ্টও হয়েছিল। বাড়ীটা হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে গেল। বাবা আর মা খুব চাপা গলায় কী সব আলোচনা করে, কিন্তু বুঝতে পারি বাবা খুব উত্তেজিত। দীপুদা যথা নিয়মে এ বাড়ীতে আসেন। বেশীক্ষণ থাকেন না। আমার সঙ্গে মামুলী দু-একটা কথা হয়। আমাকে এড়িয়ে চলেন। ওঁর দুই ছেলে অধিকাংশ সময় হয় আমার কাছে না হয় মার কাছে রয়েছে। দিন কাটছে, রাত হচ্ছে। রাতও কাটছে কিন্তু কেমন যেন ছন্দহীন। গতিহীন। ঘুম আমার চলে গেছে। কেন জানি না নিজেকে অনেক বয়স্কা বলে মনে হচ্ছে। এই দিন কয়েকের মধ্যে যেন হঠাৎ বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেললাম। দীপুদা অসহায়—ছেলে দুটো মাতৃহারা—দীপুদা আমায় ভালবাসেন—কিন্তু কী আমি করতে পারি?—আমার এই ১৬ বছরের জীবন দিয়ে কতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব?—আমার স্বপ্ন—অনেক কল্পনা—বাবার আশা আকাঙ্খা কল্পনা অনেক দূরে হবে আমার শ্বশুর বাড়ী- খুব সুন্দর বর—আমি বাবাকে চিঠি লিখব—বাবা আমাকে—আমার খুব মন কেমন করবে—প্রতি রবিবার বাবাকে আসতে বলব—মাকে আসতে বলব—আমার বর খুব ভাল হবে—আমার বাবা মাকে খুব ভাল বাসবে— খুসী হবে—সারাদিন থেকে ওঁরা সন্ধ্যের দিকে চলে যাবে—আমার খুব কষ্ট হবে তখন—ওদের যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন আমার চোখে জল আসবে ঠিক সেই সময়

আমার সেই সুন্দর বর খুব আস্তে আমার পিঠে হাত রাখবে ঠিক তখনই কান্না চাপতে না পেরে আমার ১৬ বছরের জীবনটা তার বুকেতে খুসীতে ছটফট ক'রে উঠবে।—

ভীষণ চমকে উঠলাম। দীপুদার একটা হাত আমার কাঁধে। সকালের আলো ওঁর মুখে এসে পড়েছে। উনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

—কি চিন্তা করছ?

—কিছু না।

—আমি জানি এ বিয়েতে তুমি খুসী হওনি। কাল রাতে যখন ছেলে দুটোকে আমাদের কাছেই শোয়ার ব্যবস্থা করছিলে তখনই বুঝতে পেরেছি।

উনি বাইরে চলে গেলেন। ছেলে দুটোর ওপর ভীষণ মায়া হোল। ওরা জেগেছে। আমাকে অবাক হয়ে দেখছে। জন্ম থেকেই ওরা আমাকে দেখছে। আচ্ছা, ওরা ত' আমাকেও মা বলে ডাকবে। মা? আমি মা? গত রাতে আমার ফুলশয্যা আজ সকালে আমি মা? হঠাৎ ভীষণ হাসি পেল। হাসতে পারলাম না। কেন জানি না ভয় করতে লাগল। মারা যাওয়ার সময়ের বৌদির সেই বিকৃত মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। "বৌদি, আমি কোনো অন্যায় করিনি—বিশ্বাস করো এ আমি জীবনে চাইনি"—"মা, এ তুমি কী বলছ? এটা কী করে সম্ভব?"

—আমি অনেক ভেবেছি। চিন্তা করে দেখ। যে মানুষটা আমাদের জন্য এত করল তার জন্য কী আমাদের কিছুই করার নেই? অন্তত এই দুঃসময়ে? দুটো অবোধ শিশু, বড়টারই মোটে চারবছর বয়স, একেবারে অনাথ হয়ে যাবে—

—কিন্তু মা—

—আমি জানি তোর আশা আকাঙ্খা। তোর বাবা আমাকে ভুল বুঝবে। কিন্তু একটা অসহায় মানুষ বিশেষ করে দুটো অবোধ শিশুর কথা ভেবে—তোকে আমি জোর করব না—কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে আমার কিন্তু, আমাদের কিছু করার আছে—দীপুর প্রস্তাবে আমিও অবাক

হয়েছিলাম—কিন্তু আমি ভেবেছি—ও আমাদের অনেক করেছে—সময় হয়েছে আমাদেরও কিছু করার আছে—কর্ত্তব্য —মনুষ্যত্ব—।

আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি কী করি? বাবা গম্ভীর। কথা এক রকম বন্ধ বাবার সঙ্গে। বাবা কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। আমিও বাবাকে যেন এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছি। কর্ত্তব্য—মনুষ্যত্ব—।

—জানি আমাদের কিছু করার আছে। কিন্তু সেটা মেয়ের জীবনের বিনিময়ে নয়?

—মেয়ে কী শুধু একলা তোমার? আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না। মেয়ে বড় হয়েছে। সংসারের এইত অবস্থা। আমাদের বিপদে দীপু অনেক করেছে। অন্তত ঐ বাচ্চা সূর্য্যোর মুখের দিকে তাকিয়ে।

—সব জানি। আমাদের ঐ একমাত্র মেয়ে—ওর সমস্ত জীবন—আমি গরীব হতে পারি—কিন্তু এ আমি পারব না। এটা নিষ্ঠুরতা, এটা অবিচার। "বাবাকে এত কঠিন সুরে কথা বলতে, কখনও দেখিনি। আমার বাবা—আমার গরীব বাবা। ভোর পাঁচটায় বাড়ী থেকে বেরোয়। রাতে বাড়ী ফেরে। মুখে কোন বিরক্তি নেই। দুনিয়ার কারো ওপর কোন রাগ নেই। কোনো অভিযোগ নেই। পরিশ্রম। শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম।

সমস্ত পরিবেশটা, সমস্ত পরিস্থিতিটা কেমন জটিল হয়ে গেল। আমাদের কিছু করার আছে। এ সংসারে উনি অনেক করেছেন—আমরা কৃতজ্ঞ—তার স্ত্রী মৃত—তিনি বিব্রত। অসহায় সন্তান—উনি আমায় ভালবাসেন—ওঁর সন্তানরা আমায় ভালবাসে ওদের আমি ভালবাসি—একটা সংসার বাঁচবে—অসহায় একটা মানুষ—কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা মনুষ্যত্ব—। "মা, শোন, তুমি কথা দিতে পার।" অনেকদিন পরে মার বুকে মুখ রাখলাম। মার চোখে এত জল? "তোর ভাল হবে। কল্যাণ হবে। একটা মহৎ কাজ করলি। মানুষের কাজ করলি।"

মহৎ কাজ শুরু হোল। মানুষের কাজ শুরু হোল। অনেক দূরের সেই সুন্দর রঙের বাড়ী থেকে বাবাকে চিঠি লেখা আর হোল না।

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই নতুন পরিস্থিতিকে আমি মেনে নিলাম। অনেক দিন পরে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কেন জানিনা হঠাৎ বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। বাবা কোনো কথা বলল না। চলে আসার

সময় দেখলাম খোলা জানালা বাইরের আকাশের দিকে বাবা তাকিয়ে রয়েছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষটা অসহায়ের মত বসেই রইল। চলে এলাম আমি।

সব কিছু মেনে নিলাম। দীপুদার মুখে আবার হাসি ফুটল। আমার ১৬ বছরের জীবনটাকে ভালবাসায় আর কল্পনায় রঙীন ক'রে তুলতে উনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ছেলে দুটোর মধ্যে আমি একাত্ম হয়ে গেলাম। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ছেলেরা আমাকে 'মা' বলে ডাকতে শিখল। আত্মীয় স্বজনদের কাছে আমি একটা আদর্শ মানুষ হয়ে উঠলাম। সময় কাটতে লাগল যথানিয়মে। কিন্তু, মাঝে মাঝে, কেন জানিনা অদ্ভুত একটা শূন্যতা, দুর্বোধ্য একটা যন্ত্রণা—যেটা, না পারি প্রকাশ করতে, না পারি উপলব্ধি করতে—একা একা বয়ে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু ওটা সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। পরিস্থিতি আর পরিবেশ আমাকে আবার আপন জগতে ফিরিয়ে আনত। এই ভাবেই চলল। চলতে লাগল।

প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেল। স্বাভাবিক মধ্য বিত্তের জীবন। আজ আমি প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়। বাবা-মা বহুকাল গত হয়েছিল। আমি নিজেও পাঁচটী সন্তানের জন্ম দিয়েছি। যদিও দুটী জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেছে। কিন্তু 'মা' বলে আমাকে পাঁচজনেই ডাকে। যথারীতি আত্মীয় স্বজনের কৃপায় দুজনের কাছে আমি তথাকথিত সৎমা বলেই প্রমাণিত। কিন্তু ওরা প্রতিষ্ঠিত। ওরা বিবাহিত। আমার কর্ত্তব্য আর মনুষ্যত্বের প্রশংসায় এখনও কিন্তু অনেকেই মুখর। জানিনা এই প্রশংসা আর কতদিন চলবে। বুঝতে পারি খুব বেশী দিন আর নয়। এই ভাল। এটাই স্বাভাবিক বোধ হয়। এর বেশী কিছু চিন্তা করতে পারিনা। ইচ্ছাও করে না। শুধু স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এখনও, এই বয়সে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, রাত নিঝুম হয়…মাঝে মাঝে একটা শূন্যতা, দুর্বোধ্য একটা যন্ত্রণা, সেটা না পারি প্রকাশ করতে, না পারি উপলব্ধি করতে, আমাকে কেন জানিনা আচ্ছন্ন করে আর ঠিক সেই সময় আমার বাবার মুখটা ভেসে ওঠে—দুহাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেটে আসতে আসতে দরজায় আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে…মাটিতে ব্যাগ দুটো নামিয়ে, দুটো হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার বাবা, আর আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দমে ছুটে এসে বাবার দুটো হাতে বন্দী হয়ে গেছি আর শুনতে পাচ্ছি বাবা বলছে—"তোর চিঠি আমি………

চিঠি...চিঠি...চিঠি......শোন চিঠিখানা পড়ছি, "মহাশয়, গত ২৯শে ডিসেম্বর আমাদের—পরমারাধ্য পিতৃদেব......" কীসের চিঠি? কার চিঠি? "অতএব মহাশয় আগামী......" কারা এরা? কী পড়ছে এরা? "শুভা-গমণ করতঃ পিতৃদায় হইতে......"

উঠে পড়লাম। বারান্দায় এলাম। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাথরুমে গেলাম। চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না আটকে রাখতে। চোখের জলে আমার সমস্ত মুখটা স্নান করতে লাগল। কিন্তু কেন? কীসের জন্য? আমি নিজেই এর জবাব খুঁজে পেলাম না।

ঈশ্বর-নারী-নিসর্গ প্রভৃতি

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমি তো প্লাবিত হয়ে যেতে চাই—ঈশ্বরের অপরূপ সুনীল জ্যোৎস্নায়,
রমণীর অন্ধকারে—এক সঙ্গে ডুব দিতে চাই!
আজকে দাঁড়িয়ে এই পশ্চিমের শান্ত বারান্দায়
মনে হয় দুই ই সত্য—এই আলো অন্ধকার একই ঈশ্বরের
দুই রূপ: নারী নদী— প্রবৃত্তি ও আশা বাসনায় এ প্রভাই
এই স্বাদু অন্ধকার—ঈশ্বর আলোর দিকে সমর্পিত,
সম্মিলিত দ্রুত নাটকের
অন্তহীন প্রস্তাবনা: নিরুদ্ধ সঙ্গোপনে—পৃথিবীতে স্বপ্ন রচনার
দায়িত্ব নিয়েছে, দৃপ্ত বড় জীবনের
অঙ্গীকারে অপরূপ হয়ে উঠছে—পূর্ণের প্রাঙ্গনে।

অন্যদিকে নিবৃত্তির নীল মেঘ তাও কত বিচিত্র বর্ষার
পরিনতি নিয়ে আসে: প্রবৃত্তি নদীর দুই তীরে তীরে
নিবৃত্তির অলৌকিক বনে,
প্রান্তরে ও লোকালয়ে—পল্লীর প্রসঙ্গ অঙ্গনে—
হিরন্ময় মাঠে মাঠে আমার হৃদয় আহা আনন্দ বাউল
হয়ে উঠতে চায়। —সমস্ত প্রত্যহ কাজের
অতীব প্রশ্নগুলি আমার উচ্ছল ডালে ঝরায় মুকুল
বার বার, ফুটে ওঠা পুষ্পগুলি স্তব্ধ হয়ে থাকে
বেদনায়। নদী তো সমুদ্রে যায়—তবু ছাখো
অপরূপ নদীর পারের
নম্র স্নিগ্ধ গ্রামগুলি—নিরিবিলি মধ্যাহ্ন দিনের
শান্তনায় কী রকম—বিবিক্ত চিত্রিত হয়ে থাকে।

নগরে বন্দরে শস্য স্বর্ণ আর অর্থ কীর্তি আমাকে যে ডাকে—
শিশুর সোনালী মুখ, রমণীর দেহ-নীলোৎপল
আমাকে জাগায় কর্মে, কর্মের বিচিত্র প্রজ্ঞায়
সমাহিত করে রাখে পরিণত সূর্যের বন্ধনে।
আমার সর্বাঙ্গে তাই মাটি আর আকাশের জল
দুইয়েরই সঞ্চিত সত্য—আমাকে চেনায়
বহুধা এ জীবনের নব নব রূপকল্প—
স্বপ্ন আর সূর্যের দর্পণে।
সূর্যের অতীত স্নেহে তবু থাকে অন্য এক অব্যক্ত হৃদয়।
ঈশ্বর নারীর দিকে বহতা নদীর কলস্বনে
চিরকাল আমার যে সমান বিস্ময়॥

রাজার মতন

মনোজিত ঘোষ

রাজা যেমন সিংহাসনে বসেন যেমন তর্জনীতে
দেখেন যেমন সুখের চিহ্ন রাজা যেমন
ঘুমের মধ্যে হাসেন জলে স্ফটিক মালা...
আমি কি আর তেমনি আছি?
নির্জনতার এমন স্বরাট কোন্ ফিকিরে
সুখ পেতে চাই?
রাজার মতন রাজার মতন
উঠতে বসতে রাজার মতন
এতই সহজ?
রাজা যেমন একলা কাঁদেন বিরলে তাঁর তর্জনীতে
দেখেন কেমন দুখের চিহ্ন রাজা যেমন
ঘুমের মধ্যে চিবুক ঢাকেন শূন্য হাতে...
সাত মহলের পায়রা ওড়ে
পায়রা-ওড়া কই সে আকাশ?
রাজার মতন রাজার মতন
উঠতে বসতে রাজার মতন
এতই সহজ?

সেই রূপসী বাংলা

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

নেই সেই রূপসী বাংলা আর
দানবের তাণ্ডবে হিংস্র বর্বরতায় আজ সে মৃত ॥

হয়তো এখনও বয়ে চলেছে
মেঘনা পদ্মা কর্ণফুলী কপোতাক্ষের উজান জলে
মুক্তি যোদ্ধাদের গুলীবিদ্ধ লাসগুলি ॥

হয়তো আজও ভিজে রয়েছে
নববতী-বাতাবীর সবুজ ছায়ে, সোনালী ধানের শীষে
আম জাম কাঁঠালের নীচের ঘাসে
সুফিয়া রোসনাদের চাপা চাপা তাজা রক্ত ॥

শুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যা রাতে কলেজ লনে
জমে উঠতো ইনটেলেকচুয়েল আড্ডা
জীবনানন্দের কবিতা আর রবীন্দ্রনাথের
গানে ভরে উঠতো আসর
আজ সেখানে বিরাজ করছে
এক বিরাট বিস্ময়কর নিস্তব্ধতা
সর্বত্র পাক-পাশবিকতার রক্তাক্ত স্বাক্ষর ॥

ব্যর্থস্বপ্ন

হেনা চৌধুরী

আমাদের আধুনিকাদের জীবনে সমস্যা অনেক—কিন্তু এমন কতকগুলো সমস্যা আছে যার সমাধান আমাদের নিজেদেরই হাতে।—বিয়ের পরের যে শ্বশুর বাড়ীর জীবন তা নিয়ে অধিকাংস আধুনিকারা আজ বিব্রত এবং অসুখী—এই অসুখী হওয়ার বীজ আমাদের মনের মধ্যে। প্রথমেই বলছি এ প্রবন্ধে কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়—কারণ আমার তো মনে হয় নিজেদের দোষগুণ নিজেরা বিচার করলে তারমধ্যে সহানুভূতি ও নিরপেক্ষতা উভয়েই বর্তমান থাকে।

বিয়ের পরে মেয়েদের যে শুধু গোত্রান্তর হয় তাই নয় জন্মান্তরও হয়—অবশ্যই বলছিনা যে এই জন্মান্তরের জন্য রাতারাতি নিজের স্বভাবকে পরিবর্তন করতে হবে। কারণ আজ কালকার যুগে আর ছোট ছোট মেয়েদের বিয়ে হয়না যে একতাল কাঁদার মত তাকে ভেবে নিজের ইচ্ছেমত গড়ে নেওয়া যাবে। বিয়ের আগেই একজন মেয়ে পূর্ণ বিকশিত মানুষরূপে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আধুনিকারা সংসার জীবনে প্রবেশ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছুদিন বাদে বাসীফুলের মত ম্লান হয়ে যাই।

তাই সব সময়েই অধিকাংশ মানুষের কাছে শুনি যে আধুনিকারা adjustment করতে পারেনা—এইজন্য ছেলের বিয়ে দিতে বাবা মা শঙ্কিত—ছেলে নিজেও বুঝি বা কিছুটা চিন্তিত।

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভেঙ্গে গেছে—সত্যি কথা—তবে বাবা মা ভাইবোন নিয়ে সংসার এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরাজমান আর সমস্যাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেইখানে। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আমাদের অধিকাংশের কাছে ভাল নয়—আর আপনও নয়। অনেক সময় তাই দেখি অতিসামান্য পরিচিতের কাছেও আমরা নির্বিচারে তাদের নিন্দে করে থাকি। যখন করি এ কাজটা তখন বন্ধুবান্ধবদের সহানুভূতি নিশ্চয় পাওয়া যায় কিন্তু সে যদি

একটু বুদ্ধিমান হয় তবে নিশ্চয় বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবেননা। পৃথিবীতে যত প্রকার খারাপ গুণ আছে তারমধ্যে পরনিন্দা অন্যতম আর শ্বশুরবাড়ীর নিন্দের চেয়ে মুখরোচক—আর কিছু নেই।

এখানে আমাদের মায়েদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মেয়েকে যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন ঠিকই কিন্তু তার মনের জমিটা এমন ভাবে প্রস্তুত করে দেবেন তাতে যে গাছই লাগানো হোক না কেন তা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আধুনিক মায়েরা যুগের সঙ্গে তাল রেখে স্বার্থপরতার বীজটিও তাদের মনে ঢুকিয়ে দেন। শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে বলে দেন, "নিজেরটা বুঝে চলবি, ওদের জন্ম এত করবিনা।" মায়ের সেই বাণীটির অভয়মন্ত্র নিয়ে সে সংসার জীবনে প্রবেশ করে—দিন যায় ক্রমশঃ সে নিজের হিসেব বুঝে নিতে চেষ্টা করে—আর এরই ফলে সুখ তার জীবনে হয়ে ওঠে মরিচীকা। নিজের স্বার্থ নিয়ে একটা দুর্গ রচনা করে সে তারমধ্যে নিজেকে বন্দী করে ফেলে।

অবশ্য অস্বীকার করবনা এসব ক্ষেত্রে শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের অসহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয়—বউ পরের মেয়ে তাকে আমরা আপন করে নিতে পারিনা একথা অতীত যুগের মত আমাদের দিনেও সমান সত্য। কিন্তু অতীত যুগের মেয়েরা সে যুগে বাস করেও শ্বশুরবাড়ীকে করেছিল নিজের বাড়ী, তারা নিঃশেষে নিজের জীবন দিয়ে গেছে তাই তারা আর কিছু না হোক আমাদের থেকে সুখ্যাতি অর্জন করেছে শান্তিও পেয়েছে। যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাবতীয় অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এসব ঘটনার নজীরও বহু আছে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে বিবাহিত জীবনের মূল কথা সুখী করা—নারী ভগবানের উদ্যানের সুন্দর ফুল—সেই ফুল তার প্রীতি প্রেম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সংসার উদ্যানকে রমণীয় করে তুলতে পারে—কিন্তু আমরা আধুনিকারা চাইছি নিজেরা রমণীয় করে তুলতে। জীবনের সব ক্ষেত্রে দুহাত ভরে পেতে—তাই ভুলে গেছি নিতে। পৃথিবীর সমস্ত আদান প্রদানের চেয়ে বড় হ'ল হৃদয়ের আদান প্রদান। শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের কাছে আমরা আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি, রূপগুণ নিয়ে বিকসিত হয়ে উঠতে চাই—চাই না হৃদয়ের প্রীতি তাই কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে দেখি—জীবনে যা চেয়েছিলাম তা পেলাম কই?

এভাবে পাঁচজনকে নিয়ে থাকার কোন মানে হয় না। যাদের স্বামীরা স্ত্রীর কথায় ওঠেন বসেন সেখানে বুদ্ধিমতী নারীরা আলাদা ফ্লাট নিয়ে আলাদা সংসার গড়ে তুলে বাঁচে আর যারা তা পারে না তারাই অকারণ অবসাদ নিয়ে ভরিয়ে তোলে মন।

নিজের জগতে বাড়ী আজ আমাদের আধুনিকা বিবাহিত মেয়েদের জীবনে ব্যর্থস্বপ্ন। পাঁচজনের থেকে আলাদা করে ফেলে। নিজের স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা একটা ভুবন গড়ে তোলে। এ সবই একান্ত স্বার্থপরতার ফল! ফলে যা সে পেতে পারত তা পায় না।

পৃথিবীতে সব মানুষ সমান হতে পারে না। প্রত্যেকের মনস্তত্ত্ব আলাদা—বিয়ের পর সেই মনস্তত্ত্ব নিয়ে প্রত্যেকের হৃদয় জয় করবার চেষ্টা করা উচিত। কে কতটুকু পেলে সুখী হয় এটুকু জানতে পারলেই নিজের জীবনে সুখী হওয়ার বাধা কোথায়!

আর আমরা আগের যুগের মেয়েদের তুলনায় অনেক শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমতী তাই এই adjustment এবং মানুষ চেনার ক্ষমতা আমাদের অনেক বেশী বলেই আমার বিশ্বাস। বইএর বিদ্যা শুধু কেতাবে আবদ্ধ থাকলে তার আর মুল্য কোথায়? জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে সেই বিদ্যার দ্বারা অর্জিত বুদ্ধিকে যদি প্রয়োগ করতে না পারি!

স্বার্থপরতা এবং আত্মপ্রেম যতক্ষণ আমাদের বর্মের মত ঘিরে থাকবে তত-ক্ষণ বিবাহিত জীবনে সুখশান্তি আমাদের জীবনে সুদূর স্বপ্ন! যতই শিক্ষিত হইনা কেন প্রেম প্রীতি স্নেহ নারীর এই সনাতন প্রবৃত্তিকে জয় করবার বাসনা নিয়ে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আমরা সাফল্য লাভ করব না। কারণ সহজাত ধর্মকে অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না—বিশেষ করে সংসার ক্ষেত্রে। আর আমরা সহজাত ধর্মকে অতিক্রম করে স্বার্থের দুর্গে বন্দী হয়েছি বলেই দুখ।

অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় বিদেশী সাহিত্য পর্যায়ে শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডি'র শেষাংশটুকু প্রকাশিত হল না। সঃ দুঃ

॥ প্রস্তুতির পথে ছন্দিতার শারদীয়া সংখ্যা ॥

প্রবন্ধ লিখছেন—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রমা চৌধুরী
ক্ষেত্র গুপ্ত
অমিতাভ চৌধুরী
নিরঞ্জন হালদার
বেলা দে
সুরেশ হালদার ও
আরো অনেকে।

একটি নাটক লিখবেন—সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য

মস্কোর প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিকায় রচিত একটি রুশ গল্পের সরাসরি বঙ্গানুবাদ করেছেন—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কবিতা লিখছেন
গোপাল ভৌমিক, দুর্গাদাস সরকার,
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, হেনা হালদার.
কবিরুল ইসলাম, তৃপ্তি ভট্টাচার্য,
রবীন, সুর, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ও
আরো অনেকে

এছাড়া থাকবে কবি, সংগীত শিল্পী ও অভিনেতা/অভিনেত্রীর সংগে সাক্ষাৎকার। ও
রম্য রচনা, ফিচার, মেয়েদের ঘর সংসারের কথা।

আপনার কপির অর্ডার আজই পাঠান
মূল্য—একটাকা পঞ্চাশ পয়সা

নিয়মাবলী

ছন্দিতা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

প্রতি ইংরাজী মাসের ২০ তারিখে প্রকাশিত হয় (বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহ)।

বার্ষিক সডাক ৫.০০টাকা
প্রতি সংখ্যার মূল্য .৪০ পয়সা।

বছরের যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায় বৈশাখ থেকে বর্ষ শুরু (ইংরাজী এপ্রিল)।

গ্রাহক গ্রাহিকাদের উচ্চ-মানের লেখা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

প্রয়াজন বোধে লেখা সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়। ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত না হলে গ্রহণ করা হয় না।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ পেতে হলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট সমেত লেখা পাঠাতে হয়। পত্রালাপের জন্য সব সময়ই উপযুক্ত ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

১৩৭৮ সালের জন্য গ্রাহক চাঁদা গ্রহণ করা হচ্ছে

● দশ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্সি জমা প্রতি সংখ্যার জন্য ২৫% কমিশন বাদে ২ টাকা অগ্রিম দিতে হয়

● কমিশন বাদে ভি, পি, পি যোগে কাগজ পাঠানো হয়। ডাক খরচ এজেন্টকে দেয় দিতে হয় না।

[illegible] সংখ্যা। দাম—[illegible] পয়সা।
[illegible] কর্তৃক বি-৪১, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭৮

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কবিতা

অনুবাদ গল্প

ফিচার

সাক্ষাৎকার

ক্রীড়াজগৎ

আলোচনা

রম্যরচনা

সম্পাদকীয়

তারাশঙ্কর / বাংলা সাহিত্য / শারদীয় যৌন সংখ্যা

মনে দারুণ অতৃপ্তি নিয়ে তারাশঙ্করবাবু চলে গেলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান হাল দেখে দুঃখ এবং আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'রাজনীতিই এই অবস্থার জন্য দায়ী'। সুতরাং সাহিত্যে রাজনীতির ঢালাও কারবার নিয়ে আমরা ছন্দিতার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৮ সংখ্যায় আলোচনা করেছিলাম এবং তারাশঙ্করবাবুর উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার জন্য শুধুমাত্র রাজনীতিই দায়ী নয়—বাংলা সাহিত্যের জন্য সম্প্রতিকালের প্রকাশিত সেক্স জারনাল গুলিও দায়ী। গত এক দশক পূর্বে বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রথম এলো সিনেমা পত্র পত্রিকা। এখন সিনেমা পত্র পত্রিকাগুলিও বাজারে স্থান পায়না। এবার মোট বারখানা ঢালাও যৌবনে ফেটে পড়া রূপসী নারীর সম্পূর্ণ নগ্ন ও উত্তেজিত দেহের ছবি সম্বলিত শারদীয় সংখ্যা স্টলে স্টলে ব্যাপক ভাবে প্রদর্শিত এবং বিক্রী হচ্ছে। লজ্জা এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই যখন দেখি প্রগতিশীল পাঠক পাঠিকাদের লুকিয়ে লুকিয়ে পত্রিকাগুলি কিনতে। এই সেক্স জারনালগুলির অতিমাত্রায় স্ফীতিভাব দেখে তারাশঙ্কর-বাবু গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। অথচ যে সমস্ত লেখকগণ প্রচুর টাকার লোভে ঐ সমস্ত সেক্স জারনালে লিখে থাকেন তাদেরই দেখা গেল তারা-শঙ্করবাবুর শবযাত্রার মিছিলে—ঘন ঘন রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে!

লোভী মালিকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে দেখেছি এদেশের জনসাধারণকে। সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সেই জনগণকেই দেখেছি বিক্ষোভে ফেটে পড়তে কিন্তু দেখলাম না অশ্লীল ও যৌন মনোবৃত্তি সম্পন্ন লেখক ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জনগণকে গর্জে উঠতে। এদেশে আইনও আছে পুলিশও আছে। কিন্তু বে-আইনী ও অবৈধ কারবারের সঙ্গে পুলিশের সুন্দর সহাবস্থান পৃথিবীর কোনও দেশে নেই। আমাদের সৌভাগ্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এক-নিষ্ঠ সেবক তারাশঙ্করকে আর সেই দৃশ্যগুলি দেখতে হবে না।
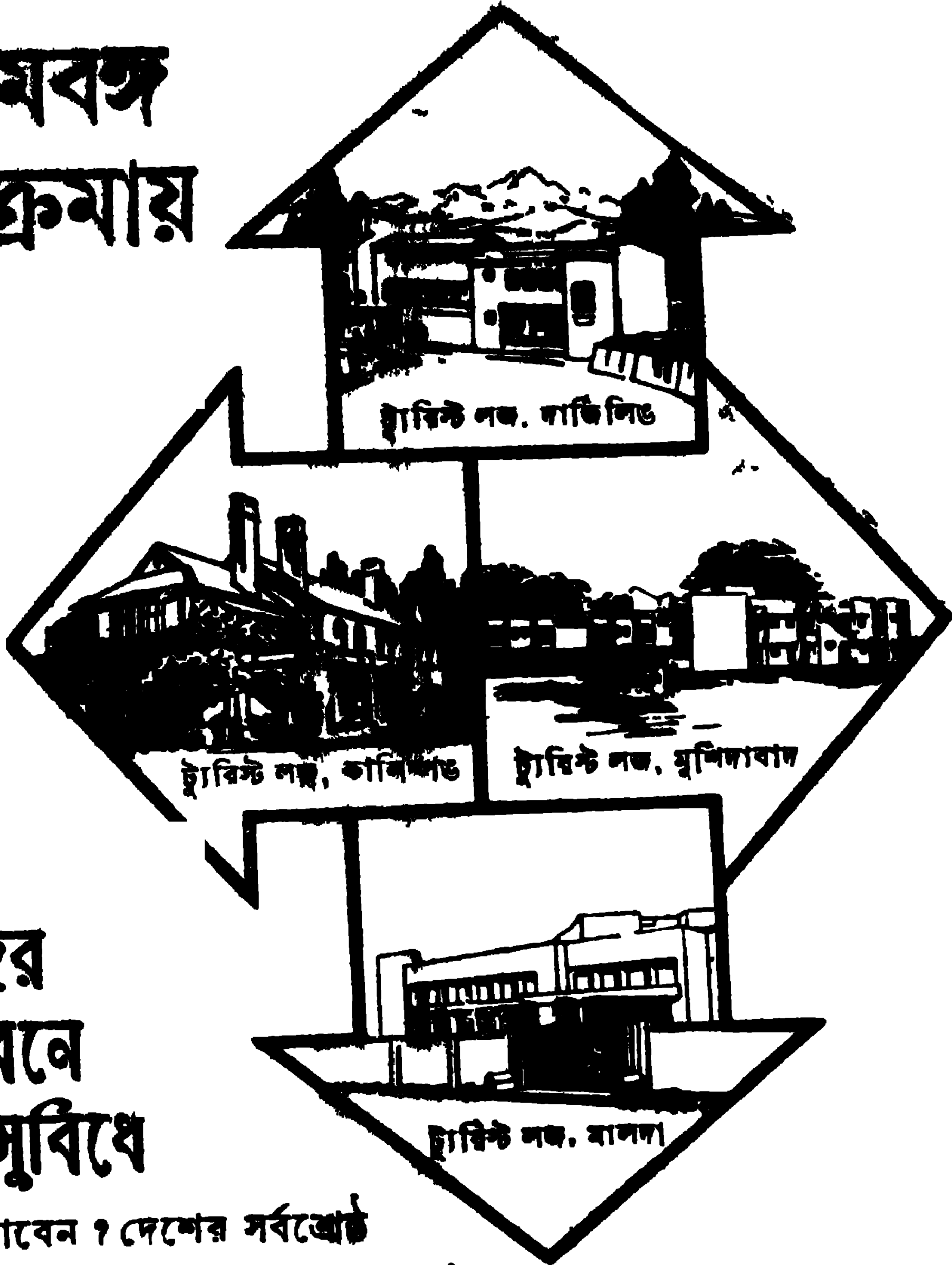
আয়ুঃ রক্ষতু বারাহী

ডক্টর রমা চৌধুরী

"আয়ুঃ রক্ষতু বারাহী ধর্মং রক্ষতু পার্বতী।
যশঃ কীর্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবী-কবচ ৪১)

'বারাহী করুণ আয়ুরক্ষা, পার্বতী ধর্মরক্ষা সতত।
যশঃ, কীর্তি ও লক্ষ্মীরক্ষা বৈষ্ণবী করুন নিয়ত।'

"আয়ুরক্ষা" এর প্রকৃত—প্রকৃষ্ট অর্থ কি? কেবলমাত্র পার্থিব আয়ু, কেবলমাত্র সাংসারিক জীবন-দৈর্ঘ্য, কেবলমাত্র জাগতিক প্রাণরক্ষাই কি আমাদের কাম্যধন হতে পারে, প্রার্থনার বস্তু হতে পারে, সাধনার লক্ষ্য হতে পারে? না, কদাপি নয়। কারণ, জাগতিক আয়ু, পার্থিব জীবন, সাংসারিক প্রাণ আমাদের কতদূর নিয়ে যেতে পারে? নিয়ে যেতে পারে কেবল এই ক্ষুদ্র-সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপর অস্তিত্ব পর্যন্ত—তার অধিক বিন্দুমাত্রও নয়। কিন্তু এরূপ অতি তুচ্ছ মূল্যহীন অসার্থক স্থিতিতে আমাদের লাভ কি? এত অতি সাধারণ পশুর জীবন, প্রকৃত মানবের জীবন নয়। কি অপরূপ ভাবেই না আমাদের প্রজ্ঞাগম্ভীর শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—

"জীবন্তি পশুপক্ষিণো জীবন্তি
তরবোঽপি চ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন
হি জীবতি।"

"জীবনধারণ করে পশুপক্ষী,
জীবনধারণ করে বৃক্ষচয়।
তিনিই করেন প্রকৃত জীবনধারণ,
জীবন যাঁর সদা মননময়।"

এরূপ মননের, চিন্তার, বিচার-বুদ্ধির, জ্ঞানের, উপলব্ধির শক্তিই হল মানবের শ্রেষ্ঠ শক্তি। এরূপ শক্তিবিহীন জীবন জীবনই নয়; তা' কেবল

'যেন-তেন প্রকারেণ' জীবন-ধারণই মাত্র; প্রকৃত—প্রকৃষ্টভাবে জীবন-যাপন নয় একেবারেই। সেজন্য, যে আয়ু, যে জীবন আমরা প্রার্থনা করব পরমা জননীর নিকট, সেই আয়ু, সেই জীবন এরূপ প্রকৃত-প্রকৃষ্ট আয়ু বা জীবনই যেন হয়, সে বিষয়েও আমাদের বিশেষ অবহিত হওয়া কর্তব্য।

এরূপ প্রকৃত-প্রকৃষ্ট জীবন লাভের উপায় কি? আমাদের শাস্ত্রমতে, জীবজগৎ পরমেশ্বরের মূর্ত প্রতিচ্ছবি; এবং তিনিই সানুগ্রহে কারণরূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্যে পরিণত, অথবা, রূপান্তরিত হয়েছেন। সেজন্য উপনিষদের এই মধুরমোহন মন্ত্র পঞ্চক অক্ষরে অক্ষরে সত্য,

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩। ১৪।১)

"ব্রহ্মেদং সর্বম্।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১)

"তত্ত্বমসি।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।৮।৭)

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১৯)

"অহং ব্রহ্মাস্মি।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।১০)

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।"

"তিনিই তুমি।"

"এই আত্মাই ব্রহ্ম।"

"আমিই ব্রহ্ম।"

অতএব. ভারতীয় মতানুসারে, পৃথিবীর সব কিছুই ব্রহ্মস্বরূপ, জীবও ঠিক তাই। সেজন্য, এই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মস্বরূপত্বকে উপলব্ধি করা,—নিজের এবং অপরের ক্ষেত্রে,—পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত করা—নিজের এবং অপরের ক্ষেত্রে—মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এইটাই প্রকৃত—প্রকৃষ্টরূপে জীবন-যাপনের একমাত্র উপায়—কেবল দৈহিক দিক্ থেকে নয়, কেবল পশুভাবে নয়, কেবল সাংসারিক পরিবেশে নয়, কিন্তু আত্মিক দিক্ থেকে, ব্রহ্মভাবে, পারমার্থিক পরিবেশে জীবন যাপন করা; স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে, অন্যদেরও ব্রহ্মস্বরূপ হতে, সাহায্য করা—এতেই ত নিহিত হয়ে আছে মানব জীবনের একমাত্র সার্থকতা। আজকের এই বিশেষ শুভদিনে এরূপ শুভ-সার্থক জীবনই আমাদের দান করুন পরমকরুণাময়ী বিশ্বজননী।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে যা স্বাধীন বাংলাদেশ তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ঠিক বলতে শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁর যে সংযোগ প্রায় তার মতই তা তাৎপর্যপূর্ণ। এককালে তা তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল, তাঁর পারিবারিক জীবনের পরিবেশ রচনা করেছিল, সমাজ-উন্নয়ন কর্মে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সর্বোপরি সাহিত্য সাধনায় তাঁর বিশেষ সহায়তা করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা হবে।

কলিকাতার বদ্ধ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের মন টিকত না, তাই গ্রামের পরিবেশের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সুযোগ এল একটি পারিবারিক দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। ঠাকুরবাড়ীর জমিদারীর মূল অংশই উত্তরবঙ্গে নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় অবস্থিত ছিল। মহর্ষি এই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর প্রথম জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন মহর্ষি নিরুপায় হয়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর তার ভার দেন। মনে হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের আগেই এই ব্যবস্থা চালু হয়, কারণ আমরা জানি সাহাজাদপুরের কুঠি বাড়িতে বসে তিনি 'বিসর্জন' নাটক এই সময় রচনা করেন।

এই জমিদারী তত্ত্বাবধান করতে তিনি কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত শিলাইদহে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে একটি সুন্দর কুঠিবাড়ী ছিল। তা একেবারে পদ্মার ধারে অবস্থিত। উত্তরে পতিসর ও সাহাজাদপুরেও কুঠিবাড়ী ছিল। রবীন্দ্রনাথ নৌকা যোগে পদ্মা ও যমুনা দিয়ে এই সব অঞ্চলে যেতেন। সাহাজাদপুর হতে পতিসর যেতে মাঝে চলন বিল পড়ত। এই কুঠিবাড়ী-গুলিতে থাকবার সময় তিনি কত কবিতা রচনা করেছেন। তাই দেখা যাবে তাঁর অনেক কবিতা এই তিনটি জায়গার নামের সহিত সংযুক্ত হয়েছে। শিলাইদহের এই কুঠিবাড়ী শুধু তাঁর জমিদারী তত্ত্বাবধানের কর্মকেন্দ্র ছিল না। এখানে তাঁর পারিবারিক জীবনের সুখের অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল।

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ একাই জমিদারী তত্ত্বাবধানে যেতেন এবং মাঝে মাঝে কলিকাতায় ফিরে আসতেন। পরে তাঁর সন্তানরা যখন একটু বড় হল এবং তাদের লেখা পড়া তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ল, তখন তিনি পত্নী মৃনালিনী দেবীসহ তাঁর পাঁচটি সন্তানকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে আনিয়ে নিলেন এবং তাদের সহিত বাস করতে লাগলেন। এখানে তাঁর ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া ও চরিত্র সংগঠনের জন্য তিনি যা ব্যবস্থা করেছিলেন তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। চার বছর এইভাবে শিলাইদহের সুন্দর পরিবেশে এখানে তাঁর পারিবারিক জীবন কেটেছিল। তার পরে তাঁর মনে একটা অস্থিরতা দেখা দিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিদ্যালয়ে থেকে পাঠ চর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করলেন। তখন তাঁর মনে ইচ্ছা জাগল এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবার যেখানে দেশের ছেলেদের প্রাচীন আদর্শে আবাসিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হতে পারে। এ হতেই শান্তিনিকেতনের প্রধান আশ্রমের পরিকল্পনা এবং সেই কারণেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি স্থায়ী ভাবে শিলাইদহ ত্যাগ করলেন।

সুগন্ধ ফুল যেখানেই ফুটুক যেমন তার কাছে ভ্রমর আসে, তেমন গুণী সাহিত্যশিল্পীর সন্ধান মিললে, তিনি যেখানেই থাকুন সাহিত্যরসিক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে শিলাইদহের গ্রাম্য পরিবেশে আত্ম নির্বাসনের ব্যবস্থা করলেন, তখনও সাহিত্যরসিক তাঁকে ছাড়লো না। তাঁকে ঘিরে এই সুদূর পল্লীর বুকেও একটি সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন কুষ্টিয়ার ভারপ্রাপ্ত মহকুমাশাসক। আপিসের ফাঁকে ছুটি নিয়ে তিনি সেখানে চলে আসতেন। কলিকাতা হতে জগদীশ চন্দ্র বসু আসতেন। শীতকালে পদ্মার চরে সাহিত্য সভা বসে যেত। রাজশাহী হতে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আসতেন। রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু সিভিলিয়ান লোকেন পালিত আসতেন। এঁদের সাহচর্যে এই সব বৈঠক বেশ জমে উঠত।

উত্তরবঙ্গে বাসকালে গ্রামের সাধারণ মানুষের সহিত তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনে, তাদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে তিনি পল্লী উন্নয়নের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসুক হন। তিনি বুঝেছিলেন কৃষি ও সমবায়কে ভিত্তি করেই পল্লীবাসীর উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠান। পুত্র শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে আসলে শিলাইদহে তাঁর জন্য বড় খামারের ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানকার পরীক্ষামূলক কার্যকে ভিত্তি করেই পরে শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

জীবনের এই অধ্যায়ে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে তাঁর সাহিত্যিক রচনাও নূতন পথে প্রবাহিত হয়েছিল। কার্য উপলক্ষ্যে গ্রাম হতে গ্রামান্তরের পথে তিনি প্রকৃতি ও গ্রামের মানুষের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছিলেন তাই তাঁকে গল্পরচনায় উৎসাহিত করেছিল। এতদিন তিনি ছিলেন প্রধানত কবি, এখন গল্পের ধারা একটি নূতন স্রোত রূপে সাহিত্যে আবির্ভাব হল। তিনি নিজেই বলেছেন "আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম গ্রামান্তরের পথে ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়" (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৪)

এই নূতন পরিবেশের নূতন অভিজ্ঞতার সংগে তাঁর যে একটা নিবিড় সংযোগ ঘটেছিল তা খুবই বোঝা যায় গল্পগুলির কাহিনী ও পরিবেশ লক্ষ্য করলে। গ্রামের ছেলের, গ্রামের পোষ্টমাষ্টার, গ্রামের মানুষ তার নায়ক-নায়িকা। পোষ্টমাষ্টার গল্পের পোষ্টমাষ্টার সত্যই সাহাজাদপুরে বাস করতেন। (ছিন্ন পত্রাবলী, ৬২ নং) ফটিকের বিকারে ষ্টীমার চালক জল মাপ সূচক উক্তি 'এক বাও মেলে নাই' প্রভৃতি এই অঞ্চলেরই সচরাচর দৃষ্ট অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের' কাহিনীতে যে ঢেউ রূপী দুরন্ত ছেলেগুলি আকর্ষণ করে খোকাবাবুকে জলে টেনে নিল তাও এই নদীমাতৃক দেশের নিত্য-লক্ষিত ঘটনা। আরও লক্ষ্য করবার এই যে উত্তরবঙ্গে বাসকালে যে অবারিত ধারায় তিনি গল্পলিখে চলেছিলেন, তা শান্তিনিকেতনে চলে গেলে থেমে না থাক, স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে সেটা নিজেও লক্ষ্য করেছিলেন তা তাঁর এই মন্তব্য হতে সমর্থিত হবে:

"সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা অন্তঃকরণে যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোট গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসবের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।" (সোনার তরী, সূচনা)

তাঁর কাব্যধারা ও জীবনের এই অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর দিক থেকে নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। সেও নূতন পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে। এই

প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। এই যুগে যে ছয়টি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাদের নাম হল 'সোনারতরী,' 'চিত্রা', 'চৈতালি, 'কল্পনা', 'কনিকা' ও 'নৈবেদ্য'। সোনার তরী'র প্রথম কবিতায় যে দৃশ্যটি অঙ্কিত হয়েছে তা এই পদ্মার চরে উৎপাদিত ধানের দৃশ্য। এখানেই ছোট ক্ষেতের আশেপাশে বাঁকা জলকে খেলা করতে দেখা যায়। বিষয় বস্তুর দিক হতে 'চিত্রার' অন্তর্ভুক্ত 'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক কবিতাটি লভ্য করা যেতে পারে। যাদের ম্লান মুখে তিনি ভাষা দিতে চেয়েছিলেন, যাদের ক্লান্ত ক্লিষ্ট ভগ্নবুকে আশা জাগাতে চেয়েছিলেন তাদের সঙ্গে এখানেই তাঁর নিবিড় পরিচয়। স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে একই গ্রন্থের 'সন্ধ্যা' শীর্ষক কবিতায়। এই কাব্য গ্রন্থেই 'উর্বশী' কবিতাটি স্থান পেয়েছে। নৌকায় বসে পদ্মার বক্ষেই তা রচিত। এমনও হতে পারে এখানকার ধানের ক্ষেতে প্রকৃতির দোলায়িত অঞ্চলের শোভাই তাঁর মনে সুরসভাতলে নৃত্যরত উর্বশীর তনু দেহের লীলায়িত সুষমার কল্পনা তাঁর মনে ফুটে উঠেছিল।

এদের মধ্যে 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থ খানি ছোট হলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। এতে অনুভূতির উচ্ছ্বাস পাই না, ঘটনা পাই না, পাই ছবি আর ছবি। এই নদীমাতৃক দেশের নানা নয়নরঞ্জন ছবি তিনি এখানে কাব্যের ভাষায় ফুটিয়েছেন। তার ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন যে পতিসরের কাছে নৌকা নোঙর করে তার মধ্যে বসে তিনি এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। বাংলা সাহিত্যেও এই কাব্যগ্রন্থটি একান্তভাবেই এই অঞ্চলের দান।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের পর এই অঞ্চলের সহিত তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলেও পরবর্তী কালেও তা রবীন্দ্রনাথের পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের স্থান হয়েছিল। শোকের আঘাতে বা ক্লান্তির পর বিশ্রামের জন্য মানুষ একান্ত আপন জন বলে যাকে মনে করে তার কাছে চলে যায়, তিনিও তেমন এমন অবস্থায় পরবর্তী জীবনে শিলাইদহকে আশ্রয় করতেন। তাই দেখি কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি মনকে শান্ত করতে এখানে চলে এসেছিলেন। আবার দেখি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে রওনা হবার আগে শরীরকে বিশ্রাম দেবার জন্য তিনি এখানে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে ছিলেন। সেই সময়েই তিনি ইংরাজি গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির অনুবাদ করেন। ইংরাজি গীতাঞ্জলির তাৎপর্য্য সুদূর প্রসারী। [illegible] তাঁকে বাঙ্গালীর কবি হতে বিশ্বের কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। শিলাইদহ এই ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী উপন্যাস : রাজমোহন্‌স্‌ ওয়াইফ

ক্ষেত্র গুপ্ত

১৮৬৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে" ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজমোহন্‌স্‌ ওয়াইফ বেরিয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি খুঁজে পান এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ বঙ্কিমগ্রন্থা-বলীর ইংরেজি খণ্ডে প্রকাশ করেন। ইংরেজি উপন্যাসটির প্রথম তিনটি অধ্যায় পাওয়া যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ঐ ইংরেজি বইয়ের সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তার প্রথম তিনটী অধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণের হারিয়ে যাওয়া অংশটুকু পূর্ণ করেন। প্রাপ্ত ইংরেজি রাজমোহন্‌স্‌ ওয়াইফের প্রথম তিনটি অধ্যায়ের ভাষা বঙ্কিমের।

১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হলেও বইটি সম্ভবত কিছু আগে লেখা হয়েছিল, তবে অনেক আগে নয়। কারণ উপন্যাসটির কোথাও কোথাও পরিণত জীবনবোধ চকিত দর্শন মেলে। নবম অধ্যায়ে নায়িকা মাতঙ্গিনী যে উত্তপ্ত কিন্তু সংযত ভঙ্গিতে মাধবের প্রতি তার অবৈধ প্রণয়াবেগ প্রকাশ করেছে ["Ah, hate me not, despise not," cried she with an intensity of feeling which shook her delicate frame. "Spurn me not for this last weakness ; this, Madhav, this may be our last meeting ; it must be so, and too, too deeply have I loved you – too deeply do I love you still, to part with you for ever without a struggle."] তা লেখকের একাধিক মুখ্য উপন্যাসের সদৃশ। সমগ্রত শিল্পবিচারে দুর্বল এই উপন্যাসে ঐ একটি মাত্র ঘটনা-সন্ধিতে বঙ্কিমের হাতের গভীর স্পর্শ আছে। ভাষা ইংরেজি হলেও এই বইটিকে তাঁর উপন্যাসধারার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক বলা চলে না। তখনও তিনি উপন্যাস লেখার যথার্থ ও মনোমত একটি শিল্পরীতি আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিভাবে সার্থক উপন্যাস লেখা যায় বাংলা সাহিত্যে তার কোনো

খাঁটি আদর্শ ছিল না বলেই তাঁকে নিজেকে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবতে হয়েছে। কোনো প্রচলিত সিদ্ধ রীতি থাকলে তিনি নিজের জীবনবোধ এবং উপন্যাস-বিশেষের শৈল্পিক প্রয়োজন-অনুযায়ী সে রীতির পরিবর্তনের ও উন্নয়নের কথাই শুধু ভাবতে পারতেন। বঙ্কিমকে একটি সিদ্ধরীতি গড়ে তোলার কথা ভাবতে হয়েছে। এবং প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি দুদিক দিয়েই তাঁর অনুসন্ধান রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফে। দুর্গেশনন্দিনীতে যে রাজপথ মিলল তা হঠাৎ পাওয়া যায় নি। তার জন্য গোপন সাধনার মত এই ইংরেজি উপন্যাস।

কিন্তু বঙ্কিম কেন এই উপন্যাস ইংরেজিতে লিখেছিলেন? বাংলা লেখায় তাঁর কিছু অভ্যাস ছিল ছাত্রজীবন থেকেই। যদিও সে-সব লেখার সঙ্গে এখন (১৮৬৩—৬৪ সালে) তাঁর মনের পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। কিন্তু মধুসূদন যেমন ইংরেজিতে লেখাটাই স্বাভাবিক করে তুলেছিলেন বলেই "ক্যাপটিভ্ লেডি," "ভিসন্‌স্ অব দি পাস্ট" "বিজিয়া" প্রভৃতি ইংরেজিতে লিখেছিলেন, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে সে-জাতীয় কোনো কারণ ছিল না। তাঁব ইংরেজি রচনাবলী (সবই প্রবন্ধ) সবই পরের লেখা। রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফেব আগের ইংরেজি লেখার খোঁজ মেলেনি। ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ বহিরঙ্গ প্রেরণা হতে পারে। আসলে ইংরেজী ভাষার অন্তরালে তিনি যেন প্রস্তুত হতে চেয়েছেন উপন্যাসরীতির মুক্তিমন্ত্র আয়ত্ত কবাবাব জন্য। এই ব্যর্থ ইংরেজি উপন্যাস তাঁকে পৌছে দিয়েছে দুর্গেশনন্দিনীব রীতিঘটিত সাফল্যে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরেব দুলাল" অথবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "অঙ্গুরীয় বিনিময়ের" বীতির প্রতি কোনোরূপ আনুগত্য নিয়ে তিনি আরম্ভ করতে চান নি। হঠাৎ দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে বঙ্কিম উপন্যাসের পাঠ শুরু করলে মনে হতে পারে যে আগে লেখা একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী "অঙ্গুরীয় বিনিময়" হয়তো তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে। এবং যেহেতু "ঐতিহাসিক উপন্যাসের" অন্তর্ভুক্ত এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি তার দৃষ্টিসীমার মধ্যেই ছিল। ১৮৭১ সালে Caleutta Review পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে তিনি "Bengali Literature" নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে ভূদেববাবুর প্রসঙ্গ তোলা হয়। ["...his little volume of historical tales...is enough to show that he might have done a great deal more than he actually has done."] কিন্তু বঙ্কিম

প্রথম হাত পাকাবার চেষ্টা করলেন রাজমোহনস্ ওয়াইফ—একটি সামাজিক উপন্যাসে, ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সে নয়। শেষ পর্যন্ত মুক্তি যে ইতিহাসমিশ্র কল্পনার আকাশে সে-সত্য ভূদেব তাঁকে শেখাতে পারেন নি। কারণ ভূদেবের উক্ত রচনা সেরূপ কোনো সত্যনির্ধারণের দিক থেকে ছিল অকিঞ্চিৎকর, এবং উক্ত সমস্যা প্রাবন্ধিক ভূদেবের জীবনসমস্যা ছিল না। বঙ্কিমকে সামাজিক উপন্যাসের ভুল পথে চলে সে-সত্য জানতে হয়েছে। নিজের সাধনার আলোতে দুর্গেশনন্দিনীতে পৌঁছে হয়ত তিনি অঙ্গুরীয় বিনিময়কে সাধ্যমত স্মরণ করেছিলেন।

কিন্তু প্যারীচাঁদের আলালকে তিনি প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ["His best work is Alaler Gharer Dulal, which may be the first novel in the Bengali language."—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ]। প্যারীচাঁদের মত তাঁর এই ইংরেজি কাহিনীও বাংলা সমাজজীবনের ভিত্তিতেই লেখা। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি আলালের পথ ধরে এগুলেন না। রাজমোহনস্ ওয়াইফ রীতিতে (এবং জীবনকে দেখায়ও) আলাল থেকে একেবারে আলাদা। আলাল বাস্তব সমাজ চিত্র, রাজমোহন স্ববলম্বিত কাহিনী। প্যারীচাঁদ যখন জীবনের বাহিরের মহলে ভ্রমণশীল, বঙ্কিম তখন প্রবৃত্তির গহনলোক সন্ধানী। প্যারীচাঁদ থেকে তাঁর ধর্ম জাতি আলাদা রাজমোহন থেকেই বঙ্কিম সেটুকু বুঝেছিলেন।

রাজমোহন তাই হয়ে রইল উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন আত্মানু-সন্ধানের দলিল।

স্থানাভাবে শারদ সংখ্যায় শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, শ্রীমতী হেনা চৌধুরী, শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ডু, শ্রীঅরবিন্দ নাহা ও আরো অনেকের লেখা প্রকাশ করতে পারা গেল না, এজন্য আমরা দুঃখিত। যুগ্ম-সম্পাদক : ছন্দিতা

পঞ্চায়েত ও সমবায়প্রথা

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

কোন এক সময়ে আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'প্রতিটি গ্রামেই তিনটি মৌলিক বস্তু থাকবে, একটি পঞ্চায়েত, একটি সমবায় সংস্থা ও একটি বিদ্যালয়। একমাত্র তাহলেই আমাদের দেশের বুনিয়াদ অত্যন্ত শক্ত ও সুদৃঢ় হতে পারে।'

জনসাধারণকে স্বেচ্ছামত স্বীয় মত ব্যক্ত করার এবং যথাযথ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্র তৈরী করে দেয় পঞ্চায়েত। এর সঙ্গে আরো অনেকগুলো সংস্থা কর্মরত থাকে, যেমন কিষাণ মণ্ডল, বাল মণ্ডল, যুবক মণ্ডল, মহিলামণ্ডল, দস্তকর মণ্ডল প্রভৃতি। গ্রাম জীবনের সকল ধরনের কাজ কৃষি পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নানাবিধ শিল্প প্রচেষ্টা, যেমন নৃত্য নাট্য, সংগীত অনুষ্ঠান, যাত্রা কথকতা, খেলাধুলা, ব্যায়াম চর্চা ইত্যাদি সব কিছু ভাগে ভাগে এইসব মণ্ডলের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের ধারা অনেকটা মন্ত্রী পরিষদের মতো। পঞ্চায়েতের যাবতীয় কিছু পরিচালনা করে থাকে পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ। পঞ্চায়েতের অর্থকরী দিকটার জন্য ভারপ্রাপ্ত রয়েছে সমবায় মূলক ব্যবস্থা। পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মতে সমবায় প্রথার মাধ্যমে যেন বিরাট এক পরিবারের পরিকল্পনা রয়েছে, যে পরিবার ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে। এর মূল লক্ষ্য হ'ল

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা সবারই তরে।

সমবায় প্রথা বিশেষ করে দুর্বল ও নিঃস্বদের এক গোষ্ঠীতে একত্রে এনে তাদের সক্ষম ও শক্তিবান করে তোলে। যাদের 'কিছুই নেই' তারা 'অনেক আছে' যাদের তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে, কাজেই সমবায়মূলক প্রথা আসলে হ'য়ে ওঠে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবলম্বন ও ভিত্তিস্বরূপ।

বহুকাল পূর্বে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমরা যে পর্যন্ত না সমবায়মূলক

প্রথার দ্বারা প্রচেষ্টা সুরু না করি আমরা চাষবাসের দ্বারা জমি থেকে পুরো ফসল কখনই পাবো না।' ক্ষেত থেকে যদি অনেক ফসল পাওয়া যায় সেই ফসল গুদামজাত করে রাখার যাবতীয় বিলি ব্যবস্থা অনায়াসেই সমবায়মূলক প্রচেষ্টার দ্বারা হতে পারে।

বিদ্যালয় হ'ল আর একটি সংস্থা যার উপর নব ভারতের বুনিয়াদ গড়ে উঠবে। পঞ্চায়েত ও সমবায় প্রথার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ও নতুন যুগের নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। এই তিনটি সংস্থার মধ্যে একটি আর একটির পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আদর্শ শিক্ষা শুধুমাত্র আমাদিগকে নতুন খবর নতুন পথের সন্ধানই দেয় না, শিক্ষা আমাদিগকে, আমাদের সত্ত্বাকে ঐক্যের দ্বারা জীবন্ত ও ছন্দোময় করে তোলে।'

বিদ্যালয় হ'ল আসল মহৎ সাংস্কৃতিক জীবনের উৎস। গ্রামের মধ্যে সমাজ কল্যাণের কাজ, যৌথ জীবনের পরীক্ষা, নিরীক্ষা অস্পৃশ্যতা বর্জনের দ্বারা অতি অজ্ঞ, মূর্খ সম্প্রদায়ের লোকদেরও সকল দিক থেকে তুলে ধরার কাজ বিদ্যালয়ের অনুকূল পরিবেশে সাধিত হতে পারে।

গ্রামের জমিদার বা মহাজন বা সাহুকার যখন চাষীকে ঋণ দেয় তখন সে তা কখনো চাষীর উপকারের জন্য চাষীকে দেয় না। সে ঋণ দেয় যা'তে সে চাষীর কাছ থেকে মোচড় দিয়ে দিয়ে, চাষীকে আরো বিরক্ত করে আরো হয়রান করে চাষীর কাছ থেকে অনেকটা টাকা সুদে আসলে আদায় করতে পারে।

আবার অনেক সময় মূর্খ, অজ্ঞ চাষাকে গ্রামের জমিদার বা মহাজন বিস্ময়কর-ভাবে প্রতারণা করে। তাকে যত টাকা ধার হিসাবে দেওয়া হয়েছে তার বেশী টাকা হয়তো মূল খতের মধ্যে জমিদার বা মহাজন লিখিয়ে নেয়। দলিলের মধ্যে হয়তো নিরক্ষর চাষীকে দিয়ে যেখানে সেখানে টিপসাহি করিয়ে নেয়। যেটুকু ক্ষেতের ফসল চাষী পায় তা থেকে হয়তো একটা অংশ চাষী রেখে দেয়, নিজের পরিবারের সারা বছর ধরে আহারের জন্য। বাকী ফসল হয়তো সে টাকার বিনিময়ে বিক্রী করে দেয়। চাষী অত্যন্ত গরীব, তার এক কাণা কড়িও সম্বল নেই, কাজেই সে নিজে তার শ্রমের ফসলের মূল্য নিজে থেকে চাইতে পারে না। তাকে মহাজন দয়া ক'রে যা ধরে দেয়, তাই তার প্রাপ্য হয়। এইভাবে দরিদ্র চাষী নানাভাবে প্রতারিত হয়, শোষিত হয়, মহাজন

শ্রেণীর লোকদের দ্বারা। ক্ষেতের ফসল ঘরে তুলতে না তুলতেই নানা ধরনের ফঁড়েরা এসেও চাষীর উপর উৎপাত করতে থাকে। চাষী তখন দিশাহারা হয়ে যেমন খুসী তেমন কোন মূল্য পেলেই তার শ্রমের ফসল দিয়ে দেয়। একমাত্র সমবায়মূলক ব্যবস্থার দ্বারাই চাষীকে মহাজন ও জমিদারদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঐক্য

যতদিন গ্রাম জীবনে একতা ছিল, ততদিন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল নানাদিক থেকে। একতা থেকেই আসে নিরাপত্তা, হয় শ্রীবৃদ্ধি। কৃষিকাজ, গৃহশিল্প, চারুকলা, সাংস্কৃতিক জীবন, শিক্ষা সব কিছু প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যখন গ্রামের মানুষরা একতাবদ্ধ হয়ে থাকে।

গ্রামের লোকদের একতাবদ্ধ করে রাখার একমাত্র সংস্থাই হ'ল পঞ্চায়েত্। গ্রামের মধ্যে যে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দিলে তা মিটিয়ে দিতে পারে পঞ্চায়েত্। 'পঞ্চায়েতের যে পঞ্চ পরমেশ্বর' তার প্রতি গ্রামের লোকের বরাবরই ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা। গ্রামের লোক খুব ভালোভাবে এই সত্য মানতো যে পঞ্চায়েতের কথনো অবাধ্য হওয়া চলবে না। পঞ্চায়েত্ যা বলে তা-ই করতে হবে। কাজেই পঞ্চায়েতকে অবলম্বন করে, পঞ্চায়েতের ছত্র ছায়ায় গ্রামের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে টা গভীর ঐক্য বোধ, একটা সুনিবিড় ভ্রাতৃত্ববোধ, একটা সহজ ও অনাবিল ই ভাই ভাব বিদ্যমান ছিল।
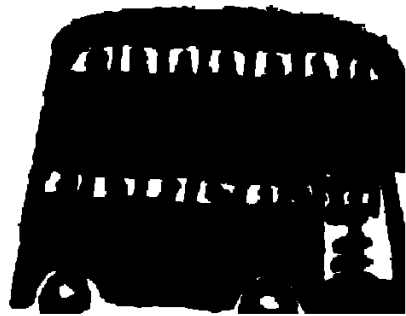
বাংলাদেশের সংগ্রাম ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত

নিরঞ্জন হালদার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জয়বাংলা আন্দোলন বাংলাদেশের বেশীরভাগ অধিবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই বদলে দিয়েছে। সেই আন্দোলনের ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকেও উদ্বেলিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ (বাঙালী ও অবাঙালী উভয় গোষ্ঠীই) সামগ্রিকভাবে কিন্তু বাংলাদেশের আন্দোলনকে ভাল চোখে দেখেননি। তা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দল-নিরপেক্ষ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী বেশ কিছু বাঙালী মুসলমান যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, সংগ্রামের সমর্থনে ও শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও কাজ করেছেন। আবার তরুণ উর্দু-কবি সাংবাদিক সামসুজ্জামান কলকাতায় সর্বভারতীয় উর্দু-কবিদের "মুসায়রার" আয়োজন করে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও শরণার্থীদের জন্য ২৫ হাজার টাকা তুলেছেন।

যে আন্দোলন ও মুক্তি যুদ্ধের ঢেউ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে সারা ভারতকে উদ্বেলিত করেছে, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বামপন্থী নেতা আওয়ামী লীগের সেই অসাম্প্রদায়িক ও বাংলা জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে খুসী মনে গ্রহণ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির হালতু আঞ্চলিক কমিটী আয়োজিত এক কর্মী সমাবেশে দলের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তৃতাই (গণশক্তি, ২৪ এপ্রিল, ১৯৭১) তার প্রমাণ। বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক, "এমন কি গরীব চাষী খেতমজুর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল" —একথা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত স্বীকার করেছেন। এই ধরনের সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দেশে দেখা যায় নি। কিন্তু এই সংগ্রামের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে, যাঁরা ভাষা-আন্দোলন, ছয়-দফা কর্মসূচীর আন্দোলন, খাদ্য-আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, তাঁদের কিন্তু শ্রীদাশগুপ্ত কোন অভিনন্দন জানাতে

পারেননি। বরং জয় বাংলা আন্দোলনের স্রষ্টা, মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষনকেও তিনি লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন।

শ্রীপ্রবোধ-দাশগুপ্ত বলেছেন, "এ সংগ্রামের নেতৃত্বে রয়েছে জাতীয় বুর্জোয়া।" শ্রীদাশগুপ্ত যদি বলতেন ধনিক শ্রেণী বা ক্যাপিটালিষ্ট শ্রেণী, তা হলে তাঁকে চেপে ধরা যেতো। 'বুর্জোয়া' শব্দটি ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের ভাষা, ইংরেজিতে ওই শব্দটি ঠিক কোন অর্থ প্রকাশ করে, ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল তা বুঝে উঠতে পারেননি বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীদাশগুপ্ত যেহেতু বলেছেন—"একচেটিয়া পুঁজি জমিদার-জোতদার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যদি এই সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, তবে আজকের অপ্রধান দ্বন্দ্ব আগামী দিনে প্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হবে।" সেই হেতু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে "জাতীয় বুর্জোয়া', অর্থে শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধীদের হাতে নেতৃত্ব রয়েছে—শ্রীদাশগুপ্ত একথাই বোঝাতে চেয়েছেন। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, এবং শ্রমিকদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের বিষয় শ্রীদাশগুপ্তের একেবারেই জানা নেই। কোন মালটি-রেসিয়াল সমাজে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রমিকদের স্বার্থ এক হয় না, আলজেরিয়ার, দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্ব-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।

বাংলাদেশে শতকরা ৮৫ জন কৃষি-নির্ভর। পূর্ববাংলায় আগে হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত বেশী জমির মালিক থাকায় আয়ুব খানের আমলে পূর্ব বাংলায় জমির সর্বোচ্চ সীমা ৩৩ একরের নির্ধারিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলমান জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য ওখানে জমির সর্বোচ্চ সীমা সেচ এলাকায় ৫০০ একর, অসেচ এলাকায় ১ হাজার একর। জমির এই উর্দ্ধ-সীমার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি-জমির মালিকেরা ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে অতি সহজে ঋণ পেয়েছেন এবং বিভিন্ন সরকারী সুবিধার জন্য গম ও তুলার উৎপাদনই বৃদ্ধির সঙ্গে ধানের উৎপাদনও বাড়িয়ে ফেলেছে। আয়ুব খানের আমলে পূর্ব বাংলা থেকে যে জমিদারী প্রথা বিদায় দিয়ে জমির সীলিং ৩৩ একরে নামানো হয়েছে, আওয়ামী লীগ তার অবসান-ঘটিয়ে পুনরায় জমিদারী ও জোতদারী

প্রথা ফিরিয়ে আনতে যাবেন কেন? বাংলাদেশে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম করার দরকার হবে না। বাংলাদেশে কলকারখানার মালিক প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানীরা। চা-বাগানের মালিক ও তারা। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকশ্রেণী আওয়ামীলীগকে ভোট দিয়েছিল বলেই আওয়ামীলীগ ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে অত বেশী আসন পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেতাদের বেশীর ভাগ পরিবারে হয় প্রথম নতুবা দ্বিতীয় পুরুষ লেখাপড়া করেছে। যাঁরা কৃষক, শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁরা স্বাধীন বাংলা দেশে একচেটিয়া পুঁজি গড়ে উঠতে দেবেন কেন? আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী কার্যকর করতে তাদের তো কোন বাধা থাকার কথা নয়। ১৯৬৮ সালের পর বাংলাদেশে বেশীরভাগ শ্রমিক তো আওয়ামী লীগের ট্রেড ইউনিয়নকেই সমর্থন করে এসেছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি "সিটুর" সমর্থন পেয়েছে। ১৯৬৯ সনে আওয়ামী লীগের কর্মীদের নেতৃত্বেই বাংলাদেশের শ্রমিকদের আন্দোলন সফলতা লাভ করেছিল। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে 'ঘেরাও' ব্যবস্থা চালু করেছিলেন আওয়ামী লীগের শ্রমিক নেতারাই।

আওয়ামী লীগের অনেক নেতা অ্যাডভোকেট। রাজনীতি করে সংভাবে জীবন যাপন করা যায়, এমন পেশা গ্রহণের কথা ভেবেই ছাত্রাবস্থায় অনেকে 'ল পড়েছিলেন। আইন-ব্যবসায় অর্থ উপার্জন এঁদের কখনও প্রধান চিন্তা ছিল না। প্রধান চিন্তা ছিল রাজনীতি এবং ১৯৪৮ সাল থেকে এই নেতাদের বার বার জেলে যেতে হয়েছে। আওয়ামী লীগের উপরের নেতৃত্ব আইনজীবীদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই কি শ্রীদাশগুপ্ত "বাংলাদেশের সংগ্রামের নেতৃত্ব"কে "বুর্জোয়া," আখ্যা দিয়েছেন? ভাসানী-পন্থী ন্যাপের নেতা দলের সিনিয়ার সহ-সভাপতি আবদুল জব্বার এবং আর একজন নেতা আবদুর রজ্জাক তো অ্যাডভোকেট এবং আইন ব্যবসা করে প্রথম জন খুলনা শহরে ১১ খানা এবং দ্বিতীয় জন ৪ খানা বাড়ির মালিক হয়েছেন। ভাসানী-দলের মুখপত্র 'স্বাধিকার" পত্রিকার মালিক খুলনায় বার্জের ব্যবসা করেন, ভাসানীর দলের সম্পাদক রংপুরের মশিয়ুর রহমান চীন থেকে পূর্ববাংলায় কয়লা ও সিমেন্ট আমদানির এক মাত্র অধিকারী। মাও-পন্থীদের নেতা তোহা এক জন অ্যাডভোকেট। ওঁদের তুলনায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব অনেক বেশী সক্ততা ও সংগ্রামের ঐতিহ্যের অধিকারী। সি-পি-এমের পশ্চিমবঙ্গ

থেকে রাজ্যসভার সদস্য শ্রীঅরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি, শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জি এবং শ্রীসলিল গাঙ্গুলিও তো আইনজীবি। শ্রীজ্যোতি বসুও আইনজীবি। পশ্চিম-বঙ্গের সি-পি-এমের এই আইনজীবি নেতৃত্বের তুলনায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ত্যাগ অনেক বেশী. সাধারণ মানুষের সংগ্রামে তারা অনেক বেশী অংশীদার। আওয়ামী লীগ দল, নেতা এবং কর্মীদের খরচ সংগ্রহের ব্যাপারে শ্রমিকদের আয়ের একটি অংশ দলীয় তহবিলের জন্য সংগ্রহ করতনা। নিশ্চয়ই এই "অপরাধের" জন্য আওয়ামী লীগের নেতাদের বুর্জোয়া আখ্যা দেওয়া চলেনা।

এশিয়া-আফ্রিকার যে-কোন দেশে কৃষকেরাই সংখ্যায় বেশী, শ্রমিকেরা সংখ্যায় নগন্য। এখনও পর্যন্ত এশিয়ার কোন দেশ তো দূরের কথা, কম্যুনিস্ট দেশেও শ্রমিকদের হাতে দেশের বা দলের নেতৃত্ব নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু রাজনীতিক নেতা নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে দাবি করে থাকেন. চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করায় ওই দেশে সামরিক বাহিনী এখন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে দাবি করছেন। কিন্তু নিজেদের দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য উপরোক্ত দেশগুলির কোথাও শ্রমিকদের প্রতিনিধি বা নেতা নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় নি। এখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এশিয়া-আফ্রিকা বা ল্যাতিন আমেরিকায় কোন আন্দোলন বা সংগ্রাম দেখা যায়নি।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিচালিত হওয়া উচিত, তাহলে মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশের সংগ্রামের সব শ্রমিক একতাবদ্ধ হবে না। কারণ বাংলাদেশে কোন কোন এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে উর্দু ভাষীরা সংখ্যায় বেশী। সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে উর্দুভাষী মুসলমানেরা বাঙালীদের সম-দৃষ্টিতে দেখে না। ওদের চিন্তা ভাবনা একটু পরিমাণে ধর্ম-ভিত্তিক হাওয়ায় বাঙালীদের সংস্কৃতিকে তারা 'কাফের' বা হিন্দুদের সংস্কৃতি বলে মনে করে। পশ্চিমবঙ্গের টিটাগড় এলাকায় চটকলের উর্দু-ভাষী সিটুর শ্রমিকেরা তাদের বাড়ির লোকজনকে কীভাবে রাখেন, শ্রীদাশগুপ্ত একটু খোঁজ নিলেই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। যেহেতু উর্দু-ভাষী শ্রমিকেরা বাংলাদেশে ভাষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সংখ্যায় নগণ্য, সব সময়ে তাই তারা নিজেদের বাঙালীদের থেকে পৃথক করে রাখে। তারা বাঙালীদের থেকে যত বেশী আলাদা করে রাখবে,

অনেক বেশী পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকদের নিকট থেকে সুবিধা পাবে। সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকদের চেয়েও তারা বেশী সাম্প্রদায়িক থাকতে চায়। বাংলাদেশের মত ঘটনা আলজেরিয়াতেও ঘটেছিল। বিদ্রোহের আগে আলজেরিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টি ও কম্যুনিস্ট-পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন জি-জি-টি তে ইউরোপীয়ান ও আলজেরিয়ান মুসলমান ছিল। দুটি সংগঠনেই আলজেরিয়ান ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। বিদ্রোহ আরম্ভ হলে কম্যুনিস্টদের সদস্য সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। হেনরি আলেসের মতো মাত্র কয়েকজন ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট সংগ্রামের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিল, তারা তাদের ফরাসী সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। বেলকোবট ও বাব-এল-আওদে অনেক বেশী সংখ্যায় কম্যুনিস্ট বাত্তাবাত্তি ফরাসী কলোনিয়ালদের সমর্থক বনে যায়। ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিও সুস্পষ্টভাবে আলজেরিয়ানদের দাবি সমর্থন করে না। অপর দিকে ওঁরা ও আলজিযার্সে আলজেরিয়ান শ্রমিকদেরই সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট বিরোধী আই-সি-এফ-টি-উ-এর শাখা আগটা (UGTA) বিদ্রোহে পুরোপুরি সামিল হয় এবং কয়েকমাসের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিল এবং পরে টিউনিস থেকে 'আগটা' মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপারে আলজেরিয়া ও ফ্রান্সে কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। (the Algerian problem by Edward Behr. P. 227-33) পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা গিয়েছে গরীব শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরাই ধনী-শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশী বর্ণ-বিদ্বেষী। কারণ যোগ্যতা না থাকলেও ওই বর্ণ-বিদ্বেষের জোরেই সে অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করতে পারে। এইসব কারণে বাংলাদেশের ভিন্নভাষী শ্রমিকদের সামগ্রিকভাবে এক ধরনের স্বার্থ থাকতে পারে না। তাছাড়া, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের কথায় যেখানে সমাজের সর্বস্তরের লোক, এমনকি গরীব চাষী, খেতমজুর এই সংগ্রামে সামিল হয়েছে, সেই সংগ্রামকে সমাজের ক্ষুদ্র একটি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে নিয়ে যেতে হবে কেন? এই ধরনের চিন্তা কী গণতন্ত্র বিরোধী নয়? যে দেশে শ্রমিকেরা সংখ্যায় কর্মক্ষম ব্যক্তিদের অর্ধেকেরও বেশী, সে দেশে না হয় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের কথা উঠতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে শ্রমিকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য। উদার-নৈতিক রাজনীতিকদের হাতে সংগ্রামের নেতৃত্ব থাকলেও স্বাধীনতার পর

যে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচী কার্যকর করা যায়, আলজেরিয়ার ইতিহাসই তার প্রমাণ।

শ্রীদাশগুপ্ত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী করার কথা বলেছেন। ভারতে ইতিমধ্যেই ৮০ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। কলেরা ও অন্যান্য অপুষ্টিজনিত রোগে কয়েক হাজার শিশু, বৃদ্ধ ও অন্য বয়সের শরণার্থী ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে কয়েক লক্ষ লোকের অকালে মৃত্যু হতে পারে। তাছাড়া, এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর ভার বইতে হলে ভারতের অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী বাতিল করতে হবে এবং দরিদ্র ভারতবাসীদেরও কেবল শরণার্থীদের জন্যও অনেক বেশী কর দিতে হবে। শ্রীদাশগুপ্ত এসব কথা মনে রেখেও সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইলে বুঝতে হবে, তিনি মুখে দাবি করলেও আসলে সাধারণ মানুষের প্রকৃত বন্ধু নন। আর সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব যাওয়ার বদলে সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ১৯৪৮ সাল থেকে বার্মার কম্যুনিস্ট-বিদ্রোহ চললেও, শ্রমিক এলাকাতে ওই বিদ্রোহ প্রসার লাভ করেনি, কম্যুনিস্ট-বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং কম্যুনিস্ট-হত্যাকারী জেনারেল নে-উইনকে সম্প্রতি পিকিং আমন্ত্রণ করে চৌ-এন-লাই তাঁর যথেষ্ট সমাদর করেছেন।

"পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচারী নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।" কিন্তু তারপরেই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন, "কেন্দ্র বলতে কোন জাতিকে বোঝায় না—কেন্দ্র হচ্ছে শাসক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা।" বাংলাদেশের শোষণ ও বঞ্চনার ফলভোগী কেবল শাসক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ। ভারত-শোষণের ফল যেমন ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণী একদা ভোগ করেছে, তেমনি পূর্ববংলাকে শোষণ ও বঞ্চনার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে নূতন নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষির উন্নতি হয়েছে, সরকারী ও বেসরকারী মালিকানায় যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরাও কাজ পেয়েছে, বেলুচিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশের গ্রাম্য-যুবকেরা সেনাবাহিনীতে ঢুকতে পেরে বেকার-জীবনের অভিশাপ এড়াতে পেরেছে, যে-পথ বাংলাদেশের যুবকদের সামনে খোলা ছিল না। করাচী, পিণ্ডি ও ইসলামাবাদে তিনটি রাজধানী শহরের জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করা

হয়েছে, তা আর হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই হাতে গিয়েছে। বাংলা-দেশের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি করে পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ধনী হয়েছে। বাংলাদেশের সংগৃহীত সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনের কাজে লেগেছে। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা আর্থিক কারণে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পিছনে ছিল, এখনও ইয়াহিয়ার শাসনের পিছনে আছে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের সমর্থনের ভিত্তি যত দুর্বল হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন, আসলে ভিত্তি তত দুর্বল নয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের নিন্দা করে, বাংলাদেশকে শোষণের ফলভোগকারী পশ্চিম পাকিস্তানীদের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের থেকে পৃথক করে দেখিয়ে শ্রীদাশগুপ্ত আসলে এদেশের সাম্প্রদায়িক ও ইয়াহিয়া সমর্থক মুসলিমদের (এদের মধ্যে আবার উর্দু-ভাষী শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক) সমর্থন করতে চান! শ্রীদাশগুপ্তের এই উদ্দেশ্য কতটা সফল হবে, আগামী নির্বাচন দেখলেই তা বোঝা যাবে। বাংলাদেশের মাতা একটা ঘটনা যেখানে সাম্প্রদায়িক মনো-ভাবকে মুছে ফেলার কাজে লাগানো যেতো, শ্রীদাশগুপ্ত তা উল্টো ব্যাপারেই ব্যবহার করলেন। *

---

*মতামতের জন্য যুগ্ম সম্পাদক দায়ী নন।
এ বিষয়ে পাঠক পাঠিকাদেরও মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

নারী ও স্ত্রী

বেলা দে

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এবং সকল ধর্মেই অবিবাহিত ও বিবাহিত এবং বিধবা মেয়েদের মধ্যে আচরণ, আভরণগত কয়েকটী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে অন্যান্য দেশ এবং ধর্মের কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বাংলা দেশের বিবাহিতা হিন্দু মেয়েদের সম্পর্কে দু'চার কথা বলছি।

আমরা সঠিকভাবে জানিনা কোন্ অনাদিকাল থেকে কি কারণে পতিব্রতা হিন্দুনারী সধবার চিহ্ন স্বরূপ সিঁথিতে এবং ললাটে সিঁন্দুর এবং হাতে শাঁখা আর বাঁ হাতে লোহা ধারণ করলেন।

কেউ কেউ বলেন সিঁথেয় সিঁন্দুর পরার প্রথাটী বহু প্রাচীন এবং তখনকার সময়ে স্বামী যুদ্ধে বা কোন কাজে বাইরে যাবার সময় স্ত্রীর সীমান্তে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে রক্তচিহ্ন এঁকে দিয়ে যেতেন এবং পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিতেন যাতে স্ত্রী বাইরের মুখ না দেখতে পান। এতে করে মনে হয় প্রথাটী অনার্য্যদের মধ্যে থেকে এসেছে।

তবে শাঁখা পরার প্রচলনটী প্রথমে দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে ছিল। ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে শাঁখার ব্যবহার চলতে থাকে। হাতে শাঁখা পরে মানুষ বুঝলো হাতের শ্রীবর্দ্ধন করবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এই শাঁখার। তাই নতুন নতুন নকসা এসে শাঁখার সৌন্দর্য্য বাড়ালো। বহুমূল্য দিয়ে তখনকার লোকেরা শাঁখা কিনত। শাঁখের শুভ্র সৌন্দর্য্যের এমনি মোহ ছিল। ঢাকার বিখ্যাত শাঁখার কথাও সকলেই জানেন।

যাই হোক্ বাংলাদেশের বিবাহিত হিন্দুনারীর বৈশিষ্ট্যময় কোনো কোনো চিহ্নগুলি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মেয়েরাও ব্যবহার করছেন দেখে আনন্দ হয়। কাজেই এই চিহ্নাবলীর প্রাচীন ইতিহাস যাই থাক না কেন সিঁন্দুরের উজ্জ্বল লালিমা এবং শুভ্র শাঁখার পবিত্র শুভ্রতা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক আভরণ হিসেবে-ও কিছু কম স্থান পায় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক কালে হীরা জহরতে মুড়ে, সারা অঙ্গে রূপসজ্জার নিখুঁত ছবিটী তৈরী করে আধুনিকা বধুটি ভুলে

গেলেন সীমন্তে সিঁদুর আর ললাটে সিঁদুরের টিপ্‌টি পরতে—এমনি একটি পরিবারে নিমন্ত্রণে গিয়ে আমার এক বান্ধবী খুব অপ্রস্তুতে পড়েছিলেন এক প্রবীনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। বান্ধবী বেশ পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিলেন 'স্বামী তো আমাদের আজকাল বন্ধুর পর্য্যায়ে পড়েছেন অতএব তাঁর প্রভুত্ব স্বীকৃতিস্বরূপ লোহা, শাখা অথবা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে বাহ্য আভরণ ধারণ করে নিজের ব্যক্তিত্ব বা স্বকীয়তা বিসর্জ্জন দিতে আমরা বাধ্য নই।' আমি অবশ্য এর কোনো প্রতিবাদ করিনি—প্রাচীনার সঙ্গে অন্য কথায় এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে বাধ্য হোলাম।

কিন্তু মনে হয় মিথ্যা ভাবপ্রবণতাই হোক আর কঠোর শাস্ত্রাচারই হোক বিবাহিতা তথা প্রেমিকা নারি যদি তাদের মানসিক ভারসাম্য রক্ষাকর্ত্তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ যে কোন একটি বৈশিষ্টকে তাঁর আভরণের অঙ্গ বলে ধরে নেন, তবে তাতে শোভন ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পরিচয়ই দেওয়া হবে।

যুগটা যখন ফ্যাসানের তখন ফ্যাসান নিশ্চয়ই করবেন কিন্তু নিজ নিজ সমাজের বৈশিষ্ট বজায় রেখে চলতে পারলে সকলের কাছে সম্মানের আসন লাভ করা যায়।

দুটী ছবি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখুন—একখানি ছবি আমাদের সেই চিরাচরিত সীমন্তে সিন্দুর; ললাটে সিন্দুরের টিপ, লালপাড় শাড়ী, হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা যেন লক্ষীর প্রতিমা—আর ঠিক তারই পাশে রুক্ষ চেহারা মাথায় বাবুই পাখীর বাসা খোঁপা, ঠোঁটে লাল রং, মুখে একরাশ পাউডার, বড় বড় নখে লাল রং, পিঠকাটা ব্লাউজ আর খুব দামী শাড়ী অথবা স্কার্ট জাতীয় কিছু—আপনার দৃষ্টি নিশ্চয়ই শাখা সিন্দুর আলতা পরা মেয়েটির দিকেই পড়বে তাই না? পরিবর্ত্তনশীল জগতে যেমন সবকিছুরই পরিবর্ত্তন দ্রুতগতিতে চলছে—সাজসজ্জার ব্যাপারেও তাই—তবে বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ কোমল মূর্তিটী কল্পনায় রেখে যদি আমরা সাজ-সজ্জা করি তাহলে অতি আধুনিক রুচিজ্ঞান শূন্য বলে যে দুর্নাম আমরা দিনের পর দিন অর্জন করে চলেছি তা থেকে নিশ্চয়ই মুক্তি পাব।

পুজোর কাজ

পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান বছরে এখনও পর্যন্ত আমরা ধাবনাই করতে পারছিনা পূজোটা কেমন কাটবে। কিংবা পূজোটা কেমন হবে? এবং আদৌ আমরা তা উপভোগ করতে পারব কি না। এক একটা পাড়াতে পূজো হবে কি না তাও একটা চিন্তার কথা। তাই সম্পাদক মহাশয়ের চিঠিটা পেয়ে ভাবছিলাম—ঘর সাজাবার কথা কি বলব। সে উৎসাহ উদ্দীপনা যেন আর নেই। আপনার যা আছে তাই থাক শুধু নতুন করে দুটো ফুল-দানি ও অন্তত: পক্ষে একটি এ্যাশট্রে রাখুন।

হিমা গোলাপ জাম একরকমের কৌটো দিচ্ছে দেখেছেন নিশ্চয়। তার গায়ে 'আই ব্রাও' পেনসিল দিয়ে ইচ্ছে মত অাঁকুন। ফেব্রিক রঙ দিয়ে মিডিয়াম না মিশিয়ে ঘন করে রঙ মিলিয়ে বুলিয়ে যান। একটু সাবধানে করবেন। রঙ্ যেন গড়িয়ে না পড়ে কারণ গা টা খুব তেলা। শুকিয়ে গেলে সাইড টেবিলে রেখে তাতে টাটকা ফুল রাখুন। রোজ যদি ফুল আনতে না পারেন—সুন্দর প্লাষ্টিক ফুল এনে সাজিয়ে দিন। এমন ভাবে ফুল দেবেন যাতে কৌটার গায়ের কাজটা বোঝা যায় অথবা নিউ মার্কেটে ভাল বেতফুল, ঝাউফুল, হোগলা ফুল পাওয়া যায়। ময়লা হলে ধোয়া যায়। তাই কিছু এনে রাখুন না।

মিনি বল আইস্‌ক্রিম অথবা পাবলে অবেঞ্জ বলের যে কৌটোগুলো আছে তার গায়ে বেশ একটু কায়দা করা মানুষের মুখ এঁকে রঙ দিন। অনেকটা 'মিকি মাউজো'র টাইপে হবে। অথবা আপনার পছন্দ মত অন্য যে কোন ডিজাইন এঁকে কৌটার মতন করেই রঙ্ দিন। বলের মুখের ওপরে যে ঢাকা আছে তাকে খুলে দিন। তাহলে সেখানে ছাই ফেলা যাবে।

অনেকে আবার মুখ বড় একটি শিশির ওপর একে মোম বা গালা দিয়ে এঁটে বসিয়ে, কাপড় পরিয়ে, মুখ এঁকে পুতুলও তৈরী করেন। তার থেকে এ্যাশট্রে অবশ্য সোজা ও কাজের।

এবার কিছু রান্নার কথা বলি। বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে সবাই এক দিনে আপনার বাড়ী আসবেন না। সুতরাং আপনিও একদিনেই সব খাবার করবেন না। কিছু "চীনা ঘাস" কিনে রাখুন। অতিথিকে বসিয়ে রেখে দোকানে না গিয়ে অথবা দোকানে যাবার খুবই অসুবিধা লোক নেই, তখন যতজন লোক তার ডবল হাতা দুধ একটু চিনি দিয়ে ঘন করে নিন। দুধ ফোটাকালীন কিছু "চীনা ঘাস" দিয়ে নাড়তে থাকুন। ঘন হলে ছোট অথচ ছড়ানো পাত্রে ঢেলে দিন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে টুকরো টুকরো করে কাটুন। যদি একটু ভ্যানিলা বা গোলাপজল ড্রিংকিং চকোলেটের গুঁড়ো নামাবার আগে ছড়িয়ে দিতে পারেন তবে উপাদেয় লাগবে। চীনা ঘাস দামেসস্তা অথচ খুব ভাল খাবার হয়। যাঁদের ফ্রিজ আছে তাঁরা সহজেই জমিয়ে নিতে পারবেন। ছয় সাত জনের মত খাবার করতে ছোট এক প্যাকেট ঘাস ব্যবহার করতে পারবেন। দুধের জন্য পরাগ অথবা 'আমুল' ঘরে রাখতে পারেন ভাল করে গুলে জাল দিয়ে নিলেই কাজ হবে।

ধরুন প্রথম দিন আপনি নোনতা খাবার হিসাবে ঘুগনী করেছেন। দ্বিতীয় দিনে খুব চিন্তায় পড়লেন কি করবেন। তখন মিষ্টির সঙ্গে একটু আলু কাবাব দিন না। আলুগুলোকে ভেজে তুলে তেলে প্রথম পেঁয়াজ ভাজুন। তারপর একসংঙ্গে আলুপেঁয়াজ দিয়ে একটু বেশী পরিমাণে লঙ্কা, আদা, রসুন, ধনে জীরে ও হলুদ বাটা দিন। প্রয়োজন মত লবণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। যখন বেশ ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন জল দেবেন। জল যেন বেশী না হয়। একদম গায়ে মাখা শুকনো ঝোল থাকবে। তখন আবার কড়াতে খুব মিহি করে কুচোনো পেঁয়াজ ঘি দিয়ে লাল করে ভেজে তাতে আলু ছেড়ে দেবেন। একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন। নামাবার আগে একটু টম্যাটোর সস ছড়িয়ে নেড়ে নিতে পারেন। সব সময় জলের দিকে নজর রাখবেন। আর এতে একটু তেল ঘি বেশী লাগে। মাছ বা মাংসের চপ করতে গেলে যেমন ভাবে পুর করা হয়, ডিম দিয়ে সেই রকম পুর করে নিন। একটু বেসন ও ডিম গোলা রাখুন। এবার ছুটো সাইজ করা পাউরুটি নিয়ে একটার ওপর পুর দিয়ে ওপরে আর একটা পাউরুটি দিয়ে গোলাটায় ডুবিয়ে নিয়ে ডুবন্ত তেলে অর্থাৎ ঘি-তে ভাজুন।

বড় বড় পাউরুটির চপ হবে। পুর খুব কম দেবেন, যেন ছুটো রুটি মিশে থাকে।

দুধ চিনি ও নারকোল একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে নাড়ু অথবা বরফি করলে তার স্বাদ বেশী বাড়ে। এ জাতীয় খাবার বাচ্চাদের জন্য করা চলে তবে বেশী দিন ঘরে রাখা চলে না।

আশাকরি ছন্দিতার পাঠিকারা এবারের পূজোয় এগুলো পরীক্ষা করবেন। পাঠকরা বাড়ীতে তাড়া দেবেন রান্নাগুলো করার জন্য। আসন্ন পূজো সবারই ভাল কাটুক এই কামনা জানিয়ে এবারকার মত লেখা শেষ করলাম।

গল্প

বিজন বেদনাতে

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

চাকর বাকর, আত্মীয় স্বজন সব নিয়ে রীতিমত জমজমাট সংসার। নীলুর জীবন, যাকে বলে, রূপোর চামচ মুখে দিয়েই শুরু। কোথাও কোন বেদনা নেই। বিষণ্ণতা নেই।

অভাব শব্দটা নীলুদের সংসারের সীমানা থেকে কবে যেন ঘাড়ধাক্কা খেয়েই বিদায় নিয়েছে। প্রথম কথা বলতে শিখেই নীলু তাই যে অক্ষরটার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছিল সেটার নাম সু।

সু·········সু মানে সুখ।

নীলুকে দেখাশোনা করার জন্য সর্বক্ষণ একটা বাচ্চা চাকর নিযুক্ত ছিল। তারপর অন্যান্য বিষয়ের জন্য বাড়ীভর্তি চাকর চাকরানী তো ছিলই।

নীলুর বাবা বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরীর এক্সপোর্ট ইমপোর্টের বিরাট ব্যবসা। টাকার পাহাড় উঠেছে ক্রমাগত আকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে। পাড়া প্রতিবেশীরা তারিফ করেন তাই বিনয়েন্দ্রবাবুকে। সব ব্যাপারেই তার নাম ডাক। দুর্গাপূজার প্রেসিডেন্ট তিনি। জলসার প্রধান অতিথি। কর্পোরেশনের কাউনসিলর। এমনকি এম. এল. এ. করতেও পাড়ার লোকেরা বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরীকেই চায়।·········বিনয়েন্দ্রবাবুর আপত্তি। না হলে সারা দেশের তকতে তাউসের তিনিইতো একমাত্র সুযোগ্য সুলতান।

বিনয়েন্দ্রবাবুর বেশি বয়সের সন্তান হলো নীলু। প্রথমে একমেয়ে অজেয়া। তারপর অনেক দিন বিনয়েন্দ্রবাবু সন্তানসন্ততীর মুখ দেখেন নি। পয়তাল্লিশ বছরে জন্মালো নীলু। ডাক নাম ঐ। পোষাকী নাম নীলয়েন্দ্র। শখ করে মিলিয়ে রেখেছেন বিনয়েন্দ্রবাবুই। এমনই শোনা যায়।

নীলু বেড়ে উঠতে লাগলো ঐশ্বর্য্যের দুলাল হয়ে। ব্যথা নেই। কষ্ট নেই। শুধু সুখ, সুধা বর্ষণ করতেই দেখলো সে তার ভাগ্যাকাশ জুড়ে। কথা বলতে শিখেই পেলো কাছে পিঠে অসংখ্য সঙ্গীসাথীর অজস্র কল কাকলী। পেল খাবার দাবার। হাতের কাছে অসংখ্য খেলনা।

সামান্য আঘাতেই দেখলো নিরাময়ের জন্য ছুটে আসছে হন্তদন্ত হয়ে একটা বিরাট দুনিয়া। বিপুল সংসার। অসংখ্য লোকজন। রঙ বেরঙের খেলনা। প্রতিটি বায়না ও আবদার রক্ষা করতে সবাইর কেমন তটস্থ ভাব।

হাঁটতে শিখে বেড়াতে যেতে লাগলো হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ানের হাত ধরে। পরিশ্রান্ত হতে না হতেই চড়তে পেল তার কাঁধে। ক্ষিধে পেতে না পেতেই খেতে পেল ক্রিমক্রেকার, ফ্রাই। পেল আঙুর, বেদানা, আপেল। তারপর সন্দেশ।

বর্ণপরিচয় হলো ভাটপাড়ার নামি পণ্ডিতের কাছে হাতেখড়ির পর। কিন্তু পড়তে গেল ডনবস্কোর কিণ্ডারগার্টেনে। বিরাট বাস এসে দাঁড়াতো বাড়ীর সামনের রাস্তাটাতে। পাল্লা খুলে দাঁড়াতো স্কুলের দ্বারোয়ান। সুটকেশ হাতে অপেক্ষমান নীলু ছুট্টে যেতো গাড়ীর কাছে। তারপর হাসতে হাসতে হাতনেড়ে বাড়ীর বাচ্চা চাকর সুবলকে বলতো টা টা, বাই বাই। ডিজেল স্মোক ছড়িয়ে বাসটা অদৃশ্য হয়ে যেতো ১৮৬ নম্বর যোধপুর পার্কের বিরাট কোলাপসিব্‌ল গেটটার পাশ থেকে। বাড়ীতে আসতো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিস।............

তারপর হাইস্কুলে ভর্তি হলো নীলু। সেণ্ট টমাস হাইস্কুলে। এখানে আসাযাওয়া চলতো বাড়ীর ছোট্ট ফিয়েট গাড়ীটাতে কখনো হেরাল্ডেও আসতো। বড় রোলসরয়েসে বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরী যেতেন লায়ন্স এক্সচেঞ্জের অফিসে। মাঝে মাঝে যেতেন আবার বেহালা বীরেন রায় রোডের ফ্যাক্টরিতে। নীলুর স্কুলের সব বড়লোকেদের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। কারো বাবা আছেন মেটালবক্সের চীফ ইঞ্জিনিয়ার। কারো ড্যাডী পোর্টের ডক্‌ম্যানেজার। কারো পাপ্পা গেষ্টকীন কিংবা ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন ঐ জাতীয় কোন আগরওয়ালা গোছের সওদাগরি প্রতিষ্ঠানের পার্সোনাল ম্যানেজার কী চীফ সেক্রেটারী। কিন্তু নীলুর বাবা সব কিছুরই উপরে। বাঙালীদের মধ্যে একজন বিগ বিজনেস ম্যাগনেট। সর্বক্ষণ ফোন আর ট্রাঙ্ককলে কথাবার্তা। ভি. আই. পিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। প্রাইমিনিষ্টারের সঙ্গে দহরম মহরম। ডিনার লাঞ্চ খান রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে একত্রে বসে।

তার মা-ও রীতিমত স্বনামধন্যা মহিলা। এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের সব অনুষ্ঠানেরই লালফিতে কেটে উদ্বোধন করেন তিনি। খবরের কাগজে তার ভাষণরতা ছবি ছাপা হয়। মহিলাসংসদের সাধারণ সম্পাদিকা।

আর নীলুর দিদি অজেয়ার নাম কেনা জানে? ফেমিনার বিউটি কনটেষ্টে ফার্ষ্ট হয়েছে সে। রাইফেল স্যুটিং-এ অব্যর্থ লক্ষ্য তার সব পূর্ববর্ত্তী রেকর্ডকে নষ্ট করেছে। এণ্ডারসন ক্লাবের প্রতিবছরের সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ তারই লভ্য। কেনা জানে ডকটর বীরেন মল্লিকের বিশেষ তত্ত্বাবধানে সে আগামী অটামেই চ্যানেল সাঁতারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে?

নীলুও এরই মধ্যে বেশ নাম ডাক করেছে। উয়াই, এম, সি-এর বিলিয়ার্ড বোর্ডের সেই পয়লানম্বরের স্ট্রোকার। পরপর দু'বছর বেঙ্গল জুনিয়ার লীগ চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিসে। তারপর জুনিয়ার ষ্টেটসম্যানের রেগুলার ফিচার রাইটার। এবারে টেক্‌নিক্যাল গ্রুপে হায়ার সেকেণ্ডারী দেবে। নীলয়েন্দ্র রায় চৌধুরীকেও অনেকে চেনে।

মোটেরউপর যোধপুর পার্কের এই চৌধুরী ফ্যামিলিকে চেনেনা এমন লোক নেই। এমন একটা বিত্তশীল পরিবার যাকে বলে এক কথায় রীচ ফ্যামিলি তার সংখ্যা যোধপুর পার্কেও কম আছে।

নীলুদের এই ঐশ্বর্যের সাম্রাজ্যের পাশেই অথচ পোদ্দার পার্ক। যা'হাতে ক'য়েকগজ হেঁটে গেলেই আরেকটা পৃথিবী। এখানে প্রতিদিন প্রয়োজন আর সামর্থের সঙ্গে চলেছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দড়ি টানাটানির মতন শক্ত খেলাটা। ওপাশের ঐ পৃথিবীর মানুষগুলোর অধিকাংশের একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনের ময়লা চীরাবাস, চোখের গহ্বরে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত হতাশা। —এই পরিবেশ পেটানো মানুষগুলোকে নীলয়েন্দ্র দেখে দূর থেকে। কী অদ্ভূত দীনতা ওদের ঐ দু'চোখে? ভাগ্যের সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে কী অসাধারণ আপোষ! ঐ মানুষগুলোকে দেখে আর করুণা করে নীলয়েন্দ্র।

ঐ যে ওর সমান একটা ছেলে পোদ্দার পার্কে অল্প ভাড়ার কোন একটা কোয়াটারে থাকে যেন, প্রতিদিন একগাদা মানুষের ভিড় ঠেলে ব্যাগ, টি, স্লাইডরুল ইত্যাদি হাতে ন'নম্বরে যাদবপুরে পড়তে যায়! গাড়ী করে স্কুলে যাবার সময় ওকে দেখেছে নীলয়েন্দ্র। ওদের গাড়ীটা পাশের কোন পেট্রোল পাম্প থেকে তিন লিটার তেল নেবার সময় ঐ ছেলেটা ফিরছে হাঁটতে হাঁটতে চীনাবাদাম চিবুতে চিবুতে হয়তো হেঁটে এসে

বাসের ভাড়াটা বাঁচিয়েছে। এসব কথা নীলয়েন্দ্র ভাবে। হয়তো বা ভাবে না।

কেবল ভাবে, পোদ্দার পার্কের ঐ জীবনগুলিতে কোনদিন ভাগ্যাকাশ থেকে সুধাবৃষ্টি হয়না।

সেদিন সকালবেলা নেটপ্র্যাক্টিসে বেরুতে গিয়ে দেখলো পুলিশভ্যান পোদ্দার পার্কের দিকে এগুচ্ছে। পাশের পানবিড়ির দোকানের সন্তোষ জানালো, ঐ যে যাদবপুরে পড়ে কুন্তল বলে ছেলেটা—ওকেই ধরতে এসেছে। ওর নামে যাদবপুর থানায়তো অনেক ডাইরী। এবারে নাকি ছিনতাইর কেস!

—ইমবেসাইল। ডারটি হ্যাগ! মুহূর্তে উচ্চারণ করে সামনের দিকে এগুলো নীলয়েন্দ্র।

তুলনা করলো এদিক থেকে ওদের জীবনটা অনেক পরিচ্ছন্ন। অনেক পারফেক্ট। অনেক ব্লেসেড।

প্রতিদিন একটা না একটা ঘটনা লেগেই আছে পোদ্দার পার্কের এই সীমান্তে।

অজেয়াকে বলছিল ওদের বাড়ীর রাধুনী কমলা আঠাশ নম্বর কোয়াটারের ঐ বীনা বলে মেয়েটার কথা। ঐ যে অত দেমাক, পৃথিবীটাকে লাথি মেরে এগোয়। যাদবপুরে এম. এ. পড়ে। বি. এ. তে নাকি ফার্স্ট হয়েছে। পোদ্দার পার্কের পঙ্কে জন্মেছে পঙ্কজিনী?.........মেয়েটা একটা বজ্জাতের হাড়ি। আমাদের দাদাবাবুকে একদিন পা থেকে চটি খুলে দেখিয়েছে। অথচ ঘুরিসভো দেখি একটা হা-ঘরে হা-ভাতের সঙ্গে। কোয়াপারিটিভের কেরানিবাবু যদু ঘোষের ছেলের সঙ্গে। মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে দু'পয়সার চানা চিবুতে চিবুতে সেকি প্রেম, তুমি যদি একবার দেখ দিদিমনী?...........

সত্যিইতো কোথায় পাবে এর বেশি বীনারা? বীনার বাবাতো পুরানো দিনের গ্রাজুয়েট হয়েও যাদবপুর বিবেকনগর না কোথাকার একটা প্রাইভেট স্কুলের মাষ্টার। একজন সরকারী অফিসের কেরানি আত্মীয় এখানকার কোয়াটার ছেড়ে চলে যাবার সময় বসিয়ে দিয়ে গেছে। তাইতো আছে সস্তার ভাড়াতে।

জীবনসংগ্রামে পোদ্দার পার্কের মানুষগুলো যেন বড় বেশি আহত। বড় বেশি জর্জরিত। জীবিকার সমুদ্রমন্থনে ওদের উঠেছে শুধুই হলাহল।

পোদ্দার পার্কের এই জীবনযাত্রাকে তাই সুধাসঙ্গী যোধপুর পার্কের অমৃতের পুত্ররা বড় বেশি করুণা করে হয়তো। হয়তো ভাবে ওদের জীবনে ওরা পরাজিত সৈনিক। রক্তাক্ত তিরন্দাজ।

·········একদিন মারতে মারতে শান্তিরক্ষী ক্যালকাটা পুলিশ পোদ্দার পার্কের কোয়াটার ভেঙ্গে দস্যুর মতন নিয়ে গেল সুশান্ত হালদারকে। ছেলেটা জমাতে স্কাউণ্ড্রী ডিভিসনে কাজ করে! শালা, নক্সালবাড়ী!······

এসব কোন উৎপাত নেই যোধপুর পার্কের জীবনযাত্রায়। এখানে বিয়ে বাড়ীতে উৎসবে নীয়ন জ্বলে, বড় বড় গাড়ী, দামী শাড়ী পরা মোটাসোটা সফিসটিকেটেড মেয়েরা ভিড় জমায়। সানাই বাজে। ললিতের সুরে মুখর করে বাতাস। এ পাড়ায় বসন্ত যেন কোনদিনও শেষ হবার নয়।

নীলয়েন্দ্র চারটি টিউটরের সকাল বিকাল তত্ত্বাবধানের ফলে ফার্ষ্ট ডিভিসনেই টেকনিক্যাল গ্রুপে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলো। বিনয়েন্দ্র চৌধুরী ওকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থাও পাকা করতে থাকলেন ইতিমধ্যে। মেডিটেরিনিয়ানের বাতাস এসে মাতাল করতে থাকলো নীলয়েন্দ্রের মন। চেয়ারিং ক্রশ, প্যাডিংটন, মুখর লণ্ডন, চেলসী ও পাটনী......মধ্যদিনের গান......

নীলুকে নিয়ে মেতে উঠলো ওয়াই. এম. সি.-এর জগত। যোধপুর পার্কের দ্বারের ময়নারা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সব ব্যবস্থা পাকা পাকি করে বাড়ী ফিরলেন বিনয়েন্দ্র চৌধুরী।

রোলসরয়েস এসে থামলো ১৮৬ নম্বর বাড়ীর সামনে। গাড়ী থেকে নামতে যেয়ে মাথাটা ঘুরে গেল বিনয়েন্দ্রবাবুর। ছুটে এলো দাস দাসীরা। ধরাধরি করে শোয়ালে ঘরে। ফোন করতেই ডকক্টর সিয়েন ছুটে এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, কেস সিরিয়াস। সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্। পি. জি. তে রিমুভ করতে হবে।

হাসপাতালেই পাঠানো হলো বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরীকে। সেখানে দু'দিন চল্‌লো ভারতবর্ষের সব নামকরা ডাক্তারের প্রচেষ্টার সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যুর লড়াই। অবশেষে মৃত্যুই জয়ী হলো। নীলয়েন্দ্রকে যথাযোগ্য সান্ত্বনা দিলেন তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীরা। নীলুও খুব একটা দুঃখের কারণ দেখলনা। এক শুধু তার বিলেত যাওয়াটা সাময়িক বন্ধ রইল। কিন্তু হেড অফ দি ফ্যামিলি চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদের সংসার, বিশেষ করে পাশেই ঐ পোদ্দার পার্কে যে ইন্দ্রপতনের মতন দুঃখজনক ঘটনাঘটে তেমন কিছুই ঘটলো না নীলয়েন্দ্রের জীবনে।

কয়েকদিনের মধ্যেই লায়ন্স একস্‌চেঞ্জের অফিসে যেতে শুরু করলো নীলয়েন্দ্র। ফাইলপত্তর বুঝতে লাগলো পি. এ. টি. কে. ঘোষের কাছ থেকে।

অফিসের করণিক করণিকারা নোতুন মনিব দেখলো। দেখলো দপ্তরি বেয়ারারা।

কতইবা বয়স? হয়তো বিশ কী বাইশ! একেই বলে ভাগ্য? টাইপিষ্ট অমিতা শিকদার বল্‌লে ষ্টেনোগ্রাফার রঞ্জন মিত্রকে অফিস ছুটির পর পাঁচটা পঁয়তাল্লিসের সময়ে ডালহাউসীর পথ হাঁটতে হাঁটতে।

—ঈর্ষা হচ্ছে বুঝি?

—তাতো হবারই কথা।

অমিতার দাদা অমন যে ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেণ্ট প্রফুল্লরঞ্জন শিকদার এম. কম. পরীক্ষাতে সেকেণ্ড ক্লাস হয়েও অ জ এই ছ'বছরের মধ্যে একটা স্কুল মাষ্টারিও পায়নি। আর? আর? ....

—কথা বলছো না কেন অমিতা?

কিইবা বলবার থাকে! দাদার দু'টো টিউশ'নি আর ওর এই টাইপিষ্টের চাকরির টাকায় সংসারের ফুঁটো পানসী যে আর কিছুতেই চলছেনা।

অমিতাকে ছ'নম্বরে গড়িয়ার বাসে তুলে দিয়ে রঞ্জন গ্রে-ষ্ট্রিটের ট্রাম ধরে। যাবে পার্টটাইম করতে।.........

লায়ন্স একস্‌চেঞ্জের এই তরুণ মনিবটি লোক ভালই। তবে বড্ডবেশি পরনির্ভর। সব সময় একে ওকে ডাকাডাকি করেন। ইনডিপেন্‌ডেণ্টলি কোন কাজই করতে পারেনা। আর সবসময় যেন কী ভাবেন? কেমন যেন উদাস।

অনেকেই দেখা করতে আসেন অফিসে। স্লিপ পাঠান। কাউকেই বিমুখ করে না নীলয়েন্দ্র। সকলের সঙ্গেই দেখা করে। মৌখিক আশ্বাস দেয়।...... .....স্লিপে প্রত্যেকেরই পারপাস লেখা থাকে। অবশ্য সাক্ষাতে অতিরিক্ত কথাও হয়।

সেদিন অফিসে পৌছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন ভিজিটর নেই। লাঞ্চের আর মাত্র মিনিট দশেক বাকি। বাড়ীর থেকে ব্রেকফাষ্ট মাত্র খেয়েই অফিসে আসে নীলু। গ্রেটইষ্টার্ণ কী ফিরপোতে খায় লাঞ্চ।...............

ঘড়িতে একটা বাজবে বাজবে।

ভিতরে স্লিপ বয়ে আনলো বেয়ারা। একটি একটি করে দু'টি। দু'জন লোক দেখা করতে চায়। পারপাস পার্সোনাল।

কি করবে? লাঞ্চের সময় হয়ে এলো। আর পনেরো মিনিট মাত্র সময় আছে। মনিবন্ধে ঘড়িতে সময় দেখে নীলয়েন্দ্র।

আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।

—জী হুজুর।

ঘরে এসে ঢুকলেন দু'জন ভদ্রলোক। একজন প্রৌঢ়; আরেকজন যুবক। দু'জনেই ফোলিও ব্যাগ খুলে বার করলে দু'খানা খাম।

একখানায় এই লায়ন্স একসচেঞ্জের এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্‌পোর্টের ব্যবসা সংক্রান্ত ডিড। প্রপ্রাইটরশিপ সংক্রান্ত বিষয়। এতদিন পূর্বপাকিস্থানে আটকা পড়েছিলেন প্রৌঢ় অতীন বসু। তারই টাকায় এই ব্যবসা। নীলুর বাবা বিনয়েন্দ্র চৌধুরী শুধু ওয়ার্কিং পার্টনার। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও লভ্যাংশ দেন নি তিনি অতীনবাবুকে। ভেবেছিলেন বিগত দাঙ্গায় বোধহয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। এমন কি খোঁজটুকুন পর্যন্ত করেন নি।

আরেকখানাই ভয়ানক।

তার বিলাসিনী দিদি অজেয়ার বিরুদ্ধে ব্রিচ অফ কনট্রাক্টের মামলার পিটিসনের নকল। এসেছেন তারই স্বামী অশোক মুখার্জি। যাকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাহাজের ডেকে দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে ডেক থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে অম্বুজের সঙ্গে ইণ্ডিয়াতে চলে এসেছিল তার দিদি। তিনিই এনেছেন এই দলিল। মরেন নি। মরেন নি তিনি।

লাঞ্চের টাইম পেরিয়ে যেতে দেখে ওরা ভদ্রতা দেখিয়ে উঠতে চাইলেন। পরে কথা হবে বলে ওরা সুইংডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

একমিনিট পর নীলয়েন্দ্রও বাইরে এলো।.........তখন অফিসের ষ্টাফেরা রিসেসের পর আবার একে একে যে যার টেবিলে ফিরছে।

নীলয়েন্দ্র, নীলু লিফ্‌টের দিকে না যেয়ে পাঁচ তলার সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নামতে থাকলো।

ও পড়ে যেতে চাইছে। এই অমৃতের স্বর্গ থেকে (?) ও স্বেচ্ছায় নীচে, অনেক নীচে পড়ে যেতে চাইছে।

কী এক বিজন বেদনাতে, সবাই শুনলো ওদের অফিসের তরুণ মণিব চীৎকার করে বলছে—**I pant, I sink, I tremble, I expire!**

জানালায়

রজত রায়চৌধুরী

জানালাটা খুলতেই ওপাশের জানালায় আর একখানি মুখ চোখে পড়ল।

ঘরটা অন্ধকার। তবু চিনতে অসুবিধে হল না। পর্দাটা একটুখানি ফাঁক করা। দুটো হাতে শিকদুটো ধরে সুমিতা রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

রাস্তার আলোগুলো সব নেভানো। এমন কি আশপাশের বাড়ীগুলোয় কোন মানুষ আছে বলেও বোধ হচ্ছেনা।

সীবালীর ঘরটাও অন্ধকার। যেন আলো জ্বালালেই বিপদ। আলো জ্বালালেই বিভীষিকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নাকে বারুদের গন্ধের মতন কিরকম একটা গন্ধ এসে লাগল। কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করল সীবালী। বিকেল থেকেই বুকটা কাঁপছে। থেকে থেকে চমকে উঠছে সে।

ওপাশের জানালায় যে বসেছিল, সে রাস্তা থেকে এবার মুখ ফেরাল।

—সীতেশদা ফিরেছে কি ?

—না। বাতাসে কিরকম বারুদের গন্ধ দেখছ ?

—কি হবে বৌদি ?

—কিসের ?

—এই ভাবে আর কতদিন চলবে ?

—আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।

—আমারও।

বিকেল থেকেই বোমা ফাটার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এমন পাওয়া যায়। তবে আজকের মতন এমন প্রচণ্ড নয়; অনেকক্ষণ ধরে নয়।

এর আগে এ পাড়ায় দু'চারটে খুনখারাপির খবর যে পাওয়া যায়নি, তা নয়, কিন্তু আজ যেন সব দিনের সব বিভীষিকাকে পেছনে ফেলে এ পাড়াকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে।

বৌদি কে যেন আসছে, বোধহয় সীতেশদা ?

রাস্তাটা অন্ধকার। আশপাশের বাড়ীর দরজা জানলা বন্ধ। ফলে মানুষ চেনা সম্ভব নয়। যে এল, সে সীতেশ নয়, অন্য কেউ—চলেও গেল ভীত, সন্ত্রস্ত, নিঃশব্দ দ্রুতবেগে। —অন্ধকারে হাঁটার ধরনটা অনেকটা সীতেশদার মতন, তাই না বৌদি !

সীবালী বুঝল, বিব্রত বোধ করছে সুমিতা ! বলল, যা অন্ধকার, খুব কাছে না আসলে চেনা শক্ত।

আবার দুজনে নিশ্চুপ। গোটা দুয়েক বোমা ফাটল কাছাকাছি কোন গলিতে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ফায়ারিং-এর আওয়াজ। বুকটা আবার কেঁপে উঠল সীবালীর।

আস্তে আস্তে উঠল সীবালী। রান্নাঘরে এল। সীতেশের জন্যে হালুয়া করেছিল সে আজ। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কেত্‌লীর জলটা ফুটে ফুটে ঘোলাটে হয়ে গেছে। স্টোভ্‌টা নিভিয়ে ঘরের আলোটা বন্ধ করে আবার রাস্তার ধারের জানালার কাছে এসে বসল সীবালী।

বসার সঙ্গে সঙ্গেই খুব কাছে কোথায় যেন বোমা ফাটলো। মনে হল কারুর যেন আর্তনাদ শোনা গেল মুহূর্তকালের জন্যে। ভয়ে, উত্তেজনায় জানলার শিকদুটো শক্ত করে আকড়ে ধরল সে।

—বৌদি, গলির মোড়ের মাথায় কতকগুলো লোক দৌড়ে গেল—

ঠিক এই সময় প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফাটল। বিদ্যুতের মতন আলোর ঝিলিক চোখ ধাঁধিয়ে দিল। শিউরে উঠে সরে এলো সীবালী। দেয়ালের পাশ থেকে যেন তাকে কেউ দেখছে, তাই আড়াল হয়ে, জানলাটা ধীরে ধীরে ভেজিয়ে দিল সীবালী। তারপর একটুখানি ফাঁক করে, লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাল। যতদূর দৃষ্টি যায়, রাস্তাটা ফাঁকা বলেই মনে হল। তখন আবার পাশের বাড়ীর জানালার দিকে তাকাল সীবালী। হ্যাঁ, তখনও শূন্যদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছে সুমিতা।

মনে মনে একটুখানি হাসল সীবালী। হ্যাঁ, সে জানে কার জন্যে সুমিতার এত উৎকণ্ঠা, এত উদ্বেগ।

ওদেরই বাড়ির একতলায় থাকে মনোজিৎ। সীবালী জানে মনোজিতের জন্যেই সুমিতার এই আকুল প্রতীক্ষা। সীতেশ যেমন ফেরেনি আপিস থেকে, তেমনি মনোজিৎও।

কিই-বা অবস্থা সুমিতাদের। অনেকদিনের পুরনো বাসিন্দা বলে দোতলায় থাকে। আর মনোজিৎরা ? মাত্র পাঁচবছর এসেছে এ পাড়ায়। ঘরদোর দারুণ ছিমছাম। ওই মনোজিৎ এবার রেফ্রিজারেটর কিনেছে। চাকরি করে ভালো। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান চেহারা। আর সুমিতার কি-ই বা আছে। ময়লা রঙ। রোগাই বলা চলে। তবে, হ্যাঁ, মুখশ্রীটি বড় সুন্দর। সীবালী ভাবল, মেয়েটার ব্যবহার বড় ভালো। কখনও রাগতে দেখেনি সুমিতাকে। উঁচু গলায় কোন কথা বলতে শোনেনি—ঝগড়া তো দূরের কথা।

এর মধ্যে হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। একরকম দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলল সীবালী। বেশ ক্লান্ত, চুলগুলো এলোমেলো, চোখেমুখে দারুণ উত্তেজনা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—সীতেশ খোঁড়ো কাকের মত ঘরে ঢুকল।

পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে বলল, উফ্ আজ বড় জোর বেঁচে গেছি।

সীবালীর চোখের কোণায় জল এসে গেল। সে ঘনিষ্ঠ হল সীতেশের। প্রথমে বুকের ওপর হাতটা রাখল, তারপর মাথাটা। সীতেশ দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সীবালীকে। পিঠে হাত বুলাল। ফিশফিশ করে বললে, যেন অন্য কেউ আছে এ ঘরে, শুনে ফেলবে—তাই গলার স্বরটা অত্যন্ত কোমল হয়ে এলো, কোন ভয় নেই সীবালী, এইতো আমি এসে গেছি।

সীবালী তবু ছাড়লনা সীতেশকে। আর কিছুক্ষণ স্বামীর গায়ের সঙ্গে মিশে রইল। তারপর খেয়াল হল, সত্যিতো, মানুষটা সারাদিন খেটেখুটে কত ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে এসেছে, তার খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম দরকার। সে সীতেশের চোখের ওপর কয়েকমুহূর্ত চোখ দুটো রাখলো।

সীতেশের চোখে পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসির সঙ্গে বোধহল একটুখানি দুষ্টুমির ছোঁয়া লাগল। বলল, সুমিতা দেখছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হল সীবালী। ঈস্! কী লজ্জা! ঘরের আলো জ্বলছে। পর্দাটা তোলা। আর এখনও তেমন করেই অন্ধকার জানলায় বসে আছে সুমিতা।

তুমি মুখ হাত পা ধুয়ে নাও, আমি তাড়াতাড়ি চা বানাচ্ছি—সীবালী বলল। তবু নড়ল না সীতেশ। কেমন যেন উদাস, শূন্যদৃষ্টিতে জানলার বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে।

আবার কাছে এল সীবালী। হাতটা ধরে বলল, এই, কী হয়েছে তোমার? এ্যাঁ, না, ম্লান হাসল সীতেশ। তারপর গামছা হাতে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

ঘরেতেই চা দিয়েছিল সীবালী। বিছানার ওপর বসল সীতেশ। খাবারের ডিশটা তুলে ধরল সীবালী। সীতেশ ছুঁচামচে খেয়ে বলল, আর খেতে ইচ্ছে করছে না।

সীবালী মুখ তুলে চেয়ে রইল সীতেশের দিকে। সীতেশ বোধ হয় বুঝল কী বলতে চায় সীবালী। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, প্রায় একঘণ্টার ওপর ট্রাম ডিপোর কাছে ঘোরাফেরা করেছি। আমি একা নই, অনেকেই—

এমন সময় ফায়ারিং-এর আওয়াজ শোনা গেল। সীতেশ চমকাল একটু। বলল, এতক্ষণে বোধহয় পুলিশ এল।

এর আগেও কিন্তু ফায়ারিং-এর শব্দ শুনেছি আমি—সীবালী বলল। ঠিকই শুনেছ, মৃদুস্বরে বলল সীতেশ, তবে তা পুলিশের নয়, —বলতে বলতে বিছানা থেকে নামল সীতেশ। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা দেখল একবার। দেখল পাশের বাড়ির জানলাটা। যেখানে নিস্তব্ধ পাথরের স্ট্যাচুর মতন তখনও সুমিতা বসে।

আর চা খাবে না, সীবালী বলল, আর কাপ তো এখনও রয়েছে।

আস্তে আস্তে আবার খাটে এসে বসল সীতেশ। চায়ের কাপটা তুলে একবার চুমুক দিল। তারপর অন্যমনস্কভাবে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল।

সীবালী কি বুঝল কে জানে! খাবারের ডিশটা আর চায়ের পেয়ালাটা সরিয়ে রেখে খাটে এসে বসল। শুয়ে পড়া সীতেশের বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, তোমার নিশ্চয় কিছু হয়েছে, এমন করছ কেন?

আমার কিছুই হয়নি সীবা, আমার কিছুই হয়নি—উক্—হরিবোল—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সীতেশ। ঝুঁকে পড়ল সীবালী। মুখের কাছে মুখটা এনে বলল, অমন করছ কেন?

—ন্‌না। কিছু না—উঠে বসল সীতেশ। হাতের চেটো দিয়ে মুখটা মুছল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, উঃ কি নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছে মানুষ। তুমি কল্পনাও করতে পারবেনা সীবা, মানুষ কেমন করে এত নিষ্ঠুরতা দেখাতে পারে!

যেন শিউরে উঠল সীতেশ এই কিছুক্ষণ আগের দেখা দৃশ্যগুলো চোখের সামনে মূর্ত হল তার।

বড় রাস্তাটাও অন্ধকার। দোকানগুলোর দরজা সব বন্ধ হয়ে গেছে। বাস চলছে না। রিক্সাওয়ালারাও ওদিকের রাস্তায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

শুধু সীতেশ নয়, তার মতন আরো অনেকেই আপিস ফেরৎ এসে আটকা পড়েছে ট্রামডিপোর কাছে। বাকি পথটুকু আট-দশ মিনিট হাঁটলে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া যায়!

রাস্তাটাই যেন দু'পক্ষের সীমানা। যেন রণক্ষেত্র। কিছু বোঝবার উপায় নেই। হঠাৎ দারুণ শব্দে বোমা ফাটল। তার আলোর ঝিলিক। সেটা মিলোতে না মিলোতে আর একটা। তারপর কাছে দূরে অনেকগুলো। এবং কিছুক্ষণ নৈঃশব্দের পর ব্যাপারটা মিটে গেছে মনে করবার মতন যখন মানসিক প্রস্তুতি চলছে, তখন অকস্মাৎ একটা আর্ত চিৎকার। কয়েকটা লোকের ছুটোছুটি।

গেল বোধহয় একজন। মনে মনে শিউরে উঠল সীতেশ।

সীবালী একদৃষ্টে তার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। সীতেশ তা দেখল। ডান হাত দিয়ে তাকে বুকের ভেতর টেনে আনল। বললে, রাকেশদা, বিনয়বাবু, অনিল জ্যাঠা, পল্টন—সবাই ছিল মোড়ের মাথায়। আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, আস্তে আস্তে এগুবো। পানের দোকানের সামনে এসে সুজাতা স্টোরসের পাশ দিয়ে মাঠটা পেরিয়ে সুব্রতদের বাড়ি গিয়ে উঠবো। তারপর যা একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

করলামও তাই। সবাই সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দ্রুতপদে পেরিয়ে এলাম পথটুকু। পানের দোকান পার হয়ে কি হয়নি, একটা অমানুষিক আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

তিন চারজনে চেপে ধরেছে একজনকে। আমরা পালাতে ভুলে গেলাম। ব্যাপারটা এত আকস্মিক। এবং কিছু বোঝবার আগেই লোকগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পল্টনই প্রথম এগিয়ে গেল। গলাটা কাটা। পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে এসেছে। বীভৎস চেহারা।

দুহাতে মুখ ঢাকল সীতেশ। সীবালী বলল, উফ্, আর বোলো না তুমি, আর বোলনা—বলে সে আঁকড়ে ধরল সীতেশকে।

কিছুক্ষণ বিরতির পর সীবালী জিজ্ঞাসা করল, আছা, লোকটাকে তোমরা চিনতে পারলে।

ঘাড়টা নাড়ল সীতেশ। চোখের দৃষ্টি শূন্য। চিকচিক করে উঠল জলের রেখা।

তা লক্ষ্য করল সীবালী। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, কে ?

আস্তে আস্তে চোখদুটো নামাল সীতেশ। সীতেশ সীবালীর মতন অস্ফুটে বললে, 'মনোজিৎ!'

উফ্! —প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সীবালী। তারপরেই দুজনের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পাশের বাড়ির জানালার দিকে। যেখানে সিলুয়েটের মতন একখানা স্থির ছবি। নিথর, নিস্পন্দ। দুচোখের পলক পড়ছে না। দৃষ্টিটা পথের দিকেই নিবদ্ধ। একমুঠো বোবা অন্ধকার যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে সারা রাস্তাটাকে।

চিঠি

জয়ন্তী সেন

ঘড়ি দেখে শব্দ শোনে না শব্দ শুনে ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে ঠিক জানেনা রমানাথ। তবে ঠিক সেই মুহূর্তে নটা বাজে, আর দরোজার কাছে খস খস শব্দ। ডাক পিয়ন চিঠিগুলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে যায়। আকাশে রোদ থাকলে কেমন চকচক করে ওঠে বাইরেটা, মেঘ না হলে আরও নীল দেখায় সব কিছু। আশে পাশের অন্য সব শব্দ, ঠিকে ঝি এর কর্কশ কণ্ঠের রেশ, মায়ের শতনাম জপার মত একশ নালিশ, ভাই দুটোর ঝগড়া, বোনের বেসুরো গলার গুন গুন গান, গলির অসহ্য ঐকতান ঐ একটুখানি শব্দের পাশে একমুহূর্ত্তে মিইয়ে যায়। দিনের মধ্যে ঐ একটিবারই নয়, পিয়ন আরও দু তিনবার আসে। সব মুখস্থ রমানাথের। হাতে যে কোন কাজ থাকনা কেন বাড়ীতে থাকলে সে আসবেই। বাড়ীতেই বেশীর ভাগ সময় আজকাল কাটাচ্ছে রমানাথ, কারণ ভোর ছটা আর রাত আটটার টিউশনী দুটা বাদ দিলে সে প্রায় ছ মাস ধরে বেকার বসে আছে। এ শব্দটা শুনলেই সে অন্য সকলের সঙ্গে রেশারেশি করেই এ ঘরে ছুটে আসে। সকলে সকলের রহস্য জানে। পুরোন ছেঁড়া কাশিরাম দাসের মহাভারতের মত আগাগোড়া পড়া হয়ে গেছে অন্য সকলের মন। মায়ের উৎকণ্ঠা বড়দার জন্যে, এ বাড়ীর বড় ছেলে। সীতানাথ। সে আজ তিন বছর নিরুদ্দেশ। কারণ কেউ সঠিক জানেনা। কেউ বলে পাগল হয়ে গিয়েছে, কেউ বলে সন্ন্যাসী। দূর ছাই, রেলে কাটা পড়ে কত অজ্ঞাত নামা যুবক আজ কাল হামেশাই প্রাণ হারাচ্ছে। কথা হচ্ছে ওগুলো দুর্ঘটনা না সেচ্ছাকৃত ঘটনা! বড়দা আত্মহত্যা করবে কেন, তা নিয়ে মনে মনে এককালে মাথা ঘামাতো রমানাথ। মধ্যবিত্ত চাকরী একটা ছিলো, অতএব বেকারত্বের প্রশ্ন ওঠে না। বড়দার বন্ধু সজলদার মাসতুতো বোন নমিতার সঙ্গে বোঝাপড়া ছিলো প্রকাশ্যেই। রূপের দিকটায় ঘাটতি থাকলেও অভিভাবকদের আপত্তি ওঠেনি, কারণ ভদ্রমহিলার একটা স্থায়ী চাকুরী

ছিলো। বিশ্রী ফাটল ধরা সংসারে কোন দিকটায় জোড়াতালি দেওয়া শুরু করবেন ভাবতে ভাবতে মা পঞ্জিকায় দিন দেখতেন, এবং পাড়ার নীচু স্যাকরাকে দিয়ে ক্লিপ ভাঙা বিছে হারটা মেরামত করার স্বপ্ন দেখতেন। সেই সময় একদিন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল বড়দা। অফিস থেকে বাড়ী ফিরলোনা। কান্নাকাটি, কাগজে বিজ্ঞাপন, বন্ধু বান্ধবের আশ্বাস ও অপেক্ষা, সব কিছুই ক্রমশ: নিস্তেজ হয়ে এলো যে কোন মৃত্যুশোকের মত। রমানাথ জানে মা একমাত্র মা এখনও প্রত্যেকদিন মনের টবে পোঁতা শুকনো কুঁকড়ে ওঠা আশার মান্ধাতা আমলের পচা পুরোন উপমা সম্মত লতায় রোজ জল ঢালতে ভোলেনা। তাই চিঠির শব্দে মার পাঁজর বার করা নির্জীব বুকের খাঁচায় একই সঙ্গে ডানা ঝাপটানোর শব্দ বেজে ওঠে। হয়তো খোকা চিঠিতে জানাবে সে ভালো আছে, ভালো চাকরী পেয়েছে। এবারে ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরবে। আসলে মাও মনে মনে জানেন ওচিঠি সত্যি সত্যি আসতে পারে না। তবু আশা করে থাকাটাই তাঁর কেমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অথবা নেশা। পান দোক্তা খাওয়ার মতন। হাতে আঁকড়ে ধরে থাকার মতন জলে ভেসে যাওয়ার অনিবার্য মুহূর্ত্তে। তাই শব্দটা শুনলেই যে কোন হাতের কাজ স্থগিত রেখে মা একবার এ ঘরে এসে দাঁড়াবেন। হলুদ আঁচলে মুছে হাতটা বাড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করবেন। তারপর মাঝেসাঝে পোষ্টকার্ডটা নাকের কাছে তুলে ধরে দিদির বক্তব্য বিড় বিড় করে পড়া শুরু হয়ে যাবে। নানা অভাব অভিযোগ, নানা নালিশ ভরা একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। মাঝে মাঝে পুনশ্চ করে খুদে হরফে লেখা—খোকার কোন খবর পেলে নাকি? পরশু ওকে স্বপ্নে দেখে অবধি মন খারাপ হয়ে আছে।

শব্দটা বাবার কানেও পৌঁছয়। শব্দ শোনার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখেন বলেই হয়তো। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখ কান দুটোরই ধার ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে আসছে। বাবা যে বড়দার চিঠির জন্য এমন বিচলিত হয়ে থাকবেন, একথা বিশ্বাস করা কিছুতেই চলেনা। তাঁর জ্যোতিষ চর্চায় অগাধ বিশ্বাস এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও পঞ্জিকায় প্রকাশিত স্বনামধন্য জ্যোতিষীদের নিজের কোন এক তীব্র সমস্যার কথা জানিয়ে প্রায়ই নানা ঠিকানায় চিঠি লেখেন। মনিঅর্ডারে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ টাকা এবং পাঁচটা ফুলের নাম পাঠানোর নির্দেশ থাকে। বলা বাহুল্য প্রথমোক্ত

দাবী অগ্রাহ্য করা হয় এবং সে কারণে উত্তর আসেনা। একবার না দুবার ছাপানো কার্ড এসেছিলো। একটি মাত্র লাইন টাকা পাঠান। তবু বাবা আশা ছাড়তে পারেননি। তাই শব্দ শুনে বাবাও সশব্দে চেয়ার ঠেলে খড়মের খট খট শব্দ তুলে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়ান। ফরিদপুরের এককালীন প্রজার এখনও বিশ্বস্ত থাকার এক আশ্চর্য প্রমাণ স্বরূপ লেখা চিঠি মাঝে মাঝে তাঁর নামে আসে। আগ্রহের সঙ্গে বাড়ানো হাত মিইয়ে যায় পত্রলেখকের নাম শোনামাত্র. বুঝতে পারে রমানাথ। এক এক সময় ভাবে বাবাকে বললে হয় সমস্যাটা খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। জ্যোতিষীর মীমাংসার মত সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। নিজের মনেই হাসে রমানাথ। কি এমন সমস্যা কে জানে? বড়দার খবর, জামাইবাবুর স্বাস্থ্য, তার চাকরী, ছোটবোন রেবার বিয়ে, ছোট ভাই দুটোর ভবিষ্যত, দেশের.দুর্দশা, বাজার দর এর উর্দ্ধমুখিতা! একদিন রাত্রিবেলা ঘুম না আসার দরুণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে লাহাদের চারতলা বাড়ীর ছাদের উপর ঝুলে পড়া মেঘলা চাঁদ দেখছিলো রমানাথ। চাঁদ দেখলে ঠিক কবিত্ব কবার প্রবনতা না এলেও কেন জানি ভালো লাগে অনেক কিছু ভাবতে। অনেক দুর দেশের কথা। ভ্রমণ কাহিনীর স্মৃতি। পুরোণ বন্ধু বান্ধবদের মুখ, যারা অনেককাল বিচ্ছিন্ন হারিয়ে গেছে, সহপাঠিনী দীপা, সুপ্রিয়া, অরুন্ধতীদেব কথাবার্তা—এসব ভিড় করে আসে ভুলে থাকার কপাট ফাঁক করে। হঠাৎ বাবার কাশি মেশানো কণ্ঠস্বর কানে এলো। মাকে লেকচার দিচ্ছেন। ছেলেবেলায় তাদেরও দিতেন, যতদিন পর্যন্ত মুখের উপর ভণ্ডামীর মুখোশ চাপিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো। মনে নেই কবে, তবে বড়দাই একদিন মাঝপথে বাধা দিয়ে বলেছিল 'আমার সময় নেই বাবা, এখুনি বেরোতে হবে।' ফলাফলের জন্যে দুশ্চিন্তা তাদের ছিলো কিন্তু বাবা এত আশ্চর্য হয়েছিলেন যে বক্তৃতা মাঝপথে থামিয়ে খড়মের শব্দ তুলে ঘরে চলে গিয়েছিলেন। আর কোনদিন ছেলেদের সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে কথা বলেননি। এখন পর্যন্ত মা, বেচারী মাই একমাত্র শ্রোতা ও সমালোচনার পাত্র।

"আমার জীবনে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে' —বাবা মাকে বলছিলেন—।

'নিশ্চয়ই খোকা—।' মার গলাটা আশান্বিত শোনালো। 'আর একবার বিজ্ঞাপন দিলে হোতনা—। আমার মনে হয়—।'

'তোমার কি মনে হয় তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। যে বাড়ী ছেড়ে পালায়, তার জন্যে হা হুতাশ করা বোকামী। আমার সমস্যা হোল জন্মান্তরের প্রশ্ন নিয়ে। জ্যোতিষ যদি এই জন্মের বিচার করতে পারে, তবে অতীত কিংবা আগামীর সম্পর্কেও অন্ততঃ সাজেসশান দেওয়া তার উচিত— ।''

কথার চেয়ে কাশি প্রবলতর হয়ে ওঠাতে বিরক্ত হয়ে রমানাথ ঘরে ফিরে গেল। সমস্যাটা অবশ্য ফেলনা নয়, এর পর কোন্ পরিবেশে জন্মাব জানতে পারলে ইহজীবনে অনেক কিছু সহ্য করা যায়।

রেবার গল্পও সকলে জানে। দেখতে মোটামুটি চলনসই, অন্ততঃ অল্প বয়সের জৌলুষ এখনও চোখেমুখে চকচক করে। ইস্কুলের গণ্ডী পেরোতে পারেনি, লেখাপড়ায় মন বিশেষ নেই। বাড়ীতে গাধার খাটুনী খাটে, মার বকুনী খায়, মেয়ে দেখানোর ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রহসন সহ্য করে। বাড়ীর সকলেই জানে লাহাদের পাশের বাড়ীর রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এর ছেলে অমলেন্দুর সঙ্গে ওর এককালীন ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস। ছেলেটা ভদ্র, বিনয়ী এবং ব্রিলিয়াণ্ট না হলেও মোটামুটি শিক্ষিত। অভিভাবকদের মত না থাকলেও অন্ততঃ তার কথার দাম আছে, সে বিষয়ে বাড়ীর সকলে নিশ্চিন্ত ছিলো। চাকরী পেয়ে কোচিন এ হঠাৎ বদলি হয়ে গেছে অমলেন্দু। এবং তারপরে আর কোন খবর নেই। পাড়ায় গুজব শোনা যায় ডেপুটি গিন্নী ছেলের জন্য পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছেন। রেবার হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর নাকি দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। রমানাথ রোজই রেবার ফ্যাকাশে কান্না কান্না মুখটা দরজার ওদিকে দেখে আর ভাবে ও কি এতই বোকা। এখনও চিঠির আশা করছে। অন্ততঃ সাত আট মাস কেটে গেছে। লেখার হলে এতদিনে অনেক চিঠি লিখত অমলেন্দু। অন্ততঃ সাহস থাকলে রেবার চিঠির জবাবে খোলাখুলি বলতে পারত 'আমাকে ক্ষমা কোর। ভুল করেছিলাম।' তা বলে রেবার জন্যে সত্যি বলতে কি কোনরকম দুশ্চিন্তার কারণ তাদের নেই। খুব সুখের শরীরে ননীর পুতুলের অঙ্গে এসব মনস্তাত্বিক দুঃখ জীবনকে নিয়ে ওলট পালট খেলায় মেতে উঠতে পারে। রেবা ঐ একটি মাত্র দুঃখকে আরও নানা আঘাত ঝড় ঝাপটার আড়ালে দপদপ করে কতকাল জালিয়ে রাখবে। সেজ মাসীর ভাসুরপোর সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, হয়তো বিয়ে হয়েও যাবে ওখানে। দিদির মত

একরাশ অভাব অভিযোগের আসবাবে সাজানো সংসারে হাল ধরতে গিয়ে এসব কথা সব ভুলে যাবে রেবা। তবু চিঠি—একটা চিঠির জন্যে তার মনের এক কোণে একটু গোপন অপেক্ষা চিরকাল জমানো থাকবে—। বাবার সিন্ধুকের কোণে পুরোন আতরের গন্ধের মতো—আগেকার জীবনের স্মৃতির এ এক টুকরো ফেনা। অমলেন্দুর অস্তিত্ব ক্রমশঃ ওর জীবনে মিথ্যা হয়ে যাবে। তবু আজীবন ঐ চিঠির শব্দটা শুনলে ওকে দরোজার সামনে এসে হয়তো দাঁড়াতেই হবে।

সকলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালো রমানাথ। এমনকি ছোট ভাই দুটোকেও। ওরা দিনরাত খেলোয়াড়, সিনেমা ষ্টারদের কাছে চিঠি লেখে অটোগ্রাফ ভিক্ষা করে। দুএকটা পেয়েছে, বেশীর ভাগই নিরুত্তর। তবু চিঠির নামে যে যেখানে থাকে ছুটে আসবেই। কিন্তু রমানাথ? সে নিজে কোন্ চিঠির অপেক্ষায় বসে আছে। তাকে কে লিখবে, কেন লিখবে? চাকরীর ইন্টারভিউ দিয়ে এসে আগে ভাবতে ভালো লাগতো, পরিচ্ছন্ন টাইপ করা নির্দেশ আসবে। মা সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবেন। এক সময়ে সে চিঠির অপেক্ষায় থাকতো রমানাথ। এখন থাকেনা। একটা চাকরী পেয়েছিলো, চিঠির প্রয়োজন হয় নি। বড়দার অফিসের সত্যচরণবাবু নিজে বাড়ী এসে জানিয়েছিলেন। তারপর ছাঁটাই হয়ে গেছে বিনা কারণে। চাকরী হলে অন্য ভাবেই সে খবর আসে। দীপা আর সুপ্রিয়া কলেজ জীবনে তাকে চিঠি লিখতো। সে চিঠি ডাকে আসতো না তা থাকতো বই এর পাতার মধ্যে আজে বাজে কাগজের অন্তরালে। দুজনে দুজনকে লুকিয়ে অথবা কমপিটিশান করে লিখত কিনা কে জানে? বেশ উচ্ছ্বাস, রবীন্দ্রনাথের গান কবিতার কোটেশান, প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আবেগে ভরপুর। তবে চিঠিগুলো ব্যক্তিগত ছিলোনা। যে কোন মেয়ে যে কোন ছেলেকে ঐ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক চিঠি লিখতে পারে। দীপার বিয়ে কলেজে থাকতে থাকতেই হয়েছে, তার চেহারায় চটক ছিলো বেশী। সুপ্রিয়া বছর দুয়েক কোন একটা মেয়ে ইস্কুলে পড়িয়েছিল। পরে তার বিয়ের হলুদ চিঠিও ডাকে এসেছিলো যথা সময়ে।

সত্যি কথা বলতে কি রমানাথ চোখ বুঁজে আজও অকারণে তার নামে আসা একটা পুরু নীলচে এনভেলাপের স্বপ্ন দেখে। ডাক টিকেট এক কোণে স্পষ্ট ভাবে লাগানো। তাতে অস্পষ্ট দেশ বিদেশের পোষ্টমার্ক, সুন্দর চোখের নীচে ঘন কালো ছাপের মত। মুক্তার মত হস্তাক্ষরে পরিষ্কার তার নাম ঠিকানা।

লেখা। মনে মনেই চিঠিটা হাতে তুলে নেয় রমানাথ। কি সুন্দর নিটোল খস-খসে স্পর্শ, গাছের কচি পাতার মত লাহাদের বারান্দার টবে ফোটা নানা রঙের ডালিয়ার বা চন্দ্রমল্লিকার মত। নাকের কাছে তুলে ধরলে আশ্চর্য নিবিড় একটা গন্ধ। গন্ধটা সঠিক কি বলা যায়না। ছেলেবেলায় মা একবার সেজমাসীদের বাগান বাড়ীর পুকুরে জোর করে নামিয়ে ছিলেন। বড়দার ভয় করেনি কিন্তু জলে হাঁটু, কোমর, গলা অবধি ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে রমানাথ এক নতুন ধরনের অনুভূতিকে বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে দিয়েছিলো। আর সেই জলের ভিজে ঘাস ঘাস সবুজ গন্ধ। প্রায় ক্লোরোফর্মের মত ঝিম ঝিম করে ওঠে মাথার মধ্যে। কল্পনার চিঠিটা নাকের কাছে তুলে বার বার শুঁকল রমানাথ। অচেনা রাস্তায় ক্লান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা চেনা ঠিকানা পেয়ে গেলে যেমন আশ্বস্ত হওয়ার সুখী হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, চিঠিটাও তাকে সেই ধরনের স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। এই চিঠিটা যেন তার জীবনের একঘেয়ে ক্লান্তিকর রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। রমানাথ এসব কথা কাউকে বলেনা। কেবল শব্দটা শুনলে আর সকলের সঙ্গে দরোজার পাশে এসে দাঁড়ায়। ওরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ছাঁচে রমানাথকে চালাতে চায়। মা নিশ্চিন্ত যে বাড়ীর মধ্যে একজন যার হৃদয় আছে, স্মৃতি আছে, তাঁর দুঃখের অসহ্য ভার ভাগ করে নেওয়ার মত মন আছে। তাঁর খোকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি স্বার্থের ছোট ছোট নিজ হাতে গড়া খাঁচার মানুষগুলোর জীবনে। বাবা মুখে যতই নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করুন, রমানাথের চাকরীর জন্যে অপেক্ষা করে থাকা তাঁর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ইনটারভিউ না দিলেও তিনি ভাবেন রমানাথ আশা করছে অবাক করে দেওয়া চিঠি একটা আসবে। রেবা হতাশ চোখেও কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ ছোঁয়া লাগায়, কারণ তার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছোড়দাই এ বাড়ীতে তাকে নিয়ে একটু মাথা ঘামায়। রেবার ধারনা রমানাথ এখনও অমলেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চিন্তা করে।

জানলাটা দেখতে চৌকো একটা নীল খামের মত, রোদের অক্ষরে সকালের নাম ঠিকানা লেখা। রমানাথের অকারণেই এসব কল্পনায় চায়ের পেয়ালা হাতে বসে থাকতে ভালো লাগে। মনে হয় চিঠিটা না এসে পারেনা। অন্যরা যে তুচ্ছ চিঠির অপেক্ষায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, সে তুলনায় তার স্বপ্ন কত রোমান্টিক! একটা আশ্চর্য সুখবর, যার আদি অন্ত কোনটাই তার জানা নেই, অথচ যার সম্ভাবনায় রক্তের কণাগুলো আলোর পোকার মত থির থির করে কেঁপে ওঠে। রমানাথ বেঁচে থাকার একটা মানে হয়তো বা খুঁজে পায়। কারণ সে খুব ভালো করেই জানে বেঁচে তাকে থাকতেই হবে। গলায় পাথর ঝুলিয়েও এই মজাহাজা নদীতে ডুবে মরা যায় না।

অন্য পথ

নির্মলেন্দু গৌতম

দীর্ঘদিন পর কোলকাতায় এলেন সদাশিববাবু। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে ছোটো ছেলের মতো কৌতূহলে তিনি কোলকাতা শহর দেখতে থাকলেন।

এখন সন্ধ্যে। আজকে একটু লেট হয়েছে ট্রেনের। নাহলে বিকেল-বিকেল শেয়ালদাতে পৌঁছে যেতেন। সুধা আর নিখিলেশকে মিছিমিছি এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না। অবশ্য সুধা এবং নিখিলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সদাশিববাবু তার জন্য তাদের কোনো অস্বস্তির প্রকাশ দেখতে পান নি। ট্রেন পৌঁছুবার পর কামরা থেকে সুটকেশ নিয়ে বেরুবার আগেই সুধা আর নিখিলেশের মুখ নিজের কামরায় দেখতে পেয়েছিলেন সদাশিববাবু। সুধা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'একবারেই তোমাকে খুঁজে পেয়েছি বাবা।'

সদাশিববাবু হেসে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, 'বাবাকে একবারেই পাওয়া যায়।'

নিখিলেশ হাসতে হাসতে এগিয়ে তার সুটকেশটা তুলে নিয়েছিলো।

ট্রাম বাসের ভীড়ের ভেতর দিয়ে বেশ দ্রুত চলেছে ট্যাক্সি।

সুধা হঠাৎ শুধালো, 'তুমিতো অনেকদিন পর কোলকাতায় এলে?'

'সত্যি অনেকদিন পর কোলকাতা এলাম।' বলে একটুখানি থামলেন সদাশিববাবু। তারপর সুধার দিকে ফিরে বললেন, 'বছর তিরিশ আগে এসেছিলাম। একেবারে পাল্টে গেছে সব কিছু।'

নিখিলেশ বললো, কোলকাতা রোজ পাল্টাচ্ছে।'

রোজ পাল্টাচ্ছে কথাটা হয়তো সত্যি, কিন্তু তিরিশ বছর পরে কোলকাতার পাল্টে যাওয়া ব্যাপারটা খুব বেশীরকম সত্যি। সদাশিববাবু বাইরের দিকে তাকিয়ে তার চেনা কোলকাতাকে চিনতে চেষ্টা করলেন।

ট্রাম বাসের ভীড় কাটিয়ে চৌরঙ্গীতে এসে কিছুক্ষণের জন্য রেড লাইটে থেমে থাকলো ট্যাক্সি।

আলো ঝলমল্ চৌরঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হলেন সদাশিববাবু। স্মৃতির মধ্যে যে কোলকাতা ছিলো সে কোলকাতা হারিয়ে গেলো একমুহূর্তে। ট্যাক্সির জানালায় মুখ রেখে তিনি দ্রুত চোখ ফেরাতে থাকলেন চারদিকে।

'তুমি যখন এসেছিলে, তখন চৌরঙ্গী নিশ্চয়ই এমনি ছিলো না।' সুধা আস্তে আস্তে শুধালো।

'উহুঁ।' তেমনি জানলায় চোখ রেখে সদাশিববাবু বললেন।

ট্যাক্সি ফের চলতে শুরু করলো।

বেশ ভালো জায়গাতেই বাসা নিয়েছে নিখিলেশ। সরু সরু গলি দিয়ে ট্যাক্সিতে ঢুকতে ঢুকতেই অনুভব করলেন সদাশিববাবু। সুখী হয়ে উঠলেন ভেতরে ভেতরে।

কিছুটা এগিয়ে ট্যাক্সি থামালো নিখিলেশ। সদাশিববাবু একবার তাকিয়ে দেখলেন বাড়িটা। একতলার ফ্ল্যাটটা নিখিলেশের। নিখিলেশ একতলার ফ্ল্যাটই পছন্দ করে। সদাশিববাবুর মনে হয় নিখিলেশের স্বভাবের সঙ্গে তার এই পছন্দের ঘনিষ্ঠ একটা মিল আছে।

ট্যাক্সির দরজা খুলে আগে নামলো নিখিলেশ, তারপর সুধা। সবশেষে নামলেন সদাশিববাবু। নেমে সুখী সুখী মানুষের মতোই নতুন জায়গাটা ভালো ক'রে দেখতে চারদিকে চোখ ফেরালেন। উল্টো দিকের বাড়ির বারান্দায় উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে একটি অল্প বয়স্ক বৌ অসম্ভব কৌতুহলে তাকে দেখছে। একটুখানি ঝুঁকে থাকায় মুখখানি ছায়া-ছায়া। সদাশিববাবুর তাতেই যেন ভালো লাগলো। তাকিয়ে ভালো ক'রে দেখতে ইচ্ছে হলো বৌটিকে। তবু চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

নিখিলেশই ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দিলো। সুধা দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে বললো, 'বাবা এসো'।

নিখিলেশ বললো, 'আপনি যান। আমি সুটকেশ নিয়ে আসছি।'

সদাশিববাবু সুধার পেছনে পেছনে ভেতরে এলেন।

সুধা অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে আলো জ্বালালো। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সুধার সাজানো সংসার। মুগ্ধ চোখে সদাশিববাবু সাজানো ঘরখানা দেখতে থাকলেন।

'তুমি বসো বাবা। তোমার জন্যে আগে চা করি। চা খেয়ে আগে বিশ্রাম ক'রে নেবে। বাথরুমে যেও তারপর।'

'ঠিক আছে।' ব'লে সদাশিববাবু খাটের ওপর এসে বসলেন। সুধা ভেতরে চলে গেলো ব্যস্ত পায়ে। স্যুটকেশটা হাতে ঝুলিয়ে ঢুকলো নিখিলেশ।

'ট্রেনে কষ্ট হয় নি তো?' স্যুটকেশটাকে গুছিয়ে রেখে নিখিলেশ বললো।

'না না, সোজা ট্রেনে চেপেছি, নেমেছি এসে শেয়ালদাতে। তোমরা ষ্টেশনে না গেলে অবশ্য ট্যাকসি ধ'রে বাসায় ফিরতে কষ্ট হতো।'

কথা বলতে বলতে পাঞ্জাবী খুললেন সদাশিববাবু। নিখিলেশ একটা হ্যাংগার এনে সেটা ঝুলিয়ে রাখলো দেয়ালের পেরেকে।
ফ্যানের স্পীডও বাড়িয়ে দিলো খানিকটা। সদাশিববাবু আরাম করে বসলেন এবার। নিখিলেশের দিকে একবার তাকালেন। বুঝতে পারলেন তার জন্য ভেতরে ভেতরে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নিখিলেশ।

চায়ের জল চাপিয়েই সুধা এলো। সদাশিববাবুর পাশে বিছানার ওপর ব'সে বললো, 'মাকে সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে।'

'কি ক'রে আসবে সে। একমুহূর্ত কাছে না থাকলে মীরা তার দেড়মাসের ছেলেকে নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে।' সদাশিববাবু বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

'তার মানে বৌদির ছেলে হাটতে না শিখলে আর মা'র আসা হচ্ছে না।'

হাসলেন সদাশিববাবু। বললেন, 'তখন আবার সেই ছেলে ছাড়বে না।'

সুধা বললো, 'এবার আমি গেলে ঠিক সঙ্গে নিয়ে চলে আসবো।'

'সেই ভালো।' নিখিলেশ বললো।

সদাশিববাবু হেসে সিগারেট ধরালেন একটা।

সুধাকে প্রায় একবছর পরে দেখলেন সদাশিববাবু। সুধার সংসারে এই প্রথম তার সুধাকে দেখা। বিয়ের আগের সেই সুধা যেন পাল্টে গেছে। অনেক সুন্দরী হয়েছে সুধা, অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। সমস্ত চোখে মুখে সম্রাজ্ঞীর মতো স্বাচ্ছন্দ্য। মেয়েরা বোধহয় বিয়ের পর এমনি-ই পালটে যায়।

'চায়ের জল বোধহয় ফুটে উঠেছে এতক্ষণে।' সুধা হঠাৎ উঠে দ্রুত পায়ে চলে গেলো ভেতরের ঘরে।

নিখিলেশ বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই স্নান ক'রে নেবেন?'

'সারাদিন ট্রেনে এসেছি। স্নান না করলে ঘুম হবে না। এ বাড়িতে জল ঠিক মতো পাওয়া যায় তো?'

নিখিলেশ হেসে বললো, 'যায়। সব দেখে শুনেই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছি।'

ছোট্ট একটা ট্রে-তে চায়ের কাপগুলো সাজিয়ে নিয়ে এলো। সুধার দিকে তাকিয়ে সদাশিববাবুর মনে হলো, সুধা তার ছোট্ট সংসারটাকেও অমনি যেন ছোট্ট একটা ট্রে-র ওপর সাজিয়ে অমনিভাবে নিয়ে চলেছে।

সদাশিববাবু ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিলেন নিখিলেশ তুলে নিলো আরেকটা। ট্রেটাকে ছোট্ট টেবিলে নামিয়ে রেখে বাকী কাপটা সুধা তুলে নিলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন সদাশিববাবু। একটা সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ ক'রে টান দিয়ে ধন হয়ে বসলেন।

তিরিশ বছর আগের চেনা কোলকাতা আশ্চর্যভাবে পালটে গেছে। পরদিন বিকেলে একা একা পথে বেরিয়ে ফের মনে হলো সদাশিববাবুর।

তখন ভবানীপুরে মাসীর বাড়ি এসেছিলেন। বয়স কুড়ি ছাড়িয়ে ছিলো। তবু নিষেধের প্রাচীর ছিলো চারদিকে। কিন্তু সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। যতোদূর চেনা যায় ততোদূর চিনে রাখতেন। পরে সুযোগ পেলেই অবাক করে দিতেন সবাইকে। সেই কুড়ি বছর বয়সে চেনা কোলকাতা একেবারেই পালটে গেছে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে সদাশিববাবু হাঁটতেই থাকলেন।

কাছাকাছি পার্কে এসেছিলেন সদাশিববাবু। সুধাই চিনিয়ে দিয়েছে পার্কটা। পার্কের ভীড়, হৈ, চৈ, থেকে সদাশিববাবু বেরিয়ে পড়েছেন। পথে পথে হেঁটে বেড়ালে মন্দ লাগবে না বলেই এমনিভাবে বেরিয়ে পড়া। কতক্ষণ এবং কোনদিকে হাঁটবেন, তা অবশ্য সদাশিববাবু নিজেই জানেন না।

কিন্তু চেনা যা কিছু, সে সব এখন স্মৃতির মধ্যে। কুড়ি বছর বয়সের সেই কোলকাতা স্নিগ্ধ হয়ে আছে সেখানে। ভোরের শিউলি তলার মতো সুগন্ধ স্মৃতি। সুগন্ধি স্মৃতির কথা মনে হতে বুকের ভেতরে কষ্ট বোধ করলেন সদাশিববাবু। আত্মমনস্কভাবে হাঁটতেই থাকলেন তিনি।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যে হলো। আলো জ্বললো পথে। ঝলমল ক'রে উঠলো দোকানগুলো। সদাশিববাবু কিছুতেই যেন ফিরতে পারছেন না।

ভীড়ের ফুটপাথের মধ্য দিয়ে এই সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবার ব্যাপারটা ভাবতে থাকলেন তিনি। কষ্ট থেকে ক্রমে যেন অস্বস্তিকর ভয় জমে উঠলো। একটা নির্জন বাসষ্টপের পাশে একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে তিনি এবার ভয়টাকে নিয়ে ভাবতে থাকলেন। সবকিছুই সময়ের প্রবাহে পাল্‌টে যায়, সব কিছু! তিনি দীর্ঘকাল পর প্রবাস থেকে ফিরলে হয়তো শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ির রাস্তা চিনে ফিরতে পারবেন না। এই মুহূর্তে সদাশিববাবুর কোথায় যেন ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে স্পষ্ট ক'রে ভাবতে পারছেন না তিনি। প্রতিমা, মীরা, আশীষ এবং মীরার ছেলের মুখ সব ছাপিয়ে জেগে উঠলো মনের ভেতর। তবু ভরসা পেলেন না সদাশিববাবু।

এই যে চেনা চারদিক পাল্‌টে যাচ্ছে, এ-ই তো চিরকালের নিয়ম—চিরকালের এই কথাটাই নতুন ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলেন তিনি।

কথাগুলো ভাবতেই তিনি যেন অনুভব করলেন, সুধার বাড়িতেও তিনি হয়তো আর ফিরতে পারবেন না। অসম্ভব ভয়ে নির্জন বাসষ্টপের গাছ তলায় দাঁড়িয়ে দু'হাত অস্থিরভাবে নাড়াতে নাড়াতে ভাবলেন, দীর্ঘক্ষণ হেঁটে এই যে তিনি একান্ত অচেনা একটা বাসষ্টপে এসে দাঁড়িয়েছেন, এখান থেকে পথ চিনে ফিরবেন কি ক'রে!

ভাবতে ভাবতে ঘামিয়ে উঠলেন সদাশিববাবু। আর দাঁড়াতে পারলেন না। প্রায় ঊর্ধশ্বাসে যে পথে এসেছিলেন সে পথে ছুটতে থাকলেন। দু'ধারে দোকানের উজ্জ্বল আলোগুলো সদাশিববাবুর চোখে সারিবদ্ধ মনে হলো। কেউ তাকে পাগল ভাবতে পারে, বিপদাপন্ন ভাবতে পারে। তার জন্য আপাততঃ কিছু ভাবতে পারছেন না সদাশিববাবু। যে ক'রেই হোক চতুর্দিকের পাল্‌টে যাওয়া পথ-ঘাটের মধ্য থেকে তাকে সুধার বাড়িতে ফিরতে হবে। এখুনি ফিরতে না পারলে, যেন আর কোনদিনই তার ফেরা হবে না। ভয় এবং কষ্ট আশ্চর্যভাবে বড়ো হতে হতে তাকে ঢেকে ফেলতে থাকলো ক্রমশঃ।

অসম্ভব দ্রুত হেঁটে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার সামনে এসে আশ্চর্য স্থির চোখে দেখলেন, দারুণ উৎকণ্ঠায় দরজার সামনে ঝুঁকে থাকা সুধার চোখ এক মুহূর্তে উজ্জ্বল হাসিতে ভ'রে উঠলো। সুধা দ্রুত পায়ে কাছে এসে বললো, 'উফ্, তোমার জন্যে কী যে ভাবনা হচ্ছিলো।'

সদাশিববাবু বলতে পারলেন না, কেন, ভাবনা কিসের ? কারণ অনির্বচনীয় এক আনন্দের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে তিনি আবিষ্কার করলেন, যা পাল্‌টেছে, যা শেষ হয়ে গেছে ব'লে তিনি এতোক্ষণ যে দুঃখের মধ্যে, ভয়ের মধ্যে বাস করছিলেন তা ভারি ছোটো হয়ে গেছে তার কাছে। মানুষ তার অনুভব নিয়ে পৃথিবীর চাইতে বড়ো। পৃথিবীর সমস্ত পথঘাট, বাড়িঘর পাল্‌টালেও তার কিছু এসে যায় না। পথ ভুললেই বা কি এসে যায়! অন্তপথ ধ'রে মানুষের চিরকালের যাওয়া আসা। সে পথ আপনি মনের মধ্যে ভাস্বর হয়ে থাকে।

বিস্মিত আনন্দে নির্বাক হয়ে তিনি সুধার দিকে তাকালেন।

সুধা ফের বললো, 'কোথায় গিয়েছিলে বলো তো ?'

'হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। চল, ভেতরে যাই।'

ব'লে স্থির চোখে আরেকবার সুধার দিকে তাকিয়ে অনির্বচনীয় সেই আনন্দের মধ্যে নিঃশেষে তলিয়ে পায়ে পায়ে ঘরের দিকে চলতে থাকলেন সদাশিববাবু।

খুনীরা

ঊষা ভট্টাচার্য

পাঁচ পাঁচটা দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি......বৃষ্টি আর বৃষ্টি......এমন অনাসৃষ্টি ললিতা শোনেনি, দেখেওনি। সেই যে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, জল আর থামেনা। কি করা যায় এখন? দুটো দিনত' এর ওর দোকান কুড়োনোতে চলে গেল, এখন উপায় কি?

"রামু! ও রামু! সোনা ভাইটি আমার......ভাখ্......ভাখনারে...... আর যে পারি না! খুব...খুব খুদা লাগছেরে। পেটটা আমার......একেবারেই জইলল্যা যায় যে।"

......"ও রামু আমার পেটটা ব্যথা করে যে ...!"

রামহরি অর্থাৎ রামু উত্তর দেয় না। সে তখন ছোট ভাই কালুর অর্থাৎ কালিপদর বিছানার তলায় কাঠের তক্তাটাকে সন্তর্পণে উঁচু করে দিচ্ছে।

নয়াবাড়ী থেকে চুপি চুপি গোটা আটেক ইট চুরি করেছে। হ্যা, চুরি করেছে ...।

কালুটা আজ তিনদিন জ্বরে জ্বরে লাল হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য এত জ্বরেও একটুও রোগা হয়নি। খেতে পায়নি কিছুই তিন দিন, শুধু জল খেয়েছিল একটু কাল রাতে। গভীর রাতে প্রায় তিনটে নাগাদ একটু খেতে চেয়েছিল, কিছুত' ছিল না—তাই এক কৌটো জল ধরে খাইয়েছিল...তখন ঝম্ ঝম্ করে শুধুই আকাশ চিরে জল ঝরছিল। ... একটুও রোগা দেখাচ্ছে না কালুকে। আজ সকালে চোখমুখ আরো ঢলঢল করছে। দিদিটা শুধু সেই থেকে উসখুস করছে ... কাঁদছে খিদেয়।

কালু আজ কথাও বলছে না আর শেষ রাত থেকে। বুঝি ঘুমিয়েছে ... গাটা আর জ্বলে যাচ্ছে না, জ্বর বুঝি নামলো ...একেবারে বরফের মত হয়ে গেছে কালুর শরীরটা...। এত ঘুমুচ্ছে যে বুকটাও নড়ে না।

ইট চুরি করেছে রামু ... ললিতা খুব রাগ করেছে। বিড়বিড় করে সেই থেকেই বকে চলেছে ... রামু একেবারেই কান দেয়নি সে কথায়। দিদির

প্যানপ্যানানিতে কান দিলে আর ভাইকে বাঁচাতে পারবে না—একথা রামু খুব বোঝে। এই ত জলের চাল বেয়ে কালুর বিছানাটা একেবারেই ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বড় রাস্তার চৌমাথাটা ক্রমেই উঁচু হয়ে গিয়ে ব্রীজের মুখে লেগেছে, সেই মুখেই নয়াবাড়ীটা উঠছে আকাশ ভেদ করে। এই মাস ছয়েক আগেও এখানে—এই সহরের বুকেই, এখানে ছিল বুকসমান উঁচু উঁচু সব আগাছা আর বুনো ফুলের মেলা। আর এখন বাড়ীটা যেন কেবলই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছে ··· দেখতে দেখতে দশতলা উঠে গেল। মিস্ত্রিরা বলে, 'বাবুরা আঠার তলা বাড়ী উঠাইব। "এই দেখ বাপু, এই কাগজেই ছবি ধরা পড়ছে।"

··· অসমাপ্ত বাড়ীটার চার পাশে ছোট ছোট অনেক চা-রুটির দোকান। ছাতুওয়ালারা দুপুরে নিয়ে বসে ছাতুর ডালা—জলের টিন আর কতো যে চকচকে পেতলের থালা—ছোট ছোট টিনের মগ। দুপুরে কাজের ছুটি হয় একবার—তখন যেন মেলা বসে যায়।···

কিন্তু বৃষ্টির ছাট আটকান এক বিষম দায়—! রামুরা এই ব্রীজের মুখেই ঐ নয়াবাড়ী থেকে সামান্য একটু দূরেই ভাঙ্গা দেয়ালটা ঘেঁসে একটা মাথা গোজবার চালা করে নিয়েছিল··· রামু সন্তর্পণে কালুর বিছানাটা উঁচু করে দেয়। ইট লেগেছে আটখানা—ওর ঐ জিরজিরে শরীরটা ঠিক বয়ে নিয়ে এসেছে ঐ ভারী ইটগুলো। শরীরটা একেবারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। চার চারখানা ইট এক একবারে নিয়ে এসেছে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল নয়াবাড়ীর সিঁড়ির তলা থেকে ঐ ইট কখানা তুলে নিতে—। আচ্ছা ওদের ত অনেক আছে, শত শত, হাজার হাজার—এই আটখানা ইট কতই না নগণ্য, তবু ওরা দিতে চায় না কেন? ···বুকের সঙ্গে একেবারে চেপে নিয়েছে রামু ইটগুলি··· এরই মধ্যে রয়েছে কালুর 'জীয়ন-কাঠি'। দুখানা দুখানা করে সাজিয়ে দেড়গজী তক্তাটাকে উঁচু করে, ছোটভাইর পিঠটাকে জলের স্রোত থেকে বাঁচিয়েছে। ঐ কাঠটাও সে নিয়ে এসেছে ঐ নয়াবাড়ীর রাজমিস্ত্রীদের চোখে ধোঁকা দিয়ে, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অনেক কষ্টে। চুরি করবার সময় বুকের মধ্যে এক-একটা হাতুড়ি পিটছিল এমন জোরে যেন এই দমবন্ধ হয়েই রামু মরে যাবে। কিন্তু মরেনি। ললিতা রেগে গিয়ে ভাইকে বলেছিল। তার দুচোখ দিয়ে তখন জল ঝরছিল।

"তুইও চুরি করলি রামু। তোর আইজ খাওয়া বন্ধ কইর‍্যা দিলাম। দেখি আমি ক্যামন বাপের মাইয়া। একটুও ডর নাই পোলার? মনে নাই?

এরই মধ্যে ভুইল্যা গেলিরে রাম। তোর বড় বুকের পাটারে। এরই মধ্যে কার্তিকরে ভোলতে পারলি ? ...কইছি না আর চুরি করণের কথা জীবনে মনে আনবি না!" বকেই চলে ললিতা, ওর ওই এক দোষ, একবার আরম্ভ হলে আর থামতে চায় না, রাম দিদিকে মানতে চায় না—কিন্তু খাওয়াটা একেবারে ললিতার হাতে বাধা—এখানেই রামু জব্দ।

"পোতীজ্ঞা কর রামু আর কোন দিন পরের জিনিস নির্বি না চুরি কইরা।" ছুঁবি না, ছুঁবি না—পরের জিনিস ছুঁবি না—। তিনবার পোতীজ্ঞা কর আমারে ছুঁইয়া। তবে খাইতে দিমু। এই আমার এক কথা।"

রামহরি প্রতীজ্ঞা করেছিল।

"না না না। এই তোরে ছুঁইলাম, আর কোন দিন চুরি করুম না।" রামুর চোখে জল চকচক করে নেবে আসে।

দিদিকে রাম কথা দেয়। কার্ত্তিক সাত বৎসরের ছেলে, পেটের জ্বালায় কাতর হয়ে নয়াবাড়ীর বাবুর গাড়ী থেকে ব্যাগ তুলে নিতে যায়। মিস্ত্রীদের চোখে পড়ে যায়। আর যায় কোথায়—ঐ বিরাট বিরাট লোকগুলি সাত বছরের ছেলেটাকে এমন তেড়ে আসে যে ছোট্ট ছেলেটা ছিটকে এসে পড়ে ঠিক বড় রাস্তার মাঝখানে। আর উঠবার ক্ষমতা হয়নি- নয়াবাড়ীর মাল বোঝাই ভারী ট্রাকটা দুরন্ত গতিতে গেটে ঢুকবার মুখেই বাচ্চা ছেলেটার পেটটাকে তার বাকী শরীর থেকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছিল। টকটকে রক্তের বড্ড বেশী লাল রং একেবারে ভোলা যায় না। ......সে মাত্র গত বছরের কথা।

রামহরির চোখে ঐ টকটকে তাজা রক্তের রং—খিদের জ্বালায় ফ্যাকাশে হয়ে আসে ...উনুনের 'পরে, অর্থাৎ তিনটে ইটের ওপরে একটা কালো মিশমিশে মাটির হাঁড়িতে ঢাকনা ঠেলে ঠেলে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে চায়...। গন্ধটা রামের খুব ভাল লাগে। দেশে থাকতে মা এমনি করেই সন্ধ্যাকালে ওদের খেতে দিত। সে আর কতদিনেরই বা কথা ...।

সারাদিনের অর্জিত তিন ভাইবোনের ভিক্ষার পয়সায় বুড়া দোকানীর কাছ থেকে কিছু গমের গুঁড়া আর ডাল পেয়েছে। ...ললিতা তাতে অনেক জল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফুটিয়েছে ... এবারে খাবার উপযুক্ত হয়েছে। কালুর অর্থাৎ পাঁচ বছরেরর ছোট ভাই—কালিপদ'র তর সয়না ... পরম স্নেহভরে দিদি উনুন থেকে দুহাতা জলো খিচুড়ী ভাইএর টিনের কৌটোয় তুলে দেয়... জলো ধোঁয়া টিনের কৌটোর মুখ গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

"এই মুখে দিস্ না কালু,—হাত আর ঠোঁট পুড়িয়ে ফেলবি···দিদির সাবধান বাক্য কালিপদকে থামিয়ে দেয়—ঐ গরমদ্রব্য গলিত লাভার মত ঐ কচি মুখটি একেবারেই ঝলসিয়ে দিতে পারত। কি যে করে। চোখভর্তি জল নিয়ে আপত্তি জানায়। পেটের মধ্যে যে বিবুভিয়াস তাকে রুখতে পারে না...।

"এত গরম দিলি কেন লতি ? আমার খিদে পায় না ?"

"এই অসভ্য ছেলে, দিদিকে আবার নাম ধরে ডাকছিস্ !"

"হ্যা, ডাকবতো—লতি, লতি, ললিতা, ···আমার বুঝি খিদা লাগে না !" চোখ থেকে জল গড়িয়ে টস্ টস্ করে কৌটোর মধ্যে খাবারের সঙ্গে মিশে যায় কালিপদর।

"আবার ডাকবি লতি বলে" ...রামহরি কালুর কান ধরতে যায়··· ।

লতি অর্থাৎ ললিতা ততক্ষণে হাড়ি নামিয়ে দুই ভাইএর পাত্রে খাদ্যদ্রব্য দিয়েছে··· আর দেরী নয় রাম তার ভাঙ্গা টিনের বাটিটায় চোখ নামিয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

গত পাঁচ মাস তিন ভাইকে নিয়ে দশ বছরের বোন ললিতা বনগাঁ, রাণাঘাট বারাসাত হয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়··· । মা বাবা তাদের কাজে আটকা পড়েছিল, আজও আসে নাই। আর এলেই বা ওদের খুঁজে পাবে না ত ? এক জায়গায় ওরা কদিনই বা থাকতে পারে। খাদ্য আহরণ করতে কত দূরে দূরে চলে যেতে হয়। বৃষ্টি নামবার পর থেকে লোকে ভিক্ষাও দেয় না। নিজেদের সামলাতেই তারা ব্যস্ত। গাড়ীগুলো যায় দরজা জানালা বন্ধ করে, ডাকলেও ওদের গলার স্বর তাদের কানে পৌঁছয় না। আর ভাল মানুষরা বৃষ্টির মুখে দাঁড়ায় না। লালবাতির মুখেও বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পুলিশ কোথায়। বৃষ্টিতেওরাও কি কিছু দেখতে পায়—একটা গাড়ী আর একটাকে মারলে দুচারটে মানুষ ঘায়েল হয়। তখন পুলিশ ছুটে যায়— । আজকাল হামেশাই ঘটে চোখে আর লাগে না। আগে মনে লাগতো রামের, এখন দেখে দেখে সয়ে গেছে। ললিতা বলে—

"রামু এখানেও মানুষ মরে রে। মানুষেই মানুষ মারে, আমাগো দ্যাশের মতইরে। কোথায় যে যাই ··· মানুষেই মানুষ মারে। আগে মায় কইত 'জঙ্গলে যাইস না লতু বাঘে ধইরা লইয়া যাইব।' অখন দেখি মানুষরাও বাঘের থাইক্যা কম যায় না রে রামু।"

মা বাবারা আজও ফিরতে পারে নাই। গ্রামের শেষ রাস্তার পারে চোখের জলে ভিজতে ভিজতে তারা ছেলেমেয়েদের গ্রামবাসী মেজো খুড়ার হাতে সপে দিয়েছিল। যতদূর চোখ দৃষ্টি পায়··· বাবা মা দাঁড়িয়ে আছেন—ললিতা দেখতে পেয়েছিল—ফিরে ফিরে কেবলই দেখতে গিয়ে বার দশেক ললিতা হোঁচট খেয়েছিল। মাইজ্যা দাদুর বকা খাইয়া লতি ঠিক হয়ে চলতে সুরু করেছে। ছোট ভাইটা আর পারে না···ললিতা কোলে নিয়ে চলবার চেষ্টা করে, হাঁপিয়ে ওঠে, পারে না।

বাড়ী ছেড়ে ললিতা আসতে চায়নি মোটেই। আসবার দুদিন আগে বাবা হাটে গিয়েছিল—হাট করে ফিরতে সেদিন কমলাপতির বড় রাত হয়েছিল। ললিতা উদ্বেগে ঘুমুতে পারছিল না—অন্ধকারে দাওয়ায় বসেছিল—সামনের সোজা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে। মা বারবার ডাকছিলেন 'আয় না লতু। শুবি আয়।' লতু কথা শোনে নাই। আবার মা ঘর থেকে ডেকেছে। ছোট ভাই দুটো, কাতু আর কালু মার দুপাশ থেকে তাকে জাপটে ধরে আছে। ঘুম না আসা পর্যন্ত মায়ের ছুটি নাই। রাম স্কুলে পড়ে। পড়ার বই থেকে কবিতা মুখস্থ করতে সে ভালবাসে··· একটু আগেও অন্ধকারে বসে ললিতা ভাইয়ের কবিতা পাঠ শুনে শুনে তারিফ করছিল।···

চাঁদের মাঠে, আলোর হাটে,
চাঁদের বুড়ি, আনলো ঝুড়ি,
ভরলো তাতে, আপন হাতে
জোছনা মাখা তুলো ···

লতুর খুব ভাল লাগে ভাইএর ছড়া পড়া, রাম বলে 'দিদি জানিস মাষ্টর মশাই কইছে—এই ছড়া ল্যাখছেন—সুখলতা রাও।

ও ঘর থেকে মায়ের গলায় তখন ভেসে আসে নিদ্রামাসির গান। ভাই দুটোর চোখে তখন ঘুমে আর হাসির রাশিতে মিলে মিশে একাকার—লতু ভাবে কোন মেয়ের গান এমন সুন্দর হাসিরশি ছড়িয়ে দেয় রে, আমার ছোট দুলাল ভাইদের ঘুমন্ত চোখে ?...মার সুর ভাসে অন্ধকারে—

"টাকডুমা ডুম ডুম,
হোগলা বনের ফোকলা বুড়ো
খোকার আনো ঘুম ···"

হঠাৎ সব নিঝুম। মা ধরমর করে উঠে আসেন অনেক রাত হলো—ওরে ও লতি তোর বাবা আসেন নাই ?

লতুর মা এসে মেয়ের পাশে বসে অন্ধকার দেখতে থাকেন।…মেয়েকে সান্ত্বনা দেন। মা বুঝিয়েছে… 'উনি আসব এখনই। মহাজন টাকা দিতে দেরী করে হাট বারে…।

মেয়েকে ভরসা দিতে গিয়ে মায়ের স্বগোক্তি চলে। মহাজন টাকা দিব, সেই টাকায়—মুসুরীর বীজগুলি বেচল তোর বাবা … এখন অনেক পয়সার দরকার। আরো কিছু দিন এই মুসুরী ঘরে রাখতে পারলে দুইগুণ পয়সা আনত রে লতি! টাকা পাইলে তোর লইগ্যা একখানা ডুইরা শাড়ী আনব… আর কইয়া গেছেন… কালুর লইগ্যা সিলেট পিন্সিল আনব। আর আনব একখান নতুন গামছা। ওনার গামছাটা ত অনেক দিনই ত্যাগ করবার কথা। আলস্য কইরা নিজের জিনিষে মন দেয় না তোর বাবা। · আগামী দ্বিতীয়ায় কালুর হাতে-খড়ি দিমুরে লতি।

কমলাপতি হাট থেকে ফিরেছিল ভোর রাতে। অনেক কথা সে কয় নাই। ললিতা বুঝতে পেরেছে বাবা যেন কিছু বলছেন না। কিছু গোপন করেছেন আজ।

সকাল হতেই হঠাৎ মা বলেছিল—"রতনরা আইজ দুপইরে কইলকাতা যাইব। তোরা তৈয়ার হইয়া ল' লতি—তোরাও যাবি। রাস্তায় ভাইগো দেখবি…তুই ত বড় হইছিস্—এইখানে আর না— তোর বাবা ক'ন, তোরা যাবি আগে আমরা আসুম কয়েক দিনের মধ্যেই।'

ললিতার প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে। 'বাবা কেন কথা ক'ন না, কিছু হইছে নাকি গোলমাল ?'

মা বলেন—"দ্যাশে বিপদ আইতেছে। যুদ্ধ লাগব। তোরা পোলাপান আগে যা, আমরা জমাজমির ব্যাবস্থা কইরা নিশ্চয় আসুম।… ভয় কি… সোনা খুড়া, মাইজ্যা কাকা আছে দলে…তোমাগ কোন বিপদ নাই। লক্ষী মাইয়া আমার। ওঠ ভাইগো নাওয়াইয়া খাওয়াইয়া লও।' মা ভাত রাধছেন। কাঠের ধোয়া লেগে অনেক জল পড়ছে চোখ দিয়ে—নাকমুখ একেবারে সিঁদুরে রাঙ্গা হয়ে গেছে…

ললিতা হঠাৎ কেঁদে ফেলে—এত ধোয়া করছ কেন—চুলায় কাঠ গোজ না' তারপর ছুটে চলে গিয়েছিল তুলসীতলায়-নীরবে কেবলই মাথা ঠুকছিল তুলসী-

তলায়...শুধু সে চেয়েছিল নিজের ভিটের মাটিটুকু সবই তার ছোট্ট কপালে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে···কলকাতা কতদূর, সেখানে কোথায় ঘর, কোথায় থাকবে। কোথায় আমবাগান, কোথায় পুকুর ধারে শিউলিতলা, আর আনারস খেতের পারে পুরাণ তেতুল গাছ? ঝোপের পারের করবী গাছে বুলবুলির ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়ান...। বাবলা গাছে বাবুইএর বাসা কি কলকাতায় আছে?

তাড়াহুড়োয় ললিতার আর ভাববার সময় নেই। ভাই তিনটের হাত ধরে রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে চলেছে, ঝোপঝার পার হচ্ছে, শুকনো নদী পার হয়ে চলেছে গাঁয়ের সম্পর্কে দাদা কাকার দলে মিশে···

রোজই ললিতা ফ্যালফ্যাল করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘন্টার পরে ঘন্টা কাটিয়ে দেয়···কোথায় তাদের পুকুর ঘাট—তিনটে সাদা হাঁস আর একটা কালো হাঁস পারের ধারে কেবলই ডুব দিচ্ছে আর উঠছে—গাটা তাদের ডোবে না। শুধু মাথাটা ডোবে আর পা দুটো তখন জলের ওপরে উঠে আসে, কমলা রংএর পা। সাদা কালো হাওয়া ভর্ত্তি ঐ হালকা হাঁসের গা থেকে কি করে যে ঐ গাঢ় কমলা রং বেরুল? ললিতা ভাবে ঠাকুরের কৃপায় সবই সম্ভব।

কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় বাবা মা আসছেন না কেন? কেন আমরা খাই একবেলা, কেন আমরা কোন কোন দিন উপোষ করি। ভাই তিনটে যে আর না খেয়ে থাকতে পারে না। তবু আমরা বেঁচে থাকব—মা বাবা ফিরে এলেই আমাদের আবার দুখানা ঘরের বাড়ী হবে। গোলা হবে, বেগুন কুমড়োর চাষ হবে খেতে। রামুর সঙ্গে কাতু আর কালুও ইস্কুলে যাবে।... আর আমার বিয়েও···

রামু ধাক্কা দেয় হঠাৎ। আচমকা ধাক্কায় ললিতার পাতলা দেহটা ছিটকে পড়ে —কাঁদ কাঁদ মুখে রাম ক্ষমা চায়—

"রাগ করিস না দিদি.... আমি তোকে ফেলে দিতে চাইনি। তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, গায়ে একটুও শক্তি নেই, তাই পড়ে গেলি।'

"নারে আমার অনেক শক্তি আছে এই দেখ না হাতের জোর।" বড় বড় চোখ দুটো হাতের চেটোয় মুছবার চেষ্টা করে ললিতা।

"ত্যাখ রাম অনেকক্ষণ তাকালে রোদের রং থেকে আমাগ বাড়ীর ছবিটা ফুটে ওঠে—আমি দেখতে পাই। মা বাবা আর বাড়ীতে নাই—ওনারা

বোধহয় বওনা হইয়া আসছেন ... হাঁসগুলি আর পুকুরে নাই। কেই বা 'চই' 'চই' কইয়া ডাবব, খাইতে দিব। না নিজেরাই শিয়ালের খাদ্য হইছে কে জানে।" "বাবা মা আইলেও আমাগো লগে আর দেখা হইব না। এই কথা সত্য।—এক জাযগায থাকলে ত তাঁবা আমাগো পাইব ? খুঁইজ্যা পাওয়ন একটা কথা নযবে দিদি। কইলকাতা সহব কি একটুখানি নাকি ?"

"দেখ রাম কি খাইবে ? বড যে খিদা পাইছে ? দেখত চাযের দোকান খোলছে কিনা ?"

বড় বড চোখ দুটো মাটিব দিকে নামিযে ন বছবেব ভাই বামহবি উত্তব দেয়—

"একটু পবেই বৃষ্টি একটু ধবব। তখন যামু ঠাকুব ভাইব চাযেব দোকানে ... তোব লইগ্যা আইন্জ একটা ডবল রুটি আনুমই। ধাব ককম দশ পযসা বাকী আমাব হাতে আছে—একটা একটা কবে ভিক্ষাব পযসা কযটা গুণে গুণে দেখে বামহবি ... হ্যা আব দশটা পযসা পেলেই হাফ রুটি অর্থাৎ দিদিব প্রিয় পাওযারুটি একটা আনা চলবে।

পাওযারুটি ললিতাব খুব প্রিয খাদ্য। ছোট বেলায বাবা বলতেন

"মহামায়া আমার ললিতাবাণীবে এই পাওয়াকটিটা দেও। আমি হাট থেকে আসনেব সমষ ভাবলাম মাইয়াটা আমাব পাওরুটি কত না ভালবাসে! ললিতাবে একটা পুবা ডিম ভাইজ্জা দিবা কইলাম। ...মাইযা আমাব বাণী হইব গো। ঠাকুবে কইছেন 'এই মাইযা তোমাব এই ঘবেব জন্য জন্ম লয় নাই।···অনেক সুলক্ষণ আছে ওব দেহে। যেমন তেমন ঘরে এই মেয়েব থাকাব কথা নয।' কথাটা শুনে কমলাপতি খুশি হযেছিল—সত্যিই তবে মেয়েটি আমাব বাজার ঘরে যাবে ? ভেবেছিল পিতা সবলমনে। পত্নীকে তাই গবব কবে বলত "দেখবা গুরুব কথা মিথ্যা বাক্য নয়। ললিতা আমাব রাজাব ঘবে যায কিনা। যোগমাযা তুমি দেখবা, আবাব ভয়ও হতো তাব মনে—বুঝিবা ললিতা বড ঘবে গিয়ে পড়বে—আর কি আমাদের গবীবেব ঘবে আসতে দিবে বড ঘবেব বাজারা। তবু গর্বে প্রাণমন প্রসন্ন হয়—নানা কাজেব মাঝখানে কিছু না কিছু হাতে না করে কমলাপতি বাড়ী ফেবেন না হাট থেকে।

এ কথা কালে কালে ছোট ভাইও জেনেছে···বাড়ীতে পাওরুটি আসলে দিদিই খাবে বেশী। ভাইবা তার ক্ষুদ্র অংশেব অধিকাবী মাত্র।

রাম কথা দেয় দিদিকে, বৃষ্টি থামলে হয়। যেমন করেই হোক না কেন সে পাওরুটি একটা সংগ্রহ করে এনে দেবেই। তবে চুরি সে করবে না—আবার পয়সাগুলি নাড়াচাড়া করে। টিনের কৌটোর শব্দ হতেই চমকে থেমে যায়—বুঝিবা কালু জেগে যায়। না, খুব ঘুমিয়েছে আজ আর জাগবার কোন চিহ্ন নেই মুখে, অন্যদিন এরমধ্যে কত না কান্নাকাটি, বায়না শুরু করত খিদের জ্বালায়—

"সূয্যি মামা উঠি উঠি করে রে রামু!"

"তুই কি খোয়াব দেখছিস নাকি লতি?" ভাইয়ের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে ...

হঠাৎ প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ণ বেজে একটা মোটর গাড়ী ললিতার চালাটার একদম কাছেই থেমে পড়লো। রাস্তার বাঁকে ভারী লরীটা একটা ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ শব্দ করে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে—একটা নেড়ী কুকুরের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে। কি একটা খাবার লোভে ছুটছিল সেটা। রাস্তার ওপার থেকে এপার হবার পথে লরীটা থেমে পড়ে —। কুকুরটা বেঁচে যায়।

ঐ লরীটা থেকেই কি একটা কাগজের মোড়ক ছুড়ে ফেলেছিল—ললিতার চালার দিকে—জলের ছাটে আর দমকা হাওয়ার ঝাপটা লেগে সেটা গিয়ে পড়েছে ঐ বিরাট লরীটার ভারী চাকা ঘেঁষে।

ললিতা উঠে বসেছে। ঢলঢলে ছোট্ট মুখখানির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ঝাকড়া ঝাকড়া পাটকিলে রং ঘন চুলের গোছা। ডাগর ডাগর চোখদুটিকে ঢেকে দিয়েছে চুলের রাশি। ভাল করে দেখবার চেষ্টা করেই ললিতা ঝাপিয়ে পড়লো রাস্তার সেই ভারী চাকার পাশে......

হ্যা, পাওরুটিই ত। একটুকরা নয়—। গোটা একটা।......বাসি রুটিটা ছুড়ে দিয়েছিল লরীর চালক। পরশু সকালে সে কিনেছিল বাড়ীতে ছোট ছেলেটা পেলে খুশি হয়ে যাবে ভেবে—। —বৃষ্টিতে রাস্তায় আটকা পড়েছিল পুরুলিয়ার কাছে—। এইত সবুজ সবুজ ছোপ পড়েছে রুটির গায়ে—। বোধ হয় ঐ ভিখারী ছেলেমেয়েদের দেখতে পেয়েই ছুঁড়ে মেরেছিল—যদি ওরা খেতে পারে। রুটিটা পচে গেছে। ললিতার হাত দুটো রুটীর স্লাইস্‌ স্পর্শ করা মাত্রই নরম কাঠ কাঠ হাত দুটী অবশ হয়ে গেল কেন?

শরীটা এগিয়ে গেছে। মুহূর্তে পেছনের এ্যামবেসেডরখানা গড়িয়ে এসে ঐ কচি দেহটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মুখের মধ্যে জিবটা গুটিয়ে যাচ্ছে......এবার জিবটা গলার ভেতরে চলে যেতে চাইছে যে, ঠোঁটটা শুকিয়ে গেল- ক্ষীণ একটা শব্দ মাত্র শোনা যায় 'জল'—

গাড়ীর ভেতরে আর একটি কচি গলা শোনা যায়

"মা এই যে আমার জলের বোতল"

"চুপ কর Baby, বড্ড বেয়াদপ হয়েছ" মায়ের শাসন বেবীকে নির্বাক করতে অসমর্থ।

আবার শোনা যায় সেই আকুল কণ্ঠ—"মা মেয়েটা জল চাইছে যে···'

"ড্রাইভার হা করে দেখছ কি? তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাও। খোকাকে স্কুলে পৌঁছতে হবে না? নাও ছোটাও গাড়ী...কে কোথায় পড়লো···মরলো ···যত সব।"

সাতবছরের খোকাকে উদ্দেশ করে—মা তখন স্বগতোক্তি করেই চলেছেন। কয়েকটা পাউরুটির টুকরো রাস্তায় ছড়িয়ে আছে···। রাস্তার ওপার থেকে লোমবিহীন সেই নেড়ীটা জলের ছাঁট বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করে—ভিজে ভিজে এসে একটা রুটির টুকরা মুখে পুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। পরমুহূর্ত্তেই—আবার এক পা একপা করে ফিরে—গিয়ে দুবার পাক খেয়েই নিজের স্থানটীতে শুয়ে, সামনে পাদুটির প'রে থুতনী রেখে রাস্তার ওপরে রক্তের ছিটগুলোর দিকে অপলক দৃষ্টিমেলে বসে রইলো।

কোন এক সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিবা পৌঁছে দিয়েছে কোন হাসপাতালে— ঐ দেহটি সেখানে নেই শুধু পড়ে আছে পাওরুটির টুকরোগুলো—রাস্তার জলে আর ডেলা রক্তের সঙ্গে মিশে আরো ফুলে উঠেছে পাওরুটির টুকরো- গুলি—। আবার জোরে বৃষ্টি এলো ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্।

নিঃসঙ্গ বেদনাতে

সমীরণ রুদ্র

সূর্যমুখী যে মেয়েটির কথা আমি বলছি, সে ছিল সুহাসিনী ও সুভাষিনী। মেয়েটির নাম ছিল প্রণতি। যৌবনের সঙ্গে অমন রূপ আর লাবণ্য সচরাচর এদেশে চোখে পড়ে। আমরা একই কলেজ থেকে একসঙ্গে বি এ পাশ করেছিলাম। সে থাকতো ভাগলপুরে। আমি থাকতাম মুঙ্গেরে। ওর বাবা ছিল ভাগলপুরের পোষ্ট মাষ্টার। আমি যখন ছেলেবেলায় জামালপুর ও মুঙ্গেরে ছিলাম সে আসতো আমাদের বাড়ীতে। ভাগলপুর গেলে আমি থাকতাম ওদের বাড়ীতে। আমার পিসেমশাইও ছিলেন মুঙ্গেরের পোষ্ট মাষ্টার। ছেলেবেলায় আমি আমার পিসেমশায়ের কাছেই মানুষ। আমার পিসেমশাই ও প্রণতির বাবা দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল ছেলেবেলা থেকে। তাই আমাদেরও পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই। আমি পাশ করলাম মুঙ্গের থেকে ও পাশ করলো ভাগলপুর থেকে। তারপর দুজনেই এলাম আমরা একসঙ্গে কোলকাতাতে পড়তে। দুজনে একই কলেজে ভর্তি হলাম। ও থাকতো মেয়েদের হোষ্টেলে আর আমি ছেলেদের হোষ্টেলে। এইভাবে দুজনেই বি এ পাশ করি। আগেই বলে রাখি এখানে আমাদের মধ্যে প্রেম বা প্রণয় বলে কিছু নেই। সে ছিল আমার বান্ধবী, আমার সুখে সুখী এবং আমার দুঃখে দুঃখী। আমিও তাই। বি এ পাশ করার পরে ওর বিয়ে হয়ে গেল। কোলকাতারই কোন এক অভিজাত পরিবারের একটি ছেলের সঙ্গে। প্রণতির বাবা দূর থেকে পাত্র সম্বন্ধে অত খোঁজ খবর নিতে পারেন নি। ছেলেটি বি কম পাশ- ছিল। দেখতে ছিল কার্তিকের মতো সুন্দর। ব্যাঙ্কে চাকরী করতো। কোলকাতায় নিজেদের বাড়ি ও গাড়ি। এই দেখেই ওর বাবা বিয়ে দিয়ে দিলেন ওখানে। প্রণতির বাবার দোষ নেই সত্যই অপূর্ব সুন্দর ছিল ছেলেটিকে দেখতে। ফর্সা, মাথায় একমাথা কোঁকড়ানো চুল, টানা টানা বড় বড় চোখ, অপরূপ স্বাস্থ্যের অধিকারী। কোলকাতায় নিজেদের ব্যবসা। রূপের সঙ্গেই অপরূপের মিলন হয়েছিল।

প্রণতির খুব পছন্দ হল তার স্বামীকে, মন প্রাণ দিয়ে সে ভালবেসে ফেললো অসীমকুমারকে। হ্যাঁ অসীমকুমারই ছিল তার নাম। কিন্তু কোথায় যেন একটা বিষাক্ত কীট কিলবিল করছিল সেই ছেলেটির মধ্যে। কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। একটা নোংরা স্বভাব। ইতর মন। প্রণতির বাবা তা আগে টের পাননি। আসলে চরিত্র-হীন ছিল অসীমকুমার। মদ খেত। স্ত্রীকে মারধোর করতো। বিয়ের পরে প্রণতিই তা আস্তে আস্তে টের পেল। অসীমের এই অত্যাচারে সে অতিষ্ট হয়ে উঠল। অথচ লজ্জায় মুখ ফুটে সে কাকেও কিছু বলতে পারলো না। মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে সে দিন কাটাতে লাগলো। বিয়ের আগেই অসীম ভালবাসতো রত্না নামে একটি মেয়েকে। কিন্তু সেই গরীব মেয়েটিকে ও বিয়ে করলো না। করলো টাকার লোভে প্রণতিকে। প্রণতিকে যে সে বিয়ে করেছে সে কথাটাও রত্নার কাছে বেমালুম চেপে গেল সে। রত্না কিন্তু টের না পেলেও প্রণতি ক্রমশ: স্বামীর উপর সন্দিহান হয়ে উঠলো এবং একদিন সব জানতে পারলো। রত্নার কাছে অসীম মাঝে মাঝে রাত কাটাতো। অথচ প্রণতি ঐশ্বর্য্য ও যৌবন সম্ভার অকপটে দিতে চেয়েছিল তার স্বামীকে কিন্তু পারলো না। নিজেকে গুটিয়ে নিল। এসব জেনে কোন মেয়েই পারে না। অসীম কখন্ বাড়ী আসে কখন্ চলে যায় কিছুই ঠিক নেই। কোনদিন বা রাত্রে থাকেই না। জিজ্ঞাসা করলেও মিথ্যা কথা বলতো, একটি টাকা পয়সাও বাড়ীতে দিত না। তার কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। সবটাই যেন বিশৃঙ্খলা সর্পিল জটিলতা। মধ্যে মধ্যে আমি যেতাম প্রণতির কাছে, আমার সেই আবাল্য সহচরীর কাছে। দেখতাম তার গায়ে প্রহারের দাগ। অথচ সে অসীমের এই নির্যাতনের কথা ও নোংরা মনের কথা কিছুই বলতো না আমাকে। সবটাই চেপে যেত। আমি যেতাম বলে উপরন্তু ককটেল ফেরত অসীম প্রণতিকেই সন্দেহ করতো। এই সন্দেহের বশে মাতাল অসীম তার স্ত্রীকে আরো বেশী আঘাত করতো। প্রণতি নীরবে নতমুখে তা সহ্য করতো। কুৎসাটা বেশী ছিল আমার নামেই। কলঙ্ক মাখাতো অন্য পুরুষের গায়েও। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। একদিন সেই সীমা রেখা ছাড়িয়ে গেল। অন্ধকার নদীতীরে প্রথম ও শেষ সামগান বাজল। বিরোধ বাধলো মনের সঙ্গে মনের, প্রণতির রুচি আর শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি অন্য জাতের ছিল। তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ছিল। এই নিত্য ভিতর এবং বাইরের সংঘর্ষে

প্রণতি অবিরত মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। তার খাওয়া ছিল না, ঘুম ছিল না। সে রুগ্ন ও রুক্ষ হয়ে গেল। ক্রমশ: তার মস্তিকের গোলমাল দেখা দিল। অবশেষে সে একদিন পাগলই হয়ে গেল। স্বামীকে ভালবেসে সে পাগল হয়ে গেল। অথচ স্বামী তার মোটেই যোগ্য নয়। মাতাল চরিত্রহীন। আজ ভাবি প্রণতির এই পরিণামের জন্য দায়ী কে? আমাদের সমাজ? না আর কেউ? সমাজে অসীম তো কোন শাস্তিই পেলো না। তার বুকে রোজই মহোৎসবের বাজনা বাজে। আমোদ স্ফূর্তি হয়। অথচ প্রণতি রইলো উন্মাদ আশ্রমে। এদিকে অসীম কুমার প্রকাশ্যে রত্নাকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুললো একদিন। প্রণতির গহনা উঠলো রত্নার গায়ে। প্রণতির বাবার দেওয়া খাট বিছানাতে রাত্রে শুয়ে রইলো রত্না ও অসীম। না জানি কত আঘাতই মেয়েটা পেয়েছে যে জন্য সে পাগল হয়ে গেল। জানিনা সে ভাল হয়ে উঠবে কিনা, নাকি তার সারা জীবন ওই উন্মাদ আশ্রমেই কেটে যাবে। আর ভাল হয়ে যদি সে ফেরে, সে উঠবে কোথায়? তার স্বামীর ঘরে, না তার বাবার ঘরে? নিষ্ঠুর স্বামীর ঘরে সে সতীন নিয়ে ঘর করতে গিয়ে আবার পাগল হয়ে যাবে না তো? আর বাপের বাড়ীতে বাপের অবর্তমানে ভাই ও ভাজের গঞ্জনার মধ্যে সে আবার দুঃখ পেয়ে পাগল হয়ে যাবে নাতো? তারচেয়ে পাগলী হয়ে সে তো সব দুঃখ ভুলে আছে। তাই থাকুক। অথবা তার মৃত্যু হোক। আমি তার বাল্য বন্ধু হয়ে এই কামনাই করি। আশা বলে আমাদের কলেজে আর একটি মেয়ে পড়ত, তার বিয়ের পরে সে যখন জানতে পারলো যে তার স্বামী মদ্যপ ও লম্পট। সেই থেকে আশা বাপের বাড়িতে ফিরে এল আর কোনদিন ওই স্বামীর ঘরে ফিরে যায়নি। নিজে চাকরী করে, স্বাধীন ভাবে থাকে। এখন তার বাবা বেঁচে আছেন বলে বাবার কাছেই সে থাকে, নচেৎ আশা দৃঢ়কণ্ঠে বলে 'একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে সে আলাদাই থাকবে।' এখন আশা মাসে মাসে একগোছা টাকা উপায় করে এনে বাপের হাতে দেয়। ইচ্ছামত সাজে গোজে, সিনেমায় যায়, খায় দায় আনন্দেই থাকে। বলে, 'বেশ আছি বাবা। প্রণতির মতো অমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে এই বেশ আছি। যদি কোনদিন সেরকম সৎ উদার মনের মানুষ পাই তবে তাকে বিয়ে করে তার সঙ্গেই থাকবো। নচেৎ এখন এই বেশ চলে যাচ্ছে।'

চলে যাবেও। আমার মনে ছিল লোভ। আমার প্রাণে ছিল ভয়। আমি সেগুলিকে খুন করে অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসেছি। জীবনে প্রেম এল না বলে আমার কোন দুঃখ নেই। আত্মপীড়নের অসীম যন্ত্রনা নেই। কারো কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইবারও নেই। এই বেশ সুন্দর স্বাধীন মুক্ত জীবন।' আমি ওদের দুজনের কথাই ভাবি আর দেখি বিকীর্ণ বিকেল বেলা পাখিরা হারিয়ে যায় দূর থেকে দূরে দূরে,—ঝাঁকে ঝাঁকে।

ছড়ায় মা বাংলা

তমাল চট্টোপাধ্যায়

বুকের খুনে হাত রেখে মা
বাড়া মনের বল
পণ করেছি মুছবো তোর ওই
ডাগর চোখের জল।

একশ' নদী রক্ত দেবো
দেবো শবের ভেলা
মুক্তি স্নানের শেষে মাগো
আসিস্ ভোরের বেলা

একই মায়ের স্তন দুটিতে
দু'ভাই রাখি মুখ
তাতেই মায়ের হৃদয় জুড়ায়
গর্বে ভরে বুক।

তুমি হঠাৎ আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলে

কবিরুল ইসলাম

তুমি হঠাৎ আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলে
আমি টের পাই
অকস্মাৎ তুমি হেঁটে চলে গেলে
আমি জানতে পারি :
তোমার পায়ের চিহ্ন, নিশ্বাসে সুবাস
সুবাতাসে সমাচার রেখে চলে যায়
আমি বুঝতে পারি।

আমি সেজেগুজে তৈরী আছি, আসময় আছি
এই মুহূর্তের অপেক্ষায়
এমন কি স্বপ্নের ভিতরও
সারারাত্রি জেগে আছি
কখন বাগানে
সাধের সকাল ফুটবে তাই।

তুমি হঠাৎ আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলে
আমি টের পাই
অকস্মাৎ তুমি হেঁটে চলে গেলে
আমি জেগে উঠি

তুমিময় আমার নিখিলে।

পিতামহের প্রতি

কাজল ঘোষ

পিতামহ,
এ জীবন ছুঁয়ে গিয়ে
কোথায় লুকালে,
প্রজ্ঞার বৈদেহী তীরে
আমাদেরও নিয়ে চল তুমি।
গোলাপের বুকে ছিল
করুণ বাসনা
সেই ফুলে মালা গেঁথে
কে সাজালো ঈশ্বরী প্রতিমা।
তাই বলি—
কে কোথায় যুক্তি মেনে
ভুলেছে ঈশ্বর !
পিতামহ,
পুনরায় জীবনকে ছুঁয়ে তুমি
ঈশ্বরের আবরণ
উন্মোচন কর
প্রত্যেকেই ফিরে পাক
গভীর বিশ্বাস।

রোগাক্রান্ত

গোপাল ভৌমিক

বুকে যক্ষ্মা রোগের বীজাণু নিয়ে
আমরা প্রত্যেকে নিরুপায়
তবু ভাল থাকার ভান করতে
সকাল বিকাল কেটে যায়।

নিজেকে ঠকাতে গিয়ে অপরকে
ঠকাতে কে ভাবে এক তিল?
চোরে বাঁটপারে খেলা জমে উঠে
এ জীবন করে হালফিল।

দেঁতো হাসি বাঁকা মন
জলুসের টেরেলিন পরে পথ হাঁটে;
ভিতর যায় না দেখা, রক্ষা তাই
দুঃখ লেখা থাকে না ললাটে।

আমাদের প্রেম ঘৃণা ভালবাসা
কুঁরে কুঁরে খায় পোকাগুলি
যন্ত্রণা গোপন করে প্রশ্ন করি
বহুবিধ, হোক তা মামুলি।

প্রতন্থ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

দোটানা জমিন।
একদিকে সরু স্থতো আর-দিকে মোটা।
একদিকে শহরের মার্জিত সভ্যতা আঁটোসাঁটো,
অন্যদিকে বৃদ্ধবট জীবন গ্রামীন।
একদিকে উচ্ছল উদ্দাম মন চলোর্মি চঞ্চল,
অন্যদিকে অনুপুঙ্খ নিষ্ঠা সামাজিক,
বিদ্যুৎ আলোকে দীপ্ত গর্বী নাগরিক—
হেয়ো ভাবে গ্রামের অঞ্চল।
অথচ একটি প্রাণ বাঁচে না এককে
শহরের স্রোত আছে অফুরন্ত চাঞ্চল্যে বিলাসে ;
কিন্তু তার রসদের যোগানদারীর খোঁজ গ্রামীন নিবাসে,
অতি সূক্ষ্ম সুর তুলে অনুরণনিত এক ত্বকে।
স্থূল থেকে সূক্ষ্ম তনু প্রার্থিব নিশ্চয়—
প্রকৃতির আদিভূমি তবু পাশে সৌন্দর্যে নিলয়।

শেষ কোথায়

মানস সেনগুপ্ত

ছোট ছোট অক্ষর নিয়ে গড়ে তুলি শব্দ,
মনের সংরাগ মিশিয়ে সৃষ্টি করি কাব্যের মাধুরী,
তবুও বিপ্লব নিয়ে আসি পৃথিবীর বুকে,
ছোট বড় বাঁধা নিয়মের আঙিনায়,
উদবেজিত, উৎক্ষিপ্ত জীবনে খুঁজি প্রত্যাশা,
আলোর সরণী ধরে অসীম শূন্যতায়।

আমি দেখেছিলাম, শুনেছিলাম

হেনা হালদার

আমি একবার ঈশ্বরের মুখ দেখেছিলাম।
না, সিংহাসনের ওপরে নয়
সোনার মুকুটের নীচে নয়
ফুলের পাহাড়ের সামনে নয়
পবিত্র নদীর পেছনে নয়
কিন্তু আমি দেখেছিলাম, আমি দেখেছিলাম
নিঃসন্দেহে আমি ঈশ্বরের মুখ
দেখেছিলাম।
আমি একবার ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম।
না, ধর্ম প্রচারকের বক্তৃতায় নয়,
দার্শনিকের তত্ত্ব কথায় নয়
পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে নয়
নগর সংকীত্তর্ণের সমবেত সঙ্গীতে নয়
কিন্তু আমি শুনেছিলাম, আমি শুনেছিলাম
নির্ভুল ভাবে আমি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর
শুনেছিলাম।
যখন একটি উদ্বাস্তু বালক ওরই মত
আর একটির
গলা জড়িয়ে বলছিল : 'তোর মা-বাবা
ভাইবোন সকলে মরে গেছে তাতে ভয় কীরে
আমি রয়েছি না?'

স্বপ্ন চুরি ঘোর নিশীথে

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমারই জন্যে সাতটি রঙের স্বপ্ন চুরি
ঘোর নিশীথে
স্বপ্ন মাখা দূর প্রদেশে কথার আড়াল
ধুয়েই যাবে মুছে যাবে স্পর্শ আঁধার
বালিকা বেলার মুখচ্ছবি
মৌল ব্যথায় চেনায় যদি দৃশ্য জগৎ
স্বপ্ন চুরি হলেই কিছু নেই
আপাতত সাক্ষী তবু পত্রীবাবুর ছবির ফ্রেম
স্বপ্ন নিয়ে
তোমারই জন্যে স্বপ্ন চুরি ঘোর নিশীথে
সারারাতই বাগান জুড়ে চোরা বাতাস সজাগ অসুবিধে
রঙ ভাঙছে ঝুম নিঝুম পাখপাখালি
বড়ই ঘুম এ নিশীথে
সাতটি রঙ ধুয়েই গেল
অবগাহন ভেবে
দিব্য করে বলতে পারি
এমনিতর গোপন কাঁদা
বিশ্রাম সংগীতে
সাতটি রঙের খেলাচ্ছলে

স্বপ্ন চুরি ঘোর নিশীথে

অক্টোপাস্

যতীশ ভট্টাচার্য

পৈশাচিক আনন্দের ফোয়ারা ছড়ানো
জীবনের আদিগন্ত,
হিংসার দৌরাত্ম্যে রুদ্ধ হৃদি-বাতায়ন
জিঘাংসার ভস্মাকীর্ণ দৃষ্টির সম্মুখপথ;
চোখের তারায় জ্বলে স্বার্থের ঝিলিক,
লক্‌লকে লোলজিহ্বা—চৌদিক ছড়ানো আগুন :
ঈর্ষার দাবানল—দাবদাহ।

দুঃসহ জীবন।

বার বার দম্ আটকে আসে
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
'স্থবিরতা অক্টোপাস' আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরেছে :
নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাই
'সোচ্চার' হতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাই।

প্রশ্ন জাগে : আমি কি বেঁচে!

পা-চাটা

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

পদলেহনের অন্নে
থাকা বা না থাকা সমান—তবু স্বার্থপর জানে পা-চাটা
মনিবের সামনে গিয়ে
নতজানু দৈনিক হাজিরা না দিলে মোটা মাসোহারা যাবে কাটা
এই জন্যে
হন্যে
হয়ে অশোভন দৌড়োনো বা হাঁটা

ঘৃণা করি আমি শিরদাঁড়াহীন নিঃস্ব বুকের-পাটা।

শারদ জ্যোৎস্না রজনী

সুজিত কুমার রাণা

উনিশশো সত্তর দশকের
শারদ জ্যোৎস্না রজনী—কোজাগরী পূর্ণিমা।
নেশা নেশা গন্ধ প্রেমের—
কার প্রেম—অষ্টম এডওয়াড
নাকি সাজাহানের ?
স্মৃতির মন্দির আলোয় আলোময়
দেখিনি তাজকে
তবু-নেশা নেশা ঘুম ঘুম ভাব
তন্দ্রা আনে প্রেমে।
ভালবাসাকে স্মৃতি করে রাখতে শিখিনি
শুনেছি সাজাহানের অনুশীলন
কোজাগরী পূর্ণিমায়—অপূর্ব—অপূর্ব
ষোলকলা পূর্ণ ভালবাসায়—হৃদয়ের প্রলেপ।
সব কেমন রোমান্টিকতায় পূর্ণ
অথচ আজ আমি একা—একলা।
সাজাহানে আমাতে নেই কোন তফাত
আমার স্মৃতি পূর্ণতায়—
সাজাহান পরিপূর্ণ
অথচ দুজনেই একা, শারদ পূর্ণিমায় কৃতজ্ঞ।
শুধু তাজের স্মৃতি চারণে সাজাহান প্রয়াসী
আর আমি ভবিষ্যতের পিয়সী।

যেতে যেতে

দুর্গাদাস সরকার

দুই পা গেলেই দেখা যাবে-ঝুলছে লণ্ঠন মুদির চালায়,
বেচাকেনা বন্ধ বলেই এখন একটু সলতে নিচু,
ঘরে গেছেন মুরুব্বিরা, দু-চারজন আছে কিছু,
কেউ শাসাচ্ছে কেউ বা হাসছে, মশগুল কেউ আলোচনায়।

খেত-খামারে গোয়ালঘরে যুদ্ধ হয় না কামান দেগে।
জলছবিতে : রক্ত তবু ঘষছে হাতে সেনাপতি,
তা দেন তাঁর গোঁফের ডগায়, একটা লোমও খসে যদি
কী যে ঘটবে সেই ভয়ে কি রাত কাটায় সব জেগে জেগে।

হঠাৎ তখন শেয়াল ডাকে, শরবনে রব সাজো সাজো।
থম্‌থমে গ্রাম কাঁপতে থাকে, খেপে ওঠে খেঁকী কুকুর,
ঢেউ তুলে যায় তখন যেন পূব-পাড়ার এক এঁদো পুকুর,
সেই যে কবে যুদ্ধ লাগল, থামল নাক' যুদ্ধ আজো।

সকাল হতেই খবর হচ্ছে রেডিও-তে উঁচু গলায়—
'দাম-বেড়েছে, তাই বলে কেউ দেবেন না দাম বাড়িয়ে গলা।'
মুদির দোকান চলছে মন্দে. ঝিমুচ্ছে ঐ আড্ডাঅলা,
লাইন করে লোকগুলো সব শান দিতে যায় ভাঙা কলায়।

এখানে কেন

সমরেশ ঘোষ

তোমাকেই শুধু বলা যায়
বলা যায় সীমাহীন জনতার নির্জনতায়
এখানে কেন এসেছি
এই বক্র সরল পৃথিবীর রমনীয় ভীড়ে
ফণিমনসা অপরাজিতার প্রেয়সী নীড়ে।

তোমাকেই শুধু বলা যায়
বলা যায় এখানে কেন এসেছি।
এখানের আলো অন্ধকারে স্নান সেরে
আগুন অঙ্গার ছুঁয়ে শরীরে মেখে
মাটি গাছ ফসলের ঘ্রানে
কৃষানের সাধ পেতে চাই ...

তোমার দু' চোখের শব্দহীন অজস্র ধ্বনির গভীরে নেমে
পৌষের সবুজ মেলায় নবান্নের গান বেঁধে
শরীরী অশরীরী তোমাকে নিবিড়তম আমাকে
নিঃশেষে ভালবেসে
পৃথিবী নাড়ীর ঋণে ঋণে রিক্ত হতে চাই।

Robert Browning-রচিত যুগল কবিতার
(Companion piece) ভাবানুবাদ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

Love in a life

ঘর হতে ঘরে ফিরি
ঘুরে মরি দুয়ারে,
একসাথে আছি তবু
কখনো যে দেখিনি উহারে;

অন্তরে আশা দিয়ে জেগে আছি দেখা হবে নিশ্চয়,
আজকে না হয় হল, জমা থাক্ আরো কিছু বিস্ময়,
আনাচ কানাচগুলো ভরপুর যেন তার গন্ধে
আল্সের কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটবেই তালে তালে চরণের ছন্দে
আয়নায় মুখ তার রূপ নিয়ে ভেসে উঠে ঝংকার দেবে বাজুবন্ধে ॥

ভাবনায় ভাবনায়
দিনগুলো এমনিতে কেটে যায়,
আমি যে আগের মত
ঘরে ঘরে খুঁজে ফিরি নিরাশায়

আবার ব্যাকুল হয়ে ভাগ্যের যাচাই করি একলাই—
যখন এসেছি ফিরে শূন্য ঘরে তবু তারে দেখি নাই,
বেদনায় দিনগুলো কেটে গেছে, কেবা তাঁর খোঁজ নেয় ?
ব্যর্থ সন্ধান শেষে গোধূলির রঙে কত কিছু মুহূর্তের হল ব্যয়,
ঘর হতে ঘরে গেছি কত না আকৃতি নিয়ে এইভাবে সকাল সন্ধ্যায় ॥

Life in a love

এড়িয়ে আমায় পালিয়ে যেতে পরবে না—
আমি তো সেই আমিই আছি, তুমিও আছ কাছাকাছি
জগতটাতে আমি এবং তুমি যতই থাকছি,
তুমি ডাকে দাও না সাড়া আমি ততই ডাকছি।

তুমি যতই পালিয়ে বেড়াও আমার আমি হারবে না।
হয়তো আমার ভ্রান্তি আছে, আজকে তারে বুঝলাম,
তোমার প্রেমের মূল্য দিতে জীবনটা ভোর যুঝলাম;
ব্যর্থতাকে বরণ করে নিয়ে,—
পরাজয়ের পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবো, প্রিয়ে।

লক্ষ্য যদি নাই বা পেলাম, কিসের ক্ষতি তাতে ?
মোচড় দিয়ে মনটাকে তো কঠিন করি অমনি সাথে সাথে,
অর্থ যে নেই চোখের জলে, হাসতে পারি হতাশ হলে,
নতুন কোরে বাঁচার আশা নিজের হাতেই গড়ি,
ভালবাসার অন্বেষণে এমনি কোরেই ঘুরে ফিরে মরি।

যখন তুমি সুদূর হতে দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে চাও,
বেলাশেষের সকল কিছু তোমায় দিলেম, দু-হাত ভরে নাও;
পুরোনো সব আশা যত সঙ্গোপনে শেষ হতে না হতে,—
উঠল জেগে নতুন আশার স্রোতে,
আমার আমি নতুন পেল রূপ,
আমার কাছে বিদায় নেবে ? সে কথাটা শুধু যে বিদ্রূপ॥

শারদীয়া ছন্দিত

নবান্ন

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য

["সারা এশিয়ায় এক অগ্নিগর্ভ পটভূমিকার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিম এশিয়াতে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে অনেক দিন আগেই। ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের প্রত্যন্ত দেশগুলিতেও ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে—দক্ষিণ এশিয়ার ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের গর্ভেও আগুন সঞ্চারিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর থেকেই। এমন কি তার আগে থেকে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ জীবনে অগ্নি বন্যা শুরু হয়েছিল। •...ভিয়েৎনাম এবং অন্যত্র সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই। বাকী ছিল দক্ষিণ এশিয়া। এতদিন পরে সেই দেশও আলোড়িত, আন্দোলিত এবং বিস্ফোরিত।" আজকে সেই বিস্ফোরণেরই মহড়া চলছে। এই বিস্ফোরণকে আমরা স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে ধীক্কার জানাই ট্যাঙ্ক, স্যাবার জেট, ক্ষেপনাস্ত্রকে। সমগ্র মুক্তিকামী মানুষের লড়াইকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের নাটক—'নবান্ন'।

বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করছেন—

প্রহরী
ভূপাল
মহীতোষ
প্রশাসক
সেনাপতি
রথীন
ইন্দ্র
শান্তনু
অম্বর
অসিত
জয়ন্ত

ঘোষনা শেষ হওয়া মাত্রই ভেতরে রেকর্ডে বাজবে একটা যুদ্ধের বাজনা। একই সংগে ঢোল, ঝাঝ ইত্যাদি খুব জোরে একটা প্রবাহ সৃষ্টি করে বাজানো হবে। মিনিট খানেক এইভাবে বাজার পর আস্তে আস্তে এটা কমে আসবে এবং বাজবে প্রহরীর বাদ্য। পর্দা খুলবে যুদ্ধের বাজনা বাজার সময় আস্তে আস্তে। একটা তবলার বায়া কালো কাপড়ে মুড়ে গলায় ঝুলিয়ে পেটাতে পেটাতে খালি মঞ্চে প্রবেশ করে প্রহরী। প্রহরীর পোষাক সাদা মোটা জামার ওপর কালো রং-এর ফিতে লম্বালম্বিভাবে ঝুলিয়ে মেশিনে সেলাই করা এবং টাইট চোস্ত। মাথায় আছে শোলার কালো রং-এর মুকুট। মুকুটের শীর্ষ দেশে একগুচ্ছ সাদা কাগজ কাটা। মুখে পেইন্ট অর্দ্ধেক সাদা অর্দ্ধেক কালো। পায়ে একটা সাদা একটা কালো ক্যাম্বিসের জুতো। প্রহরী প্রবেশ করার আগে ভেতরে চীৎকার করে বলবে—'ওরে, তোরা শুনেছিস, প্রশাসকের আদেশ' এবং এই কথাটাই ভেতরে প্রবেশ করেও মঞ্চের কোণে কোণে দৌড়ে গিয়ে বলবে। এইভাবে চারকোণ চারবার বলার পর মঞ্চের তিন-চতুর্থাংশ পিছনে যেখানে আর একটা পর্দা (মঞ্চকে দুভাগে ভাগ করে নেবার জন্য) ঝুলছে, তার মাঝামাঝি অংশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত উচুঁতে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বলে—'ওরে আমার আর্ত চীৎকার কি তোদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করছে না! দর্শকের দিকে এগিয়ে 'তবে তোরা উত্তর দিচ্ছিস না কেন? তোরা কি শুনতে চাস না প্রশাসকের আদেশ?'

দুদিক দিয়ে তিনজন-তিনজন করে প্রবেশ করে রথীন, ইন্দ্র, শান্তনু এবং অম্বর, অসিত, জয়ন্ত। এদের মধ্যে রথীন ইত্যাদির পোষাক আকাশী রং-এর। জামাগুলোর কলার পিছন দিকে হবেনা, হবে সামনের দিকে। বুক ঢোলা। হাতা তিন-চতুর্থাংশ। প্যান্ট-চোস্ত। মুখে প্রত্যেকের লাল রং করা। পোষাকের রং অনুযায়ী প্রত্যেকের পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো।]

সকলে : কী প্রহরী?

প্রহরী : অবিলম্বে সকলকে কর্মস্থলে ফিরে যাবার জন্যে প্রশাসক আদেশ দিয়েছেন।

সকলে : যদি না যাই?

প্রহরী : প্রশাসকের বিশেষ মন্ত্রবলে; কর্মস্থলে ফিরে না গেলে, কর্মহীনের তালিকায় তুলে দেওয়া হবে।

রথীন : এটাই কি প্রশাসকের আদেশ ?

প্রহরী : (রথীনদের দিকে বাঁ হাত এলিয়ে) হ্যারে মাটির খেকারা, (অম্বরদের দিকে ডান হাত এলিয়ে) আকাশের দূতেরা।

অম্বর : আর কোন আদেশ প্রশাসকের আছে ?

প্রহরী : (অম্বরের কাছে গিয়ে) আপাতত নেই। (রথীনদের কাছে) সঠিক উত্তর পেলে আবার শোনাবো নতুন আদেশ।

ইন্দ্র : আর কোন আদেশ শোনাতে হবে না প্রহরী। তুমি তোমার প্রশাসকের স্বর্গ-পুরে ফিরে যাও। গিয়ে বল, তার আদেশ আমরা মানিনা।

সকলে : হ্যা।

প্রহরী : (সকলের কাছে দৌড়ে) আ-হা-হা-হা-হা ! একি কথা বলিস তোরা, তাতো জানিস না। (অসিতের কাছে এসে শেষ)

অসিত : আমরা ঠিকই জানি আমরা কি বলছি।

শান্তনু : কে প্রশাসক ! কোথাকার প্রশাসক ? (প্রহরী শান্তনুর কাছে যায়)

জয়ন্ত : আমাদের পুরীতে কোন প্রশাসক নেই। (প্রহরী জয়ন্তর কাছে যায়)

রথীন : আমাদের পুরীতে আমরাই শাসক। (প্রহরী রথীনের কাছে যায়)

প্রহরী : (ভয়ে মাঝমঞ্চে সরে আসে) ওরে চুপ ! চুপ !! চুপ !!!

সকলে : কেন ?

প্রহরী : তোদের জন্যে অপেক্ষা করছে মহা-অন্ধকূপ।

অম্বর : অন্ধকূপের ভয় দেখিয়ে আর আমাদের দমাতে পারবে না।

ইন্দ্র : তন্ত্রের দীক্ষায় আমরা হয়েছি বলিয়ান।

প্রহরী : আবার বলছি চুপ,
প্রশাসকের মন্ত্রে তোরা ধরবি যন্ত্র রূপ

সকলে : (নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে) যন্ত্র !!

প্রহরী : হ্যা যন্ত্র। (বাহু পিটিয়ে সকলের কাছে একবার ঘুরে আসে গোল হয়ে। তারপর দর্শকদের সামনে মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে) যন্ত্র মানে জানিস না !

সকলে : (প্রহরীকে) নাতো।

প্রহরী : আশ্চর্য ! তবে শোন, আমি বলি।
যন্ত্রের তর্জমা করি।

রথীন : দেখ, তর্জমায় আমাদের দরকার নেই। প্রশাসককে জানি না, এটা তোমাকে সাফ কথা বলে দিলাম।

প্রহরী : (রথীনকে) আহা, রাগিস কেন শোন,
আমার বাছাধন।

(মাঝ মঞ্চে বাদ্য বাজিয়ে)

প্রহরী : স্বর্গ, মর্ত্ত পাতাল,
তিন পুরে আকাল,
ন্যায়দণ্ড হাতে বসে স্বয়ং মহাকাল ;
স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ,
মর্ত্তবাসীরা ক্ষুব্ধ
কেমন করে চলবে শাসন ভাবনা ভেবে নাকাল।
সবাই তোরা জানিস.
আমার কথা মানিস,
দেবাদিদেব রুষ্ট হলে, সাফ হবে জঞ্জাল।
তাইতো বলি মন দিয়ে শোন,
দেব করেছেন আমরণ পণ,
ডাক দিয়ে একটি কথা আমায় তিনি বললেন,
'হারিনি কখনো'—বলেই তিনি পদ্মচক্ষু মুদলেন।

রথীন : আমরাও কখনো হারিনি, হারবোও না কখনো, একথা গিয়ে তোমার দেবকে বলে দিতে পারো।

চারজনে : হ্যা।

অম্বর : কিন্তু এর সংগে যন্ত্রের সম্বন্ধ কি ?

প্রহরী : কথা বলি সেটাই,
ভাবনা যখন এটাই।
শোন্‌রে খোকারা, ক্রোধের ঔরসে, হিংসার গর্ভে জন্ম হয়েছে কলির। আবার তার সন্তান, আমাদের দেব প্রশাসক। এটা মিথ্যে কথা নয়, স্বয়ং ত্রিকালেশ্বরের স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দিয়ে প্রশাসককে বলেছেন, দিগদিগন্তে ক্রোধের সঞ্চার করে, হিংসার বিষ

ছড়িয়ে দেবার জন্যে তোর জন্ম। তোর ফুৎকারে নির্গত বিষ যাদের রক্তে মিশবে সেই তোর বশ্যতা স্বীকার করবে—ক্রমে পরিণত হবে — তোর আদেশমত চলবে।

তাদের, উঠতে বললে উঠবে,

বসতে বললে বসবে,

চলতে বললে চলবে,

বলতে বললে বলবে।

অসাবধানতায় কারো রক্তে যদি সেই বিষ না মেশে. মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রশাসকের বিরুদ্ধে কেউ যদি প্রতিবাদ জানায়, সোচ্চার হয়ে যদি প্রশাসকপুরের শান্তি ভংগ করে, যন্ত্রের মত প্রশাসকপুরের কাজকর্ম না করে, তাহলে রোগের ভান দেখিয়ে ক্রোধের ঔরসে হিংসার গর্ভে জন্ম কলির সন্তানের আদেশানুসারে ক্ষুধার্ত হিংস্র সিংহের খাঁচার মধ্যে ফেলা হবে। এবার বলতো খুলে,

তোরা যাবি- কর্মস্থলে ?

সকলে : না যাবো না।

প্রহরী : তবুও।

সকলে : হ্যা—তবুও।

প্রহরী : কারণ ?

সকলে : এটা মিথ্যে কথা। বানানো কথা।

প্রহরী : বানানো !!

রথীন : হ্যা বানানো। আমাদের জাগ্রত সত্বায় আঘাত হানার এটা অপকৌশল মাত্র।

প্রহরী : (রথীনের কাছে গিয়ে) বেশ প্রশাসককে গিয়ে সে কথাই বলি !

জয়ন্ত : হ্যা বল। মিথ্যের বেসাতি দিয়ে আর আমাদের ভোলাতে পারবে না।

প্রহরী : (জয়ন্তের কাছে গিয়ে) বেশ, প্রশাসককে গিয়ে সে কথাও বলি।

ইন্দ্র : হ্যা বল। ছলে বলে, মন ভুলিয়ে, আর আমাদের আটকে রাখতে পারবে না।

প্রহরী : (ইন্দ্রের কাছে গিয়ে) বেশ, প্রশাসককে গিয়ে এ কথাও বলি।

অসিত : হ্যা বল, সিংহের গলায় কাঁটা হয়ে ফুটবো, তবু এ আদেশ আমরা মানতে পারবো না।

প্রহরী : (অসিতের কাছে গিয়ে) বেশ, প্রশাসককে গিয়ে তোর কথাই বলি।

শান্তনু : হ্যা বল, প্রশাসকের সাঁড়াশি শাসনের মধ্যে থাকতে আমরা আর রাজী নই। আমরা নিজেরাই গড়তে চাই, নিজেদের শান্তির নীড়।

প্রহরী : (শান্তনুর কাছে গিয়ে) বেশ, প্রশাসককে গিয়ে তোর কথাও বলি।

অম্বর : হ্যা বল। মুক্ত সত্তা নিয়ে এবার আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচবো। এই মুহূর্ত্ত থেকে আমরা ঘোষণা করছি—

সকলে : (একসংগে ওপরে হাত তুলে) আমরা স্বাধীন।

প্রহরী . (দর্শকদের দিকে সভয়ে দ্রুত এগিয়ে যায়) ওরে চুপ কর, চুপ কর, চুপ কর।

সকলে : কেন ? (প্রহরীর দিকে হাত এলিয়ে)

প্রহরী : আকাশের চোখে কোন দিন তন্দ্রা নামতে দেখেছিস ?

সকলে : না।

প্রহরী : খাড়া পাহাড়কে কোন দিন ঘাড় কাৎ করে শুতে দেখেছিস ?

সকলে : না।

প্রহরী : সাগরকে কখনো গর্জ্জন থামাতে দেখেছিস ?

সকলে : না না-না।

প্রহরী : আমাদের প্রশাসক তেমনি আকাশ পাহাড়, সাগর। প্রশাসকের চোখে কোন দিন তন্দ্রা নামে না। খাড়া পাহাড়ের মত প্রশাসক অটল, সাগরের ঢেউ-এর মত প্রশাসক উচ্ছল। দিন রাত গর্জ্জন করে তিনি শুধু তটের পর তট ভেঙে চলেন।

রথীন : আর তট ভাঙতে দেব না। বাঁধ বেঁধে প্রশাসকের দম্ভ এবার চূর্ণ করবো।

প্রহরী : (রথীনের কাছে গিয়ে) ওরে চুপ-চুপ-চুপ।

অম্বর : সবল বাহুর আঘাতে খাড়া পাহাড়ের দম্ভ এবার চূর্ণ করবো।

প্রহরী : (অম্বরের কাছে গিয়ে) আর কথা বাড়াস নি। বিপদ বেড়ে যাবে।

ইন্দ্র : স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসককে আমরা মানিনা।

প্রহরী : (ইন্দ্রের কাছে গিয়ে) অদ্ভুত কথা! বিচিত্র সাজ উদ্গীরণ।

অসিত : আত্মগ্লানিতে আমরা আর ভুগতে চাই না। প্রশাসককে শেষ করে কালো মেঘের সহজ বর্ষন-আমরা নিশ্চিত করবো।

প্রহরী : (অসিতের কাছে গিয়ে) ওরে তোরা চুপ কর। স্বেচ্ছায় কেন কাঁটার মালা বরণ করিস! কথা বাড়িয়ে কেন ভয়ংকর দিনকে স্বাগত জানাস!!

শান্তনু : আমরা ভয়ংকর দিনকেই স্বাগত জানাতে চাই। তুমি ফিরে যাও। প্রশাসককে বলো, যে প্রশাসক আমাদের মনোবিচারের মুল্য দেয় না, বিশাল চেতনাকে যে প্রশাসক মাটির সংগে মেশায়, সে প্রশাসককে আমরা মানি না।

সেই প্রশাসকের বিরুদ্ধে—

সকলে : আমরা সম্মুখ যুদ্ধ ঘোষণা করছি।

প্রহরী : (সকলের কাছে দৌড়ে গিয়ে) ওরে তোরা আমার কথা কেন শুনিস না? তোরা চুপ কর-চুপ কর-চুপ কর।

সকলে : চুপ আমরা করবো না।

রথীন : তুমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারো প্রহরী।

ইন্দ্র : বহু রক্তের বিনিময়ে লব্ধ চরম সত্যকে আমরা মিথ্যে হতে দেব না।

শান্তনু : কারুর বাধাই আমাদের আকাশ চুম্বী বাসনা থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

অসিত : অসুস্থ দস্তের প্রতিনিধি, প্রশাসক আমাদের ওপর অনেক অত্যাচার চালিয়েছে।

অম্বর : অনেক রক্ত গলে যাওয়া পিচে রাজপথে মিশেছে।

জয়ন্ত : আজকে এসেছে দিন, সেই ঋণ শোধের।

[প্রহরী তালে তালে বাদ্য পেটাতে পেটাতে সকলের কাছে ঘুরছিল। এবার সে সামনের দিকে একপাশে সভয়ে দাঁড়ায়। অপর দিকে এ দিককার তিনজন ওদিকার তিনজনের সংগে একই সংগে কদম ফেলে মধ্যিখানে এসে মিলিত হয়ে একটা লাইনে মিশে যায়]

প্রহরী : আর তোরা কথা বাড়াস নি। তোরা চুপ কর।

সকলে : না—।

রথীন : [illegible] ধারা মিশেছে একসাথে। (সামনের দিকে এগিয়ে দাঁড়ায়)

অসিত : [illegible] হয়েছে মজবুত। (সামনের দিকে এগিয়ে দাঁড়ায়)

ইন্দ্র : মন হয়েছে ইস্পাত কঠিন। (সামনের দিকে এগিয়ে দাঁড়ায়)

অম্বর : অস্ত্রশক্তি কিছু আমাদের নেই। (সামনের দিকে এগিয়ে অসিতের পাশে দাঁড়ায়)

শান্তনু : তবু শক্তিহীন আমরা নই। (সামনের দিকে ইন্দ্রের পাশে দাঁড়ায়)

জয়ন্ত : সমস্ত দম্ভের অবসান এবার ঘটাবো। (অম্বরের পাশে দাঁড়ায়)

[স্বভাবত সকলের মুখ উল্টোদিকে ফেরানো থাকে। প্রহরী আস্তে আস্তে বাদ্য বাজায়]

প্রহরী : (অপর পাশে গিয়ে) ওঠ তোদের বন্ধ করবি কিনা ?

সকলে : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) না।

প্রহরী : না !!

শান্তনু : দুর্ভেদ্য দুর্গ আমরা গড়ে তুলবোই।

অম্বর : বজ্র সেই অভ্রভেদী দুর্গকে ভাংতে পারবে না।

ইন্দ্র : সেই দুর্গের ভেতর থেকে অবিরত তীর বর্ষণ করবো।

অসিত : শত চেষ্টাতেও বাদ্য সেদিন বাজবে না।

রথীন : মৃত্যুর শীতল কোলে বর্তমান বিলীন হয়ে যাবে।

প্রহরী : (ভয় পেয়ে বাদ্য থামিয়ে) না।

সকলে : (হাসি)

জয়ন্ত : (হাসতে হাসতে) কী প্রহরী তোমার বাদ্য থেমে গেল কেন ?

প্রহরী : বাদ্য আমার থামেনি। থেমেছে আমার হাত।

রথীন : পড়েছ ভীত হয়ে ?

প্রহরী : হয়ত তাই, হয়ত নয়।

অসিত : (দু হাত বাড়িয়ে) মেলাতে পারো না, আমাদের হাতে হাত ?

প্রহরী : কৌলিন্যের দাস আমি, দম্ভের ক্রীড়নক। অভাবে হয়ে গেছি যন্ত্র। আমাকে ওঠালে ওঠি, বসালে বসি, চলালে চলি, বলালে বলি।

ইন্দ্র : না প্রহরী না। এখনও তোমার সত্তায় রয়েছে মনুষ্যত্বের স্বাক্ষর। কৌলিন্যের তুমি দাস নও, তুমি দাস মিথ্যের।

প্রহরী : (দর্শকদের দিকে) হয়ত তাই।

[illegible] : দম্ভের তুমি ক্রীড়নক নও, অর্থের ক্রীড়নক।

প্রহরী : (একই ভাবে) হয়ত ভাই।

শান্তনু : যন্ত্র হওনি তুমি। তোমার সবল সতেজ পেশী, সাবলীল বাক্‌ভংগীমাকে ক্রয় করা হয়েছে।

প্রহরী : (একই ভাবে) হয়ত ভাই।

জয়ন্ত : এস্ না ভাই, আমরা হাতে হাত ধরি। (হাত বাড়িয়ে দেয়)

প্রহরী : (দর্শকদের দিকে স্বগতোক্তি) না!

সকলে : (এক হাত উঁচুতে তুলে আর এক হাত বিছিয়ে) এক হাতে ধরি অস্ত্র, আর এক হাতে মশাল।

প্রহরী : (চীৎকার করে) না—। তোমরা আমাকে শক্তিহীন করে দিতে চাইছ। তোমরা ভুলে যেওনা, আমি রাজ-প্রহরী-চৌকীদার। আমার কাজ রাজার আদেশ অনুসারে সকলকে সাবধান করে দেওয়া। রক্তনীতে আমার সত্তা, রক্তনীতে বিলীন। তোমাদের কোন মিনতি আমাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারবে না। (মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে পিছন দিককার পর্দার কাছে চলে আসে)।

রথীন : (গম্ভীর ভাবে) আমরাও জানি তুমি রাজ-প্রহরী। (মোলায়েম) কিন্তু সর্বোপরি তুমি মানুষ। আমাদের ঐ ভিটেতেই তোমার জন্ম। রাজ-প্রীতি তোমার যতই থাকুক না কেন, একথা ত' তুমি অস্বীকার করতে পারবে না প্রহরী, তোমার শিরা, উপশিরা ধমনীতে বইছে একই মায়ের রক্তধারা! এস না ভাই? যৌথ কণ্ঠে একবার চীৎকার করে বলি—'জয় দেশ মাতৃকার জয়'।

[প্রহরী আবার দ্রুত দর্শকদের দিকে এগিয়ে যায়, নিজের কণ্ঠ ধরে]

অসিত : মায়ের শৃঙ্খল আমরা মোচন করি, এস না ভাই, আমাদের বাহুর শক্তির সংগে তোমার বাহু শক্তি মেলাও। জয় আমাদের অনিবার্য।

প্রহরী : (ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে) না—। শোনো অর্বাচীন, বাচাল, প্রশাসক প্রজাবৃন্দ, প্রশাসকের হুকুম যদি তোমরা তালিম না কর, যদি অবিলম্বে কর্মস্থলে ফিরে না যাও, তাহলে আমায় প্রজাকূলকে কঠোর সাজা দেবার ব্যবস্থা প্রশাসক করবেন।

[রথীন ইত্যাদি দুদিক থেকে দুদল মধ্যিখানে এসে জটলা করে প্রহরীর ঐ কথা শুনে, এবং ইসারায় কথোপকথন চালায়। প্রহরী একবার জোরে জোরে বাদ্য বাজিয়ে ওদের কাছে আসে ও পরক্ষণে ফিরে সামনের দিকের একটা কোণে চলে যায়]

প্রহরী : তোমাদের সম্মতিসূচক ধ্বনি শোনাও, আমি ফিরে যাই রাজসমীপে।

[সকলে একসংগে ছিটকে পড়ে পিছনের পর্দার লাগোয়া একটা অর্ধবৃত্ত তৈরী করে এবং সেই সংগে চীৎকার করে—না]

প্রহরী : না !!

রথীন : হ্যা—না। কর্মস্থলে আমরা ফিরে যাবো না।

অসিত : প্রশাসকের অপসারণ পর্যন্ত চলবে আমাদের আমরণ সংগ্রাম।

ইন্দ্র : সে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলেও আমরা পশ্চাদ্‌পদ হব না।

অম্বর : সহস্র ধারা নিয়ে আমরা ছুটে যাবো দুর্গ হতে দুর্গ।

শান্তনু : প্রশাসকের প্রহারী সিমিত, আমাদের মানব বল অফুরন্ত।

জয়ন্ত : আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।

[সকলে সার বেঁধে নিজের নিজের কথা বলে প্রহরীকে ঘিরে দাড়ায়]

প্রহরী : একি ! তোমরা আমাকে ঘিরে ফেলছো কেন ? আমি নিতান্তই প্রশাসকের বার্তা-বাহক !

রথীন : ভয় নেই প্রহরী, কাকের মাংসে আমাদের লোভ নেই।

প্রহরী : তাহলে তোমরা আমার দিকে এগোচ্ছো কেন ?

অসিত : আমাদের অফুরন্ত শক্তির সামান্য নমুনা তোমাকে দেখাবো বলে।

প্রহরী : (ভয় পেয়ে পিছু হঠে) কি—কি করবে তোমরা ?

ইন্দ্র : আপাতত তোমাকে বাদ্যহীণ করে প্রশাসকের কাছে ফেরৎ পাঠাবো।

প্রহরী : (বাদ্যযন্ত্র চেপে ধরে) না; করুণ মিনতি কণ্ঠে রেখে বলি আর তোমরা এগিয়ো না। দূরে সরে যাও, গ্রামান্তরে পৌছে দিই প্রশাসকের বাণী।

সকলে : না—। (একথা বলে প্রহরীর বাদ্যের দিকে এক হাত বাড়ায় প্রহরী বাদ্য চেপে ধরে সভয়ে বাস পড়ে)।

[ঠিক এই সময় প্রবেশ করে প্রতিনিধি। পরণে মিলিটারী পোষাক। এরও জামার কলার সামণের দিকে। বীভৎস দাড়ি-গোঁফ। জামার ওপর চিত্র-বিচিত্র করে জরীর ফিতে সেলাই করে বসানো। মাথায় সেইমত টুপী। হাতে একটা পাঁচফুট লম্বা লোহার শিকের আংটা। প্রহরী ইত্যাদি সেদিকে আছে, তার উল্টো-দিক দিয়ে প্রতিনিধি প্রবেশ করেই চীৎকার করে ওঠে]

প্রতিনিধি : এই বরাহের বাচ্ছারা !!

[রথীন ইত্যাদি থতমত খেয়ে সংগে সংগে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। প্রহরী দ্রুত প্রতিনিধির কাছে চলে যায়]

সকলে : (ঘুরে দাঁড়িয়েই) খবরদার !!!

প্রহরী : (প্রতিনিধির কাছে গিয়ে) মহামান্য প্রতিনিধি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইন্দ্র : মুখ সামলে কথা বলবি, পা-চাটা পোষক।

প্রতিনিধি : (রাগে কেঁপে চীৎকার করে ওঠে) এই—। (সংগে সংগে হাতের আংটা দিয়ে ইন্দ্রের গলায় আটকিয়ে এক ঝটকায় ইন্দ্রকে কাছে টানে। ইন্দ্র এসে ধপাস করে প্রতিনিধির পায়ের সামনে পড়ে। ইন্দ্র 'আ—' করে চীৎকার করে। গলা ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। টলতে টলতে খানিকটা উঠেও দাঁড়ায়। কিন্তু প্রতিনিধি সংগে সংগে তাকে নিজের হাঁটু দিয়ে ইন্দ্রের থুবনীতে মারে। ইন্দ্র ছিটকে পিছনে চলে যায়। রথীন ইত্যাদি তাকে লুফে নেয়। প্রতিনিধি একটু সামনের দিকে এগিয়ে যায়। প্রহরী তার পিছনে আসে) প্রহরী, সমস্ত ঘটনা আমি নিজে চোখে দূর থেকে দেখেছি। এই মুহূর্ত্ত থেকে এদের বিচারের ভার আমি গ্রহণ করলাম। তুমি যাও।

[প্রহরী প্রতিনিধিকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে যায়। ওদিকে প্রতিনিধির ঐরূপ ক্ষিপ্রতায় রথীন ইত্যাদি সবাই হতবাক হয়ে যায়। সম্ভবত প্রতিনিধির আংটায় বিষ ছিল। ইন্দ্রকে ঐভাবে আংটা দিয়ে টান মারায় সেই বিষ ইন্দ্রের ঘাড় ফুটো হয়ে রক্তের সংগে মিশে গেছে। তার ওপর প্রতিনিধির ঐ রকম আচম্বিত মারার ফলে ইন্দ্র একেবারে নিতিয়ে পড়ে। সকলে

ইন্দ্রের মাথার দিকটা ধরে বসে পড়ে এবং সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটাতে হবে]

সকলে : প্রতিনিধিকে শেষ কর।

প্রতিনিধি : (উচ্চৈঃস্বরে হেসে) তোরাও কি তোদের বন্ধুর পথ অনুসরণ করতে চাস ? ভাল করে চেয়ে দেখ, তোদের বন্ধুর দেহে এখন পাহাড়ী সাপের বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সকলে : (ভয়ে) না — !!! (সংগে সংগে ইন্দ্রর দেহের পাশে বসে)

ইন্দ্র : কে ? র-র-র-র- (ঘাড় কাৎ হয়ে যায়)

[সকলে উঠে দাঁড়ায়। ঘাড় নত করে ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় প্রতিনিধি তার হাতের আংটা লুকতে লুকতে হাসে। পরক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে]

প্রতিনিধি ; এবার বল তোরা প্রশাসকের আদেশ মানবি কি না ?

সকলে : (ঘাড় তুলে) না।

প্রতিনিধি : ভাল করে ভেবে দেখ।

রথীন : মরণকে আমরা ভয় করি না।

প্রতিনিধি : তোরা বিদ্রোহী।

অম্বর : আমরা মুক্তবিহংগী।

প্রতিনিধি : কী চাস তোরা ?

অম্বর : আমাদের মনো বিচারে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে রাজপদে আসীন দেখতে চাই।

প্রতিনিধি : আমাদের প্রশাসক ত' তাকে সে পদ দিতে চেয়েছিলেন। তোরা যাকে রাজ-পদে বসাতে চাস, সেই প্রশাসকের আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে।

সকলে : মিথ্যে কথা।

প্রতিনিধি : মিথ্যে কথা ! আমি তাহলে তোদের সংগে মিথ্যে কথা বলছি !

চারজনে : হ্যাঁ বলছেন।

রথীন : পায়ে শেকল বেঁধে খাঁচার বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তা নিতে রাজী নই।

অম্বর : আমরা পেতে চাই পূর্ণ মুক্তির স্বাদ।

প্রতিনিধি : মুক্তি! (হাসি) সে মুক্তি তোরা কোনদিনই পাবি না। তোরা ক্রীতদাস, চিরকাল মাথা নীচু করে থাকবি।

শান্তনু : বেশ আমরাও দেখবো পেতে পারি কি না! না পাওয়া পর্যন্ত আমাদেরও চলবে সংগ্রাম।

প্রতিনিধি : (আবার হাসি) সংগ্রাম! (হাসি) ওরে সংগ্রাম করে শুধু মৃত্যুকেই বরণ করা যায়, সামাজিক লাভ তাতে কিছু হয় না। তার চেয়ে শোন, তোরা কর্মস্থলে ফিরে যা। যদ্দিন তোরা কর্মস্থলে যাস নি, তার পুরো বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা প্রশাসককে বলে করবো, আর যদি চাস, বেতনের হারও তোদের বাড়িয়ে দিতে বলবো।

রথীন : লোভ দেখিয়ে কোন লাভ হবে না প্রতিনিধি।

প্রতিনিধি : (রেগে) বেশ, তাহলে তোরা সংগ্রাম চালা। দেখি তোদের সংগ্রামের দৌড়-টা। কিন্তু আমরাও প্রস্তুত। তোদের নির্মূল না করা পর্যন্ত চলবে পাল্টা অত্যাচার।

(প্রস্থানোদ্যত)

অসিত : অধিকারের সংগ্রামে কারা জয়ী হয়, আমরাও দেখবো। আমরাও প্রস্তুত।

প্রতিনিধি : (আস্তে আস্তে ফিরে) এখনও ভেবে দেখ, সময় আছে। বহুদিনের যত্নে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা দেহগুলোর গতি একমুহূর্তে থামিয়ে দিতে চাস কি না! তোদের শেষবারের মত ভাববার সুযোগ দিচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত, আবার ফিরে) হ্যা ভাল কথা, প্রশাসক আজ তোদের সংগে মিলিত হতে চান। প্রশাসক আশা করেন, আজকের সেই মিলন সভায় তোরা সকলে উপস্থিত থাকবি। সভা ময়দানে হবে প্রশাসক, ঠিক আধঘন্টা পরে। (প্রস্থান-দ্বারের কাছে গিয়ে) যদি না যাস, তোরাও তোদের বন্ধুর পথ অনুসরণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকিস।

[প্রস্থান, যে পথে এসেছিল সেই পথে। রথীন ইত্যাদি সার বেঁধে ইন্দ্রের দেহের পিছনে দাঁড়ায়। ঘাড় হেঁট করে। ক্রমান্বয়ে হাত দুটো জানুর কাছে এনে হাঁটু মুড়ে বসে। ইন্দ্রের দেহের দিকে

তাকায়। আস্তে আস্তে সেতার বেজে চলে। ওরা চীৎকার করে একসংগে উঠে দাঁড়ায়]

সকলে : না যাবো না। প্রশাসকের আদেশ আমরা মানিনা।

(দূর থেকে ভেসে আসে—হুশিয়ার হো—)

রথীন : মৃত্যুর স্তব্ধতার ভয় পেয়ে আমরা আমাদের আমরণ সংগ্রামের রণ থেকে ভংগ দেব না।

অসিত : এই মুহূর্তে এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

সকলে : (বজ্রমুষ্টিতে হাত উঁচুতে তুলে) হ্যা।

রথীন : আসুন বন্ধুরা, এই বর্বর নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে আমরা সোচ্চার হই। তার আগে আমরা মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাই।

সকলে : হে মৃত শহীদ, খাঁচায় বন্দী জীবন মুক্ত করতে গিয়ে তুমি যে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিয়েছ, আমরা তা ভুলবো না। শেষ প্রাণ স্পন্দন পর্যন্ত আমরা অবিচল থাকবো। তোমার মৃত্যু আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।

(নেপথ্যে আর একটু জোরে—'হুশিয়ার হো', এই ধ্বনি ছড়িয়ে যায় আকাশে বাতাসে। রথীন ইত্যাদি দৌড়াদৌড়ি করে পাঁচজনে পাঁচদিকে ছড়িয়ে যায়। এদের মধ্যে রথীন থাকবে মাঝমঞ্চে আর বাকী চারজনে চারকোণে)

রথীন : ঐত সেই চেনা কণ্ঠস্বর।

অম্বর : যে কণ্ঠস্বর আকাশে বাতাশে ধ্বনি তুলে আমাদের বন্দী সবাকে মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছিল।

শান্তনু : যার মহৎ প্রচেষ্টায় আমরা মনো-বিচারে অংশ নিতে পেয়েছিলাম।

অসিত : হে বীর, তুমি কোথায়? সাড়া দাও। তোমার কণ্ঠে সুরধারা আবার নিসৃত হোক।

রথীন : আগুনের ফুলকী মিশিয়ে দাও আমাদের অন্তরে।

জয়ন্ত : আমরা জ্বলে উঠি। জ্বলিয়ে দিই প্রশাসকের অপশাসনের সমস্ত জঞ্জাল।

শান্তনু : তার স্বর তো আর কানে আসে না।

অসিত : তবে কি সে ধ্বনি মিলিয়ে গেল কালো গহ্বরে!

অম্বর : ওগো উচ্চ শিরের অধিকারী নির্ভীক হৃদয়ের মুক্তি-দূত তুমি শোনাও বজ্র কণ্ঠের বাণী।

জয়ন্ত : আমাদের নিদ্রিত সত্বাকে আবার জাগ্রত কর।

[নেপথ্যে—হুশিয়ার হো—]

রথীন : ঐ তো সেই ধ্বনি।

শান্তনু : মনে হয় আরো কাছে উঠেছে রণন।

('হুশিয়ার হো' বলতে বলতে প্রবেশ করে ভূপাল যেদিক দিয়ে প্রতিনিধি 'প্রবেশ প্রস্থান' করেছে। ভূপালের চোখে পুরোনো তাঁরের ফ্রেমের চশমা। দাড়ি নেই। গোঁফও নেই। ছেঁড়া, ময়লা সাদা জামার ওপর ফেত্তা বেঁধে কাপড় পরা। বাঁ হাতে একটা বুনো কিংবা গাঁদা ফুলের মালা জড়ানো। ডান হাতে একটা শুকনো সরু গাছের ডাল। মাথার চুল রুক্ষ।)

ভূপাল : (কথাবার্তার মধ্যে যাত্রার সংদের মত নাচের একটা তাল রাখতে পারলে ভাল হয়) হুশিয়ার হো— ও ভাইরে, তোরা শোন,

আমার কথায় আজকে তোরা দেরে মন,
জানি তোরা কথা বলতে চাস,
ওরে, উঠে দাঁড়াতে চাস
তবে উঁচু মাথা নীচু করে থাকবি কতক্ষণ ?
তোরা শোন।

ওরে ভবের কোলে নাগর দোলে, দুলছে ওরে কালপুরী,
তোরা যদি অস্ত্র ধরিস যাবে ওদের কাল ঝরি।
তাইতো বলি এবার তোরা কররে মরণ পণ,
তোরা শোন।

(এই কথাটাই সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে ভূপাল বলবে। বলা শেষ হলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কথাগুলো আওড়াবে। এর তালে তালে ভেতর থেকে কাঁসর বাজাতে পারলে ভাল হয়। ভূপাল তার বলা শেষ হলে একপাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে যখন কথাগুলি বলবে সেই সময় রথীন ইত্যাদি একত্রিত হয়ে যাবে এবং ভূপালের কণ্ঠস্বর চলাকালীনই বলবে)

অম্বর : ঐ তো সেই কণ্ঠস্বর।

রথীন : না, সে কণ্ঠস্বর নয়।

শান্তনু : আমারও মনে হচ্ছে, সে কণ্ঠস্বর নয় সে কণ্ঠস্বর আরও বলিষ্ঠ, উদাত্ত।

অসিত : সে কণ্ঠস্বরে অন্তরে জাগে শিহরণ।

জয়ন্ত : আকৃতিতে অনেকটা সে রকম, কিন্তু প্রকৃতিতে এ পাগল।

রথীন : কিংবা শয়তান—

অম্বর : গুপ্তচর—

শান্তনু : কিংবা প্রশাসকের অগ্নিবন্যায় সব হারানোর একজন।

রথীন : হতে পারে। অস্বীকার করি না। কিন্তু এমনও হতে পারে পাগলামীটা ছল। আসলে পেতে চায় আমাদের মনের নাগাল। দেখতে চায় আমাদের মানসিক প্রস্তুতির রূপ। পৌছে দিতে চায় শত্রু কিংবা মিত্রের কাছে আমাদের সংবাদ।

অসিত : যাই হোক, পরিচয় না জানতে পারা পর্যন্ত আমরা আমাদের মনের নাগাল পেতে ওকে দেব না। মুখ আমরা খুলবো, তবে তা নেহাৎ-ই আলাপের জন্যে।'

চারজনে : তবে তাই হোক।

(আগের মত পাঁচজনে পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে যায়।)

জয়ন্ত : আপনার নাম আমরা জানিনা।

অসিত : আপনাকে চিনিও না।

শান্তনু : তবু মনে হয় আপনি আমাদের একান্ত পরিজন।

অম্বর : সমগ্র পুরীর খবর জানতে আমরা উন্মুখ।

রথীন : যথোপযুক্ত পরিচয় দিয়ে সমগ্রপুরীর খবর আমাদের জানাতে পারেন ?

(ভূপাল আগের মতই করে চলে।)

সকলে : (বিরক্তি) আগন্তুক !!

ভূপাল : (লাফিয়ে রথীনের কাছে এসে) তাক, তেরে কেটে তাক।

আমার নাম ভূপাল, এবার চুপ থাক।

এসেছি দেশে নীল পাহাড়ের পাশে,

সমর বেশে,

হাজার হাজার ভীমরুল,

শ্রাবণে ঢেউ-এ তরীহারা হয়ে পাচ্ছে না
কোন কূল।
হয়তো এখুনি এখানে পড়বে এসে,
কূলহারা হয়ে সকলে যাবি যে ভেসে,
তাই বলি সব ঘরে ঘরে তোরা, তৈরী হ'তে থাক,
ডাক, তেরে কেটে ডাক।

সকলে : বুঝেছি, আপনি আমাদের একজন।

ভূপাল : স্বজন নই, তবু আপনজন,
তবুও বলছি চুপ করে তোরা থাক,
আপদ বালাই নির্মূল হয়ে যাক,
তারপর কথা হবে।

রথীন : আমরা এখন কি করবো ?

ভূপাল : (গান গেয়ে গলা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে আসে)
ওমা কালী, গলা খালি,
মুণ্ডমালা কোথা হারালি
(রথীনের কাছে এসে আগের মত)
ছুটে চলে যা গ্রাম থেকে গ্রামে বাণের ঘোষণা শোনা,
এ মুহূর্তে চাই শক্ত জালটি বোনা।

সকলে : তারপর ?

ভূপাল : উপায় দেব বলে,
আসবি তোরা চলে, কাল সকালে, দলে।
(স্বাভাবিক কণ্ঠ) তাড়াতাড়ি যা। একটা প্রাণের দাম এখন
এক একটা মুহূর্ত ।
[ওরা সকলে ধরাধরি করে ইন্দ্রের দেহ রথীনের কাঁধে তুলে দেয়।
ভূপালের নাচ বা ওষ্ঠ কখনো থামবে না। কিছু করার না থাকলেও
প্রথম যে কথা বলে ও ঢুকেছিল, নাচের তালে তালে সে কথাগুলো
আওড়ে যাবে। এইভাবে আওড়ে যেতে যেতে হঠাৎ রথীনের
কাঁধে ইন্দ্রের দেহ তুলতে দেখে, গান গেয়ে ওঠে]
ঐ তো মা তোর মুণ্ডু পড়ে,
মালা করে পড় মা গলে। যা যা যা তাড়াতাড়ি পালা।

(আবার গান গাইতে যেদিক দিয়ে এসেছিল সে দিকে প্রস্থানোদ্যত।
এই অবসরে রথীন ইত্যাদির প্রস্থান, অপর দিক দিয়ে। ভূপাল
প্রস্থানোদ্যতকালীন)

ও মা কালী, গলা খালি
মুণ্ডমালা কোথায় হারালি ? হুশিয়ার হো—।

[প্রবেশ করে প্রতিনিধি]

প্রতিনিধি : কাকে হুশিয়ারী দিচ্ছিলে কুনিশ ?

ভূপাল : কুনিশ আমার নাম নয়, নাম ভূপাল।
দিকে দিকে ছুটে বেড়াই নেইকো চুলো চাল।
যে দেয় আমায় খাবার,
তার শত্রু করি সাবার,
পথ ছেড়ে দিন, সময় হল যাবার,
প্রশাসককে খবর দেবার।

প্রতিনিধি : আহা-হা, সেত' যাবেই। তা বল না, কাকে হুশিয়ারী দিচ্ছিলে ?

ভূপাল : বাবা ভোলানাথকে। সতীকে কাঁধে করে চলে গেল।

প্রতিনিধি : কাকে কাঁধে করে চলে গেল !

ভূপাল : সতীকে। নিন পথ ছাড়ুন।

প্রতিনিধি : সতী !! নিশ্চয় কোন মেয়ের কথা বলছেন। তা কেমন, প্রশাসকের পর, আমার ভাগ্য থাকবে ত ?

ভূপাল : না-না সে সব নয়। এ হল ইতিহাসের সতী।

প্রতিনিধি : আ ! কী সব উদঘুটে নাম বলছো। ইতিহাস হল পাতিহাসের ছোট ভাই।

প্রতিনিধি : পাতিহাস। সে কথা বললেই ত' মিটে যেতো শুধু শুধু আজে বাজে বকলে ! কোন দিকে গেল ?

ভূপাল : উড়ে গেল। ডানা মেলে পালিয়ে গেলা, ঐদিকে- (রথীনরা যেদিকে গেছে সেদিক নির্দেশ করে)।

প্রতিনিধি : দাঁড়াও আমি আসছি। (প্রস্থানোদ্যত)

ভূপাল : আহা-হা শুনুন।

প্রতিনিধি : আবার কি ?

ভূপাল : যে উড়ে গেছে, তাকে উড়তে দিন। আসল কাজের কথা শুনুন। ওরা কেউ রাজী হল না। বললে, অস্ত্রের বদলা আমরা অস্ত্র দিয়েই নেব।

প্রতিনিধি : চুপ।

ভূপাল : কেন?

প্রতিনিধি : প্রশাসককে একথা জানানো চলবে না। তাহলে আমাদের দুজনেরই চাকরী খতম হবে।

ভূপাল : তাহলে?

প্রতিনিধি : যে কোন ভাবে লোক যোগাড় করতে হবে। সভা আজ হবেই। তার জন্য ভয় দেখিয়ে হয় ভয়, লোভ দেখিয়ে হয় লোভ—যে কোন ভাবে।

ভূপাল : কিন্তু ওরা যে কেউ প্রশাসকের সভায় যেতে রাজী নয়।

প্রতিনিধি : তাহলে ত' আপনার চাকরীই আগে যাবে।

ভূপাল : বাঁচা যাবে! এই নোংরা পোষাকের চাকরী আর ভাল লাগছে না। বাড়ীর অনেকদিন কোন খবর নেই। বৌ-ছেলে-মেয়েগুলো ম'লো কি বাঁচলো তাও জানি না। রোজ উড়ো খবর যা কানে আসছে, তাতে এ চাকরী টিকিয়ে রাখতে আর সাহস পাচ্ছি নে।

প্রতিনিধি : তা কি হয় কুর্নিশ!

ভূপাল : কুর্নিশ আমি নই।

প্রতিনিধি : ভুলে যাই। বড় ভুল হয়ে যায়। তোমাকে দেখলেই, কেবল ঐ কুর্নিশের কথা মনে পড়ে। তা যাহোক, এ খতম কিন্তু চাকরী থেকে নয়, জীবনের খতম হয়ে যাবে। আচ্ছা কুনি—, না-না ভূপাল—, আমি প্রশাসককে দ্বিতীয় একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সে সম্বন্ধে প্রশাসক কিছু বলেছেন?

ভূপাল : প্রশাসক ভালই বলেছেন। আমাদের সেনারা গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে সাধারণ পোষাকে গাঁয়ের লোকদের মধ্যে মিশে গিয়ে কিছু গল্প গুজব করার পর, 'ঐ সেনা আসছে' বলে ভয় দেখালে, অনেক কাজ হয়ে যাবে। বলা যায় না, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, পাশের পুরীতে পালিয়ে গিয়ে আমাদের খরচা অনেক কমিয়ে দিতেও পারে।

প্রতিনিধি : (আত্মতৃপ্তি) কেমন প্ল্যান দিয়েছি! এক ঝটকায় সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। চলুন যাওয়া যাক।

(প্রতিনিধি যেদিক দিয়ে এসেছিলো সেদিক দিয়ে প্রস্থানোদ্যত ভূপাল উলটো দিকে যায়)

প্রতিনিধি : ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? তোমার কি প্রাণের মায়াটায়াও নেই?

ভূপাল : মনে হল যেন একদল লোক সব বড় বড় অস্ত্র নিয়ে এদিকে আসছে।

প্রতিনিধি : কো-কো-কো-থায়?

ভূপাল : ঐ তো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার চশমা কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

প্রতিনিধি : চলুন পালাই। (দ্রুত পলায়ন)

(ভূপাল খিলখিল করে হেসে ওঠে। এবং 'হুশিয়ার হো ও ভায়েরা' বলতে বলতে প্রতিনিধির পথে গমন। অপরদিক দিয়ে প্রবেশ করে রথীনদের দল)

অম্বর : না-না, এভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

শান্তনু : দিনের পর দিন ওরা যেভাবে আক্রমন চালাচ্ছে, আপোষহীন সংগ্রামের কথা বলে আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে মন চাইছে না।

রথীন : কী করতে চাস তোরা?

শান্তনু : লড়তে চাই। প্রতি আক্রমন হেনে ওদের দেহকেও মাটিরসংগে মেশাতে চাই।

অম্বর : বুঝিয়ে দিতে চাই, আমরাও আঘাত করতে জানি।

রথীন : খালি হাতে? ওদের হাতে সব মারণাস্ত্র আছে আর আমাদের হাতে কি আছে? উঃ— লড়তে চাই!

অসিত : কিন্তু এভাবে পড়ে পড়ে মার কাহাতক সহ্য করা যায়?

রথীন : মানি—মানি সে কথা। কিন্তু নিরস্ত্র হয়ে সশস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা। নিরুপদ্রব অহিংস আন্দোলন করা যায়, কিন্তু সে স্তর আমরা এখন পেরিয়ে এসেছি।

জয়ন্ত : তাহলে আমরা এখন কি করবো?

অম্বর : ঘোড়ার ঘাস কাটবো!

রথীন : আগে আমাদের নেতাদের খুঁজে বের করতে হবে। ওদের খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

জয়ন্ত : নেতাদের খুঁজতে যাওয়াও তো আর এক বিড়ম্বনা। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ ছেলে দেখলেই ধরছে আর রাস্তার পাঁচিলের ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারছে। মেয়েরাও বাদ যাচ্ছে না।

রথীন : তবু জানতে হবে। তারা আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। মনোবিচারে অধিকার প্রয়োগ করার পথ দেখিয়েছে। সুতরাং তাদের বক্তব্যটা আগে শোনা দরকার। অম্বর—।

অম্বর : কী?

রথীন : আমাদের জন্য তোর আর শান্তনুর রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কে যাবি?

শান্তনু : কোথায়?

রথীন : নেতাদের খুঁজে বের করতে। সকলকে না হলেও মুখ্য নেতাদের অন্তত একজনকে।

অম্বর : নিশানা বলতে পারলে আমি যেতে পারি।

রথীন : গতকাল ওপারে শ্বেতপত্রে দেখলাম, আমাদের নতুন নেতারা নাকি শাসন—নাকি শাসনভার নিয়েছে। তোরা সে শ্বেতপত্র দেখেছিস?

সকলে : না তো।

অম্বর : কবে নিয়েছে?

অসিত : কোথায় নিয়েছে?

শান্তনু : মুখ্য নেতা কে হয়েছে?

জয়ন্ত : তারা সব আছেই বা কোথায়?

রথীন : উচ্ছ্বাসী নদীর পূর্ব দিকে যে বনটা আছে, সেখানে সকলে আত্মগোপন করে আছে। যদি অবশ্য শ্বেত পত্রের কথা সত্যি হয়।

অম্বর : সত্যি হয় মানে?

রথীন : ও পারের শ্বেত পত্রকে আমি বিশ্বাস করি না।

অসিত : কেন?

রথীন : ও পারের শ্বেত পত্রেই ইতিপূর্বে লিখেছিল আমাদের এ পারের ছেলেরা উভয় খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেছে। মনে আছে তোদের সেদিনই ইন্দ্রের সংগে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে। উত্তর খণ্ড দখল

করার জন্য আমরা যখন তাকে অভিনন্দন জানাই—তখন ও বলেছে সমস্ত সংবাদটা ভূয়ো। বন্ধু প্রশাসকের সেনারা ওখানে নির্বিবাদে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে।

অম্বর : তাহলে এসব কি করা যাবে? এভাবে ত' হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না।

রথীন : উচ্ছ্বাসী নদীর পারে বনটাতে ঢুকতে পারবি ?

অম্বর : পারবো।

রথীন : প্রতি মুহূর্তে কিন্তু জীবন নাশের আশংকা আছে।

অম্বর : জানি।

রথীন : সাহায্য চাস আর কারো ?

শান্তনু : আমি ওর সংগে যেতে রাজী আছি।

অম্বর ; দরকার নেই। একা যাওয়াই ভালো। কথা না বলে পথ চলা যায়।

রথীন : বেশ তাহলে চলে যা। পারে যাবার জন্যে ডিংগী নৌকো পাবি বালিয়াড়ী পেরিয়ে তরমুজ ক্ষেতের পাশে। নদীর ধার দিয়ে বালির স্তূপকে আড়াল করে যাবি।

অম্বর : তোরা কোথায় থাকবি ?

রথীন : সেই পাগলা বুড়োর সংগে দেখা করার চেষ্টা করবো। আমাদের এখনকার উদ্দেশ্য কোন অস্ত্র ঘাঁটি দখল করা। লোকবল আমাদের যথেষ্ট, কিন্তু অস্ত্রবল কিছুই নেই। ইতিমধ্যে তুই ফিরে এসে আমাদের আমলকী বনের ভেতর গুপ্ত ঘাঁটিতে চলে যাবি। তোর মুখ থেকে, নেতাদের বক্তব্য শুনে, পরবর্তী অধ্যায় শুরু করবো।

অম্বর : তাহলে আমি যাই ?

রথীন : হ্যাঁ।

[অম্বর দ্রুত বেরিয়ে যায়। সকলে হাত নাড়ে। এই সময় ভেতর থেকে ডাক শুনতে পাওয়া যায়—ই-ন্দ্র—]

কার একটা স্বর শুনতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে!

শান্তনু : মনে হচ্ছে ইন্দ্রকে কে ডাকছে।

রথীন : চোখের সামনে ইন্দ্রকে মরতে দেখলাম, তবু কেউ কিছু করতে পারলাম না—তাই না ?

জয়ন্ত : কী করবো? ওর হাতে ছিল বিষ অস্ত্র। আমরা নিরস্ত্র। নিরস্ত্র হয়ে বিষ অস্ত্রের কিছু করতে যাওয়ার অর্থ, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে ডেকে আনা।

['ইন্দ্র' ডাক ক্রমাগত কাছে আসে]

রথীন : তবু তো আমরা কিছু করতে পারতাম। প্রতিনিধি ছিল একা। আমরা ছিলাম দলে। একটার বিরুদ্ধে আমরা পাঁচ পাঁচটা জোয়ান যদি লাফিয়ে পড়তাম—।

অসিত : চোর পালালে তবেই বুদ্ধি বাড়ে।

(পা থেকে যারা গা এমন কি মুখ বাদ দিয়ে মাথা পর্যন্ত বনের গাছপালার ডালে মোড়া মহীতোষের প্রবেশ)

মহীতোষ : (সকলের কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে মুখগুলো দেখে নেয়, পরে জিজ্ঞাসা করে) তোরা আমার ইন্দ্রকে দেখেছিস?···কথা বলছিস না কেন? আমার ইন্দ্রকে তোরা দেখেছিস?

অসিত : কৈ—ইয়ে—না তো।

মহী : ছেলেটা কোথায় গেল বল দিকি নি? নদী পেরিয়ে চলে আসার পর থেকে ওকে আর দেখিনি।

জয়ন্ত : ওপার থেকে এপারে চলে এলেন কেন?

মহী : বাবারা বলিস কি? ওপারে মানুষ থাকতে পারে না গো-মানুষ থাকতে পারে না। রাক্ষসের দল, ইয়া বড় বড় থাবা নিয়ে ওপারে ঘোরাঘুরি করছে, আর মানুষ দেখলেই মটাস্ করে ঘাড় মটকে দিচ্ছে।

শান্তনু : আমরা জানি।

মহী : কিছু জানিস না রে খোকারা কিছু জানিস না। তোরা জানিস, কেমন করে শ্বেত পাখীর ওপর থেকে জ্বালানো বর্শা পড়ে? তোরা জানিস. চোখের পলক না পড়তে কেমন করে গাঁয়ের পর গাঁ দাউ-দাউ করে জ্বলে যায়? তোরা জানিস, কুণ্ডলী পাকানো ক্যাকাসে ধোঁয়ায় কেমন করে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপও হার মানে?—কিছু জানিস না তোরা···।

শান্তনু : জানি—সব জানি। আপনি শান্ত হোন।

মহী : শান্ত (হাসি)! আমি শান্ত হব (আবার হাসি)!···হব, শান্ত আমি হব, তোরা যদি জেগে উঠিস, তবে শান্ত হব। তোরা যদি

ঐ রাক্ষসগুলোকে গাঁ ছাড়া করতে পারিস—তবে শান্তি হব।
(দর্শকদের দিকে এগিয়ে) আ-আ-আচ্ছা ধর, তোদের চোখের সামনে থেকে যদি তোদের বৌকে, জোয়ান মেয়েকে, কিশোর ছেলেকে, বাচ্চা মেয়েকে একে একে ঐ রাক্ষসগুলো ঘাড় মটকে মাটিতে লটকে দেয়, তাহলে তোরা শান্ত হতে পারতিস? (সকলের কাছে এক এক করে গিয়ে) শান্ত থাকতে পারতিস?—বল—উত্তর দে—শান্ত থাকতে পারতিস? (সকলে ঘাড় নীচু করে) আ—আ—আমি কিন্তু পেরেছিলাম। ইন্দ্র, আমার জোয়ান ছেলে, ও-ও পেরেছিল।

রথীন আপনারা তখন কোথায় ছিলেন?

মহী রাক্ষসগুলোকে হাউ-মাউ করে এগোতে দেখে, ছাদের ওপর থেকে আমরা ইট ছুড়েছিলাম। কিন্তু তাতে ফলটা হল বিপরীত। ওরা আরোও জোরে তেড়ে এল, আমরা লাফ দিলাম বাগানে। ওরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যাকে সামনে পেল মারলো। সমস্ত জিনিষ-পত্র তছনছ করে দিল [আমরা ছেঁচা বেড়ার ফাঁক থেকে সব দেখলাম। কিন্তু করতে কিছুই পারলাম না।

রথীন কেন?

মহী কেন কিরে খোকা! কিছু করতে গেলে আমরাও যে শেষ হয়ে যেতাম। নিরস্ত্র হয়ে ওদের সংগে পেরে উঠবে কে? তবু তো সান্ত্বনা ইন্দ্রকে বাঁচাতে পারলাম।

রথীন তারপর?

মহী ওখান থেকে পালিয়ে এপারে চলে এলাম। এপারে আসা পর্যন্ত ইন্দ্রও আমার সংগে ছিল। কিন্তু তারপর থেকে আর ওকে দেখতে পাইনি। হ্যারে সত্যি কথা বল না, আমার ইন্দ্রকে তোরা দেখেছিস?

রথীন : দেখেছি।

মহী : দেখেছিস! কোথায় বল সে? আমি তাকে খুঁজে খুঁজে সারা!

রথীন : কেন?

মহী : আমি যে প্রতিশোধ নিয়েছি। সংবাদটা ওকে জানাবো না!

রথীন : প্রতিশোধ!

মহী : হ্যারে হ্যা প্রতিশোধ। এই তোরা সবাই ওখানে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোরা শুনতে চাস না বুঝি, আমি কেমন করে প্রতিশোধ নিলাম।

অসিত : না তা নয়। তবে—।

মহী : আরে বাবারা, ইন্দ্রর মরার খবরটা তোরা আমায় কেমন করে দিবি তাই ভাবছিস। ও আমি মুখ দেখলে বুঝতে পারি তোদের ওষ্ঠের পেছনে কোন্ কথাটা আটকে আছে। চোখ দেখলে বুঝতে পারি মনের গোপন ভাষা। আয় আমার কাছে আছে আয়। লড়াইয়ের সময় কোন দুর্বলতা মনকে প্রশ্রয় দিতে নেই। কান্নাকে আটকে রাখতে হয় গুমরে থাকা মনের মাঝে।

রথীন : মনে এত বল পাচ্ছেন কোথা থেকে?

মহী : বুকে বেঁধেছি সাত সাগরের ঢেউ আটকানো বাঁধ। আছড়ে পড়া কান্না এসে উপচে পড়ে, আবার ফিরে যায়। না; বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। হ্যারে, ওর দেহটা আছে, নাকি সেটাও রাক্ষসরা গিলে ফেলেছে?

রথীন : আছে। আজ রাতের অন্ধকারে ওটা জলে ভাসাবো।

মহী : (আবদারের সুরে) আমিও তোদের সংগে যাবো। সাঁতার কেটে নিজের হাতে নিয়ে যাবো মাঝ নদীর চরে। চিল-শকুনের দল যেখানে সদা বিচরণ করে। দেখবো আমি কেমন করে ঠুকরে ঠুকরে খায়। তারপর ফিরে এসে রাক্ষসগুলোর মাথা আবার ইট দিয়ে থ্যাৎলাবো। যেতে যেতে শোনাবো তোদের কেমন করে নিয়েছি প্রতিশোধ। ফিরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার চোখে জল নেই, তোদের চোখে জল! তাড়াতাড়ি চল। (প্রস্থানোদ্যত। ফিরে আসে) ভাবছিস, আমি পাগল হয়ে গেছি নারে? ও কথা ভুলেও ভাবিস নে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ...। (হাসি কান্না)।

[মহীতোষ একপাশে বসে পড়ে এবং আত্ম অভিনয় চালায়। রথীন ইত্যাদি অপর পাশে মিলিত হয়ে]

রথীন : মনে সংশয় থাকায় এতদিন আমরা অস্ত্র ধরিনি।

অসিত : আর দ্বিধা নয়, এবার আমাদেরও অস্ত্র ধরতে হবে।

মহী : (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যা—। এইতো, এইতো তোরাও আমাকে আবার নতুন করে বাঁচার পথ দেখাচ্ছিস। আমার বুড়ো হাড়ে আর জোর কত! তোরা জোয়ানরা যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গর্জে না উঠিস, তাহলে নতুন দিনের শিশুরা বাঁচবে কি করে! চুপি চুপি বলি শোন, আমার কাছে সতেরোটা বন্দুক আছে। আপাতত সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

রথীন : অতগুলো বন্দুক পেলেন কোথায়?

মহী : ঝোপ-ঝাড়ে দেহটা মুড়েছি কি শুধু শুধু! রাতের অন্ধকারে চুপ করে রাস্তার ধারে বসে থাকি। রাক্ষসগুলোর পাহারা দিতে দিতে যখন তন্দ্রা আসে, ঠিক সেই সময়ে একটা আস্ত ইট নিয়ে মাথায় সজোরে মারি। সংগে সংগে কাজ ফতে। আমি টোপ সেজে বন্দুক নিয়ে পালিয়ে আসি।

রথীন : তাহলে আমরাও সকলে ঝোপ ঝাড় পরে ফেলবো কি বলেন?

মহী : নিশ্চয়। ইন্দ্রের দেহটা নদীর চরে রেখে এসে, বন্দুক যেখানে রেখেছি সেখানে তোদের নিয়ে যাব। তোরা আমার সংগে বল—

হয় প্রাণ, নয় মান—

সকলে : হয় প্রাণ নয় মান,

মহী : হয় জান্, নয় মান।

সকলে : হয় জান্, নয় মান।

মহী : চল্ সকলে—।

[সকলের প্রস্থান। পিছনের পর্দা খোলে।] দেখা যায় প্রশাসক চিন্তিত মুখে পায়চারী করছে আর একপাশে দাঁড়িয়ে ভূপাল অনবরত তাকে কুর্নিশ করে চলেছে। প্রশাসকের পোষাক প্রতিনিধির অনুরূপ। আসবাব বলতে ঘরে একটা দামি ইজি চেয়ার আছে।]

প্রশাসক : (পায়চারী করতে করতে হঠাৎ ঘুরে) কিন্তু এটা কি করে সম্ভব?

ভূপাল : সম্ভব হয়েছে মান্নী,
আমি এটাই জানি।

প্রশাসক : (রেগে) চুপ করুন!! যা বলার সোজা করে বলুন। নইলে এখান থেকে যান।

[কথা বলার সময় ছাড়া ভূপালের কুর্নিশ কোন সময় থামবে না।
বিশেষ করে প্রশাসকের সামনে]

ভূপাল : খবরটা নিশ্চিত জেনে তবেই আপনাকে দিয়েছি।

প্রশাসক : কটা গান্ বোট ধ্বংস হয়েছে ?

ভূপাল : একটা গান্ বোট একটা ট্যাঙ্ক।

প্রশাসক : ৫৫'কে আমি তখনই বলেছিলাম, গান বোট নামাবার সময় এখনও হয়নি। এ পুরী ছেড়ে প্রাণ ভয়ে ওরা পাশের পুরীতে চলে যাচ্ছে—চলে যাক।

ভূপাল : ৫৫ ঠিক কাজই করেছিল। আমাদের এ পুরীর প্রচুর সম্পদ ওরা ও পুরীতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের পুরীর সম্পদ একটা ভিন্‌দেশী পুরীতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের পুরীর সম্পদ একটা ভিন্‌দেশী পুরীতে যাক, স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই এটা চায় না।

প্রশাসক : হয়েছে ! বুদ্ধি ফলাতে এসেছে ! (সামনের দিকে খানিকটা দ্রুত এগিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়) প্রহরী কোথায় ?

[লাফ মেরে প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী : প্রাণটা টিকিয়ে এখনও রেখেছি প্রভু,
প্রতিনিধির হাজির বিনা, বাঁচতো নাকো কভু।

প্রশাসক : ওদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে বলেছিলে ?

প্রহরী : বলেছি প্রভু।

প্রশাসক : ওরা রাজী ?

প্রহরী : মুখের ওপর সত্যি কথা কেমন করে বলি ?

প্রশাসক : লোভ দেখিয়েছিলে ?

প্রহরী : হ্যা।

প্রশাসক : তবুও না।

প্রহরী : না।

প্রশাসক : (রেগে) কুর্নিশ !!

ভূপাল : মানী ?

প্রশাসক : প্রচার চালাতে হবে—প্রচার।

ভূপাল : আদেশ দিন কেমন করে।

প্রশাসক : প্রহরীকে নিয়ে যান। প্রহরী যা বলবে আপনি তার প্রতিধ্বনি করবেন। প্রহরী যদি বলে অমুক জায়গায় আমাদের সেনারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, আপনি বোঝাবেন ঠিক অমুক জায়গাতেই প্রশাসকের সেনা আছে, আর সব প্রদেশের লোক দখল করে নিয়েছে।

ভূপাল : এতে যদি বিপরীত ফল ফলে যায়!

প্রশাসক : মানে?

ভূপাল : ওরা যদি সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করার জন্যে আমাদের আটকে রাখে?

প্রশাসক : মৃত্যু একদিন হবে জেনেও, আপনি কি প্রাণের মায়া করেন নাকি?

ভূপাল : প্রাণের মায়া কার না আছে মানী?

প্রশাসক : প্রহরী!

প্রহরী : প্রভু?

প্রশাসক : আমি এ পুরীর সর্বময় কর্তা।

প্রহরী : আমি প্রচার করি।

প্রশাসক : আমার কথার ওপর কথা বলতে সাহস পায়, এমন লোক এ পুরীতে আছে?

প্রহরী : যারা ছিল, তারা ইতিপূর্বেই আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

প্রশাসক : এখনও যারা আছে?

প্রহরী : আপনি কাজী। হাতের মুঠোর মধ্যে থাকলে শিরোচ্ছেদ ঘটান। আমি সেই শির ও পাশের পুরীতে পাঠিয়ে দেব।

প্রশাসক : প্রতিনিধি কোথায়?

প্রহরী : উল্কাসীর বুকে শত্রুরা একটা গান্‌বোট পাথরের আঘাতে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত সেখানে।

প্রশাসক : আমি থাকি, না থাকি, আসলেই ঐ কুর্নিশের গর্দান কেটে নিতে বলবে।

প্রহরী }
ভূপাল } : প্রভু!!

প্রশাসক : প্রাণের মায়া আপনার আছে-বলছিলেন না?

ভূপাল : আমার অপরাধগুলো জানতে পারলে একটু ভাল হত।

প্রশাসক : কেন ?

ভূপাল : আর কিছু না হোক খাঁড়ার আয়তনটা সম্বন্ধে সহজ ধারণা করে রাখতাম আগে থেকে।

প্রশাসক : আপনি যা যা করেছেন তার সমস্তটাই অপরাধ।

ভূপাল : মা-মা-মা-নে ?

প্রশাসক : নইলে এই ছোট্ট একটা পুরীর সামান্য কটা লোক কিসের জোরে আমার কথা শোনেনা ! কার ভরসায় তারা কর্মস্থলে ফিরে যেতে অস্বীকার করে ! কিসের জোরে ওরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ! গান্ বোট ধ্বংস করার সাহসই বা ওরা পায় কোথায় ?

ভূপাল : তা আমি কি করে বলি।

প্রশাসক : সে কথা যদি বুঝতাম যে আপনিই এসব করছেন তাহলে ত' অনেকদিন আগেই আপনার ঐ কুর্নিশ করা বাঁকানো গর্দান আমি ঝলসিয়ে খেতাম।

প্রহরী : আর একটা দুঃসংবাদ আছে প্রভু।

প্রশাসক : ওঃ আমি আর পারছি না। বল, আর কি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে !

প্রহরী : এ পুরী থেকে আমাদের প্রতিবেশী পুরীতে যাবার সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এমন কি বহির্জগতের সংগে আমরা দূরাভাষে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পেরেছি কি না তাও সন্দেহ।

প্রশাসক : (চীৎকার করে) কি !!

প্রহরী : সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রতিনিধি আপনার সংশয় দূর করতে পারবেন আশা রাখি।

প্রশাসক : (ভেঙে পড়ে) এখনও কি আপনি প্রাণের মায়া করে বসে থাকবেন কুর্নিশ।

ভূপাল : আমার ওপর আপনার বিশ্বাস নেই। তবু এতটা দায়িত্ব কেন আমার ওপর দিচ্ছেন মানী ? তাছাড়া আমি বুড়ো হয়েছি, এখন একটু ভেবে চিন্তে কাজের ভার না দিলে আমি পারবোই বা কেমন করে ?

প্রশাসক : আপনিও ভাল করে জানেন কুর্নিশ কেন আমি আপনার ওপর এত নির্ভর করি। আপনার বাকচাতুর্যে এখানকার লোকেদের মধ্যে আপনি যতটা তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারেন—আমার প্রশাসন ব্যবস্থায় আর কেউ নেই, অত তাড়াতাড়ি পারে। সে যাক, আপাতত যে কাজের ভার দিয়েছি সেটা খুবই ভেবে চিন্তে দিয়েছি। এখন আপনি বলুন কোন্‌টা বেছে নেবেন মৃত্যু না নতুন প্রাণ? মানে কাজটা করবেন না, না গর্দান দেবেন?

ভূপাল : মরতে যদি হয়, নিজের লোকের হাতেই মরবো।

প্রশাসক : অর্থাৎ আমার হাতেই আপনি মরতে চাইছেন?

ভূপাল : অগত্যা।

প্রশাসক : প্রহরী?

প্রহরী : প্রভু!!

প্রশাসক : তুমি আগে আগে বাদ্য বাজিয়ে প্রচার করবে। পেছনে কুর্নিশ তোমার কথার প্রতিধ্বনি করবে। কুর্নিশ! সাবধান করে দিচ্ছি, কোন চালাকী করলে কূলও যাবে, তরীও ভাসবে।

ভূপাল : আপনার কোন ব্যাপারে কোনদিন কোন চালাকী খেলেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

প্রশাসক : কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যা বলছি শুনুন। এই মুহূর্ত থেকে প্রচার করতে হবে, বিরোধী শক্তির প্রচণ্ড দাপটের কাছে নতি স্বীকার করে, আমি আমার সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। নতি স্বীকারের আর একটা কারণও অবশ্য আছে। প্রতি অক্রমণ করতে গেলে বহু নিরীহ মানুষ মারা পড়বে। কিন্তু আমি ইতিপূর্বেই মৃত্যু দেখে ক্লান্ত তার ওপর রসদের জোরও আমার এখন নেই। কুর্নিশ?

ভূপাল : বলুন?

প্রশাসক : এ পুরীর আঞ্চলিক সর্বময় কর্তা হতে আপনার ইচ্ছে করে?

ভূপাল : বুঝতে পারলাম না।

প্রশাসক : এই শেষ চালে যদি ঐ রুই-কাৎলাগুলোকে সাবার করা যায়, তাহলে চুনোপুটীদের কব্জায় আনতে বেশী সময় লাগবে না। রুই-কাৎলা

গুলো শেষ হয়ে গেলেই আপনাকে আমি আঞ্চলিক সর্বময় কর্তা করবো।

ভূপাল : কিন্তু আপনার ঐ ঘোষণায় সব সাবার হবে কি করে ?

প্রশাসক : আমার নতি স্বীকারের সংবাদে ওরা দলে দলে গাঁয়ে ফিরে আসবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চলবে শ্বেতপাখীর ওপর থেকে অবিরাম আগুনের বর্শা নিক্ষেপ। গ্রামকে গ্রাম জালিয়ে, পুড়িয়ে, ছারখার করে, এদের ঐতিহ্যের সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে আমি আমার মনো মত লোক এনে আবার নতুন করে গ্রাম তৈরী করবো।

ভূপাল : (চীৎকার করে ওঠে) না—। আপনি তা করবেন না।

প্রশাসক : যুদ্ধক্ষেত্রে আবেগ-অনুভূতির কোন দাম নেই ওসব অনুভূতিকে মনে প্রশ্রয় দেবেন না। প্রহরী ?

প্রহরী : প্রভু ?

প্রশাসক : আশাকরি আমার বক্তব্য তুমি বুঝতে পেরেছ ?

প্রহরী : মস্তিষ্ক আমার ক্ষুদ্র হলেও এটুকু বোঝার সামর্থ আমার আছে প্রভু।

প্রশাসক : বলতো কি বলবে ?

প্রহরী : (বাদ্য বাজাতে বাজাতে দর্শকদের দিকে এগিয়ে যায়) ওরে কে কোথায় আছিস শোন—

প্রশাসক : আগে একটা 'সোনার খোকারা' করে দাও।

প্রহরী : ওরে সোনার খোকারা, তোরা কে কোথায় আছিস শোন—
তোদের আর্ত চীৎকারে প্রভুর মন-উচাটন।
তোরা, বনের পল্লবে, ইলার কোলেতে, যে যেথায় আছিস শোন
সংগীন উচানো ঘাতকের দল গিয়েছে অস্তাচল।
তোদের অভাবে মায়ের বুকের স্তন শুকিয়ে যায়,
তোরা আয়রে ফিরে আয়— (প্রস্থান)

প্রশাসক : কুর্নিশ, ওর পেছনে যান।

[ভূপালের ধীর গতিতে প্রস্থান। প্রশাসক বীভৎস হাসি হাসে]

প্রশাসক : (হাসতে হাসতে) দেখি কতক্ষণ তোরা আত্মগোপন করে থাকতে পারিস ! হয় আমি মরবো—নয়তো তোরা সমূলে উৎখাত হবি। (আবার হাসি)

[হাত সমেত সারা দেহ বাঁধা অবস্থায় অম্বরকে নিয়ে প্রবেশ করে প্রতিনিধি। ভেতরে ঢুকেই অম্বকে প্রশাসকের পায়ের কাছে ফেলে।]

প্রশাসক : এ কে ?

প্রতিনিধি : স্বার্থের পরিপন্থী, ময়লার জঘন্যতম কীটদের অন্যতম। আশাকরি ইতিপূর্বেই শুনে থাকবেন, ঐ বিদ্রোহীর দল আমাদের একটা গান বোট ধ্বংস করেছে। বাষ্প চালিত স্থল যান চলাচলের পথ উড়িয়ে দিয়ে ওরা আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেছে। ধনপুরীর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে আমাদের যে প্রতিনিধি যাচ্ছিল, তাকে হত্যা করেছে।

অম্বর : (মাথাটা সামান্য উঁচু করে) এবার তোদের পালা। সারা পুরী আজ তৈরী। তোদের হিংসার খোরাক জোগাতে আমরা আর রাজী নই।

প্রশাসক : (সজোরে লাথি মারে) চুপ কর !!

অম্বর : ওসব ধমকানিতে আমরা ভয় পাই না।

প্রশাসক : তাই নাকি ? (দাঁতে দাঁত চেপে) দেখি ভয় পাস কি না ! প্রতিনিধি—(মঞ্চের পেছন দিকে চলে যায়)।

প্রতিনিধি : হুজুর !!

প্রশাসক : আপনার বুটটা দিয়ে ওর পা-টা চেপে ধরুন তো, দেখি ওর ভয় পায় কি না !

[প্রতিনিধি তাই করে। অম্বর পা সরিয়ে নেয়। কিন্তু প্রতিনিধির সংগে পেরে ওঠে না, প্রতিনিধি সজোরে তার সবুট পা অম্বরের পায়ে চেপে ধরে। অম্বর চীৎকার করে ওঠে। প্রতিনিধি এবং প্রশাসকের চাপা হাস্যরোল]

প্রশাসক : কিরে ভয় পাস ?

অম্বর : (কষ্ট হলেও দাঁতে দাঁত চেপে) না পাই না।

প্রশাসক : প্রতিনিধি !

প্রতিনিধি:

প্রশাসক : ওকে নিয়ে যান। আমার সেনাদের হাতে ওকে তুলে দিয়ে বলবেন, অন্ধ খাঁচার মধ্যে পুরে ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটেই ওকে পিটিয়ে শেষ করতে। যান।

[প্রতিনিধি আচ্ছা হুজুর বলে ধপাৎ করে অম্বর এর ঘাড় ধরে ঝোঁকে। ও টানতে টানতে নিয়ে যায়। যাবার সময় অম্বর বলে]

অম্বর : মানুষ হয়ে জন্মেছি—মরতে আমরা ভয় পাই না। কিন্তু তোদেরও মরনের দিন ঘনিয়ে আসছে। (প্রতিনিধি হিচড়োতে হিচড়োতে ওকে বাইরে নিয়ে যায়)

(প্রশাসক উচ্চ রবে হেসে সারা মঞ্চে দাপটের সংগে পায়চারী করে। পরে মঞ্চের মধ্যিখানে এসে)

প্রশাসক : (চোখে হিংস্রতার ভাব ফুটিয়ে) এইভাবে তোদের সবাইকে আমি টিপে টিপে শেষ করবো। সারা পুরীতে আমার নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবো, এখানে থাকবে কেবল একজনের শাসন এবং আমিই সেই একজন। (হাসি। বাঁ দিকে ঘুরে নিয়ে পিছনের ইজিচেয়ারের পাশে টেবিলের ওপর রক্ষিত ম্যাপটার কাছে যাবার জন্যে যেমনি, পা বাড়িয়েছে, সংগে সংগে বাইরের দিকে নজর যায়) কে ! কে ওখানে (গর্জ্জন করতে করতে এক পা এগিয়ে যায়) ?

(প্রতিনিধি দ্রুত প্রবেশ। প্রশাসকের কাছে গমন)

প্রতিনিধি : মহাশয়

প্রশাসক : (ভয়ে ঘুরে দাঁড়ায়) ওঃ আপনি! আচ্ছা, প্রতিনিধি দেখুন তো আমার বাগানের দিকটা। মনে হচ্ছে কে যেন রয়েছে।

প্রতিনিধি : কোথায় হুজুর।

প্রশাসক : ঐ যে ফুলবাগানের মধ্যে।

প্রতিনিধি : ওটা একটা ঝোপ। সম্ভবত দেবদারু গাছের।......

প্রশাসক : কিন্তু ঝোপ নড়বে কেন ?

প্রতিনিধি : হাওয়ায় ঝোপ নড়বে না!

প্রশাসক : সত্যিইতো। একথাটা আমার একবারও মাথায় আসেনি। ধন্যবাদ আপনাকে, প্রথমত, শুনুন আমি প্রচার করতে পাঠিয়েছি—।

[দূর থেকে ভূপালের চীৎকার—মানী—]

কুনিশের গলা মনে হচ্ছে!

প্রতিনিধি : আজ্ঞে হ্যা (শুনে নিয়ে)

[ভূপালের প্রবেশ]

ভূপাল : রানী, সর্বনাশ হয়ে গেছে। (প্রতিনিধির কাছে গিয়ে) প্রতিনিধি, কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।

প্রশাসক }
প্রতিনিধি } : কি হল কি ?

ভূপাল : সর্বনাস হয়েছে, ওরা সব দলে দলে ছুটে আসছে।

প্রশাসক : দূর মশাই, কারা ছুটে আসছে বলবেন তো !

ভূপাল : ওরা।

প্রতিনিধি : ওরা কারা ?

ভূপাল : (একবার প্রতিনিধি একবার প্রশাসক উভয়ের কাছে গিয়ে) কারুর হাতে বন্দুক, কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে বঁটি, কারুর হাতে কাঁটারী। সব একেবারে পংগপালের মতো ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসছে। (ভেতরের দিকে প্রস্থানোদ্যত অবস্থায়) পালিয়ে আসুন রানী, পালিয়ে আসুন— (প্রস্থান)।

[ওদিকে নেপথ্যে ততক্ষণে ডাক শুরু হয়েছে প্রহরীর ডাক— প্রভু—। ভূপাল ভেতরে গমন করলে প্রহরী ঢোকে]

প্রশাসক : কি !! (বলে ভূপালের প্রস্থান পথের দিকে খানিকটা এগোয় পিছনে প্রতিনিধি)

[প্রহরী ঢেকে]

প্রহরী : পালিয়ে যান প্রভু, পালিয়ে যান। হাঙরের মত সব দল বেঁধে সাঁতার কেটে এদিকে আসছে। তাড়াতাড়ি পালান।

[মহীতোষ মঞ্চে কখন ঢুকেছে এবং কখনই বা আস্তে আস্তে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে, কেউ দেখেনি। সেখান থেকে সে খিল খিল করে হেসে ওঠে। প্রতিনিধি এবং প্রশাসক উভয়ই চমকে ওঠে। প্রতিনিধি দ্রুত পকেটে হাত দেয়। প্রতিনিধি পিস্তল বের করে। প্রশাসক কিছু পায় না।]

প্রশাসক }
প্রতিনিধি } : কে !! কে !! (প্রতিনিধি এপাশ ওপাশ ঘুরে আসে)

প্রতিনিধি : কেউ না হুজুর।

প্রশাসক : কিন্তু ওরা এখানে এলো কি করে ?

প্রহরী : কি করে জানবো প্রভু !

প্রশাসক : হয়তো কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে !

[illegible] : কি করে জানবো প্রভু !

প্রতিনিধি : আমাদের সেনারা কোথায় ?

প্রহরী : কেউ পালিয়ে গেছে, কেউ নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, কেউ আমলকী বনের দিকে, কেউ নর্দ্দমার পাঁকে। আর কথা বাড়াবেন না প্রভু, পালিয়ে যান।

প্রশাসক : অসম্ভব। প্রতিনিধি !

প্রতিনিধি : আজ্ঞে হ্যা !

প্রশাসক : ধ্যোৎ তারি আজ্ঞে হ্যা এর বাচ্ছা। একটু এগিয়ে দেখুন না কি হয়েছে ?

প্রতিনিধি : আমি যাবো হুজুর ! মানে আমাকে একা পেয়ে যদি ওরা গালে দুটো চড় বসিয়ে দেয়।

প্রশাসক : রাবিশ ! গর্দ্দভ !! প্রহরী ?

প্রহরী : বলুন প্রভু ?

প্রশাসক : আমার সংগী হতে আপত্তি আছে ?

প্রহরী : স্বর্গে যেতে নেই, নরকে যেতে আছে।

প্রশাসক : এই বিপদের সময়ে যে কি করে অত ভাল ভাল কথা বেরোয় !

[আবার খিল খিল হাসি]

(ভয়ে) না, না, না—নিশ্চয়ই কেউ আছে। (ভেতরে পালাতে যায়। প্রবেশ করে। পথ আটকায়)

ভূপাল : মানী—ওদিকে পথ নেই। ওরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের পুরীতে ঢুকেছে।

[চারজনে ভূপাল যেদিক দিয়ে ঢুকছে সেদিককার পিছনের আর একটা উইং দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। প্রবেশ করে রথীন। বন্দুক দিয়ে ঠেলে মঞ্চের মাঝ জায়গায় পৌছে দেয়, চারজনে একেবারে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে]

রথীন : সুবিধে হবে না প্রশাসক।

(চারজনে তাড়াহুড়ো করে অপরদিককার একটা উইং দিয়ে পালাতে চায়। প্রবেশ করে অসিত হাতে বর্শা। উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে। ওরা পালিয়ে আর একটা উইংগের কাছে যায়। প্রবেশ করে জয়ন্ত। হাতে বটি। ভূপাল যেদিক দিয়ে ঢুকেছে সেখানে

যায়। প্রবেশ করে শান্তনু। হাতে লাঠি। চারজনে পিছনে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ঝোপ ঝাড়ে মোড়া মহীতোষ। সবাই মাঝমঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে তাকায়। পিছনে মহীতোষ, উচ্চরোলে হাসি। এই সময় ভূপাল পিছনদিকে প্রথমে রথীনের কাছে গিয়ে]

ভূপাল: ওরে বেঁধে ফেল, বেঁধে ফেল আর দেরী নয়। (চলে আসে শান্তনুর কাছে) ওরে বেঁধে ফেল, আর দেরী নয়। (জয়ন্তর কাছে যাবার জন্যে যখন প্রশাসক ইত্যাদির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল)

প্রশাসক
প্রতিনিধি } : কুর্নিশ !!

প্রহরী: ছিঃ ছিঃ নিজের লোক হয়ে কিনা তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে!

ভূপাল: (জয়ন্তর কাছে যাওয়া হল না, প্রহরীর দিকে ফিরে) হ্যাঁ করেছি। একক শাসন চাই না বলে করেছি। (প্রশাসকের কাছে) মৃত্যু দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বলে করেছি। (প্রতিনিধির কাছে গিয়ে যেমনি বলতে গেছে) বর্বর অত্যাচার চাই না বলে (কথা শেষ হয় না, প্রতিনিধি তাকে গুলি করে। হাতে একটা ইট নিয়ে পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসে মহীতোষ, রথীন বন্দুক উচিয়ে ধরে, জয়ন্ত বটি, অসিত বর্শা। কিন্তু সকলের আগে শান্তনুর সামনে ঘটনা ঘটায় শান্তনু লাঠি দিয়ে সংগে সংগে প্রতিনিধির কব্জি লক্ষ্য করে মারে। ভূপাল মাটিতে আস্তে আস্তে বসে পড়ে, কিন্তু প্রতিনিধির পিস্তলও ছিটকে বেরিয়ে যায়। প্রশাসক, প্রতিনিধি, প্রহরী আবার পলায়নের ভাব নেয়। কিন্তু পাঁচজনে একসংগে গর্জে ওঠে)

পাঁচজনে: হাত তুলে দাঁড়ান! আর এগুবেন না।
(ওরা হাত তুলে দাড়ায়। সংগে সংগে শান্তনু একটা দড়ির বল-এর অগ্রভাগ নিজের কাছে রেখে বলটা ছুড়ে দেয় জয়ন্তর কাছে। জয়ন্ত খুঁট ধরে রেখে বল ছুঁড়ে দেয় শান্তনুর দিকে। এইভাবে একটা ত্রিকোণের মধ্যে ওদের তিনজনকে ফেলে দেওয়া হয়। অসিত এবং রথীন উঁচিয়ে ধরে থাকবে।)
দড়ির বল নিয়ে লোফালুফি করে ওদের বেঁধে ফেলার সময় জয়ন্তর কণ্ঠে, (পরে শান্তনু আর সকলের কণ্ঠে)
গান শোনা যাবে—

বাঁধ, বাঁধ, বেঁধে ফেল, যেখানে যত পাবি,
শয়তান শাসকের দল,
বলিষ্ঠ মন নিয়ে, দুর্বার গতি নিয়ে
বেঁধে চল, বন্দুক নল।

অবিরাম আমরা যুঝি

কৃষ্ণ ধর

আমরা সবাই যেন যুদ্ধে পরিবৃত
প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধ, প্রত্যেক ঘরেই যুদ্ধ
কোথাও অদৃশ্য যুদ্ধ, কোথাও তা রক্তাক্ত ভীষণ।
প্রেম ভালবাসার যুদ্ধ, গোলাপের জন্য যুদ্ধ হয়
ক্ষুধার জন্যও লড়ি, মর্যাদার জন্য যুঝি সব
কোথাও বা চোখের জলের জন্য,
শিশুর দুধের জন্য কোথাও বা

সর্বত্রই যুদ্ধ চলে
এযুদ্ধের কোনো শেষ নেই।

●

আজও আমাকে বলতে হবে 'না'

হরপ্রসাদ মন্না

'এ বছরে পুজো পড়েছে ২৬ শে সেপ্টেম্বর'
আমি তারিখের হিসেব রাখি না।
অপু বলেছিল বোধহয় তারিকটা।
আমার এক বছরের মেয়ে
টুকুনসোনাকে কোলে নিয়ে,
সেদিন ওর মা অপু অর্থাৎ অপর্ণা
লেক-স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসের ওপর
বসে বসে, আরও, আরও অনেককিছু বলেছিল।

এরা বলেছে !
কাগজে দিয়েছে পুজোর আগেই
সমস্ত বন্ধ ফ্যাক্টরী খুলে যাবে।
এই ! তোমাদের 'লক্-আউট'
কবে ওরা তুলে নেবে গো ?'

লক্-আউটের এই সাত মাসে
অপু পেট ভরে ভাত পায় নি।
নতুন শাড়ী পায় নি।
একটাও সিনেমা দেখে নি।
ওর ফর্সা নিটোল মুখটা
তামাটে হয়ে গেছে।
দেহটা শীর্ণ হয়ে গেছে।

পুজোর আর দিনকয়েক বাকী।
আমার ফ্যাক্টরীতে এখনও লক্-আউট।

রোজ সন্ধ্যের মত
আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলে,
অপু জিগ্যেস করবে, 'ফ্যাক্টরী খুললো ?'
রোজ সন্ধ্যের মত
আজও আমাকে বলতে হবে 'না'

●

অগ্নিকন্যা রোশেনারা

পঙ্কজ সোম

শেকল-পরা স্বাধীনতার
সুদীর্ঘ কারাবাস,
ইতিহাসের ক্যালেণ্ডারে
তার সমাপ্তি চিহ্নিত
তাই দিকে দিকে মুক্তির উল্লাস—
বারুদের আঁতুর ঘরে
জন্ম নিল রোশেনারা।
আত্মত্যাগের ইতিহাসে,
একটি বিশিষ্ট নাম
'রোশেনারা, বিপ্লবী রোশেনারা'
যেন কালজয়ী নিশ্চল ধ্রুবতারা,
স্বদেশপ্রীতির এ জ্বলন্তসাক্ষ্য থেকে
আগামী পৃথিবী পাবে
মুক্তির ঠিকানা,
সে ঠিকানা হবে—
উপেক্ষিত বঞ্চিতের স্বর্গ নিবাস।
ক্রীতদাস আর কয়েদীর স্থান
ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ে
সমাহিত জারের স্বৈরাচার,
পড়ে আছে আস্তাকুঁড়ে
মুসোলিনী হিটলার
খান ইয়াহিয়া আর জুলফিকার।
শুধু জীবন্ত মৃত্যুঞ্জয়ী রোশেনারা
আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
দানবতা বনাম মানবতা সংগ্রাম—

রণচণ্ডী দশভুজায় বলিষ্ঠ হাত
দুর্ধর্ষ রোশেনারা
দুর্দম, দুর্বার, দুর্জয় সে ললনা।
মুক্তি সে পাবেই
দানবতার সমাধি পরে—
রোশেনারা শুধু নয়
পূর্ববাংলার,
সে ভিয়েতনামের, সে ভারতের
তথা সারাবিশ্বের
উপেক্ষিত শোষিত মানুষের—
হে নিবেদিতপ্রাণা, বীরাঙ্গণা রোশেনারা,
তোমার রোষানল জ্বলবেই জ্বলছে যেমন
এ যে স্বাধীনতার আগ্নেয় স্বাক্ষর॥

যৌবনের রক্ত ছুঁয়ে

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

চেতনার জন্ম নিল নতুন আলো।
কৃষ্ণপথ রাত্রির পর
একমুঠো জ্যোৎস্না ছড়ালো।
যৌবনের রক্ত ছুঁয়ে
এল এক বিশাল হৃদয়, কম্পিত, রক্তিম
দীর্ঘ এক অবসর পরে, দেখি,
ঠিক এক সদ্য-ফোটা ফুল
সৃষ্টি-শিহরণে কাঁপে
গোপন গৃহের কোণে, শুভ্র বাতাসে।

●

কৃষক

অমিয় কুমার হাটি

আপাত উদাস দৃষ্টি মেলে আছে দিকচক্রবালে,
সবল হাতের মধ্যে কাস্তেখানি ধারালো চকচকে,
ঝলসায় আগুন যেন, খর রৌদ্রে। গ্রামের কৃষক
কী যেন শুনেছে কানে, মনেমনে উদগ্রীব অধীর।

কাস্তে সে শানায় নিত্য। সুসময়ে অথবা আকালে
জেনেছে এ বাঁকা সূর্য একমাত্র শক্তি তার ঠিকে
অনেক স্বার্থের দ্বন্দ্বে। বুকে জোঁক। অজস্র শোষক।
তাদের সংহার মন্ত্র রক্তেবাজে। উর্দ্ধে তোলে শির।

চোয়াল কঠিন হয়। আর নয়। যুগ সন্ধিকালে
সকল বঞ্চিত দেশে অভ্যুত্থান। চোখের পলকে
বদলায় দৃশ্যের পট। নাটকের বিশিষ্ট নায়ক
সতর্ক চরণে হাঁটে বনাঙ্গনো। প্রতিজ্ঞায় স্থির।

কাস্তেটা আকাশে তোলো। হাত নাড়ে। বিশ্বের বিদ্যুৎ
চমকায় ঝলকায় তাতে। বজ্র নাচে ইতিহাস দূত।

ঈশ্বর বা অন্যকেউ

প্রণব ঘোষ

মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল
দুঃস্বপ্নের ঘোরে
ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম
বুকের মাঝখানে যন্ত্রণা দলাপাকান
ভীষণ তৃষ্ণার্ত্ত
গলা শুকিয়ে কাঠ
ঘামে সমস্ত শরীর জবজবে
অথচ অনেক করেও
স্বপ্নটা মনে করতে পারলাম না

মশারি তুলে দিলাম
জানলা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে
চাঁদ দেখতে দেখতে মনে হোল
ঈশ্বরের মুখ দেখতে পাচ্ছি
ক্ষত-বিক্ষত
বিকৃত
বীভৎস
এই বুঝি কেঁদে ফেলেন
কিন্তু না
হাসলেন।

শেষরাতে ঝড় উঠল।

●

একটি অসহায় প্রার্থনা

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমার এই রক্ত মাংস স্নায়ুর অসহায় লোভী
দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে, মানুষ যেরকম দূর দুর্গম
তীর্থ পথের শেষতম মন্দিরে দেবতার কাছে এসে
সমর্পিত হয়, সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে—সুখদুঃখ
স্বপ্ন সাধ আকাঙ্খার ইতিবৃত্ত, প্রত্যহের ক্ষুদ্র খণ্ড
ছিন্ন ভ্রষ্ট বিক্ষিপ্ত আমি' কে মুছে ফেলে নিঃশেষে
আমার চলে আসতে ইচ্ছে করছে তোমার কাছে :
তোমার খুব কাছে, তোমার নরম নিঃশ্বাসের নীল
নিবিড়তায়, ঘনিষ্ঠ তোমার সহজ সান্নিধ্যের উষ্ণ
উত্তাপে। তোমার সম্পর্কে আমার সমস্ত সুন্দর ইচ্ছেগুলি
আমার নিভৃত বুকের সমস্ত অব্যক্ত আকাঙ্খাগুলি
বার বার তারা সবাই ধীরে ধীরে শ্বেতপদ্ম হয়ে ফুটে
উঠতে থাকুক অনিন্দ্য তোমার চার পাশে : তারপর
তোমার নিটোল নরম হাতে তাদের তুমি একটি একটি
করে তুলে নাও—তুমি তাদের গন্ধ নাও, স্পর্শ নাও
তোমার পেলব ওষ্ঠাধরে, কপোলে চিবুকে তোমার
ধনী গ্রীবায়, এবং তাদের একটি দুটিকে তুমি পরে
নাও তোমার নির্জন নিবিড় খোঁপায় অন্তরালে! অথবা
তোমার, কখনো তোমার অলস ইচ্ছার মুহূর্তে উষ্ণ
তোমার কোমল হাতের মুঠোয় পিষ্ট কর তাদের। অথবা

ছিড়ে নিয়ে এক একটি করে পাপড়ি স্নিগ্ধ তোমার
আরক্ত সুন্দর নখাঙ্কুরে ছিন্ন ভিন্ন করে তাদের
ছুড়ে ফেলে দিও, ছড়িয়ে দিও ইতস্তত: তাদের এই
অপক্ষপাত মাটিতে এবং নিশব্দ চারিদিকে
ছড়িয়ে পড়া সেই সব পাপড়ির উপর দিয়ে
আরক্ত কোমল তোমার ছোট্ট দুটি পায়ে পায়ে
দলিত পিষ্ট করে চলে যেও তোমার যেখানে খুশী।
স্পর্শের আনন্দ বুকে করে তৃপ্ত আমার অসহায়
ইচ্ছারা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে নির্জন মাটিতে একা॥

চাই মন আঁকে

রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁচতে সবাই চায় তোমারই পাশে
মাটির পৃথিবী মাঝে পিয়াসা মনের :
জীবনের সুপ্ত সব রূপ রেখা খুলি
অলি গলি কানাকানি করে সময়ের।
কালো মাটি রাঙা হয় রঞ্জনার তীরে
বাঙলার সুরতীর্থ ভাঙা গড়া চলে ;
পত্রলেখা এ রাত্রির জীবন যৌবনে
আশ্চর্য ! তোমাকে চাই, রূপ ঝলমলে।
প্রথম কবিতা তুমি, সুর গীতিময়ী
আলোর প্রভাতী গাই, জ্বালি রক্ত দীপ ;
ওপার মেঘনা পদ্মা হাসে খল্ খল্
এপার গংগা চলে, ভালে সূর্য টিপ।
রূপসী বাঙলা মাকে এই বাঁকে বাঁকে
হৃদয়ের চিত্রপটে চাই মন আঁকে।

ভুল ঠিকানায়

সমীর বসু

ঠিক তখন সে এসে দাঁড়াল
একা
মাঠ ভেঙে ভেঙে
ঘুমন্ত শহরের নিঃশব্দ শিয়রে
বুকে তার বুলেটের রক্তচিহ্ন
স্বপ্নঘন চোখে আঁকা সোনার স্বদেশ

পূর্বদিগন্ত তখন দাউদাউ জ্বলছে
দানবের মুখোমুখি সংগ্রামের
রক্তাক্ত আগুনে
নদী-মাঠ-জনস্থলী দাউদাউ জ্বলছে……

আর এ শহরে অজগর ঘুম
তখনো—তখনো
আদর্শ দেয়ালে বিদ্ধ
যন্ত্রণায়
গুপ্তহত্যা অবাধ নিশীথে
মনুমেন্টের পায়ে
করুণার কনা—
অজগর ঘুম।

সে মরতে মরতেও দুচোখ ভয়ে
কাঁদল
কী করে বলবে সে—

'ঘুমন্ত শহর—
তোমার কাছেই আমি
শেষবার
যন্ত্রণায় রাঙা বুকে
কাঁটা কাঁটা মাঠ ভেঙে ভেঙে
সারা পথ পেরিয়ে এলাম!"

●

কোলকাতার ছড়া

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

এখন শুধু আমার হাতে
হাত ভর্ত্তি যুদ্ধ।
ছিঃ ছিঃ একী কাণ্ড,
শান্তি এখন চাঁদের দেশে
আমার দেশে ঝুলি ভর্ত্তি নরমুণ্ড।

দুই

শ্লোগান-বন্ধ--ইত্যাকার বস্তু
বড্ড বেশি ক্লিসে।
ফলত : চাঁদার বাক্স হাতে নিয়ে
গলির মোড়ে ধন্না দিয়ে,
রাম-শ্যাম-আর অমুক বস্তু
ধুত্তারি যাক বয়ে
এখন এসো, গড়গড়া আর তামাক নিয়ে
কি মশাই, যাবেন নাকি গৌরীসেনের দেশে?

তিন

আমাকে মাফ করবেন.
মিটিং ঘরে আমার প্রহিবিশন
কারণ, কলকাতার আকাশে শান্তির পারাবত
মিটিং ঘরে বড্ড বেশি খিস্তি খেউর।

পাশাপাশি থাকার প্রতিশ্রুতি

নবীন স্থর

সকলেই চিরকালের মেয়াদ সর্তে পাশাপাশি
থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনা
কেউ মুহূর্তব্যাপী—বড়জোর দুএকটি উজ্জ্বল ঋতুর
সংক্রামক ব্যাপ্তির মতন
চলে যাওয়ার হাহাকার ঘনীভূত করার জন্য
উদয়দিগন্ত রেখায় আকাশ রক্তিম করে,
দিনের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে রং
সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়তে-না-পড়তেই
আশ্চর্য জন্মের শোণিত ক্ষরনেই মৃত্যুর রক্তবমনে আপ্লুত হয়
তবু প্রতিদিন—প্রত্যেকেই চেতনে অচেতনে আলো অন্ধকারে
কাউকে-না-কাউকে চিরকালের জন্য অমোঘ প্রত্যাশায়
পাশাপাশি প্রতিশ্রুত দেখতে চায়

যে-অন্ধকার স্তূপ স্তূপ নৈরাশ্যের বিকট অবয়ব
প্রাগৈতিহাসিক গুহার ভিতর থেকে
আজতক্ চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্রমশঃ বিস্তৃত
সেই অন্ধকারে
আলোর পিপাসাগুলি উদ্যোগ নেওড়ানো
অস্তিত্বের জমাট মোমের নৈঃশব্দ্য
শিখায়িত করার উচ্চাভিলাষে
আমরা অনেকেই প্রতিদিন চেতনে অচেতনে আলো অন্ধকারে
চিরকালের মেয়াদসর্তে পাশাপাশি থাকার প্রতিশ্রুতি
বারংবার প্রার্থনা করি।

ঈশ্বর বিমুখ হলে

মনীন্দ্র নাথ বোস

ষ্ট্রীট-লাইটটা জ্বলছিল
সামনে একটা গাছ,
তারই
একটা পাতার
ছায়া
পড়েছিল
আমার
বাড়ীর দেওয়ালের উপর
ঈশ্বর ছিলেন
সামনে একটা জীবন
তারই
একটা ঘটনার
স্মৃতি
পড়েছিল
আমার
মনের উপর
হঠাৎ
লাইটা
নিবে গেল
দুজনে (গাছ ও দেওযাল)
এক-অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল
ঈশ্বর বিমুখ হলেন স্মৃতি
উঠে গেল
মানুষ
এক-অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল।

হালকা নীল এবং সবুজ

ইউ. কাজাকভ্

—লিলিয়া,—শুধু এইটুকু বলে ও আমার দিকে ওর উষ্ণ ছোট্ট হাতখানি বাড়িয়ে দিল।

আমি সতর্কতার সঙ্গে ওর হাত ধরে মৃদু চাপ দিলাম। আমার নামও বললাম।

চারদিকে উঁচু বাড়ীর নীচে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই সব স্বল্পালোকিত বাড়ীতে জানালা :· জানালাগুলি .হালকা নীল ও সবুজ, গোলাপী এবং সাদা। দোতলার হালকা নীল জানালা থেকে মৃদু গান ভেসে আসছে। ওরা রেডিও বাজাচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোতলার হালকা নীল জানালা দিয়ে ভেসে আসা জ্যাজ্ (Jazz) গানের তাল শুনছি।

ওর নাম বলার পর বেশ কিছুক্ষণ যেন নীরবতা নেমে আসে। আমি জানি ও কিছু শোনার প্রতীক্ষা করছে। হয়তো ভাবছে আমি কোন মজার কথা বলব বা শুধু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে গান শুনছি।

শেষ পর্যন্ত আমরা আলোকিত রাজপথে চলে এলাম। আমরা চারজন, আমার বন্ধু ও তার বান্ধবী, লিলিয়া এবং আমি। আমরা সিনেমায় যাচ্ছি। এই প্রথমবার আমি কোন মেয়ের সাথে সিনেমায় যাচ্ছি, এই প্রথমবার আমি ওর সঙ্গে পরিচিত হলাম, ও ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের নাম বলল। এই তো আমরা পাশাপাশি চলেছি, সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু একই সময়ে—অদ্ভুতভাবে পরিচিত।

আমার বন্ধু তার বান্ধবীকে নিয়ে একটু একটু করে আমাদের পেছনে পড়ে যেতে লাগল। আমি জানি এটা ওদের ইচ্ছাকৃত। আমরা দুজনে একসঙ্গে রয়ে গেলাম।

ওকে কি বলতে হবে? ও কি পছন্দ করবে? সতর্কতার সঙ্গে আমি

লিলিয়ার দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল, চুল ঘন কালো সম্ভবতঃ সরু তারের মত, ঘন ভুরু আর মুখমণ্ডল কঠিন। ওকে কিইবা বলা যায় ?

—আপনার কি মস্কো ভাল লাগছে ?—হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে ও কঠিন-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ভারী গলার আওয়াজ শুনে আমি চমকে উঠি এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। শেষে সাহস সঞ্চয় করে বলি,—হ্যাঁ, অবশ্যই মস্কো আমার ভাল লাগে। বিশেষতঃ, এর পায়ে-হাটা শান্ত রাস্তা ও চওড়া সড়কগুলি।—বলেই আমি আবার চুপ হয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত আমরা গিয়ে সিনেমাহলে পৌছালাম। শো আরম্ভ হতে আরো পনেরো মিনিট বাকী। আমরা লবির সামনে দাঁড়িয়ে গান শুনি। কিন্তু গান শুনতে ভাল লাগছেনা। আমি ছবিগুলি দেখতে শুরু করি। আমি এর আগে কখনও এত মনোযোগ সহকারে ওগুলি দেখিনি, কিন্তু এখন ওগুলি পরীক্ষা করে দেখতে ভাল লাগছে।

লিলিয়া আমার দিকে উজ্জ্বল ধূসর চোখে তাকাচ্ছে। ও কি দেখতে সুন্দরী ! না, ও খুব সুন্দরী নয়, তবে ওর চোখদুটি উজ্জ্বল আর গালদুটি গোলাপী ও ঠাসা। যখন হাসে, ওর গালে চমৎকার টোল পড়ে। ভ্রূযুগলও তখন আর রুক্ষ মনে হয় না। ওর কপাল প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। শুধুমাত্র কখনও সেখানে কয়েকটি বলিরেখা দেখা যায়। সম্ভবতঃ, এ সময়ে ও কিছু ভাবছে।

না, আমি আর ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনা। কেন ও আমাকে ওর দৃষ্টি দিয়ে এত পরীক্ষা করছে ?

—আমি একটু ধূমপান করে আসি,—এইকথা বলেই আমি ধূমপান কক্ষে চলে যাই। সেখানে বসে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। আমি ঘড়ি দেখলাম। শো শুরু হতে আরো পাঁচ মিনিট। না, হয়তো আমি বোকামি করছি। অন্যান্যরা এত সহজে পরিচয় আদান প্রদান করে, কথাবার্তা বলে, হাসে। তারা কত বাক্‌পটু, ফুটবল খেলা নিয়ে কথা বলে, সাইবারনেটিক্‌স্ সম্বন্ধে যুক্তির অবতারণা করে। মেয়েদের সঙ্গে সাইবারনেটিক্‌স্ বিষয়ে আলোচনা করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আর আমার মনে হয় লিলিয়া নির্দয়, ওর চুলগুলি তারের মত। আমার চুলগুলি অত্যন্ত নরম। সম্ভবতঃ, :এজন্যই আমি বসে বসে ধূমপান করছি, যদিও ধূমপান করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই।

অবশেষে ঘণ্টা বাজল। আমি অত্যন্ত ধীরে ধীরে ধূমপান কক্ষ থেকে

বেড়িয়ে লিলিয়ার কাছে গেলাম। পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে আমরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসলাম। তারপর আলো নিবে গেল ও ছবি শুরু হল।

যখন আমরা সিনেমা থেকে বেরোলাম, আমার বন্ধুবর সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছেন। এটা আমাকে এত প্রভাবিত করল যে আমার সাধারণভাবে চিন্তা করার শক্তি লোপ পেল। আমরা শুধু চলতে লাগলাম ও চুপ করে থাকলাম। রাজপথে কেউ নেই বললেই চলে। আমাদের চলার শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে।

এইভাবে আমবা ওর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দরজার কাছে আবার দাঁড়ালাম। অনেক রাত হয়েছে। জানালার আলো ইতিমধ্যেই নিভে গেছে, সদর দরজার কাছেও অন্ধকার, ঠিক যেরকমটি দুঘণ্টা আগে ছিল। অনেক সাদা ও গোলাপী জানালা আঁধার হয়ে গেছে, কিন্তু সবুজগুলি এখনো জ্বলছে। দোতালার হালকা নীল জানালাতেও আলো জ্বলছে, কেবল গান আর শোনা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। শেষে আমি বললাম, "আগামীকাল আমাদের দেখা হওয়া চাই।" আমি খুশী হলাম এটুকু চিন্তা করে যে দরজার কাছটা অন্ধকার হওয়াতে ও আমার গালের রক্তিম আভা দেখতে পেল না।

ও দেখা করতে রাজী হল। ওর ছুটি, আত্মীয়েরা গ্রীষ্মাবাসে চলে গেছেন আর ও যেন নিঃসঙ্গতায় বিরক্ত। বেড়াতে পারলে খুশীই হবে।

আমি ভাবছি, আমি কি ওর হাত ধরে বিদায় নেবো। কিন্তু ও নিজেই হাত বাড়িয়ে দিল এবং আমি আবার ওর হাতের উষ্ণতা ও বিশ্বস্ততা অনুভব করি।

২

পরের দিন একটু আগে ওদের বাড়ীতে গেলাম। উঠানে অনেক ছেলে-মেয়ে। আমার মনে হল, আমার দিকেই তাকাচ্ছে, আর ওরা ভালভাবেই জানে আমি কেন এসেছি।

আর আমি যেন কিছুতেই উঠান পেরিয়ে ওর জানালার কাছে পৌঁছাতে পারছিনা।

—লিলিয়া বাড়ীতে আছেন?—চেঁচিয়ে প্রশ্ন করি। হ্যাঁ, ও বাড়ীতে। সঙ্গে কোন বান্ধবী আছে।

—তাড়াতাড়ি আসুন!—লিলিয়া ডাকল আমাকে। কিন্তু আমি যে কিছুতেই আর উঠোন পেরোতে পারছিনা····

—আমি আপনার জানালায় উঠে আসছি।—স্থির চিন্তা করে আমি লাফিয়ে জানালায় উঠলাম।

আমি জানালার গোবরাটে গিয়ে বসে লিলিয়ার দিকে তাকালাম।

—গরমের দিনে জানালায় বসতে আমার ভাল লাগছে না। বরঞ্চ আপনার জন্য আমি রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষা করছি,—এইকথা বলে আমি জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ি। কয়েকমিনিটের মধ্যেই আমি লিলিয়াকে দেখতে পাই। ও ওর বান্ধবীর সঙ্গে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ওর বান্ধবীর দিকে আমি তাকালাম না। কেন ও আমাদের সঙ্গে চলেছে? আমি চুপ করে থাকি, আর লিলিয়া ওর বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। ওরা কথাবার্তা চালাচ্ছে আর আমি চুপ করে আছি। যখন আমরা দেয়ালে আঁটা একটা বিজ্ঞাপনের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আমি মনোযোগের সঙ্গে সেটা পড়তে শুরু করি। আমরা রাস্তার কিনারায় গিয়ে পৌছাই, আর এখানেই বান্ধবীটি বিদায় নিতে শুরু করে। আমি ওর দিকে তাকাই। ও অতীব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। বান্ধবীটি বিদায় নিয়ে চলে গেল, আর আমরা বন-বীথিকার দিকে অগ্রসর হলাম। কত প্রেমিক যুগল এই বীথিকা ধরে হেঁটে গিয়েছে। এখন আমরা এর উপর দিয়ে যাচ্ছি। এটা সত্যি, যে আমরা এখনও প্রেমিক-প্রেমিকা নই। তবে, হতে পারে, যে আমরাও প্রেমিক যুগল শুধু আমি তা জানি না। আমরা পরস্পর থেকে একটু দূরে দূরে চলেছি। ফুলের বাগিচায় অনেক ফুল ফুটে আছে। আমরা খুব কম কথা বলছি। আমরা নিজেদের বা পরিচিত লোকদের কথা বলছি আর একমিনিট আগে যে কথা বলেছি তা ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু এতে আমরা বিরক্ত হচ্ছিনা, আমাদের আরো অনেক সময় আছে। সম্মুখে সুদীর্ঘ অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন কাল, ভুলে যাওয়া কথা তখন মনে করা যেতে পারে। আর আরো ভালভাবে স্মৃতিতে আসবে পরে, রাত্রির গভীরতায়!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, আর আমরা এখনও হাঁটছি, কথা বলছি আর হাঁটছি। মস্কোতে না থেমে ক্রমাগতই হেঁটে যাওয়া যায়। রাস্তার আলোগুলি নিভে গেল। আকাশ যেন আরো নীচে নেমে এলো, তারাগুলি বড় বড় হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল—এলো শান্ত প্রভাত। প্রেমিক-প্রেমিকারা তখনও

বীথিকায় বসে আছে। আমি ওদের দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাই আর চিন্তা করি আমার কি কখনও লিলিয়ার সঙ্গে ঐভাবে বসে থাকা সম্ভব হবে।

রাস্তায় পুলিশ ছাড়া কোন লোকজন বিশেষ নেই। ওরা সকলেই আমাদের দিকে দেখছে। সম্ভবতঃ, ওরা আমাদের কিছু বলতে চায়, কিন্তু কিছুই ওরা বলল না। লিলিয়া মাথাটা একটু বেঁকিয়ে ওর পদক্ষেপ দ্রুত করে দেয়। আর আমার যেন কোন কারণে হাসতে ইচ্ছা হল। এখন আমরা প্রায় পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। আর আমি অনুভব করছি কিভাবে ওর হাতে মাঝে মাঝে আমার হাতে লাগছে।

শেষ পর্যন্ত ওর নিস্তব্ধ বাড়ীর উঠানে গিয়ে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সকলে ঘুমিয়ে আছে, কোন জানালাতেই আলো জ্বলছে না। ভোর রাতে আমি বাড়ী পৌছালাম। আমি শুয়ে শুয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি অনেক উঁচুতে সাততলায় বাস করি। আমাদের জানালা থেকে অনেক বাড়ীর ছাদ দেখা যায়। আর দূরে সেখানে, যেখান থেকে গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয় হয়, ক্রেমলীন দুর্গের তারা দেখা যায়। এখন শুধু তারা দেখা যাচ্ছে। আমি শুয়ে শুয়ে তারার দিকে তাকিয়ে আছি আর লিলিয়ার কথা ভাবছি।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার মার সঙ্গে উত্তরে চলে গেলাম। অনেক দিন ধরে আমি এই ভ্রমণের স্বপ্ন দেখছিলাম। সত্যিকারের ঘন বনাঞ্চলে আমার উপস্থিতি এই প্রথম। আমার রাইফেল আছে ও আমি শিকার করি। আমি সম্পূর্ণ একা শিকারে যাই এবং তাতে আমি বিরক্ত হইনা। আবহাওয়া খারাপই হোক বা ভালই হোক, আমি খুব ভোরে বাড়ী থেকে বেরোই আর জঙ্গলে চলে যাই। সেখানে আমি শিকার করি বা ছত্রাক সংগ্রহ করি অথবা বসে বসে ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকি। জঙ্গলে শুধুমাত্র শুয়ে থাকা যায়, শোনা যায় গাছের আওয়াজ বা লিলিয়ার কথা চিন্তা করা যায়। ওর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলা যায়। আমি ওর কাছে শিকারের গল্প করি, হ্রদের কথা বলি, জঙ্গলের কথা বলি।

একমাসের ভিতর আমি মস্কো ফিরে আসি। আমি বাড়ীতে সুটকেশ রেখে তখনই লিলিয়ার বাড়ীতে যাই।

আমি জানালার কাছে গিয়ে, পরদার ভিতর দিয়ে দেখি।

লিলিয়া একা চেয়ারে বসে পড়ছে। ওর মুখমণ্ডলে চিন্তার আভাস। ও চোখ ওঠায়। ওর চোখদুটি কি কালো! আমি আগে কেন ভেবেছিলাম যে ওর চোখদুটি ধূসর রংয়ের? ও দুটি সম্পূর্ণ কালো, প্রায় মিসকালো।

—লিলিয়া!—আমি অনুচ্চস্বরে ডাকি। লিলিয়া উঠে দাঁড়ায় ও জানালার কাছে আসে।

—আলিয়শা!—ও ধীরে ধীরে বলে!

—আলিয়শা! তুমি? এতো সত্যিই তুমি? আমি এখনই বাইরে আসছি। তুমি বেড়াতে যেতে চাও? আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে বেড়াতে। আমি এখনই বাইরে আসছি।

এক মিনিটের মধ্যেই ও বাইরে আসে। ও ছুটে আমার কাছে আসে, আমার হাত দুটি টেনে নেয় ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ওর হাতে ধরে রাখে।

আমার মনে হল ওর চেহারা কিছুটা রোদে পোড়া আর শীর্ণ হয়েছে। চোখ দুটি যেন আরো বড় হয়েছে।

—চল বেড়িয়ে আসি!—ও বলে।

আর তখন আমার খেয়াল হ'ল যে ও আমাকে 'তুমি' বলছে। আমি অনুভব করি যে আমার পা'দুটি এত দুর্বল হয়ে গেছে যে আমার একটু বসা উচিত।

আর এইতো আমরা আবার মস্কোর রাস্তা ধরে চলেছি। বৃষ্টি শুরু হল। আমরা এক সদর দরজার নীচে লুকিয়ে পড়ি ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সশব্দে জল পড়ছে, ফুটপাথ চকমক করছে, মোটর গাড়িগুলি সম্পূর্ণ ভিজে ভিজে চলেছে। একটু পরে বৃষ্টি বন্ধ হলে আমরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ি, খানা ডোবা লাফিয়ে পার হই। কিন্তু বৃষ্টি আবার নতুন শক্তি নিয়ে শুরু হল। আমরা আবার লুকিয়ে পড়ি। ওর চুল থেকে ঝড়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটাগুলি। চমকাচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী চমকাচ্ছে ওর চোখদুটি যখন ও আমার দিকে তাকাচ্ছে।

—তুমি আমার কথা মনে করেছো?—ও প্রশ্ন করল।—আমি প্রায় সব সময় তোমার কথা ভেবেছি, যদিও আমি ভাবতে চাইনি।

আমরা অনেক আগে থেকেই একই স্কুলে পড়ি। ও নবম শ্রেণীতে, আমার দশম। অবসর সময়টা আমি লিলিয়ার সঙ্গে কাটাই। আমি ওকে আরো বেশী ভালবাসি। প্রত্যেক মাসের সঙ্গে সঙ্গে লিলিয়া আমার আরো বেশী প্রিয় পাত্রী হয়ে ওঠে। ও প্রায়ই আমাকে টেলিফোনে ডাকে। আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলি, আর এই কথা বার্তার পর আর আমার পড়ার বইতে মনসংযোগ করা হয় না। এর পর প্রবল তুষারপাত শুরু হয়। মা গ্রামের বাড়ীতে যেতে চান, কিন্তু তাঁর কাছে গরম চাদর নেই। আমার কাকীমা যিনি গ্রামে থাকেন, তাঁর কাছে এরকম চাদর আছে। আমাকে এখন গিয়ে সেই চাদরটা আনতে হবে। রবিবার সকালে আমি বাড়ী থেকে বের হই। ষ্টেশনে যাবার পথে আমি একই সঙ্গে লিলিয়ার সাথে দেখা করি।

তারপর আমরা একসঙ্গে স্কেটিং করলাম এবং যাদুঘরে গিয়ে তাপ অনুভব করলাম। এখানে বেশ বসে বসে শান্ত পরিবেশে গল্প করা যায়। আমরা হলঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ছবি দেখলাম। কখনও কখনও আমরা ছবির কথা ভুলে নীচু গলায় কথা বলতে লাগলাম আর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। আমরা যাদুঘর থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসি আর আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে আমার চাদর আনতে যাওয়ার কথা ছিল। আমার খুব ভয় হওয়াতে লিলিয়াকে আমি এ বিষয়ে বললাম। আমরা ঠিক করলাম যে আমরা একসাথে গ্রামের বাড়ীতে যাব। আর আমরা এই ব্যাপারে খুশী হয়ে চললাম যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার প্রয়োজন নাই। আমরা বরফে ঢাকা প্ল্যাটফরমে ঢুকে আবার বেড়িয়ে এলাম আর মাঠ পেরিয়ে চলতে লাগলাম। এরপর আমরা জমাট বাঁধা বরফের নদী পার হয়ে অন্ধকার রাস্তায় চলতে লাগলাম। দু'ধারে ঘোরকালো ফার গাছ আর পাইন গাছ। এখানে তীব্র অন্ধকার, মাঠের চেয়েও বেশী। অবশেষে আমরা আমার কাকীমার বাড়ী গিয়ে পৌছালাম।

—লিলিয়া, তুমি আমার জন্য একটু অপেক্ষা করবে?

—ইতঃস্তত করে আমি জিজ্ঞাসা করি।—আমি খুব শীঘ্রই ফিরে আসব।

—বেশ,—ও রাজী হয়।—শুধু বেশী দেরী করো না। আমি ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি।

আমি ওকে অন্ধকার রাস্তায় সম্পূর্ণ একা রেখে চললাম। আমার মনে

মনে খুব খারাপ লাগল। কাকীমা ও খুড়োতো বোনরা আমাকে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত ও খুশী হল।

ওরা আমার ওভার কোট্ খুলে নিয়ে হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। অবশেষে আমি বললাম :

—মাফ করবেন, কিন্তু আমার একটু তাড়া আছে········ব্যাপার এই যে, আমি একা আসিনি। আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছে····একজন বন্ধু।

ওরা কি ভাবে আমাকে তিরস্কার করল. বোন বাগানে দৌড়ে গিয়ে মুহূর্ত মধ্যে লিলিয়াকে ঘরে নিয়ে এলো। ও বরফে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। ওরা ওর কোট্ খুলে নিয়ে ওকে ষ্টোভের সামনে বসাল। তারপর আমরা চা খেতে বসলাম। লিলিয়া তাপে ও ঝামেলায় লাল হয়ে উঠল। আমরা শীঘ্রই উঠে দাঁড়ালাম। যাওয়ার সময় হয়েছে। আমরা কোট পড়ে নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লাম। লিলিয়া হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করল।

—যখন তুমি আমাকে নিয়ে এলে, তখন তোমার খেয়াল কি ছিল।

আমিও হাসতে লাগলাম।

—আলিয়শা! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই····কেবল তুমি আমার দিকে তাকাবে না।

—আমি তাকাব না····

—আলিয়শা··· তুমি কখনও চুমু খেয়েছো?

—না। কখনও চুমু খাইনি। আর কি?

—একেবারেই না?

—আমি একবার চুমু খেয়েছিলাম····কিন্তু এটা ছিল প্রথম শ্রেণীতে। আমি একটা বাচ্চা মেয়েকে চুমু খেয়েছিলাম। ওর নাম পর্যন্ত আমি মনে করতে পারছিনা।

—তাহলে এটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তুমি তখন বালকমাত্র।

—হ্যা, আমি বালক ছিলাম।

—আলিয়শা····তুমি আমাকে চুমু খেতে চাও?

—কখন? এখনই?—আমি জিজ্ঞাসা করি।

—না, যখন আমরা রাজধানীতে গিয়ে পৌছাব। আমি চুপ করি। আমার মনে হয়, হিম পড়া একটু কমে আসছে। আমি হিম পড়াটা একেবারেই

অনুভব করতে পারছি না। আমার গাল লাল হয়ে গেছে। আমার গরম লাগছে।

—আলিয়শা....

—হ্যাঁ?

—আমি এখন পর্যন্ত কাউকেই চুমু খাইনি। আমি চুপ করে তারাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। জীবন এখনও কি আশ্চর্যজনক।

—এটা লজ্জাস্কর....চুমু খাওয়া? তুমি লজ্জিত হয়েছিলে?

—আমার মনে নেই, এত আগের ব্যাপার। আমার মতে, এতে লজ্জিত হবার কিছুই নেই।

আমরা ইতিমধ্যে মাঠের উপর দিয়ে চলতে শুরু করেছি। আমরা সম্পূর্ণ একা। যে পর্যন্ত না আমরা ষ্টেশনে পৌঁছালাম আমাদের আর কোন কথা হলো না। ষ্টেশন একেবারে ফাঁকা। বুকিং অফিসে একটি আলো জ্বলছে। লিলিয়া হঠাৎ আমার কাছ থেকে একটু দূরে দূরে হাঁটতে লাগল। আমি প্ল্যাট্‌ফরমের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ট্রেণের আলো দেখার চেষ্টা করি।

—আলিয়শা....লিলিয়া আমাকে ডাকে। ওর গলার স্বর অপরিচিত।

আমি ওর কাছে গিয়ে পৌঁছাই। আমার পা কাঁপছে। আমি হঠাৎ ভীত হয়ে পড়ি।

—আমি ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেছি। আমাকে জড়িয়ে ধর।

—লিলিয়া বলল।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরি। আমার মুখ প্রায় ওর মুখে গিয়ে ঠেকছে। আমি নিবিড় ভাবে ওর চোখের দিকে তাকাই। আমি এত ঘনিষ্ঠভাবে এই প্রথম ওর চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখের পাতার উপর সাদা হিমকণা জমেছে। ওর চোখদুটি কি বড় বড় আর দৃষ্টি ভয়ভীত। আমরা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা চুপ করে আছি কেন? যাই হোক কেউ একেবারেই কথা বলতে চাইছি না।

লিলিয়া ওর শান্ত ঠোঁটদুটি ধীরে ধীরে নাড়াল। ওর চোখদুটি একেবারে মিসকালো।

—তুমি আমাকে চুমু খাচ্ছ না কেন?—ক্ষীণ অনুচ্চস্বরে ও বলল।

আমি ওর ঠোঁট দুটির দিকে তাকাই। সে দুটি নড়ছে আর ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে অনেকক্ষণ ধরে নিবিড় ভাবে চুমু খাই,

সমস্ত বিশ্ব যেন নিঃশব্দে ঘুরতে থাকে। ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ ওকে চুমু খাচ্ছিলাম ও আধবোজা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ও চুমু খেল আর আমার দিকে তাকাল, এরপর আমি দেখলাম ও আমাকে কত ভালবাসে।

এইভাবে আমরা প্রথমবার চুমু খেলাম। এরপর ও আমার মুখে ও গালে চাপ দিতে লাগল। আমার মুখের উপর ওর গরম নিঃশ্বাস অনুভব করলাম আর ওর হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পেলাম। আমি ওকে আবার চুমু খেলাম। এবার ও চোখ বন্ধ করল।

দূরে ট্রেণের হুইসিল শোনা গেল। এক মিনিটের মধ্যে আমরা আলোকিত ও গরম কামরায় গিয়ে বসলাম। কামরার ভিতর লোক কম। একজন পড়ছে আর একজন ঢুলছে।

লিলিয়া চুপচাপ জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে যদিও জানালার সার্সির উপর বরফ জমা আর কিছুই তার ভিতর দিয়ে দেখা সম্ভব নয়।

কখন তুমি প্রেমে পড়বে ঠিক করে বলা কখনই সম্ভব নয়। আর আমি এখনও মনে করতে পারছি না আমি কখন লিলিয়ার প্রেমে পড়েছিলাম। যখন আমি উত্তরে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন হতে পারে কি? আর এও কি হতে পারে যখন ওকে ষ্টেশনে চুমু খেলাম, তখন? বা তখন, যখন প্রথম ওর হাত বাড়িয়ে দিয়ে কোমলস্বরে ওর নাম বলেছিল? আমি কেবল একটি কথাই জানি, যে এখন ওকে ছাড়া আমার চলে না। আমার পুরো জীবন কালটি এখন দু'ভাগে ভাগ করা যায় ওর সঙ্গে আলাপের আগে আর পরে।

শীতকালটি আমাদের কাছে খুবই মনোহর ছিল। সব চাওয়া-পাওয়া আমাদের কাছে এক অতীত ও ভবিষ্যৎ, আনন্দ ও সমস্ত জীবন, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। কিন্তু বসন্তকালে আমি অনুভব করতে আরম্ভ করলাম, যেন কিরকম একটা নূতন কিছু এগিয়ে আসছে। আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের মনোভাব পৃথক হয়ে গেছে। ও আর আমার তাকানোটা পছন্দ করেনা, আমাদের স্বপ্নের ব্যাপার নিয়ে ও যেন হাসাহাসি করে। আমরা প্রায় সব সময়েই ঝগড়া বাঁধিয়ে বসি। এরপর ...এরপর সবই খুব তাড়াতাড়ি এবং ভয়ানকভাবে ঢালু পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে পড়ল। বেশী সময়ই ওকে বাড়ীতে পাওয়া যায়না, বেশী সময়ই আমাদের কথাবার্ত্তা ফাঁকা কথায় শেষ হয়। আমি অনুভব করি,

ও আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, বহু দূরে....কি পরিতাপের বিষয়! কি দুর্বহ এই জীবন!

এই তো বসন্তকাল এসে গেছে....প্রচুর সূর্য্যের আলো, আকাশ হালকা নীল। সকলেই পবিত্র মে মাস উদ্‌যাপনের অপেক্ষা করছে। আর আমিও সকলের মত অপেক্ষায় আছি।

মে মাসে আমি দশ রুবল্ পকেট খরচার জন্য পেলাম! এখন আমাকে বেশ ধনী ব্যক্তি বলতে হবে! সামনে আমার পুরো তিনদিন ছুটি। তিনটি দিন আমি লিলিয়ার সঙ্গে কাটাব। আমি অন্য কোথায়ও যাব না, আমি এই কটা দিন ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আমরা কতদিন ধরে একসঙ্গে হইনি....।

কিন্তু ও একসঙ্গে হতে পারবে না। ওর অসুস্থ কাকার কাছে গ্রীষ্মবাসে যেতে হবে। মে মাসের দুই তারিখ? ও ভাবে আর লাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, হতে পারে, ও অবাধ জীবনের কথা ভাবছে। অবশ্য এটা ও অনেক পছন্দ করে। আমরা কেন এতদিন একত্র হইনি....

নির্দ্ধারিত সময়ে আমি গর্কি—রাজপথে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে কত কম লোকজন! আমার পকেটে দশ রুব্‌ল। আমি তা কাল খরচা করিনি। আমি ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করি।

রাস্তায় লোকজন চলছে, সবাই গান গাইছে, কেউ কেউ হল্লা করছে, একর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। সব বাড়ীতে পতাকা উড়ছে, শ্লোগান দিচ্ছে আর কতো আলো।

ওরা গান গাইছে, আমারও গান গাইতে ইচ্ছে করছে, দেখুন না আমার গলা ভাল....

হঠাৎ আমি লিলিয়াকে দেখতে পাই। ওকে যেরকম সুন্দরী লাগছে এরকম আগে কখনও দেখিনি। ওর চোখদুটি কাকে যেন খুঁজছে। ও আমাকে খুঁজছে। আমি ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য পা বাড়াই। হঠাৎ বুকে এক কঠিন তীক্ষ্ণ ব্যথা আঘাত করে। ও একা নয়। ওর পাশে টুপি পরিহিত এক ব্যক্তি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সুদর্শন, এই ব্যক্তিটি, ও ওর হাত ধরে আছে।

—নমস্কার, আলিয়শা,—লিলিয়া বলে। ওর গলা একটু কেঁপে ওঠে,

আর চোখে বিরক্তি। —তুমি কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ? মনে হয়, আমাদের খুব দেরী হয়ে গেছে····

ও ঘড়ির দিকে দেখে, এরপর ঐ লোকটির দিকে! ও কি আমার দিকেও এভাবে দেখত?

—তোমরা দয়া করে পরিচিত হও!

আমরা পরিচিত হলাম। ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে আমার হস্তমর্দন করে।

—বুঝলে আলিয়শা, আজ পারব না। আমরা এখনই বাইলশোয় থিয়েটারে যাচ্ছি····তুমি রাগ করলে না তো?

—না, আমি রাগ করিনি।

—তুমি আমাদের একটু এগিয়ে দেবে? দেখ, এখন তো তোমার কোন কাজও নেই।

—এগিয়ে দেব। বাস্তবিকই আমার কোন কাজ নেই।

—আমরা সদর রাস্তা ধরে একত্র এগোই। আমি কেনই বা যাচ্ছি? আমার সঙ্গে কি ব্যবহারটা হয়েছে? কতলোক ঘুরে ঘুরে গান গাইছে। একর্ডিয়ন বাজাচ্ছে। পকেটে আমার দশ রুব্‌ল্। কিন্তু আমি কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি?

—আর হ্যাঁ, কাকা কিরকম আছেন?—আমি জিজ্ঞাসা করি।

—কাকা? কাকা কেমন আছেন?—ও লোকটির দিকে তাকায়। —কাকা সেরে উঠছেন আমরা খুব মজার সঙ্গে যে দিবস কাটিয়েছি, খুব আমোদ হয়েছে। আমরা নেচেছি····আর তুমি? তুমিও কি মজার সঙ্গে কাটিয়েছো?

—আমি? অনেক ভালভাবে।

—হ্যাঁ, আমি খুশী।

আমরা বাইল্‌শোয় থিয়েটারের দিকে বাঁক নিলাম। আমরা পাশাপাশি যাচ্ছি, তিনজনে। কিন্তু আমি আর এখন ওর হাত ধরে চলছিনা। ওর হাত ধরেছে এই সুদর্শন ব্যক্তি। এখন আর ও আমার সঙ্গে যাচ্ছে না, ওর সঙ্গে যাচ্ছে। আমরা বাইল্‌শোয় থিয়েটার পর্য্যন্ত পৌছে থামলাম। আমি চুপ। আর কিছু বলার নেই।

—আচ্ছা, আমরা আসি। বিদায়!—লিলিয়া বলে আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। আমি ওর হস্তমর্দন করি।

ওরা ঘুরে থিয়েটারের দিকে চলতে লাগল। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আমার দৃষ্টি দিয়ে ওকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ও এ বছর বেশ বড় হয়ে গেছে! ও এখন সতেরো বছরের। এখন ও হেঁটে চলেছে আর পিছনে তাকাচ্ছেনা। এর আগে ও বিদায় নেবার পর বড় বেশী পিছনে তাকাতো। কখনও কখনও ফিরেও আসতো, আগ্রহের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাতো আর জিজ্ঞাসা করতো :

—তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও ?

—না, কিছু না.—আমি হেসে উত্তর দিতাম আর ও ফিরে আসাতে খুশীই হতাম।

ও তাড়াতাড়ি চারদিক দেখে, বলত :

আমাকে চুমু খাও !

আমি ওকে পার্কে বা রাস্তার কোণে নিয়ে গিয়ে চুমু খেতাম। রাস্তায় এরকম চুমু খাওয়া ও পছন্দ করত। এখন ও আর ফিরে তাকাচ্ছে না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি····

৬

বছরই কেটে গেল। পৃথিবীটা ধ্বংস হলো না, জীবন থমকে দাঁড়াল না। আমি লিলিয়ার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। বরঞ্চ আমি ওর কথা চিন্তা না করতে চেষ্টা করলাম। একবার রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করিনি ও কি রকম আছে বা সেও আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি আমি কি রকম আছি, যদিও এই সময়ের ভিতর আমার জীবনে অনেক কিছু নূতন ঘটনা ঘটে গেছে। একটা বছর এ অনেকখানি সময়। আমি কলেজে পড়ি আমি ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারি। কেউ আমাকে বাধা দেয় না, কেউ আমাকে বেড়াতে যাবার জন্য ডাকে না।

আবার বসন্ত এলো, ফিরে এলো মে মাস। আমি বসন্তকাল খুব পছন্দ করি। আমি পরীক্ষায় পাস করে দ্বিতীয় বর্ষে চলে যাই। একদিন আমি ওর চিঠি পেলাম। ও লিখেছে যে ওর বিয়ে। আরো লিখেছে, ওর বরের সঙ্গে ও উত্তরে বেড়াতে যাবে তাই ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য বারবার লিখেছে।

অবশ্যই, ও যদি চায় তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করব। ও আমার শত্রু নয়, আমার কোন ক্ষতি করেনি। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব, দেখুন আমি অনেক

আগেই সব, সব ভুলে গেছি। সত্যিই কি সব আবার মনে আসবে, যা একবছর আগে ঘটে গেছে।

আমি ষ্টেশনে যাই। আমি অনেকক্ষণ ধরে ওকে ষ্টেশনে খুঁজি, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। আমি হঠাৎ ওকে দেখে চমকে উঠি। ও হাত খোলা সাদা পোষাকে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতদুটি আগের মত কোমল। কিন্তু মুখ বদলে গেছে। সে মুখ এখন এক মহিলার। ও আর কিশোরী নয়, না, কিশোরী নয়....ওর সঙ্গে ওর স্বামী আর আত্মীয়রা দাঁড়িয়ে আছেন—সেই একই ব্যক্তি। ওরা সকলে জোরে জোরে কথা বলছে আর হাসছে। কিন্তু আমি দেখছি কিভাবে লিলিয়া ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে: ও আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি গিয়ে পৌঁছালাম। ও আমার হাত ধরল।

—আমি এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব,—মৃদু হেসে ও ওর স্বামীকে বলে। তিনি মাথা নাড়ালেন ও আমার দিকে সৌজন্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন। হ্যাঁ, তিনি আমাকে এখনও মনে রেখেছেন। তারপর লিলিয়ার সঙ্গে আমি ওখান থেকে সরে এলাম।

—আচ্ছা, তাহলে আমি চললাম, বিদায় মস্কো,—লিলিয়া বলে আর ভারাক্রান্ত দৃষ্টিমেলে ষ্টেশনের গম্বুজের দিকে তাকায়।—তুমি এসেছো, আমি খুশী হয়েছি। তুমি খুব বড় হয়ে গেছ। কিরকম চলছে তোমার?

—খুব ভাল,—উত্তর দিই আর হাসতে চেষ্টা করি, কিন্তু হাসির ভান করাও আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। লিলিয়া মনোযোগের সঙ্গে আমাকে দেখছে।

—তোমার কি হয়েছে?—ও জিজ্ঞাসা করে।

—কিছু ভেবোনা। আমি শুধু তোমার জন্য খুশি হয়েছি....তোমাদের কি অনেকদিন হল বিয়ে হয়েছে?

—এক সপ্তাহ হল। এটা এত আনন্দের।

হ্যাঁ, এটা আনন্দের।

লিলিয়া হাসতে লাগল।

—তুমি কোথা থেকে জানলে। কিন্তু তোমার মুখটি অস্বাভাবিক লাগছে!

—রোদ লেগে এরকম হয়েছে। এছাড়া আমি খুবই পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা আসছে,—আমি হাসার চেষ্টা করি।

—শোন, আলিয়শা, ব্যাপার কি ?—ভীতিমিশ্রিত স্বরে লিলিয়া জিজ্ঞাসা করে।

আমি কাছ থেকে ওর সুন্দর মুখের দিকে দেখি, সেখান থেকে যেন কি একটা চলে গেল। হঁ্যা, সেখানে পরিবর্তন হয়েছে। সে মুখ যেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

—তুমি আগে এ রকম ছিলে না,—ও বলে।

—না, কেবল রাত্রিতে ঘুম হয়নি,—আমি উত্তর দিই। ও ঘড়ি দেখল। তারপর ফিরে তাকাল। ওর স্বামীও মাথা নাড়াল।

—এই আসছি !—ও চেঁচিয়ে তাকে বলল এবং আবার আমার হাত ধরল।

—তুমি জান, আমি কত সুখী ! আমার মত সুখী হও। আমরা উত্তরে চলে যাচ্ছি. কর্মস্থলে····তোমার মনে আছে, তুমি আমার কাছে উত্তরের কত গল্প করতে ? তুমি আমার প্রতি খুশি হয়েছ ?—কেন ও আমাকে এসব জিজ্ঞাসা করছে ! হঠাৎ ও হাসতে আরম্ভ করে।

—তুমি জান, আমার মনে আছে, আমরা শীতের সময় কি রকম চুমু খেতাম।—ও হাসে।—আমরা কিরকম নির্বোধ ছিলাম।

—হঁ্যা, আমরা নির্বোধ ছিলাম····

লিলিয়া কামরার দিকে এগিয়ে যায়। সকলে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

—আচ্ছা, বিদায় ! ও বলে।—না, আবার দেখা হবে ! আমি তোমাকে চিঠি লিখব, ঠিক আছে ?

আমি জানি, ও আর চিঠি লিখবে না। কেন লিখবে ? এবং তা ও জানে। ও আমার দিকে তাকাতেই ওর মুখ লালচে হয়ে যায়।

—আমি তবু খুশি যে তুমি দেখা করতে এসেছো। এবং অবশ্যই ফুল না নিয়েই এসেছো। তুমি কোনদিন আমাকে একটিও ফুল দেওনি।

—হঁ্যা, আমি তোমাকে কিছুই দিইনি····ও আমার হাত ছেড়ে দেয়, ওর স্বামীর হাত ধরে এবং কামরাতে গিয়ে ঢোকে। ট্রেণ চলতে শুরু করে। আমরা নীচে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকি। ওর আত্মীয়-স্বজনরা কি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারি না। সকলেই হাসছে, রুমাল নাড়াচ্ছে, চীৎকার করছে, কামরার পাশে পাশে যাচ্ছে। লিলিয়া ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে। এক হাত দিয়ে ওর স্বামীর কাঁধ ধরেছে, অন্য হাত

আমাদের দিকে নাড়াচ্ছে। দূর থেকে পর্যন্ত দেখা যায়, ওর হাত কত কোমল। এবং আরও দেখা যায়, ওর হাসি কত সুখের।

ট্রেণ চলে গেল!

আমি সিগারেট ধরাই ও বাইরে বেরোবার রাস্তা নিই। আমি আলোক স্তম্ভগুলির দিকে তাকাই। ওগুলি সূর্যের আলোয় চকমক করছে, তাকালে চোখ জ্বালা করে। আমিও চোখ নামিয়ে নি। এখন স্বীকার করা যায়, এত কিছু সত্বেও পুরো একবছর আমার মনে আশা ছিল। এখন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। ভালই, ওর খুশিতে আমি খুশি, কথা দিয়েছি, খুশি থাকব। শুধু বুকে যেন কিরকম একটা ব্যথা অনুভব করছি।

সাধারণ ব্যাপার, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়, খুবই ভাল। শুধু এইটুকু খারাপ লাগছে, যে আমি কাঁদতে পারছিনা। আমি শেষ বার কেঁদে ছিলাম যখন আমার বয়স পনেরো বছরের ছিল। এখন আমি কুড়ি বছরে পা দিয়েছি। বুকে যেন কি একটা আটকে গেছে, আর আমি কাঁদতে পারছি না। খুব ভাল, মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা····

আমি মেট্রোর (ভূ-গর্ভস্থ রেলপথ) দিকে যাই। আমার মুখের উপর দিয়ে কি যেন ঘটে গেছে। আমি লক্ষ্য করি, অনেকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। বাড়ীতে গিয়ে কিছুক্ষণ লিলিয়ার কথা চিন্তা করি। সম্ভবতঃ, ও এখন সেই প্ল্যাটফরমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে আমরা প্রথমবার চুমু খেয়েছিলাম। সেই প্ল্যাটফরমের দিকে কি ও একবার ফিরে তাকাল? আমার কথা কি আবার মনে হল? কিন্তু, প্ল্যাটফরমের দিকে ও তাকাবে কেন? ও এখন তাকিয়ে আছে ওর স্বামীর দিকে। ও ওকে ভালবাসে। ওর স্বামী বেশ সুদর্শন।

৭

এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, দুঃখও চিরস্থায়ী হয় না! আর জীবনের গতি কখনও থেমে যায় না। সমস্ত মানবজাতীর দুঃখ, জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে, নিতান্ত নগণ্য। এরকম চমৎকারভাবে পৃথিবীকে সাজানো হয়েছে।

এখন আমার কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেছে। আমার তারুণ্যের অবসান হয়েছে, এতো ভালই; আমি একজন বয়স্ক-ব্যক্তি। শীঘ্রই আমি উত্তরে যাব। জানি না, কেন আমি উত্তরে যেতে চাই। সম্ভবতঃ, এজন্য যে কোথায় যেন

সেখানে একবার শিকারে গিয়েছিলাম এবং আনন্দ পেয়েছিলাম। লিলিয়াকে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি, এত বছর কেটে গিয়েছে! বেঁচে থাকাই কঠিন হতো যদি ভুলে যাওয়া না থাকতো। অবশ্যই ও এখনও পর্যন্ত আমাকে উত্তর থেকে কোন চিঠি লেখেনি। আমি জানি না, ও কোথায়, আর জানতেও চাই না। আমি ওর কথা একেবারেই ভাবি না। জীবন এখন আমার কাছে রমণীয় খেলাধূলার প্রতিযোগিতা, বৈঠক, হাতে-কলমে কাজ, পরীক্ষা—এ সব নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে আমার এক মিনিটও সময় নেই। এ ছাড়া আমি নাচতে শিখেছি, অনেক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, অনেককে ভাল বেসেছি, ওরাও অনেকে আমাকে ভাল বেসেছে·········

কিন্তু কখনও কখনও লিলিয়াকে আমি স্বপ্ন দেখি। ও আমার কাছে স্বপ্নে উদয় হয়, আমি ওর গলার আওয়াজ শুনতে পাই, ওর নরম হাসি, ওর হাতের স্পর্শ, ওর সঙ্গে কথা বলা—(কি সম্বন্ধে কথা হয়, আমি মনে করতে পারি না) আর তখন নিজেকে তরুণ ও লাজুক মনে হয়, যেন আমার আবার সতেরো বছর বয়স আর জীবনে যেন এই প্রথমবার ভালবাসছি।

আমি সকালে উঠি, কলেজে যাই। কিন্তু এসব দিন আমার মন ভারগ্রস্ত থাকে আর একা থাকতে পছন্দ করি, কোথাও চোখ বুজে বসে থাকতে ভাল লাগে।

কিন্তু কদাচিৎ এরকম হয়, বছরে গোটা চারেক বার। আর দেখো, এটা শুধু স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখা পছন্দ করি না। গানের স্বপ্ন দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। আমি গাঢ় ঘুম পছন্দ করি, তাতে জেগে উঠে মেজাজ খুশী থাকে। দেখুন জীবনটা এত সুন্দর!

হায়, কেন আমি স্বপ্ন পছন্দ করি না!*

*সোভিয়েট লেখক ইউ. কাজাকভ্ লিখিত রুশ গল্পের সরাসরি বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক: ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ফিচার

বিহঙ্গ বনাম বিমান

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

বিরাটাকার পাখির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ মাঝে মাঝেই আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই। তবে এ ধরণের সংবাদগুলিকে বিমান যাত্রীদের পক্ষে দারুণ একটা সমস্যা বলে আমরা অনেকেই মনে করি না। কিন্তু পাখি এবং বিমানের সংঘর্ষ জনিত গত কয়েক বছরের একটা হিসেব কষলেই অনুমান করা যাবে, এ সমস্যার গুরুত্ব কতখানি।

সামান্য একটা পাখি যে কি সাংঘাতিক বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রমাণ ইংল্যাণ্ডের একটি ঘটনা। তা'হল একটি ছোট্ট চড়ুই পাখি এক বিরাটাকার যাত্রীবাহী বিমানকে সামান্য কিছুটা ওড়ার পরই মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য করে।

প্রায় বছর দশেক আগে বোস্টন শহরে একটি বিমান ঘাঁটি থেকে একটি বিমান শূন্যে ওঠার পূর্বেই এক সামুদ্রিক পাখির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে রাণ-ওয়ের পাশেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে উল্টে গিয়েছিল। ওল্টানোর পর স্বভাবতই আগুন লেগে গিয়েছিল বিমানটিতে এবং জলন্ত চেম্বার থেকে কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে বেরিয়ে এসেছিল সেই বৈমানিক।

একটি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায় যে গত সাত বছরে বিভিন্ন জাতের পাখি এবং বিমানের মধ্যে অন্ততপক্ষে পাঁচশোটি সংঘর্ষ হয়েছে। এই সংঘর্ষগুলির পরিণতিতে বেশ কিছু মৃত্যুর সংবাদও এই পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া গেছে।

১৯৫৮ সালের একটি যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার উনিশজন যাত্রী নিহত হয়েছিল এবং দুর্ঘটনার কারণ নির্দেশ যে রিপোর্ট পেশ করা হয়, তাতে খুঁটিয়ে অনুসন্ধানের পর একালে উড়ন্ত রাজহাঁসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে ছিল। এর ঠিক দুবছর পরে সংঘটিত আর একটি বিমান দুর্ঘটনার কথা বলছি, যে দুর্ঘটনায় বিমানের বাষট্টিজন যাত্রীই নিহত হয়েছিল। অনুসন্ধান রিপোর্টে জানা যায় বিমানের ভূমিপথ ছেড়ে ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক এক পাখীর দল বিমান পথের মধ্যে এসে পড়ে। শুক জাতীয় এই পাখির দলটি সংখ্যায় ছিল আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার। এই বিরাট বিমানটির সঙ্গে

বিমানের সংঘর্ষের ফলে দুর্ঘটনার পর বহু পাখিকে বিমানটির ইঞ্জিনের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আরও শতাধিক পাখি মৃত এবং অর্ধমৃত অবস্থায় বিমানঘাঁটির রাণওয়েতে এসে পড়েছিল। এ দুর্ঘটনাটিও ঘটেছিল বোস্টনের একটি বিমান ঘাঁটিতে। পরবর্তীকালে বিশেষ ধরণের বহু ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও একই বিমানঘাঁটিতে আরও কয়েকটি দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তবে সৌভাগ্যবশতঃ কোনটিতেই মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

বহু ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যখন এমন ধরণের ছোটখাটো দুর্ঘটনা ক্রমাগতই ঘটতে লাগল, তখন বিমানঘাঁটির কর্তৃপক্ষ এক অভিনব পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। প্রতিটি বিমানঘাঁটি থেকে আকাশে ওড়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটি সশস্ত্র জীপগাড়ী (পাখি মারা বন্দুক নিয়ে) রাণওয়ের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে, যদি কোনও পাখি বা পাখির ঝাঁক বিমানপথের ওপর আরামে ঘুমোয় অথবা প্রমোদ-বিহারে ব্যস্ত থাকে, তাদের তাড়িয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে এবং সম্ভব হ'লে বন্দুকের সাহায্যে গুলি করে বিমানপথ নিরাপদ করে নেয়। এ ছাড়াও বিমানঘাঁটির সীমানার চারপাশেও এই ধরণের সশস্ত্র পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে পাখির দল কোনক্রমেই বিমানঘাঁটির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। সাময়িক ভাবে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হলেও এই সব পাখিদের মরসুমে বন্দুক ছুঁড়ে বহু পাখি নিদারুণভাবে বধিত হয়, যে অস্ত্রের ব্যবহারও সেখানে পরাজিত হোত। আর তাছাড়া বিমানঘাঁটিকে পাখি শিকারের একটি কেন্দ্র তৈরী করাও কর্তৃপক্ষের নিশ্চয় উদ্দেশ্য নয়।

মার্কিন নৌ-বহর কয়েকবছর আগে একটি বিমানঘাঁটি নির্মান করেছিল লোকালয় থেকে অনেক দূর সমুদ্রের মাঝখানে একটি নির্জন দ্বীপে যেখানে পাখিদের অত্যাচার কম হবে বলে তারা আশা করেছিল। কিন্তু সেখানেও পাখিদের আসা-যাওয়া থেকে তারা নিস্তার পায় নি। কারণ ভূপৃষ্ঠের কোনও অংশই পাখিদের অপরিচিত নয়। মানব সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করার বহু পূর্বেই পাখিরা পৃথিবীর বিভিন্ন সীমানার মধ্যে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

মার্কিন নৌ-বহর আরও চেষ্টা করেছে সেই পাখিদের ডিম অন্য কোনও দ্বীপে স্থানান্তরিত করার জন্যে-যে দ্বীপ বিমানঘাঁটির দ্বীপ থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে। পাখিদের তাড়াবার জন্যে তারা বিশেষ জাতের বোমা পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। কিন্তু কিছুই কার্যকর হয় নি বেশ কয়েক বছরের বহু পরিশ্রম ও বিভিন্ন চেষ্টাতেও।

বর্ষার ভিজে সন্ধ্যা ; অন্ধকার পিচ্ছিল পথের ক্লান্তি ঘুচে গিয়ে এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠলো মন। অবশেষে পৌছলাম কবি মজুমদারের বাসভবনে। বেলঘরিয়াতে কবি তখনও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বসে গেয়ে চলেছে 'যেন পেরিয়ে এলাম অন্ত বিহীন পথ·····।' ওর বাড়ীর জানলার কাছে একটু থমকে দাঁড়াই, উদাস আনমনে কবি গাইছে। একটু পরে আমাদের অভ্যর্থণা করে ঘরে নিয়ে গেল। খুব সাধারণ অথচ শৈল্পিক সৌন্দর্যে সাজান ঘরটি। কুশল বিনিময়ের পর প্রশ্ন করলাম শিল্পীর সম্পর্কে কিছু জানতে বৈষ্ণবী বিনয়ের সঙ্গে কবি বলে চললো তার নিজের কথা নিজের ভাষায়—

১। প্রশ্ন : প্রথমে তোমার ছোটবেলার কথা কিছু বল।

উত্তর : মনে পড়ে আমার জন্মস্থানকে, আমার জন্মভূমিকে ১০৪০ সালের যশোপুর জেলার শ্রীপুর গ্রামটিকে। সত্যি তুলনা হয় না পূর্ব-বাংলার সেই সৌন্দর্য্য পূর্ণ গ্রামগুলির। অপূর্ব সুখ মণ্ডিত ছিল সেই ছেলে বেলার দিনগুলি, মা, বাবা, পাঁচ বোন আর তিন ভাই মিলে ছিল আমাদের সুখের সংসার। বাবা ছিলেন

সাক্ষাৎকার

কবি মজুমদার

সরকারী ডাক্তার তাই অভাব অনটন আমাদের ছিল না বল্লেই চলে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এখনকার মত সংগীত শিক্ষার সুযোগ ছিল না আর প্রসার তো ছিলই না। তবু ছোট বেলা থেকেই সংগীতের উপর আকর্ষণ বোধ করায় পড়া-শোনার ফাঁকে ফাঁকে আপন মনেই সংগীত চর্চা করে যেতাম। আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশগম্ভীর প্রকৃতির লোক। উনি বাড়ীতে গান বাজনার আসর বসাতেন কিন্তু সেখানে আমাদের মত নাবালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। লেখা পড়া ছেড়ে গান বাজনার জগতের সন্ধান নেওয়া বাবা একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং তাঁর ধারণা ছিল এই বয়সে পড়াশুনার সময় গানবাজনার দিকে মন দিলে পড়াশুনা হবে না। তবু লেখাপড়ার থেকেও সংগীতের দিকেই মন বেশী ঝুঁকত এবং বাবার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তার অসাক্ষাতে সংগীত

চর্চা করে যেতে লাগলাম। এবং মনে হয় চট্ করে কোনকিছু আয়ত্ত করবার একটা ভগবদ শক্তি ছিল বলেই পড়াশোনা করার উপর খুব বেশী চাপ না দিয়েও পড়ার ক্লাশে প্রথম ছাড়া কোনদিন দ্বিতীয় হইনি। এইভাবে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর দেশ বিভাগের দুর্যোগে সবকিছু ছেড়ে কলকাতার শহুরে পরিবেশে ভাগ্য অন্বেষণে বেড়িয়ে পড়তে হয় কলকাতার পথে ঘাটে।

২। প্রশ্ন: আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রে যোগদান করেছো কবে এবং কি ভাবে ?

উত্তর: এক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে নিজেদের গুছিয়ে মানিয়ে নিতে আমাদের বেশ সময় নষ্ট হয় এবং সবকিছু বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো ভাবে চলতে থাকে। এই সময় আমি নিজের ইচ্ছার বসে বেতারে যোগ দিই ও কৃতকার্য্য হই। সেই দিনটির কথা বা সেই সালের কথা আজ আর মনে নেই, তবে মনে হয় আজ থেকে ১০ বৎসর আগে কারো সাহায্য না নিয়েই নিজের মনের জোর নিয়েই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বেতার কেন্দ্রের দরজার সামনে এবং সসম্মানেই প্রবেশ করেছিলাম। বেতারে আমি প্রথম আধুনিক গান গাই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও আমার নিজের সুরে।

সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত গৌরীদার লেখা বহু গান আমি গেয়ে আসছি রেডিওতে, নানা জায়গায় ও নানা জলসায়। আমার সংগীত জীবনে গৌরীদার স্নেহের তুলনা হয় না, ছোট ভাইয়ের মতই তিনি সর্বদা আমায় দেখেছেন। বেতারে আমাকে গানের কথা দিয়ে সাহায্য করেছেন আরো অনেকে; তাঁদের মধ্যে তরুণ লেখক সুরজিৎ সাহার কথাই সর্বপ্রথম মনে পড়ে। ছোট ভাইয়ের মত আমার সব আদেশ সে মাথা পেতে নিত। সত্যবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা দে, তপেন্দ্র দেব এবং স্বর্গীয় অমিয় দাশগুপ্ত এঁরাও আমাকে গানের কথা দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

৩। প্রশ্ন: সঙ্গীতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এবং রেকর্ড সম্পর্কে যদি কিছু বল।

উত্তর: আমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীঅনিমেষ রায়ের সহযোগিতা ও পরামর্শে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। রবীন্দ্রভারতীর ডিপ্লোমা অর্জন করার পর আমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে B. A. প্রথম বর্ষে পড়তে পড়তে নানা বাধা বিঘ্নের জন্য বাধ্য হয়ে পড়াশুনা বন্ধ করে বাঁচবার লড়াইতে ঢুকে পড়লাম।

এই সময় আমি আমাদের রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপিকা শ্রীমতি মায়া সেনের

পরামর্শে হিন্দুস্থান কোম্পানীতে রেকর্ড করার জন্য যাই এবং মায়া সেনের ট্রেনিং-এ ১৯৬৮ সালে প্রথম রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড করি (১) "শুন নলিনী খোল গো আঁখি", (২) "আয় তব সহচরী"। ১৯৬৯ ইং সালে (১) "আমি যাব না গো" (২) "ধূসর জীবনের"। ১৯৭০ সালে হিন্দুস্থান কোম্পানীর সঙ্গে মত-বিরোধ হওয়ায় রেকর্ড করা হয়নি। তাই এই বছর ১৯৭১ইং সালে আমার নিজের ট্রেনিং-এ (১) "বুক যে ফেটে যায়" ও (২) "সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' এই গান দুটো রেকর্ড করেছি।

এই রেকর্ডের ব্যাপারে শ্রীমতি সুচিত্রা মিত্র ও মায়া সেন প্রভৃতি কয়েকজন আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

এই সময় এর আগে এবং এখনও বহু ফ্যাংশানে আমি গান গেয়েছি ও গাইছি। তাছাড়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অধ্যাপিকা সুচিত্রা মিত্র ও মায়া সেনের সঙ্গে বহু নৃত্যনাট্যেও অংশগ্রহণ করেছি ও করে চলেছি। এইভাবে আধুনিক ও রবীন্দ্র সংগীতের নানা জলসায় আমি গান গেয়েছি, গাইছি ও গাইবার ইচ্ছা এখনও মনে রেখেছি।

৪। প্রশ্ন : সংগীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছো না এটা শৌখিন নেশা ?

উত্তর : বর্তমানে সংগীতই আমার পেশা ও নেশা দুই-ই। নানা জলসা, রেডিও প্রোগ্রাম, শিক্ষকতা ও রেকর্ডিং এই হ'ল আমার সংগীত পেশার নমুনা।

কিন্তু বর্তমানে দেশের অবস্থা যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েছে তাতে ক'রে আমাদের জীবিকার যে কত ক্ষতি হচ্ছে তাতো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই যুগ যন্ত্রণার অবসান যে কবে হবে, কবে এই সংগীত সেই আবার পুরানো দিনের মতো সবকিছুর ঊর্দ্ধে থাকবে সেখানে থাকবে না হিংসা, দ্বেষ, রাজনীতির কোন ঝঞ্ঝা। তা হয়ত আমি বা আপনারা কেউই বলতে পারব না।

৫। প্রশ্ন : অনেকে বলে তুমি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে অনুকরণ করে থাক ?

উত্তর : সেটা কিন্তু আপনাদের ভুল ধারণা, কারণ প্রত্যেক শিল্পীই চায় তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে। সে শিল্পী অসামান্যই হোন আর সামান্যই হোন। আর আমিও তাই বিশ্বাস করি। যাই হোক, আমি মনে করি শিল্পসৃষ্টির স্বকীয়তা শিল্পীর কাছে অনন্য, অন্তত শিল্প বোধ যাঁদের আছে তাঁদের কাছে তো বটেই। তাই কোন শিল্পীর হুবহু নকল বা অনুকরণের প্রশ্ন এক্ষেত্রে আসে না। তবে এক শিল্পীর কণ্ঠের আওয়াজের সঙ্গে আরেক শিল্পীর

আওয়াজের মিল থাকতে পারে। আমার ক্ষেত্রেও হয়ত সেই ভাবে হেমন্তবাবুর আওয়াজের quality'র সঙ্গে আমার গলার আওয়াজের মিল থাকতে পারে, তবে তা আমার একান্তই নিজস্ব। যাই হোক, হেমন্তবাবুর গান কিন্তু আমি সব থেকে ভালবাসী।

আলোচনার মাঝে শিল্পী-পত্নী ভারতী চা দিয়ে গেল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ভারতী মজুমদারও একজন দরদী শিল্পী। মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে কবির জীবনকে পূর্ণ করে তুলেছে ও। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে পরের প্রশ্ন রাখলাম।

৬। প্রশ্ন : এ যুগের শিল্পীরা সঙ্গীত সাধনার উপর যতটুকু যত্ন না দেন তার চেয়ে বেশী দিয়ে থাকেন সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য।

উত্তর : যে সংগীতের জন্য ভারত যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দরবারে পরিচিত, সমাদৃত সেই সংগীত কখনই এই সংগীত নয়। এই সংগীত সেই সংগীতের কঙ্কাল। বস্তুতপক্ষে এর জন্য দায়ী আমাদের এই যুগ। আমাদের বর্তমান যুগের সমাজের শ্রোতারা, সমাজদাররা যাঁরা এই সংগীতের মানকে নীচে নামিয়ে দিয়েছেন—হাল্কা করে দিয়েছেন তার গভীরত্ব, তাই আজ দেখতে পাই যাঁরা সত্যিই ভারতীয় সংগীতের শিক্ষা করেছেন, শিক্ষার প্রারম্ভেই করেছেন রাগ রাগিনীর দ্বারা সংগীত জীবনের ভিত্তি স্থাপন, তাঁরাই আজ হারিয়ে গেছেন সংগীত জগৎ থেকে সাধনা বর্জিত অশুদ্ধ আওয়াজধারী শিল্পীদের ভীড়ের চাপে। তবে আমার মনে হয় ভারতীয় রাগ-রাগিনীর শিক্ষার মান কোন দিনই একেবারে ভেঙে পড়বেনা কারণ সে নিজেই তার স্বকীয়তায় চির উজ্জ্বল।

প্রশ্ন : ৭। এবার ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রশ্ন রাখলাম। তুমি তো বিবাহিত—সঙ্গীত চর্চায় স্ত্রীর সহযোগিতা পাচ্ছো তো ?

উত্তর : হ্যাঁ আমি, বিবাহিত এবং বিয়ে আমি করেছি রবীন্দ্র ভারতীর আমার সহপাঠিনী ভারতী রায়চৌধুরীকে।

স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় সংগীত জীবনে নিরাশার একঘেয়েমি রোগে যখন ভুগছিলাম তখন ও এসেই আমায় বাঁচিয়েছিল, আমায় আশার আলো দেখিয়েছিল, প্রেরণা দিয়েছিল বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়েও এগিয়ে চলবার।

বিয়ে করার পরই আমি প্রথম রেকর্ড করি। আমার স্ত্রীও একজন গুণী শিল্পী, কয়েকটি সংগীত স্কুলের শিক্ষিকাও অনেক ফাংশানেও অংশ গ্রহণ করেছে ও একক হিসাবে আমার সঙ্গে দ্বৈত হিসাবেও। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায়। ওর সুর দেওয়া আধুনিক গান হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে এবারের পুজাতে রেকর্ড করেছি—গানটি হোল (১) "এই নাটকের শেষ দৃশ্য বড়ই করুণ" (২) "এসো কিছুক্ষণ বসি এই ঘাসের সবুজে"।

আলোচনা শেষে কুশল বিনিময়ের পর বাড়ী থেকে যখন বেরোলাম রাত তখন আটটা। শিল্পী ও তার পত্নী দুজনেই আমাদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিলেন। ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাসে উঠলাম। কিন্তু দুচোখের সামনে তখন ভেসে চলেছিল কবির সেই সলজ্জ হাসিটুকু।

অমর ডোরাণ্ডো

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

১৯০৮ সাল। স্থান লণ্ডনের হোয়াইট সিটি ষ্টেডিয়াম। অলিম্পিক ট্রাকে ম্যারাথন দৌড়ের ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। ঘোষকের কণ্ঠস্বর মাইক্রো-ফোনে ভেসে এল। "জুরী অফ্ এ্যাপিল" শেষ সীমান্তের সমস্ত ঘটনা ধীর স্থিরভাবে বিবেচনা করে আমেরিকার জনি হেসকে ম্যারাথন-বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন সর্বাগ্রে শেষ সীমান্ত অতিক্রম করলেও অপরের সহায়তা গ্রহণের অভিযোগে ডোরাণ্ডো পিয়েত্রীকে প্রতি-যোগিতায় জয়লাভের অযোগ্য বলে বিবেচনা করে তাঁর নাম বাদ দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রথমে সমগ্র ষ্টেডিয়াম জুড়ে মৃদু গুঞ্জন সুরু হল এবং ক্রমশঃ তা উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে সুরু হল বিচারকদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ আর ক্রমশঃ সরব প্রতিবাদ আর ধিক্কার ধ্বনীতে সমগ্র ষ্টেডিয়াম মুখর হয়ে উঠল। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা দর্শকদের শান্ত করতে অক্ষম হয়ে শেষ পর্যন্ত একে একে সরে পড়লেন।

কিন্তু উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তারা দর্শকদের এড়াতে সক্ষম হলেও রক্ষা পেলেন না। তাদের জরুরী তলব হল রাজকীয় উপবেশনাগারে। স্বয়ং রাণী আলেকজান্দ্রাও বিচারকদের বিচার সম্বন্ধে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করলেন। তিনি জানালেন বিচারকদের এ ফলাফল তিনি মানেন না। আন্ত-র্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বিভিন্ন বিদেশাগত পরিচালকবৃন্দ রাণী আলেক-জান্দ্রাকে বোঝাতে সুরু করলেন। কিন্তু রাণীর সেই এক গো। তিনি পরিচালকবৃন্দকে জানালেন আপনাদের নিয়ম আপনাদের কাছেই থাকুক। আমি এ বিচার অভ্রান্ত বলে মানি না। আমি ডোরাণ্ডো পিয়েত্রীকেই বিজয়ী বলে মনে করি এবং ডোরাণ্ডো পিয়েত্রীকে এজন্য পুরস্কৃত করব।

আজ থেকে তেষট্টি বছর আগের কথা। লণ্ডনে চতুর্থ অলিম্পিয়াডের

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিযোগিরা একত্র হয়েছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম অপেশাদার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। প্রতিযোগিতার প্রধানতম প্রধান আকর্ষণ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা।

খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে পারস্য সম্রাট দরায়ুস এথেন্স আক্রমণ করতে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এথেন্সের দক্ষিণে ম্যারাথন প্রান্তরে অবতরণ করেন।· সংখ্যায় নগণ্য হয়েও এথেনিয়ান বাহিনী প্রবল পরাক্রান্ত পারসিক সেনা বহরকে প্রথমেই আক্রমণ করে বসে এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। পারসিক বাহিনীর অবতরণ সংবাদে এথেন্স নগরী থেকে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের পাহাড়ে ও বনের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাই রণাঙ্গনের ভারপ্রাপ্ত এথেনিয়ান সেনানায়ক অবিলম্বে বিজয় সংবাদ এথেন্স নগরীতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করলেন। সে যুগের সমগ্র গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ দূরপাল্লার দৌড়বীর, অলিম্পিক, প্যান এথেনিক্, প্যান-হেল্লেনিক ডোম্‌সের বিজয়ী ফিডিপ্পিডেশকে এ জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্বে স্পার্টা প্রভৃতি রাষ্ট্রে সাহায্য ভিক্ষা করে বিশেষ দূত হিসেবে এই ফিডিপ্পিডেশকেই প্রেরণ করা হয়েছিল। তিন দিনের মধ্যে তিনশ মাইল দৌড়ে এসে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না নিয়েই স্বদেশপ্রেমিক ফিডিপ্পিডেশ পারশিক বাহিনীর সঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধশেষে সেনানায়কের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে আবার বিজয় সংবাদ বহন করে এথেন্স অভিমুখে দৌড়ে রওনা হন। চারদিনের অবিশ্রান্ত দৌড় ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও নিজের দেহের শ্রান্তি ও ক্লান্তি ভুলে কিডিপ্পিডেশ বিজয় বার্তা বহন করে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে এথেন্স পৌঁছান। কিন্তু অনিয়মিত গতিবৃদ্ধি ও অসহনীয় শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে এথেন্স নগরীর তোরণ দ্বারে অপেক্ষারত নগরকর্তাদের কাছে মাত্র "আনন্দ করুণ আমরা বিজয়লাভ করেছি" এ কয়টি কথা উচ্চারণ করেই মরণের কোলে ঢলে পড়েন। ফিডিপ্পিডেশের এই স্মরণীয় দৌড়ের স্মৃতিতে ১৮৯৬ সালে এথেন্সে অনুষ্ঠিত আধুনিক যুগের নব পর্যায়ের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচীতে ম্যারাথন দৌড় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রথম অলিম্পিক ক্রীড় প্রতিযোগিতায় ম্যারাথনের রক্তক্ষরা প্রান্তর থেকে যে পথে ফিডিপ্পিডেশ বিজয় সংবাদ বহন করে এথেন্সে এসেছিলেন সেই পথে এই দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। এই দৌড়ের দূরত্ব ছিল ৪০ কিলোমিটার (২৪৮ মাইল) ও বিজয়ী হয়েছিলেন গ্রীসেরই ভাববিলাসী এক মেষপালক স্পিরিডন লোয়েস।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারীর দ্বিতীয় অলিম্পিকে ৪০'২৬০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন মিশেল তেয়াতোঁ নামে একজন ফরাসী রুটির কারখানার শ্রমিক। তৃতীয় অলিম্পিকে দূরত্ব ছিল ৪০ কিলোমিটার এবং বিজয়ী হন আমেরিকার টমাস্ হিকস্।

চতুর্থ অলিম্পিকে দূরত্ব বাড়িয়ে করা হয় ৪২'১৯৫ কিলোমিটার (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) এই দূরত্বই পরে ম্যারাথনের নির্দিষ্ট দূরত্ব হিসেবে নির্দ্ধারিত হওয়ায় এর কারণ সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

রাজপরিবারকে (যে যুগের কথা বলা হচ্ছে সে যুগে ইংলণ্ডের রাজা ইংরেজদের কাছে দেবতার স্বরূপ) ষ্টার্টিং দেখবার সুযোগ দেওয়ার জন্য উইণ্ডসর গ্রেট পার্কের রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তির ১০০ গজ দূরে ষ্টার্টিং-এর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। এই স্থান থেকে হোয়াইট সিটি ষ্টেডিয়ামের প্রবেশ পথের দূরত্ব ছিল ২৬ মাইল। রাজকীয় উপবেশনাগারের সম্মুখে ফিনিশিং লাইন নির্দ্ধারিত হওয়ায় দূরত্ব বাড়িয়ে আরও ২৮৫ গজ করতে হয়।

২৪শে জুলাই বেলা দুটোয় যুবরাজ পত্নীর (পরবর্তী যুগে রাণী মেরী) সূচনা সংকেতের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মোট ৫৬ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন।

প্রথম দশ মাইল বৃটিশ এ্যাথলেটগণ অগ্রবর্তী ছিলেন কিন্তু ১৫ মাইল অতিক্রম করার পর দক্ষিণ আফ্রিকার দৌড়বীর হ্যাফেরণ অগ্রগামী হন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রতিযোগীদের পিছে ফেলে ইটালিয়ান প্রতিযোগী ডোরাণ্ডো পিঁয়েত্রী হ্যাফেরণের ঠিক পশ্চাতেই দৌড়াতে থাকেন। ২৫ মাইল থেকে ডোরাণ্ডো পিঁয়েত্রী অকস্মাৎ তাঁর গতিবেগের তীব্রতা অসম্ভব বৃদ্ধি করেন ও স্প্রিণ্টারের মত দৌড়ে ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। কিন্তু ডোরাণ্ডো এই অনিয়মিত গতিবেগ বৃদ্ধিতে এমনই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করে ভুল পথে ফিনিশিং লাইনের উল্টোদিকে দৌড়াতে আরম্ভ করেন। দর্শকদের চিৎকারে স্বম্বিত পেয়ে পুনরায় ঠিক পথে অগ্রসর হন এবং টলতে টলতে এগিয়ে এসে ঠিক ফিনিশিং লাইনের উপর লুটিয়ে পড়েন। সে সময় পর্যন্তও অন্য কোন এ্যাথলেটের ষ্টেডিয়ামে পৌছাবার সৌভাগ্য হয়নি। ২৬ মাইল ৩৮৪ গজের উপর দৌড়ে এসে ঠিক ফিনিশিং লাইনের উপর লুটিয়ে পড়ায় স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকদের মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠে। প্রত্যেকে

উচ্চস্বরে ডোরাণ্ডোকে সাহায্য করবার জন্য পরিচালকদের অনুরোধ করতে থাকেন। কয়েকজন পরিচালক তাকে আবার তুলে নিয়ে এসে ট্র্যাকে দাঁড়া করিয়ে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইসারা করেন। আর মাত্র ছ পা এগিয়ে গেলেই ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করা যায় কিন্তু ডোরোণ্ডোর আর সে ক্ষমতাও ছিল না, কয়েকবার একই স্থানে ঘুরপাক খেয়ে আবার মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এই সময় আমেরিকান এ্যাথলেট জনি হেস দৃঢ় পদক্ষেপে ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন। ডোরাণ্ডো তখনও মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছেন। ডোরাণ্ডোর অবস্থা দেখে রাজকীয় উপবেশনাগারে উপবিষ্ট রাণী আলেকজান্দ্রা পর্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। আমেরিকান দর্শকবৃন্দ সে সময়ে সমস্বরে উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি করে জনি হেসকে উৎসাহ দিতেছেন। শেষ মুহূর্তে একজন পরিচালক ডোরাণ্ডোকে তুলে নিয়ে কোন মতে ফিনিশিং লাইন পার করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ডোরাণ্ডো মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। চিকিৎসকরা তাঁর মৃত্যু অবধারিত বলেই ধরে নিয়েছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্য ডোরাণ্ডোর জীবনী-শক্তি। পরের দিনই তিনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এই অস্বাভাবিক দৌড়ের ফলে ডোরাণ্ডোর হৃদপিণ্ড প্রায় পৌণে এক ইঞ্চি স্থানচ্যুত হয়।

ডোরাণ্ডোর সহায়তাকারী ডোরাণ্ডোকে শেষ সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার কিছু পরই জনি হেস শেষ সীমান্ত অতিক্রম করেন। প্রথমে বিচারকগণ ডোরাণ্ডোকে প্রথম ও হেসকে দ্বিতীয় বলে ঘোষণা করেন কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকার তরফ থেকে প্রতিবাদ উঠে ও তীব্র বাদানুবাদের পর পুনর্বিবেচনার কথা উঠে ও ডোরাণ্ডো নিজের ক্ষমতায় শেষ সীমান্ত অতিক্রমণে সক্ষম না হওয়ায় এবং অপরের সহায়তা গ্রহণ করায় জয়লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হ'ন। শেষ পর্যন্ত জনি হেসই বিজয়ী বলে ঘোষিত হন।

রাণী আলেকজান্দ্রা পুনর্বিবেচনার ফলাফল শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন ও বিচারকদের বিচার সম্বন্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রচলিত বিধান অনুযায়ী "বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত" এবং এ বিষয়ে রাজকীয় হস্তক্ষেপ ইংলণ্ডের সুনামের পক্ষে হানিকর জেনে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ডোরাণ্ডোকে স্বর্ণনির্মিত একটি বৃহৎ কাপ উপহার দেন।

ম্যারাথন দৌড়ের ইতিহাসের সঙ্গে ডোরাণ্ডো পিঁয়েত্রীর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ম্যারাথন বিজয়ী হিসেবে জনি হেসের নাম অনেকেরই অজ্ঞাত কিন্তু ক্রীড়াজগতে ডোরাণ্ডো পিঁয়েত্রীর নাম অবিস্মরণীয়।

পরাজিত হয়েও ডোরাণ্ডো আজ অমর।

সাম্প্রতিককালের কয়েকটি নাটক

সুরেশ হালদার

ষ্টার ।। সীমা

সাম্প্রতিক কালে মানবজীবনে এক প্রকারের হতাশা এবং ব্যর্থতা এমনভাবে জেঁকে বসেছে যার হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ সবাই ভাবছেন। কিন্তু উপায় কি? আর কি ফিরে পাব সে জীবন....যা 'সীমা' নাটকে সত্যিই আরোপিত হয়েছে। যে জগতের কথা নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন তা কি সত্যিই বাস্তবে বিশেষ করে আজকের বিপর্যস্ত জীবনে গোঁড়ামি, হতাশা ব্যর্থতাকে সরিয়ে দিয়ে অনায়াসে মানুষ গ্রহণ করতে পারবে?

মাতৃহারা সুন্দরী সীমা পিতার স্নেহচ্ছায়ে পূর্ণা। পিতার শঙ্কা কন্যা সুন্দরী হলেও পঙ্গু, অপরের পুত্র কি তাকে নির্দ্ধিধায় গ্রহণ করতে পারবে? মেনে নেবে নিজের অর্দ্ধাংশ বলে? অধ্যাপক শৈলেশ্বর চট্টরাজের কন্যা সীমাকে সত্যিই গ্রহণ করে। রবীন্দ্রসাহিত্যে থিসিস্ তৈরী করার জন্য অসীম প্রস্তুত এবং সেই রাবীন্দ্রিক মনোভাবে সারল্যের স্পর্শ দিয়ে জীবন সঙ্গিনী রূপে অধ্যাপক কন্যা সীমাকে পেয়ে সে সুখী। মানবিকতাকে বড় করে বিধবাকে গ্রহণ করায় গোঁড়া সমাজপতিরও কোন ক্ষোভ নেই। সত্যিই, নায়কের চরিত্রগুলো সবই এত ভাল এবং সৎ যে আজকের সমাজজীবনে তার মূল্যবোধ বিঘ্নিত হচ্ছে। তবুও লোকশিক্ষার জন্য এ নাটকের প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায় নি। একদিক থেকে নাট্য আন্দোলনের জোয়ারে পথ না হারিয়ে নাট্যকার আভিজাত্য বজায় রেখে চলেছেন। এদিক থেকে ষ্টার রঙ্গমঞ্চ সত্যই সার্থক।

'সীমা' নাটকের অভিনয়ও হ'য়েছে সর্বাঙ্গ সুন্দর। সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, দীপিকা দাস চরিত্র চিত্রণে যথার্থ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত সুকণ্ঠের পরিচয় দেয়। এ ছাড়া প্রথম শ্রেণীতে অভিনয়ের দাবী রাখেন সুখেন দাস, বঙ্কিম ঘোষ, অজিতবন্দ্যোপাধ্যায়. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, যতীন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রেমাংশু বসু ও গীতা দে। পরের সারিতে

কল্পনা মুখোপাধ্যায়, মেনকা দাস, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী রিঙ্কু বেশ অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। দৃশ্যসজ্জা, আলোক নিয়ন্ত্রণ ও আবহসঙ্গীত নাট্যরস পরিবেশনে উপযুক্ত সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত সামগ্রিকভাবে গৌরবান্বিত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিশ্বরূপা॥ কোথায় পাব তারে

সম্প্রতি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে কালকূট (সমরেশ বসু) রচিত বৃহৎ ভ্রমণ কাহিনীর মধ্য থেকে কতকগুলো চরিত্র বেছে নিয়ে নাটক তৈরী করা অর্থাৎ যা এখন অভিনীত হচ্ছে তা রাসবিহারী বসুর মত নাট্যকার এবং নাট্যনির্দেশক-এরই পক্ষে সম্ভব। প্রথমেই আমাদের ভাবতে হয় নাট্যকার অভিনেতাদের বাছাই করে চরিত্র ঠিক করেন না নাটক লেখার পর চরিত্রোপযোগী অভিনেতা খোঁজ করা হয়? যা হোক্ তিনি ভালই করেছেন। নাটকে ছোট বড় অনেক গানের সংযোজন করা হ'য়েছে এবং অধিকাংশই বাউল সঙ্গীত। আড়াই ঘণ্টার নাটক তাতে ২৬ খানি গান রসোত্তীর্ণ-তো হয়েছেই শেষে প্রশংসাও অর্জন করেছেন যথেষ্ট। অভিনয় অংশে এবং সঙ্গীতাংশে যারা আছেন তাদের প্রশংসা চিরকাল আছে এবং থাকবেও কারণ সবাই সুশিল্পী। মঞ্চ পরিচালনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণেও ঠিক যতমধু ঢালা যাবে তত মিষ্টত্বই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাও সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা থাকলে কি হবে কল্পনা ঘাটতি থাকলে তাও সম্ভব হয় না এবং অভাবে তাও হয়েছে। তবে সাধারণ দর্শক আমোদ চান তাদের উপযুক্ত করে উপস্থাপনা করা হ'য়েছে। নাট্য আন্দোলনের তথা কথিত পর্যায়ে এখনও তিনি দিশাহারা। ব্যবসায়িক মঞ্চ-প্রযোজনায় সত্যিই তিনি খুঁজছেন 'কোথায় পাব তারে'।

কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ ॥ সওদাগর

সমরেশ বসুর 'সওদাগর' উপন্যাসের নাট্যরূপ কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন সমরেশ চক্রবর্তী। অভিনয় অংশে আছেন তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, রবীন মজুমদার, রবি ঘোষ, তরুণ কুমার, চিত্ত চট্টোপাধ্যায়, আরতি দাস, অপর্ণা দেবী, অলকা গাঙ্গুলী, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে।

ভারত বিভাগের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসে সমরেশ বসু নারী হৃদয়ের

যৌন কামনার সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের একটা জলন্ত প্রমাণ তুলে ধরেছেন। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে মেঘনাদ যেমন অর্থের প্রতি আকৃষ্ট স্ত্রী যেন সাময়িক ভাবে তার কাছে অবহেলিত কিন্তু আসলে কাহিনীর গ্রন্থনায় এবং নাট্যদ্বন্দ্বের উপস্থাপনে আবার স্বামীর কাছে লুটিয়ে পড়ে তা সার্থক মিলনে পরিণত করেছেন।

লীলা তার বিস্কুট ব্যবসায়ী স্বামী মেঘনাদের কাছে যেন অবহেলিত এই ভেবে বৃষ্টির রাতে তাদের বিবাহ বার্ষিকীর দিনে তার স্বামীর ব্যবসায়, সাহায্য কারীরূপী বিনয় চৌধুরীর কক্ষে যায় এবং সেখানেই তার সর্বস্ব অপহৃত হয়। বহু চেষ্টারও নিজেকে রক্ষা করতে না পেরে বিনয় চৌধুরীর লালসা বহ্নিতে পুড়তেই হ'ল। সে এই কৃত কর্মের প্রতিশোধ নেবে, পাপীকে জেলে পাঠাবে কিন্তু তা শুধু প্রশ্নই থেকে গেল।
তিন অঙ্কের তেরটি দৃশ্যের মধ্যে বিনয়ের কক্ষে ও পরে মেঘনাদের কাছে ফিরে আসার দৃশ্যে দু'টি অতি সুন্দরভাবে অভিনীত হয়েছে। অমর ঘোষের সীমিত সীমায় মঞ্চ পরিচালনায় সুন্দর। অভিনয় যেমন সুন্দর ও শিল্পের নিদর্শন আছে। আবহ সঙ্গীত ও সহযোগিতায় সুন্দর হয়েছে।

থিয়েটার সেণ্টার ॥ **পরাজিত নায়ক**

দিনের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলার নাটক "পরাজিত নায়ক"। মানুষের বিভ্রান্তি আজ বড় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলের ঘোলা পথে। এমনই ভাবেও ব্যাক্তিত্ব ও মতবাদকে বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিবিদ নায়ক দলগত মতবাদে ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্রই বোধ হারিয়ে ফেলেছেন দলের মত। বড় তাগিদেই তাঁর চলা। নিজের মতকে দলের চলার পথে এগিয়ে দিতে বাধা পান নায়ক।

দেবতোষ চক্রবর্তীর ফ্ল্যাটে ভোট যুদ্ধে পরাজিত নায়ক আহত অবস্থায় আশ্রয় পায়। দেবতোষের রক্ষিতা নায়িকা তার সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এখানেই নায়িকার স্মৃতি রোমন্থনে প্রেমিক প্রত্যাখ্যাত হয়ে রক্ষিতা জীবন যাপন করে এবং নায়কের প্রতি সহানুভূতিশীলতায় নিজের আত্ম-তৃপ্তির পথ খুঁজে পায়। পুনর্গণনায় নায়কের জয় ঘোষিত হলে নায়িকা তাকে বুঝিয়ে দেয় এ-পরাজয় রাজনীতির কাছে মনুষ্যত্বের পরাজয়।

বিক্ষিপ্ত দু'একটি ঘটনা টেনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তা নাটকের মূলগত ধারার অবান্তর। প্রয়োগ কৌশলের গতি সংযত এবং নাট্যদ্বন্দ্ব জায়গার

পক্ষে বেশ উদ্দীপক। নাটকের মোট চারটি চরিত্র। তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায় ছাড়া আর কোন অভিনেতা অভিনেত্রী অংশ গ্রহণ করেন নি। উভয়েই চারটি চরিত্রের অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে নায়ক ও নায়িকার মূল চরিত্রের অভিনয় সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। প্রয়োজনে যে সমস্ত যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাও সার্থক ভাবে উৎরে গেছে। নাটকে আজকের কথাই সার্থক ভাবে রূপ পেয়েছে এটাই হল আসল সত্য।

মিনার্ভা ॥ প্রবাহ

রাজনীতির কথা নিয়েই "প্রবাহ" নাটক। একটি ধরাবাঁধা ছকে কাহিনী রচনা করা হয় নি এ নাটকে। সূত্রধার তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে সমস্ত নাটকের একটা ঐক্য স্থাপন করে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদ আর শোষণ ইংরাজ আমলে ছিল আজকেও আছে। এই সাম্রাজ্যবাদ শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম চলছে এবং প্রবাহ অব্যাহত হবে না যতদিন না ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছন যায়। দু'টি কালের কথাই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ইংরেজ শাসনের কাল সুন্দরভাবে অভিনয়ে প্রকাশ করেছেন হিমাংশু দাস, সুজিত গুপ্ত ও ইন্দ্রজিত সেন। (যথাক্রমে পুলিশ ইন্সপেক্টর হারান সোম, সঞ্জীব চৌধুরী ও ভুবন মাষ্টার চরিত্রগুলিতে।) অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আজকের কালের অভিনয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, অমল চক্রবর্তী ও পান্না ভট্টাচার্য।

প্রয়োগে দিকে, দৃশ্য এবং আলোক সম্পাতে বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্মীসংসদ প্রযোজিত 'প্রবাহ' নাটকের অভিনয়ে আর পাঁচটা পেশাদার ও ভাল প্রযোজকের নাট্যাভিনয় থেকে পৃথক সম্মান পাবার দক্ষতা দেখা গেছে। ইউরোপীয়ান ক্লাব ও তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সুন্দর শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। বিচারকের রায় ও অপেক্ষমান জনতার প্রতিবাদ-ধ্বনির কল্পনায় বেশ পরিমিত ইঙ্গিত আছে! আলোক সম্পাতের মধ্য দিয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলিও সুন্দর হয়ে উঠেছে। নাটকের প্রবাহ এমনি ভাবেই একদিন যথার্থ লক্ষ্যে পৌছবে আশা করা যায়।

১৯৭১ এর আগমনীর প্রাক্কালে

মীরা দেবী

শেষ বর্ষণের রমঝম্ নূপুরের তালে তালে আগমনীর উৎসবের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ী বর্ষার বিরহী আমেজ। — এ সবকাব্য কথা — এই কাব্য নিয়ে মনকে ভরিয়ে তোলা চলতো যদি না ৭১ এর কোলকাতায় থাকতে হোত।

পূজোর বাজার! ওরে বাবা দশদিন এনে একদিন খাওয়াটাকে যেখানে অভ্যেস করে নিতে হবে সেখানে আবার পূজোর বাজার —এক রিল সুতো কিনে এনে ছেলেমেয়েদের গায়ে ঠেকিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছি, এই তোদের নতুন পোষাক ছেড়াখোড়াগুলো এই নতুন সুতো দিয়ে মেরামত করে ফেল পূজোয় পরবি।

মেয়ের নতুন বিয়ে, ইলিশের তত্ত্ব পাঠাতে গিয়ে মাথায় বজ্রাঘাত হল মাটির ইলিশ তৈরী করে বেয়ানকে সবিনয়ে লিখে পাঠালাম এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভাই আমি নিরুপায় পূজোর তত্ত্ব? হারতে কোথায় গেল কস্তাপাড়ের শান্তিপুরে সাড়ী আর জরিপাড় ধুতি।

সবই মায়া, এমায়া প্রপঞ্চময়ী। সেদিন তো বিষ্টির মধ্যেই ট্রাম লাইনের ধারের খেদ্ড়ো রাস্তায় কিরকম উল্টে সেকি কেলেঙ্কারী। ভাণ করলাম যেন অজ্ঞান হয়ে গেছি, আসলে চোখ খুলি কোন লজ্জায় হায় আমাদের কোলকাতার পথঘাট। মনে মনে ঠাট্টা করলাম কবিগুরুকে কারণ 'ললিত কলার' শেষ বর্ষণ উপভোগ করে বাড়ী ফিরছিলাম বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা ?

বাড়ী এসে দেখি ছন্দিতার শারদ ডালিতে আমার কলমের একটি ফুল সংযোষিত করার অনুরোধ এসেছে। আমিতো নিতান্ত অকবি বে-রসিক বুড়ো হাঁস আমার ভারতীর পাতা উল্‌টে তো এমন কিছুই পেলাম না যাতে ছন্দিতার এই ছন্দোময় গ্রন্থনায় কিছু গ্রন্থিত করতে পারি। ইংএকাত্তরের সুরু আর বাংসাতাত্তরের শেষ লক্ষ্য করে দেখুন।

কৃষ্ণচূড়ার আবিরে রাঙান আকাশ ভোটারদের মাথা খুনে লালে লাল হল দক্ষিণের বাতাস দীর্ঘশ্বাসের ভারে মুখ থুবড়ে, ঘাড় গুঁজে হোঁচট খেতে খেতে ফিরে গেল। তারপর সর্বখর্বতারে বৈশাখ কি শক্তি দিল বলুন তো ? আর বায়ু পূরবাইয়া কোন বার্তা বক্ষ প্রিয়ার হৃদয়ের মর্মস্থলে পৌঁছে দিল তা কে জানতো ? এখন রাত পোহাল শারদ প্রান্তে। কিন্তু রাত কি সত্যিই পোহাল্? আদৌ পোহাবে কি ? কোন আশার কথা লিখবো ছন্দিতার পাতায়।

তবু সানাই বাজছে। ফুলের দাম বাড়ছে ও প্রেসেও কার্ড ছাপা হচ্ছে রাত ভোর। উৎসব উৎসব চারিদিকে উৎসব শারদ উৎসবের বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে দিকে দিকে শারদ সম্ভার নিয়ে সহিত্যের পশরা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আশার কথা বইকি। আমরা এখনও মরিনি এখনও আমরা বাঁচার স্বপ্ন দেখি।

●

ছররা

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

এক

চীনকে চিনতে চীনে
যাচ্ছেন নিকসন
রুশকে খুশ করতে
চৌ করল ফিকসন॥

দুই

পেট কাটো, পিঠ কাটো
কাটো ব্লাউজের ঝুল
আরও মডার্ন হতে হলে
ছাঁট মাথার চুল॥

প্রচ্ছদ শিল্পী : নিখিল বিশ্বাস

৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ ১৩৭৮

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী
নিখিল বিশ্বাস

[যুগ্ম]-সম্পাদক
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরগোপাল দাশ

একুশে, আমার একুশে

মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে কোন দেশের মানুষকে এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি, এত রক্তপাত হয়নি—যা হয়েছে বাংলা দেশের বীর সংগ্রামীদের। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে সমগ্র বাংলা দেশে যে ব্যাপক গণ সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তা বিস্তৃত আকার রূপ নিল উর্দু চাপানোর পাকিস্তানী চক্রান্ত ব্যর্থ করতে। সেদিন ঢাকা সহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় যে প্রদীপ্ত গণ আন্দোলন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিশ্বের কোন দেশেই সেরূপ সংগ্রাম দেখিনি, মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করার জন্য সেদিন ওপার বাংলার যুব ও ছাত্র সমাজ মিলিটারির বুলেটের সামনে বুক পেতে দিল—তাজারক্তে রাঙ্গা হল রাজপথ। আজ সেই একুশেরই স্মরণীয় পবিত্র দিনে অমর শহীদগণের স্মৃতিতে আমরা প্রণাম রাখছি। চিন্তা কর্ম ও আদর্শের অনুপ্রেরণার জন্যই মাতৃভাষাকে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মাতৃভাষা জীবনের সকলস্তরে

সকল কাজে প্রেরণা জোগায়। সৃজনশীল মননের, হৃদয় বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্যই মাতৃভাষাকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি ওপার বাংলার মানুষের এই অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় পেয়েই বোধ কবি এপার বাংলার একশ্রেণীর দেশ শাসকের বাংলা ভাষার প্রতি একটা কিঞ্চিৎ মমত্ব বোধ এল একদিন। সার্কুলারের পর সার্কুলার জারি হ'ল এপার বাংলার সরকারী কাজেও বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য। কথাটা শুনেছিলাম যখন আমরা ছিলাম মাতৃ জঠরে। সেই মা আমাদের প্রসব করলেন, মা বৃদ্ধা হলেন, আমরাও যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্ব লাভ করলাম—দেশে কত মন্ত্রী এলো—গেলো, কিন্তু বাংলা ভাষার স্বীকৃত মর্যাদা পাওয়া গেলনা। অনেক রকম পাণ্ডিত্যই(!) আমরা দেখেছি কিন্তু এপার বাংলার—মন্ত্রী আমলাদের মত এমন সেরা পাণ্ডিত্য সারা বিশ্বে নেই। জনগনকে খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-বাসস্থান প্রতি মৌল জিনিষগুলি দিতেই এদের বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়—তার উপর মাতৃভাষার মর্যাদা? তার চেয়ে শুধুমাত্র বক্তৃতায়, সার্কুলারে যতদিন দেওয়া যায় ততদিনই মঙ্গল! অবশ্য দোষ আমাদেরও কিছু আছে। ওপার বাংলার মানুষের মত আমরা রক্ত দিইনি। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ মমত্ববোধ দেখাই বটে, তবে দেশ জননী এবং মাতৃ ভাষার প্রতি দরদ আমাদের কারো নেই। থাকলে বাংলা ভাষার এই অপমান আমাদের সহ্য করতে হত না। ওপার বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষ চিন্তা কর্ম ও ত্যাগের মধ্যদিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেছে। ওরাই আসল বাঙ্গালী আর বাংলা ওদেরই ভাষা। আর সেই ভাষার জন্য যে দামাল ছেলেগুলি বুকের রক্ত দিয়ে জীবনকে ত্যাগ করেছে সেই অমর শহীদদের স্মৃতি মিনারে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করে আমরাও বলতে চাই—

"আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি?"
"সত্যি, আমি কি ভুলতে পারি?
আমরা কি ভুলতে পারি!"

ছন্দিতা

বাংলা সামাজিক নাটক (প্রসংগে) প্রথম যুগ

রাধারমণ দে

দার্শনিক প্লেটোর কাছে সমাজের কল্যাণ ছিল মূল কথা। সেই কারণে তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে তিনি শিল্পকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন। শিল্পের বল্গাহীনতা সমাজের শৃঙ্খল ভিত্তিতে আঘাত হেনে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর অভিমতের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে কোন সমাজই শিল্পকে সমাজচ্যুত করেনি। যদিও কখন কখন শিল্পকে সমাজের কঠোর নিয়ন্ত্রন মেনে নিতে হয়েছে। সমাজ মানুষকে বাদ দিয়ে অকল্পনীয়। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থেকেই মানুষ রচনা করেছে সাহিত্য ও শিল্প। সাহিত্য ও শিল্পের বিষয়বস্তু মানুষ—তার বিচিত্রলীলার বর্ণনায় সমৃদ্ধ। লিঅনার্দো দা-ভিঞ্চি বলেছিলেন, "Every good artist has two subject : Man & the hopes of his soul." যুগে যুগে সাহিত্য গড়ে উঠেছে মানুষকে কেন্দ্র করে আর তার আত্মার এষণা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে নানারূপে। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক এই সবই সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম। এই গুলোর মধ্যে নাটকের সঙ্গে সমাজ জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কবিতা, উপন্যাস ও গল্পের বিষয়বস্তু মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে অতিক্রম করে কল্পনাদৃষ্টিতে স্থান করে নেয়। ঐ সব সাহিত্যের রস গ্রহণের সময় সাহিত্য রসিকের একক চেতনার সক্রিয়তা থাকাই যথেষ্ট ; কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে বিষয় বস্তু প্রদর্শিত হয় বলে তা' প্রত্যক্ষ এবং রস গ্রহণ করতে হয় সেই প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে। এবং নাটকের অভিনয় দেখে তার রস মানুষ গ্রহণ করে সম্মিলিত ভাবে। সমকালীন সামাজিক সমস্যা মানুষের হৃদয় দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে নাটকের মাধ্যমে। এই প্রথা চলে আসছে কাল থেকে কালান্তরে। শ্রবণ ও দর্শন একই সঙ্গে দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষের মনে সাড়া জাগানো সহজ বলে সমাজের ওপর নাটকের প্রভাব অপরিসীম। সেই কারণেই সাহিত্যের

অন্যান্য শাখাগুলোর থেকে নাটকের সঙ্গে সমাজ জীবনের যোগ স্থাপিত হয়েছে গভীর ও প্রত্যক্ষ ভাবে।

সামাজিক নাটকের শৈল্পিক গুণের কথা বলতে গিয়ে অনেক সমালোচক নাটককে সমাজের দর্পণ বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক নাটক—সামাজিকত্ব ও নাটকত্বের সমন্বয়। সামাজিক সমস্যা—তা' সাময়িক বা চিরকালীন যাই হোক না কেন সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু নাট্যরস সেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে থাকবে অঙ্গাঙ্গী ভাবে। সামাজিক নাটকে সমাজের স্থান নাটকের বাইরে নয় এবং সমাজের সমস্যা জটিলতায় নাটকের কাহিনী হবে আন্দোলিত, গতিমুখর, দ্বন্দ্ব সংঘাতময়। নাটকীয় চরিত্র এই সব আবর্তের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হবে।

গলস্‌ওয়ার্দি, ইবসেন এবং বার্নাডশ' রচিত সামাজিক নাটকগুলির প্রসঙ্গে বলা যায় যে তাঁদের মননশীলতা, এবং মানুষের জীবন ও সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সুষ্ঠুভাবে সাধারণ বিষয়বস্তুকে নাট্যরূপ দান করেছে। এই সব নাটকগুলির সঙ্গে প্রথম যুগের বাংলা সামাজিক নাটকের তুলনা করলে বাংলা সামাজিক নাটকগুলিকে অসার্থক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাঙালীর জাতীয় প্রতিভা ও মানস-গঠন নাটকের পক্ষে ঠিক অনুকূল নয়। প্রীতি ও শান্তিরসে স্নাত বাঙালী মন মানবিক দ্বন্দ্ব ও চিত্তবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। ভক্তিরসের পলি সে স্থান আচ্ছাদিত করে আছে বহুদিন ধরে। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "বাঙালীর অন্তরে গভীর লীলারস-মুগ্ধতা প্রবল ছিল বলিয়াই তাহার জীবনে ও সাহিত্যে নাট্যরূপ পূর্ণ পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যে জীবনে যাহা কিছু ঘটে সবই অদৃষ্টের ফল ও ভগবানের ইচ্ছা বলিয়া গৃহীত হয়, সেখানে যদি বা ক্ষোভ ও মনোবেদনা একেবারে পরিহার করা যায় না, তথাপি তাহাদের ক্রিয়া কখনই চরম বিক্ষোভের সীমা স্পর্শ করে না।"

প্রথম যুগের বাংলা সামাজিক নাটকের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা উপেক্ষনীয় নয়। সামাজিক নাটকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে বাংলা নাটক ইংরেজি শিক্ষার জোয়ারে অবগাহন করে বাঙালীর দৈনন্দিন সমস্যাকে উপেক্ষা করেনি। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই সামাজিক অসঙ্গতি ও কুসংস্কারগুলি তুলে ধরেছে দর্শক সম্মুখে। ভারত পথিক

রামমোহন ও পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার মূলক চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করতে সহায়তা করেছে। বাংলা সাহিত্যের যাত্রা পথে মহাকাব্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত তোরণ কিংবা গীতিকাব্যের কারুকার্যখচিত মিনার নির্মাণ বাঙালী নাট্যকারগণের পক্ষে সম্ভব হয়নি; কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্যের মঙ্গল ঘট মাথায় নিয়ে তাঁরা পথ পরিক্রমা করেছিলেন। সামাজিক অকল্যানের আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করার ভার বাঙালী নাট্যকারগণ গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে জীবন ভিত্তিক বাস্তবধর্মী রচনার সূত্রপাত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে। রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই নাটকটি রচনা করে নাট্যসাহিত্যে বাস্তব জীবনাদর্শের যে চারা রোপন করেছিলেন পরবর্তীকালে তাতে জল সিঞ্চন করে মহীরুহে রূপান্তরিত করেছিলেন মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যকারগণ। বাংলা সামাজিক নাটকের অন্য একটি দাবী এস্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মৌলিক রচনার প্রথম অভির্ভাব সামাজিক নাটকের মাধ্যমে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের আগে রঙ্গলালের কাব্য, প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাস (?) অনুপস্থিত।

নাট্যসাহিত্য বিচারের কোষ্টিপাথরে ঘসে পরীক্ষা করলে 'কুলীন কুল সর্বস্ব'-কে উঁচুদরের নাটক বলা চলে না, কিন্তু এর বিষয়বৈচিত্র্য তৎকালীন দর্শকের মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়নি। ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য প্রথার শোচনীয়তা নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু একথা ঠিক যে কাহিনীর মধ্যে বিচিত্র নাটকীয় উপকরণ থাকা সত্বেও dramatic action-এর অভাব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে রামনারায়ণ তর্করত্নের পূবসূরীদের রচিত কোন সার্থক নাটক ছিল না যা থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন। সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারায়ণ সম্পূর্ণ ইংরেজি অনভিজ্ঞ হওয়ায় তাঁর পক্ষে ইংরেজি নাটকের নাট্য শৈলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়াও সম্ভব ছিল না। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে শিল্প ক্ষেত্রে যিনি নতুন কোন বিষয়ের উদ্বোধন করেন তাঁর কীর্তি সব সময় বরণীয়। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে সামাজিক নাটক বিভাগের উদ্বোধনের জন্যে আমরা রামনারায়ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। দ্বিতীয়ত আজকের কালে বসে রামনারায়ণের নাটকের অনেক অসঙ্গতির কথা বললে নাট্যকারের প্রতি সুবিচার করা হবে না। সেই

যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর নাটকের সমালোচনা হওয়া উচিত। রামনারায়ণ রচিত 'নব নাটক' সম্বন্ধেও নতুন কোন মতামত প্রকাশের অবকাশ নেই। ফরমায়েসি দু'টি নাটক রচনার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলে দেখা যাবে যে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা' বাস্তবতাবোধ ও ব্যঙ্গ-প্রবৃত্তির উদ্বোধন। রামনারায়ণে এর শুরু এবং প্রসার আধুনিক যুগ পর্যন্ত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে পরবর্তী নাট্যকারগণের ওপর রামনারায়ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক কুপ্রথা ও সামাজিক সংস্কার বিষয়ে বহু নাটক রচনার স্পৃহা তৎকালীন নাট্যকারগণের মনে জেগেছিল। 'বিধবা বিবাহ' সংক্রান্ত বিষয় সেকালের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এই বিষয় নিয়ে সার্থক নাটক রচনা করেছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁর বিধবা বিবাহ নাটক বিষয়বস্তুর জন্যে শুধু মাত্র প্রশংসা অর্জন করেনি, উন্নত রচনার গুণে এবং অভিনয় সাফল্যের জন্যেও সমাদর লাভ করেছিল।

প্রহসন নাটকের একটা অন্যতম বিভাগ। সেই কারণে সামাজিক নাটকের আলোচনায় মধুসূদনের উৎকৃষ্ট দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সম্বন্ধে আলোচনা এই নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

প্রখর তেজদীপ্ত মধুসূদনের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের যে কোন শাখাকেই আপন আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। প্রহসন দু'টির মধ্যে তৎকালীন সমাজের স্বচ্ছ চিত্র সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনে উন্নতির নামে নববাবু সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ তে ধর্মের নামে অধর্মাচারী প্রাচীন সমাজের কপটতা যথাযথ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মধুসূদন তাঁর প্রহসন দুটিতে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন পক্ষের উপর নীতিকথা প্রয়োগের দ্বারা নাটকীয় রস ক্ষুন্ন করেননি। নীতিকথাগুলি অত্যন্ত গৌণ রূপ লাভ করায় বাস্তব রস মুখ্য হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্যমূলক এই প্রহসন দুটি সমাজ সংস্কার মূলক বক্তৃতার পরিবর্তে প্রকৃত শিল্পরূপ লাভ করেছে বিষয় বৈচিত্র্যে, কাহিনী বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে এই প্রহসন দুটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

। নব্যসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা সাময়িক সমস্যা হলেও বকধার্মিকদের সমস্যা

সেই যুগেই শেষ হয় নি। যে শ্রেণীর ধর্মধ্বজিককে উপলক্ষ্য করে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ রচনা করা হয়েছিল তারা আজও বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই প্রহসনটির মূল্য সেই কারণে নিত্যকালীন। মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যকারগণের ওপর এই প্রহসন দুটির প্রভাব যথেষ্ট, বিশেষ করে একেই কি বলে সভ্যতা?'র প্রভাব দীনবন্ধুর কয়েকটি প্রহসনে পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক নাটকের প্রবাহ রঙ্গব্যঙ্গের রূপ পরিগ্রহ করে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করল দীনবন্ধুর হাতে। নীলদর্পণ প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক যেখানে শাসক ইংরেজের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালী ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করবার ভাষা খুঁজে পেল। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল নীলদর্পণ নাটকে। শোষিত জনসাধারণ শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার প্রেরণাও লাভ করেছিল এই নাটকের মাধ্যমে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যে বিদেশী শক্তিকে খর্বকবার জন্যে প্রয়োজন তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার নীলদর্পণ নাটকে। নীলদর্পণের কাহিনী বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তিকরে রচনা করা হয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচার তৎকালীন বাংলা দেশের ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এমন কি ক্ষেত্রমনির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত নয়। হরমনির হরণের কাহিনীকেই নাট্যকার তাঁর নাটকে রূপদান করেছিলেন। হরমনির হরণের কাহিনী যে সত্য ঘটনা তা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার খবর থেকেই প্রমানিত। এই প্রসঙ্গে ৭ই নভেম্বর ১৮৭৩ সালের 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছিল "নদীয়ার অন্তর্গত ওয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।"

উনবিংশ শতকের বাঙালী জীবনের পরিচয় দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনের মধ্যে সর্বত্র। এই শতক বাঙালী জাতীয় জীবনের বিপর্যয়ের যুগ আবার এই শতকেই অন্ধকারের কাল অতিক্রম করে বাঙালী নবীন সূর্যোদয়ের শুভলগ্নের আশীর্বাদ লাভ করেছিল। ইংরেজি সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কারকে গ্রহণ করে বাঙালী স্বদেশীয় কুসংস্কার ও আবর্জনা বর্জন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ইংরেজি সভ্যতার গ্রাসে বাঙালী জীবনে যে বিপর্যয় এসেছিল

তা'ও কম উল্লেখ যোগ্য নয়। দীনবন্ধুর নাটকে এই সব কিছুর চিত্র সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নাটক বিচারের পাশ্চাত্য রীতির আলোকে আমরা যদি বাংলা সামাজিক নাটকের বিচার করি তা' হলে হয়ত প্রথম যুগের বাংলা সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে বহু দোষত্রুটি খুঁজে পাব। কিন্তু নাটকগুলির যে ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক মূল্য আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। Shakespeare এর নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে T. S. Eliot বলেছিলেন যে এই নাটকগুলোর মধ্যে তাঁর সময়কার সমাজ ও পরিবেশের অবস্থার বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেই হিসেবে এইগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। প্রথম যুগের বাংলা সামাজিক নাটকগুলো সম্বন্ধেও আমরা সেই কথাই বলতে পারি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে এই নাটকগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করলে বাঙালীর পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিচয় আমরা পাই তার সাহিত্যিক, শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়।

পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

সুকৃতি রায়চৌধুরী

মৌখিক ভাষা আর সাধুভাষার প্রভেদ সব ভাষাতেই আছে। তেমনি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় লৌকিক ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে। সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রাথমিক পর্য্যায়ে লৌকিক ভাষারই প্রাধান্য—পরে বিভিন্ন স্তরে উৎকর্ষতা লাভ করে ক্রমশঃ তার মান উন্নয়ণ হয়।

পাঞ্জাবী সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকেই এর উৎপত্তি। গোরখনাথের (৯৪০—১০৩১ খৃ) হঠযোগ সম্পর্কীয় রচনা থেকেই এর যাত্রা সুরু। বেদান্ত প্রচার ও হটযোগ সম্বন্ধীয় বিষয়ের ব্যাপক প্রচাব করতে যে ভাষার ব্যবহার হয়েছিল, তার মধ্যেও চমৎকারিত্ব বা সৌন্দর্য্যের প্রকাশের পরিচয় মেলে। তবে সঠিক পাঞ্জাবী ভাষার আদি রচনা হিসেবে এগুলির উল্লেখ সমীচীন নয়।

মুসলমানেরা ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের জয়যাত্রা সুরু হয়। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের যে সংঘর্ষ, তার মধ্যে থেকে জন্ম নেয় সুফীবাদ। সুফিবাদ এই দুই ধর্মের মধ্যে সমন্বয় আনতে পেরেছিল কিনা, সে বিচার না করে এইটুকু জোর দিয়ে বলা চলে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল সুফী আন্দোলন। ফরিদ (১১৭৩-১২৬৫ খৃঃ) সুফী কবিদের অন্যতম। তাঁর রচনায় ফারসী শব্দের প্রয়োগ থাকলেও ব্যবহারিক পাঞ্জাবী ভাষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বর্ণনায় পাঞ্জাব ভূখণ্ড নবনব রূপে প্রকাশমান। তাছাড়া তাঁর কবিতায় শব্দচয়ন, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি পাঠকের মনোহরণ করে।

এরপর প্রায় দুশোবছর পাঞ্জাবী ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য রচিত হয় নি। ঐ দুই শতাব্দী ভারতের বুকের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে—তাছাড়া মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মহৎ ক্ষণ ও মহৎ ব্যক্তির যুগপৎ আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজনও বটে।

সেই রকম একটা মাহেন্দ্রক্ষণ পাঞ্জাবী সাহিত্যে এল গুরু নানকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে (১৪৬৯—১৫৩৯ খৃঃ)। গুরু নানক শিখধর্মের প্রবর্ত্তক। পাঞ্জাবী ভাষা যেমন হয়ে উঠল প্রাণবন্ত, তেমনি সাহিত্য হল সমৃদ্ধ তাঁর পূত লেখনীস্পর্শে। লৌকিক ভাষার সুসংহত প্রয়োগ, উপমার সুষ্ঠু নির্বাচন, ছন্দ ও কাহিনীর মৌলিকতা—সর্বস্তরে নানকের শিল্পকীর্ত্তির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তাঁর রচনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন লৌকিক ভাষার উৎকর্ষতা সংস্কৃত ভাষাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। নানা বিষয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন—সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি মানুষের জয়গান গেয়েছেন। মানবাত্মার ব্যথা বেদনা, আর্তি সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তিনি। তাঁর রচনাবলী 'জপ জী', 'সিধ গোসাত', 'বড় মাহ', সবই 'আদি গ্রন্থে'র অন্তর্ভুক্ত। এর পর গুরু রামদাস এলেন—তাঁর রচনায় প্রভূত শিল্পরুচির পরিচয় মেলে। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেবের অবদান অমূল্য। তিনি যেন ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান হয়ে কলম ধরেছেন। ছন্দোবদ্ধ কবিতা যেমন সুষমামণ্ডিত তেমনি প্রসাদগুণসম্পন্ন। তাঁর রচিত 'সুখমণি' শুধু পাঞ্জাবী সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর যে কোন ভাষার ইতিহাসে এক অমূল্য সম্পদ। তিনি 'আদি গ্রন্থ' সম্পাদনা করেছেন। এই সম্পাদনায় তাঁর দক্ষতা ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন প্রখ্যাত শিখ পণ্ডিত ভাই গুরুদাস (১৫৫৮—১৬৩৭ খৃঃ)। তিনিও একজন প্রখ্যাত কবি। গুরু গোবিন্দ সিং পরে গুরু তেগ বাহাদুরের কিছু রচনা 'আদি গ্রন্থে' সংযোজন করেছিলেন।

এ সময় গদ্য রচনা তার নাবালকত্ব পেরোয়নি। গুরু নানকের জীবনী ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে কিছু বিক্ষিপ্ত রচনার হদিশ মেলে। ফরিদ যদিও সুফীবাদ প্রচারে ইসলামকে বোধ হয় একটু প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী সুফী কবিরা হিন্দুধর্মের রূপকল্পকে আশ্রয় করলেন। শাহ হুসেন রচিত কয়েকটি 'কাফি' তে তার নিদর্শন আছে। অন্যান্য সুফী কবিদের মধ্যে সুলতান, আলি হায়দার প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ধর্মীয় চেতনাবোধ থেকে যে কবিতার জন্ম তা বিশ্বজনীনতার সত্তা পরিগ্রহ করতে কিছু সময় লেগেছিল। যুদ্ধের সময় লিখিত কবিতা বা সামরিক গাথা এসময় কিছু রচিত হয়। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের 'চণ্ডী ডি বর' একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা। নাদির শাহের আক্রমণের ওপর নাজাবেত লেখেন একখানি কাব্য। হরি সিংয়ের বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে কাদির ইয়ার লেখেন একখানি কাব্য।

প্রেমগাথা পাঞ্জাবী সাহিত্যে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। উন্মুক্ত প্রান্তর, শস্য শ্যামলা ধরিত্রীর বুকে পাঞ্জাবীরা বসবাস করেছেন। কবিতায়, গাথায় তার জন্মভূমির জয়গান গেয়েছেন বিভিন্ন কবি। রোমান্টিক কবিতার আসরে সেরা স্থান হল অমর কাব্য 'হীর-রাণঝা' র। ১৭শ শতাব্দীতে দামোদর থেকে সুরু করে বহু কবি এই কাহিনী অবলম্বনে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ওয়ারিশ শাহ (১৭৩০-১৭৯০খৃ:) রূপে রসে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় একে প্রথম সারিতে তুলে ধরলেন। 'হীর-রাণঝা' র ছত্রে ছত্রে পাঞ্জাবী জীবনের আলেখ্য। এ ছাড়া পিলু লিখেছেন 'মিরজা ও শাহিবান'। হাশ'ম লিখেছেন 'শশী ও পুন্নু'। উৎকর্ষতায় এরা 'হীর-রাণঝার' সমকক্ষ নয়।

১৮শ শতাব্দীতে কবিতার ইতিহাস লেখা সুরু হল। ভাই মনি সিং (১৬৪৪-১৭৩৪) গদ্যে লিখলেন 'জনম সখী'।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ শিখদের এক গৌরবময় অধ্যায়। অথচ রণজিত সিং এর আমলেও পাঞ্জাবী রাষ্ট্রভাষা হয়নি। শিখেরা যখন পরাজিত, অর্থাৎ, যখন বৃটিশেরা এদেশ অধিকার করল, ততদিনে পাঞ্জাবী সাহিত্যের চারশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কবিতার ঐতিহ্য বজায় রইল। এ সময়ের একমাত্র প্রতিভাবান কবি হলেন শাহ মহম্মদ (১৭৮২—১৮৬২ খৃ:)। ইনি শিখ সাম্রাজ্য পতনের ওপর ভিত্তি করে কাব্য লিখেছেন।

ইংরেজ এদেশ অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার হল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি লাভের ফলে চিন্তাজগতে এল বিপ্লব। আর বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনায় হল তার প্রতিফলন। পুরাতন মূল্যবোধের পরিবর্তন হল। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, মার্ক্সবাদ ও ইউরোপীয় শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান প্রসারিত হল। আর্য্য সমাজ ও সিং সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অবশ্য নতুন জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেবার বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু নূতনত্বের জলতরঙ্গ কে রুধিবে।

দুই ধারার সেতুবন্ধন করেছিলেন ভাই বীর সিং (১৮৭২—১৯৫৭ খৃ:)। নব্য ধারায় অবগাহন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, তবু পরিবর্তনকে ঠেকাতে পারেন নি। পাশ্চাত্য ভাবনা তাঁকেও অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি লিখেছেন প্রবন্ধ, উপন্যাস, পত্র-সাহিত্য—তবু কবি হিসেবেই তিনি সমধিক

প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত কাব্য 'রাণাসুরত সিং' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তীর্থযাত্রী চলেছে চরম প্রাপ্তির সন্ধানে—নির্বাণের পথে—তারই কাব্যময় বর্ণনা।

এরপর যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন পুরাণ সিং (১৮৮১—১৯৩১)। শিখ আধ্যাত্মবাদকে তিনি বিবৃত করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। ভাই বীর সিং তাঁর কবিকল্পনাকে অসীম বিস্তৃত করেছেন—অপর পক্ষে পুরাণ সিং গেয়েছেন অসীমের গান, অথচ তা কখনও মাটির পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'খুলে ময়দান', 'খুলে আসমান' ইত্যাদি। সীমার ভেতরে অসীমকে খুঁজেছেন তিনি।

বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশক পর্যন্ত এই দুইকবিই খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন।

ধনিরাম চত্রিকের কবিতার বৈশিষ্ট্য হল, তার উচ্চারণভিত্তিক এবং লিরিক ধর্মী। পাঞ্জাবী ভাষা তাঁর হাতে যেন সজীব হয়ে উঠেছে।

এরপরই বলা চলে আধুনিক কবিতার যুগ। তবে এ আধুনিকতা বিশেষ করে তার বিষয় নির্বাচনে। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, চেতনার প্রবাহ, প্রতীকধর্মী কবিতা এল আসর জাঁকিয়ে। মোহন সিংকে (১৯০৫) আধুনিক কবিদের অগ্রগণ্য বলা হয়। রোমান্টিক কবিতা থেকে বৈপ্লবিক মানবিকতায় উত্তরণের স্বাক্ষর তাঁর কবিতায়। ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা করেছেন তিনি। এরপর নামকরা চলে আর একজন সচেতন কবির—তিনি হলেন অমৃতা-প্রীতম (১৯১৯)। দেশবিভাগের ফলে তার অন্তর্দৃষ্টি হয়েছে প্রসারিত। মনের গহন গভীরে তিনি কী যেন খুঁজে বেড়ান। আর একজন মহিলা কবি হলেন প্রভাজোত কাউর। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্য 'পাখি' বিখ্যাত। প্রীতম সিং সফির (১৯১৬) কবিতায় কল্পনাপ্রবণতাও আছে, আছে আধ্যাত্মিকতার সুর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নবতরঙ্গের কবিরা এসেছেন। নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে পাঞ্জাবী কবিতায়। হরভজন সিং, যশোবন্ত সিং, সোহন সিং, আলুওয়ালিয়া, হযরত এরা হলেন পুরোধা। একেবারে তরুণদের মধ্যে শিবকুমার বটলবি প্রেম আর প্রকৃতির পূজারী। এঁর রচিত 'লুনা' ইতিমধ্যে পাঞ্জাবী সাহিত্য পাঠকের মন কেড়ে নিয়েছে।

কবিতার তুলনায় পাঞ্জাবী গদ্যের বয়স অল্প। তবু হাঁটি হাঁটি পা পা

করে এগিয়ে এসেছে সে। নাটক, ছোটগল্প উপন্যাস সব সম্ভারই এসেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ঈশ্বর চন্দ্র নন্দা (১৮৯২—১৯৬৬) পাশ্চাত্য নাটক অনুকরণে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক লিখতে সুরু করেন। অভিজাত শ্রেণীর জীবন যাত্রা আঁকা হত সে নাটকে। সংলাপ উপভোগ্য ছিল। অপর নাট্যকার সন্ত সিং শেখন (১৯০৮) পাঞ্জাবী থিয়েটারে প্রাণ সঞ্চার করলেন নব্য ভাবধারা আমদানী করে। বলাবাহুল্য তাতে ইবসেন, ফ্রয়েড ও মার্ক্স প্রভৃতির ছায়া লক্ষিত হত। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটক হল 'কলাকার', নলদময়ন্তী, 'মযান আব না কই'। হরচরণ সিং (১৯১৪) তাঁর নাটকে উপজীব্য করলেন প্রগতিবাদকে. সমসাময়িক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত তার নাটক 'লোভাশক্তি' অত্যন্ত জনপ্রিয়। বলবন্ত সিং গার্গী (১৯১৮) আর একজন সার্থক নাট্যকার। তাঁর প্রথম নাটক 'লোহাকুট' নবদিগন্ত উন্মোচন করল।

উপন্যাসজগতে অগ্রণী হলেন নানক সিং (১৮৯৭)। তার গল্প বলার ভঙ্গী চরিত্র বিশ্লেষণ উপন্যাসকে মনোরম করে তোলে। নানক সিং পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ হিন্দি, তেলেগু ও মালয়ালম ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কারও লাভ করেছেন। এর রচিত 'পবিত্র পাপী' বিখ্যাত। সুরেন্দ্র সিং মারুলা (১৯১৯) পরীক্ষার পক্ষপাতী। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পিও পুত্র'তে তিনি কাহিনীর চেয়ে ব্যক্তির দিকে জোর দিয়েছেন। অমৃতা প্রীতম রচিত 'ডক্টর দেব' ও 'পিনজর' সমকালীন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস। জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন নরিন্দ্র পাল সিং, সুরজিৎ সিং সেঠি, গুরুদয়াল সিং ও মহেন্দ্র সিং।

পাঞ্জাবী ছোট গল্পেও নতুনত্ব এসেছে। সাহিত্যের শাখার এটিই বোধ হয় তরুণ। একটা মুহূর্ত, অথবা একটা ভাবনাকে প্রকাশ করতে বুঝি ছোট গল্পের জন্ম। ও হেনরী, মোঁপাসা, ম্যানসফিল্ড প্রমুখ পৃথিবীর সেরা ছোট গল্প লিখিয়েদের আদর্শ স্থানীয় মনে করেই পাঞ্জাবী গল্প লেখকেরা আসরে নেমেছেন। ছোট গল্পে নাম করেছেন সন্ত সিং শেখন, কারতার সিং দুগগাল, কুলবন্ত সিং, অজিত কাউর, দলিত কাউর প্রমুখেরা।

পাঞ্জাবী প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন যারা তাঁরা হলেন তেজা সিং (১৮৯৪—১৯৫৮), বলবন্ত গার্গী। গার্গীর 'নিম ডি পাত্তা' ব্যঙ্গরসের খনি। গিয়ানী গুরজিত সিংয়ের 'মেরা পিণ্ড' রচনাটি শ্লেষাত্মক।

সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডঃ মোহন সিং দিওয়ানা। মার্কসবাদী সমালোচক সন্ত সিং শেখন ও কিসান সিং বিশ্লেষণধর্মী রচনা লিখে যশস্বী হয়েছেন।

মোটামুটি এই হল পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। †

---

† এই প্রবন্ধ রচনায় গান্ধী ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'অ্যান অ্যানথলজি অফ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।
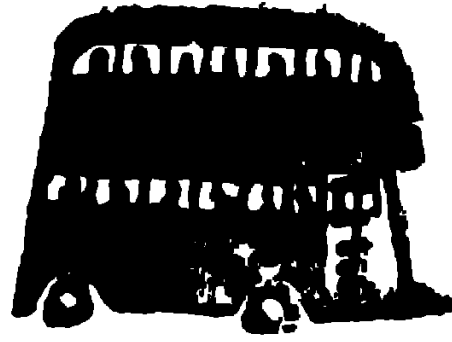
নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

॥ ছয় ॥

পরিচিত সমাজ থেকে গীতা আজ অনেক দূরে।

এখানে উৎসব আছে উচ্ছ্বাস আছে আভিজাত্য আছে। আনন্দ আছে কিন্তু জীবন কৈ? প্রাণ প্রবাহের সে প্রচণ্ড স্রোত কৈ? এ ক্লাশ অফিসারেরা 'বি ক্লাশের কর্মীদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশবে না। প্রাণের যোগ যদি প্রবল হয়ে ওঠে তা হলেও না কারণ তাতে প্রেষ্টিজের প্রশ্ন এসে পড়ে।

অনিমেষের বিয়ের পর ওর অফিস-বন্ধুরা একটা পার্টিতে ওদের নেমন্তন্ন করেছিল। কোলকাতার নিয়ন লাইটের ঝকঝকে আলো থেকে যে মেয়ে সেখানে গেছে তার কাছে পার্টির পরিবেশ খুব একটা অচেনা ছিলনা। মহিলামহলের চিরাচরিত সাড়ী গহনার অহংকার আর পুরুষমহলের অতি পরিচিত ক্ষমতার দম্ভ ওর অচেনা ছিলনা। নিস্তব্দ, শান্ত জীবনে মাঝে মাঝে বড় রকম পার্টি ওর ভালই লাগত তবে মনের ওপর কোন দাগ পড়ত না। তাই খুব সহজ ভাবেই গীতা সকলের সঙ্গে মিশত। নিম্নপদস্থ গৃহিণীদের তোষামোদে মিশ্রিত সভক্তি, সহযোগিতায় একটু বিস্মিত হত, কারণ ওর পূর্ব জীবনে শ্রেণী বিভেদটা এমন ভাবে অনুভব করতে পারেনি। বড়লোকের মেয়ের আর বড়লোকের স্ত্রীর গর্ব ঠিক এক ছাঁচে ঢালা নয়। যাই হোক এখানকার এই বিভক্ত শ্রেণী সমাজের মধ্যে একটি মেয়েকে ওর বড় ভাল লেগেছিল। মেয়েটিও ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারই ফলে ওদের পরিচয় পার্টির গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর পর্যান্ত এগিয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে মেয়েটি আসতো ওদের বাড়ী। প্রথম প্রথম অনিমেষ বেশ খুসীই হত। নিশ্চিন্তও হত কারণ ওকে তো ব্যস্ত থাকতে হয় কাজ নিয়ে আর গীতাকে বড় একলা থাকতে হয় কাজের অভাবে। রমার সঙ্গে গীতার হয়তো সব ক্ষেত্রেই মতের মিল হতনা কিন্তু তবু গীতার ভাল লাগতো রমাকে। রমা তার নিজস্ব ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তার

ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। রমার রুচি, পরিমিত আচরণ সমস্ত কিছু মিলিয়ে গীতা তার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিল।

একদিন অনিমেষ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এসে জানাল যে এখনি যেতে হবে ওর সঙ্গে। বড় সাহেবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। গীতা যেতে রাজী হল না কারণ সে অনেক আগেই রমাকে কথা দিয়েছে তার কাছে আজ যাবে বলে। অনিমেষ একটু আব্দারের সুরেই বল্ল—সে আরেকদিন যেও গীতা! আজ আমার সঙ্গে চল। মিসেস দত্ত নিজে মুখ ফুটে বলেছেন।

গীতা উত্তরে বলে—"তা হোক তুমি একটু বুঝিয়ে বল ওঁকে লক্ষীটি। দেখ! আজ রমার ছেলের জন্মদিন একমাত্র আমিই তার নিমন্ত্রিত। আমার জন্যেই ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে অবস্থার অতিরিক্ত আয়োজন করেছে। আমি না গেলে কি হয়।" —তা বেশ তো, বেশ ভাল দেখে, কাজে লাগে এমন কিছু কিনে পাঠিয়ে দাও না আর জানিয়ে দাও যে বিশেষ কারণে আজ যাওয়া হল না। অন্যদিন যাবে। নাও! নাও দেরী কোরনা গো, উঠে পড়। আর সময় নেই।

গীতা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে। আকুল হয়ে বল,—না, না, তা হয় না গো! আমি না গেলে ওরা খুব দুঃখ পাবে।

—মোটেই না, বরঞ্চ খুসীই হবে। গরীব মানুষ একদিন নিজেরা ভালমন্দ খেয়ে বাঁচবে।

অনিমেষের এই শেষ কথাটায় গীতার মাথার মধ্যে জ্বালা করে উঠলো। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললো—কি ভাবো তুমি ওদের বলতো—?

—ঠিকই ভাবি সুপিরিয়ার অফিসারের স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করছে এতেই ওরা ধন্য। তুমি ওদের বাড়ী গেলে সেটা তোমার বদান্যতা। না গেলে মেনে নেবে নির্বিবাদে। কিন্তু আমি যদি বড় সাহেবের বাড়ী না যাই প্রেষ্টিজের প্রশ্ন ওঠে। গীতা একটু ব্যাঙ্গের সুরেই বলে, ব্যাপারটা একই পাত্র পাত্রীর তফাৎ এই যা!

—একটু চড়া সুরেই বলল—

—"তুমি মিসেস দত্তের নেমন্তন্ন রিফিউজ করে তাদের অপমান করছ। বাদানুবাদ নয় তো আরো অনেকক্ষণ চলতো কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েই

গীতা আয়াকে ডেকে তার হাতে একটা চিঠি লিখে রমার কাছে পাঠিয়ে দিল।

সব চাইতে দামী সাড়ী বার করে, দামী গহনায় নিজেকে অপরূপ করে সাজিয়ে গীতা নিঃশব্দে মোটরে গিয়ে বসল। তার এই অবিচলিত কঠিন, শীতল নিস্তব্ধ সংগ অনিমেষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অনিমেষ কোন কথা বলতে পারল না। কিন্তু কেমন যেন একটা অস্পষ্ট অপরাধ বোধ ওর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠলো। এই প্রথম ওরা দুজনের কাছে অচেনা হয়ে রইল। অনড় আড়ষ্টতায় দুজনেই বিপর্যস্ত, তবে যতটা অনিমেষ ততটা গীতা নয়। গীতা ক্ষুব্ধ হল। গীতা অপমানিত হল আর আহত হল তার বিশ্বাস আর ভালবাসা। সে কি চেয়েছিল আর কি পেল? এই অনিমেষকেই সে ভালবেসে এসেছে এতদিন। খুসী হয়েছে তার সান্নিধ্যে।

মিষ্টার দত্তর বাড়ী পৌঁছেই গীতা যেন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। সে যেন এ নিমন্ত্রণে অত্যন্ত খুসী। মিসেস দত্তর সংগে পরিচিত হবার সৌভাগ্যে যেন ধন্য। আচরণে, আলাপে নিখুঁত একটি ছবি হয়ে ফুটে উঠলো গীতা অনিমেষের চোখে। অনিমেষও স্বস্তি পেল। যাক মেঘ তাহলে কেটে গেছে। কিন্তু মেঘ যে কাটেনি উপরন্তু কতখানি যে জমাট বেঁধেছে তা টের পেল যখন দেখলো, গীতা জল ছাড়া আর কিছুই মুখে ছোঁয়াল না। জোর প্রতিবাদে সে জানিয়েছিল যে আজ তার শরীর খুব খারাপ। মিষ্টার ও মিসেস দত্ত তার জন্য খুবই ব্যথিত হলেন কিন্তু কি করা যায়? শরীরের ওপর তো জোর চলেনা। পরের দিন অতি অবশ্যই যেন শরীরের কথা ফোন করে জানান হয় এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে তবে ওদের বিদায় দিলেন মিষ্টার ও মিসেস দত্ত।

গাড়ীতে উঠে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল,

—খেলে না কেন?

ইসারায় ড্রাইভারের উপস্থিতিটা বুঝিয়ে দিল গীতা। সে প্রসঙ্গ তখনকার মত সেইখানেই থেমে গেল। বাড়ী ফিরে অনিমেষ আর কোন প্রশ্ন করেনি কারণ প্রশ্ন করতে পারেনি। যার ধমকে জাঁদরেল ওয়ার্ককাররা চমকে ওঠে সেও আজ নিরীহ এক রোগা পটকা বাঙালী মেয়েকে ভয় পাচ্ছে। অনিমেষের ইচ্ছের পরাজয় এই প্রথম।

আস্তে আস্তে গুমোট ভাবটা কেটে গেল। এ নিয়ে কেউ কাউকে দোষারোপ করেনি। কোন কৈফিয়ৎও তলব করেনি, বা দেয়ও নি।

অনিমেষ কাজের মধ্যে ডুবে রইল আর গীতা তার নিঃসঙ্গ শূন্যতার মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবনার জাল বুনে বুনে কোনরকমে দিন গুলোকে কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত রইল। এখানে ওর কাজ নেই কোন। না, সংসারের, না বাইরের। গানও আর গায় না কারণ ভাল লাগেনা, নিজেকেই কেবল গান শুনিয়ে শুনিয়ে ও এখন ক্লান্ত হয়ে পরেছে। এখানে বেশ বড় লাইব্রেরী আছে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও আছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল টাউন তাই স্কুলে আর মেয়েদের সমিতির কোন অভাব নেই কিন্তু গীতা জানেনা এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল টাউনের বাইরের জগৎটা কি রকম, এখানকার আভিজাত্য পয়সা দিয়ে গেঁথে তোলা এর মধ্যে থেকে থেকে ক্রমে ক্রমে দমবন্ধ হয়ে এল গীতার'। বুকে যেন হাঁফ ধরে। সহজ ভাবে হাসতে প্রাণভরে কাঁদতে সে ভুলে গেছে। দীর্ঘ তিন বছর তার কেউ নেই।

টুটুলকে পড়াবার জন্য তিনজন এংলো ইণ্ডিয়ান টিচার। মেয়ের সঙ্গে বক বক করলে মাথাধরতে পারে তাছাড়া প্রেষ্টিজও থাকেনা তাই একজন গভরনেস। আয়াতো চব্বিশ ঘন্টা মোতায়েন রয়েছে। টুটুলের সঙ্গে গীতার সম্পর্ক শুধু বাঁধা নিয়মে ঘড়ির কাঁটা ধরে আদর করার।

অনিমেষের গাড়ীতেই টুটুল স্কুলে যায়। এখানকার নতুন নার্সারীতে সে ভর্ত্তি হয়েছে। বেলা তিনটেয় বাড়ী ফেরে। তখন সে গভরনেসের জিম্মায়। মেয়েকে দুহাত বাড়িয়ে মা কোলে নেয় কিছুক্ষণ পরেই গভরনেস্ এসে বলে টুটুল সোনা মাকে বিরক্ত করে না, চলোও ঘরে যাই তোমাকে গল্প শোনাব। তারপর বিকেলে আয়ার সঙ্গে বেড়াতে গেলে তার কিছুপরেই অনিমেষের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হয় গীতাকে—বেড়িয়ে যখন বাড়ি ফেরে টুটুল তখন বেবিকটে। টুটুলকে নিয়ে ওদের কোন আলোচনা নেই পরামর্শ নেই। তাকে নিয়ে ওদের কোন ভাবনাও নেই। অনিমেষ যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা তো করে দিয়েছে। কজন ছেলেমেয়ে এত ভাল ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ হ'বার সুযোগ পায়,

ঘড়িতে চারটে বাজলে ফিরে আসার সময় হল অনিমেষের। সে

এসেই বাথরুমে যাবে। স্নান সেরে খাবার টেবিলে বসবে। আয়া তুলে নিয়ে আসবে টুটুলকে।

সাজান গোছান মেয়ে। এ মেয়ে কি গীতার নিজের? গীতা কি দশমাস নিজের দেহে ওকে বহন করেছে? ওরই রক্ত মাংসে কি ঐ সুন্দর ননীর মত দেহটা তৈরী হয়েছে। খেতে বসে টুটুলকে নিয়ে একটুক্ষণ হাসি আনন্দর অবসর; তারপর ইচ্ছা না থাকলেও টুটুলকে খেতে হবে আয়ার সঙ্গে। তারপর বেরোবে ওরা দুজনে কোনদিন সিনেমা, কোনদিন নদীর ধারে। বেশীর ভাগই অবশ্য অফিসারদের বাড়ীতে তারপর আবার ঘড়ির কাঁটা ধরে বাড়ী ফেরা, খাওয়া আর খাওয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়া।

অনিমেষের সব অভ্যাস ওর চেনা হয়ে গেছে। আজ ওরা দুজনেই অভ্যাসের ইচ্ছায় পরিচালিত। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের আস্বাদ ইনডাস্ট্রিয়াল টাউনের অভিজাত 'এ' টাইপ কোয়ার্টাসে খুব কমই অনুভব করা যায়। এখানে সব কিছু ঘড়িধরা নিয়মে বাঁধা। মন এখানে অভ্যাসের ঘড়িতে অভ্যস্ত। দেহও তাই। মনের স্বাধীন সত্বার বাচালতাকে এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। তাই এখানে শান্তি আছে, সভ্যতা আছে, কালচার আছে শুধু নেই একটি জিনিষ বাঁচার আনন্দ। এই অভ্যাসের জাঁতাকলে নিজেকে জুড়ে দিয়েছিল গীতা তাই হঠাৎ সেদিন অনিমেষের গলায় অপরিচিত ডাক শুনে সাড়া দিতে গিয়ে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল।

—আমায় কিছু বলবে? চোখ তুলে তাকাল গীতা। একটু গম্ভীর হয়েই প্রশ্ন করে অনিমেষ—

—টুটুলকে কোলকাতার হষ্টেলে পাঠাতে চাইছ কেন?

—সে বাঙালীর মেয়ে সেই কথাটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য।

—হঠাৎ?

—আমার ইচ্ছে।

—এ বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করাটাও প্রয়োজন মনে করলে না?

—পরামর্শ! এ কথাটাকে তুমি স্বীকার কর? তাহলে টুটুলের জন্যে তো আমার সঙ্গে এ বাবৎ কোন পরামর্শ তুমি করোনি?

—যে ব্যবস্থা করেছি তা কি তোমার মনঃপুত ছিল না?

—তুমি তো তা জানতে চাওনি।

—এবিষয়ে তো কখনও কোন আপত্তি জানাওনি তাই ভেবেছিলাম তোমার কোন অমত নেই।

এ কথার উত্তরে গীতার হয় তো অনেক কিছুই বলবার ছিল কিন্তু তবু চুপ করেই গেল। কিন্তু টুটুলের নতুন ব্যবস্থার কি কৈফিয়ৎ সে দেবে? অনিমেষ রাগ করেনি জোর করেনি শুধু শান্ত ভাবে বলেছিল। আর কয়েকটা দিন ভেবে দেখ গীতা। আমাকে ভাববার জন্যে একটু সময় দাও।

কিন্তু তিন বছর পরে আজ গীতার পোষ না মানা অন্তরাত্মা যে ছট্‌ফট করে উঠেছে।

(ক্রমশঃ)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

প্রকাশের স্থান—	রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮
প্রকাশের সময় ব্যবধান—	মাসিক
মুদ্রকের নাম—	গৌরগোপাল দাশ
	ভারতীয়
	বি-৫১, রবীন্দ্রনগর, কলি-১৮
প্রকাশকের নাম—	ঐ
সম্পাদকের নাম—	ঐ
সত্ত্বাধিকারী—	ঐ

আমি গৌরগোপাল দাশ, ঘোষণা করছি যে উপরে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর
গৌরগোপাল দাশ

এপার বাংলা

প্রদীপ্ত কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লীতে পল্লীতে বহ্ন্যুৎসব
বেয়নেটের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে
বাংলার মা বোনের মর্য্যাদা লাঞ্ছিত।
এই বাংলারই॥

মধ্যরাত্রে গুলির আওয়াজ—
কিশোরের রক্তে ভেজা গলিপথ বেয়ে
সকালের কাগজ ফিরি করে বিবেকের পসরা।

সফর হয়েছে সুরু রাশ জাপ, বৃটিশ মুল্লুকে
মানবিকতার—।
রোটাণ্ডার ঠাণ্ডা ঘরে কফির আসরে
প্রতিবাদ—প্রতিরোধ খেলা।
ওঁ শান্তি॥

শান্তির ললিত বাণী ভেসে আসে
নিসর্গের থেকে
'দেবতার শিশুদের' আবেগ মন্ত্রিত কণ্ঠস্বর
আকাশবাণীতে শুধু আকাশেরই বাণী
মাটিতে সন্তানহারা বুকফাটা জননীর আকুল ক্রন্দন।

অর্থের বৃত্তেতে ঘোরে
অবিনীত শ্রমিকের বদ্ধমুষ্টি আন্দোলন
বনধ্, হরতাল।

গরিবী হটাও—
নির্বাচন এসে গেছে
গরিবরা হটে যায় এক, দুই, তিন
শোষণের নাগ পাশে
গুলির আঘাতে।

অশ্রু আজ রোষে পরিণত নীচের মহলে
ইজ্জতের অধিকার কেড়ে নিতে তাই সামিল মানুষ
নীরব প্রস্তুতি নেয় প্রতি ঘরে ঘরে
শিবাজীর বাঘ-নখ নিয়ে—
এই বাংলাতে।
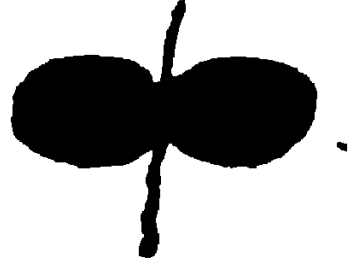
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখক লেখিকা পাঠক পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, সমস্ত রকম যোগাযোগের জন্য সব সময়ই উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে কোন রকম যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।

ছুটি

গোপীনাথ দত্ত

অক্ষম পত্রিকা সম্পাদকের প্রতিশ্রুতির মত
আজ কাল পরশুর
চাইনা মধুরতম বাঁচার আশ্বাস।
সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা পল অনুপল ধরে
মৃত্যুঞ্জয়ী নীলকণ্ঠের মত
নীরবে প্রত্যাশার গিলেছি গরল।
মৃত্যুর স্তব্ধতা বুকে নিয়ে
ঘুমায়েছি যুগ যুগ ধরে।
বঞ্চনার খরতাপে প্রত্যাশা অঙ্গার,
পীড়নের তিমকণ্ঠের বিষাক্ত জালায়
সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জাগিয়াছি আমি।
হৃদয় বেদনা তাপে জ্বেলেছি মশাল
শহরে নগরে গঞ্জে হাটে গ্রামে গ্রামে।
উদ্দীপ্ত মশালের রক্ত চক্ষু দেখি
নিশ্ছিদ্র ছায়ারা কাঁপে গাছের আড়ালে।
রক্তচোষা বাদুড়েরা
ঘুম ভেঙে জুড়েছে চিৎকার।
শতাব্দীর পুঞ্জীভূত আঁধারের বুকে
জ্বেলে দেব দাবানল আমি।
আশ্বাস বিশ্বাস আর প্রত্যাশার মত
আভিধানিক শব্দরা পুড়ে হবে ছাই।
বুভুক্ষুর প্রেতভূমে দীপ্যমান মশাল আলোতে
পথ চিনে শুরু হবে আজকের নতুন মিছিল।
কাল পরশুর মত বন্ধ্যা
প্রতিশ্রুতি ভরা অনাগত দিনগুলি
আজ থেকে তোমরা নিতে পার ছুটি।

জনৈকা সুন্দরীকে

সমীরণ রুদ্র

জানো সুন্দরী,
তোমাকে আমার ভালো লাগে কতো ?
ঠিক সোনা—রোদ ঝরা
কোনো এক অলস দুপুরে
আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে—
ভেসে যাওয়া এক ঝাঁক শ্বেত কপোতের মতো।
কিন্তু তোমাকে আমি কখনো দেখিনি ওগো বাসী মেয়ে
আচ্ছা, তুমি বাসী ফুল ছাড়া আর কি ?
তুমি রক্তচোষা বাদুড়ের মত বড় বদলালে,
ভালবাসাকে হত্যা করলে,
তোমার পূর্ব স্বামীকে ত্যাগ করলে, কেন ?
তাহলে তুমি বাসী ফুল ছাড়া আর কি ?
এখন দাখ সারাক্ষণ হাহা করে—
শিমুলের তুলো উড়ছে উত্তর বাতাসে।
রোদে পিঠ দিয়ে আমি শুধু হাই তুলছি—
আর ভাবছি তোমার ব্যর্থ যৌবনের কথা।
আর ভাবছি কেন তোমায় ভালবাসলুম।
আমাদের পথের পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটা,
দীঘির জলে সেই মোহময় পরিবেশ,
আমি বড় বড় জলাশয় এবং সমুদ্রের
গভীরতা ভাবতে ভাবতে—
তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ি।
তখন তোমার কানের পোখরাজ দু'টো
অবিশ্বাস্য আঁধারে জলে,
তোমার অনামীকায় পাথর চোখ—
অথবা—
শরীরের রক্তিম উৎসের মত লাল ঠোঁট
আমি স্বপ্নে দেখি।

লাশ

তপন কুমার দাশগুপ্ত

যেন কলিকের যুগ থেকে বসে আছি
একটি মড়া আগলে বসে আছি।

মড়া? একি শুধু লাশ? শুধু লাশ?
আর কিছু না? ছিল না কখন?
কুলগোত্র ছিল এককালে,
হয়ত অমুক কিংবা তমুকবাবু
আফিসের কেরাণী কিংবা বড়বাবু
অথবা পাড়া জ্বালানো কোন মস্তান
কিংবা ভাবী কোন পাবলো নেরুদা
কিংবা নেহাৎই কোন আলুর কারবারী
অথবা বেচারা স্কুল মাষ্টার।

আর আজ। হায় লাশ—
আজ শুধু তুমি লাশ।

শুধু লাশ?
আর কিছু না? ছিল না কখন?
কুলগোত্র ছিল এককালে,
হয়ত সীজারের মত কোন উচ্চাভিলাষী
সাগরে নগরে তুফান তুলিত সে;
জুলিয়াস ফুচিকের মত দুঃসাহসী
সত্য বাকা খড়্গের মত ঝলসাত যার কলমে;
কিংবা কোন Godo—লক্ষকোটি বছর ধরে
মানুষ যার প্রতীক্ষায় ক্লান্ত প্রহর গোণে।

আমার হৃদয় আজ লাশ
শুধু লাশ
আর কিছু নয়; আর কিছু না;
কিছু না।

প্রেম প্রীতি ও মৈত্রীর সন্ধানে ভারতবর্ষ

হেনা চৌধুরী

১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর—বিশ্বের বুকে জন্মনিল এক নতুন জাতি—স্বাধীনজাতি! আর পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিল এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র—বাংলাদেশ।

পূর্ববঙ্গবাসীর হৃদয়ের বাঁধনহারা আনন্দ উৎসবের বাণী বহন করে সে তিথিতে পদ্মা নদীর জল যে উচ্ছ্বাস কলকল রবে বয়ে চলেছিল তা আমি দেখিনি—কিন্তু দেখেছি এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে একটি স্বাধীন দেশের জন্মক্ষণে ধনী নির্ধন সকলের মুখের প্রসন্নছবি। শুনেছি তাদের প্রাণখোলা হাসি আর আনন্দের রব।

ভিটেমাটিহারা মানুষগুলি আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে যে দেশ থেকে একদিন তারা ইয়াহিয়া খাঁনের সৈন্যদের বর্বরতায় ও অত্যাচারে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষে—নিজের জীবনে সহস্র সমস্যা তবুও ভারতবর্ষ অতিথিকে ফেরায়নি—বন্ধুর মত বাড়িয়ে দিয়েছে হাত—মায়ের স্নেহ যত্ন দিয়ে ঘিরে রেখেছে এই সবহারা মানুষগুলিকে। যারা শুধু প্রাণের দাবিতে এসে পৌঁছেছিল সীমান্ত পেরিয়ে। এই মানুষগুলির অন্তরের দাবীকে উপেক্ষা করতে পারেনি ভারতবর্ষ। আর করবেই বা কেমন করে? ভারতবর্ষের ইতিহাস যে যুগ-যুগান্তর ধরে রেখে গেছে পৃথিবীর মানবতার কাছে এই প্রেম প্রীতি ও মৈত্রীর স্বাক্ষর। তাই তো আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

শক হুণ দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে আজ আনে উপহার
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে
যাবেনা ফিরে এই ভারতের
মহাভারতের সাগর তীরে।

তা না হলে যে মুসলমানের জন্য পাকিস্তানের সূচনা—সেই মুসলমানরাও তো আসলে আমাদের স্বদেশবাসী তথা ভারতীয় নন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে মুসলমানরা আসলে ভারতীয় নন, তাঁরা হচ্ছেন আগন্তুক! ভারতবর্ষের অপূর্ব রত্ন ভাণ্ডারে প্রলোভিত হয়ে একদিন যেমন ছুটে এসেছিল পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা তেমনি দেশ জয়ের বাসনা নিয়ে মুসলমানরাও এসেছিলেন সোনার দেশ ভারতবর্ষে। কালক্রমে দেশজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার করে ভারতবর্ষের মাটিতে জন্ম নিল দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমান। এদের ধর্ম আচার, ব্যবহার ও মানবিকতায় যে ভেদনীতি তারই সুযোগ নিয়ে চতুর ইংরেজ devide and rule policy কে ধীরে ধীরে কার্য্যকরী করে তুলল। স্বাধীনতার পূর্বে জিন্না সাহেবের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হল আমরা আলাদা রাষ্ট্র চাই।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট—বহুশতাব্দীর পরাধীনতার বেদনার শৃঙ্খল খসে পড়ল ভারতমাতার কণ্ঠ হতে কিন্তু সত্যি কি মুক্ত হয়েছিল এই পূর্ববাংলার মানুষেরা। মুসলমান সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিয়ে গড়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তান। শুধুই পশ্চিম পাকিস্তানের সুখ আর বিলাসিতার মদত জোগাবার এক রাষ্ট্র। স্বাধীন জাতির যে অধিকার তার কিছুইতো পেলনা এই মানুষগুলি। শতাব্দীর পর শতাব্দী যেন শুধু চরম অভিশাপ আর পরম দুঃস্বপ্ন নিয়ে কেটে গেল তাদের জীবনের যন্ত্রণাময় প্রহরগুলো। যে শিশু জন্মেছিল ১৯৪৭ সালের পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে—যে এই ২৫ বছরে হল তরুণ—বিশ্বের সমস্ত অগ্রগামী দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—কোথায় আমাদের স্বাধীনতা! কোথায় আমাদের মানুষের মত বাঁচবার অধিকার। এক প্রভুর অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়ে হয়েছি আমরা শুধু আর এক প্রভুর অধীন! জিন্না, লিয়াকতআলী, আয়ুব, ইয়াহিয়া এরাই তো আমাদের ভাগ্যবিধাতা! আমাদের সম্পদ ওরা নিঃশেষে শোষণ করে নিয়ে যায়।

নাঃ এমন করে আর চলবেনা। আমাদের দিতে হবে বাঁচার অধিকার! মানুষের মত করে বাঁচার অধিকার। গর্জে উঠলেন আওয়ামী-লীগ নেতা মুজিবর রহমান। জনাকীর্ণ ঢাকার রমনার-ময়দানে তিনি দেশও জাতির উদ্দেশ্যে রেখে গেলেন স্মরণীয় অভিভাষণ। যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর পূর্বসূরী ভারত পথিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রর কথা। যিনি দেশবাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা

দেবো। মুজিবর বললেন এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম। এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম—ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

তারপর সংগ্রামের আহ্বায়ক নেতা হলেন বন্দী—কিন্তু তাঁর এই আহ্বানকে প্রতিটি মানুষ গ্রহণ করল অন্তরের সংগে। ইয়াহিয়া যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৯ মাস শুধুমাত্র মনোবলকে সম্বল করে লড়াই করে গেছে মুক্তিযোদ্ধারা। ভারত তাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছে—দিয়েছে আশা ও বিশ্বাস। এই মানুষগুলিও হারিয়েছে সবই কিন্তু হারায়নি শুধু আত্মবিশ্বাস। নির্মম শত্রুর অত্যাচারে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে—স্বামীর চোখে জ্বলে উঠেছে প্রতিহিংসার আগুন।

মৃত স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছে—আজ আমি পারলামনা কিন্তু স্বাধীন বাংলা দেশের মানুষরা একদিন তোমার রক্তের শোধ নেবে!

স্বামীর সে স্বপ্নকে সার্থক করে গড়ে তুলতে বিশ্বের কাছে এক নতুন রাষ্ট্র ও জাতি—আর তার স্বাধীনতার ইতিহাস ভারতবর্ষ যে প্রেম, প্রীতি ও মৈত্রীর স্বাক্ষর রেখে গেল তা সমগ্র বিশ্বের মানবতার ইতিহাসে অভিনব।

আমেরিকা ও চীনের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি হাত মিলিয়েছে পাকিস্তানের সংগে! সেলাক ক্ষতি নেই! বাংলাদেশের জন্য আছে ভারতবর্ষ! সে ভোলেনি তার অতীত ইতিহাস, ভোলেনি গঙ্গা পদ্মা ও মেঘনা নদীর ত্রিবেনী সংগমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারাকে! শস্য শ্যামল, সুজলা, সুফলা বাংলাদেশের যে ছবি যুগে যুগে এঁকেছেন আমাদের কবিরা—সে রূপ তো পূর্ববাঙ্গালীর। পদ্মার বুকের ভাটিয়ালী গানের দিনের স্মৃতি যে আজও পূর্ববাঙ্গালী প্রাচীন মানুষের স্মৃতিতে ভাস্বর।

কত মহা মণীষীরা জন্মাল এর কোলে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছেন, আমি নিজেকে পূর্ববাঙ্গালী বলিতে গর্ব অনুভব করি। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, এ দেশের মানুষের উদার প্রাণ ও সরলতা আমাকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্র সাহিত্যে পদ্মানদী তো এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই বাংলাকেই আধুনিক কবি জীবনানন্দ বলেছেন রূপসী বাংলা!

চতুর ইংরেজের বিভেদের ছুরিকা এই মানুষগুলিকে বাইরে থেকেই বিভক্ত করেছিল—কিন্তু ফাটল ধরাতে পারেনি মনের পাতায়! তাই ভ্রাতৃসম বন্ধুর বিপদের দিনে ভারতবাসী তার আভ্যন্তরীন বিবাদ ভুলে সর্বশক্তি নিয়োগ করল এই মুক্তি সংগ্রামে! নিজেদের আশা আকাঙ্খাকে মিলিয়ে দিল এই

মানুষগুলির সংগে ! কোন লোভ কোন স্বার্থ নিয়ে ভারতীয় মুক্তি বাহিনী এ সংগ্রামে সাহায্য করে নি ! ভারতবর্ষ চেয়েছিল শুধু এই জাতিকে স্বাধীন জাতি হিসাবে মানবতার অধিকার দিতে ! শুধু একান্ত বন্ধু ও শুভার্থীরূপে তাঁদের স্বপ্ন সফলের সহায় হতে ! আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বারবার বলেছেন "অন্য রাজ্যের উপর আমাদের কোন লোভ নেই।" নিঃস্বার্থভাবে একটা জাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার স্বাধীনতা—তাই আজ সারা দেশের আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ভারত-বাংলা জিন্দাবাদের জয়ধ্বনি। এ বন্ধুত্ব দীর্ঘ স্থায়ী হোক।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন বেদ—শ্রীমতী হেনা চৌধুরী। প্রকাশক:—আলফাবিটা পাবলিকেশনস্ ৫৫।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: দশ টাকা।

শ্রীমতী হেনা চৌধুরী লেখিকা হিসাবে নবীনা। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমরা তার প্রবন্ধ-ফিচার-রম্য রচনা প্রভৃতি পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি। সম্প্রতি তিনি দেশবন্ধুর জীবন সামগ্রী নিয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে সুধীজনের সপ্রশংসনীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দেশবন্ধুর সমগ্র জীবনের ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ নেই বটে তবে বহু মূল্যবান তথ্য সম্বলিত ঘটনাসমূহের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়ে গ্রন্থটিকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। আমরা অর্থাৎ এই দশকের বুদ্ধিজীবি যুব সম্প্রদায় যখন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও মার্কসীয় চিন্তাধারার আলোকে নিজেদের অস্তিত্বকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেব র কাজে ভীষণভাবে ব্যস্ত তখন এই যুব সমাজেরই একজন হয়ে—শ্রীমতী চৌধুরী —মানবজাতির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত দেশবন্ধুর জীবনালেখ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে ফেলে আসা সেই জাতীয় আন্দোলনের দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দেশবন্ধুর কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র ঘটনা সম্পর্কে এ যুগের যুব সমাজ অনেক কিছুই জানেন না, বিশেষ করে তাঁর সাহিত্য ও কবি জীবন সম্পর্কে। তাই মানুষ হিসাবে, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে, সাহিত্যিক-কবি হিসাবে দেশবন্ধুর একটি সামগ্রিক পরিচয় লেখিকা এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ হলো চিরাচরিত ভূমিকার পরিবর্তে এতে স্থান পেয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি পত্র। পত্র নির্বাচনে লেখিকার যোগ্যতার তারিফ না করে পারছি না। তা ছাড়া সর্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সামান্য কয়েক লাইনের পত্রটিও গ্রন্থটির মূল্যবৃদ্ধি করেছে শতগুণে। এমন একটি প্রামানিক দলিলসম গ্রন্থে বেশ কিছু শব্দের বানান ভুল (নিশ্চয়ই ছাপাখানার ব্যাপার) দেখে বেদনা অনুভব করছি। তবে—সহজ ও সরল ভাষায় এমন একজন মহাপুরুষের জীবন বেদ রচনায় লেখিকার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সংযমবোধের পরিচয় পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছি—তাই তাকে ধন্যবাদ জানাই। বাঁধাই মোটামুটি; সাদা বর্ডারযুক্ত কমলা-লেবু রঙের প্রচ্ছদপটটি সুরুচির স্পর্শে ভরা।

জয়তু শ্লোক তব

অবশেষে অনেক ত্যাগ, অনেক রক্ত দানের পর ওপার বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষের বহুদিনের আশা আকাঙ্খা বাস্তবে রূপ নিল। সোনার বাংলা স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার এই শুভলগ্নে আমরা এপার বাংলার বুদ্ধিজীবিগণ বিনম্র চিত্তে আমাদের প্রণাম রাখছি বীর শহীদদের স্মৃতিবাসরে। অভিনন্দন জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সকলকে। গর্ববোধ করছি নিজেদের ওপার বাংলার মানুষের এক অংশ হিসেবে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের গঠনমূলক ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাঁরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদূর এগিয়েছেন; বীর সৈনিকের মত সেখানকার প্রতিটি মানুষ সাহসে অটল, ব্যক্তিত্বে প্রখর, বুদ্ধিতে তেজদৃপ্ত, কণ্ঠে শান্তি মৈত্রী ও প্রগতির বাণী। এদের পরাজয় নেই। জয় ওদের হবেই হবে, সে জয় শুধুমাত্র পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনেই নয়—সে জয় শুধুমাত্র বিদেশী খানসেনাদের পাশবিক মত্ততার বিরুদ্ধেই নয়—সে জয় বিশ্বমানবতার জয়। আর এই জয়ের সূত্রধরেই নতুন করে গড়ে উঠুক দুইবাংলার মানুষের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতির বন্ধন—প্রীতির সম্পর্ক—ভাই ভাইয়ের আত্মিক যোগ। বিনিময় হোক চিন্তার, ধ্যান ধারণার।

ছন্দিতার আগামী সংখ্যায়

বাংলা নাট্যমঞ্চের

শতবর্ষ উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ

বাংলা সামাজিক নাটক (প্রসংগে)

প্রথম যুগ ঃ

রাধারমণ দে।

—এছাড়া—

মীরা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ জনতা

ও

গল্প, কবিতা, পুস্তক সমালোচনা
প্রভৃতি

সুন্দরের পূজারী নারী

হেনা চৌধুরী

পৃথিবীকে যদি একটি রম্য কাননের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে নারী তার পুষ্প — এ উপমা যে ভৌগলিকের দেশভেদে প্রযোজ্য তা নয়—পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের নারী সমাজের পক্ষেই এ উক্তি সমানভাবে প্রযোজ্য। দেশে দেশে মানুষের সংসার কি নারীর কল্যাণী হাতের স্পর্শ না পেলে এমন শ্রীময়ী থাকতো! পুরুষ তো চিরকালের আগোছাল! বিয়ের সময় বাসরে একটি খেলা দেখি চালখেলা — বউ হাত দিয়ে গোছানো চালকে যতদূর ইচ্ছে ছিটিয়ে দেয় আর স্বামী তা নিতান্ত লক্ষ্মীছেলের মত অতি সযতনে গোছ করে থাকেন। এই খেলাটি দেখলেই আমার মনে প্রশ্ন জাগত — খেলার পদ্ধতিটা হওয়া উচিত ছিল উলটো! কারণ সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখার দায়িত্বটা চিরকালই মেয়েদের। তবে আমি বলছিনা যে পুরুষ মানেই অগোছাল; ২।১ জনকে দেখেছি এ কাজে তারা মেয়েদের চেয়েও নিপুণ! তবে সেটা তারা দায়িত্ব বোধে করেনা করে নেহাৎই খেয়ালখুশী মত কিংবা বউকে পটের বিবি করে মাথায় তুলে রাখবার জন্য। অবশ্য আমার মনে হয় মেয়েলি গুণপনা সম্পন্ন পুরুষমানুষ কোন সপ্রতিভ মেয়েই পছন্দ করেনা। যদিও আধুনিক যুগে সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকুরী করার জন্য এবং পরিবারে অন্যলোক না থাকায় এই সহযোগিতার যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক যুগের একজন শিক্ষিতা মেয়ের সংসারে সাধারণতঃ আমরা পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্য্যবোধ আশা করতে পারি। কারণ শিক্ষা মানে তো পুঁথিগত কতগুলো theory মুখস্থ করা নয় — শিক্ষা মানে হচ্ছে মন ও রুচীর উন্নতি ঘটিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি সমন্বয় সৃষ্টি করা। আধুনিক যুগের নারীরা প্রগতির ফলে পেয়েছে উদার জীবনের সন্ধান — প্রগতির এই আলো যে কেবল তার দেহ ও মন এবং সাজ সজ্জার ওপরই ছায়া ফেলবে তা নয় — সংসার জীবনকেও যদি উন্নত না করতে পারে, জীবনের

সব গ্লানি অভাব অভিযোগ দূর করে দিয়ে যদি না পারে প্রতিদিন সুস্থভাবে বাঁচার প্রতিশ্রুতি তবে সেই প্রগতির মূল্য কোথায়? জীবনটা একটা নিয়মগত পাপক্ষয় নয় 'life is an art' একথাটা মনে রাখলেই পেতে পারেন সুন্দর একটি সুশৃঙ্খলিত জীবন!

কিন্তু একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি যে উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালী মেয়েদের অনেকক্ষেত্রে রুচীবোধ গড়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল একদিন এক বান্ধবীর বাড়ী গেছি — দেখি শোয়ার ঘরে রয়েছে এক ঝুড়ি কাঠ, ঘরে দড়ি খাটিয়ে জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বুঝতেই পারেন এই নিদারুণ পরিবেশে আমার মনের অবস্থা। সোজাসুজিই আমি ওকে আক্রমণ করলাম—তোর কি একটুও সৌন্দর্য্য বোধ নেই!

উত্তরে ওর তীব্র প্রতিবাদ কি করবো আমরা তো আর তোর মত বড়লোক নই!

সংসারে যেন বড়লোকদেরই আছে বাঁচার অধিকার আর এই মধ্যবিত্ত সমাজ—বাঁচতে ভুলে গেছে বলেই প্রতিদিনের সভা সমিতিতে তাদের সোচ্চার দাবীতে রয়েছে বাঁচার দাবী। কিন্তু মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তার মন তার রুচী ও তার শিল্পবোধ — দরিদ্র হলেও মানুষের মত করে বাঁচা যায় যদি আপনি সুন্দরের পুজারী হন।

খাওয়া, ঘুম আর যৌনজীবন যাপনের মধ্যে যে জীবনের ইতিহাস শেষ হয়ে যায় তাতো পশুরজীবন — আর এই জীবন যাপনের জন্যই কোনরকমভাবে একখানি ঘরের প্রয়োজন একথা ভাবা খুবই ভুল। গৃহ মানে আশ্রয়—যে আশ্রয় শুধু দৈহিক নয় মানসিকও — সারাদিনকর্ম ক্লান্ত দিনের শেষে মানুষ যখন গৃহে ফেরে সে চায় একটু আরাম, একটু বিশ্রাম এবং কল্যাণী হস্তের পরিচর্য্যা! আপনি যদি সুন্দরের উপাসক হন শিক্ষার সঙ্গে যদি আপনার উন্নত রুচীবোধ থাকে তবে আপনি গৃহ যেমনই হোক না কেন সেখানে রেখে যেতে পারবেন আপনার রুচীর ছাপ। মনে রাখবেন উন্নত রুচী থাকলে খুব কম পয়সাতেও একটি মনোরম গৃহ গড়ে তোলা যায়।

ধরুণ সত্যিই আপনার দামী আসবাব কেনার মত পয়সা নেই। নাই বা থাকল! আসুন না দেখি সামান্যখরচে কেমন করে গৃহকে

মনোরম করে তোলা যায়। ঘর যেমনই হোক তাতে দরজা, জানলা নিশ্চয় আছে—আপনার সাধ্যে কুলালে সস্তাদামের নীল, খয়েরী বা হলুদ রং এর পর্দা দিন। আর যদি সেই পর্দার কাপড়ও না কিনতে পারেন —তবে হালকা রং এর ওপর চাপা শাড়ী দিয়ে পর্দা দিতে পারেন। চেয়ার, সোফা আপনার নাই তা থাকল —ঘরের লম্বা দিকে একটা চৌকি পাতুন। চৌকিতে একটি তোষক পেতে তারপর যতটা সম্ভব পর্দার সঙ্গে মিলিয়ে একটা সুন্দর নক্সা করা বেডকভার পেতে দিন। আর তা না হলে কাপড়ে মুড়ে দিয়ে তলায় কুচিদিয়ে ঝালর ঝুলিয়ে নেবেন। বেশ দেখাবে। শান্তিনিকেতনী-মোড়া গদী আঁটা দুটো রাখুন—মাঝখানে একটা মাঝারী সাইজের টেবিলে হাতেকাজ করা কিংবা আজকাল যে কেবরিক প্রিন্ট বেরিয়েছে তার একটা টেবিল ক্লথ পাতুন। টেবিলের মাঝে আপনার সংগ্রহে যেমন থাকে একটা এ্যাসট্রে রাখুন—আর মাঝখানে একটা ফুলদানী —আজকাল ২/৩ টাকায় বেশ সুন্দর ফুলদানী পাওয়া যায়। ফুলদানীতে ঋতু, রুচী ও আপনার সামর্থ অনুযায়ী দুটি অন্তত ফুল রাখুন—ফুল যদি না রাখা সম্ভব হয় তবে একটি পাত্রে মাটি দিয়ে মানিপ্ল্যান্ট বা যে কোন জাতীয় লতা রাখতে পারেন। ফুল ছাড়া ঘর শোভাহীন দেখায় আবার সামান্য একটু ফুলের ছোঁয়াচেই অতি সাধারণ পরিবেশও অপরূপ হয়ে উঠতে পারে। যে কোন শিক্ষিত পরিবারেই কিছু বই থাকে। ঘরে যদি তাক বা দেয়াল আলমারী থাকে তবে বই রাখবার সুবিধে হয়। বই সাজাবারও একটা রীতি আছে-যেমন জীবনানন্দের পর যদি রবীন্দ্র রচনাবলী রাখেন তবে তা দৃষ্টিকটু লাগবে যে কোন সাহিত্যিকের কাছে। বইগুলো যদি বহাল তবিয়তে থাকে তবে মলাট না দিলেই ভাল দেখায় —আর তার বহিঃসৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গেলে মলাট দিয়ে ওপরে সুন্দর করে বই এর নাম ও লেখকের নাম লিখে রাখুন। সাধারণ একটা র‍্যাক বা সেলফ—ঘরের এক পাশে রাখুন তাতে সস্তায় সুরুচী পূর্ণ কয়েকটি পুতুল রাখুন। প্রত্যেক বছরই রথের মেলায় দেখবেন দামী পুতুল যেমন পাওয়া যায় তেমনি সস্তায়ও বেশ সুন্দর সুন্দর পুতুল বিক্রী হয়। এমনি কয়েকটি পুতুল দিয়ে র‍্যাকটি সাজান। প্রত্যেকবারই যদি ২/৩ টাকার পুতুল কেনেন তাহলে পুরনো পুতুলগুলো সরিয়ে ফেলতে পারতেন। কারণ একই পুতুল ক্রমাগত দেখতে দেখতে বড় একঘেয়েমী আনে। তাছাড়া

বাল্যাবেশের উপহারের টুকিটাকিও সাজিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু please একসেট কাপডিস সাজিয়ে রাখবেন না। র‌্যাকের ওপরে একটা ফুলদানী রাখুন আর ঠিক তার পাশের দেওয়ালে আপনার ভাল লাগা বা আদর্শ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র কিংবা আর কারুর একটা ছবি রাখুন। ঘরের মেঝেটা বড় ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে না! সেখানে সুদৃশ্য একটা সতরঞ্চি কারপেটের মত করে পেতে দিন। আর তা যদি না থাকে তবে ঘর পরিষ্কার হয়ে যাবার পর সামান্য একটু আলপনা দিয়ে দিন। ঘরের আলোটা নীল বা সবুজ রং এর লাগান। এবার দেখুন তো আপনার সেই দৈন্যদশার ভরা ঘরটিকে আপনি নিজেই চিনতে পারছেন কিনা! কিন্তু এরজন্য আপনাকে ১০০ টাকাও খরচা করতে হয়নি। বসার ঘরের মত শোবার ঘরটিও যতটা সম্ভব স্নিগ্ধ রাখুন। বিছানার জিনিষ সম্ভব হলে সাদা ব্যবহার করুণ! শোবার ঘরের পর্দাও সাদা হলে ভাল। শোয়ার ঘরে লতা পাতার চেয়ে ২/৪ টি ফুলই রাখবেন। সব জিনিষ গুছিয়ে রাখবেন সুদৃশ্য ও পরিপাটী করে।

খাবার জায়গা সব সময় পরিষ্কার রাখবেন। আর্থিক সামর্থে কুলোলে যত সস্তাদরের সম্ভব একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার রাখুন। টেবিলে একটি প্লাষ্টিকের ঢাকা পেতে দিন। এতে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য এবং কাজকর্মে বড় সুবিধে। কাচের বাসনের দাম বেশী নয়। তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে একটু যত্ন করে ব্যবহার করলে কাচের বাসনই খাবার বাসন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। তবে এর পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। অনেক বাড়ীতে গেলে দেখেছি এমন নোংরা কাপে চা দেয় যে বাধ্য হয়েই বলতে হয় এইমাত্র খেয়ে এসেছি।

এমন একটি সুন্দর সংসারে আপনি নিজেও অতি সস্তাদরের শাড়ী ব্লাউজ একটু রুচীবোধের সংগে পরে থাকুন। সামান্য একটু প্রসাধন করুন। তারপর বাড়ীতে অতিথি এলে চা আর সামান্য তেলে ভাজা দিয়েই তাকে আপ্যায়ণ করুন। তার সংগে গল্প করুন। হাসুন—আলোচনায় মুখর হয়ে উঠুন।—বান্ধবী হয়তো এসেছে বিরাট গাড়ী হাকিয়ে কিন্তু যাবার সময় তার মন যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠবে—সুমিতা সত্যিই তুই কি সুখীরে! অথচ আমার সব থেকেও কিছু নেই।

সারাদিন ক্লাব আর পার্টি করে নিজেকে ভুলিয়ে রাখি।

কেন একটু সংসারে মন দে!

আমার দ্বারা ভাই ওসব হবে না।

তাহলে আর কি বলবো তোকে?

সুমিতা একমিনিট ভেবে নিয়ে বলে—জানি ভাই পৃথিবীটা আমাদের ক্ষণিকের বাসস্থান। সেক্সপীয়রের সেই স্মরণীয় উক্তিটা মনে পড়ে গেল "All the world is a stage and we men and women are only players"

চলে তো ভাই একদিন যেতেই হবে—কিন্তু পশ্চাতে রেখে যাবো আমার মনুষ্যত্ব আর ব্যক্তিত্বের ছাপ। তোর মতো উদার পরিসর—আমার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ—তবু তারমধ্যে সাধ্যমত যতটুকু পারি করতে চেষ্টা করি।

শুধু ঘর সংসার নয়—খাবার দাবারের ক্ষেত্রেও মুখরোচকের চেয়ে পুষ্টির দিকে আমার নজর বেশী। তাই আমার বাড়ীতে অসুখ বিসুখও নেই।

অনিতা—জানিস ভাই সুমিতা—ধন নয় মান নয় এই একটুকু বাসার স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম—বাঁচতে চেয়েছিলাম আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মত। কিন্তু আমাদের এই অতি আধুনিক সমাজ আমাকে বাঁচতে দিল না। মদ ছাড়া আমার চলে না—স্বামী বাড়ী না ফিরলেও কিছু এসে যায় না। শনিবার রেসের মাঠে না গিয়ে আমি থাকতে পারি না—সর্বনাশের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছি আমি—কথা শেষ হয় না দুচোখ বেয়ে নামে জলের ধারা। দুইমেরু প্রান্তের দুটি নারী নীরব ও পাথর হয়ে বসে আছে—একজনের কিছু নেই তবু সব পাওয়ার আনন্দে মন তার প্রজাপতির পাখা আর একজন—সব আছে তবু শূন্য অন্তর নিয়ে আধুনিক সভ্যতার দরজায় মাথাখুঁড়ে মরছে—তার কাকুতি শুধু বাঁচার।

গিরগিটি

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবারের ঢুলুঢুলু রাত। বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ চলছে। আকাশে চাঁদ নেই, শুধু সাদা খইয়ের মত কিছু তারা সারা আকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাতে রাতের অন্ধকারের তারতম্য ঘটেনি, বরং কিছুটা নিবিড় হয়েছে মনে হয়। তবু রাতের পার্ক ষ্ট্রিট নিয়ন লাইটের ঝকঝকে আলোয় ঝলমল করছে। পার্ক হোটেলের উল্টোদিকের ফুটপাত থেকে অনেকক্ষণ ধরে একটা ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টা করছিল সন্দীপন। শরীরটা একটু অবশ, পায়ে ঠিকমত জোর পাচ্ছে না এখন।

আজ সন্ধ্যে থেকে এই রাত সাড়ে আটটা ন'টা অবধি 'মূলা রুজে' বসে একটু গলা ভেজাচ্ছিল সন্দীপন। খাঁটি স্কচ হুইস্কি। অবশ্যই নিজের পয়সায় নয়। সেই লোকটা ঠনঠনিয়া নাকি চনচনিয়া —কি যেন নাম—ওরই পয়সায়। এই প্রথম নয়। যখনই সুবিধে-মত দাঁও মারতে পারে, অন্যের পয়সায় আকছার মালটাল খেয়ে থাকে সন্দীপন। সন্দীপনের মতে এতে দোষের কিছু নেই। রাজ্যি সুদ্ধ লোক এই করে খাচ্ছে, তবে এই বা ব্যতিক্রম হবে কেন! আজকাল মাল টানায় সন্দীপন রীতিমত ভেটেরান। একনাগাড়ে ছ' পেগ টেনেও বেহেড হয় না, শরীরটা সামান্য অবশ হয় মাত্র।

চনচনিয়া—লোকটা ওর কাছে অনেক দিক থেকে ঋণী, সেই ঋণেরই সামান্য কিছুটা শোধ করছিল মূলারুজে। লোকটা হলদে দাঁত বের করে আরো অনেক কিছু অফার করছিল, কিন্তু সন্দীপন প্রত্যাখ্যান করেছে। ওতে অনেক ঝামেলা। তাই আজকাল মাল ছাড়া অন্য ব্যাপারে ওর বিশেষ আগ্রহ নেই। সব কটা পার্টিকেই আজকাল এই কথাটাই বুঝিয়ে থাকে ও। চনচনিয়া য়্যাণ্ড কোম্পানীর ইনকাম ট্যাক্সের খাতায় কিসব গণ্ডগোল ছিল, সন্দীপনই সেসব ঠিক করে দিয়েছে। অবশ্যই নিঃস্বার্থে নয়। দু পক্ষই বেশ খুসী। লোকটারও বেশ মোটা টাকা বাঁচল, এদিকে সন্দীপনের পকেটেও বেশ কয়েক

হাজার উপরি এল। না' হলে ইনকাম ট্যাক্সের সবচেয়ে নীচুতলার অফিসারের পক্ষে নিজের পয়সায় রোজ রোজ স্কচ হুইস্কি গেলা চলে না। নাঃ, এজন্ত সন্দীপনের কোন অনুশোচনা নেই, সমাজের পাপ এই ঠনঠনিয়া-চনচনিয়াকে যতটা পারা যায় নিংড়ে নেওয়াই ভালো। শালারা এক একটা চীজ, বাস্তু ঘুঘু। সন্দীপন ঠোঁট দিয়ে চুকচুক শব্দ করল। —হ্যাই, ট্যাক্সি—সন্দীপন টলতে টলতে এগিয়ে গেল খানিকটা। ওর কপালে বিরক্তির কতগুলি অমসৃণ উঁচুনীচু ভাঁজ। পকেটে এখন অনেক টাকা, দশ দশটা কড়কড়ে একশ' টাকার নোট। তা'ছাড়া খুচরো-খাঁচরাও কম নেই। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সন্দীপন। না, টাকাগুলো সব ঠিকঠাক আছে। এখনো পর্যন্ত খোয়া যায় নি। এঅঞ্চলটা আজকাল ছিনতাই পার্টিতে ভরে গেছে। একটু বেসামাল, নেশুড়ে লোক পেলে তো কথাই নেই।

নভেম্বরের শেষ, শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, ময়দানের দিক থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। মাথাটা ঝিম ধরে আছে অনেকক্ষণ। ময়দানের ঠাণ্ডা হাওয়াটা এসময় বেশ ভালো, নেশার ভাবটা যেন অল্প অল্প কেটে যাচ্ছে।

পরপর অনেকগুলি ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল হুস হুস করে। কিন্তু কোনটা'ই খালি নয়, জোড়ায় জোড়ায় চলেছে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন চরিত্রের মেয়ে পুরুষ।

দূর! আজকাল দেখছি সব শালারই বেশ পয়সা হয়েছে। মদের বোতলের মত সন্দীপনের মুখটা আঁকাবাকা হয়ে ওঠে। এদিকটায় ট্যাক্সি খালি পাবার আশা কম দেখে চৌরঙ্গীর দিকে এগোল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর এখন খানিকটা স্বাভাবিক, চলতে কষ্ট হচ্ছে না বিশেষ। পার্ক ষ্ট্রিটের মোড়ে গান্ধীর ষ্ট্যাচু, ও দিকে তাকিয়ে জুতার মধ্যে পেরেকের মত সন্দীপনের বুকের কাছটায় খচখচ করে উঠল। দূর ছাই, এসব সস্তা সেন্টিমেন্টের কোন মানে হয় না। লাল হলুদ আলো লাগানো হরেক রকমের বিলাসী গাড়ীর স্রোত চলেছে রাস্তা দিয়ে। সন্দীপনের মনের গভীরে বেশ খানিকটা আফশোষ। কলকাতায় থেকে নিজের একটা গাড়ী না রাখতে পারলে সুখ নেই, প্রেসটিজ নেই। কিন্তু শালা, গাড়ী এখন একটা কিনলেই হিংসুক লোকগুলোর 'চোখ' টাটাবে, সি. বি. আইয়ের কেউ লাগবে। অবশ্য ওদের ঠাণ্ডা করবার মন্ত্র সন্দীপনের হাতের মুঠোয়। তবু শালা, বাড়তি ঝামেলা আর ভালো লাগে না উন্নত

চিন্তাগুলিকে ঝুড়িতে পাপ চাপা দেবার মত দু'নিয়ে আপাততঃ ট্যাক্সির জন্য এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

ঐ—ঐতো, একটা ট্যাক্সি—প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে সন্দীপন। কিন্তু ট্যাক্সিকে চেঁচিয়ে ডাকবার আগেই একটা ভিখিরী-ঠিক ভিখিরী নয়—গোঁছের লোক সন্দীপনের দৃষ্টিতে আড়াল করে দাঁড়াল।

বাবু—লোকটা মিনমিন করে হাত কচলাতে থাকে।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে সন্দীপন লোকটার দিকে তাকিয়ে। এই লোকটার জন্যই ট্যাক্সিটা ডাকা হল না। সন্দীপনের কণ্ঠ বেশ ঝাঁঝালো, কি, কি চাই তোমার। ভাগো হিঁয়াসে। হুইস্কির কড়া গন্ধে চারদিক ভরে উঠল। সন্দীপনের কড়া ধমকেও লোকটার ভঙ্গীর কোন পরিবর্ত্তন নেই। তখনও লোকটা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য্য! এখনো ইনিয়ে বিনিয়ে টেপ রেকর্ডারের মত কি যেন বলে চলেছে। সন্দীপন এবার তাকিয়ে দেখল, গায়ের রং ফরসা, কাঠামো মজবুত, গালে অন্ততঃ দিন সাতেকের না কামানো দাড়ি। তেলের অভাবে চুল উসকো খুসকো, জট পাকানো। এসব ভিখিরী লোকদের সন্দীপন সহ্য করতে পারে না একদম। লোকগুলি অপদার্থ, শালা গায়ে জোর আছে, নিজের ঠ্যাংয়ে দাঁড়িয়ে খাগে যা।

ধমকে উঠল সন্দীপন, লজ্জা করে না ভিক্ষে করতে। এমন জোয়ান চেহারা। কাজ করে খাও।

—না, বাবু আমি ভিখিরী না—লোকটার আত্মসম্মান হঠাৎ যেন চাগিয়ে উঠল।

—হাত পেতে ভিক্ষে করছ, ভিখিরী নও তো কি? আলবৎ ভিখিরী।

—বাবু, ফ্যাক্টরী লক আউট আজ একমাস। দু'টো বাচ্চা—তা, আমি করবটা কি? তোমার ফ্যাক্টরী তো আর আমি লক আউট করি নি। যাও, যাও, এখানে কিছু হবে না। অর্থ সাহায্যের ব্যাপারটা এসে পড়ায় সন্দীপনের গলার স্বরে অতিরিক্ত খানিকটা রুক্ষতা। ও আবার রাস্তার দিকে তাকালো ট্যাক্সির আশায়। —বাবু, আমায় অন্ততঃ কিছু সাহায্য করুন। যা পারেন, সামান্য দশ, বিশ, কিছু অন্ততঃ দিন।

সন্দীপন লোকটার দিকে তাকাচ্ছিল না, ভাবছিল কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

—আমার কথা ভাবি না স্যার। বাচ্চা দু'টো সারাদিন না খেয়ে আছে—ওঃ

ভাঁওতা প্যান প্যান শুরু করল তো। ব্যাটারা কোন কাজ করবে না। খালি ফাঁকি, আর কথায় কথায় স্ট্রাইক। নাও বোঝ এবার। কাজকর্মে একটু যদি মনোযোগ থাকে—কথাগুলি কেমন যেন স্বগতোক্তির মত শোনাল।

বুকের কাছটায় আবার খচ করে উঠল। আজ একটু বেশী মাল টানা হয়ে গেছে। মাল টানলেই দেখেছে সন্দীপন, কেমন একটা দুঃখু দুঃখু ভাব জাগে মনে। আর থেকে থেকে বুকের কাছটায় টান পড়ে।

হঠাৎ খুব বিজ্ঞের মত গম্ভীর গলায় সন্দীপন বলল, এমনিভাবে ভিক্ষে না করে কোন কাজকর্ম করতে পার না। ছোটখাট পানবিড়ির দোকান, নয়ত বুটপালিশ। এতলোক খেটে খাচ্ছে, আর তুমি এমন একটা শক্ত সমর্থ জোয়ান লোক—দ্যান না বাবু একটা কাজ। যা বলবেন, কুলিগিরি; তাও করব। বাবু, দ্যান না একটা চাকরী। আমার বাচ্চা দু'টো সারাদিন না খেয়ে আছে। বলতে বলতে মজবুত চেহারার লোকটা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সন্দীপনের সেই মুহূর্তে খুব বিচ্ছিরি লাগল। কোন শক্ত সমর্থ লোকের ভ্যাদভেদে নাকী কান্না একদম বরদাস্ত করতে পারে না। লোকটা তখনো কাঁদছে, হাপুস নয়নে কাঁদছে, দু'চোখে হাত রেখে। সন্দীপন লোকটাকে দেখল, দেখল ওর চওড়া, শক্ত লোমশা কব্জি। আশ্চর্য, এমন একটা শক্ত সমর্থ লোক এমনভাবে কাঁদতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। সন্দীপন স্বগতোক্তির মত বলল, ইডিয়ট, তোমার মরাই উচিত। লোকটা তখনো ইনিয়ে বিনিয়ে পয়সার জন্য, চাকরীর জন্য বলে যাচ্ছে একনাগাড়ে। এবার আর ও দিকে নজর দিল না, একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে চেপে বসল। ট্যাক্সি ছুটল বেহালার দিকে। সন্দীপন কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা পাঁচ নয়া পেয়ে সেটাই ছুড়ে মারল লোকটার দিকে অন্ধকারে।

সন্দীপন ভেবেছিল, এই অকর্মণ্য লোকটার কথা আর ভাববে না। কিন্তু লোকটার শক্ত সমর্থ চেহারা, চওড়া কব্জি, বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। এমন স্বাস্থ্য, অথচ ভিক্ষে করে সংসার চালাচ্ছে। ক'পয়সাই বা জোটে, তা'ছাড়া নিজের আত্মসম্মানের ব্যাপারটাও আছে। অন্যমনস্কভাবে, ঘুমজড়ানো চোখে নিজের ডানহাতটা মুঠো করে শক্তি পরখ করবার চেষ্টা করল। না: কব্জি দু'টো একেবারেই পলকা, জোর বলতে বিশেষ কিছু নেই। ট্যাক্সির ভেতরটা অন্ধকার, তবু আবছা আলোয় নিজের মুখের আদলটা বোঝবার চেষ্টা করল ড্রাইভারের মাথার সামনে লাগানো আয়নায়। বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না,

আর তখন সন্দীপন দেখতে পেল, নিজের তোবড়ানো গাল, [illegible] বুক, নাকটা খাঁড়ার মত উঁচু। না, ওকে সুপুরুষ বলা যায় না কোন মতেই। বরং বেশ খানিকটা আনইম্প্রেসিভ, চোয়াড়ে চেহারা। অথচ ওরই কাছে হাত পাততে হয় কত লোককে—প্রতিদিন কত নানারকম কাজের জন্য। চনচুড়িয়া, পিল সিং, মিঃ গুপ্ত—এমনি কত আর নাম করবে। চমচনিয়ার নাম মনে পড়ায় সন্দীপনের হাতটা আপনা আপনিই কোটের কাছটায় বারকয়েক ঘোরাঘুরি করল। নাঃ টাকাগুলি সব ঠিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন একটা আত্মগর্ব, কিন্তু তবু বুকের কাছে সেই খচখচে ভাবটা। কেমন অদ্ভুত একটা পাপবোধ মনের মধ্যে ঘুণপোকার মত কুরকুর করে মাঝে মাঝে। কিন্তু কেন, ও কি কোন পাপ করছে! ওর ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে, তাই ও রোজগার করছে। এ পৃথিবীতে সকলেরই সুযোগ আছে, কিন্তু অন্যেরা যদি তার সুযোগ না নিতে পারে, তার জন্যে কি ও দায়ী! যাদের ক্ষমতা নেই, তারাই সব ব্যাপারে সুযোগ সুবিধে মত পাপ বা পুণ্যের লেবেল এঁটে দেয়। আবার বিপাকে পড়লে তাদেরই ওই লোকটার মত হাত পেতে ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল সন্দীপন, ট্যাক্সিটা এখন বেহালার কাছাকাছি। —এই যে রোকো, রোকো, এই—এখানে থামিয়ে দাও, ব্যস।

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে জোড়াবটতলার কাছেই নেমে পড়ল। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িতে সময় দেখল, রাত সাড়ে ন'টা। এরই মধ্যে রাস্তা প্রায় জনমানবশূন্য। গোটাকয়েক কুকুর ঘেঁউ ঘেঁউ করছে এদিক ওদিক। রাস্তার ইলেকট্রিক বাতিগুলো নিঃশব্দ রাত্রির নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। চারিদিকে কেমন একটা নিঃঝুম ভাব। এই তো দিনদুয়েক আগেও এখানে কারফিউ ছিল। গণ্ডগোলের ভয়ে স্থানীয় লোকজন যতটা সম্ভব বাড়িতেই থাকছে আজকাল। এখান থেকে সন্দীপনের বাড়ী বেশী দূর নয়, মাত্র মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। একটা পুকুর ও কয়েকটা গলিঘুঁজি পেরিয়ে এই পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে। সন্দীপন ইদানীং ভাবছে, এ পাড়াটা ছেড়ে দিয়ে নিউ আলিপুরের দিকে চলে যাবে। ওর স্ট্যাণ্ডার্ডের লোকের পক্ষে এ পাড়াটা বেশ বিপজ্জনক।

সন্দীপন পাকা পীচের রাস্তা ছেড়ে খোয়া বেছানো রাস্তায় নামল। একটু এগোলেই একটা চৌকো পানা পুকুর। এদিকটা এমনিতেই বেশ নির্জন, তার

উপর বেশ গাছপালা গজিয়ে কেমন একটা ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোষ্টও মাত্র একটা, তাও বাল্বটা দিনকয়েক আগে কারা যেন ঢিল মেরে ভেঙে দিয়েছে। বিজলী বাতির অভাবে এদিকটা বেশ অন্ধকার. কেবল আশেপাশের বাড়ীর জানলা গলে বা পাঁচিল টপকে আলো ছেঁকে এসে পড়েছে, তারই উপর ভরসা। পুকুরের ধারে বলে শীত একটু বেশী, যদিও সন্দীপনের ভালোই লাগছিল, তবু কোটের সব বোতামগুলো এক এক করে আঁটল। কে জানে, বলা যায় না, ঠাণ্ডা লাগতে পারে। এখন জ্বর হলেই মুশকিল, সব ব্যবসা বন্ধ।

হঠাৎ চোখে পড়ল, পুকুরের ওধার থেকে কে একজন আসছে, অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে লোকই বটে, আপাদমস্তক আলোয়ানে ঢাকা। লোকটা এখন সন্দীপনের বেশ কাছে, কিন্তু ও চিনতে পারছে না। নিশ্চয়ই বেপাড়ার লোক, কারণ সন্দীপন পাড়ার প্রায় সব লোককেই চেনে। হয়ত বেড়াতে এসেছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে। লোকটার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে বেশ নিশ্চিন্ত অনুভব করল।

তাই লোকটার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের ভাবনায় মশগুল হল। কাল সকালে অফিসে পৌঁছে প্রথম কাজ, ঢনঢনিয়া এ্যাণ্ড কোম্পানীর কাগজ পত্রগুলি শেষবারের মত ভালোমত পরীক্ষা করে দেখা, যদি এখনো কোথাও খাতাপত্রে গণ্ডগোল থাকে, তবে তা ঠিক করে দিতে হবে শেষবারের মত। তারপর মিঃ ঢনঢনিয়া আবার আসবেন ঠিক বিকেল পাঁচটায়। তখন নিরিবিলি কোন জায়গায় বসে নিভৃতে সলাপরামর্শ, যাতে কোনদিকে কোন ফাঁক না থাকে। এরপর দেনাপাওনার হিসেব। টাকা এবং আনুষঙ্গিক।

হঠাৎ সন্দীপনএর ভাবনাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেই আলোয়ান পরা লোকটি সন্দীপনের পথ আটকে দাঁড়িয়ে। ও স্বভাবতই বিরক্ত, কি ব্যাপার, রাস্তা দেখে চলতে পার না। লোকটি নিজের জায়গা থেকে না সরে ধীর শান্ত অথচ গ্র্যানিট পাথরের মত গম্ভীর গলায় বলল, পালাবার চেষ্টা করবেন না, পকেটে যা আছে, ভালমানুষের মত কোন গণ্ডগোল না করে বের করে দিন।

সন্দীপনের চেহারা তেমন শক্তসমর্থ না হলেও মাস্ল মোটামুটি শক্ত, তাছাড়া লোকটিও বেশ পাতলা, সন্দীপনের চেয়েও। শারীরিক শক্তিতে ওকে হয়ত কবজা করতে পারবে, এই রকম একটা সম্ভাবনা থেকে, ভেতরে

ভেতরে কিছুটা ভয় পেলেও সেটা বাইরে বুঝতে দিল না। ও গলার স্বর তুলে বলল,—এর মানে, মগের মুল্লুক নাকি—

হ্যাঁ, তাই। জানেন তো, জোর যার মুল্লুক তার। তা'ছাড়া আপনার রোজগার পাতি তো বেশ ভালোই। তা' আমাদেরও কিছু ছাড়ুন মাঝে মাঝে। তাই নাকি—সন্দীপনের গলার স্বরে কিছুটা ব্যঙ্গ।

আপনি দেখছি, সোজা কথার মানুষ না, বলেই লোকটি কোমরে হাত রাখল। পরমুহূর্তেই সন্দীপন সভয়ে দেখল, লোকটার হাতে উদ্যত ছোরা, সাপের ছোবলের মত, অন্ধকারের ভেতর ফলাটা ঝকঝক করছে।

লোকটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে কাছে, আর সন্দীপন পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, স্পষ্টতই দারুণ ভয় পেয়েছে ও। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতগামী মোটরের মত, নভেম্বরের শীতেও প্রচণ্ড ঘামছে, চোখে মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ। সন্দীপন চেঁচিয়ে উঠল আর্তকণ্ঠে, নাও, তুমি সব নাও, আমায় প্রাণে মেরো না বাপু। লোকটা ধমকে উঠল, থাম, নাকী কান্না আর কাঁদতে হবে না। মেয়ে নাকি। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত সুরসুর করে সব টাকা পয়সা ছাড় তো বাছাধন।

সন্দীপন তখনো ঘামছে বেতো রুগীর মত, প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে এগিয়ে দিল লোকটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মানিব্যাগ খুলল, তারপর একটা সরু ছোট্ট পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে, অবিশ্বাসের সুরে বলল, মাত্র বারো টাকা। চালাকি করবার জায়গা পাও নি। বের কর বলছি বাকী টাকাগুলি। শিগগির, লুকিয়ে রাখলে বুকে ছুরি মেরে সব টাকা বের করে আনব।

সন্দীপনের তখন অবাক হবার মত সময় নয়, তবু বিদ্যুৎঝলকের মত হঠাৎ মনে হল, ওর বুকপকেটে টাকা আছে, একথা বলল কে? তবে কি লোকটা ওকে চেনে।

বুক পকেট থেকে একটা একশ' টাকার নোট বের করে বলল সন্দীপন, এই নাও, আমার শেষ সম্বল, এই একশ'টা টাকা—লোকটার চোখ হঠাৎ বাঘের চোখের মত জ্বলে উঠল, মাত্র একশ' টাকা, আরো আছে নিশ্চয়ই। শিগগির বার কর।

সন্দীপন কিছু বলবার আগেই লোকটা শিকারী কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কোটটা খুলে নিল ওর গা থেকে। এ পকেট ও পকেট তন্নতন্ন করে খুঁজে, বুকপকেট থেকে সযত্নে রাখা টাকাগুলি সব বের করে, কোটটা ফের ছুঁড়ে দিল

সন্দীপনের দিকে। এরপর জোরে পা চালিয়ে অন্ধকার পেরিয়ে লোকটি চলে গেল বড় রাস্তার দিকে।

একটু একটু করে সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে সন্দীপন। হৃদযন্ত্রের কাজকর্ম আবার প্রায় স্বাভাবিক। উঃ, দারুণ বাঁচা বেচে গিয়েছে ভগবানের কৃপায়। আর একটু হলেই গুণ্ডার হাতে জীবনটা যেত। ধুলো ঝেড়ে কোটটা পড়ে নিল, তারপর ভাবতে চেষ্টা করল সারাদিনের রোজনামচা। লোকটার আচমকা ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিল একবার। কনুই ও হাঁটু ছড়ে গিয়ে বেশ জ্বলছে এখন। ওঃ, সারাদিনটাই আজ বরবাদ। চমচমিয়ার কাছ থেকে যে টাকাগুলি পাওয়া গেল, তাও কোন কাজে এল না। সবটাই পরস্মৈপদী। বিচ্ছিরি একটা গালাগালি মুখে এল। পার্ক স্ট্রীটের ওই খ্যা-ভিখিরী না বেকার লোকটাই দায়ী। ব্যাটা ঘ্যানর ঘ্যানর করে দেরী না করিয়ে দিলে হয়ত অনেক আগেই ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারত। ছিনতাইয়ের কবলে পড়তে হত না। যাও সব অজন্মা আস্তাকুড়ের জঞ্জাল, অমন গতর থাকতে ব্যাটা ভিক্ষে করে বেড়ায়। কনুইয়ের কাছটায় হাত বোলাতে বোলাতে আর একব র বিচ্ছিরি গালাগাল উচ্চারণ করল সন্দীপন।

কিন্তু সন্দীপন স্পষ্ট বুঝতে পারল, ওর গলার আওয়াজ কেমন ভেজা কাকের মত ম্রিয়মান। চারিদিকের নিস্তব্ধ নির্জন ভয়ংকর পরিবেশে কোথায় কে যেন তীক্ষ্ণ গলায় ওকে ডাকছে। দূর থেকে ভেসে আসা গলার স্বর চড়া থেকে খাদে নামল ধীরে ধীরে। কিন্তু সেই চাপা অথচ অমোঘ আওয়াজ যেন ওর পরিচিত, বেশ পরিচিত। চৌরঙ্গীর নিয়ন আলোর ছায়ায় দাঁড়ানো সেই মেরুদণ্ডহীন ধূসর চেহারার লোকটা। কিন্তু ওর চোখ দু'টো অমন ভয়াল বাঘের মত জ্বলছে কেন! ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে লোকটা, বিশাল দৈত্যের মত ভীষণ ভয়ংকর। সন্দীপন পালাতে চাইছে অন্য কোথাও, কিন্তু পারছে না। নিশ্চিন্ত নিয়তির মত ওর পা ক্রমেই স্থবির, অথর্ব, অনড় হয়ে এল। ও অনুভব করল সমস্ত সত্তা দিয়ে, ভেতরে ভেতরে ও বদলে যাচ্ছে, আত্মরক্ষার তাগিদে কিম্ভূতকিমাকার সরীসৃপের মত ইতিমধ্যেই রং বদলাতে শুরু করেছে। ওর গায়ের জামাটের রং আশেপাশের গাছপালার মত ঘন নীল, ক্রমশ সবুজ হয়ে এল।

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

॥ পাঁচ ॥

একদিন কলেজ জীবনে ইউনিয়নের মাধ্যমে গীতার সংগে ওর আলাপ। সেই আলাপ ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। গীতা ওকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করতে পারে না তবু গীতাই সেই মেয়ে যার মধ্যে ও অনেকখানি সম্ভাবনা দেখেছিল। গীতা পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি ওর মনের মত মেয়ে।

হঠাৎই ওরা আবিষ্কার করল যে কাজের অবসরে ওরা দুজনে দুজনকে নিয়ে অনেকখানি সময় ব্যয় করেছে এমন কি ভাবনার মধ্যেও। বিমলের সমস্ত ভাবনা কখন যে গীতাকে কেন্দ্রবিন্দু করেছে তা জানতে পারে নি। দুজনে দুজনের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে উত্তরণের পথেই এগিয়ে গেছে, এরই মধ্যে দিয়ে ওদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। গীতার সমস্ত উদ্দীপনা বিমলের সংগে দেখা হওয়ার মধ্যে নিবদ্ধ থেকেছে, আর বিমল নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে সেই ব্যাকুলতার বশেই অধ্যাপনা নিয়ে কোলকাতার বাইরে চলে যায় সেই সময়ে পরস্পরের চিঠির বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ওরা যেন আরও ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো। এরপর গীতার সান্নিধ্যের জন্যেই হয়তো বিমল অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে আবার স্কুলে ফিরে এলো।

চণ্ডীপুর থেকে ফিরে এসে কোথায় যাবে ভাবছে বিমল। ভাবতে ভাবতে মেসের ঘরখানাতে গিয়েই উপস্থিত হ'ল। লতা আজ আর পড়তে আসবে না। আলস্যে গা এলিয়ে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। ট্রেনে বসে মায়ের কথা মনে পড়েছিল। খুব সম্ভব চণ্ডীপুরের ঐ নির্জ্জন গ্রাম্য পরিবেশে ওর মামার বাড়ীর কথা মনে পড়ে গেছে। সেখানকার সংসারটার সংগে কোথায় যেন একটা মিল আছে চণ্ডীপুরের স্বামীজির আশ্রমের। ও জায়গাটাকে আশ্রম বলা যায় না যেন ছোট্ট একটা সংসার, মেয়ে মানুষ না থাকাতে ও সংসার বলতে বাধেনা এমনিই পরিচ্ছন্ন। গীতাকে মোটেই বেমানান লাগছিলনা। তবে সেখানকার সেই নিরুচ্চার দারিদ্র্যের পক্ষে গীতা উপযুক্ত

কিনা সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। গীতাকে ওখানে রেখে এসে এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি এইবার ওর ছুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চোখে জল ওর এলেও তাকে কখনই প্রশ্রয় দেয়না কিন্তু এ ঘরে এখন কেউ নেই তাই এ জল ঝরে পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। ও ভাবছিল ব্যাপারটা তো অন্যরকম হতেও পারতো। আচ্ছা, টুটুলকে ছেড়ে গীতা পারবে থাকতে? আর অনিমেষ? কি হবে তার? না না গীতাকে ও কোথাও থাকতে দেবেনা, অনিমেষের কাছেও না। চণ্ডীপুরেও না। গীতা ওর। যে যা বলে বলুক, ভাবে ভাবুক গীতাকে ও নিজের কাছে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ জোর করেই নিয়ে আসবে। টুটুলকে ও নিয়ে আসবে নিজের কাছে, গীতাকে ও নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে ওকে আশ্রম টাশ্রমে মানায় না।

সুধীরের ডাকে ঘুম ভাঙলো বিমলের। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সুধীরই আলোটা জালিয়ে দিল, দরজা খোলাই ছিল, সুধীর বল্লে, "কিরে অবেলায় ঘুমোচ্ছিস? গায়ে জামাজোড়া এঁটে? কোথায় গিয়েছিলি?" তাইতো জামা খোলা হয়নি চটিটাও আধখোলা। হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিমল। হাতের ঘড়ি হাতেই রয়েছে।

এই মুহূর্তে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালো লাগছিল না তার। কিন্তু বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সুধীরই গীতার কথা সব জানে। বিমল কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বললে

"চণ্ডীপুরে গিয়েছিলাম।"

"সে আবার কোথায়?"

নদীয়া জেলার নিতান্ত আটপৌরে সাধাসিধে একটা অজ পাড়া গাঁ।

"বাবা রাখ। সেখানে গিয়েছিলি কেন?"

"গীতাকে পৌঁছে দিতে"

"কাকে? গীতাকে? গীতাকে ওখানে কেন?"

"সে অনেক ব্যাপার। গীতা সন্ন্যাস নেবে।"

"মানে?"

'মানে আবার কি সোজা বাংলাতেই তো বল্লাম'

"একটু খুলে বলতো বিমল"

"কাগজে বিজ্ঞাপণ দেখে গীতার ঝোঁক হল সেখানে যাবার। আমাকে

বেশী কিছু বলেনি, শুধু বললে 'আজ আমি চণ্ডীপুরে যাচ্ছি' কেন কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা আমার স্বভাব নয় জানিস তো। তাছাড়া জানিস, ওকে বেশী প্রশ্ন করলেই ও রেগে যায়।"

"কিন্তু না জিজ্ঞেস করলে আরো রেগে যায় না ?.

"হ্যা—ঠিক ধরেছিস জিজ্ঞাসা না করলে অতীতের অভিমান আর জিজ্ঞাসা করলে বর্তমানের যন্ত্রণা। বল্, এ অবস্থায় কি করতে পারি—কাজেই কথা না বাড়িয়ে গুটগুট করে ওর পেছন পেছন গিয়ে চণ্ডীপুরের গাড়ীতে চেপে বসলাম। তারপর পুরো একদিন আর একরাত কাটিয়ে আজ দুপুরে ওখান থেকে রওনা হয়ে ফিরে এসেছি সশরীরে এই মেসের ঘরে তোমার সামনে অবস্থান করছি।"

"কিন্তু চণ্ডীপুরে কি আছে ?"

"কি আছে তা এখনও ভাল করে বুঝিনি, যতটুকু বুঝেছি তাতে জেনেছি 'সমাজ সেবা'—গীতার ধাতে যা একেবারে সয়না। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল ? কি জানি কি ভাল বুঝলো। মরুক্‌গে যাক, চল্ এককাপ চা খেয়ে আসা যাক্।"

স্বামীজির আশ্রমে এতদিন কেবল মাত্র কয়েকজন পুরুষের আনাগোনা ছিল। তার মধ্যে কেউ কেউ আসতেন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কেউবা নিছক কৌতূহলের বশে। কেউ আসতেন একটু আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবার জন্যে আর কেউ কেউ আসতেন স্বামীজিকে ভালবেসেই। আর আশ্চর্য্য যে, স্বামীজিকে ভালবেসে যাঁরা আসতেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই অল্প বয়সের ছেলে। চণ্ডীপুর গ্রামে যাঁরাই আসতেন তাঁরা একবার না একবার এ আশ্রম ঘুরে যেতেন।

এ আশ্রমে ভীড় হবার কোন উপলক্ষ ছিল না, তীর্থযাত্রীর ভীড়তো নেই কারণ চণ্ডীপুর পীঠস্থান নয়। বাংলা দেশের দেবদেউলের একটাও এখানে ছিল না। বহুকাল আমলের বুড়ো শিবতলা একটা ছিল বটে কিন্তু তার কোন ঐতিহ্য ছিল না কেবল বছরে একদিন চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা বসতো। ছোট্ট গ্রামটায় সেদিন য়েন নতুন করে প্রাণ সঞ্চয় হতো। আর পাঁচটা অজ পাড়াগাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়তো চণ্ডীপুরে। বৌ ঝিয়েদের সখের জিনিষ পুঁথির মালা, কাঁচের চুড়ি, ডুরে শাড়ী, হিমানী, হেজলিন, মাথার প্লাসটিকের

জিতে, সখের ছবি, উলের কৌটা, সেলাইয়ের রং সুতো এমনি আরও কত কি টুকিটাকি এই মেলায় পাওয়া যেত। আর পাওয়া যেত গিন্নীদের ঘর সংসারের কড়া খুন্তি, ধামা কুলো, বঁটি চাকু আরো সব নানান সরঞ্জাম, শিশুদের নানান রং বেরংএর খেলনা, ছবির বই, লক্ষীর পাঁচালী, সস্তায় বুক পকেট সাইজের পাঁজি এমনি আরও কত কি।

মেলা উপলক্ষ করে গ্রামের ছেলেরা পালাগান করতো। যাত্রা করতো, হাল আমলের ছেলেরা সখের থিয়েটারও করতো। এই গরীব গ্রামে এমন সঙ্গতি কারও ছিল না যে কলকাতা থেকে ভাড়াকরা থিয়েটার নিয়ে আসবে। আর কলকাতা থেকে ভাড়া করা মেয়ে এনে থিয়েটার করার রেওয়াজটাও তখনও চালু হয় নি চণ্ডীপুরে, তাই ওরই মধ্যে একটু অল্প বয়সের ছেলেরা গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সেজে অভিনয় করতো। কিন্তু গোঁফ কামানো হিরোইন দেখেও তাদের মন ভরতো না। তাই ইদানিং প্রতিবারেই একটু বাকবিতণ্ডা দেখা যেত।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ অফিসারেরা এই সময়টাতে একটু ব্যস্ত থাকতেন।

স্বামীজীর আশ্রমে এই সময় একটু ভীড় হ'ত, তিনি কাউকেই ফেরাতে পারতেন না। তাই কোন কোন অতিথি অভ্যাগতদের আশ্রয় দিতে হ'ত।

সদ্য মেলা ভেঙেছে, এখনও লোকের মুখে মুখে মেলার খবর পাওয়া যায়। সদ্য দেখা থিয়েটারের পাট এখন অনেক ছেলের মুখে মুখে ঘুরছে।

প্রায় তিনকুড়ি হল গীতা এখানে এসেছে, এর মধ্যে গ্রামের কয়েকজন গিন্নার সংগে তার আলাপও হয়েছে। সে গেছেও কারো কারো বাড়ী, আর সে সব জায়গা থেকে কিছু অচেনা অভিজ্ঞতাও সে সঞ্চয় করেছে। এখানে সকলে গীতাকে নিয়ে খুব সচকিত।

গীতা প্রথমেই মেয়েদের সপ্তাহে একদিন করে জড়ো হতে বলেছে। প্রথমে রামায়ণ পাঠ দিয়ে সুরু, ধর্মভীরু জাত। ধর্ম সংস্কারের ইন্ধন জোগাতে পারলে গ্রাম সংস্কারের আগুনটা ভালভাবে জ্বালান যাবে এই বিশ্বাস নিয়েই গীতা কাজে নামলো।

মাসের মধ্যে একদিন স্বামীজি কথকতা করতেন আর বাকী দিন গীতাই রামায়ণ পাঠ করে আর ব্যাখ্যা করে শোনাত। প্রথম এ মজলিসে বৃদ্ধারাও আসতেন, ক্রমে কৌতুহলী জনাকয়েক অল্প বয়সের মেয়ে ও বৌ এদেরও দেখা

গেল, তাদের মধ্যে অনেকে মায়ের বা শাশুরীর আঁচল ধরে আসতো। ওদের মধ্যে থেকেই কয়েকজনকে গীতা রাজী করাতে পেরেছিল সেলাইএর আসর বসাবার জন্যে। ক্রমে সেলাইয়ের সংগে আবার জ্যাম জেলী আরো আরও নানা রকম হাতের কাজে তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিল। ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে চললো ক্রমে গীতা একটা কাজের কাজ করে ফেলল। জনা চার পাঁচ মেয়েকে রাজী করিয়ে একটা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলে বসলো। ওর ইচ্ছে আছে মেয়ে-দের একটা স্কুল খোলবার। চার পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র মেয়েদের স্কুল তাও সেটা জুনিয়ার স্কুল। আর চণ্ডীপুর থেকে অনেক দূরে।

সেলাই এর ক্লাশে অনেকে আসে কিছুদিন থেকে আবার চলে যায়। কেউ কেউ আসে নিছক মজা দেখার জন্য। কেউ কেউ সত্যিই শিখতে আসে। এদের মধ্যে অল্পবয়সী বিধবারাই বেশী।

গীতাকে স্বামীজি মামনি বলে ডাকেন, সেই দেখা দেখি সকলেই ওকে মামনি বলে ডাকে। বিধবা মায়েদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে গীতার প্রাথমিক বিদ্যালয় সুরু হয় কিন্তু সেলাই এর মেয়েদের পড়াশুনো করা কিছুতেই রাজী করান যায় না। ক্রমে সেলাই স্কুলে অল্প বিস্তর আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিল। এদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া যায় না কারণ মাইনে দেবার সংগতি এদের নেই, যাদের আছে তারা গীতার এই নগন্য স্কুলে ছেলে পাঠাবেনা। তারা খরচ করে জুনিয়ার স্কুলে পাঠাবে। যে কজন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার আছেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু ডোনেশন নিয়ে কোনরকমে চলছে, স্বামীজি মাঝে মাঝে কলকাতায় যান তাঁর পরিচিতদের কাছ থেকে কিছু ডোনেশন তুলে আনেন কিন্তু তা যৎসামান্য। গীতা খুব মেতে উঠেছে, সারাদিনই সে এই সমস্ত নিয়ে ব্যস্ত। এবারে সে লাইব্রেরীতে হাত দেবে। পাড়ার অল্পবয়সী ছেলেরা মামনির কাছে এসে ভীড় জমায়, তাদের ঠিকমত কাজে লাগান দরকার। কিন্তু এ কাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন উৎসাহী কর্মী। তেমন ছেলে কৈ? বিমল যদি এ ব্যাপারে তাকে একটু সাহায্য করত।

হঠাৎই একদিন বিমল এল, গীতার উৎসাহ আর কর্মদক্ষতা দেখে সত্যিই সে অবাক হ'ল। নতুন করে গীতাকে চিনল। কলেজ লাইব্রেরী ইউনিয়নে ছাড়া মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করা, পাঠচক্র করা এইসব কাজে গীতা যে

কতখানি পারদর্শিনী তা সে ভালোভাবেই বুঝেছিল কিন্তু এখানে এই নিরক্ষরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েদের নিয়ে সে যে এমন একটা সংঘবদ্ধ কার্য্যনির্বাহক মণ্ডলী গড়ে তুলতে পেরেছে এতে সত্যিই সে অবাক হ'ল। মনে মনে গীতার প্রশংসা না করে পারলনা। ছেলেদের গীতা বলেছিল সব আগে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে। ছেলেদের মধ্যে শরীর চর্চা আর সেই সংগে মননশীলতার একান্ত প্রয়োজন তাই ও চেয়েছিল তাদের জন্যে একটা ফ্রি-রিডিংরুমের ব্যবস্থা করতে।

স্বামীজির লাইব্রেরী ঘরটাই ফ্রি-রিডিংরুমের কাজে লাগানো হ'ল। ছেলেরা নিজেরাই পয়সা তুলে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা আনতে লাগল। আশ্রমের সামনের মাঠে ব্যায়ামের আখড়া তৈরী হ'ল ওদের নিজেদের চেষ্টাতেই। স্বামীজি থানা অফিসারকে এ বিষয় বলে কয়ে মত করিয়ে দিলেন। আজকাল তো কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলেকে একসংগে দেখলেই বিচক্ষণদের ভুরু কুঁচকে ওঠে। কে জানে অজ-গ্রামেও কম্যুনিষ্টের ঢেউ এসে পৌঁছাল কিনা।

বিমলকে এইসব গ্রামের ছেলেরা খুব আগ্রহের সংগে গ্রহণ করল। বিমল ঠিক করল ওদের নিয়ে পাঠচক্র সুরু করবে। ওদের মধ্যে যারা কিছু কিছু লেখাপড়া করেছিল, শরৎবাবু যাদের আদর্শ। শরৎবাবুকে নিয়েই তাদের সংগে নতুন করে আলোচনা করল বিমল। এ আলোচনায় শরৎ সাহিত্যের নতুন নতুন একটা দিক তারা দেখতে পেল। বিমলকে তাদের খুব ভাল লাগল। ওকে তারা ছাড়তে রাজী নয়। মধ্য বয়স্ক কয়েকজন অভিবাবক অবশ্য বিমলকে ভালভাবে নিতে পারলেন না। কারণ বিমলের রুক্ষ চেহারা আর কাটাকাটা উদ্ধত কথা তাদের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। গীতা কোনদিনই মেয়েদের লক্ষ্মীপূজা আর নীলের উপোষ কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়নি কিন্তু বিমল জোর গলায় ছেলেদের বলেছে নিজের জন্য বাঁচো আর অন্যায় যেখান থেকেই আসুক তার প্রতিবাদ কোরো। ধর্ম্মের নামে সুবিধেবাদী মিথ্যে সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত কর আগে।

বিমল মাঝে মাঝে আসে। ও যে সময় আসে তখন আবহাওয়া যতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠে বিমলের অনুপস্থিতিতে তা হয় না। বিমলের অনুপস্থিতি-টাকে গীতা তার নিজের উপস্থিতি দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারেনা, এরজন্য

বিমলের প্রতি তার ঈর্ষাও আছে অথচ এর মধ্যে একটা গর্ববোধও তাকে আনন্দ দেয়। এই ঈর্ষা থেকেই হতাশা তৈরী হয়েছে গীতার। সে ভাবে বিমল যা পারে আমি তো তা পারিনা অথচ বিমলের সাফল্যে সে খুসী হয় কেন সেকি নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণে না একটা মানুষের এই উদ্যম, ভালোভাবে বেঁচে থাকার উৎসাহ যা বিমল নতুন করে তার কাছ থেকেই পেয়েছে সেই কারণেই। কিন্তু কেন সে আজও বিমল সম্বন্ধে এতখানি সচেতন, এইযে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করা, মহৎ পরিকল্পনাকে আদর্শ রূপ দিতে প রার পথে এগিয়ে যাওয়া জীবনের এই যে প্রাণময়তা এই কি সে চেয়েছিল। তাইকি অনিমেষকে ত্যাগ করে বিমলকে পাবার জন্যে এইখানে আদর্শের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। মনটা আবার বিক্ষিপ্ত হল। আবার ইচ্ছে করে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে ও? যেখানেই যাবে সেইখানেই তো মন যাবে সংগে। বিমল সবেমাত্র চলে গেছে। দিন পনেরোর মধ্যে আর আসতে পারবে না। অত্যন্ত অস্থির অথচ নিরুত্তাপ মন নিয়ে স্বামীজিকে প্রশ্ন করেছিল গীতা—'কি করলে মনের এই অনিশ্চিয়তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গীতা ভেবেছিল স্বামীজি হয়তো প্রশ্ন করবেন কিসের অনিশ্চিয়তা কেন বিক্ষিপ্ত হয়েছে মন। কিন্তু তিনি কোন প্রশ্নই করলেন না। স্থির গাম্ভীর্য্যে শুধু বলেছিলেন—"দেখমা মনকে নিজের ভাবনায় ডুবিয়ে রেখোনা, আত্ম পরিচর্য্যা ভাল, আত্মপ্রেমও ভাল কিন্তু তা যেন কোনদিনও মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। আত্মসমালোচনা খুবই প্রয়োজন কিন্তু তা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যান।

"কিন্তু স্বামীজি আত্ম সমালোচনাই কি উত্তরণের পথ নয়?"

"হ্যাঁ উত্তরণ সম্ভব যদি তা পরিমিত হয়। আত্মসমালোচনায় তুমি তোমার নিজের দোষ ত্রুটি আর অক্ষমতাই দেখতে পেলে আর তাই নিয়ে তোমার হতাশার সৃষ্টি হল, তখন দেখবে নিজের প্রতি তোমার অনুকম্পা আর করুনা তোমার অক্ষমতার যন্ত্রনা থেকে তোমাকে হয়তো সাময়িক ভাবে বাঁচাবে কিন্তু সে বাঁচা বাঁচা নয় তবু যন্ত্রনাকে ভুলে থাকার জন্য ঘুমিয়ে থাকার মত। সব আগে জানতে হবে তোমার নিজের ইচ্ছেগুলোকে তারপর বিচার করতে হবে তাদের স্বরূপ। তারপর চেষ্টা করবে তার কতখানিই বা গ্রহণ করবে তাকেই পরিপূর্ণ করে তোলার চেষ্টাও তো সাধনা। সাধনা মানেত নয় শুধু মন্দিরে বসে ভজন পূজন করা।

—"যদি পরিপূর্ণতা সম্ভব না হয় ?"

—"না যদি হয় তখন কি হলনা বলে হতাশায় ভেঙে পড়াইতো জীবনের কাছে পরাজয়। তখন চেষ্টা করতে হবে নিজেকে নিয়ে মগ্ন না থেকে বাইরের কাজে আত্মনিয়োগ করা। যত নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে তত হতাশায় নিজেকে নিজের কাছেই করুণার পাত্রী করে তুলবে। তারপর একদিন দেখবে করুণা শুধু নিজের কাছ থেকেই চাইছনা অপরের কাছ থেকেও চাইছ।

—"যদি তাই হয় তাতে ক্ষতি কি ?"

—"ক্ষতি নয় ? একটা মানুষের এমন সাংঘাতিক অপমৃত্যু কি ক্ষতি নয় ?"

—"একটা অপদার্থ মানুষের মৃত্যুতে ক্ষতি কোথায় স্বামীজি ?"

—"কিন্তু সেই মানুষ যদি অপদার্থ না হয়, সমাজের কল্যানকামী হয়ে ওঠে তাহলে ? তাইতো বলছিলাম বাইরের কাজে নিজেকে জড়িয়ে দিতে হবে। বাইরের ভাবনাতে মগ্ন থাকো সেই সংগে মর্য্যাদা দাও নিজের ক্ষমতাকে আর বিশ্বাস রাখো তোম র এই রক্তমাংসের শরীরটার ওপর।"

গীতা শুনলো সব চুপ করে কিন্তু সে মেনে নিতে পারল না। স্বামীজি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। প্রিয়জন সংস্পর্শহীন। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অতীত তাই তাঁর ভাবনা মহৎ। সংকীর্ণতার পরিধি অতিক্রম করে তাঁর মানসিকতা বিশ্ব-প্রেমের সাধনায় উৎসর্গীত। সংসারী মানুষের অতি তুচ্ছ অথচ অতি আবশ্যকীয় সুখদুঃখের মর্মের তিনি কি জানেন। সংসারী মানুষের পক্ষে তাঁর আদর্শ অনুশীলন করা সম্ভব নয়। পথই যার আশ্রয় ঘরের কোণের খবর সে জানবে কেমন করে। তাই স্বামীজির কথায় মন ভরল না গীতার। কাজের মধ্যেই তো ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে তবু কেন অবসাদ ঘোচেনা মনের। বিমলের পাশাপাশি কেন আজও অনিমেষ এসে দাঁড়ায় তার মনের একান্ত নিভৃত নির্জনে ? টুটুলের যে ব্যবস্থা সে করে এসেছে তাতে সে নিজেই সন্তুষ্ট। বাধ্য হয়ে সন্তুষ্ট নয়—নিজের মন থেকেই সন্তুষ্ট।

অনিমেষের কাছ থেকে চলে আসার কিছুদিন আগে ওকে একদিন অনিমেষ ডেকে বলেছিল, "তুমি কি খুব ব্যস্ত আছ ?" কথাটা শুনে প্রথমে গীতা বুঝতে পারেনি যে অনিমেষ ওকেই ডাকছে কারণ প্রায় একবছর ওদের দুজনের মধ্যে কথার কোন আদান প্রদান ছিল না। বিয়ের প্রথম বছরটা একটা স্বপ্নের ঘোরে কেটে যায়। সেই স্বপ্নের মাঝে কখনও কখনও বিমলের ছবি ফুটে

উঠতো কিন্তু পরক্ষণেই মিলিয়ে যেত।

বিমলের সংগে সম্পর্কে ওর ছেদ পড়েনি শুধু যে পাটটানের দিকে এগিয়ে চলেছিল সেটা পাল্টে গেল। দুজনে অত্যন্ত ভদ্র ও শান্তভাবেই ভেবে নিল যে বিয়ে করা ওদের চলবে না। বিবাহিত জীবনের দায়িত্বকে পূর্ণ মর্যাদা দেবার মত সমন্বয় ওদের দুজনের স্বভাবের মধ্যে নেই। বিমল হয়তো খুব ভাল স্বামী কিন্তু গীতার পক্ষে নয় আর গীতাও হয়তো আদর্শ স্ত্রী কিন্তু বিমলের আদর্শকত নয়। এ সিদ্ধান্ত কিন্তু গীতার একার বিমল এ সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী নয়। সে আরও সময় চেয়েছিল। তার আশা এত সহজে পরাস্ত হয়নি, সে বিশ্বাস করতো, হয়তো আজ ওদের বিয়ে হলে ওরা আদর্শ স্বামী স্ত্রী হতে পারতো।

অনিমেষের প্রাণ-প্রাচুর্য্য, অল্পেতেই বেশী খুশী হয়ে ওঠা, আর ভুলত্রুটি-গুলোকেই হাসিমুখে মেনে নেওয়ার ওপর ওর মনের উদারতাটাই গীতার চোখে ধরা পড়েছিল আর ঐ পথ ধরেই অনিমেষের প্রতি তার ভালবাসা এগিয়ে চলেছিল। পরিস্থিতি অনুযায়ী কতগুলি সর্তে সেই প্রেম ধীরে ধীরে নিটোল হয়ে উঠেছিল কিন্তু বিমলের প্রতি তার ভালবাস কোন সর্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি। প্রেমের মাধুর্য্য হয়তো বিবাহের দায়িত্ব এসে ক্ষুন্ন হতে পারে মনের এই স্বীকারোক্তিকে গীতা প্রাধান্য দিয়েছিল বেশী তাই অনিমেষকে ও বিয়ে করে ভালবাসার পূর্ণতায় তাকে ভরিয়ে তুলতে পারবে বলে বিশ্বাস করেছিল।

অনিমেষ ইঞ্জিনিয়ার। সে বোম্বে কাজ। তার মতে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় সম্পদ হল স্বাচ্ছন্দ। মানসিক আলস্যকে যেমন পছন্দ করত না তেমনি কাজের দায়িত্বকে অবহেলা করা তার কাছে ছিল অন্যায়। অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ের প্রথম বছরটা তার স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল। তারপর সে কাজের মধ্যে ডুবে গেল একেবারে। আরো স্বাচ্ছন্দে আরও আরামে সে সুখী করতে চায় তার একমাত্র মেয়ে টুটুলকে? দারিদ্র্যের ভীষণ ছায়া তার সংসারে যেন বিন্দুমাত্রও উৎপাত করতে না পারে। (ক্রমশঃ)

ওরা সাতজন

শিশির কুমার দাশ

ওরা সাতজন, ঘুমিয়ে রয়েছে, আমিও ছিলাম,
আমিও দেখেছি স্বপ্ন অনেক, দেখছে ওরাও;
ঘুম ভেঙেছিল, ওরা সাতজন, তখনও বিধাতা—

আমিও দেখেছি স্বপ্ন অনেক, দেখছে ওরাও;
ঠিক মুহূর্তে জ্বলে উঠেছিল মধ্যগগন,
চেঁচিয়েছিলাম সবলগলায়, 'আগুন, আগুন'।

ঠিক মুহূর্তে জ্বলে উঠেছিল মধ্যগগন,
বাইরে দেখেছি আকাশে আকাশে তারকার দল
খসে যাচ্ছিল অনিবারণীয় আকর্ষণে

বাইরে দেখেছি আকাশে আকাশে তারকার দল,
আগুনের শিখা লেগেছিল ঘরে খড়ের চালে;
চেঁচিয়েছিলাম সবলগলায়, 'আগুন আগুন'।

আগুনের শিখা লেগেছিল ঘরে খড়ের চালে;
ঘুমিয়ে রয়েছে ওরা সাতজন, ওরা কি মৃত?
ওরা কি মৃতই, ওরা সাতজন, অথবা স্বপ্ন?

ঘুমিয়ে রয়েছে ওরা সাতজন, ওরা কি মৃত
তখনও, বিধাতা, শুনতে পায়নি শব্দ হাওয়ার
যে শব্দে ছিল বন্ধু হারানো ক্রূর হাহাকার

তখনও, বিধাতা, শুনতে পায়নি, অথবা ওদের
ভালো লেগেছিল উষ্ণ হাতের তীব্র দাহ!
ঠিক মুহূর্তে আমি কি বলিনি, 'আগুন, আগুন'।

হে মানসী

সমীরণ রুদ্র

স্টেশনে শেষ ট্রেন হুইসিল দিয়ে কখন্ চলে গেছে,
সময়ের সীমানা পেরিয়ে আমি শুধু হাঁটছি,
—আর হাঁটছি।
আর দূরাগত বাতাসের গান শুনছি,
—ঝিমি-ঝিমি।
কিন্তু হে সময়, হে মহাকাল বলো
আর কতো কাল এমনি পথ হেঁটে যাবো—
রাত্রির চিবুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে?
যন্ত্রণার অসহ্য শরীরে—
অন্ধকারে রক্তাক্ত হৃদয়ে?
এখন সামনে শুধু পায়ে চলা পথ বন্ধুর,
চারিদিকে পাথর ছড়ানো,
মাথার ওপরে মুমূর্ষু চাঁদ—,
মধ্য রাত্রি তুলছে হৃদয়ে কোলাহল—
—শূন্য মন্দির মোর—
কবে পাবো তাকে—
সেই মায়াময়ী মানসীকে?
সময় নদীর দুই তীরে—
কবে মুখোমুখি বসবো দুজনে?
আঃ সেদিন ফুল ফুটবে অজস্র বাগানে,—
সুরভিত সমস্ত প্রত্যয়।
প্রাণে প্রাণে বিনিময় মনের খেলায়।

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার পর্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা এপার বাংলার কয়েকজন তরুণ সংগীত শিল্পী, সাহিত্যিক-এর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় ওপার বাংলার তরুণ, সংগীত শিল্পী শ্রীমতী শেফালী সান্যাল-এর সংগে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করছি।
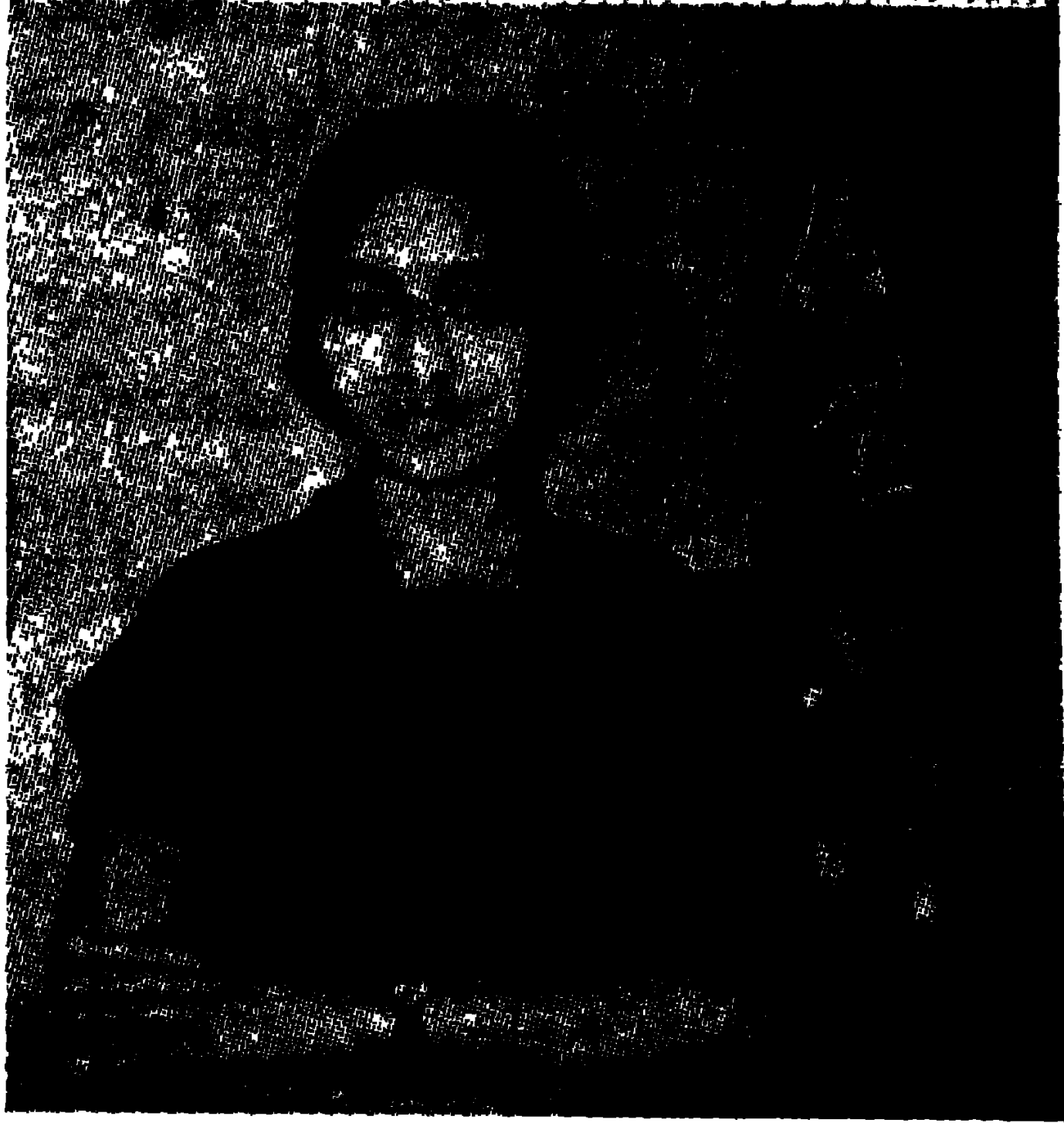
শ্রীমতী শেফালী সান্যাল

রক্তে রাঙ্গা ওপার বাংলায় তখনও চলছে সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালীর উপর বর্বর খান সেনাদের নগ্ন অত্যাচার; প্রতিবাদে এপার বাংলায় কবি শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক সর্বস্তরের মানুষ ফেটে পড়ছে। এমনি সময় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে পরিচয় হলো শ্রীমতী শেফালীর সঙ্গে···প্রশ্ন করলাম—

১। প্রশ্ন:— ছোটবেলা থেকেই কি সঙ্গীত চর্চা করছেন?

উত্তর:—আমার জন্ম বাংলাদেশের পাবনা শহরে ইংরাজী ১৯৫৪ সালের ১৭ই অক্টোবর। আমার বয়স যখন ছয় বৎসর তখন থেকেই আমি সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করি। বাড়ীর পরিবেশ আমার সঙ্গীত শিক্ষার অত্যন্ত অনুকূলে ছিল বলেই আমার পক্ষে এতটা এগোন সম্ভবপর হয়েছিল। বলতে

পেলে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-ই আমাকে সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

২। প্রশ্ন:—সঙ্গীত শিক্ষার সাফল্যে আপনি কার কাছ থেকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন?

উত্তর:—অনুপ্রেরণা বলতে সর্ব্বপ্রথম আমি যখন ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী তখন আমাদের বাড়ীতে স্বনামধন্য গুরুজী সংগীতাচার্য্য প্রমথ নাথ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটে। আমার সুকণ্ঠ শুনে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে তাঁর প্রতিষ্ঠান 'সঙ্গীত বিত্তাবীথি' স্কুলে ভর্ত্তি করে নেন। এবং তাঁর কাছ থেকেই আমি ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বৎসর এভাবে ক্রমাগত ১২ বৎসর একাধিক্রমে সঙ্গীত শিক্ষা করি। আমি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পাবনা জিলা সংগীত প্রতিযোগীতায় "খেয়ালে" প্রথম স্থান অধিকার করি। সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে আমি পাবনার জেলা প্রশাসক হেদায়েতুল হক সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ তিনি আমার কণ্ঠে "মালকোষ" খেয়াল শোনার পর থেকে আমার প্রতি খুব প্রীত ছিলেন। তিনি আমাকে তার Special Fund থেকে আমার শিক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করেন। এরপর আমাদের কলেজের সেক্রেটারী ঘোষণা করেন তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিযোগিতাতে প্রথম হতে পারলে Freeship দেয়া হবে। পরিশেষে আমি ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম হই এবং সত্যিই আমি freeshipএ পড়ে এসেছি। আমি ১৯৭১ সালের ৫ই জুলাই তারিখে বি, এস, সি ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতাম। কিন্তু রাষ্ট্র বিপ্লবে তা সম্ভব হয় নাই।

৩। প্রশ্ন:—সঙ্গীত শিক্ষাকালে বাংলাদেশের কোন্ কোন্ শিল্পীর সংস্পর্শে আপনি এসেছেন? এঁদের মধ্যে যদি কাউকে আপনি আপনার শিক্ষা-গুরুর আসন দিয়ে থাকেন, তাহলে সঙ্গীত শিক্ষার সাফল্যে তাঁর কতখানি দান?

উত্তর:—সংগীত শিক্ষাকালে পাবনা, রাজশাহী, ঢাকার এবং সিরাজগঞ্জের বহু নামকরা বেতার শিল্পী ও জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম। যেমন পাবনা নিবাসী অধুনা ঢাকা মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবারীন মজুমদার, ইলা মজুমদার, রেণু অধিকারী, রূপবাণী ঘোষ এবং মলয় মৈত্র প্রভৃতি। রাজশাহীর নারায়ণ চন্দ্র বসাক প্রভৃতি ঢাকার আবদুল জব্বার,

ফেরদৌসি রহমান, সাবিনা হোসেন, ফরিদা ইয়াসমিন, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, ওস্তাদ ইয়াসিন কোরেশি, ওস্তাদ ফজলুল হক প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কেউই আমার শিক্ষাগুরু নন, তবু এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছি এবং আমার চলার পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করেছে।

৪। প্রশ্ন :— বেতারে আপনি গান পরিবেশনের সুযোগ কিভাবে পেলেন?

উত্তর :— বেতারে গান পরিবেশনের ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম আমার মনে পড়ে রাজশাহীর প্রখ্যাত গীটার বাদক সাজেদুর রহমানের কথা এবং আমার অন্তরংগ সহপাঠীনি শ্রীমতী সাবিনা হোসেনের কথা। বলতে গেলে ওঁদের সক্রীয় সহযোগিতাই আমার বেতার জগতে প্রবেশের দ্বারপথ উন্মোচন করে। আমি রাজশাহী বেতারকেন্দ্রের নিয়মিত সংগীতশিল্পী ছিলাম। এর মধ্যে ঢাকা বেতার থেকেও আমন্ত্রণ আসে কিন্তু রাষ্ট্র বিপ্লবে আমার সেই স্বপ্ন বিফল হয়ে যায়।

৫। প্রশ্ন :— জলসায় অংশ গ্রহণ করেছেন কি? জলসার শ্রোতারা আপনার গান কিভাবে গ্রহণ করেছেন?

উত্তর :— আমি আজ পর্য্যন্ত যে কত জলসায় অংশ নিয়েছি তা গুণে শেষ করা যায় না। শুধু পাবনাতেই নয়, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ, ঈশ্বরদী, পাকশী, ঢাকা প্রভৃতি জায়গাতেও আমি এত জলসায় অংশ গ্রহণ করেছি যে তাতে আমার পাঠ্য জীবনে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে এবং এজন্য অনেকের মনক্ষুন্ন করতে হয়েছে। পাবনা শহরেও শিল্পীদের তালিকায় সর্ব্বাগ্রে আমার নাম থাকার জন্য অনেকে ঈর্ষা করতো। জলসার শ্রোতারা আমার গান এমন উচ্ছ্বসিত প্রসংশার সংগে গ্রহণ করত যে সব সময়ই আমাকে একাধিক গান গাইতে হতো।

৬। প্রশ্ন :—আপনার গাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গান কি? রেকর্ড করার সুযোগ পেয়েছেন?

উত্তর :—আমার গাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গানটি হচ্ছে নজরুল ইসলামের "হিন্দোল" রাগের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাগ প্রধান। এই গানটির সঙ্গে একটি ঘটনাকে মনে পড়ে—জলসাটি ছিল কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন উপলক্ষে এবং তাতে প্রধান আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন পাবনার হেদায়েতুল হক সাহেব। তখনও আমি বেতারে অংশ নেই নি কিন্তু ঐ দিন ঐ

অনুষ্ঠানে ঢাকা বেতারের এক প্রখ্যাত গায়িকাও অংশ গ্রহণ করলেন। যেহেতু আমার গানটি রাগপ্রধান এজন্য সেটা শেষে দেওয়া হয়েছিল। গানটি শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গে শ্রোতাদের করতালির শব্দে আমি লজ্জা পেলাম। ঐ জলসায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজী সংগীতাচার্য্য শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে জেলা প্রসাশক ঘোষণা করলেন "আমার গানে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নিজের তহবিল থেকে আমাকে পুরস্কৃত করবেন" —তাঁর এই মহানুভবতা আমাকে বিস্মিত করেছিল সেদিন।

ঢাকা কর্তৃপক্ষ আমার গান রেকর্ড করেছেন—গীতিকার ফজলে খোদা। গানের প্রথম লাইন "ও আমার দেশ আমি তোমার বুকেই হাসি"।

৭। প্রশ্ন :—বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে কার গান আপনার ভাললাগে?

উত্তর :—বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে আমার ভাললাগে ওস্তাদ নাজামত সালাকত আলীর গান। এ ছাড়া লায়লা আর্জুমান্দ বানু, সোহরাব হোসেন, বেদারউদ্দীন আহামেদ, সাবিনা ইয়াসমিন, ইসমত আরা, ফজলুল হক, নারায়ণ চন্দ্র বসাক, কণা নিয়োগী, বারীন মজুমদার, ইলা মজুমদার, ভক্তিদাস চাকী, মলয় মৈত্র, রেণু অধিকারী ইত্যাদি এছাড়াও আরো অনেকে।

৮। প্রশ্ন :—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর যদি একটু আলোকপাত করেন—

উত্তর :—বাংলার সাম্প্রতিক কালের ঘটনাকে আমি আমার জীবনের মধ্য-দিয়েই অনুভব করেছি। আমার স্বপ্ন ও আশাকে যারা ছিন্নভিন্ন করে, আত্মীয় পরিজন থেকে পৃথক করেছে তাদের আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারবো না।

৯। প্রশ্ন :—এই আন্দোলনে শিল্পীদের কি ভূমিকা হওয়া উচিৎ? '৬৮ সালের ভাষা আন্দোলনে আপনারা কি রকম ভূমিকা নিয়েছিলেন?

উত্তর :—আমার মত হলো, বাংলাদেশের প্রত্যেক কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের ঠিক এই মুহূর্তে এক একজন "মুক্তিসেনার" পর্য্যায়ে নেমে আসাই একান্ত কর্তব্য। যদি আমাদের মাঠে নামবার সুযোগ না আসে তা হলে আমাদের এমন কাজ করা উচিত যাতে করে আমাদের নবীন ভাইএরা যাদের তাজা খুনে সোনার বাংলাতে আজ স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাদের এই সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করা। '৬৮ সালের আন্দোলনে আমি সক্রিয় অংশ নেই। তখন আমি ১ম বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্রী। ঐ সময় আমরা ভোরে খালি পায়ে

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সঙ্গে শহীদ মিনারে খালি পায়ে থেকে শুরু করে সারা সহর গান গেয়ে জেলের বন্দী ছাত্রদের এবং ছাত্র সমাজকে গণ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করার কাজে সহায়তা করতাম। এর উপর ভিত্তি করে তিনটি গান আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে, যেমন — রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন "করলিরে বাঙ্গালী" "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়" এবং "যায় যদি যাক প্রাণ তবু দেব না গোলার ধান"

১০। প্রশ্ন :—এপার বাংলায় এসে সবচেয়ে কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আপনার জীবনে ঘটেছে ?

উত্তর :— এপার বাংলায় এসে শুধু উদ্দেশ্যবিহীন খর কুটোর মত ভেসে চলেছি।

১১। প্রশ্ন :—ওপার বাংলা এপার বাংলার শিল্পীদের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন কি ?

উত্তর :—আমার মতে শিল্পীদের কোন ভিন্ন জাত, গোষ্ঠী বা মন থাকতে পারে না এবং এই মন নিয়েই বলছি আমি শিল্পীদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখি না তিনি ওপার বাংলারই হোন আর এপার বাংলারই হোন।

১২। প্রশ্ন :—ভবিষ্যত জীবনে কি করতে চান ?

উত্তর :—ভবিষ্যতে যা করতে চেয়েছিলাম তা এখন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। ছোটবেলা থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল আমি এম, বি, বি, এস ডক্টর হবো। কিন্তু এখন ডক্টরের কম্পাউণ্ডার হবারও আশা রাখি না।*

---

* সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে। এখন ওরা স্বাধীন —শ্রীমতী শেফালী তার জীবনের সকল আশা আকাঙ্খা পূর্ণতায় ভরে তুলুন এই প্রার্থনা করি।

লিমেরিক

তপন কুমার দাশগুপ্ত

ভাত ডাল মাছ এই সহজ কথাই বুঝি
ঐ আমাদের দিতে পারে যে
তার দিকেতে আমরা সবাই আছি ;
তোমার তত্ত্বকথায় ভরা, বাক্য ঝুরি ঝুরি
ওসব থোরাই কেয়ার করি।

ছন্দিতার আগামী সংখ্যাগুলোর জন্য
গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও ফিচার
তরুণ লেখক লেখিকাদের কাছ থেকে
আহ্বান করা যাচ্ছে।

ওঁরা তিনজন

মোহিত গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে ওঁরা ছিলেন তিনজন যাঁদের আবির্ভাবে রসিক পাঠক বুঝেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের কালের পরিধি পেরিয়ে স্বকীয়তা, ব্যক্তিত্বে ও সিদ্ধিতে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন ও প্রাঙ্গনকে সুশোভিত করতে সক্ষম হবেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সেই প্রতিভাবিত সাহিত্যিকদের অন্যতম যিনি এক আকস্মিকতাকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যের দরবারে এসেছিলেন। একটু বেশী বয়সে যখন তিনি এলেন তখন তাঁর অভিজ্ঞতা ও মননের পট-ভূমিতে অনেক মূল্যবান উপকরণ জমে উঠেছে। তাই তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা যেমন ছিল প্রখর দায়িত্ববোধও ছিল অনেক বেশী। হয়ত সেই জন্তেই রাঢ়ভূমির মানুষের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার এমন আশ্চর্য আলেখ্য রচনা করতে পেরে-ছিলেন। বীরভূমের লালরুক্ষ মাটি এবং তার আশেপাশের গ্রামের বাউল, ফকির কবিয়াল সাধুসন্ত ও অজস্র রকমের পূজা উপাচারের সঙ্গে হৃদয়ের যোগা-যোগ রেখে—তাদের ভাষা ও জীবনোত্তাপে উষ্ণ কথা উপকথা এনে বাংলা সাহিত্যকে বিষয় বৈচিত্র্যে নতুন দিগন্ত ছুঁইয়ে দিলেন। স্বভাবধর্ম থেকেই তারাশঙ্কর দেশমাতৃকাকে গভীর ভাবে ভালোবেসেছিলেন। সেই ভালবাসাই সত্তার গভীরে গিয়ে কালক্রমে প্রবল রাষ্ট্রচেতনায় রূপান্তরিত হল। সেই সঙ্গে তিনি দেখলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারির পুরানো ঐতিহ্য, জমিদার ও অন্যান্য অর্থবান লোকদের দ্বারা প্রভাবিত গ্রাম বাংলার গরীব চাষীদের অর্থনৈতিক দুর্দশা। তার সংহত অনুভূতিকে ডুবিয়ে দিলেন এরই তথ্যনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ চিত্র রূপায়নে। কোপাইয়ের কাহারদের জীবন কাহিনী বর্ণনায় তিনি মিশে গেছেন তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জনের সঙ্গে। মিশেগেছেন অবহেলিত শিক্ষক জীবনের দ্বন্দ্বময় আবর্তে। তাঁরই অতুল অভিজ্ঞতায় দেখলাম রোগ-চিকিৎসায় প্রাচীন মীমাংসায় জ্ঞানী নবীন চিকিৎসককে Urban Society'র incursion বলে মনে করেও তারই হাতে তুলে দিলেন নিজের ভাবমুক্তির ভার। আমাদের সমাজে সংস্কারকে সংরক্ষণ ও তার মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা

এবং সেই সংস্কারকে পরাজিত করবার জন্য লড়াই তারাশঙ্করের চৈতন্যের অভিজ্ঞানে ধরা দিয়েছে। তাই অনেক অবজ্ঞাত মানুষকে তাদেরই একজন হয়ে তিনি শিক্ষিত মানুষের দরবারে এনে হাজির করেছিলেন।

তারাশঙ্করের প্রায় সমসাময়িক আর এক মৌলিক প্রতিভা হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অতসীমামী গল্প নিয়ে তাঁর বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ, পরবর্ত্তীকালে তিনি এই গল্পটিকে রোমান্টিক ভাবালুতা বললেও সেই গল্পটির খ্যাতির মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির দ্বার খুলে যায় এবং নিজেও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। এই রোমান্টিকভাবধারা তাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গির মাধুর্য নিয়ে আবির্ভাব হয় দিবা রাত্রির কাব্য। তার পরবর্ত্তীকালে এল পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুল নাচের ইতিকথা এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধিতে পৌঁছানোর খ্যাতি। মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের মাপ কাঠির নীচের মোহনার দ্বারোদ্ঘাটনের ফলক পড়ল বাংলা সাহিত্যে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধিলাভের পশ্চাৎভূমিতে গেলে দেখা যাবে তিনি জীবন রহস্য উদ্ঘাটনে অনেকটা অভিজ্ঞতা নির্ভর ছিলেন। তিনি মানবমনের অন্তস্থলে পৌঁছে সুক্ষ মন বিশ্লেষনে চিত্তজটিলতার গ্রন্থি খুলে দিতে আশ্চর্য মুন্সীয়ানা দেখিয়েছিলেন। সংসারের নাগপাশে আজ মানুষ সমাজ জীবনের গভীর সঙ্কট ও সেই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা এই সবের মননশীল বাস্তবানুগ চিত্র পূর্ণ তার সাহিত্য শুধু সাহিত্যের হাওয়ার হাওয়া বদলের থেকে জীবন সচেতনার দিকে আমাদের টানল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন কেননা তিনি সব সংস্কার ও গোঁড়ামিকে আঘাত হেনে আগুয়ান হতে চেয়েছিলেন বলে। যৌন সম্পর্কের গভীরতা ও নৈতিক বিপর্যয় দুই তাঁর কাছে ছিল অতিবাস্তব। তাঁর মতে প্রেম ভালবাসার গভীরতায় মানুষের সে বোধটি গড়ে ওঠে শতদুঃখের মধ্যেও তা অন্যকে ভালবাসতে শেখায়। দৈহিক সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে কোথাও তাঁকে ঠেক খেতে হয়নি তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন 'দেহত আর অশ্লীল নয় দেহের চেতনাও নয়—ঐ চেতনার বিকৃতিই অশ্লীলতা'। তিনি বিজ্ঞান সচেতন মন নিয়েই এসবের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। Industrialisation এর ক্রমাগত চাপে আধুনিক শহর জীবনের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের নানা দুর্বিপাক ও অস্বস্তির সঙ্গে স্বেচ্ছামিলনের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যাদর্শ সাম্যবাদী চিন্তাধারায় গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর শেষের দিকের সাহিত্য কর্মে এই আদর্শই ছিল আশ্রয় সুর।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এসে প্রকৃতিকে মানুষের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে একাত্ম করে দিলেন এক আশ্চর্য অনুভূতির জীয়ন-কাঠিতে। প্রকৃতির নিবিড় সুখানুভূতির স্পর্শ, গীতিময়তাও শান্তিসুধায় নিজের শিল্পসত্তাকে ডুবিয়ে দিয়ে জীবন জিজ্ঞাসায় ব্যাপ্তি এনে দিলেন। গ্রাম বাংলার পরিবেশ ও তার চেনা অচেনা মানুষের কাহিনী রূপায়ণে এই প্রকৃতিই এনে দিয়েছে আশ্চর্য গতিবেগ। তাই বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিস্তার করে বিভূতিভূষণ আমাদের হাতে তুলে দিলেন তার স্বষ্ট মধুর জগতকে। সত্যিই একথা ভেবে বিস্ময়ে আবিষ্ট হতে হয় যে প্রকৃতির সামান্য উপকরণ থেকে এখন অসামান্য জীবনবোধ সঞ্চারিত হতে পারে। বিভূতিভূষণের কাছে জীবন নিসর্গবাহিত এক স্নিগ্ধ অববাহিকা যেখানে প্রত্যাশার হিসেবী প্রহরী নেই আছে সুব্যাপ্ত চৈতন্যের প্রসারিত প্রসাদ স্পর্শ। সেই জন্যেই তিনি বলেছেন এই কর্মব্যস্ত অগভীর ও একঘেয়ে জীবনের পেছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ অনিন্দভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে সে জীবনকে মানুষই চেনে। কেননা 'জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করে দেখিবার চেষ্টা করে—দেখাও হয় না বোঝাও হয় না'। হয়ত তাই সবুজ শংওলাগন্ধ মেঠোপথের মূলাধার থেকে যে শিশুটি বাহির বিশ্বে বেরিয়েছিল সে সুখ মিলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মৌলিক বিরোধাভাসগুলির সন্ধান পেয়েও এক শুভ্র মানবিক স্তরে উত্তরণের মধ্য দিয়ে অপরাজিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের গোপন অন্তরে যে শিশু মনটি অপ্রতিহত বিভূতি লাভ করে, প্রবুদ্ধ জীবনের শতজ্ঞান অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্ম সম্ভারের নীচে চাপা পড়া সেই শিশুমনটিই যেন আপন সাক্ষী হয়ে সাহিত্যের স্পন্দবোধরূপে বর্ণণায় রেখায়িত।

তিন সাহিত্যিকের শিল্প মানসের অস্তিত্বের পেছনে যে স্ব স্ব চৈতন্যের বোধ ও অভিজ্ঞান আছে তা মেলে ধরে তাঁদের রচনাপরম্পরায় এগিয়ে গেলে রসিক পাঠকের মনে হতে পারে যে প্রত্যাশার গভীরে পৌছানোর প্রসন্ন আমেজে পূর্ণ রস ধরছে না।

তারাশঙ্কর যে বোধের জ্ঞানের কোমল আলোর প্রোজ্জ্বল স্পর্শে অবজ্ঞাত মানবজীবনের রসঘন চিত্র এঁকেছিলেন তা শেষের দিকের সাহিত্য কর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেন কতকটা ঠেক খেয়ে গেছে। মনে হবে এই সব রচনা অভিজ্ঞতা নির্ভর হয়েও শিল্প মানসের স্থির দৃষ্টির চেয়ে কতকটা অব্যবস্থিত অবস্থা থেকেই উৎসারিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে প্রেম প্রয়োজন ও সামাজিক সমস্যার সমীক্ষায় নেমেছিলেন। কিন্তু লেখকের অভিজ্ঞান প্রসূত জ্ঞান শিল্প সুষমা নিয়ে সাহিত্যের জীবনচিত্র হয়ে উঠতে গিয়েও যেন কিছুটা সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই রোমান্টিক রম্যতা পেরিয়ে জনজীবনের ভাষ্যকার হয়ে ওঠার সচেতন প্রয়াসটি সম্পূর্ণতা লাভের পরিবর্তে শুধু প্রোক্ষিপ্ত মূর্ত মুহূর্ত হিসেবে ধরা দিয়েছে।

প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ মানুষের জীবন প্রবাহের কাহিনী তন্ময় হৃদয়াভাসে পরিচয় দিতে দিতে হঠাৎ পেলেন অনুভূতির কোঠায় দেবযানের আলো। হয়ত human desire to merge with nature এর সঙ্গে এই আলোর সম্পর্ক গভীর।

তুমি রোদ্দুরের দিকে—কবিরুল ইসলাম।
নবজাতক প্রকাশন। কলকাতা-১২।
মূল্য : চার টাকা

কবি কবিরুল ইসলামের কবিতা লেখা সম্বন্ধে নিজের স্পষ্ট উক্তি—"He writes simply because he cannot escape writing." তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'কুশল সংলাপ' ভূমিষ্ঠ হয় ১৯৬৭তে। তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই "তুমি রোদ্দুরের দিকে" জন্মগ্রহণ করল একাত্তরের জুনে।

আমি কবিকে দেখিনি। অতএব ব্যক্তিগত পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা সমালোচনার ঋজুতাকে পথভ্রষ্ট করবে এই শংকা করিনা। তবু প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো কবিরুলবাবুর কবিতার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। তাই সমালোচনার পঙক্তিতে যদি কখনো প্রশংসার প্রকাশ একটু বেশী প্রকট হয়, তার জন্য আমার কলম দায়ী নয়, আমার অন্তরই দায়ী।

প্রথমেই বলেছি আমার দুর্বলতা আছে কবিরুলবাবুর কবিতার ওপর। কোনো কোনো প্রত্যয়ী সম্ভাবনার মুহূর্তে আনন্দ যখন সোনার নূপুর ঝুমঝুমিয়ে আসে, গভীর বিশ্বাসে আমরা প্রত্যেকেই হয়তো তখন মনে মনে অন্তত একবার সোনালী দেবদূত হতে চাই। অথচ প্রাত্যহিক জীবনে যখন রয়েছে আদর্শের সংগে সংগতির সংঘাত, তখন অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সন্ধির সর্ত মেনে চলতে হয়। সেই পরিচিত উঠি-মুঠি পথে কখনো আমরা ভীরু শামুকের মতো আত্মগোপনকারী, কখনো তীরবিদ্ধ নারীর মতোই করুণ অসহায়। তবু স্বপ্ন মরেনা, মূল্যবোধ নিঃশেষ হয়না, স্মৃতি অমধুর হয়না। "যেন গান স্বপ্নের সঙ্গতে শুদ্ধ"। প্রদীপ জ্বলে, ঠিকই জ্বলে। আমার তো মনে হয়, কবিরুল ইসলামের সাম্প্রতিকতম কবিতাগুলো ঠিক এমনি কোমলে-রোদ্দুরে মেশা একটি অনুভূতির অন্তরঙ্গতায় নিবিড়। দৃষ্টান্ত দিই "দেখা হবে" কবিতার থেকেই—

> "কথা ছিলো দেখা হবে। কথা আছে
> একদিন দেখা হবে। একটি প্রদীপ
> আজও জ্বলে যায় সন্তর্পণে
> আড়ালে আড়ালে।"

কবিরুল ইসলামের কবিতার বৈশিষ্ট্য, তিনি কষ্টার্জিত দুর্বোধ্যতার গহনে তাঁর কবিতাকে সমর্পণ করেননি। তাঁর কবিতায় আছে একটা স্বচ্ছতার নিরহংকার বেশ, যা প্রিয় গানের কলির মতো বারবার মনের মধ্যে রিন রিন করে ওঠে। তিনি অবলীলায় বলতে পারেন—

"তুমি কি রকম সহজে ছড়িয়ে যাচ্ছো
চতুর্দিকে—
পয়ারে, প্রবাহে!" ("তুমি ভেঙে ভেঙে")

ব্যক্তিগত অনুভব এই তিনটী লাইনে কী অবলীলায় সার্বজনীনতার অপরিসীমতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

স্বর্গত কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রতি কবির গভীর অনুরাগ নিটোল শ্রদ্ধায় বুনটে ভাষা পেয়েছে "সঞ্জয়দার জন্য" কবিতাটিতে। তেমনি আরেকটি কবিতা "নীলিমাদির গান শুনে"। কোনো অনাবশ্যক অলংকার নেই, অথচ অকৃত্রিম অনুভূতির হৃদয়নিঃসারী প্রকাশ।

সমসাময়িকতার প্রেক্ষিতে কবির কয়েকটি লেখা পৃথকভাবে স্থান পেয়েছে "বাংলা দেশের কবিতা" হিসেবে। কবিতাগুলো যে সময়ে রচিত হয়, বাংলাদেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। অথচ কবির মনে সেটা বাস্তবের চেয়েও সত্য—' বাংলাদেশ আজ রক্তে সবচেয়ে সত্য হয়ে বাঁচে"।

("ঘরে-ফেরা")

কবি বাংলাদেশ কখনো চোখে দেখেননি কিন্তু তাঁর প্রাণে বাঁশী বেজেছে নদী-মাট-ঘাট বিস্তৃত সেই সবুজ শ্যামল দেশের, যেখানের মানুষ তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন-বিশ্বাস-সোনার ইচ্ছার সংগে তাঁর অস্তিত্বের মতোই একাকার হয়ে গেছে।

"আমার রক্তে তোমার রক্তে নদী
এপার ওপার বাংলা নিরবধি' (তোমার রক্তে আমার রক্তেনদী)

এই হল কবিরুল ইসলামের কবিতা। কখনো আবেগে লোহিত, কখনো বেদনায় নীল, কখনো উদ্যত সংকল্পে দীপ্ত। বক্তব্য সোজাসুজি হয়তো সেকারণেই কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে আরেকটু তুলির আঁচড় থাকলে ভালো হত, কিন্তু নির্মোক বক্তব্যের নির্লিপ্ত প্রকাশ বেশীরভাগ সময়েই কবির শক্তি সম্পর্কে আমাকে বিস্মিত করেছে। "তুমি রোদ্দুরের দিকে" বইটির একটি কবিতার নাম। সে হিসেবে নামখানি বইটির সবগুলি কবিতার পরিচয় বহন না করলেও আবেদন নিশ্চয়ই বহন করে।

—ডাঃ সমীর বসু

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা　　**সূচীপত্র**　　বৈশাখ ১৩৭৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

নিখিল বিশ্বাস

যুগ্ম-সম্পাদক

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

গৌরগোপাল দাস

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ / বঙ্গদেশ / বঙ্গভূমি / বঙ্গ প্রদেশ ?

বাংলা দেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার পর ভারতীয় বাঙালীদের দেশ-জাতি ও পরিচয় নিয়ে বেশ কিছু পরিমাণে তর্ক বিতর্ক হয়ে গেল কোলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে। অবস্থার জটিলতা সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে। পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব তিনি রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে চেয়েছেন। সেই থেকে এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবি-শিল্পী-সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের চোখে ঘুম নেই। এঁদের ভাবখানা এই যে নাম পরিবর্তন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোন সমস্যাই নেই অথচ পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্ত্তনের কোন যৌক্তিকতা আমরা এক্ষুনি খুঁজে পাচ্ছিনা। রাজনৈতিক কারণে এই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কোনদিন যদি হয়ও তবে তা করতে খুব বেশী সময় লাগবে না। ওপার বাংলার বাঙালীরা জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন—গড়ে তুলেছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু আমরা এপার বাঙলার বাঙালীরা ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশে বসবাস করছি। ওদের সঙ্গে আমাদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির অবিকল মিল থাকলেও রাষ্ট্রীয় সংহতি নেই। তাই বলছিলাম পশ্চিমবঙ্গের নাম না পরিবর্ত্তন করে সরকার যদি এ রাজ্যের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক রূপ দিতে উৎসাহী হোন তবে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্রতী হোন। এবং তা অবিলম্বে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা ?

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে কোলকাতার টপক্লাশ বুদ্ধিজীবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের একটি দল বৈশাখের এই নিদারুণ খরতাপের তাপদগ্ধ পিচের রাস্তায় পথ পরিক্রমা করে বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন। এইরকম একটি লোক দেখানো মিছিল দেখে সেদিন আমরা প্রাণ খুলে হেসেছিলাম। তার প্রথম কারণ হলো যে সমস্ত কবি-শিল্পী সাধারণত শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ী ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত তাদের সেই রৌদ্রের মধ্য

...দের মিছিল এবং আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য দেখে। ওঁরা বলছেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী কাজ অবিলম্বে বাংলায় চালু করা হোক। বাংলা ভাষার প্রতি এই তথাকথিত শিল্পী সাহিত্যিকদের মমত্ববোধ দেখে লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে। যতদূর জানি কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকীতেই (৬১) পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেইথেকে আজ এগার বছর হলো এই ভাষাকে ব্যবহার করতে সরকার এবং বেসরকারী স্তরে কোন সুফল চেষ্টাই করা হয়নি। বিধান সভায় প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্ত্বেও আজও বাংলাকে সরকারী কাজে পুরোপুরি ভাবে ব্যবহার করা হলোনা। এই তথাকথিত শিল্পী সাহিত্যিকগণ এতদিন কোন্ বিবরে আত্মগোপন করেছিলেন? মাতৃভাষার প্রতি এমন অবহেলা ঘৃনা কোন সভ্য দেশে আছে বলে জানি না। দেখা যাক শিল্পী সাহিত্যিকগণকে আর কতদিন এই লোক দেখান লোক হাসানো মিছিল বার করতে হয়!

দুই বাংলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে গত পঁচিশে বৈশাখ যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের মধ্যে পালন করা হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এপার বাংলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী কি ভাবে পালিত হয়েছে তা আমরা বিলকুল প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং এ নিয়ে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। ওপার বাংলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হলো উভয় বাংলার অসংখ্য রবীন্দ্রানুরাগীগণ কর্তৃক কবির বহু স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহের কুঠি বাড়ীতে জয়ন্তী অনুষ্ঠান। শুধু তাই নয় ঐদিন বাংলাদেশ সরকার ঘোষনা করলেন শিলাইদহে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন গড়ে তোলার তাদের সংকলনের কথা। এপার বাংলায় রবীন্দ্র-নৃত্য সঙ্গীতের বিপুল ব্যবস্থা—ওপার বাংলায় রবীন্দ্র ভাবাদর্শে মানসিক চর্চার ব্যবস্থা। দুই বাংলার মধ্যে এখানেই পার্থক্য। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বাংলাদেশেরই সম্পদ হওয়া উচিত বলে মনে করি। কারণ বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের মনে রবীন্দ্রনাথ যে কি পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। ওরা রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শকে অন্তরের উপলব্ধিতে প্রকাশ করছেন আর আমরা মাসাধিককালব্যাপী রবীন্দ্র সঙ্গীত নৃত্যাদির অহোরাত্রি অনুষ্ঠান করে থাকি। এপার বাঙ্গালীর জীবনে এত বড় দৈন্য, দেউলিয়াপনা বোধ করি আর কখনও হয়নি।

বেয়াকুফ
গোপাল ভৌমিক

আমরা বেয়াকুফের মত
কতকগুলি নিয়মের দাসত্ব করি
যদিও মনে মনে জানি
সেগুলি অর্থহীন সংস্কার ছাড়া কিছু নয়
তবু তাদের হাত এড়াতে
বাপ পিতামহের মত আমিও পারি না।

যেমন কারও রোগে বা মৃত্যুতে
সান্ত্বনা দেবার যে প্রয়াস করি
তাকে মনে হয় বাচালতা :
যে মানুষ রোগে কাতরাচ্ছে
তার বিছানার পাশে গিয়ে
বোকা বোকা মুখে
দাঁড়ানোর কথা ভাবলেই
আমার স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে।

আবার কেউ যখন মারা যায়
হাহাকারে ফেটে-পড়া গৃহ-পরিবেশে
অপরাধীর মত মুখের ভাব করে
যখন সবাই এসে ভীড় করে
নির্মম অস্বস্তির শিকার হয়ে
আমি একপাশে চুপচাপ থাকি :
মরণের অমোঘ বিধান
আর তার ভাবগম্ভীর রূপ
চোখের জলের চেয়ে অনেক অনেক বড়।
সমবেদনার ভাষা কি করে তার নাগাল পাবে ?

সব বুঝি
অথচ দাসত্ব করি নিয়মের
সুতরাং হাসপাতালে যাই,
শ্মশান কবরখানাও বাদ পড়ে না।

মৃতদেহ

মনুজেশ মিত্র

রাত্রি কাঁপে অন্ধকারের ঝড়ে,
বিশাল বাড়ী হৃদয়ে, কোন্ ঘরে
এখনো জলে আলো!
কে যেন এক মৃতদেহের পাশে
প্রহর কাটায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে,
রাত্রি কি পোহালো?
মাঝে মাঝে শব্দ ওঠে—হাওয়া;
শেষ হলো না স্মৃতির কবর ছাওয়া—
আমার মত কে ও?
বন্ধ তালা অন্য সকল দোরে,
সে, আর শুধু একলা আলোর ঘরে
আমার মৃতদেহ!

আয় ঘুম জোনাক তারা
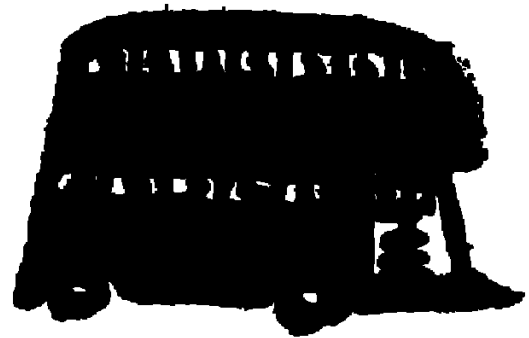
উষা ভট্টাচার্য

জোনাক জোনাক জোনাক,
টিপ টিপ টিপ জ্বলে উঠে
ফুলমস্তর শোনাক।

লাগে মন্তর গপ্‌প হয়,
ভেল কিৎকিৎ ভেলকি খেলা
সাপে কথা কয়।

ফাঁকা-মাঠে খ্যাকশিয়ালীর নথনৃত্যনাচ,
নতুন বাছুর জনম নিল
চাঁদ কপালী ছাঁদ।

আকাশ পারে তারায় টীপ জ্বল জ্বল করে
সাঁঝে সন্ধ্যায় মাটির দীপ
জ্বলে তুলসী ঘরে।

আসমানেতে বাজে ডম্বুর, লোকে বলে শিব,
খোকন ঘুমে টৈ-টম্বুর
নিভে গেল দীপ।

খুকুর মা জান কি? ঘুমের মাসি কৈ?
ঘুম দিল যে জোনাকি
আলো মোয়া খৈ।

চন্দ্রিতার আগামী সংখ্যায় সূচী

নীরা দেবীর ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ জনতা

এছাড়া গল্প, কবিতা, ফিচার

এবং

সুকৃতি রায়চৌধুরীর

প্রতিবেশী সাহিত্য

'খাসি সাহিত্যে'র উপর প্রবন্ধ।

আমাদের পাপ ধুয়ে দাও

কবিরুল ইসলাম

আজ রাত্রে আমাদের পাপ ধুয়ে দাও :
এই রাত্রির অশেষ মহিমা
আমরা সবিশেষ ওয়াকিবহাল আছি।
এই রাত্রে আমাদের পাপ ধুয়ে দাও
যেন এইমাত্র গর্ভের আঁধার মুক্ত শিশু
তাই এলো আলোব সকালে !

আজ রাত্রে আমাদের পাপ ধুয়ে দাও
আজ এই অলৌকিক রাতে॥

কালবৈশাখী

উমা চট্টোপাধ্যায়

মাথায় ধূসর ধুম্র জটা
চক্ষুতে তার বহ্নিচ্ছটা
ঐ বাজে কার গম্ভীর ডম্বরু,
হুংকারে তার কাঁপল ভূধর
বনবীথি স্তব্ধ নিথর
এবার বুঝি কালবোশেখী শুরু।
তাই তো তারি পদক্ষেপে
রুদ্র আজি উঠলো ক্ষেপে
বজ্র হাঁকে মেঘের ফাঁকে
বসুন্ধরার বক্ষ দুরু দুরু।
বজ্র ধরার সুপ্ত প্রাণে
জাগরণের মন্ত্র হানে
কালবোশেখী বারে বারে
তাই তো তারি বার্তা আনে।

বুকের মধ্যে বুক

সমীর বসু

পাঁজরগুলো জায়গামতোই পাহারাদার

ভয়ে ভয়ে
বুকের মধ্যে হাত রাখিনা
পকেট-তালাস
সিগারেটের
মুহুর্মুহু
এপাশ-ওপাশ নাড়াচাড়া
সাবধানী মন—
ভুলেও কিছু বুকের মধ্যে হাত রাখিনা

পাঁজরগুলো জায়গামতোই পাহারাদার

চায়ের দোকান—
'বন্ধু' নামের পুচ্ছধারী
যূথচারীর অবিশ্রান্ত পান্সে প্রলাপ
রাজনীতিকের দমকা বুলি—
পাঁজরগুলো উদ্ধত নয় সচরাচর

যদিও হঠাৎ
ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরতে
ককিয়ে উঠি
চুপে চুপে ॥

জয় বাংলা

সমীরণ রুদ্র
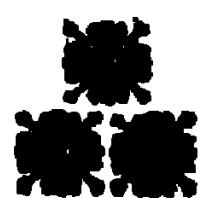
মারকিন সপ্তম নৌবহর
ভারত সাগরের উদ্দেশে।
কিন্তু কোন উদ্দেশ্যে ?
রেডক্রসের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে
পাক শাসকদের অনেকে।
খুলনা দখলের জন্য ত্রিমুখী
লড়াই আমাদের চলছে।
চট্টগ্রাম জ্বলছে।
ঢাকা অবরুদ্ধ।
খান সেনাদের আত্মসমর্পন সুরু হয়েছে।
শেষক্ষণের আর দেরী নেই।
জয় আমাদের সুনিশ্চিত।
ধর্মের জয়, আদর্শের জয়, মানবতার জয়।
কিন্তু সেদিন। সেই ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সাল ?
যেদিন ওরা ওই নেকড়ের দল হঠাৎ
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের ওপর ?
সেদিন বাতাস ভরে গেছল বারুদের গন্ধে—
রাত্রির অন্ধকার চীৎকার করে উঠল ট্যাঙ্কের গর্জনে,
কামানের গোলায়।
সেদিন রাজপথে ছিল রক্তস্রোত
আকাশে ছিল আগুন
সেদিন নারীর ইজ্জত হল ভূলুণ্ঠিত
কিন্তু আজ শত্রু পদানত
কৃপা ভিখারী,
স্তব্ধ হয়েছে কামানের শব্দ,
যুদ্ধ শেষ।
বাংলা দেশ রাহু মুক্ত।
জয় বাংলা।

ছবি

নির্মলেন্দু গৌতম

সুমিত্রা এসে দাঁড়াতেই প্রিয়ব্রতকে খুশী হয়ে উঠতে দেখলো নিখিলেশ। সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে ডুবিয়ে দিয়ে প্রিয়ব্রত সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই যে সুমিত্রা আজকে কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।'

সুমিত্রা অবাক হলো প্রিয়ব্রতর কথায়। বললো, 'সেকি, কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন।'

প্রিয়ব্রত হেসে বললো, 'বলছি।'

প্রিয়ব্রতর উদ্দেশ্য নিয়ে আসবার কথায় নিখিলেশও অবাক হয়ে তাকালো প্রিয়ব্রতর দিকে। আশ্চর্য, প্রিয়ব্রত এতোক্ষণ নিখিলেশকে কিছু বলে নি।

অবশ্য প্রিয়ব্রতর স্বভাবটাই এরকম। যে কোনো ঘটনার মধ্যে প্রিয়ব্রত একটা সহজ আনন্দ ধরে রাখতে চায়।

সুমিত্রা এবার নিখিলেশের দিকে তাকালো। সুমিত্রার চোখে কৌতুক খেলা করছে।

'প্রিয়ব্রত তোমার কাছে কোনো আশ্রম টাশ্রমের চাঁদা চাইবে না তো?' নিখিলেশ হেসে বললো সুমিত্রাকে।

সুমিত্রা বললো, 'বলা যায় না।'

প্রিয়ব্রত বললে, 'সে আরো চাল্লশ বছর পর হইবে। নিজেই আশ্রম করবো তখন। তোমরাও ইচ্ছে হ'লে সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে।'

সুমিত্রা হেসে ফেললো প্রিয়ব্রতর কথা শুনে। বললো, 'নিশ্চয়ই থাকবো।'

'কথাটা মনে রইলো কিন্তু।' প্রিয়ব্রত বললো।

নিখিলেশ বললো, 'আজকে তোমার আসবার উদ্দেশ্যটা বললে না কিন্তু।'

প্রিয়ব্রত বললো, 'এক্ষুনি বলবো?

'সৎ উদ্দেশ্য হলে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলাই উচিত।' নিখিলেশ বললো সঙ্গে সঙ্গে।

প্রিয়ব্রত কাঁধের ব্যাগ থেকে ক্যামেরা আর ফ্ল্যাশগান বের করলো। তারপর বললো, 'এতে একটাই ফিল্ম আছে। তাতে সুমিত্রার একটা ছবি তুলবো।'

'সেকী, আমার ছবি তুলবেন কেন?' উচ্ছ্বসিত গলায় বললো সুমিত্রা।

'হঠাৎ ইচ্ছে হচ্ছে তাই।'

নিখিলেশ বললো, 'সত্যি সুমিত্রার তেমন ভালো ছবি নেই। বেশ ভালো ক'রে এ ছবিটা তুলবে। বুড়ো বয়সে যেন ছবিখানা দেখে ভাবতে পারি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছিলাম।'

সুমিত্রা কিছু না ব'লে হাসলো।

প্রিয়ব্রত হেসে বললো, 'ঠিক আছে, এমন ছবি তুলে দেবো, যাতে সুমিত্রা নিজেই অবাক হয়ে যাবে।'

নিখিলেশ সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বললো, 'যাও, একটু সেজে এসো।'

প্রিয়ব্রত বললো, 'না না, সাজবার দরকার নেই। আমি ঠিক এই ভাবেই ছবি তুলবো।'

'এমনিভাবে তুললে বিচ্ছিরি ছবি আসবে যে!' সুমিত্রা বললো।

প্রিয়ব্রত বললো, 'উহুঁ, বিচ্ছিরি ছবি আসবে না।'

ব'লে তাড়াতাড়ি ক্যামেরা রেডি ক'রে ফেললো প্রিয়ব্রত।

'কোথায় দাঁড়াবো, এখানেই?' সুমিত্রা শুধালো ক্যামেরা রেডি হতেই।

ঘরের ভেতরটা দ্রুত একবার দেখে নিয়ে প্রিয়ব্রত বললো, 'তুমি এই সোফাটার ওপর বোসো।'

ব'লে উঠে দাঁড়ালো প্রিয়ব্রত। চোখ রাখলো ক্যামেরায়। সুমিত্রা সোফার ওপর বসলো।

নিখিলেশ নিঃশব্দে দেখতে থাকলো সমস্ত ব্যাপারটা।

খুব কম সময়ের মধ্যে ছবি তুলে ফেললো প্রিয়ব্রত।

'ছবি কবে পাবো?' সুমিত্রা শুধালো সঙ্গে সঙ্গে।

'কাল সন্ধ্যেয় অথবা পরশু। তুমি বরং একটা ফোন ক'রো আমায়, ব'লে দেবো।' নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে শেষের কথাটা বললো প্রিয়ব্রত।

নিখিলেশ বললো, 'আচ্ছা।'

কথা বলতে বলতেই ক্যামেরা ব্যাগে ভ'রে ফেললো প্রিয়ব্রত। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'আজ আর বসবো না কিন্তু।'

ঘড়ির দিকে চোখ রেখে সুমিত্রা বললো, 'এখনও আটটা বাজে নি কিন্তু।' তারপর মুখ তুলে বললো, 'সিনেমায় যাচ্ছেন নাকি ?'

'উহুঁ, অনেক কাজ আছে।'

নিখিলেশ বললো, 'অন্তত এককাপ চা খেয়ে যাও।'

'ঠিক পাঁচ মিনিট লাগবে চা করতে।' বলেই উঠে পড়লো সুমিত্রা।

প্রিয়ব্রত বললো, 'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট আরো বসছি না হয়।'

ভেতরে চলে গেলো সুমিত্রা।

প্রিয়ব্রতর সঙ্গে নিখিলেশ এবং সুমিত্রার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। কলেজে পড়বার সময় থেকে। প্রিয়ব্রত তখন থেকেই সুমিত্রাকে নাম ধরে ডাকতো। সব সময় নিখিলেশের চাইতে নিজেকে বড়ো ভাবতে ভালো বাসতো প্রিয়ব্রত। আর সে জন্যেই সুমিত্রাকে অবলীলায় নাম ধ'রে ডাকতো। সুমিত্রা কিন্তু তখন থেকেই পছন্দ করতো প্রিয়ব্রতকে।

নিখিলেশদের ঘনিষ্ঠ কোনো মুহূর্তে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা হ'লে সুমিত্রা খুশী হতো। প্রিয়ব্রত কতোদিন সিনেমার টিকিট কেটে এনেছে। একসঙ্গে সিনেমা দেখে তিন জন হাঁটতে হাঁটতে ফিরেছে দীর্ঘপথ।

এখন একটা ভালো চাকরী করছে প্রিয়ব্রত। নিখিলেশ জানে, সেজন্যেই সময় পায় না। অবশ্য সময় ক'রে যেদিন আসে সেদিন সেই সময়টুকু উজ্জ্বল ক'রে রেখে যায়।

সুমিত্রা প্রিয়ব্রতকে বলে, 'আপনি ইচ্ছে ক'রে সময় নিয়ে আসেন না।'

প্রিয়ব্রত হেসে বলে, 'সে আমার ইচ্ছের দোষ। তাকে বরং শাস্তি দিতে পারো।'

সুমিত্রা বলে, 'পারলে তাই দিতাম।'

প্রিয়ব্রত সুমিত্রার ছেলে মানুষী উত্তর শুনে হাসে।

'মনে হচ্ছে তুমি কিছু ভাবছো ?' হঠাৎ নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে প্রিয়ব্রত বললো।

নিখিলেশ বললো, 'উহুঁ, কিছু ভাবছি না।'

সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে প্রিয়ব্রত বললো, আপিসের একবন্ধুর

মেয়ের ছবি তুলে এলাম। রোজ বলছিলো। একটা ফিল্মে ছবি তুলিনি। সেই ফিল্মেই সুমিত্রার ছবি তুলে নিয়ে গেলাম।,

হঠাৎ সেই ফিল্মেই ছবি তুললে যে !, নিখিলেশ শুধালো।

হেসে প্রিয়ব্রত বললো, 'সে আমার ইচ্ছের দোষ।'

'দোষ না গুণ ?'

'যা বলো'।'

সুমিত্রা এল চা নিয়ে। প্রিয়ব্রতর সামনে চায়ের কাপটা রেখে বললো, 'পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নিই নি কিন্তু।'

এক মুহূর্ত ঘড়িতে চোখ রেখে প্রিয়ব্রত বললো, 'সত্যি।'

'একটুও সাজতে দিলেন না, ছবি খারাপ হ'লে কিন্তু খুব ঝগড়া করবো।' সুমিত্রা বললো।

প্রিয়ব্রত বললো, 'ঠিক আছে।'

খুব দ্রুত চা খেয়ে প্রিয়ব্রত উঠে পড়লো। বললো, 'তুমি কিন্তু ফোনটা করবেই নিখিলেশ।'

'নিখিলেশ হেসে বললো, 'আচ্ছা।'

আর একমুহূর্তও দাঁড়ালো না প্রিয়ব্রত।

দ্বিতীয় দিন টেলিফোন করতেই প্রিয়ব্রত বললো, 'আমার এখানে চলে এসো, ছবি রেডি।'

কি রকম ছবি হয়েছে, তা কিন্তু বললো না প্রিয়ব্রত।

বাড়িতে ফিরে সুমিত্রাকে কথাটা বলতেই সুমিত্রা বললো, 'তুমি বোধ হয় জিজ্ঞেসই করো নি।'

'তুমি তো প্রিয়ব্রতকে চেনো, নিখিলেশ বললো।

সুমিত্রা কিছু বললো না। হাসলো শুধু।

নিখিলেশ বললো, 'তোমার জন্য আপিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি। রেডি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

'নিচ্ছি।, বলে ভেতরে চলে গেলো সুমিত্রা।

নিখিলেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে সুমিত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো।

রেডি হতে খুব বেশী সময় নিলো না সুমিত্রা। চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললো, 'নাও, চলো।'

নিখিলেশ উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

ট্যাক্‌সি ক'রে প্রিয়ব্রতর কাছে এলো দু'জন।

এখানে একাই থাকে প্রিয়ব্রত। অবশ্য একজন কাজের লোক আছে, সে প্রিয়ব্রতর জন্য রান্না থেকে শুরু ক'রে সব কিছুই ক'রে দেয়।

সুমিত্রা প্রিয়ব্রতর ঘরে ঢুকেই বললো, 'ছবি দেখবো আগে।'

'তার আগে চা হোক।' ব'লে প্রিয়ব্রত ব্যস্তভাবে ভেতরে গলা বাড়িয়ে চায়ের কথা ব'লে দিলো।

নিখিলেশ বললো, 'চায়ের জন্য তোমার ব্যস্ত হবার দরকার ছিলো না।'

প্রিয়ব্রত বললো, 'ব্যস্ত না হলে চা আসতে দেরী হবে। আর চা আসতে দেরী হ'লে সুমিত্রার ছবি দেখতেও দেরী হবে।

সুমিত্রা প্রিয়ব্রতর কথা শুনে হাসলো শুধু।

প্রিয়ব্রত কিন্তু চায়ের জন্য অপেক্ষা করলো না। কথা বলতে বলতেই ড্রয়ার টানলো। ভেতর থেকে বের করলো সুমিত্রার ছবিখানা।

সুমিত্রা উচ্ছ্বসিত হয়ে ঝুঁকে পড়লো ছবির ওপর।

'কী, সুমিত্রার চাইতে অনেক সুন্দর হয়েছে কিনা সুমিত্রার ছবি?' হেসে প্রিয়ব্রত শুধালো।

সুমিত্রা বললো, 'সত্যি, আমার ছবি আমার চাইতে অনেক বেশী সুন্দর হয়েছে।' তারপর নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী, সত্যি কিনা?'

নিখিলেশ বললো, 'সত্যিই তাই। তোমার একমুহূর্তের সৌন্দর্য এ ছবিতে অসম্ভব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ব্রত বললো, 'ঠিক বলেছো নিখিলেশ। ছবি মানেই একটা মুহূর্ত।'

প্রিয়ব্রত আরো অনেক কথা বলতে চেয়েও বোধহয় বলতে পারলো না। ঠিক ভাষা পেলো না। তবু মনে হলো, কথাটাকে খানিকটা অনুভব করতে পেরেছে সুমিত্রা। নিঃশব্দে তাই ছবিখানাই দেখতে থাকলো।

চায়ের পরও অনেকখন গল্প হলো। হাজার গল্প, হাজার প্রসঙ্গ তিন জনকেই সময় ভুলিয়ে দিয়েছিলো।

সুমিত্রাই ঘড়ি দেখে চম্‌কে উঠে পড়লো একসময়।

'এবার যাবো। ছবি খানা নিচ্ছি কিন্তু।'

বলেই উঠে পড়লো সুমিত্রা। নিখিলেশও উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

প্রিয়ব্রত বললো, 'মাঝে মাঝে চলে এসো না এখানে।'

সুমিত্রা বললো, 'চেষ্টা করবো।'

আর কথা হলো না।

বাইরে বেরিয়ে কিছু সময় নিঃশব্দে হাঁটলো নিখিলেশ। স্বচ্ছন্দ পায়ে সুমিত্রা তার পাশে পাশে হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতেই সুমিত্রা হঠাৎ বললো, 'যাক্ ভালোই হলো, যত্ন করে রেখে দেবো ছবি খানা। বুড়ো বয়সে এই ছবি দেখে ভাবতে পারবে, সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করেছিলে তুমি।'

নিখিলেশ বললো, 'এতো তোমার একমুহূর্তের সৌন্দর্য।'

সুমিত্রা একটু যেন অবাক হয়ে তাকালো নিখিলেশের দিকে।

নিখিলেশ ফের বললো, 'আমার মনের মধ্যে তুমি অন্তহীন মুহূর্তের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে আছো সুমিত্রা। তোমার এক মুহূর্তের সৌন্দর্য যত্ন করে রেখে কি হবে?'

চম্‌কে উঠলো সুমিত্রা।

অনেকখন কোনো কথা বললো না। হাঁটতে হাঁটতে গভীরভাবে কিছু ভাবলো, তারপর অসম্ভব সহজ গলায় বললো, 'জানো, আজকে আমার নিজেকে সব চাইতে বেশী সুখী মনে হচ্ছে।'

নিখিলেশ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকালো। সুমিত্রার মুখে সত্যিই সুখের চিহ্ন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। নিখিলেশ অনুভব করতে পারলো, তাকে কখন যেন অবলীলায় ছুঁয়ে ফেলেছে সুমিত্রা।

নিখিলেশ আর কিছু বলতে পারছে না। হঠাৎ আলোয়, মানুষে উজ্জ্বল পথের মধ্যে সে যেন অন্য একটা পথ পেয়ে গেছে পায়ের তলায়। সমস্ত শরীরে তারি জন্য রমণীয় সুখের প্রতিধ্বনি বেজে উঠলো।

রোমাঞ্চিত নিখিলেশ এবার দু'হাতে অজস্র আলোর ফুল উড়িয়ে সেই পথেই দীর্ঘপায়ে হাঁটতে থাকলো।
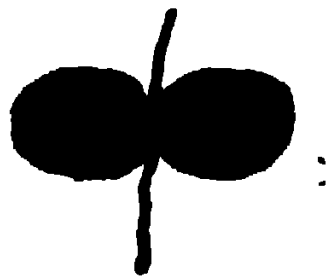
গুজরাটি সাহিত্যের টুকিটাকি

সুকৃতি রায়চৌধুরী

আদি পর্ব :

দাক্ষিণাত্যের ভাষাগোষ্ঠী ছাড়া প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হল সংস্কৃত ভাষা থেকে। পালি, প্রাকৃত অপভ্রংশে রূপ পরিগ্রহ করে আধুনিক ভাষার বর্তমান রূপান্তর। গুজরাটি ভাষার ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে গেলে দেখতে পাবো প্রাচীন গুজরাটি সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব। সংস্কৃত থেকে যখন পালির চেহারা নিল, তাতে দেখা গেল বৌদ্ধ প্রভাব আবার অপভ্রংশ অংশে দেখি জৈন প্রভাব। গুজরাটি সাহিত্য পর্য্যালোচনায় এই কথাটা মনে রাখতে হবে। রাজস্থানের কয়েকটি অঞ্চল ও মলিওয়া, সমগ্র অঞ্চলে একই ভাষায় কথা বলা হোত। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে তার বাঁধন আল্‌গা হয়ে যায়।

প্রাচীন গুজরাটি সাহিত্য দুটি ধারায় প্রবহমান ছিল। একটি হল পৌরাণিক গল্প উপাখ্যান, অপরটি হল ধর্মকথা, অথবা প্রেমের উপাখ্যান যার মধ্যে পাওয়া যাবে একটু ধার্মিক গল্প অথবা নীতিকথার ছোঁয়া। ধর্মকথা পর্য্যায়ে প্রথম যেটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তার নাম 'তরঙ্গলোলা', যেটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা পদলিপ্তাচার্য্য। এটি একটি প্রেমের উপাখ্যান—জন্মজন্মান্তর প্রেমিক মিলিত হয় প্রেমিকার সঙ্গে—শাশ্বত প্রেমের এই বাণী বিধৃত হয়েছে এ কাব্যে। শালিভদ্রসুরি-র 'ভারতেশ্বর বহুবলি রাস' আর একটি প্রাচীন কাব্য। ৫৫০ খৃঃ থেকে ৭৫০ খৃ: পর্যন্ত যে দুজন কবির নাম আমরা পাই, তারা সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। একজন হলেন সৌরাষ্ট্রের ভট্টি। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'ভট্টিকাব্য'। অন্যজন, আবু অঞ্চলের মঘা। এঁর রচিত কাব্যের নাম 'শিশুপাল বধ'। এরপর এলেন হরিভদ্র। উনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত হলেও পরে জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি অনেক দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ষড়দর্শন

সমুচ্চয়' ও 'ধর্মকথা'। তীব্র ব্যঙ্গের আলোয় উদ্ভাষিত তাঁর 'ধূর্তাখ্যান ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার বিচারের নানাদিকে আলোকপাত করেছে।

গুজরাটি ভাষার আদিরূপের জন্ম বলতে গেলে ১১০০ খৃষ্টাব্দে। অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এগিয়ে চলল সে। তবুও একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও কথ্যভাষায় সেকালীন সাহিত্য রচিত হয়েছে। দক্ষিণ গুজরাট অঞ্চলে যে আঞ্চলিক ভাষা তা হাস্যরসের উপযুক্ত—তাকে বলা হ'ত লাতি। এই লাতি ভাষার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। সাহিত্য ও কৃষ্টির বিকাশকেন্দ্র ছিল মলিওয়া ও উজ্জয়িনী—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এখানকার পরমারা শাসকবর্গের অনেকেই ছিলেন বিদ্বান এবং বিদ্যাসভার পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা রাজকবি বা সভাকবিদের উৎসাহ দিতেন। এই শাসকশ্রেণীর একজন, ভোজ পরমারা রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'শৃঙ্গারমঞ্জরী'।

শাসকবর্গ আসে যায়—রাজ্য হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু সাহিত্য সেবায় বিরতি আসে না। প্রাণের ক্ষুধা, রসাস্বাদনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আসেন শিল্পী, আসেন সাহিত্যিক। রাজ্যের ক্ষমতা এল চালুক্যদের হাতে। তাঁরা নিজেরা কবি ছিলেন না কিন্তু গুণের কদর করতেন—করতেন গুণীর আদর।

চালুক্য রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন জয়সিংহ সিদ্ধরাজ। তাঁর রাজ সভায় অদ্ভুত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন হেমচন্দ্র। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচনা লিখেছেন যেমন, তেমনি প্রসাদগুণসম্পন্ন তাঁর রচনা। ভারত সাহিত্যগগণের সেদিনের ভাস্কর হেমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা বিকশিত হয়েছে ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র, জীবনী ও কবিতাবলীতে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন রামচন্দ্র। ইনি শুধু যে অনেক নাটক লিখেছেন, তা নয়, নাট্যপ্রয়োগবিদ্যা ও নাট্যরচনা বিষয়েও এর ব্যুৎপত্তি ছিল। হেমচন্দ্রের ও তাঁর অনুগামীদের রচনার ভাষা ছিল সংস্কৃত। ফলে শুধুমাত্র শিক্ষিতরাই এর স্বাদ পেতেন। অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের নাটক বা গুরুগম্ভীর রচনার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। ভাষার দুরূহতা এবং বিষয়ের জটিলতা দুইই ছিল বাধাস্বরূপ। তাই রচনার বিষয়বস্তুকে লঘু করে তাদের কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা করলেন হেমচন্দ্রের দল। গদ্যে ও পদ্যে আদিরসাত্মক, বীরত্বব্যঞ্জক ও সরল নীতিকথামূলক

রচনা লিখলেন তাঁরা এবং অচিরেই তা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। জনজীবনের ছায়া সেকালীন সাহিত্যে বড় একটা প্রতিফলিত হ'ত না। শিল্প কৃতির বিচারে তাদের আসন যেখানেই হোক না কেন, এবং জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে তারা যেখানেই পৌছুক না কেন, একথা অনস্বীকার্য্য যে অলঙ্কারমণ্ডিত সাহিত্য আর জনগণের সাহিত্যের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল।

মধ্যপর্ব :

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে চালুক্যরাজাদের পতনের পর একটা নতুন যুগের সূচনা হল। সভাকবিরা শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে চলে এলেন জনগণের মাঝে। এতদিনে বুঝি হল মেলবন্ধন। সমৃদ্ধ হল জন-সাহিত্য। রাস, কথা, ফাগু, বারমাস্যা গবরা—এমনি ধারায় শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হল গুজরাটি সাহিত্য। প্রেমের উপাখ্যান আর বীরের উপাখ্যান সমান খ্যাতি অর্জন করল। কন্হাদদেপ্রবন্ধ এমনি এক বীরগাথা। এটি লিখিত হয় ১৪৫৬ খৃ:। আলাউদ্দিন খিলজি কর্তৃক গুজরাট বিজয় এর বিষয়বস্তু। জহর ব্রতর মতন পবিত্র ব্রতর জয়গান গাওয়া এবং দেশের জন্য বীরের প্রাণত্যাগ করা—অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় এসব কথিত হয়েছে।

তদানীন্তন সামাজিক পরিপেক্ষিতে এর প্রয়োজন ছিল। মুসলমানদের আগমনে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন এল—কবি সাহিত্যিকেরা তখন যদি সচেতন না হতেন, তাহলে দেশবাসীকে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতেন না।

তারপরই এল ভক্তিবাদের বন্যা। মীরাবাই নিয়ে এলেন রাধা কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় গান। মীরাবাইয়ের গানের ভাষা ছিল পশ্চিম রাজস্থানী অথবা গৌড়জারি অপভ্রংশ মারওয়াড়ী অথবা মেবারী। এর মধ্যে গৌড়জারি অপভ্রংশ থেকে প্রাচীন গুজরাটির জন্ম। লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে স্থানীয় ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে মীরাবাইয়ের গানে এবং গুজরাটি, রাজস্থানী ও হিন্দী সাহিত্য তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে।

সৌরাষ্ট্রের জুনাগড়ে জন্ম এক মহাপুরুষের, যিনি এই ভক্তিবাদকে দৃঢ়মূলে প্রোথিত করলেন উত্তর পশ্চিম ভারতে। ইনি হলেন বরণীয় ও স্মরণীয় নারসিং মেহটা। গুজরাটি সাহিত্যের মধ্যপর্বে ইনি একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

নারসিং শুধু কবি ছিলেন না, ইনি ছিলেন সাধক। বৈষ্ণব কবিতা এঁর হাতে অনন্যতা লাভ করেছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এঁর রচনার দুটি ধারা। এক ইনি ভগবানকে নানারূপে দেখে তাঁর কথা লিখেছেন—এঁর কাছে কৃষ্ণ কখনও বাল গোপাল, কখনও লীলাসহচর, কখনও বন্ধু, কখনও প্রেমিক আবার কখনও বা দুঃখ ভয়ত্রাতা। দুই, ইনি উপনিষদের কাহিনী সহজবোধ্য করে লিখেছেন। ভাব ও ভাষার সমন্বয় সাধন করে তিনি যা লিখেছেন, গুজরাটি সাহিত্যে তা আজও অমূল্য সাহিত্য বলে পরিগনিত হয়। কৃষ্ণ ও রাধার কবিতা আর দার্শনিক কবিতা দুই-ই প্রাণ পেয়েছে তাঁর হাতে। এঁর বিখ্যাত ভজন 'বৈষ্ণব জনতো' আজও লোকপ্রিয়।

একদিকে নরসিং, একদিকে মীরাবাই—এ দুজনের কৃতিত্বে কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার এসেছিল সে সময়ে। এদের উত্তর সাধকেরা তার রেশ বহন করে চললেন। ভক্তিমূলক গান রচনায় যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন রঘুনাথদাস, প্রিতম, রত্ন, মুক্তানন্দ। কবি ভালানা 'বান কাদম্বরী' অনুবাদ করলেন। দার্শনিক কবিতার হোতা হলেন নরসিং, কিন্তু তাকে সঞ্জীবিত করলেন আর এক কবি—আখো। আখো অত্যন্ত জটিল সূত্রের সাবলীল ভাষায় মীমাংসা করলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি হলেন প্রেমানন্দ। রামায়ণ ও মহাভারতের কথা কাহিনীকে উপজীব্য করে তিনি চল্লিশটির উপর গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি মূল কবিতা ও রচনা করেছেন এবং নরসিং মেহটার জীবনী ও লিখেছেন। সঙ্গীত সহযোগে উদাত্তকণ্ঠের অধিকারী প্রেমানন্দের কবিতা আবৃত্তি কবিতাপাঠকে লোকসমাজে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

একদিকে যেমন পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে গল্প, গাথা রচিত হতে লাগল, তেমনি এল সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন সাহিত্যের ধারায়। প্রেমানন্দ এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তার কারণ, তিনি পৌরাণিক কাহিনীর কথকথার মধ্যে যুগধর্মী জীবনযাত্রার ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বল্লভ নামে আর একজন কবি শাক্তবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচিত ভক্তিমূলক রচনার মধ্যে কবিতার নানা ছন্দ লক্ষিত হয়। গুজরাটি সাহিত্যের মধ্যপর্বে কেবল যে ধর্মগাথা রচিত হয়েছে, তা নয়। ধর্মকে উপজীব্য করে কবি সাহিত্যিকেরা রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন ঠিকই কিন্তু একসময় তাও

ঘঁস্তাপচা হয়ে উঠল—একঘেয়ে গল্প কবিতায় সাধারণ পাঠকের ক্ষুধা মেটে না। জৈন ও অ-জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত সাহিত্যিকেরা লিখলেন লোক-গাথা। ন্যায় সুন্দর ও সামলিভাট উভয়েই এ ব্যাপারে অগ্রণী। সাধারণ মানুষ যেন এই জিনিষটিই চাইছিল। তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিলেন তৎকালীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী। এমনিভাবে ধর্মভাবের প্রাধান্য লোপ পেল গুজরাটি সাহিত্য থেকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কাব্যচর্চা অব্যাহত ছিল, কিন্তু জৌলুষ ছিল না তাতে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন দয়ানন্দ (জন্ম ১৭৬০)। মুঘল সাম্রাজের ভিত একটু একটু করে ধ্বসে পড়ছে। চলেছে মারাঠাদের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ— অশান্তি আর অরাজকতায় ছেয়ে গেছে দেশ। সেই সময় এলেন দয়ানন্দ। তার সময়েই আবার দেখা গেল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং ব্রজভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত গর্বী, যা গরবা রাসগানের সঙ্গে গীত হয়, মানুষের চিত্তে এক অপূর্ব কাব্যময় ভাবের অনুভূতি আনল। তাঁর ভাষা নদীর স্রোতের মত স্বচ্ছ প্রবাহী। তিনি নিজে কৃষ্ণপ্রেমী ও গায়ক ছিলেন। ১৮৫২খৃঃ দয়ানন্দের মৃত্যুর পর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গুজরাটি ভাষার অবলুপ্তি ঘটে। আদি ও মধ্যপর্বে কবিতার প্রাধান্য থাকলেও গদ্য রচনা একেবারে হয়নি তা নয়। মানিক্যসুরির 'পৃথ্বীচন্দ্র চরিত্র' এবং সহজানন্দের 'বচনামৃত' উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক পর্ব :

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সমস্ত দেশে চাঞ্চল্য এনেছে জীবনের প্রতিস্তরে। সাহিত্যেরও হয়েছে নবযুগান্তর। প্রগতিশীল চিন্তানায়কেরা নব নব ভাবনার জোয়ারে প্লাবিত করলেন সাহিত্যকে। ইংরেজ এল বনিকের মানদণ্ড নিয়ে, নিয়ে এল সেই সঙ্গে তার শিক্ষাধারা। পশ্চিমী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন দিকপাল নেতারা যেন উপলব্দি করলেন নিজেদের দৈন্য-অস্পৃশ্যতা, সামাজিক কুব্যবস্থা, কুসংস্কার, অশিক্ষা ইত্যাদি। বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হল 'এলফিনস্টোন ইন্সটিটিউট'। আলেকজাণ্ডার ফোরবেস প্রতিষ্ঠিত 'গুজরাট ভারনাকুলার সোসাইটিতে' যোগদান করলেন দলপৎরাম। এটি আহমেদাবাদে ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দলপৎরাম ও নরমাদ ছিলেন সে যুগের সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিকবর্গের নেতৃস্থানীয়। গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ রসরচনা—একাধারে সাহিত্যের সর্বশাখায় সমাজ সচেতন প্রখ্যাত

লেখক, কবি অংশগ্রহণ করেছেন। নতুন সংস্কৃতছন্দে কবিতা লিখে অমর হয়ে আছেন দলপৎরাম। তাঁর রচিত নাটক 'মিথ্যাভিমান' (১৮৬৩) সেকালের জনপ্রিয় নাটক। পেশায় শিক্ষক দলপৎরাম আধুনিক গুজরাটি ভাষায় নবদিগন্তের সূচনা করলেন। সংস্কারের এই ধারা বহন করে চললেন নরমাদ। এঁকে আধুনিক গুজরাটি গদ্যের জনক বলা হয়। 'তিনিই প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গান গাইলেন। 'নর্মকবিতা' নামে তা বিখ্যাত। একক হাতে কোন আর্থিক সাহায্য না পেয়েও তিনিই প্রথম 'অভিধান' সংকলন করলেন। যদিও নরমাদের ভাষায় ছিল আড়ষ্টতা, তবু নবচিন্তার ধারক ও বাহকরূপে তিনি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন চিরকাল। তাঁর রচিত 'মণ্ডলী মলিবথী তথা লাভ' নতুন গদ্যের নিশানা।

দলপৎরাম ও নরমাদের যতটা ছিল আগ্রহ বা উৎসাহ, ততটা ছিল না সামর্থ্য—কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক ছিল। ইতিমধ্যে ১৮৬৭খৃঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এসেছে বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী। কিন্তু এর ঠিক পূর্বপর্যায়ে প্রবন্ধকার হিসেবে পাই নভালরামকে। নন্দশঙ্কর এ যুগের প্রথম উপন্যাস লেখেন—'কর্ণদেব'। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'করণঘেলো'-ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। পেশাদারী মঞ্চের প্রথম নাটকটি হল ললিতা দুখদর্শক—নাট্যকার রণছোড়ভাই। মহিপাত্রম হলেন প্রথম গুজরাটি সমাজ সংস্কারক যিনি বিদেশ যাত্রা করেছেন এবং প্রথম ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর গুজরাটি সাহিত্যের আর একটি পর্যায় সুরু হল। দলপৎরাম ও নরমাদ. নভালরামের যুগকে যদি বলা হয় সমাজ সংস্কারকেরযুগ—এই নতুন যুগকে বলা চলে পণ্ডিতী যুগ। ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে তাঁদের চিন্তার দিগন্ত হল প্রসারিত—তারা গ্রহণ করলেন অনেক কিছু, আবার ঐতিহ্যের মধ্যে অনুসন্ধান করলেন নতুনলব্ধ জ্ঞানের। পশ্চিমের যা কিছু সুন্দর তাই গ্রহণীয় এমন মত পোষণ করলেন কেউ। নব্য-তন্ত্রীদের মধ্যেও দেখা দিল বিভেদ। আনন্দশঙ্কর ধ্রুব. নানালাল. মনিলাল নাথুভাই, মনসুখরাম. ইচ্ছারাম নর্মদাশঙ্কর প্রমুখ চিন্তাবিদেরা বিদেশী শিক্ষা গ্রহণ করেও সনাতন ধর্মকেই আঁকড়ে থাকতে চাইলেন। আনন্দশঙ্কর লিখলেন 'আপনো ধর্ম'। মনিলাল নাথুভাই লিখলেন 'মনিলালনী বিচারণারা'। নানালাল ব্যক্তিগত জীবনে দলপৎরামের পুত্র। তিনি প্রথম গুজরাটিতে

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। পুরোণো গর্বি কবিতায় নতুনত্বের আস্বাদ আনলেন তিনি। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হতে হয়। নানালালের উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'চিত্রদর্শনো', 'জয়জয়ন্ত' প্রভৃতি। দ্বিতীয় একটি শ্রেণীর লেখক কবি প্রতীচ্যমুখী হলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন কবি নরসিংরাও, রমনভাই, বলবন্তরায় ঠাকুর প্রমুখ। বলবন্তরায় বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী দুই-ই নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, এবং উত্তরসূরীদের কাছে তা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে আছে। ১৮৮৬ সালে নরসিংরাওয়ের 'কুসুমমালা' প্রকাশিত হয়। লিরিকধর্মী কবিতার এটি প্রথম প্রচেষ্টা। এঁর রচনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ছায়া পাওয়া যায়। রমনভাই লিখলেন উচ্চাঙ্গের নাটক 'রাই নো পর্বত'। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আর একজন কবি হলেন কলাপি; ইনি একটি দেশীয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। এঁর রচনায় সুফীবাদ আছে—এবং এঁর কয়েকটি গজল আজও বিখ্যাত। মনিশঙ্কর ভাট বা কান্ত গুজরাটি সাহিত্যে প্রথম খণ্ডকাব্য নিয়ে এলেন। জাতীয়তাবাদী এই কবির দার্শনিক মত তাঁর রচনায় খুবই সোচ্চার। কলাপি রচিত 'কেকারব' ও কান্ত রচিত 'পূর্বালাপ' গুজরাটি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এ যুগের এক বিস্ময়কর প্রতিভা গোবর্ধনদাস ত্রিপাটি। এঁর লেখা উপন্যাস 'সরস্বতীচন্দ্র' লিখিত হয়েছে দীর্ঘ চোদ্দটি বছর ধরে। যদিও এককালীন সমস্ত রচনার মত এঁর ভাষা ও ছিল সংস্কৃতঘেষা তবু বক্তব্যের ঋজুতা ও চরিত্র-চিত্রণের জন্য এটি বিখ্যাত। ১৯৫৫ সালে গুজরাটে মহাসমারোহে এঁর শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই সময় থেকেই ছোটগল্পের চাহিদা বাড়ে, যদিও গল্প লেখকেরা তখনও তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্র শহরের চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে যেতে পারেননি। শহর কেন্দ্রিক গল্পই বেশি লিখিত হয়েছে। গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ধনসুখলাল মেহটা, হরঘড়িদাস কাঁটাওয়ালা, রামমোহন সেন প্রমুখ।

মহাত্মা গান্ধী ভারতে এলেন ১৯১৫ সালে। তিনিও নানাভাবে গুজরাটি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই পর্বকে গান্ধীযুগ বলা যেতে পারে। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন, তিনি গুজরাটি রচনায় নিয়ে এলেন সাবলীলতা—ভাষাকে করলেন সহজ, সরল ও জনসাধারণের গ্রহণবোধ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গুজরাটি বিদ্যাপীঠ' গুজরাটের সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠল। কানাইলাল মুনসী অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় রচনা করলেন ঐতিহাসিক

উপন্যাস ও গল্প। মুনসীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'লোপামুদ্রা' 'বিশ্বরথ' 'ভগবান পরশুরাম,' 'গুজরাট নো নাথ', পাতন নী প্রভৃত' প্রভৃতি। এঁর কয়েকটি উপন্যাসও বিখ্যাত নাটকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া নাটক হিসেবে 'কাকানী শশী', 'ছিয়ে তেজ ঠিক' প্রভৃতিও জনপ্রিয় হয়। সাহিত্যের সর্বশাখায় তিনিই তাঁর সাহিত্যকৃতির ছাপ রেখেছেন। গান্ধীজি চেয়েছিলেন জনগণকে সেবা করতে। তাই তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন তদানীন্তন সাহিত্যিক, শিল্পীরা। স্বাধীনতার বাণী ও অহিংসার বাণী প্রচারিত হল নব নব লেখকের বিভিন্ন রচনার মধ্যে। উমাশঙ্কর যোশী লিখলেন বিশ্বশান্তি', 'নিশীথ' প্রভৃতি কাব্য। উমাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার ভক্ত। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাবও তাঁর রচনায় এসে পড়ে। 'প্রাচীনা' ও 'মহাপ্রস্থান' কাব্যে তার নিদর্শন মেলে। মেঘাণী এ যুগের এক শক্তিশালী সাহিত্যিক। তাঁর 'যুগ বন্দনা' কাব্য, 'তুলসী কায়রো বেবিশাল' উপন্যাস 'সৌরাষ্ট্র রসধারা' লোক সংগীত সংকলন গুজরাটি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মেঘাণী কিছুদিন মার্কস্‌বাদী কবিতাও লিখেছেন। মেঘাণীর আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'সোরাথ তারা বেহতা পাণি' উপন্যাস। আঞ্চলিক পটভূমিকায় উপন্যাস লেখার পথিকৃৎ তিনি। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কবি হলেন সুন্দরম, স্নেহরশ্মি, শ্রীধরণি, কাভেরী, ভোগিলাল গান্ধী প্রমুখ। গদ্য সাহিত্যকে যাঁরা এ যুগে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে রমনলাল দেশাই অন্যতম। এঁর কলমের শক্তি ছিল অপরিসীম। অহিংসা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুসংস্কার ও সামাজিক কুব্যবস্থায় কুঠারাঘাত করেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাস, দিব্যচক্ষু', 'ভারেলো অগ্নি', 'জয়ন্ত' তার স্বাক্ষর বহন করছে। নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। কাকা কালেলকর অজস্র লিখেছেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ও জীবনী সাহিত্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। কিশোরীলাল মাশরুওয়ালার অবদান প্রবন্ধ ও জীবনী সাহিত্যে। তাঁর রচনায় ভাব প্রবণতা ছিল কম। তিনি যুক্তি দিয়ে বক্তব্যকে খাড়া করতেন। রামনারায়ণ পাঠক ছোট গল্প লিখে যশস্বী হয়েছেন। এঁরা সকলেই সমালোচক হিসেবেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গান্ধীজি চেয়েছিলেন দরিদ্র জনগণের কথা—গ্রামবাসী জনসাধারণের কথা সাহিত্যের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগণকে জানাতে। 'ধূমকেতু' অক্ষরে অক্ষরে সে আদর্শ মেনে

চলেছেন। তাঁর ছোট গল্পে দীনদরিদ্রের কথা আছে, আছে গ্রামের কথা। ধূমকেতুর রচিত 'চাউলাদেবী' অতি জনপ্রিয় উপন্যাস। আর একজন গান্ধীবাদী লেখক হলেন 'দর্শক'। কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক ও উপন্যাস লিখে ইনি বিখ্যাত হন। ত্রিশ চল্লিশ দশকে কিছু সাম্যবাদী গল্প কবিতা লেখা হয়েছে তবে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে তাদের প্রভাব অনেক হ্রাস পায়। এই দশকে সি. সি. মেহটার কয়েকটি নাটক বিখ্যাত হয় যেমন, 'আগগাড়ী', 'বীর নারমাদ', 'মাজম রাত' প্রভৃতি। এ বছরে ইনি আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন। প্রাক স্বাধীনতা যুগে যশস্বী হয়েছেন চুণীলাল মাদিয়া 'বিজয় নো বরষ' উপন্যাসের মাধ্যমে—পান্নালাল প্যাটেল 'মানবিনী ভাবাই', ও 'ম্যালেলা জীব' প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে। আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য লক্ষিত হয় এদের উপন্যাসে। এই সময়ের অন্যান্য সফল নাটক ও ছোট গল্প। এছাড়া নাটক ও ছোট গল্প প্রাণ পেয়েছে যাঁদের হাতে তাঁরা হলেন গুলাবদাস ব্রোকার ও জয়ন্তিলাল দালাল। আর দেশাত্মমূলক কবিতা ও লেখা হয়েছে ভূরি ভূরি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারত স্বাধীন হলো। সঙ্গে সঙ্গে লেখার ধারাও পালটালো নবারীতির গদ্য ও কবিতা লেখা হতে লাগল—পরীক্ষা নিরীক্ষা অবশ্য আজও অব্যাহত আছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে অবক্ষয় আর হতাশার মধ্যে কবি সাহিত্যিক শিল্পীরা চেতনার গভীরে গিয়ে উপলব্ধি করলেন এক নতুন সত্যকে। ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টি বড়—নাকি, ব্যক্তির চেয়ে সমাজ বড়, এ দ্বন্দ্বের অবসান যদিও হয়নি, তবে সাহিত্যকেরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল আঁকড়ে রইলেন প্রচলিত মূল্যবোধকে, অপরদল সোচ্চার হলেন বিদ্রোহ ঘোষণায়। গদ্য ও কবিতা, উভয় ক্ষেত্রেই এর নিদর্শন দেখা গেছে। কবিতার ক্ষেত্রে যারা সনাতনপন্থী হয়ে রইলেন তাঁরা হলেন রাজেন্দ্র শাহ, নিরঞ্জন ভগত, জয়ন্ত পাঠক. মরকন্দ ভাভে প্রমুখ। আর গদ্য রচনার এ ধারার সাহিত্যক বৃন্দ হলেন গুলাবদাস ব্রোকার, এম জাভেরী শিবকুমার যোশী, ধীরবেন প্যাটেল, বিষ্ণুপ্রসাদ ত্রিবেদী প্রমুখ। গদ্যের ক্ষেত্রে অন্তধারার প্রবক্তারা হলেন চন্দ্রকান্ত বক্সী, সুরেশ যোশী, মধু র ই, সরোজ পাঠক প্রমুখ। কবিতার অস্তিত্ববাদী নব্যতন্ত্রীরা হলেন হারিন্দ্র ভাভে চেনু মোদি, শীতাংশু, আদিল মনসুরি প্রভৃতিরা। প্রাগ্‌জী দোসা নাটক লিখেছেন—'মঙ্গল মন্দির', 'অনাহত নাদ' প্রভৃতি। শিশু সাহিত্যের

বয়স অল্প—এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হলেন গিজুভাই ভিয়স তারবেন মোদক। 'চাকোমাকো' একটি চমৎকার শিশু সাহিত্য। মোটামুটি চল্লিশ দশক পর্যন্ত এই হল গুজরাটি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।

চন্দ্রকান্ত মেহটার একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে
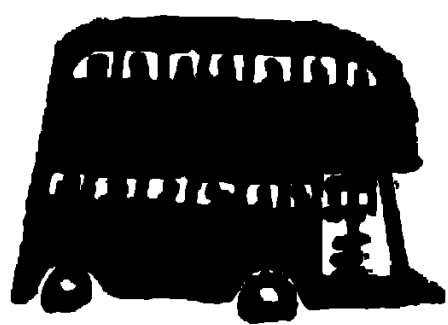
ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মানসিকতা

গৌরী ঘোষ

শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্ব সাহিত্যেও ছোটগল্প জাতীয় রচনা আধুনিক যুগের সৃষ্টি। সমাজ ও ব্যক্তি সমস্যার দ্বন্দ্ব-সংকুল পটভূমিতেই ছোটগল্পের আবির্ভাব। তাই সাধারণত: জীবন জিজ্ঞাসা ও বিদ্রোহই ছোটগল্পের প্রধান উপজীব্য। ফ্রান্সে ভলটেয়র, বালজাক ফ্লবেয়র, মোপার্সাঁ, রাশিয়ার পুস্কিন, গোগল, চেখভ, গোর্কী, ইংলণ্ডে লরেন্স, মম প্রভৃতি প্রধানত: জীবন জিজ্ঞাসার pointing finger নিয়েই গল্পের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য এ দেশের ইতিহাস কিছু স্বতন্ত্র।

বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। ছোটগল্প রচনার পটভূমি রূপে সমকালীন বাংলাদেশে নরমপন্থী ও উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের সংঘাতে একটি দ্বন্দ্ব-সংকুল পটভূমি গড়ে উঠেছিল সত্যকথা। কিন্তু এই দ্বান্দ্বিক-পটভূমি বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যুগকে খুব বেশি প্রভাবিত করেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু কিছুদিন পরেই অনুভব করলেন যে 'সাধন' 'হট্টগোলের কাঁধে' আসন নিয়েছে। সরে গেলেন রাজনৈতিক কোলাহল থেকে। গেলেন বিশ্ব ভ্রমণে, শান্তি পেলেন না। ফিরে এসে শিলাইদহ-পাতিসরের পথে পাড়ি দিলেন। এই পদ্মা গোরাই-ইছামতী-চলনবিলের দেশে 'বাংলা দেশের হৃদয়' কে অনুভব করলেন তিনি। সাধারণ মানুষকে জানলেন, গ্রাম বাংলাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন—তাঁর মানস ভূমিতে 'মানুষের জীবন কল্লোল' প্রবেশ করল। এমন সময় ছোটগল্প রচনার ডাক এল হিতবাদী সাহিত্য পত্রিকা থেকে। গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথে প্রান্তরে বিচিত্র পথ ফেরা এবং জীবন থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতার ভূমিকায় রচিত হল গল্পগুচ্ছের সোনার ফসল। ছোটগল্প মনোপ্রবণতার দিক দিয়ে একদিক থেকে গীতিকবিতার সমধর্মী। উভয় রীতিতেই স্বল্পপরিসরে জীবনের খণ্ড অংশের ব্যঞ্জনাধর্মিতা স্ব-প্রকাশিত। বাংলা ছোটগল্পের যিনি স্রষ্টা তিনি মূলত গীতিকবি। রবীন্দ্র কবিমানসের

স্বর্গ-মন্দাকিনীই মানুষের 'জীবন কল্লোল'এর অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে মর্ত্য-ভাগীরথীরূপে দেখা দিয়েছে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে সেই সুখদুঃখের ইতিহাস যা সকল জটিলতা ও সমস্যাকে অতিক্রম করে জীবনের 'ছোট সুখ ছোট ব্যথার' কথাই বার বার বলেছে। সমকালীন জিজ্ঞাসা দ্বন্দ্ব ও সমস্যা যে তাঁর গল্পে দেখা দেয়নি তা নয় কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে জীবনের আনন্দ বেদনার 'মেঘ-ও-রৌদ্রে'র লুকোচুরি খেলা। এইখানেই পৃথিবীর অন্যান্য শ্রুতকীর্তি ছোটগল্প লেখকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

প্রথম পর্বে নর-নারী ও নিসর্গ জীবনের বিচিত্র তরঙ্গ এসে তাঁর মনকে আঘাত করেছে তিনিও নব-মঞ্জরিত পত্রপুটের মত বিচিত্র রসের গল্পে তাঁর মনকে বিকশিত করে দিয়েছেন। মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দেখা দিয়েছে পদ্মাপাড়ের দিগন্তবিস্তারী সৌন্দর্য, সূর্যালোকের অকৃপণ দাক্ষিণ্য, জ্যোৎস্না-পরিকীর্ণ ধূ ধূ-বালুচরের শ্রী ও সৌন্দর্য। প্রকৃতি ও মানুষের পট-ভূমিকায় লেখা হল তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলি।

প্রথমে লিখলেন 'দেনা পাওনা' সমকালীন পণ-প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে যদিও নিরু বলেছে 'আমি কি কোন একটা টাকার থলি?' তবু এখানে বিদ্রোহের চেয়ে যেন কারুণ্যই প্রধান। অন্য দিকে 'রামকানাইএর নির্বুদ্ধিতা' ও 'তারাপ্রসন্নর কীর্তি' সমস্ত সাংসারিক জটিলতার উর্দ্ধে বিবেক-নিষ্ঠ সৎ মানুষকে তুলে ধরল। 'ত্যাগ', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'বিচারক' প্রভৃতি গল্পে সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক কোলাহল দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে সমস্ত সমস্যা নিরপেক্ষ হয়ে 'সহজ সুরে' 'সহজ কথা' বললেন 'মৃন্ময়ী' 'ছুটি' 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পে। লিখেছেন তিনি বিচিত্র ধরণের মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'মধ্যবর্তিনী' 'ব্যবধান' 'নষ্টনীড়'। সঙ্গে সঙ্গে রূপকথা পর্যায়ের 'জয়-পরাজয়' 'একটি আষাঢ়ে গল্প' বা 'দালিয়া'ও বাদ যায়নি। কতকগুলি গল্পে দেখা গেল তাঁর কবি মানসের প্রকাশ যেমন দেখেছি চেখভের 'School Mistress' বা টুর্গেনিভের 'Smoke' গল্পে। প্রকৃতির বাণীকে অন্তরে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রহণ করল 'অতিথি'র তারাপদ তাঁর কবিমন সৃষ্টি করল গীতিধর্মী 'একরাত্রি'। Browningএর Last Ride Togetherএর মত হীরকপ্রভদ্যুতিতে উদ্ভাসিত একটি মুহূর্ত অনন্ত মুহূর্তের প্রতীক চিহ্নিত হল। যেন শুনতে পেলাম Instant made eternity'। কবির রোমান্সপ্রবণ সৌন্দর্য পিয়াসী মন সৃষ্টি করল মোগল বাদসাহের জীর্ণ প্রাসাদের পটভূমিকায় 'ক্ষুধিত পাষাণ—একটি অতি-

প্রাকৃত রহস্যময় সৌন্দর্যচেতনা এই গল্পের প্রাণ। এই দৃষ্টিরই প্রকৃষ্টরূপ 'মনিহার' ও 'নিশীথে'। অর্থাৎ সমস্ত মিলিয়ে তাঁর জীবন রসাস্বাদী কবি দৃষ্টিই প্রাধান্য এই পর্বে। আঙ্গিকের দিক থেকে কতকগুলি গল্প 'টেল' পর্যায়ের হলেও 'একরাত্রি', 'দুরাশা' 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্পে ছোট গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য এক একটি impression বা প্রতীতিকে মনের মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে পেরেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে গল্প লেখার যুগে এই জীবন রসাস্বাদী দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটল। 'সবুজপত্র' বাংলাদেশে বুদ্ধিবাদের আন্দোলন নিয়ে এসেছে। চারিদিকে তখন বুদ্ধির দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনা 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে বাইরে' বলাকা' ও 'কালান্তর' এর কিছু প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ পদ্মার যে উদার প্রান্তর ও গ্রামীন পল্লীজীবন থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করতেন সেই পরিবেশ আর রইল না। বিভিন্ন সমস্যা তাঁর ক্রম-প্রস্ফুটিত মনকে দিনে দিনে প্রভাবিত করে তুলল। বিশেষত সমকালীন যুগের নারী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে এই সময়। A Doll's Houseএর নোবার কাছ থেকে সংকেত পেয়ে পৃথিবীর সাহিত্যেও যে নারীচেতনা ও বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথও তার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। এই বিদ্রোহের দৃষ্টি থেকে রচিত হল "স্ত্রীর পত্র"। সমাজ বিদ্রোহ এমন করে এর পূর্বে তাঁর গল্পে দেখা দেয়নি। এই দৃষ্টি থেকেই 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী সংপাত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। 'পয়লা নম্বর'এর অনিলা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা নিতে পারে—যেখানে সিতাংশুমৌলি ও তার স্বামীর কাছে লিখিত পত্র নীরবে অথচ দৃপ্তভাবে ঘোষণা করেছে নারীর মূল্য অবমাননায় নয়। দেবীত্বেও নয় তার মূল্য তার মানবীরূপের মহিমায়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'তপস্বিনী' গল্পে সমকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে বিদ্রূপ করলেন, বিদ্রূপ করলেন 'সংস্কার' গল্পের কলিকাকে। অবশ্য এই পর্বের কতকগুলি গল্প যেমন 'চোরাই ধন' 'চিত্রকর' 'ভাই ফোঁটা' প্রভৃতি পূর্ব যুগের জীবন রসাস্বাদী দৃষ্টিরই অনুসরণ করেছে কিন্তু তার স্থান নিতান্তই গৌণ।

এর বহুদিন পরে জীবনের শেষ পর্যায়ে সমকালীন সমস্যা ও বিদ্রোহেও তাঁর মনস্থিতিশীল রইল না। তাঁর শিল্পদৃষ্টি ক্রমশঃ হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্ককে প্রাধান্য দিয়েছে। সহজ প্রেম, সমকালীন সমস্যা সমস্ত কিছু পরিণতি পেয়েছে আইডিয়ায়। অবশ্য একথা সত্য যে জীবনের পথপরিক্রমা শেষ করে কাব্যের

র্মত গল্পেও তিনি বিভা-অচিরার প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন কিন্তু একথা সত্য যে 'তিতবাদী' 'সাধনা' পর্বের সেই জীবন রসাস্বাদী দৃষ্টি আর ফিরে এলনা। তাই এই পর্যায়ে গল্পের বিষয়বস্তু পাত্রপাত্রী সমস্তই রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া সজ্জাত সমাজ থেকে আহৃত নয়।

'রবিবার' গল্পের বিভা-অভীক যেন 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য অমিতের রূপান্তরিত সংস্করণ। পরিচিত জগতে বিভার সন্ধান পাওয়া গেলেও অভীকের সন্ধান মেলে না। বিষয়বস্তুতেও সেই 'শেষের কবিতা'র প্রেম বিবাহতত্ত্ব। বিভা জানে সে অভীককে বাঁধতে পারবে না তাই তার প্রেম চির প্রতীক্ষমান।

'শেষ কথা' গল্পটিও আইডিয়ার বারি সেচনে সিক্ত। নবীন মাধবের মধ্যে বাস্তবের ছায়া আছে। অরণ্যের প্রভাব অচিরার আদিম প্রাণশক্তি বা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল, তাই সে আকৃষ্ট হয়েছিল নবীনমাধবের প্রতি। রবীন্দ্রনাথ এখানে জীবনধর্মী। কিন্তু এখানেও আইডিয়া প্রাণধর্মকে অস্বীকার করে বড় হয়ে উঠেছে ভবতোষের প্রতি অচিরা ভালবাসার সংস্কারকে কেন্দ্র করে। অচিরার মুখ থেকে শোনা গেল আইডিয়ার জয়ধ্বনি "সতীত্ব একটা আদর্শ ......এ জিনিষটা বনের প্রকৃতির নয় মানবীর......মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে......তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়"—অচিরার প্রেম শেষ পর্যন্ত পার্সোনালকে অতিক্রম করে ইমপার্সোনালে উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

বিশেষত এই পর্বে তাঁর ভাষা ও ভঙ্গীতে কি অ-ভাবিত পরিবর্তন। epigram-এর খরদীপ্তি যেন ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। গল্পের গতি যেন বিদ্যুৎ রেখার মত ছুটে চলেছে।

বিশেষত তাঁর শেষ গল্প 'ল্যাবরেটরী' তাঁর গল্পরচনার ধারাকে একটি তীক্ষ্ণ চমক দিয়ে সমাপ্ত করেছে। এর ভাষায় যেমন ঔজ্জ্বল্য, তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির শাণিত প্রকাশ, ভাবে তেমনি চমকপ্রদ আইডিয়া। জায়া ভগ্নি মাতা কোনরূপেই নয়, সর্ব সংস্কার ও মোহমুক্ত নির্গুণ (abstract) নারীশক্তির কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মোহিনীর মধ্যে নদী স্রোত থেকে গতিকে বিচ্ছিন্ন করার মত। সর্বসংস্কার মুক্ত এই চরিত্র বুদ্ধি-প্রসূত, জীবন প্রসূত নয়। যে কোন উপায় গ্রহণ করে স্বামীর সাধনাকে সফল করে তোলা তার উদ্দেশ্য। এ তার সতী ধর্ম নয় সতী কর্ম। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় একে বলা চলে intellectual সতীত্ব।

উত্তপ্রসূত এই নারী চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আর একটি আইডিয়া জাগ্রত। মোহিণীর মোহিণী অংশের পরিচয় নীলার মধ্যে। মোহিণী সেই মোহিণীকে সামনে রেখে ল্যাবরেটরীর দরজা খুলে দিয়েছে বীরের বীর্য পরীক্ষার জন্য—যে পুরুষ সেই মোহিণী অংশকে জয় করে কর্মের শক্তিতে ল্যাবরেটরীকে জয় করে নেবে। কিন্তু মোহিণীর একমাত্র চৌধুরী ছাড়া গবেষক জোটেনি। কারণ চৌধুরীর মধ্যে যৌবনের শক্তি থাকলেও প্রলোভন নেই। "সৃষ্টি শিখরের চূড়ান্তে মোহিণী রূপ আগ্নেয় কিরীট পরিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্য লেখনীর লীলা সংবরণ করলেন।" এরকম সম্পূর্ণ প্রতীকী ধরণের গল্প তিনি এর পূর্বে লেখেননি। রবীন্দ্রনাথের গল্প-তীর্থভূমি পরিক্রমা করতে গিয়ে লক্ষ্য করি প্রথম পর্বে জীবনের রসাস্বাদে ও দ্বিতীয় পর্বে সমকালীন সমস্যায় তাঁর মন গল্পগুচ্ছের এক একটি স্বর্ণ-শস্য রচনা করেছে। শেষ পর্যায়ে সেই মন আইডিয়ার আকাশে উর্দ্ধলোকচারী।
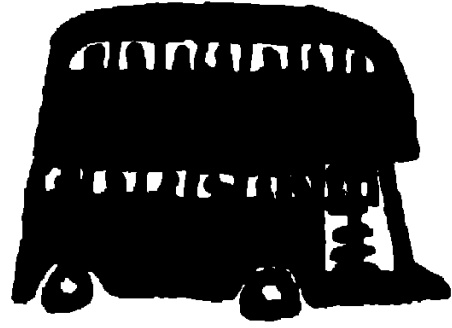
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখক লেখিকা পাঠক পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, সমস্ত রকম যোগাযোগের জন্য সব সময়ই উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে কোন রকম যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। সম্পাদক : ছন্দিতা

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

॥ আট ॥

আজ এই নির্জন অন্ধকারে পুকুরের ধারে বসে পুরনো কথাগুলো ছবির মত এক এক করে মনের পর্দায় ভেসে উঠ্‌ছে। এ গুলোকে সে মনে রাখতে চায় না। শুধু সেই শক্তি সে অর্জন করতে চায় যে শক্তিতে এই পুরনো স্মৃতিগুলো তার বুকের ভেতরের জমাট বাঁধা যন্ত্রণাটাকে জাগিয়ে না তোলে। কাজের শেষে অনিমেষ যখন ফিরে আসতো তখন গীতার মুখখানাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌তো। ভুলে যেতো তার অফিস, কাজকর্ম, বাইরের জগৎ। চমৎকার একটা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো। আর সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্য কাজের মধ্যে যখন ঝাঁপিয়ে পড়তো তখন ভুলে যেতো গীতাকে, টুটুলকে আর বাড়ী নামক বস্তুটাকে কিন্তু এ কথা সে ভুলতো না যে তার গীতার জন্য, তার টুটুলের জন্য আরো চাই, আরো—আরো—আরো পূর্ণতা, আরো আনন্দ।

গীতা শুধু একদিনই স্পষ্টে করে অভিযোগ করেছিল—তুমি কি কাজ ছাড়া আর কিছুই চাওনা অনিমেষ? যখন কাজের মধ্যে থাক তখন আমাদের কথা কি একটিবারও মনে পড়ে না?

—কিন্তু গীতা! সে তো তোমারই জন্যে। তোমাকে ভুলে যাই সত্যিই! দেখ, এই যে মুহূর্ত্তটা তোমার কাছে রয়েছি কাজের শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে এইটেই কি ভাল নয়?

—আবার যখন কাজ সুরু হবে?

—আবার ভুলে যাব। যে ক' ঘণ্টা তোমার কাছে থাকি সেই ক ঘণ্টাই তুমি আছ আমার মন জুড়ে আবার যেই কাজের মধ্যে ডুবে যাব সেই মুহূর্ত্তে তুমি আর আমার মনের কোথাও থাকবে না। তোমার উপস্থিতি সম্বন্ধেও উদাসীন হয়ে যাব।

—আমাকে সুখী করবার জন্যে আমাকেই সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছ তুমি। আর নিজেকেও।

এ কথার কোন জবাব দেয়নি অনিমেষ। এর ঠিক দিন দশেক পরেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছুটি নিতে বাধ্য হয়। সুস্থ হয়ে উঠেছিল দু চার দিনের মধ্যেই কিন্তু ডাক্তার বলেছিল বিশ্রাম নিতে অন্তত: আরো পনেরো দিন। অনিমেষ বুঝেছিল শরীরটাকে সুস্থ রাখা সবচেয়ে আগে দরকার।

গীতার প্রাণঢালা সেবা সে প্রাণভরেই গ্রহণ করেছে কিন্তু কি সে আবেগ? সেবা গ্রহণ করেছে কিন্তু গ্রহণের আনন্দটুকু কৈ? সারাদিন গীতা ব্যস্ত। অনিমেষের সব কাজ সে নিজের হাতেই করে নার্স রাখতে দেয়নি। সারাদিনের ব্যস্ততার অবসরে যখন অনিমেষের কাছে আসে তখনও তো অনিমেষের কোন ভাবান্তর দেখা যায় না। এ যেন তার প্রাপ্য এতে মুগ্ধ হবার কিছু নেই। গীতা বুঝতে পারল তার নিজের রক্তের মধ্যে—যে তাকে নিয়ে অনিমেষের মনে যে সুর একদিন রমঝম করে বেজে উঠেছিল আজ তা থেমে গেছে। কবে যেন ভালবাসার সিঁদুর রাঙ্গা আবেগটুকু মোটাটাকার অঙ্কের শূন্যগুলোর মাঝে হারিয়ে গেছে। মনে পড়ল কয়েকবছর আগেও অনিমেষ হঠাৎ অসময় বাড়ী এসে ডাকাডাকি সুরু করেছিল।

"—কি হল?—হঠাৎ?" বলে খুন্তি হাতে নিয়েই ছুটে এসেছিল গীতা।

—কি করছ এখন?

—তোমার খাবার।

—দ্যুত্তোর খাবার!—বলে হাতের খুন্তি টানমেরে ফেলে দিয়ে বলেছিল; রেখে দাও তোমার খাবার করা আজ ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে। পাঁচঘণ্টার আগে আর উঠতে পারবনা তাই পালিয়ে এসেছি একবার। লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল গীতার মুখ। দুহাত দিয়ে তার সেই লজ্জারক্ত মুখখানা তুলে ধরে বলেছিল,

—বা: লজ্জা পেলে তো তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়।

অনিমেষের বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে গীতা বলে,

—আচ্ছা তুমি কি বলতো?

—কেন কি আবার?

ঘণ্টাখানেক পরে অনিমেষ যখন ফিরে গেল একটা আশ্চর্য সুর বাজিয়ে

রেখে গেল। সেদিনের সন্ধ্যাটা গীতা আজও ভুলতে পারেনি। সেদিনের সন্ধ্যা আর আজকের এই সন্ধ্যার কত পার্থক্য, কি দুস্ত' অপরিচয়।

ঠিক এই মুহূর্তে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল বিমল এখন কোথায়? কোথায় অনিমেষ কোথায় টুটুল? আর কোথায় সে নিজে? আর কোনদিনও কি একটা সুতোয় তারা চারজনে বাঁধা পড়বে? আজ যে গীতা চলে এসেছে তার সবচেয়ে বড় কারণ টুটুল। দিনে দিনে তার বাবা মার সম্পর্কের মধ্যে যে বিরাট একটা ফাঁক গড়ে উঠছিল তার পক্ষে সেটা মোটেই মঙ্গলের হতনা। যে ব্যবধান আজ তাদের সম্পর্কের মাঝে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে সেই ভারী পর্দা পাথরের মত অনড় উপেক্ষার ভিত গেঁথে চলেছে। একদিকে তার মা আর একদিকে তার বাবা। অসহায় শিশু তার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত নির্ভরতা হারিয়ে ফেলে। সেই পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে একদিন সে নিজেও পাথর হয়ে যাবে। না, না, গীতা তা সহ্য করতে পারবে না। তার চেয়ে সে বড় হয়ে উঠুক সেই জগতে যেখান থেকে সে বিশ্বাস করতে পারবে তার মা বাবার সম্পর্ককে। দূরে থেকে প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে সে ধরতে পারবে না তাই ভালবাসবে মাঝে মাঝে পাওয়া মা বাবার সান্নিধ্য। নির্ভর করবে এই মিলিত স্নেহচ্ছায়ার নিশ্চয়তাকে।

এখানে টুটুল নেই। অনিমেষ নেই। প্রতিনিয়ত ভিতরের সঙ্গে বাইরের দ্বন্দ্ব নেই আর নেই বিমল। বিমল একদিন বলেছিল—"আমি আশাবাদী। সম্ভাবনা থাকলে সম্ভব হবেই। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তোমার মধ্যে গতানুগতিকতার কোন ব্যতিক্রম নেই। তুমি অত্যন্ত স্বাভাবিক তাই সাধারণ আর ঠিক সেই কারণেই তোমার মধ্যে কোন সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয়না। আজ আমার ভালবাসা যদি নিরুত্তাপ বলে মনে হয় তাহলে এইটেই হয়তো তার একমাত্র কারণ।" গীতা প্রশ্ন করেছিল—তাহলে সম্ভাবনাই কি ভালবাসার একমাত্র কারণ? তবে কি ভালবাসার মানুষ অক্ষম, পঙ্গু কি অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন শুধুই করুণার পাত্র? সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালবাসার উৎস সে কি শুধু তার ভবিষ্যৎ অফুরন্ত সম্ভাবনাময় বলেই? ভালবাসা তাহলে কি শুধুই কতকগুলো গর্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? গীতার মনে অনেক প্রশ্ন জমা হল। বিমল যা বললো তাই কি সত্যি? না বিমল তাকে উদ্দীপিত করবার জন্যই এ ভাবে আঘাত

দিয়েছে? কিন্তু তার নির্বিকার মুখ থেকে অবলীলাক্রমে নিতান্ত উদাসীন ভাবেই কথাগুলো বার হল। একটুও মনে হয়নি সেদিন যে আগামীর ভাস্বরতার সম্ভাবনায় আজও মেঘাচ্ছন্ন। আজ ও নিষ্ঠুর হয়েছে কাল ও অনেক বেশী স্নেহশীল হতে চায় বলেই। গীতা আর ভাবতে চায় না। নিজের প্রতি অন্ধ মায়ার বশেই হয়তো ও ভাবনাটাকে একেবারেই ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু ভুলে থাকতে চাইলেই তো ভুলে থাকা যায়না।

এখানে আসার পর কয়েকঘণ্টা কাটতে না কাটতেই অনেক আশা, অনেক ইচ্ছে আর অনেক উদ্যম ওর মনটাকে সজীব করে তুলেছিল। ও চাইছিল একটা সুন্দর নিয়মের তালিকা তৈরী করে কাজের পর কাজগুলোকে সাজিয়ে নেবে। কি কি গড়তে হবে আর ভাঙ্গতে হবেই বা কি কি এইটেই প্রথম প্রশ্ন কিন্তু এই গড়া আর ভাঙ্গার কাজ করতে হলে সব আগে জানতে হবে এই মাটিটাকে, যে মাটি থেকেই আবার নতুন কোন ছাঁচ তৈরী হয়ে উঠবে। তাই ও ঠিক করেছিল সব আগে পরিচিত হওয়া দরকার এখানকার জনজীবনের সঙ্গে। কিন্তু পবিচয় জানতে হলে নিজের পরিচয়টাও তো জানাতে হবে। শুধু 'সমাজ সেবিকা' এই পরিচয়ে মানুষের কৌতূহল তৃপ্ত হয় না। সে খুঁড়ে খুঁড়ে জানতে চাইবে কেন তুমি সমাজের সেবা করতে চাও? আদর্শ? না হতাশা? কোনটা তোমাকে টেনে এনেছে এই মহৎ উদ্দেশ্যের সীমানায়? বড় বড় বুলি আওড়ালে তো চলবে না। কোন ভয়ানক ক্ষত আছে কি তোমার? যেটাকে লুকোবাব জন্য তুমি পালিয়ে এসেছ? মানুষের মহৎ কৌতূহলের পাশে পাশে নিতান্ত তুচ্ছ ক্ষতিকারক কৌতূহলগুলোও যে মাছির মত ভন্ ভন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। মানুষের ক্ষত খুঁজে বেড়াচ্ছে অহঃরহ। সেখান থেকে বিষটুকু আহরণ করে সমস্ত আবহাওয়াটাকে বিষাক্ত করে তুলবে। সমাজের সুস্থ পবিত্র মহৎ উদ্দেশ্যগুলোকে তাই ভাল করবার ইচ্ছে থাকলেও ভাল করা যায় না। ভালো হবাব ইচ্ছে থাকলেও ভাল হওয়া যায় না।

অনিমেষের কাছ থেকে আসবার সময় মাথার সিঁদুরটা মুছে ফেলার কথা একবারও মনে হয়নি গীতার। অনিমেষের অজস্র স্মৃতি যখন সে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে তখন তার হাতের দেওয়া সিঁদুরটুকু কি এমন অপরাধ করেছে? প্রথম যেদিন ও এখানকার ডাক্তার নীলমণি ঘোষের বাড়ী গেল সেদিন ডাক্তার গিন্নী ওকে খুবই আগ্রহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ গ্রামের

মধ্যে তখন তিনিই নাকি একমাত্র শিক্ষিতা মহিলা ম্যাট্রিক ফেল। বিদুষী গীতাকে তাঁর সমকক্ষ বলেই মনে হল।

"আসুন ভাই আসুন কি সৌভাগ্য আমার।"

অভ্যর্থনায় বেশ শহুরে ছোঁয়াচ। প্রথম ফাঁড়াটা কেটে গেল। একটু স্বস্তি পেল গীতা। গীতা শসংকোচে বল্লে—

—অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম নাতো?

—ওমা! অসময় কেন? আমাদের তো ভাই এইটেই সময়। সকাল সন্ধ্যায় তো–সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তাছাড়া একটু খবরের কাগজ। বই টই পড়ি আর সবচেয়ে বড় কথা দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমুলে গায়ে চর্বি লাগবে। তাই দুপুরটা আমি একটু এ বাড়ী ও বাড়ী বেড়াই। আজ আপনি এলেন ভালই হল। গীতা প্রশ্ন করলো।

—আপনার ছেলেমেয়ে বুঝি বড় হয়ে গেছে?

- হ্যা ভাই। আমার দুটি ছেলে। মেয়ে হয়নি। ছেলেরা স্কুলে পড়ে।

—আপনাদের এখানে মেয়েদের স্কুল আছে?

—আছে একটা প্রাইমারী, তা, সে না থাকারই মধ্যে। কোন দিদিমনি তো নেই। সবই ছেলে মাষ্টার। তাই আবার অনেকে মেয়েদের ইস্কুলে দিতে চান না।' গলাটা কল্পিত সন্দেহে একটু খাটো করে বলেন—'বুঝতে পারছেন না এটা একটা অজ পাড়াগাঁ। গাঁয়ে কি একটাও শিক্ষিত মানুষ আছে। যত সব মুখ্যুর দল। পড়াশুনার মর্ম কে বুঝবে?' —এবারে গলাটা বেশ গদ গদ করে আর চড়া স্বরেই বল্লেন। —'দেখুন না ভাই, তাই আমার হয়েছে যত জ্বালা। কার চিঠি পড়ে দেওয়া, কারো বা চিঠি লিখে দেওয়া। কাকে দুটো সৎ পরামর্শ দিতে হবে তার ভাবনা। আমার ভাই কর্তা, মিথ্যে বলবনা, নিতান্ত ভালমানুষ। মানুষ জন হরদম আসুক যাক আমার বাড়ীতে তাতে তাঁর কোন আপত্তিই নেই। বলেন, 'পরের উপকার একটু করলেই বা, তুমি শিক্ষিত বলেই তো তারা তোমার কাছে আসে। দুটো সৎ বুদ্ধি, বিবেচনা দেবে তাতে তো আর পয়সা লাগেনা।'

গোলগাল মুখখানিতে খুসীর আহ্লাদ ঝরে ঝরে পড়ে। গীতা বলে—'হ্যা সেতো ঠিক কথাই। আপনি তো ভাল কাজই করছেন। আচ্ছা আজ চলি ভাই। আর একদিন আসব। আপনি একদিন আসুন না আশ্রমে।' খুব আগ্রহ নিয়েই গীতা অনুরোধ জানাল। কিন্তু এই কথায় হঠাৎ ডাক্তার

গিন্নীর মুখখানা একটু ভারী হয়ে গেল। যেন একটু দূরের মানুষ। ভুলপথে পা বাড়িয়ে পরক্ষণেই সাবধান হয়ে পা টেনে নেওয়ার মত্ত ভঙ্গি। —'না ভাই ঐ অনুরোধটি কোরবেন না। আমার বাড়ীতে যে কেউ আসুক তাতে আপত্তি নেই কিন্তু আমি যেখানে সেখানে গেলে ভারী অসন্তুষ্ট হন।' অকারণে কি কারণে জানিনা 'যেখানে সেখানে আর যে কেউ কথাদুটোর ওপর বেশ একটু জোর দিয়েই বল্লেন ডাক্তার গিন্নী। আর কথাটা বলতে পেরে মুখখানাতে আত্মপ্রসাদের যে ছাপটুকু ফুটে উঠেছিল সেটা হজম করতে একটু সময় লেগেছিল গীতার। কিন্তু 'দৈর্য্য হারালে চলবেনা' এই বোধটাই তখন তাকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। মুখখানায় আত্মীয়তা মাখিয়ে নিয়ে গীতার হাতদুটো ধরে বললেন,—'রাগ কোরলেন নাতো ভাই ?' আপনি কিন্তু আসবেন মাঝে মাঝে, না এলে খুব দুঃখ পাব।

—আসব বৈকি, নিশ্চয়ই আসব। আজ চলি, কেমন ? নিজের জায়গায় ফিরে এসে গীতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এক গা গহনা আর বাঁকা সিঁথিতে লাল ডগডগে সিঁদুর আর উঁচু করে খোঁপা বাঁধা দেখে আর ম্যাট্রিক ফেলের গর্বের আওতায় এসে ওর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ী নৈহাটি। কোলকাতার দক্ষিণে বাতাসের ঢেউ এসে শহরতলীগুলোতে বেশ ধাক্কা দিয়েছে। গীতা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত হয়ে পুরুতগিন্নী খেঁদিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির।

—'হ্যাঁরে কুমকুম তোর কাছে নাকি আশ্রমের সেই মাগীটে এসেছিল ?

—ছিঃ ও ভাবে কেন বলছেন মাসীমা ? আশ্রমের ঐ ভদ্রমহিলার কথা বলছেন তো !

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোদের ঐ ভদ্দর মহিলার মাথার সিঁদুর দেখলি নাকি ?

—হ্যাঁ সিঁদুর তো রয়েছে, পেড়ে সাড়ী হাতে চুড়ি নোয়াও তো রয়েছে।

—কি কি কথা হল তোর সঙ্গে ?

—কেন, এখানকার সব কথা ? কি কি আছে ? কি কি হয়, না হয়।

—আ-মরণ ! কি কি হয়, কি কি আছে, না আছে তাতে তোর কিরে ? আমাদের যা আছে না আছে তা থাক না। এসেছিস আশ্রমে, তা না বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাঁড়ির খবর নেওয়া।'

এবারে কুমকুম একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলে। —তা আপনার এত রাগ কেন মাসীমা ? ওতো মন্দ কিছু বলেনি। দেখাই যাকনা ব্যাপারটা কি ? তেমন যদি হয় তাহলে গাঁ ছাড়া করতে কতক্ষণ।

—কি জানি বাবু ! তোমরা সব আজকালকার মেয়ে সব কিছু চোখে দেখা চাই তবে বিশ্বাস পাবে। আমরা ওসব ছোঁয়া দেখলেই বুঝতে পারি। সাবধান হই। কথায় বলে সাবধানের মার নেই। তা এখন চলি বাছা। তোর সঙ্গে যখন নিজে এসে ভাব করেছে তখন তুই বেশ করে জেনে নিস তার ভাবগতিকটা কি ? চলি ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে। (ক্রমশঃ)

আমার বুকের মধ্যে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমার বুকের মধ্যে তবু আজ ব্যথার পূরবী,
অসহায় অন্ধকার গ্রাস করছে এখন আমাকে।
তবুও আমি চাইনা তোমার প্রতিচ্ছবি
সময়ের হাতে পড়ে ম্লান হোক। কারণ তোমার
অরণ্যে যে ফুলগুলি ফুটেছে এখন, বাঁকে বাঁকে
সে সব চঞ্চলাঞ্চল, ঢেউয়ের নরম শব্দ,
যেন অতল জলের আহ্বান
শুনেছি নির্জনে আমি, আমি চাই হোক সে বহত
অন্য সমুদ্রের দিকে, যে সমুদ্র কখনো তাহার
লবণের আক্রমণে গ্রাস করে ফেলবে না তাকে
পর্যাস্ত হবে না তার গান।

ব্রততী, তোমার ঐ পত্রপুষ্প পল্লবের ভার
কোথায় রাখবে, তুমি তুলে দেবে কাকে ?
এ রৌদ্রে অনেক দাহ, এ হাওয়ায় অনেক বিষের
প্রচ্ছন্ন অভিযান, এ মাটিতে মৃত্যুর মহা আকর্ষণ :
অথচ ফুটেছ তুমি এ মাটির ঘরে
অসহায় অন্ধকারে, হিম শীতলতা জীবনের
বুকে করে। চারিদিকে নিঃশব্দ মরণ।
অথচ আশ্চর্য তুমি ভুল করে এসেছ নদীটি
শুষ্ক তপ্ত বালুকার বিদীর্ণ রুদ্ধ হতাশ্বাসে।

পেরিয়ে এসেছ তুমি মাত্র আঠারোটি
বসন্তের রুদ্ধ ব্যথা, এরপর রয়ে গেছে দীর্ঘ নিদাঘের
দাবদাহ, অতঃপর বলো কার কাছে
যাবে তুমি ? সর্বরিক্ত ভীষণ শীতের প্রস্তাবে
তোমাকেও সাড়া দিতে হবে, শেষে সর্বস্বান্ত করে নিয়ে যাবে।

এ সব দৃশ্যের আগে আহা আমি যদি পারতাম
তোমাকে বুকের মধ্যে করে আমি লুকিয়ে রাখতাম
অন্য আকাশের ঘরে ! আহা এই ফুলটিকে
কে এখানে ফোটাল এমন
অলৌকিক এই ফুল, তুমি ত কে নিও না, জীবন।

নাম দেবো

জয়ন্তী সেন

যদি চাও নাম দেবো, নীল ছায়াময়
অন্ধকারে ডুবে নয়
আলোর সকালে
উজ্জ্বল কাচের গায়ে স্পষ্ট প্রতিকৃতি
এঁকে দেবো দুঃসাহসে,
গোপন পেটিকা
এক টানে খুলে দেবো লক্ষকোটি দর্শক সমীপে।
যদি চাও, একমাত্র নীল পদ্ম
মায়াবী জলের
বুক থেকে তুলে দেবো, যে কোন প্রতীক
নামকরণের মূল্য প্রতিদানে
বিস্মিত করার
স্পর্ধায় অন্ধকে আমি দৃষ্টি দেবো
মূর্ত্তি গড়া হলে।

নজরুল স্মরণে

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য

চরম বিদ্রোহী আমি—
বিদ্রোহী এ সমাজের, বিদ্রোহী সংসারের।
নেপথলিনের গন্ধ শুকিয়ে মন ভোলাতে চায়,
শ্মশানে টায়ার পোড়ালে গ্যাসে দুনিয়ার সিলিণ্ডার ভরতে চায়!

সে গন্ধ আমি শুকতে চাই না,
চায় না দেখতে ঐ গ্যাসে ভরা সিলিণ্ডার।
যতই উল্লাসে তোরা উল্লসিত হ'স,
ক্রোধের উত্তাল-তরংগ অন্তরে বাইরে।

প্রয়োজন ছিল কি—এ প্রহসনের?
ব্যাভিচারে মত্ত হয়ে লক্ষ কোটী মানুষের মাথার ঘাম পায়ে.
মদের বোতলে পোরার?
ফুটে ওঠা শিশুকে নিঃশেষে গলা টিপে হত্যা করে,
বুদ্ধের বীজমন্ত্র ছড়াবার?

ঘাতকের গায়ে নামাবলী!
মানি না তোদের।
তোদের বিরুদ্ধে আমি মুক্তকণ্ঠ,
সোচ্চারে ঘোষণা করছি—অবাধের লড়াই।
নেমে আয় মাঠে।
আচমকা কোমরের তলায় লাথি না মেরে,
বিষাক্ত শলাকা হাতে বিভীষিকা না ছড়িয়ে,
সহজ উলঙ্গ মাঠে সোজা নেমে আয়,
ষ্টেসনের যাত্রীরা শুনুক কার স্বর বেশী—
পূব আকাশে লাল মেঘের ঘনঘটা দেখে
পেখম মেলা ময়ূরের,
না, তোদের মত ময়ূরপুচ্ছ লাগানো কাকের বাসায় লালিত

ছিনতাই-এর ছিন্নশির কোকিলের?
নেমে আয় মাঠে—
বিদ্রোহী আমি মনে রেখে
হিংস্র নখের ফলা গায়ে না বিঁধিয়ে
দলিলের মূল সুর গা—
দেখি কার্ কণ্ঠ বেশী,
সরাইখানায় রাতজাগা ঢুলুঢুলু চোখ
তোদের মাতালের কণ্ঠে,
না, আগুনের ফুলকী মেশা, জোঁয়ার-ভাঁটা গেলা,
আমার কণ্ঠের?

চরম বিদ্রোহী আমি.
ফল্গুর অন্তলীন স্রোত আছে মনে;
দেখবো কেমন করে রথ-চাকা থামে,
কে বসে দেখবো আমি,
রক্তের চেয়ে দামী ঐ জীবনের সিংহাসনে.

রক্তের দাগ ধুয়ে ফেল

শঙ্কর চক্রবর্তী

আজ তোমার হাত থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেল।
দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন শেষ হয়েছে, হে মধ্যম পাণ্ডব।
আজ সব ক্রোধ—সব দাহ ভুলে যাও।
আজ ফিরে যাও মায়ের কাছে তার ছোট্ট শিশুর মতো।

যদি পার আজ তোমার চোখের আগুন নিভিয়ে দিও॥

উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার কালচার

হেনা চৌধুরী

আষাঢ় মাস। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে—ফিরছিলাম যুগান্তর পত্রিকা অফিস থেকে। দিনটা বোধ হয় ছিল পাইকারী হারে বিয়ের দিন। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বাস ষ্টপেজে। কিন্তু বাসের আর দেখা নেই। আপন মনে লক্ষ্য করছিলাম পথচারীদের। বিশেষ করে মেয়েদের। আমি নিজে মেয়ে হলেও মেয়েদের দেখতে আমার বেশ লাগে। কত রকমের সাজসজ্জা। কত রকমের হাসির ঠমক, আর গ্ল্যামারের চমক। তবে দেখছিলাম উত্তরের মেয়েদের সাজসজ্জার ভাব ও জাকজমক আজও বেশ চেপে বসে আছে, ভারমুক্ত হতে বুঝি আজও তারা শেখেনি।

বেশীর ভাগ মেয়েই ছিলেন বিয়ের বাড়ীর যাত্রিণী। তাই তাদের চোখ ধাঁধানো সাজসজ্জা বিশেষ করে চোখে পড়ছিল। লাল, নীল, বেগুনী নানারকম ঘোর রং-এর বেনারসী শাড়ী তার সংগে ব্লাউজের মিল থাকলে ভাল না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। বিশেষ করে লাল বেনারসীর সংগে ঘোর হলুদ রং-এর জামার combinationটা আজও আমি ভুলতে পারিনি। হ্যাঁ, এরপর গয়নার কথা! উত্তর কলকাতার মেয়েরা আজও প্রবল অলংকার প্রিয়। বেশ কিছু পরিমান ব্যাঙ্ক গায়ে চাপিয়ে তারা সর্বদাই চলাফেরা করেন দেখেছি।-আর আমি দেখেছিলাম তাদের বিয়ে বাড়ীর সাজে অতএব বুঝতেই পারেন অঙ্গ তাদের ছিল সোনায় মোড়া। কানে বড় বড় ঝুমকো পাশা, গলায় চাটাই হার বা নেকলেশ জাতীয় গয়না। আর হাতে চুড়ির সংগে বালাচুড় যতরকমের হস্তবন্ধনী আছে। এরপর প্রসাধন। আধুনিকারা প্রসাধন ব্যাপারে অনেক পরিমিত। মুখে তাই পেন্ট করার প্রচলন আধুনিক নারী সমাজ থেকে উঠেই গেছে বলা যায়। কিন্তু এরা তো সব কিছুতেই সাবেকী ধরণের। উৎকট পেন্ট করার ফলে মুখের যে সৌন্দর্য্য সেটা ম্লান হয়ে গেছে বলা যায়। পায়ে জরি দেওয়া শ্যামবাজারী ধরণের চটি—সেই চটির ফাঁক থেকে উঁকি মারছে অলকরঞ্জিত পা দুখানি। মাথার চুলে বেশ যত্ন

করে তেল দেওয়া। সেই তৈলাক্ত চুল বেঁধেছেন তারা বেশ কয়েক ডজন কাঁটা দিয়ে। তার ওপর সযত্নে বেল বা জুঁই ফুলের মালা জড়ানো। মানে এককথায় বলা যায় নিখুঁত সাবেকী এক একটি মডেল। সংগে রয়েছেন স্বামী বা অন্য কেউ। টিপটিপ বৃষ্টিতে তাদের সেই মনোরম সাজসজ্জা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেউ বা ট্যাক্সী খুজছেন কেউ বা বাস ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। বেনারসী পরে বাসে চড়ার কথা ভাবাই যায় না তাই না? তাতে শাড়ীর মর্যাদা নিজের মর্যাদা সবই নষ্ট হয়ে যায়। ভাববেন না বাড়িয়ে বলছি। আমার পাঠক পাঠিকারা জানেন যে বাড়িয়ে বলতে আমি মোটেই ভালবাসিনা। মনে পড়ে, একদিন আমার এক প্রিয় বন্ধু বলেছিল, you have a fine analatical mind – ওর কথাটা যদি অতিশয়োক্তি না হয় তবে বলবো আমার বর্ণনা ও বিশ্লেষণে আপনারা নিজেরা যাচাই করে দেখুন!

যেমন কিছুতেই ভুলতে পারিনা জীবনের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যাটার কথা। বান্ধবী মনোবীণা নেমতন্ন করেছে ওর জন্মদিনে। বলেছিলাম, কথা দিচ্ছি না যদি কোন কাজে না আটকে যাই তবে নিশ্চয়ই যাবো। মনোবীণা কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। বড়লোকের মেয়ে। ওর বাবার export import-এর ব্যবসা। নিউ আলিপুরে বিরাট বাড়ী। ওদের বাড়ী গেলে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রথমে ছুটে আসে কুকুর। মনোবীণার বাবা, মা ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার। বিয়ার, হুইস্কীর বোতল নিয়ে ওদের বাড়ীতে লুকোচুরির দরকার নেই। মনোবীণা বি, এ, পাশ করার পর আর পড়াশোনা করেনি। বিয়ে কেন করেনি জানিনা—কোন এক সওদাগরী অফিসে ও receptionist-এর কাজ করে। চেহারাটা মোটামুটি চলনসই। তবে চোখে পড়ার মত নয়। যাই হোক ভাবলাম অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। বাড়ী এসে অনেক করে বলে গেছে যখন যাই।

বড়লোকের বাড়ীর তরুণী মেয়ের জন্মদিনের পার্টি যেমন হয়ে থাকে—তরুণীর স্তাবকের দলে বোঝাই—আর বলা বাহুল্য—সেই স্তাবকের দলে যতনা তরুণ তার চেয়ে পয়সাওয়ালা মোটা গোলগাল চেহারার পৌঢ় লোকের ভীড় ছিল বেশী।

মনোবীণার পরণে সিল্কের লুংগি! গায়ে একটা জরির কুর্ত্তা। মাথার চুলগুলো শ্যামপু করা। গোড়ায় একটা নাইলনের কাপড় জড়ানো। পায়ে হাইহিলের জুতো। মুখে প্রসাধনের বাহুল্য নেই। নেই অলংকার।

ওর বন্ধু রঞ্জন এসে একটা মোটা মালা গলায় পরিয়ে দিল। চারিদিক থেকে সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার উপহারটা ওর হাতে দিলাম। ওর এই সাজসজ্জা ও পরিবেশের সামনে আমাকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল ও। কারণ ও জানে, মুখে কিছু না বললেও আমার রুচিতে প্রবলভাবে আঘাত পড়ছে।

ওর এতটা পরিবর্তন সত্যিই আমি আশা করিনি। ও বোধ হয় আমাকে নেমন্তন্ন করে একটা ভুলই করে ফেলেছে।

ওর বাবা মা এলেন। তাঁদের প্রণাম করতে গেলাম। থাক থাক বলে প্রচণ্ডভাবে তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। ভুলে গিয়েছিলাম এই modern society-তে প্রণাম করাটা খুবই সেকেলে মনোভাবের পরিচায়ক। পরে ভেবে দেখলাম এঁদের প্রণাম করার মধ্যে ও তো আমার অন্তরের ফাঁকি থেকে যেত। কারণ প্রণাম একমাত্র তাকেই করা যায় যাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি।

তারপর ওর বাবা মার সংগে গল্প হল। ওর boy friend-দের সংগে আলাপ হলো। কথাবার্তা বেশীর ভাগই চলল ইংরাজীতে।

এলো স্যাম্পেনের গ্লাস। কেক্‌, চানাচুর। প্যাটিসের ডিস।

ওর বন্ধুর দল ভেতরে চলে গেল। বোধহয় হুইসকীতে গলা ভেজাবার জন্য। শুনলাম latenight-এ ওদের dance party আছে। সে নাচ দেখবার কৌতূহল বা উৎসাহ কোনটাই আমার ছিল না।

কোনরকম ভাবে পালিয়ে এসে গাড়ীতে বসলাম। মনে মনে ভাবলাম বার্থপাশ্চাত্য অনুকরণের মোহে একটা সহজ সরল বাঙালী মেয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে!

উত্তরের মেয়েদের সবচেয়ে বড় অভাব হল ব্যক্তিত্বের অভাব। প্রায়ই কার্যোপলক্ষে আমাকে উত্তর কলকাতায় যেতে হয়—কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তেমন personality চোখে পড়েনি। তবে ব্যতিক্রম যে কেউ নেই তা বলবো না—তারা সংখ্যায় খুবই অল্প।

শিক্ষা ও কালচারের সমন্বয়ে যাদের জীবন প্রভাবিত—স্থান বিশেষের প্রভাব তো তারা কাটিয়ে উঠবেনই—তাই নয় কি?

তেমনি দক্ষিণ কলকাতার মেয়েরা জীবনের ক্ষেত্রে অনেকটা বাস্তববাদী হওয়ার জন্যই প্রগতিকে বরণ করে নিয়েছেন। চলা বলা সব কিছুর মধ্যেই

তাদের ব্যক্তিত্ব বা সপ্রতিভ ভাবটি বেশ পরিস্ফুট। আমার দেওয়া চিত্রটি অবশ্যই উৎকট আধুনিক সমাজের। কিন্তু সাধারণভাবে দক্ষিণের মেয়েরা আজ সাজসজ্জা প্রসাধন সবক্ষেত্রেই অনেকখানি বাহুল্য বর্জন করেছেন। যেমন নারী জীবনের অনেক প্রচলিত সংস্কার থেকে তারা জীবনকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁদের গর্বিত চলার ভংগী যেন বলে, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা!' আর উত্তরের নারী যেন ম্লান ভীরু কম্পিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে— '……হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনিনা।' আধুনিকতা আর অর্থ এ দুইয়ের সমন্বয়ে দক্ষিণ কলকাতার উঠতি বড়লোকের পরিবারে গেলেই এ ছবি আপনি দেখবেন। ফ্যাসনের হাওয়ায় পাল তুলে দক্ষিণের উৎকট আধুনিকারা যে কোথায় ভেসে চলেছেন তার ঠিকানা বুঝিবা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। আর আমার দেওয়া এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চিত্র দুটি থেকেই পাঠক বুঝে নেবেন উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে এখনও রয়েছে আসমান-জমিন ফারাক। উত্তরের মেয়েরা এখনও মেয়েলী অর্থেই মেয়ে রয়ে গেছেন। জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীর ছেলের সংগে প্রেম করতে ওদের বাধেনা। অপরিচিত পুরুষ দেখলে সেখানকার তরুণী মেয়েরা তো জীভ কেটে পালায়। উত্তর কলকাতায় এখনও এমন অনেক মেয়ে আছেন যাদের জীবনটা সাবেকীকালের মত রান্নাঘর আর আঁতুড় ঘরে সীমাবদ্ধ। জোর মাসে একবার স্বামীর সংগে সেজেগুজে সিনেমায় যাওয়া। আর এই আবদ্ধ জীবনের ফলেই style বা ফ্যাসান সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে পারেন না তারা। স্টাইলের মত পৃথিবী বা জীবন ও দেশ বিদেশ সম্পর্কে জ্ঞান নিয়েও তারা মাথা ঘামায় না। সিনেমা আর সিনেমার ম্যাগাজিন তাদের জীবনে একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন। তাই দেখেছি সেখানকার ছেলেরা সপ্রতিভ মেয়ে দেখলেই চেচিয়ে ওঠে 'মেমসাহেব' বলে।

পশ্চিম বাংলার ইতিহাস ঃ শ্রীরঞ্জন বাচস্পতি। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স। এম, টি ২৫/২৬ কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।

স্বাধীনোত্তর যুগের পশ্চিমবঙ্গের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাসের খোঁজ করছিলুম। গত আড়াই দশকে এ দেশে যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা ঘটে গেল তার সঙ্গে এ যুগের তরুণ সম্প্রদায়ের সম্যক পরিচয়ের জন্যই এমন একটি ইতিহাসের প্রয়োজন বড় বেশী করে উপলব্ধি করছিলাম। ঠিক এমন সময় অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই আলোচ্য পুস্তকটি আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছয়। পুস্তক প্রাপ্তির প্রথম মুহূর্তটি কেটেছিল বিমুগ্ধ বিস্ময়ে—পাঠ করার পরমুহূর্তে আচ্ছন্ন হলাম বিষন্ন বেদনায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের বিস্তৃত সময়ের রাজনৈতিক পর্ব লিপিবদ্ধ করার নামে লেখক নিউজ টাইলের যে তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন ইতিহাস রচনার আড়ালে কোন ঐতিহাসিক তা করেন না। ঐতিহাসিক যখন সার্থক ইতিহাস রচনা করেন তখন তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় জাতীয় জীবনের সকল স্তরের ইতিহাস সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হলো কিনা। বর্ত্তমান পুস্তকে লেখক বাঙ্গালী জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের আড়ালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে এক জঘন্য রাজনৈতিক চক্রান্তের ইঙ্গিতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—(১) বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তিনি অসুখী; (২) হিন্দুস্থান সরকার বাঙ্গালীদের শোষন, বঞ্চনা ও প্রতিকারহীন অত্যাচারের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখতে চান; (৩) দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নামে হিন্দুস্থানী সরকার বাঙ্গালীদের অন্যান্যদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান; (৪) বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক জীবন যাত্রার মান যাতে উন্নতি না হয় তার জন্য হিন্দুস্থান সরকার বিভিন্ন এজেন্টের মারফৎ চক্রান্তে লিপ্ত ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন ঐতিহাসিক যা বলতে পারেন না—যা পারা উচিত না লেখক প্রচুর

পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তা বলে ফেলেছেন। এখানে লেখককে আমি তাই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বলে মেনে নিতে পারছি না—বরং তিনি একজন বামপন্থী সমালোচক হতে পারেন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক নেতা তার নিজস্ব দলীয় নীতির আদর্শে সমালোচনা করে থাকেন আর ঐতিহাসিক কোন রাজনৈতিক দলের নয়—তিনি পুরোপুরি ভাবে জাতির সম্পত্তি। নির্ভিক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তাই সত্যকে জেনে নির্ভয়ে লিপিবদ্ধ করে যান। সেখানে মন্তব্যের সুযোগ থাকে না। এই পার্থক্যটি রঞ্জন বাবু আশাকরি ভবিষ্যতে উপলব্ধি করবেন।

এ লাকি ডিপ (ইংরেজী) **: শ্রীমতী লীলা রায় সম্পাদিত ও ইউ এস আই এস কলিকাতা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।**

১৯৭১ সালের কোন একসময় ইউ এস আই এসের কলিকাতা শাখা কর্তৃক আয়োজিত এক কবিতা বাসরে যে সমস্ত বাঙ্গালী কবি কবিতা পাঠ করেছিলেন তাদের মধ্যে কুড়িজনের নির্বাচিত কবিতার বাংলা ও ইংরেজী সংকলন। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে সুরু করে শ্রীমতী দেবারতি মিত্র পর্যন্ত এই সংকলনে স্থান পেয়েছেন। এমন একটি অভিনব সংকলন সম্পাদনার জন্য শ্রীমতী লীলা রায় এবং ইউ এস আই এসকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাবের জগতের কারবারী নবীন ও প্রাচীন কবি শিল্পীদের চিন্তাশক্তিকে একটি সূত্রে বাণীবদ্ধ করার এই সার্থক প্রয়াস সত্যই অভিনন্দনযোগ্য।

—অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী
নিখিল বিশ্বাস

যুগ্ম-সম্পাদক
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
গৌরগোপাল দাস

সম্পাদকীয় :

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সমস্যা

সম্প্রতি কোলকাতার বিশিষ্ট কয়েকটি দৈনিক পত্র পত্রিকায় ক্ষুদে পত্রিকা-গুলির নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য আলোচনা-গুলি সবই একতরফা হয়েছে। অর্থাৎ কয়েকজন সম্পাদক এই ক্ষুদে পত্রিকা প্রকাশের নিমিত্ত যে সমস্ত অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হ'ন—তাই জন-সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। অন্যপক্ষ অর্থাৎ পাঠক সমাজ—তারা রইলেন নিরুত্তর। এ বিষয়ে সরকার একেবারেই বোবা। ইতিপূর্বেও বহুবার নানা জায়গায় এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু সরকারী সুনজর এদিকে পড়েনি। প্রথম সমস্যাই হলো বিজ্ঞাপন। সরকারের কাছ থেকে বিজ্ঞাপণের জন্য আবেদন করলে, বিজ্ঞাপণ তো পাওয়া যায়ই না উপরন্তু যা পাওয়া যায় তাতে সম্পাদক প্রকাশকের রক্তামশা হবার উপক্রম হয়।

আর আলোচনা সমালোচনা নয়— আর আবেদন নিবেদন নয়— এবার আমরা সোজাসুজি সরকারের কাছে দাবী রাখছি—

এক। অবিলম্বে ক্ষুদে পত্রপত্রিকার জন্য সরকারী বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা।

দুই। পত্রিকা প্রকাশের পথে সরকারের কঠোর কঠিন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শিথিল করা।

তিন। সহজ লভ্যে ও ন্যায্য মূল্যে কাগজের সরবরাহ করা।

চার। পত্রিকা বিলি ব্যবস্থার জন্য ডাক খরচ হ্রাস করা।

বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির মান উন্নয়নের জন্য আজও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য। এদের শক্তি কম কিন্তু গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই এই ক্ষুদে পত্র পত্রিকাগুলিকে বাঁচাবার জন্য সরকারের উচিত উপরোক্ত দাবীগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা।

কারের আওতায় এলো দামী উলঙ্গ নৃত্য

সংবাদে প্রকাশ, যে সেদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মাননীয় সদস্যগণ অর্থ-মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত কোলকাতার হোটেলগুলিতে অনুষ্ঠিত ক্যাবারে ড্যান্সের উপর ধার্য করের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর এই সমাজতন্ত্রী সরকারকে যে কি বলে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাবো তার ভাষা খুজে পাই না। বস্তুতঃ সাহেবী পাড়ার হোটেল গুলিতে একটু বেশী রাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে এদেশের বড়লোক মাত্রেরই পরিচয় আছে। দিনের সারাটা বেলা যাদের কাটে মানসিক পরিশ্রমে—মধ্য রাতের হোটেল গুলি তাই তাদের অলস বিশ্রামের উপযোগী হয়ে ওঠে। রাত যতই বাড়ে, দামী গাড়ী, দামী শাড়ী, দামী বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ আর সপ্তসুরের মাধুর্যামণ্ডিত উলঙ্গ নারীর নাটকীয় নৃত্যের রিনি ঝিনির আওয়াজও ততই বেড়ে চলে। এহেন স্বর্গীয়কাননে কর লাভে সরকারী অনুপ্রবেশে বিধান সভার মাননীয় সদস্যগণ কোন আপত্তি করেন নি। ভাল কথা। আমরাও করছি না। তবু, কিন্তু, আশঙ্কা রয়ে গেল এই সব ধার্য্যকৃত করের অর্থ সরকারের কোষাগারে এসে পৌছবে তো?

শঙ্খচূড়

শামসুর রাহমান

(এক)

ঝোপেঝাড়ে ঝল্‌সে ওঠে, কান্তিমান নর্তক যেমন
মুহূর্তে মুহূর্তে তার স্বচ্ছন্দ গতির নক্সা আঁকে
শূন্যতায়; রূপে তার বদ্‌লে যায় জলা, কাঁটাবন।
প্রকৃতির রঙ্গালয়ে ভ্রাম্যমান, কোনো দুর্বিপাকে
সহজে কাতর নয়। এড়িয়ে ব্যাধের ফলা আর
সাপুড়ের তীব্র বাঁশি অস্তিত্ব ডুবিয়ে রাখে সে-ও
নিঃসঙ্গতায়। কখনো বা হ'য়ে যায় ক্রোধের অঙ্গার,
জ্বলন্ত দুর্বাসা যেন। ভয়ার্ত পাখিটা 'কে ও?' 'কে ও?'
ব'লে ত্রস্ত উড়ে যায়।

যদিও সে অতি বিচক্ষণ,
তবু এক ক্রূর ভ্রান্তি পরম শত্রুতা সাধে তার।
জঠরে চুল্লির দাহ, কাঁদায় বঞ্চনা; কিছুতেই
ব্যস্ততায় ত্রিসীমায় খুঁজে আর পায় না শিকার।
দ্বিপ্রহর অমাবস্যা-কালো; কেবলি হারায় খেই
ভ্রান্তির নিঝুমে ঘুরে, ব্যর্থতার রুক্ষ যন্ত্রণায়
চেনে না নিজের মুখ। আকস্মাৎ কা'র মন্ত্রণায়
মেটাতে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুধা নিজেকেই করে সে আহার।

যাদুকাঠি

(দুই)

খাটো সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শহরে হাঁটছি একা,
বুকের ভিতর স্পন্দিত অলীক কথার ঝাড়।
বড়ো রাস্তায় নেমেছে এখন ভীষণ অন্ধকার,
পার্শ্ববর্তী পথচারিকেও সহজে যায় না দেখা।

চেনা পথ আজ অচেনা ঠেকছে, গা ঘেঁষে দাঁড়ায়ে ভয়
চমকে তাকাই, কে যেন অদূরে সজোরে কড়াটা নাড়ে।
নীল পাহাড়ের অগম চূড়ায় নয়,
নয়কো অনেক হাঁস — ঝলসিত প্রাচীন হ্রদের ধারে,
ল্যাম্পোষ্টের চূড়ায় লগ্ন একজন কালো লোক
হাতে নিলো তুলে এলোমেলো কিছু ইলেকট্রিকের তার।

আঁধারে দোকান, রাস্তা, মানুষ, যান সব একাকার—
যেন কে ডাইনি নাড়ছে পাচন তেপান্তরের পারে।
একটু পরেই বড়ো রাস্তায় পাচন অন্ধকারে
কালো লোকটার যাদুকাঠিতেই ফুটলো আলোর চোখ,
যেমন হঠাৎ বিপুল সাড়ায় কবির অতীব মনে
না-লেখা কবিতা চোখ মেলে চায় নিবিড় উন্মীলনে!
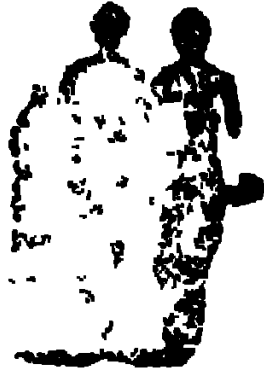
চুক্তি

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার আমার ভালবাসাবাসি চুক্তি
স্বাক্ষরে সারা শহর উঠলো ফুঁসে
অবৈধ প্রেম অশ্লীলতার দোষে
দণ্ডিত হলো নাচের নিপুণ মুদ্রা

যৌবন ঢাকা কংকালসার গ্রীষ্মে
দেখাবে কি তবে বিংশ শতকের বিশ্বে
বৃদ্ধ বোধেব অবাধ মুনাফা মুক্তি ?

তোমাব আমার ভালবাসাবাসি চুক্তি
ভেস্তে গেলেই বাস্তু শহবে আসবে
প্রাচীরহীন সর্বজনীন প্রেম।

ছন্দিতার আগামী সংখ্যায়
প্রবন্ধ লিখছেন—শ্রীমতী গৌরী ঘোষ
এছাড়া ধারাবাহিক উপন্যাস ; কবিতা এবং ফিচার
লিখবেন—রজত রায় চৌধুরী

ছোট বেলার ছায়ায়

সমীরণ রুদ্র

আমার শৈশবে আমাদের বাগানের ঝাঁকড়ালো লিচু গাছের তলে,
আমি একটা পাথরের ওপর সিংহাসন বিছিয়ে বসতুম সকালে ও বিকালে।
প্রকীর্ণ সবুজে নীলে ছোট ছোট গাছগুলি ছিল আমার প্রজা,
সেই সব ভূমিহীন প্রজাদের করতুম আমি গ্রাম দান।
রাজভাণ্ডার তুলে দিতুম ভিখিরিদের ঝুলিতে,
কারণ সেদিন সূর্যের উদয় দুর্গে আমি ছিলুম তরুণ সম্রাট।
ভিখিরিরা ছিল ওই শালিখ আর চড়ুই গুলি।
এ সবই করতুম আমি বালক কালের কল্পনাতে।
দৈত্য দানো ধরে ধরে শূলে চাপিয়ে দিতুম—
কোমরের অসি খুলে অত্যাচারীকেও আমি শাস্তি দিতে পারিনি।
তারপর বয়স সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো টপটপ করে।
সোনার যৌবন শেষে এখন আমি এক শক্তিহীন প্রৌঢ়—
ঝাপসা চোখে চশমা, বাঁধানো দাঁত,
শেষ অভিনয়ে হেরে গিয়ে,
কাম ক্রোধ লোভ হিংসার অতীত হয়ে,
অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছে এখন খতিয়ে দেখছি শুধু খতিয়ান।
সাইডিং ট্রেনের জন্য প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে অপেক্ষমান।

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ নয় ॥

আজ আর অনিমেষ কাজে বার হয়নি। গীতা যখন অত্যন্ত সাধারণ পোষাকে হাতে একটা সুটকেশ আর কাঁধের ওপর কাঁধঝোলাটা ঝুলিয়ে চোখের জল কোনরকম শাসন করে মুখ ফিরিয়ে বললো,—'চল্লাম! ছুটিতে টুটুলকে যখন নিয়ে আসবে জানিও আমি আসব। ওখানে গিয়ে ঠিকানা জানাব।'—অনিমেষ তখন বিস্মিত, বিমূঢ়। কেন যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ? না গেলে কি কিছুতেই চলেনা? এইসব কথাগুলো মুখের গোড়ায় এসেও বার হলনা। শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললো—'জিনিষগুলো বাহাদুরের হাতে দিলেই হত।' গতকালও যে অনিমেষ জোর করে তাকে বলেছে,—'ডিসগুলো বাহাদুর ধোবে, তুমি চলে এস।' গীতা বিনা বাক্যব্যয়ে নিতান্ত বাধ্যমেয়ের মত হাত ধুয়ে টেবিলে এসে বসেছে আজ সেই গীতাকে অনিমেষ জোর করে বলতে পারল না, 'ওগুলো বাহাদুরের হাতে দাও।' গীতাও আজ আর বাধ্য হতে বাধ্য নয়। পরম উদাসীনতায় বলে উঠলো—'না থাক আমি নিজেই নিতে পারব।'

যদিও গীতার একবার মনে হয়েছিল যে ও যদি নিজে ওগুলো বয়ে নিয়ে যায় তাহলে অনিমেষের আভিজাত্যে বাধবে কিন্তু সে বিচারের আজ আর দরকার নেই। যে মিথ্যা আভিজাত্যের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল সেই বেড়াজালকে ছিঁড়ে ফেলার মত শক্তি যখন আজ অর্জন করতে পেরেছে, তখন আর পিছু ফিরে কোন লাভ নেই। তাছাড়া প্রতিবাদ জোরাল হওয়াই উচিত। না হলে কোন কাজ হয় না।

—'মাইজী।' ড্রাইভার ব্যস্ত হয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করল গীতা, শেষে গাড়ীতেই উঠে পড়ল। এখন নিজে নিজে কিরকম ডাকতে গেলে বড্ড বেশী নাটকীয়তা হয়ে যাবে। সে না হয় এখানকার সব কিছুকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু অনিমেষ? তাকে তো এরই মধ্যে বাস

করতে হবে। অহেতুক কতকগুলো প্রশ্নের মুখে তাকে ফেলে দেওয়াটার কোন মানে হয়না। কিছুদূর গিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। সোফারকে বললো—'গাড়ী নিয়ে যাও, আমি অন্য গাড়ীতে ফিরবো।'

গাড়ীটা চলে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে শেষবারের মত অনিমেষ দেখতে পেল গীতার ফরসা মুখখানা, নির্বিকার, কঠিন অথচ অশ্রুসিক্ত। অনিমেষ কতক্ষণ সেই একভাবেই দাঁড়িয়েছিল কে জানে হঠাৎ খেয়াল হতেই খুব ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাগানে নেমে পড়ল। মালীকে হঠাৎ খুব বকা ঝকা আরম্ভ করে দিল। পপির বেডটাতে এত আগাছা জন্মেছে কেন? কারনেশানের সময় তো পার হয়ে গেল ওগুলো এবার তুলে ফেলার সময় হয়েছে, বাগানের ঘাসগুলো কেন সমান করে ছাঁটা হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

মালী হঠাৎ সাহেবের এত মনোযোগ দেখে হকচকিয়ে গেল। এসব তো বরাবর মাইজীই দেখাশুনো করেন। বাবু তো কোনদিনও কিছুই লক্ষ্য করতেন না। কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরে উদ্গত অভিমানের রেশটুকু গাছপালার মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে অনিমেষ যখন তার নিজের ঘরের ইজিচেয়ারটায় হাত পা মেলে দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে পড়ল তখন ওর নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হল। বাগানে কি সে নিজের হাতে কোন কাজ করে এল? শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে। হাতের মধ্যে ধরা ছিল সিগারেট আর দেশলাইয়ের বাক্স, নতুন করে সিগারেট ধরাবার উৎসাহটুকুও যেন আর পাচ্ছেনা। কেন চলে গেল গীতা? কোথায় গেল! যাবার সময় কোন অভিযোগ তো করে গেলনা। কোন সাবধান বাণী শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মত। চাবির গোছাও ছুঁড়ে কিম্বা সন্তর্পণে টেবিলে রেখে গেলনা। —সে কি একাই গেল? বিমলের কথা মনে হল অনিমেষের। তবে কি এতদিনে বিমল শোধ তুললো? কিন্তু বিমলের আচরণে তেমন তো কিছু পায়নি কখনও। একদিন সবাই জানতো বিমলের সঙ্গেই বিয়ে হবে গীতার। বিমল আর গীতার নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হত। সেদিনও বিমলের প্রতি ওর কোন ঈর্ষার উদ্রেক হয়নি। গীতা যখন বিমল সম্বন্ধে ওর হতাশার কথা বলতো অনিমেষের কাছে, অনিমেষ তখন ভাবতো 'এ সব সাময়িক দ্বন্দ্ব হয়তো গীতা এখন বিমলের কোন আচরণে আহত হয়েছে দুদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তার মতে মেয়েরা বড় সেন্টিমেন্টাল, একটুতেই হারাই হারাই ভয়। সামান্যতম উপসর্গকে ওরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখে। সুরুতেই শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় ওদের বড় বেশী।

মেয়েদের এই দুর্বল দিকটা দেখতে পেয়ে অনিমেষ বিমলের মত হতাশ হতনা বরং তাদের জন্য মনে মনে ওর একটু মায়াই হত। ঠিক এই নিয়েই ওদের দুজনের মধ্যে কত তর্কাতর্কি। বিমলের মতে নিজেদের সমস্ত স্বত্তা দিয়ে ভালবাসার মানুষকে আঁকড়ে ধরার যে প্রবণতা এটা যেন মেয়েদের ক্ষেত্রে মানায় না। ওর বিশ্বাস একটু চেষ্টা করলেই এই দুর্বলতা থেকে তাদের মুক্ত করা যায়। ওর মতে এর একমাত্র ওষুধ হল উদাসীন কঠোরতা।' অনিমেষ প্রশ্ন করেছিল—উদাসীন কঠোরতা মানে ?

—'মানে খুব সোজা। শুধুই কঠোরতা হল অস্তিবাচক। আমি তোমাকে স্বীকার করবো ততক্ষণ, যতক্ষণ তোমার ওপর রাগ কোরবো, অভিমান করব অর্থাৎ নানারকম দাবী জানাব—আর এই দাবী জানালেই মেয়েরা কাদা হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে সে ক্ষমা করে, স্নেহ করে, আবেগে গলে যায়। তার ফলে কঠোরতার মূল্য যায় কমে কিন্তু যদি মেয়েরা একবার মনে করে যে সে উপেক্ষিতা তখনই মূল্যহীনা হয়ে আবার ভয়ে স্বাভাবিকত্বে ফিরে আসে। ভাবুকতার কাদা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাই মাঝে মাঝে উদাসীন-কঠোরতার প্রয়োজন হয়।' —অনিমেষ ভাবে হয়তো বিমলের কথাই ঠিক।

গীতা আর বিমলের সম্পর্ক নিয়ে অনিমেষ মাথা ঘামায়নি কোনদিনও। যেদিন গীতা বিমলের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল সেদিনও না আবার যেদিন গীতা এসে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করল সেদিনও না। শুধু বিস্মিত হয়েছিল।

গীতা যখন ওর কাছে এসে কাঁদতো তখন মনে মনে ভাবতো অনিমেষ, এ ক্রুটটাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে পারলে হয়। ও জানতো গীতার এ কান্না বিমলের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য নয়, বিমলকে আরো নিবিড় করে পাবার জন্যেই এ কান্না। সেই সময় মাঝে মাঝে মনে হত যে গীতার জীবনে যদি বিমল না এসে ও আসতো তাহলেও কি গীতা ওভাবে কাঁদতো ? যখনি এ কথাটা মনে হত তখনি ওর শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা স্রোত বয়ে যেত। সে স্রোতের মানে ও ধরতে পারত না। আজ এতদিন বাদে আবার নতুন করে অনিমেষের রক্তের মধ্যে সেই ঠাণ্ডা স্রোতটা প্রবাহিত হল। একটা নিস্ফল অসহায়তায় ওর সমস্ত শরীর মন দুমড়ে মুচড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় পাক খেতে লাগল। এই প্রথম অনিমেষের চোখ দিয়ে হু হু করে জল নেমে এল। বন্ধ দরজার ওপারে কেউ নেই শুধু ওখানে কেন ? বুঝি কোথাও নেই। এই নির্জন ঘরটার মধ্যে সে একাই জেগে আছে নিঃসঙ্গ।

সিগারেটটা এক সময় ঠোঁটে চেপে দেশলাইএর ক্যাম্পটাও খুলেছিল কিন্তু কাঠিটা ধরান হয়নি। কান্নার আবেগে কখন ভিজে সিগারেটটা মাটিতে পড়ে অযত্নে গড়াগড়ি খাচ্ছিল তার খেয়ালই ছিলনা। অনেক কাঁদল অনিমেষ। বুক উজাড় করে কাঁদল। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে সারা মুখখানা ভিজে গেছে। হঠাৎ নজর পড়ল সিগারেটটায়। হাসি পেল। ওরই মত অযত্নে আজ কি সেটা মাটিতে পড়ে আছে। নিজের মনেই বলে উঠলো। 'তোমার দশা যে আমারি মত।' —নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলো। একি মেয়েলীপনা। বৌ পালিয়ে গেছে তাকে ছেড়ে তাই সে দরোজা বন্ধ করে কাঁদছে? এতক্ষণ চোখের জলের মধ্যে একখানা মুখ ভেসে ভেসে উঠছিল সে মুখের দিকে চেয়ে রাগ হয়নি; অভিমানও না, শুধু মন কেমন করছিল কিন্তু যে মুহূর্তে ওর ভেতরের পুরুষমানুষটা গর্জে উঠলো, পায়ের তলার মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠলো—'বয়ে গেছে। আমার তো আমি আছি আর আছে টুটুল।' —এই মুহূর্তে বিমলের উদাসীন কঠোরতা কপট তাৎপর্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দরোজা খুলে বেরিয়ে এল অনিমেষ। আয়া-বাবুর্চি মহলে যেন কোন প্রশ্ন না ওঠে। ওরা যেন ভাবতে পারে যে মাইজী কদিনের জন্য বাইরে গেছে বেড়াতে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই হুকুম দিল। '—মাইজীর ঘর পরিষ্কার রেখ। মাইজী যেন ফিরে এসে ময়লা না দেখতে পান।' বাবুর্চিকে চিৎকার ক'রে বললো—'খানা লাগাও জলদি।' অন্যদিনের চেয়েও বেশী অস্থিরতার সঙ্গে স্নান সেরে নিল। খুব যেন কিসের তাড়া। মাইজী আর সাহেব যেন কিছু একটা ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত। দুজনের পরামর্শমত যেন কোন কাজ হচ্ছে। ওরা হয়তো আর কিছুদিন বাদেই জানতে পারবে যে মাইজীর চলে যাওয়ার সঙ্গে মনিবের এই ব্যস্ততার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

অনিমেষ আয়া, বাবুর্চি রামদাস সবারই চোখের দিকে চেয়ে দেখছে কোথাও কোন সংকোচের বা অসংগতির বিস্ময় উঁকি মারছে কিনা। একবার এই ত্রুটটাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে পারলে হয়। ও জানতো গীতার এ কান্না বিমলের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য নয়, বিমলকে আরো নিবিড় করে পাবার জন্যেই এ কান্না। সেই সময় মাঝে মাঝে মনে হ'ত যে গীতার জীবনে

ভাবল ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা কোরবে, মাইজী কি একাই গেল ? কিন্তু ভেবে দেখলো ও ভাবে জিজ্ঞাসা করা চলেনা। কারণ মাইজী কি ভাবে যাচ্ছে ? কোথায় যাচ্ছে ? কার কাছে যাচ্ছে ? কার সঙ্গেই বা যাচ্ছে এসব কথা সাহেব জানেনা এ কেমন কথা। কাজেই চুপ করে থাকে অনিমেষ। তাছাড়া যদি শোনে যে ফরসা মত লাল লাল চুলের, চোখে চশমা পরা এক বাবুর সঙ্গে মাইজী গিয়েছে তাহলে? তাহলে অনিমেষের কৌতূহল অনিমেষকে ভয়ানক অস্বস্তিতে ফেলবে। কাজেই দরকার নেই ও সব জেনে। এ ক্ষেত্রে বিমলের সেই উদাসীন কঠোরতাই একমাত্র ভরসা।

সেদিন খুব মন দিয়ে কাজ করল অনিমেষ। লাঞ্চের সময় যেদিন বাড়ী যাওয়া সম্ভব হত না সেদিন গীতাকে বলে আসতো খাবার পাঠাতে। আজ সে বাবুর্চিকে বলে এসেছে খুব কাজ আছে কাজেই লাঞ্চের টাইমে বাড়ী যাবে না আর খাবারও পাঠাতে হবে না। লাঞ্চ বাইরে সারবে। এতে করে বাবুর্চি মহল ভাববে যে সাহেব মাইজীর সঙ্গে বাইরে কোথাও লাঞ্চ সারবে। মনে মনে একটু স্বস্তি পায় অনিমেষ। অফিসের কাজের মধ্যে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে কিছুক্ষণের জন্যে সব ভুলে যায় কিন্তু লাঞ্চ আওয়ার আসতেই আবার সব মনে পড়ে গেল। রাগে সর্ব শরীর যেন জ্বলে উঠলো। অপদার্থ, অকৃতজ্ঞ, মেয়েরা চিরদিনই এইরকম অকৃতজ্ঞ হয়। এটা ওর আগেই বোঝা উচিত ছিল যখন বিমলকে বিট্রে করে ওর কাছে এসেছিল গীতা।

এই মুহূর্তে বিমলের জন্য ওর মন কেমন করে উঠলো, বেচারা বিমল ! তাকেও তো একদিন এমনি অপমান করেছে এই গীতা আর দুর্ভাগ্য সেই গীতাই কিনা ওর একমাত্র সন্তানের মা। এতক্ষণে বুঝতে পারল অনিমেষ গীতা কেন টুটুলকে হস্টেলে পাঠাল।

কিন্তু কোথায় গেল সে ? একা চলার মেয়ে তো সে নয়। তাছাড়া টাকা কড়িও নিশ্চয়ই তেমন কিছু সঙ্গে নিয়ে যায়নি। ও তো ইচ্ছে করেই টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখত না। কতবার অনিমেষ বলেছে কিছু টাকা নিজের কাছে রাখা দরকার—তখনি হেসে বলেছে গীতা, "—কেন দরকার পড়লে কি তোমার কাছে পাবনা ?" —কৈ যাবার সময় তো কিছুই চাইল না ? অত্যন্ত দাম্ভীক আর গোঁয়ার প্রকৃতির মেয়ে। অনিমেষ যেন আবার নতুন করে অপমান বোধ করল।

বিকেলে একটু দেরী করেই বাড়ী ফিরল অনিমেষ। ফিরে আসার সঙ্গে

সঙ্গেই রামদাস এসে ওর তদ্বির সুরু করল। বাবুর্চি চা দিয়ে গেল। মাইজী তো নেই। সাহেবের সঙ্গেও তো ফিরল না। রামদাস একবার বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করল পেয়ালায় চা বানিয়ে দেবে কিনা, মাথা নেড়ে অনিমেষ বারণ করল। মুখ হাত পা ধুয়ে এসে বসল চায়ের টেবিলে। কেটলিতে পর্যাপ্ত চা। খাবারও রয়েছে দুজনের মত। বাবুর্চিকে ডেকে ধমকের সুরে বললো, "এত বেশী কেন?" বাবুর্চি থতমত খেয়ে বললো "মাইজির জন্যে আছে।" মুখের ওপর যেন শক্ত চাবুকের বাড়ী পড়ল।

কষ্টকর হল রাতটা।

স্মৃতির বোঝা ক্রমে বিব্রত করতে লাগল। অনেক রাত অবধি ঘুম আসেনা কিন্তু ভাববার কি আছে? সুনিদ্রার ওষুধ তো আছেই। বেশ হবে। গীতার সঙ্গে ওর এই নিয়ে মতান্তর সুরু হত। আলমারীর শেষ থাকে কাপড়ের পেছনে লুকোন বোতলটা বার করল। মাত্রা একটু অধিক হল। বাধা দেবার তো কেউ ছিল না। অমৃতটুকু নিঃশেষ হয়নি ওটাকে আবার লুকিয়ে রাখতে হবে। এবারে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল অনিমেষ। ভুল ক'রে গীতার আলমারীর তালাটা খুলে ফেলেছে—থরে থরে সব কাপড় জামা সাজান রয়েছে। কিছুই তাহলে নিয়ে যায়নি? তবে কি শিগগিরই আবার ফিরে আসবে? তখনকার মত মনে মনে এই বিশ্বাসটাই সত্য হয়ে উঠলো। ওর মন তখন সমস্ত স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে শেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন ঘুম ভেঙ্গেই মনে হল কাল থেকে সারা দিন রাত এ বাড়ীতে গীতা নেই। নাঃ এ বিষয়ে ও আর কিছু ভাববে না। উদাসীন কঠোর, তাই একমাত্র ওষুধ। সম্পর্ক যদি থাকবার হয় থাকবে যদি ভেঙ্গে যাবার হয় যাবে। মিথ্যেকে টেনে নিয়ে চলার কোন মানে হয় না। সকাল থেকে আবার রুটিন মত কাজ শুরু হল। এবারে সংসারের দিকে মন দিতে হবে। না হলে কাজের লোকেরা সব পেয়ে বসবে। টুটুলকে চিঠি লিখলো অনিমেষ। অফিস যাবার আগে হঠাৎ মনে হল ডাক আসবার সময় হয়েছে। কিসের একটা অজানা প্রত্যাশায় হঠাৎ মনটা চমকে উঠলো। রামদাসকে বললো ডাক বাক্সটা খুলতে। রামদাস এক তাড়া চিঠি পত্র নিয়ে এল। নাঃ সবই অফিসিয়াল চিঠি। একটা মাত্র পোষ্টকার্ড। বরানগরের পিসীমার চিঠি। চিঠিগুলো বেছে নিয়ে অফিস ফাইলে ভরে রাখলো। তারপর অফিস যাবার সময় জানিয়ে

গেল লাঞ্চ পাঠাতে। বাবুর্চি বোধহয় কিছু বলতে চায়। তার চিরাচরিত ভঙ্গিটিতে ঘাড় নীচু করে জানতে চাইছিল— সাব বিকেলের টিফিন কি শুধু আপনার মত হবে ? উত্তরে অনিমেষ জানাল হ্যা, মাইজীর আসতে এখন দিন কয়েক দেরী হবে।

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাবুর্চি। রামদাস পুরনো লোক। বাচ্চা বয়সে এসেছিল। ধরতে গেলে গীতাই ওকে মানুষ করে তুলেছে। ছেলেটার বয়স এখনই সবে ষোল সতেরো। তার আব্দার আর সাহসটা একটু বেশী। হঠাৎ ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসল, "মা কবে আসবেন বাবুজী ?" একমাত্র ও-ই অনিমেষকে বাবুজী বলে ডাকতো। আর টুটুলকে ডাকতো, খুকী বাবু বলে, অনিমেষ তাই হাসতে হাসতে বলতো —যাও রামদাস তোমার মা-বাবুকে খবর দাও। সবাই জানতো রামদাসের ব্যাপার আলাদা। আজ রামদাসের প্রশ্নে কেমন একটা শূন্যতার স্পর্শ পেল অনিমেষ। টুটুল নেই, গীতা নেই বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এত বড় বাড়ীটা একদিন গেল দুদিন গেল তিন দিনও গেল এবারে উদাসীন কঠোরতা আর ঠিক রইল না। অসহ্য দুর্ভাবনা এসে উদাসীনতাকে কিছুটা বিব্রত করল। সেই সঙ্গে অভিমান কর্ত্তব্য আর ভালবাসা এসে কঠোরতা গলিয়ে গলিয়ে আদ্র করে তুললো। এতদিনের সম্পর্ক কি এত সহজেই ভেঙ্গে যাবে ? ভেঙ্গে দেব বললেই কি, ভেঙ্গে দেওয়া যায় ? গীতা হয়তো অভিমান করে থাকবে। নাঃ এ ভাবে ব্যাপাটাকে ফেলে রাখা যায় না। অসাধারণ মন কেমন সমস্ত সম্পর্কটাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। গাড়ীটা অফিসের দিকে না গিয়ে বিমলের মেসের দিকে ঘোরাল। বিকেলে বিমলকে পাওয়া যায় না। দুপুরে মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে পারে।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

সরসী সরকার

গেট আউট রাসকেল, গেট আউট এট ওয়ান্স। এ মুহূর্তে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও।

ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে উঠল জয়ন্তীর দাদা। গলার স্বরে গোটা বাড়ীটা গম গম করতে লাগল। চোখে তার আগুনের ফুলকি।

বাড়ীর সকলে ছুটে এল। কেউ ভিতরের বারান্দায় আবার কেউ বা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঝি-চাকর এরা সব নীরব দর্শক, এ ওর দিকে তাকাচ্ছে শুধু। কিছুই বুঝতে পারছেনা তারা।

ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে জয়ন্তী। নির্বিকার, মুখ শুকনো, ফ্যাকাশে। কিছু দূরে আর একটা চেয়ারে বসে আছে ইন্দ্রনীল, আজকের নায়ক। মুখে তার দৃঢ়তার ছাপ। অন্যায় করেছে বলে মনে হয় না।

কী হ'ল ? এখনো উঠলে না তুমি ? চাবুক আনার দরকার হবে নাকি ? আবার গর্জন করে উঠল জয়ন্তীর দাদা।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ইন্দ্রনীল। উঠে দাঁড়াল। সবাইকে একবার দেখে নিল ভাল করে।

সবার চোখে মুখে ঘৃণার ভাব। আশ্চর্য ! কী ভেবেছে এরা ?

আস্তে আস্তে জয়ন্তীর কাছে এল ইন্দ্রনীল। বলল, জয়ন্তী, তুমি, তুমি কিছু বলবে না ? তুমি এ অন্যায়কে স্বীকার করে নেবে ? চুপ করে সহ্য করবে ?

জয়ন্তী আবার কী বলবে ? তুমি বেরিয়ে যাও এখুনি। নইলে চাবকিয়ে বার করে দেবো। জয়ন্তীর দাদার আবার গর্জন শোনা গেল।

জয়ন্তী নির্বিকার। কে যেন তার মুখ চেপে ধরেছে। কোন কথা তার মুখ দিয়ে বার হ'চ্ছে না কিছুতেই। সে দুহাত দিয়ে তার চোখ মুখ ঢেকে ফেলল সে মুহূর্তে।

আমি তা হ'লে চললাম, জয়ন্তী।

একথা বলে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল ইন্দ্রনীল। একেবারে রাস্তায়

এসে দাঁড়াল। তারপর নিমেষের মধ্যে অগণিত মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেল।

ইন্দ্রনীলকে নিয়ে জয়তীদের বাড়ীর আনন্দ আর ধরে না। তার প্রশংসায় এ বাড়ীর সবাই পঞ্চমুখ।

জয়তীর দাদা বলল, ইন্দ্রনীলের মত ছেলে হয় না। এমন আদর্শবাদী, একনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ ছেলে বর্তমান যুগে পাওয়া ভার।

জয়তী যখন দুমাস বিছানায় পড়ে ছিল, কী খাটাই না খেটেছে ছেলেটা। সব খবরাখবর নেওয়া, ওষুধ পত্র আনা, ডাক্তারের কাছে বার বার ছুটে যাওয়া—সব কাজই করেছে ও। সত্যি ওর ভিতরে একটা হৃদয় আছে, কোমল হৃদয় যার তুলনা মেলে না। জয়তীর মা বলে গেলেন এক নিঃশ্বাসে।

কেন, পি. জি. হসপিটালে কী সার্ভিস না দিয়েছিল ও। আমি যা না করেছি, ছেলেটা অনেক, অনেক বেশী করেছে আমার বন্ধুর জন্য। নিজে রক্ত দিয়েছে। অন্য লোক জোগাড় করে তাদের রক্ত ডোনেট করেছে। এমন ছেলে আজকাল কিন্তু দেখা যায় না। জয়তীর বাবার বন্ধু পবিত্র বাবু বললেন আস্তে আস্তে।

আমাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে যত উপকার পেয়েছি তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছি ইন্দ্রনীলের কাছ থেকে। ও আমাদের আত্মীয় না হ'য়েও পরম আত্মীয়, আমাদের আপনজন। জয়তীর মা এক বাক্যে স্বীকার করলেন।

তারপর বাবার শ্রাদ্ধাদির সময় ওর কাজের তুলনা মেলে না। কত টাকা ওকে দিয়েছে খরচ করতে, অথচ ঠিক ঠিক হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছে ও। একটা পয়সারও অমিল হয় নি। জয়তীর দাদার উক্তি।

সত্যি, এমন ছেলে দেখা যায় না আজকাল। অহংকার নেই, লোভ নেই কোন। সত্যের পথ, ন্যায়ের পথই ওর পথ। পবিত্রবাবু বললেন।

আরে আর একটা কথা তোমাদের কাউকে বলা হয়নি। জয়তীর দাদা বলতে লাগল। বাবা মারা যাওয়ার পর ওর নামে কিছু টাকা রাখতে চেয়েছিলাম। ব্ল্যাক মানির ব্যাপারে। ও কী বলেছিল জান? ও বলেছিল, টাকাকড়ির ব্যাপারে আমি নেই। অর্থই অনর্থের মূল,

অশান্তির কারণ। টাকা কড়ির ঝামেলায় আমি যেতে পারবো না।

এ জন্যই তো ওকে এত খাতির করি। ওকে নিচ তলা থেকে ওপরে এনে বসিয়েছি। ও একদিন না এলে আমরা সবাই অস্থির হ'য়ে উঠি। একটা মস্ত অভাব অনুভব করি। ও যে আমাদের কতখানি তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। জয়তীর মা বলল টেনে টেনে।

হ্যাঁ, এ বাড়ীর সঙ্গে ইন্দ্রনীল যেন একজন হ'য়ে মিলে মিশে গেছে। সুখে দুঃখে, আশা-নিরাশায়, আনন্দ-বেদনায় ও আমাদেরই একজন। জয়তীর দাদার গলা শোনা গেল।

বেশী ভাল ভাল নয়। দেখো, ভাল মানুষের মুখোস পরে হয়তো বা একদিন খুব দামী জিনিষ চুরি করে পালাবে, সে অপেক্ষায় বোধ হয় আছে। তখন আর ওকে তোমরা খুঁজে পাবে না। জয়তীর গলার স্বরে গোটা ঘরটা যেন চমকে উঠল। এতক্ষণ সে শুধু শুনছিল। এবার সে মুখ খুলল।

কী বলছিস তুই? তোর সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। মানুষের সততার দাম তোরা দিতে চাসনে কিছুতেই। জয়তীর দাদা তিরস্কার স্বরে বলল।

ছেড়ে দে ওর কথা। মাথায় শুধু দুষ্টু বুদ্ধি গেলেছে ওর। জয়তীর মা বলল তার দাদাকে।

না। তোমরা যাকে নিয়ে এত মাতামাতি করছ, এত সার্টিফিকেট দিচ্ছ তাকে আমরা ভাল করে যাচাই করে দেখলে বোধ হয় ভাল করতে। এমন তো হ'তে পারে ওর সাধুতার ওর সততার মধ্যে হয়তবা এমন কিছু আছে যা তোমাদের কাছে খুব দুঃখের, খুব বেদনার। আমি কিন্তু এসব লোকেদের একবিন্দু বিশ্বাস করিনে। জয়তী বলল।

চার বছরে ওকে চেনা হ'য়ে গেছে। খাঁটি সোনা আমাদের চিনতে ভুল হয় না। পবিত্রবাবু মুখ খুললেন।

ছাড়ো তো ওর কথা। ও নিজেই জানে ইন্দ্রনীল কেমন ছেলে। জয়তীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল তার দাদা।

অথচ আজ সেই ইন্দ্রনীলকে কুকুরের মত বার করে দেওয়া হ'ল বাড়ী থেকে। কেউ কোন কথা বলল না। কেউ কোন প্রতিবাদ করল না।

বাড়ীটা থম থম করছে। নিস্তব্ধ, নিঝুম যেন। এ বাড়ীর কারো মনে

আনন্দ নেই, শান্তি নেই। বাইরের একটা ছেলে। সে গোটা বাড়ীটা অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারছে।

বাড়ীর সকলেই মনে মনে চাইছে, ও আবার আসুক, আবার ফিরে আসুক। হাসিতে আনন্দে আবার ভরে উঠুক এ বাড়ী।

কিন্তু বাইরে কেউ কিছু বলে না। ওর সম্বন্ধে কোন কথাই কারো মুখে শোনা যায় না। মনে মনে পুড়ে মরে এ বাড়ীর সবাই। কিন্তু বাইরে কিছুই বলতে পারে না কেউ। এ এক জ্বালা। এ জ্বালা মর্মান্তিক, এ জ্বালা ভয়ঙ্কর। ভুক্তভোগী ছাড়া এটা কেউই বুঝতে পারবে না।

জয়ন্তী পাথর হ'য়ে গেছে। জয়ন্তী নিথর হ'য়ে গেছে। তার মন বোবা কান্নায় কেঁদে মরে। সেই তো দায়ী সব কিছুর জন্যে। সে কেন ইন্দ্রনীলের সঙ্গে চলে গেল না? কেন সে সবা'র সামনে দৃঢকণ্ঠে বলল না, ওকে আমি ভালবাসি। ওকে আমি বিয়ে করব। ওকে আমি আমিই চুমু দিতে বলেছিলাম আমার মুখে, আমার ঠোঁটে।

তাহ'লে এ বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটত না। তার দাদা কিছুতেই তাড়াতে পারত না ইন্দ্রনীলকে।

জয়ন্তী শুধু ভাবে—ভাবনা চিন্তার কূল কিনারা নেই তার। ইন্দ্রনীলের কথা এলোমেলো ভাবে ঘুরপাক খায় তার অন্তরের অন্তঃস্থলে। হৃদয়ে তুফান তোলে—তাকে পাগল করে মারে।

ইন্দ্রনীলের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্তী। হাহাকার করে ওঠে তার দেহমন প্রাণ। এ দীর্ঘশ্বাস, এ হাহাকার বড় মর্মান্তিক।

ইন্দ্রনীলের স্মৃতি শুধু জ্বালা। এ জ্বালা থেকে জয়ন্তী কোন দিনই আর মুক্তি পাবে না।

সীমারেখা
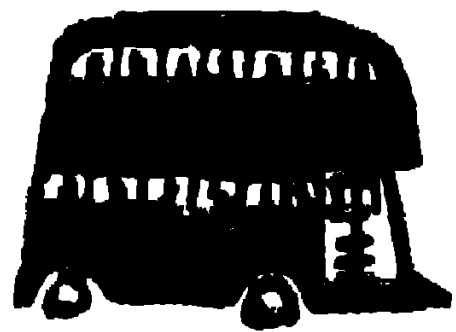
বলাই লাল সেন

নিঃশ্বাস ছেড়ে বাবা বললেন, 'বেটারা ছেড়ে গেল বটে, শেষ করে গেল বাংলা দেশটাকে, আর বাঙ্গালী জাতিটাকে। তা না হলে কেন হবে সব সাত পুরুষের ভিটা মাটি ছাড়া ?''

এ সব অনেক দিনের কথা, তখন বুঝতাম না এসব কথার অর্থ। অনেক বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, গঙ্গা, গঙ্গার উপর দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, তরুণ বয়সের উচ্ছৃলতা কাটিয়ে চিন্তাশীল জগতের দিকে এগিয়ে চলেছি। অনেক অস্পষ্টতা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাবতে শিখেছি নিজের কথা, দেশের কথা, জাতির কথা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর শহীদদের কথা পড়ি আর ভাবি, কি দরকার ছিল দেশের জন্য অকালে ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার! আজ দেশ স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীনতার কি সাধ পেল এই বাঙ্গালী জাতটা। বিশ্বকবির সোনার বাংলার সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে। জীবনানন্দের রূপসী বাংলার রূপের আর কদর নেই। খণ্ড বিখণ্ডে সে বাংলা আজ শ্রীহীন। বাঙ্গালীর আজ নিজের ঘরে ঠাঁই মেলে না, সে হচ্ছে সাত পুরুষের ভিটামাটি ছাড়া, হচ্ছে পরবাসী। তার পরে ঘরে চলছে অন্নবস্ত্রের হাহাকার। ভাই-এ ভাই-এ বিবাদ। মুখ দেখা দেখি বন্ধ। তা না হলে কেন হবে বাংলা দ্বিখণ্ড, একই জাতির আলাদা আলাদা স্থান।

আমাদের গাঁয়ের সোনাই নদীটি হল এ অঞ্চলের সীমারেখা, নদীর ওপার পাকিস্থান আর এপার হিন্দুস্থান। মুসলমানেরা চলে গেল পাকিস্থানে, আর হিন্দুরা এল হিন্দুস্থানে। একই হাটে, পথের একই গাঁয়ের লোকের মধ্যে সৃষ্টি হল বৈষম্য। এপারে ওপারে গড়ে উঠলো দ্বিজাতী তত্ত্ব, বিচ্ছেদ-কামী মনোভাব। নদীর দুপারে বসেছে দুদেশের পাহারাদার। এপারে হাকিমরেপুর খাঁ বাড়ীর প্রভাব প্রতিপত্তি কমলো, ওপারে মজুমদার বাড়ীর দব দব মুহূর্তে কোথায় উবে গেল। নদীর এপার ওপার যাতায়াতের ছোট্ট বাঁশের সেতুটা ভেঙে দেওয়া হল। আবার যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল।

নদীর ওপারে কিছু দূরে ছিল আমাদের ফলের বাগান, পিতৃপিতামহের জন্মভূমি। যখন তখন যেতাম আম জাম খেতে। কিন্তু সব বন্ধ হয়ে গেল, উৎখাৎ হলাম পিতৃপিতামহের প্রতিষ্ঠিত অধিকার থেকে। এপারে যাত্রাগান হলে ওপার থেকে লোক আসত, ওপারের হাটে বাজারে, পূজা পার্বনে এপারের লোক ভীড় জমাতো। আস্তে আস্তে সব বন্ধ হয়ে গেল। একে একে ওপারের সব স্মৃতি ভুলতে লাগলাম। ভুলতে লাগলাম ওপারের লোক জনদের। শুধু ভুলতে পারলাম না কেবল দুই চারিটি মুখকে। তাদের সঙ্গে প্রথম স্কুলে পদার্পন করেছি, তাদের সঙ্গে লেখাপড়ায়, খেলাধুলায় প্রথম প্রতিযোগীতা করেছি। মাঠে মাঠে আখ ভেঙেছি, আমতলায় আম কুড়িয়েছি, ওদের সঙ্গে জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব। ওদের সঙ্গে ছিল কত ঘনিষ্ঠতা, কত প্রাণভরা মনের কথা। ছিল না দ্বন্দ্ব। ভুলেছি অনেক কিছু, কেবল ভুলতে পারলাম না মাঝির গান, নদীর কলতান আর ওপারে পিতৃপিতামহের স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমি, বাগান বাগিচা, আর বন্ধু রুস্তমকে। সময়ে সময়ে ভাল লাগেনা, নদীর ঘাটে যাই স্নানে, অনেকক্ষণ চেয়ে থাকি ওপারের পানে, যেখানকার মাটিতে, গাছ-গাছালিতে, রয়েছে আমার পূর্ব্ব পুরুষের ছোঁয়াচ আমার নাড়ীর টান। ওপারের ঘাটে কখনও কখনও রুস্তম আসে, দূর থেকে দেখতে পায়, তাই ওর কত আনন্দ। নদীর মাঝখানে অবধি যাওয়ার উপায় নেই, মনের আবেগে দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে, রঞ্জন, কেমন আছিস? এর বেশী আর কোন কথা হয় না, বলাও সম্ভব নয়। দেখতে দেখতে ২৪ বৎসর পার হল। ও লেখা পড়া শেষ করে করছে পাকিস্থান সরকারের চাকরি, আর আমি ভারত সরকারের চাকরি। উভয়ের মনের মধ্যে জমে আছে অনেক গোপন কথা কিন্তু বলবার কোন উপায় নেই। যাতায়াত নিষিদ্ধ, যোগাযোগ বেআইনী। পাহারাদারদের অনুমতি নেই সাধারণ মানুষদের এপার ওপার করতে দেওয়ার। কিন্তু ওদের মহানুভবতায় রাতের অন্ধকারে চলেছে লক্ষ লক্ষ টাকার চোরা কারবার। এক দল কালোবাজারী ওদের সাহায্যে দিন দিন বেশ ফেঁপে উঠেছে। আর উভয় দেশের সাধারণ মানুষের [illegible] ও বন্ধুত্বের কোনই মূল্য রইল না ওদের কাছে।

সেবার রুস্তম ওর বিয়ের আগে ওদের কাছে খুব অনুনয় বিনয় করেছিল এপারে আসবার জন্য, কোন অনুমতি পায়নি। দূর থেকে চেঁচিয়ে

আমাকে বলেছিল, রঞ্জন কাল আমর বিয়ে, প্রত্যুত্তরে খালি শুভেচ্ছা জানিয়ে ছিলাম। ওর বৌ ঘাটে আসে, দেখতে পাই, ওর ছেলে মেয়ে দুটি ওর সাথে ঘাটে আসে, দেখতে পাই, দূর থেকে আমাকে দেখায় বুঝতে পারি, কিছু বলতে পারিনা। এমনই বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে আমাদের এই সীমারেখা।

সে দিন সকালবেলা সবে ঘুম থেকে উঠেছি, দীর্ঘ দিনের হারিয়ে যাওয়া পরিচিত গলার স্বর শুনে চমকে উঠেছি, তাকিয়ে দেখি রুস্তম আসছে ছুটতে ছুটতে। ওর মনে কি উচ্ছ্বাস, কি আনন্দ, ও আবেগভরে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমার বাবা মাকে প্রণাম করলো, বললো, রঞ্জন হানাদার বাহিনী মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে হেরে গিয়ে হটে গেছে—ওরা আত্মসমার্পন করেছে। আমার ভাই মুক্তি যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। বাংলা দেশ আজ পাকিস্থানের রাহু মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কেউ আমাদের পাকিস্থানী বলবেনা, আমরা এখন বাঙ্গালী, বাংলাদেশবাসী। দুদেশের মধ্যে সীমারেখা আর থাকবে না। নদীর উপর আবার সেতু হবে, এপার বাংলার মানুষ নির্বিঘ্নে ওপারে যাবে, ওপার বাংলার মানুষ এপারে আসবে। পরস্পরে আবার ঘনিষ্ঠতা হবে, হারানো বন্ধুত্ব আবার গড়ে উঠবে। তুই আমি আবার ওপারের দিগন্ত প্রসারী শ্যামল মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াবো, বনে বনে আম জাম খাব, নদীর এপার ওপার সাঁতার কটবো, মাছ ধরবো, এপার ওপার মিলে আবার খেলার টিম গড়বো, দুপারের সমাবেশে এই সীমান্ত অঞ্চল আবার জম জমাট হয়ে উঠবে। বাংলার গ্রামে গ্রামে গীত হবে কালী কীর্ত্তন, সত্য পীরের গান। সে দিন দুই বন্ধুতে মিলে কত কথা হল, কথা যেন শেষ হতে চায় না, রুস্তম বল্‌লে—জানিস রঞ্জন, মাঝে মাঝে মনে হত, ঐ সীমারেখা কবে উঠে যাবে, শালার পুলিশগুলো কবে এ অঞ্চল থেকে চলে যাবে, দেশ আবার কবে এক হবে, আমরা ভাই ভাই হয়ে এপার ওপার নি:সঙ্কোচে ঘুরে বেড়াবো। ছেলে মেয়ে দুটো কলকাতা দেখতে চায়, দেখতে চায় চিড়িখানা, ওদের ঐ সব দেখাব, বলতো কত কাছের জিনিষ দূরে ঠেলে দিয়েছে ঐ সীমারেখা।

হ্যাঁ এমনই কত না আক্ষেপ, কত আকুলি বিকুলি রয়ে যায় দুপার বাংলার মানুষের। কে বুঝতে চায় ওদের মনের তৃষ্ণা, চোখের ক্ষুধা। অদৃষ্ট যে ওদের পরস্পরের মুখ দেখা দেখি বন্ধ করে রেখেছে, ওদের করেছে

আলাদা,। বিধাতার একি নিষ্ঠুর প্রহসন, একই মায়ের সন্তান হল ভিনদেশী, হল পরস্পরের শত্রু। বহু বৎসর গড়িয়ে গেল, আমরা আর মিলতে পারবো কিনা কে বলতে পারে, কে বলতে পারে ঈশ্বর আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করছেন।

ও আমাকে নিয়ে গেল ওপারে, ওর বৌয়ের সাথে, ছেলে মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ওর বৌ আমাকে নমস্কার জানালো, ভাইয়া বলে সম্বোধন করলো। বৌটা আমাকে পেয়ে কত খুসি। খুসির বেশী কারণ ওর বাপের বাড়ী এপার বাংলায়, এপার থেকে কোন্ ছোট বেলায় চলে গেছে আর আসতে পারেনি। আবার সুযোগ মিলেছে এপারে দেখতে আসার ওর জন্মভূমি, ওর প্রতিবেশীদের। ও বললে ভাইয়া আর কোন বাধা থাকবে না এপার-ওপার যাওয়া আসার। তুমি আবার আসবে, আমরা তোমাদের ওখানে বেড়াতে যামু।

ভাবতে ভাবতে চলে আসি ওদের কথায়, ওদের আশা আকাঙ্খায়। ভাবি এ সীমারেখা সত্যিই কি একেবারে উঠে যাবে—গোটা বাংলা আবার কি এক হবে? দুই বাংলার মানুষের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ সত্যাই কি গড়বে? ভাঙ্গা হাড় আবার কি জোড়া লাগবে? ভাবি সীমারেখা কি ভাবে দুই বাংলাকে তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তাইতো আস্তে আস্তে চলেছি শেষ হয়ে একই বাংলা মায়ের দুটি সন্তান হিন্দু-মুসলমান।
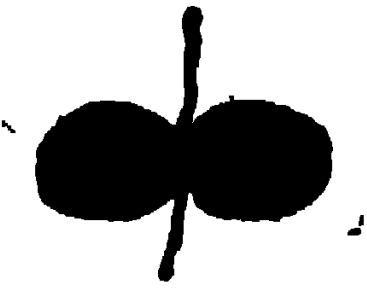
খাসি সাহিত্য

সুকৃতি রায়চৌধুরী

বন আর পর্বত ঘিরে যে বিস্তৃত জনপদ, সেই খাসি অঞ্চলে সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিত সাহিত্য অপেক্ষা লোক সাহিত্যই প্রাধান্য পেয়েছে। মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে যে কিংবদন্তী আর কথা ও কাহিনী, তাই হ'ল খাসি সাহিত্যের আদি পর্ব। ওদেশে পাহাড়ের নাম রাইটুং অথবা জলপ্রপাতের নাম কালিকাই-র সঙ্গে জড়িত হয়েছে যে কাহিনী সেটাই হ'ল ইতিহাসের অঙ্গ। রাইটুং একজন সঙ্গীতজ্ঞের নাম। তথাকার শাসকের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবার অপরাধে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কালিকাই তার দ্বিতীয় স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কূপে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পূজার পবিত্র আচার হিসেবে আজও মুরগী বলির প্রথা চালু আছে কারণ স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে মানুষের পাপে পৃথিবীতে যখন বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠল এবং তাদের বিশালতায় সূর্যকে আবৃত করল, তখন মুরগীই মানুষ আর দেবতার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিল।

খাসি ভাষায় প্রথম লিপি বাংলা লিপি। ঠিক কোন তারিখ থেকে এটি অনুসৃত হয়েছে, তা জানা যায় না। উইলিয়ম কেরীর অনুপ্রেরণায় খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত কৃষ্ণচন্দ্র পাল ১৮১৩ খৃঃ নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদ করতে সুরু করেন। চৈরাপুঞ্জিতে ছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি শাখা। তাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে এই কাজ শেষ হয় ১৮২১ সালে। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ১৮৩৮ সালে তথাকার শাখা বন্ধ করে দিলে ১৮৪১ সালে ওয়েলস্ প্রেসবিটেরিয়ান মিশন এদের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বছরেই জুনমাসে টমাস জোনস্ এবং তাঁর স্ত্রী রোমক লিপি অর্থাৎ ইংরাজী আলফাবেটেই লিখতে সুরু করেন। রোমক লিপি গ্রহণ করায় খাসি ভাষার সমৃদ্ধিতে ইউরোপীয় ভাবধারায় অনুপ্রবেশ ঘটল বলা চলে।

প্রাথমিক যুগে খাসি ভাব ধারায় সাহিত্যের আওতায় আসে বাইবেলের

অনুবাদ এবং উপদেশ বা নীতিমূলক গদ্য সাহিত্য। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও আমরা দেখেছি বাইবেলের অনুবাদের প্রভাব। তদানীন্তন সাহিত্যের যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল স্থানীয় প্রবাদ আর বাইবেলের ভাষার একমতাবে সৌকর্যসাধন করা যাতে সাহিত্যপাঠক মাত্রেই এর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম রস অনুধাবনে সমর্থ হন। খাসি কবিতা মূলত খৃষ্টের ভজনাগীতের ওপর ভিত্তি করে রচিত।

টমাস জোনস্ শুধু বর্ণমালা নিয়ে পড়ে থাকেননি, তিনি প্রথম খাসি বর্ণবোধ রচনা করেন। তাঁর রচিত অন্য পুস্তক 'দি কেলথ রীডার।' জোনসের উত্তম অন্তরের প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৮৫৫ খৃঃ ডবলু প্রাইজ লেখেন 'অ্যান ইনট্রোডাকসন্ টু দি খাসি ল্যাংগুয়েজ।' ১৮৫৭ খৃঃ প্রকাশিত হয় 'দি পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' এবং ১৮৫৯ খৃঃ প্রকাশিত হয় 'ক্রীপচার হিসট্রি।' বলা বাহুল্য এই দুটি গ্রন্থই খাসি ভাষায় রচিত। ইংরাজি ভাষা থেকে খাসি ভাষার প্রথম অভিধান প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খৃঃ এবং এর সঙ্কলক হিউজ রবার্টস্। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত এর রচিত খাসি গ্রামার লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খৃঃ।

ডঃ জন রবার্টস প্রচলিত কাহিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে সাহিত্যের উৎকর্ষতার দিকে নজর দিলেন। তাঁর প্রণীত 'দি থার্ড রীডার-এর সঙ্গে পাই আঠারোটি গল্প, চারিত্রিক বিকাশ সম্পর্কিত প্রবন্ধ, বাইবেলের কিছু গল্প এবং লোক কবিতা। খাসি গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে তিনি লিখলেন 'দি ফোর্থ রীডার।' এই গ্রন্থে তিনি 'দি পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' অনুবাদ করতে সুরু করেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে এই অসম্পূর্ণ কাজ সমাধান করেন তাঁর স্ত্রী মোগুন বার। ইনি খৃষ্ট-ধর্মান্তরিত খাসি। ডঃ জন রবার্টসের কাব্য রচনায় পরিচয় মেলে 'কাসারাক' 'জুলিয়াস সীজার' ইত্যাদি অনুবাদের মধ্যে। তিনি খাসি জাতীয় সঙ্গীত 'বি খাসি রি খাসি'-র জনক। তার বিভিন্ন বক্তৃতাবলী তাঁর স্ত্রী মোগুন বার কর্তৃক সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত বহু খাসি, যেমন, রেভারেণ্ড কিসানবিন, রেভারেণ্ড খোল্ড, প্রমুখ এই সঙ্কলনে তাঁকে সাহায্য করেন।

খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত বহু খাসি সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই প্রাথমিক স্তরে বাইবেলের অনুবাদ নিষ্ঠাবান। ১৮৫৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়। 'ফোর গসপেল' ও

পুওর অফ ওয়াকৃস্।' ১৮৯১ খৃঃ পর্যন্ত এ ধরণের অনুবাদ সমানে. প্রকাশিত হতে থাকে।

খাসি সংবাদ-সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ ১৮৮০ খৃঃ। প্রথম মাসিক 'সংবাদ মুখপত্র' ঐ একই সালে প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করেন ডবলু' উইলিয়মস্। এর পর প্রকাশিত হয় 'দি ক্রুসেডিং খৃশ্চিয়ান।'

১৮৯৫ থেকে ১৯২৫ পর্যান্ত খাসি সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় প্রায় প্রতিটি বিভাগে ধর্মীয় প্রভাব কাজ করেছে। এই সময়ের সাহিত্যিকবর্গ খাসি প্রাচীন ধর্ম এবং তার ঐতিহ্যবাহী ক্রিয়া-কলাপকে অবলম্বন করেই সাহিত্য রচনা করেছেন। মিশনারীদের প্রভাবমুক্ত হবার আকাঙ্খায়, না কি কেবল সাহিত্যিক প্রেরণায় তাঁদের এই অন্তর্লোকে বিচরণ, তার সঠিকনির্দেশ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এ কথা ঠিক যে এই সময় ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম পুরাণ সম্পর্কিত রচনা ভাষার সংহতি আনতে সহায়ক হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী খাসি ধর্ম সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ ইউ জীবন রায়ের 'দি রিলিজন অফ দি খাসিস।' স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল এবং সংক্ষিপ্ত আকারের এ গ্রন্থে আমরা পাই জন্ম, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা আর প্রবাদ সংগ্রহ। এর ভূমিকায় নতুন ধর্ম সম্পর্কে কটাক্ষ আছে এবং সনাতন ধর্মের প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা আছে। অন্য একটি গ্রন্থে ইউ জীবন রায় খাসি ধর্মের একেশ্বরবাদ সম্পর্কে সরস আলোচনা করেছেন।

ইউ রাবন সিং এর 'দি কাস্টমস্ অফ দি খাসিস' গ্রন্থে প্রচলিত আইন কানুন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

শিবচরণ রায় তাঁর 'নলেজ অফ গড এণ্ড ম্যান' গ্রন্থে ঈশ্বরের প্রকৃতি আত্মা, ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এঁর অন্য একটি গ্রন্থে নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এঁরা সকলেই প্রবাদ কাহিনী সংকলন করেছেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ইউ রাবন সিং-এর 'দি প্রোভার্বস অফ দি অ্যানসেস্টস্'। এটি ১৯১২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই লোককথায় রঙ্গ-ব্যঙ্গের ও নাটকীয়তার সমন্বয় দেখা যায়। এই সময়ে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃঃ প্রকাশিত হয় এইচ

আর জিয়েনগ্‌তো সম্পাদিত 'দি খাসি টুডে', ইউ জীবন রায় সম্পাদিত 'দি ওয়াচম্যান' এবং ১৯০৩ খৃঃ 'দি ব্রাইট স্টার'।

১৯০৫ সালে নিসার সিং-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় খাসি থেকে ইংরেজী ভাষার অভিধান। ১৯১৯ খৃঃ অর্থাৎ এঁর মৃত্যুর পর এঁরই রচিত ইংরেজী থেকে খাসি ভাষার অভিধানটি প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খৃঃ প্রকাশিত হয় বি, কে, শর্মা রায়ের রচিত 'দি হিষ্ট্রি অফ দি খাসিস।" ভূগোল ও গণিত বিষয়ক প্রথম গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় ১৯২০ থেকে ১৯২১ খৃঃ ভেতর। খাসি ভূগোলে শুধু ভূপ্রকৃতির বিবরণ নয়, এতে আছে রাজনৈতিক ও শাসন পদ্ধতির বিবরণ এবং আসাম ও খাসি পাহাড়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকা। এ পর্বের কবিতায় নতুনত্ব কিছু মেলে না।

১৯২৫ সালের পর সাহিত্যে দুটি ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। একটি সনাতন শাশ্বত ধর্মের ধ্বজাবাহী, অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ। ইউ জীবন রায়, রাবণ সিং, শিবচরণ রায় প্রবর্তিত ধারায় সাহিত্যকে পুষ্ট করে চললেন ডঃ এইচ লিংডো, আর এম, লেনিগ্রাম, পি, গাটপো, এবং দুজন অ-খাসি মিশনারী যাজক জি, কষ্টা এবং জে ব্যাকিয়ারেলো। ধর্মনিরপেক্ষ রচনার প্রভাব পড়ে নাটকে, অনুবাদে, রাজনীতিমূলক রচনায় এবং বিশেষ করে কবিতায়।

ডঃ এইচ, লিংডো রচিত ও ১৯২৮ খৃঃ প্রকাশিত 'দি প্রেয়ার ডান্স এণ্ড ক্রিয়েশন অফ চেরা সিয়েমস' গ্রন্থের বিষয়বস্তু হ'ল খাসি রাজ্যে রাজকীয় অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের প্রভাব। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৭ সালে।

জে, ব্যাকিয়ারেলো ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত তাঁর 'দি ফুট প্রিন্টস্ অফ আওয়ার অ্যানসেস্টরস গ্রন্থে সিয়েমদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন লোকানুষ্ঠান সম্পর্কীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৩৬ খৃঃ প্রকাশিত জি, কষ্টা-র গ্রন্থে সিয়েম রাজন্যবর্গের বিচার পদ্ধতি, বৃদ্ধপদ্ধতির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ১৯৫৩ খৃঃ আর এম্ নন্‌গ্রাঙের 'দি খাসি ইন দি পাষ্ট' গ্রন্থের পরিকল্পনাটী অভিনব। পূর্বোক্ত গ্রন্থকারদের রচনার সংকলন এটা। লোক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ননগ্রাম, গাটপো, এবং সোসো থাম। সোসো থামের ঈশপের গল্পের অনুবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর ভাষার মৌলিকতা প্রশংসনীয়।

ব্রাইট পর্বের কবিতা রচনাশৈলী ও তার বাঙ্গালায় আপন আসন করে নিয়েছে। সোসো থামকে বলা হয় খাসি ভাষার ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ১৯১৫ খৃঃ এঁর প্রথম কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বর্ণনা আর গ্রামীণ জীবনের ছবি তার কবিতা প্রধান বিষয়বস্তু। ইংরেজী কবিতার অনুবাদও ইনি প্রভূত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর অন্য একটা গ্রন্থে তিনি প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। অর্বাচীনের প্রতি কটাক্ষ প্রকাশে তাঁর রচনা সোচ্চার।

পি. গাটপো তাঁর 'দি ট্যাগস্ এ্যাডভেঞ্চার' কাব্যগ্রন্থে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। শিশুদের জন্য রচিত ছড়া ছন্দের ব্যবহার পাঠককে মুগ্ধ করে। বি, আংখিউর কাব্যের বৈশিষ্ট্য তার বিচিত্রতা। ১৯৩৬ খৃঃ প্রকাশিত তাঁর 'ওয়ার্ডস্ এণ্ড সং' গ্রন্থে আমরা পাই রোমান্টিক কবিতা, কাহিনীধর্মী কবিতা, মানুষের জয়গানে মুখরিত কবিতা, প্রকৃতিপ্রেমের কবিতা। হাস্য-রসাত্মক কবিতাও আছে। এইচ ইলিয়াস লিখেছেন দীর্ঘ কবিতা 'দি গোল্ডেন ক্রাউন অব দি সীজন'। এতে পাই সিয়েম রাজন্যদের অভ্যুত্থানের ইতিহাস, এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের ওপর লিখিত কাহিনী।

১৯৫৭ খৃঃ প্রকাশিত ভিক্টর বন্দর রচিত' 'খাসি পোয়েমস্' একটী উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। এতে ছন্দ ও যতির সুষ্ঠু প্রয়োগ একে শ্রুতি মধুর করে তুলেছে। কবিতা পাঠ গান হয়ে ধরা দেয় শ্রোতার কানে। বিশেষত, স্থানীয় এক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এই কবিতাব পঠনপাঠন গানের মতই শোনায়।

ভাষা ও শিক্ষা বিস্তারে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত ইউ মোগুন বারে-র 'এংলো খাসি প্রাইমার' এবং ভি, ওয়ালাং-এর 'মডেল ইংলিশ ট্রানস্লেশন' এবং 'নিউ ইংলিশ প্রাইমার'। এফ, এম. পাখ-এর কয়েকটী রচনার ভূমিকা অনবদ্য। ১৯৬৩ সালে পাখ-এর যে বইটী প্রকাশিত হয়েছে তা অনেকটা নাটকের ঢঙে রচিত। বিভিন্ন চরিত্রের পরস্পরের আলোচনায় ল্যাটিন, সংস্কৃত, খাসি, ও ইংরাজী ভাষার তুলনামূলক আলোচনাই এর বিষয়বস্তু। ভি বারে-র রচিত 'ড্রামা অব ইউ তিরোট সিং' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এটির রচনাকাল ১৯১৬ খৃঃ। একজন খাসি দেশপ্রেমিকের বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধে কারাবরণের কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত। প্রত্যেকটি চরিত্র বলিষ্ঠ, সংলাপ সাবলীল এবং পরিণতি অত্যন্ত আবেগময়।

১৯৬১ খৃঃ এফ. এম পাখ সেক্সপীয়ারের 'এজ ইউ লাইক ইট' অনুবাদ করেন। তবে এটি আক্ষরিক অনুবাদ-বলে জনপ্রিয় হয়নি।

রাজনীতিমূলক রচনা ১৯৩০ খৃঃ থেকে যথার্থ সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। এবং পাঠককূলকে রাজনীতি সচেতন করে তুলতে অনেক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ সংযোজনী রচয়িতা নেতা: জে, এম, নিকলস্ রচিত প্রবন্ধাবলী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আর একটি প্রভাবশালী পত্রিকার সম্পাদক হলেন এল, বাসান।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : বি, এম. পাখের কৃষিবিদ্যার ওপর গবেষণা-মূলক গ্রন্থ। এম রামার গাছ, ফুল ইত্যাদির ওপর গ্রন্থ। এক কথায় বলা চলে বর্তমান খাসি সাহিত্য তার কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে সাহিত্যের আসরে পাকা স্থান করে নিয়েছে।

কবি

দাউদ হায়দার

কবি হে যাচ্ছ কোথায় ?
— শবের কাছে
ওখানে তোমার কে আছে ?
— শব্দ বাণী —
সে তো এক অশরীরী
— তাতে কি
শব্দকে তুমি করবে কি ?
— রূপসী, গর্ভবতী।

●

॥ অন্ধকারের সম্পাত ॥

দেবারতি মিত্র

কালো পদ্ম ফুটি ফুটি করে যেন
গভীরে ছলকে ওঠে ভূতে পাওয়া জল—
এই পথ ছুটে যাচ্ছে দূর কার্ণিভালে
মহানিম গাছটার মাথা ভেঙে
সবুজ রক্তমাখা চাঁদ জ্বালে
কে জ্বালায় তারা ?
আবছা হাওয়ার সাড়া ভেসে ভেসে আসে।

নিবুনিবু ষ্টেশনের পাশে
গাড়ি দাঁড়ালো না
অন্ধকারে চেনাশোনা বলে কিছু নেই
টানা বাংকে কে জাগছে রাত
'রাত জাগা ভালো নয়'
হঠাৎ একটু ছুঁয়ে চলে যায়
নীরব সম্পাত।

নিজের চেহারা দেখ

সুধীর করণ

এম্‌নি ক'রে পরমায়ু কেটে যাবে?
এম্‌নি ক'রে প্রতি বছরেই
পাতাঝরা বনের আড়ালে
নিজের বিশীর্ণ লজ্জা ঢেকে দেবে তুমি!
এম্‌নি ক'রে শেষ হবে কোকিলের গান!
আমের মুকুল থেকে
মধুঝরা বন্ধ হবে কখন সহসা?
এম্‌নি ক'রে প্রতিদিন প্রতি বছরেই
সূর্য পরিক্রমা শেষ
যৌবনের দিগন্তে তোমার!

তুমি জান, সবই—
তবু কেন ঐ—
মায়াবী দর্পণখানা
বার বার তুলে ধর
কুঞ্চিত গালের সামনে
পাণ্ডুবর্ণ মেখে।
তারচেয়ে একবার ইচ্ছারূপে
নিজেকেই বলি দাও তুমি
একটিবার পরিপূর্ণ লজ্জার আড়ালে
অন্ধকার নিদ্রাহীন কর।
এম্‌নি ক'রে পরমায়ু
দিওনা নিঃশেষ করে, শূন্যতার পায়ে।

জেনে রেখো — তুমি,
প্রতিদিন হত হয় রাত্রির কৃপাণে।
অন্ততঃ একটি দিন
রক্ত উচ্ছলিত হোক্ বধ্যভূমি জুড়ে;
কোন দৃপ্ত পুরুষের খড়্গাঘাতে তুমি
একবার নিহত হও।
তারপর — মায়াবী দর্পণে
নিজের চেহারা দেখ
— "নতুন বধূর মত দীঘি ভরা জল।"

সোনা ছেলের গান

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আর কতকাল ঘুমোবি তোরা
ধূসর মায়ের চরণতলে,
ওঠ্‌রে জেগে এবার তোরা
কাঁদিস নে আর নেশার ছলে।
দুন্দুভিটা বাজা এবার
অকাল মেঘে বর্ষা এনে,
আগুন ছটায় সুর তোল ভাই
তোদের নাচন জগৎ চেনে।
মাথায় তোলা চন্দ্র তোদের
মাথা থেকে দে রে ফেলে,
বাঁচতে যদি চাস তোরা ভাই
বন্যা ডাকা মাথার জলে।
প্রতারণার খোলস প'রে
আদিমকালের আভরণে,
ঢাকিস নে আর লজ্জা তোদের
বঞ্চনারই আস্তরণে।
নাচতে তোদের হবে এবার,
ভয়ংকরের 'তাথৈ তুলে,
ওঠরে জেগে এবার তোরা
কাঁদিস নে আর সোনার ছেলে।

স্বপ্ন ও প্রিয়তম

মিত্রা চক্রবর্তী

আমার স্বপ্নে কেন তুমি বারবার ফিরে এস ?
অস্তগামী সূর্যের কাছে আমার প্রার্থনা:
চলে যাও। দূরে চলে যাও আমার এ বিদীর্ণ অন্তর থেকে।
পুরানো দিনকে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম
শুধু একটি দিনের জন্য। কিন্তু পারিনি
শুধু তোমারই জন্য।
তোমার প্রচণ্ড অট্টহাসি বিদ্যুৎবেগে
আমার শিরায় শিরায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়।
দেহের প্রতিটি অণু আজ মৃত, কালো অন্ধকার
অমাবস্যার রাত্রে আমি-আয়নার বুকে তোমার প্রতিচ্ছবি দেখি
সে কি আমার দৃষ্টিভ্রম ?
কোন অদৃশ্য হাত আমাকে হাতছানি দিয়ে
ডেকে নিয়ে গেছে সুদূরের পারে।
ঝাউগাছের শিকড়ে শিকড়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরেছি আমি : "কোথায় তুমি ?"
সে শব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে
আমার এ শূন্য হৃদয়ে।
মধ্যরাত্রে ঘরছেড়ে বেরিয়ে আসি
সমুদ্রের বেলাভূমিতে।
তরঙ্গে তরঙ্গে দেখি তোমার তীক্ষ্ণ চাউনি।
অসহ্য হয়ে পালিয়ে গেছি
নগরে, গ্রামে, বন্দরে অথবা সমুদ্রের তলদেশে।
আগামী বছরের সমস্ত আশা
ধুলিসাৎ হয়ে গেছে ভরবারির শেষ আঘাতে।
সুতরাং,
চলে যাও, দূরে চলে যাও প্রিয়
আমার এ বিদীর্ণ অন্তর থেকে।
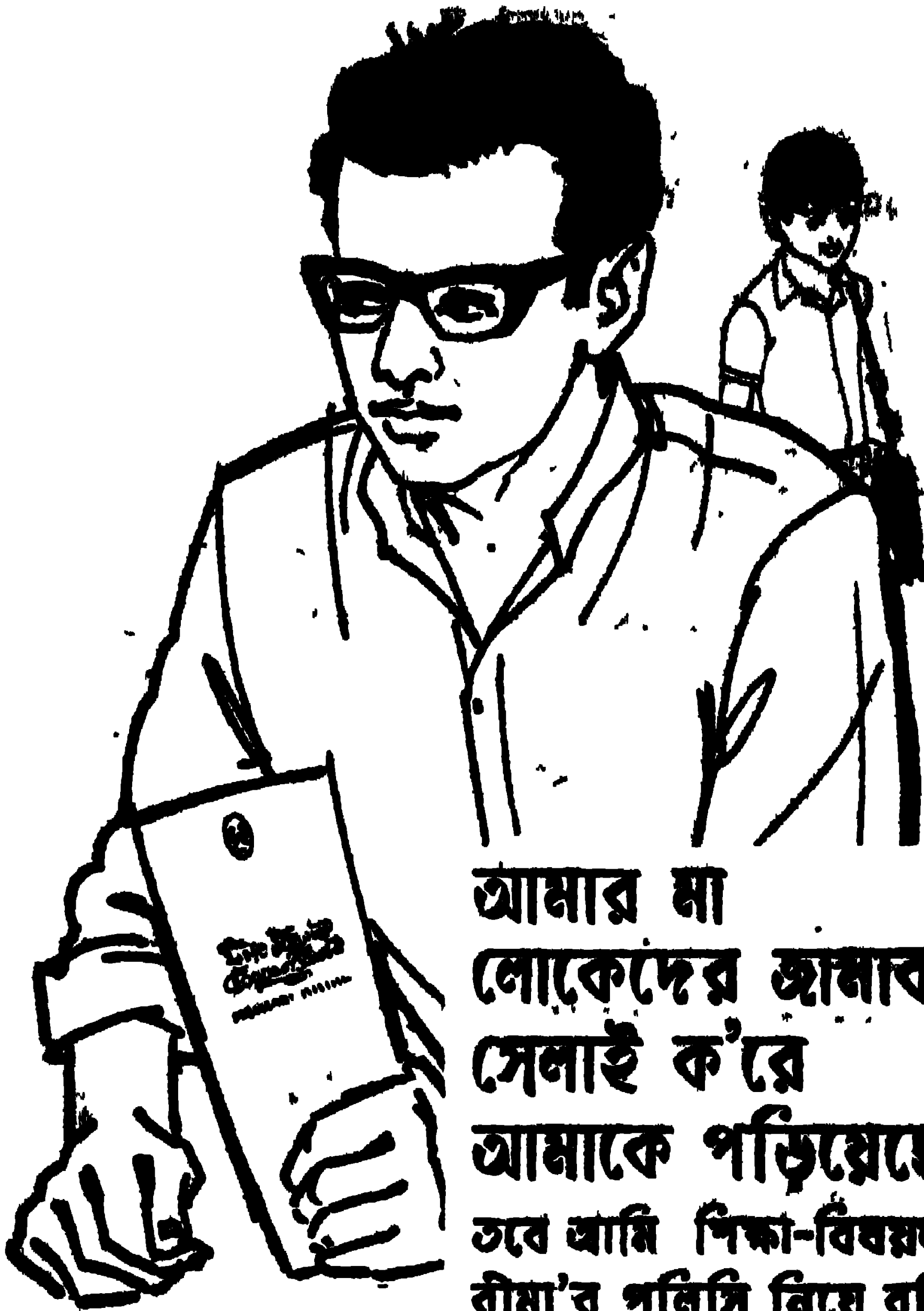
আমার মা লোকেদের জামাকাপড় সেলাই ক'রে আমাকে পড়িয়েছেন।

তবে আমি শিক্ষা-বিষয়ক বৃত্তি বীমা'র পলিসি নিয়ে রবিকে উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

"যখন আমার রবির জন্ম হয় তখনই আমি ওর জন্য ৬,০০০ টাকার ১৬ বছর মেয়াদের একটি পলিসি নিয়ে নিই। এর জন্য মাসিক প্রিমিয়াম মাত্র ৩০টাঃ ৮০পঃ। পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হ'লে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন আমাকে পাঁচ বছরের জন্য প্রতি ছয় মাস পর পর ৭০০ টাকা ক'রে দেবে। এই টাকায় রবি সহজেই কলেজে পড়াশুনা করতে পারবে। এমনকি আমার অবর্তমানেও রবি ওই টাকা পেতে থাকবে (সেই ক্ষেত্রে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না)"।

আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা

আপনিও লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের এই ধরণের পলিসি নিয়ে আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা সুনিশ্চিত ক'রে ফেলতে পারেন। এর প্রিমিয়াম—আপনার বয়স, বীমার শ্রেণী, আর পলিসির মেয়াদের ওপর নির্ভর করবে। আপনার ছেলেমেয়ের জীবনকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করার জন্য বীমা-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়।

আপনার সব রকমের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের অন্য আরও অনেক রকমের পলিসি রয়েছে। আজই লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

[illegible]

অষ্টম বর্ষ দশম সংখ্যা
মাঘ ১৩৮১
JANUARY, 197[illegible]

প্রবন্ধ

কবিতা

ধারাবাহিক উপন্যাস

গল্প

ফিচার

প্রচ্ছদ
ত্রিদিব বিশ্বাস
যুগ্ম-সম্পাদক
অমিয়েশ চট্টোপাধ্যায়
গৌরগোপাল দাস

নেতাজী! তুমি নামেই থাকো

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা একটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেছেন। এই সমাধানের জন্য নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র বসুর ভক্ত, অনুরাগীবৃন্দ নিশ্চয়ই মহাখুশি হবেন। নেতাজীকে কি ভাবে এই সমাজে বাঁচিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। অবশ্য প্রতি বৎসরই তেইশে জানুয়ারীর পূর্বে এই ধরণের কিছু কিছু সংবাদ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। তবে অন্যান্য বারের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে পশ্চিম-বঙ্গের মন্ত্রীসভা আপাততঃ স্থির করেছেন যে অতঃপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেতাজী বিশ্ববিদ্যালয়, সেকেণ্ড হুগলী ব্রীজ এর নাম নেতাজী সেতু রাখা হবে এবং বিধান নগরে একটি ষ্টেডিয়াম নেতাজীর নামে গড়ে উঠবে। এই সংবাদ পাঠ করে আমাদের সাবেকী আমলের একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। কোন এক গৃহস্থ ঘরের একটি দজ্জাল বৌ কিছুতেই তার শাশুড়ীকে সহ্য করতে পারতো না। প্রতিদিনই কোন না কোন অছিলায় কোন্দলে লিপ্ত হতো। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুন যে দিন দেহত্যাগ করলেন সেদিন থেকে বৌটির মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন এলো। প্রতিদিন সকালে শাশুড়ীর ছবিতে ফুল-ধুপ-ধুনো না দিয়ে এবং প্রনাম না করে তিনি জল গ্রহন করতেন না। নেতাজীর তেজদৃপ্ত আদর্শ ও ধ্যান ধারণাকে সমাজের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার এটিই বোধ করি চমৎকার ব্যবস্থা।

একদা কবিগুরুর স্বপ্ন ধ্যান ধারণা ও তাঁর সৃষ্ট কাব্য সাহিত্য-নাট্য ও সঙ্গীতের আদর্শ প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার যে পরিকল্পনা ১৯৬১ সালে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহন করেছিলেন তার সার্থকতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে! ? আমরা দেখেছি রবীন্দ্র সেলুন থেকে শুরু করে রবীন্দ্র ভারতী পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরে কবিগুরুকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে

(শেষাংশ নয় পৃষ্ঠায়)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মণিলাল খান

মহৎ সাহিত্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটি অতি পরিচিত নাম। এই নামের সঙ্গে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কৌলীন্যতা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ছ-ই ডিসেম্বর নৈহাটির বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম। তাঁর প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ পলাশীর যুদ্ধের সময় খুলনা জেলার 'কুমিরা' গ্রাম ত্যাগ করে নৈহাটিতে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর ১৭৬০-৬১ খৃঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি লাভ করায় তথায় একটি স্থায়শাস্ত্রের টোল চালু হয়। টোলটি এই অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে বলে জানা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পিতা রামকমল স্থায়রত্ন ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যালয় জীবন থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলে তিনি দু-বার 'ডবল-প্রোমশন' লাভ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন: 'My school career is more brilliant than my college career.

বলাবাহুল্য শুধু বিদ্যালয় জীবনই নয়, কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষাও তিনি উত্তীর্ণ হন। তাঁর বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে ১৮৭৫-৭৬ সালে সরকারী শিক্ষা-বিষয়ক প্রতিবেদনে উচ্চ প্রসংশা করা হয়। সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় তিনিই একমাত্র প্রথম শ্রেণী লাভ করেন।

সংস্কৃত ইংরাজী বাঙলাভাষা ছাড়া হরপ্রসাদবাবু উত্তরকালে পালি প্রাকৃত জার্মান তিব্বতী—প্রভৃতি ভাষাতেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত করার পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে হেয়ার স্কুলের 'ট্রানস্লেশন-মাষ্টার' হিসাবে হরপ্রসাদবাবুর কর্মজীবন শুরু। অতঃপর লক্ষ্ণৌ—ক্যানিং কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর থেকে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। তাছাড়া ১৯২১-২৪ খৃঃ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব নেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও শ্রীশাস্ত্রী বেঙ্গল-লাইব্রেরী, ব্যুরো অব ইনফর্মেশান, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সেকালের বহু গুণীজনও হরপ্রসাদবাবুর সাহচর্যকে গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

প্রায় আটাত্তর বৎসর জীবন-কালের মধ্যে হরপ্রসাদবাবু যে সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন, অল্পলোকের ভাগ্যেই তা ঘটে থাকে। কেবলমাত্র স্বদেশেই নয়, বিদেশেও তাঁর মনীষার যথাযোগ্য আসন নির্দিষ্ট হয়।

সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালায়' হরপ্রসাদবাবুর সম্মাননার যে বিস্তৃত তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন—তাতে জানা যায় যে হরপ্রসাদবাবু সরকারের 'Age of Consent Bill'—এর সন্তোষজনক 'Note' দেওয়ায় সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধী লাভ করেন। ১৯১৬ খৃঃ মথুরায় অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন, ১৯২১ খৃঃ বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অধিবেশনের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৭ খৃঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. উপাধি দিয়ে হরপ্রসাদবাবুর প্রতিভাকে বরণ করেন।

সাহিত্য সাধক হিসাবেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অবদানের গুরুত্ব নির্ণয় সম্ভব নয়। বঙ্কিম-প্রতিভার যুগে তাঁর সাহিত্যের সূচনা হলেও অল্পদিনের মধ্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৮৭৬ খৃঃ থেকে ১৮৮৩ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় আট বছর 'প্রায় প্রতি মাসেই' তিনি 'বঙ্গদর্শনের' জন্যে প্রবন্ধ লিখে দিয়েছেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ভারত মহিলা' (হোলকার-পুরস্কার প্রাপ্ত) প্রবন্ধটি ১৮৭৬ খৃঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় এবং সেই সূত্রেই তাঁর বঙ্কিম-সান্নিধ্য লাভ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ভারত-মহিলার পর 'একাদিক্রমে' বাল্মীকির জয় (১৮৮১ খৃঃ), সচিত্র রামায়ণ (১৮৮২ খৃঃ), মেঘদূত ব্যাখ্যা (১৯০২ খৃঃ) প্রভৃতি নিবন্ধ গ্রন্থ এবং কাঞ্চনমালা (১৯১৩ খৃঃ), ও বেনের মেয়ে (১৯২০ খৃঃ) নামক দুটো উপন্যাসও রচনা করেন। এ-ছাড়া বিভিন্ন অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ ও বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, মাসিক

বসুমতী, প্রবর্তক, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, প্রাচী, প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য।

'মেঘদূত ব্যাখ্যা'—প্রবন্ধ রচনার জন্য কতিপয় সমালোচক শ্রীশাস্ত্রীর প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগ করেন। আর সেই কারণেই মধ্যে কয়েক বছর, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পরে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে পুনরায় যোগদান করেন।

কিন্তু তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত হয় পুঁথি-সাহিত্য সংগ্রহে এবং সেগুলোর তালিকা-প্রনয়নে। তিনি বহু দুর্লভ পুঁথির আবিষ্কারক এবং সম্পাদক। এগুলোর মধ্যে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এটা আসলে চারটে (চর্যা, সরহ-দোহা, কাহ্ন-দোহা ও ডাকার্ণব) পুঁথির একত্র গ্রন্থন। তার মধ্যে চর্যাপদই বাঙলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন রূপে চিহ্নিত ও স্বীকৃত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ পুঁথিখানির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একমত।

হরপ্রসাদবাবুর এই কৃতিত্বে বাঙলাভাষার গৌরব বৃদ্ধি ঘটার আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রনীধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, চর্যার আবিষ্কারে বাঙ্গালা ভাষা জন্ম-মুহূর্ত থেকেই যে নিজের মূলসুর অর্থাৎ গীতিকাব্য—খুঁজে পেয়েছিল এটা পরম সৌভাগ্য। বিজয়-লক্ষ্মী তাই বাঙ্গালা সাহিত্যের আসন জগতের প্রথম শ্রেনীর সাহিত্যের মধ্যেই নির্দিষ্ট করেন।

বাঙলা ভাষার প্রতি হরপ্রসাদবাবুর নিষ্ঠার অন্তছিলনা। বহু কাল আগে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন: যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। ---- ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই কর।

ইংরাজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান পড়িতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙলা দিয়া ইংরাজী শিখনা কেন? ইংরাজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? (মাসিক বসুমতী: ভাদ্র ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

বস্তুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মধ্যে এই রকম বঙ্গ-প্রীতি বা দেশজ মনোভঙ্গী লক্ষ্য করা গিয়েছিল—তার পেছনে 'আনন্দ মঠের' লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে, সে কথা শ্রী শাস্ত্রী নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

কেবলমাত্র প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহেই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আহরণেও তিনি পরিব্রাজক হিসাবে এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বহু তথ্য উদঘাটন করে প্রকৃত পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। তিনি কেবল 'প্রাচ্যবিদ্যার' সংগ্রাহকই ছিলেন না, এই বিদ্যার সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। আর সেই কারণেই সমালোচক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সম্বন্ধে একটি যথার্থ উক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন: 'He, of all people, has been the real father of oriental Research in North India'.

১৯৩১ খৃ: ১৭ই নভেম্বর বঙ্গ-ভাষার জ্ঞানতপস্যী শিল্পী-ভগীরথ পরম শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কলকাতার পটল ডাঙ্গার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকটা দশক পার হলেও, সাহিত্য চিন্তায় যুগান্তকারী সংযোজন ঘটে থাকলেও, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম চিরকালের জন্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে নির্দিষ্ট থাকবে।

(চার পৃষ্ঠার পর)
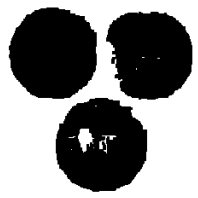
রাখা হয়েছে। আর কিছু না হউক, কবিগুরুর নামটিতো আগামী বংশধরগণ উচ্চারণ করতে পারবে। আদর্শ ও মহিমা ছেড়ে নাম কীর্তন নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি এদেশের মতো কোন সভ্যদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই। নেতাজীর দুর্ভাগ্য! যে যুব গোষ্ঠিকে নিয়ে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে, যুব সমাজের প্রতি তিনি প্রচণ্ড রকমের আশা পোষণ করতেন—যাদের তিনি দেশের ভবিষ্যৎ বলে প্রতি নিয়ত গর্ব বোধ করতেন আজ সেই দেশের যুবসমাজের একটা বিরাট অংশ সৎ আদর্শ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে—উপযুক্ত খাদ্য বস্ত্র-শিক্ষার অভাবে দিনে দিনে অপমৃত্যুর অতলে চলে পড়েছে। এজন্য অবশ্য যুব গোষ্ঠীর কোন দোষ নেই। আমাদের সরকারের শিক্ষা ও যুব কল্যাণ দপ্তরটি কি শুধুমাত্র নামেতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তারা কি দেশের মণীষীদের আদর্শ ধ্যান ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান শতাব্দীর যুব সমাজকে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন না। আদর্শ ছেড়ে সেতু বাগান অথবা সেলুনের নামের সঙ্গে মনীষীদের নামের সংযুক্তিকরণের মধ্যে আমাদের দৈন্য, নিরর্থক ন্যাকামি এবং সামগ্রিকভাবে অকর্মণ্যতার কথাই বারে বারে মনে করিয়ে দেয়। মন্ত্রীসভা যদি দয়া করে এটুকু উপলব্ধি করেন তবে এ সমাজ উপকৃত হবে। আমরা আশা করবো নেতাজীর নামের সঙ্গে যাইই যুক্ত হউক—তাঁর আশা আকাঙ্খা ও ধ্যান ধারনা যেন বাস্তবায়িত হতে কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়।

সময়কে জাপটে ধরে

অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

সময়কে জাপটে ধরে আমি উদভ্রান্ত নদীকে বাঁধছিলাম
মুখ ও মুখের ভগ্নাংশ আমাকে বাহাবা দিচ্ছিল দাঁড়িয়ে
আমার চারদিকের পতাকায় পতাকায় হেসে উঠছিল রোদ
রক্তের ভিতর আমার জাহাজের ভোঁ বাজছিল কেঁপে

ভাবছিলাম তাকে আর কোনোদিন্ স্মরণেও আনবনা
তার নীল পোষাকে অগাধ ছায়াচ্ছন্ন বহতা এস্রাজ
চোখে তার সপ্তাশ্ব বিশ্রাম নিত রাজস্থানী চিত্রের মতন
অপার সমুদ্র এসে পায়ে ফেলত বিদেশের বহুবর্ণ ফুল

সে এখন পথে পথে আমার ক্ষতকে ধোয়াচ্ছে
নদী গেছে অন্যদিকে ঘুরে, পতাকা বিছিয়ে চলছে হুয়া
শন্‌শন্ বাতাসে তার চুলে পড়ছে কর্কশ পাথর
শূন্যে ঝুলছে চকচকে চাঁদের পিঠ অনন্যোপায় ॥

যুবক চতুর্দ্দশ
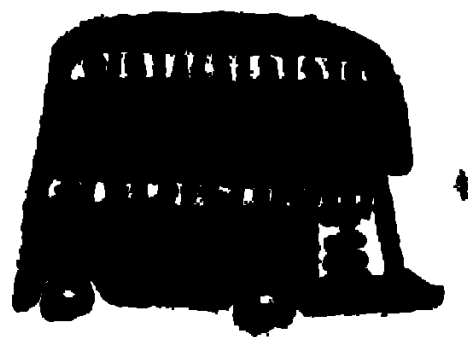
ভারতী নিয়োগী

উঃ! ভাবতে পারিনা তোমাকে ; কত পরিবর্তন এখন তোমার !
বয়স তোমার চতুর্দ্দশ ; শৈশবের অপস্রিয়মান বাঁক ছেড়ে
এলে তুমি এখন চাপল্যের বাঁকে—
যেন কিশলয়ের বাঁকা স্রোত।
তোমার মাথায় ঝুঁটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত ;
চোখ দুটি কেন ম্লান ? চতুর্দ্দশের পদক্ষেপে—
কিছুটা হয়ত শ্রান্ত-ক্লান্ত বা কিছুটা আহত ;
প্রায় সব পংক্তিতে তুমি এখন অপাংক্তেয়,
সিনেমায় প্ল্যাকার্ড তোমায় করে নিষেধ,
উপন্যাস ইঙ্গিতে করে মানা,
কেবল রকের আড্ডায় তুমি হও আমন্ত্রিত,
রাজনীতি বিশারদ,—তর্ক বিশারদ তুমি।
তোমার ম্লান চোখ দুটো দেখে—
পথের 'বেল বটম্' ও 'চিকণ—পাঞ্জাবিপরা'
সুগন্ধ টয়লেটে ভরপুর তোমার মসৃন অবয়ব।
চোখ দুটো রঙিন তোমার, কখন ও বা হয় নীল,
কখনো লাল, কখনো সবুজ ;
তুমি যে হয়ে রয়েছ এখনো
অপ্রাপ্ত বয়স্ক— অবুঝ ?

এক ঝাঁক পাখি

[illegible]

এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল
তারা পশ্চিম থেকে পূবে চলে গেল।
আমারও বুকের দুয়ার এঁটে মহড়া দেয় এক পাখি;
গাইতে জানে তবু তার বুকে বিরাট একটা ফাঁকি।
ধ্বনির বুকে প্রতিধ্বনি
প্রতিধ্বনির পরে? অন্তবিহীন শূন্যতা বোধ।
    বিন্দু বিশাল নাকি? কে জানে।
বাইরে আকাশ সবুজ বন আর পাখি পাখালির ভিড়
শহরের হাটে বাজারে নীল নিয়নের আলো
অন্ধকারের নেপথ্যে কোন্ বিপত্নীক কাঁদে?
উচ্চারণের বিভিন্নতায় অর্থবহুমুখী!
কিন্তু হায় অদৃষ্টলিপি—
আমার ডানাভাঙা পাখিটাও দূর দূরান্তে পাড়ি দিতে চায়,
ঘরে বসে তারাদের চোখে আমি শুধুই স্বপ্ন দেখি॥

জন্ম নিয়েছে এক চারা বটগাছ

সন্তোষ সাহা

সকাল বেলার শিশির ঘাসের ডগায়
সামনে বিছানো সবুজ আঙ্গিনায়।
দুপুরের তাপে ক্লান্ত আসন্ন বিষন্ন বিকেলের ছায়া
কেঁপে কেঁপে সুর তোলে বাখালি মায়ায়।
দূরাগত কোন এক অস্পষ্ট ধ্বনিতে।

স্মৃতিরা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়।
শহরের অলিতে গলিতে ভ্রাম্যমান পথিক।
ফাল্গুনের মোহিনী সন্ধ্যায় ধোয়াশায় দৃষ্টি অবশ
বিকৃত-কুশ্রী-নোংরা পথের যত আবর্জনা
ভালবাসা প্রেম প্রীতি সকল কিছুর স্তূপীকৃত জঞ্জাল।
রাস্তার ডাস্টবিনে মানুষেরা হয়ে যায় কুকুর বেড়াল
চকচকে লোভী চোখে খুটে খুটে চেটে চেটে খায়।
পার্কের কোণে, বড়লোকের গাড়ি বারান্দায়—
উপবাসী কাঙ্গাল মানুষগুলো ভাই ভাই।

অথচ কী নির্বিকার কী নিস্পৃহ অন্য সবাই।
উইক্এণ্ডের উষ্ণ সকালে পাহাড় আর সমুদ্রের কোলে—
চকচকে নধরকান্তি পরিতৃপ্ত ভুরি ভোজনের ঢেকুর তোলে,
সাঁওতাল পরগণা, পুরীর সমুদ্র কিংবা সিমলা কাশ্মীর জুড়ে।
আর আমি জমাট কংক্রিটের মত
প্রচণ্ড উত্তাপে ফেটে চৌচির ; নয়ত
উল্কাপাতের অবশিষ্ট ছাই হয়ে যাব।

তবু জানি এ পাষান প্রাচীর ভেদ করে
জন্ম নিয়েছে এক বটবৃক্ষ।
এই কদর্য শ্রীহীন অবহেলিত কোলকাতার বুকে
জন্ম নিয়েছে এক চারা বটগাছ।
এর মূল ধীরে ধীরে মাটিতে শিকড় গেড়ে
ডাল পালা মেলে এনে দেবে নিশ্চিন্ত অবসর।
শোনাবে বাঁশীর সুর অচেনা কোন এক চিকন কানাই।

সীমানা দখল

হেনা হালদার

অবিরাম হেঁটে চলা জীবনের,
হোঁচট আছাড় কায়দা করে . . . . .
যাদু দণ্ড, যাদু কল স্বচ্ছ জল সঞ্জীবনী সুরা
আহরণ করা।
উৎকণ্ঠ উত্তেজনা থরথর রক্তে, অনিচ্ছুক
প্রকৃতির হাত থেকে কেড়ে নেওয়া
লক্ষ্যবস্তু। হঠাৎ কৌশল পালটে
আক্রমণ . . . . . প্রতিরক্ষণ . . . . . .
এগোনো পেছনো। টুঁটি টিপে ধরে
মাটিতে শোয়ানো,
প্রচণ্ড গতির তেজে পরক্ষণে ঝটিতি আবার
ঝাঁপিয়ে পড়ে সীমানা দখল।

যাদুঘরে

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য
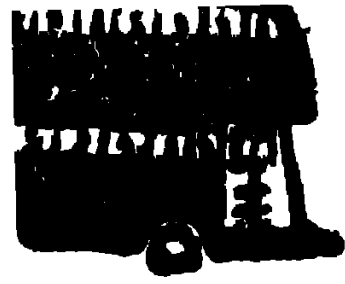
কিসের তন্ত্র ?
রাজার তন্ত্র !! কিংবা জনগণের তন্ত্র !
জাগরণের তন্ত্র ব'লে, বাজে ভেরী ;
মাদল বাজে, কামান দাগে
সেই সকালে,
মুক্ত বাঁশীর ফেরীর দিনে প্রতিবছর।

রাজা মশায় সিংহাসনে।
চোরের রাজা—জাল-জোচ্চর,
কাদের রাজা ?—জনগণের !!
তকমা এঁটে, শামলা মাথা,
ভারী কাঁচের চশমা চোখে,
পুঁথির পরে লেখেন পুঁথি
স্তুতিবাদের বোঝাই পাহাড়।
বালির ওপর উঠছে গড়ে পঁচিশ মহলা বাড়ী,
চোখ ধাঁধাঁনো রাংতা আঁটা অবাক ক'রে ভারী।

কাদের বাড়ী ?—দুখে গড়া ন্যাংটা প্রজা।
ভাবতে গেলে,
অবাক চোখে চাউনী মেলে,
চাউনী যে নেই, বাড়ীর ছাদে, বোঝাই করা
শুকনো কাগজ।
যাদের বাড়ী,
তারাই দেখি চট পেতে সব
শুয়ে ধোঁকে বাড়ীব নীচে।

ভিক্ষা চেয়ে দিন কাটিয়ে, সংস্কারের বোঝাই গাড়ী,
দেখে চলে, দিন গড়িয়ে,
হেঁকে বলে, একটি পয়সা দাওনা বাবু
খাবো কিনে মুড়ি।

কিসের তন্ত্র? রাজার তন্ত্র?
প্রজাগণের সমাজতন্ত্র?
তোমার আমার সুখের বাড়ী,
তৈরী হচ্ছে গাড়ী.
—যাদুঘরে।

সুখে দুঃখে

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

বন্যার নোংরা জল নেমে যাবে একদিন—খরার খরখরে মাটি
বৃষ্টিতে ভিজে হবে কাদা
প্রবাসে রয়েছে যারা ঘরে ফিরবে—চটুল বেশ্যার দল
পেয়ে যাবে মায়ের মর্যাদা
নিরাশার কিছু নেই, আমি দেখি চার পাশে আশার জগৎ
কল্পিত দুঃখের পাখি বুকে পুরে দিনরাত কাঁদুক মহৎ।

বাধা যত কাছে আসে আমি তত দূরে ঠেলে ফেলি—মাটি যত শক্ত হয়
আমি তত চেপে ধরি লাঙল ফলায়
রুজি রোজগার করে ঘরে ফিরি রাতের বেলায়—বেশ্যাকে বেদনা দিয়ে
শিক্ষা দেই গার্হস্থ্যকলায়—
ভাবনার কিছু নেই—সুখে-দুঃখে সকলের সংগে করি বাস
মহৎ কাঁদুক বসে,
বিপদ সংকুল বনে আমি করি মৌমাছির চাষ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

(চার)

কি হবে মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখে? এই গেরামটা যে এখনও মন্দ হয়ে যায়নি তার কারণ ল্যাকাপড়ার চলন নেই বলেই। মেয়েমানুষ সংসারের কাজকর্ম শিখবে, গুরুজনদের সেবাধর্ম করবে, ঠাকুর ঘরের কাজ জানবে, অবসর সময়ে একটু সেলাই কোঁড়াই করল, এর বেশী হওয়া ভাল নয়। সেই কথায় বলে না? ওমা আমার কি হল? পুলি পিঠের ল্যাজ গজাল। দেখ ল্যাজ গজালেই মনে সন্দ জাগে। সবাই হেঁসে উঠলেন তাঁর কথায়। হাসল না শুধু গীতা আর সেই নতুন বৌটি। গীতা একটু জোর দিয়ে বললে,

—কিন্তু মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় কি কোন উপকার নেই? দেখুন আপনাদের স্বামীরা সারাদিন ব্যস্ত থাকেন। আপনাদের খাওয়া পরার চিন্তা নিয়ে—কাজেই ছেলেদের পড়ানোর ভার, সংসারে হিসাব নিকাশের ভার যদি আপনারা নিজের হাতে নিতে পারেন তা হলে কি সত্যিই সংসারে কোন উপকার হয় না?

কথাটা কুমকুমের খুবই ভাল লাগল। গীতা বলে চলেছে—তা ছাড়া দেখুন ভাগ্যের কথা তো বলা যায় না, কেউ যদি বিধবাই হন, আশ্রয় দেবার মত আপনজন যদি কেউ না থাকে তাহলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু করে রাখা কি ভাল নয়?

এর জবাবে পুরুত গিন্নি বলে উঠ্‌লেন—

—সে কথা কে বলতে পারে মা? ভাগ্যে যদি ঝি গিরি করা থাকে তাহলে ল্যাকাপড়া শিখলেই কি নিস্তার আছে? অনন্ত গিন্নী সমর্থন করলেন জোর গলায়—ঠিক বলেছেন মাসীমা! ওই তো ও পাড়ার মিনু, কি হল তার?—মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পুরুত গিন্নী বলে উঠলেন,—শুনেছিস কুমকুম রায় বাড়ীর কাণ্ড?

কি হয়েছে গো?

—আর বলিসনি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ঘেন্নার মরি। রায় বাড়ীর মেজো মেয়েটা যে ? মাষ্টারের সঙ্গে......। হঠাৎ বৌএর দিকে চেয়ে বল্লেন, তুমি ওঘরে যাও বৌমা। কাকীমার ছেলেটার জ্বর হয়েছে তার কাছে গিয়ে বস গে।

বৌটি নিঃশব্দে উঠে গেল। তিনি আরম্ভ করলেন, ওই যে লা শীলা না কি নাম ছুঁড়িটার ? মাষ্টারের সঙ্গে সেকি।......কুমকুম একটু বিরক্ত হয়ে বললো,

—তা, এতো খবর তুমি কি করে জানলে ?

—ওমা, তা বুঝি জানিসনে ? উল মুখপুড়ী প্যারারা পাড়তে গাছে চড়ে জানলা দিয়ে দেখেছে ঘরের মধ্যে লীলাখেলা। আমরা, তা জানলাটাকে বন্ধ করে দিবিতো! আর মা মাগীকেও বলিহারি। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছিস ? সোমথ মেয়ে মাষ্টারের কাছে কেউ ছেড়ে দেয় ?

—সোমথ আবার কোথায় দিদি ? এই তো আমার বেণ্টুর বয়সি, সবে বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়েচে।—প্রতিবাদ জানাল কুমকুম। কুমকুমের দিকে রক্ত চক্ষুতে চেয়ে বক্তা আবার শুরু করলেন—

—তুই থাম বাচা। ছেলে আর মেয়ে। মেয়ের বয়স বলে কথা! অমন বয়সে আমি ছেলে বিইয়েছি। সে ছেলে থাকলে আজ বত্রিশ বছরেরটি হত। আমার যেমন কপাল সোনার চাঁদকে জলে ভাসালাম। মুহূর্তে আবহাওয়াটা পাল্টে গেল, গীতাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। এখানে কাজ করতে এসে একটা কথা গীতা বুঝেছে যে ধৈর্য্য হারালে চলবেনা। কুমকুমের দিকে চেয়ে বললে—

—আজ তাহলে চলি ভাই! তোমরা গল্প কর।

তাকিয়ে দেখে সেই নতুন বৌটি কখন ফিরে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করল,

—তোমার নাম কি ভাই ?

বৌটি সভয়ে শাশুড়ীর দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর মিষ্টি করে জবাব দেয়—"মঞ্জুরাণী।"

—বাঃ বেশ নাম তো। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ? সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত গিন্নী বলে উঠলেন,—বৌমা! তোমাকে বললাম না, বুলার কাছে গিয়ে একটু বসতে ? কৈরে কুমকুম তাস জোড়াটা পাড় না! বেলা যে গড়িয়ে এল।

—আচ্ছা তাহলে আসি ভাই!

মাথায় কাপড়টা তুলে দিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল গীতা।

সেদিন ওদের সাপ্তাহিক অধিবেশনের দিন। বিমল আসবে আর একটু পরেই। আজ কিছু নতুন বই আনার কথা আছে। এবার অনেক দিন পরে বিমল আসছে।

বাড়িতে এসে দেখে স্বামীজি একরাশ কাগজ পত্র নিয়ে বসেছেন। বাইরে থেকে ডোনেশান উঠলো। কত খরচ হল। কতজন ছেলেকে সাহায্য করা হয়েছে ইত্যাদি হিসেব নিকেশ করছেন। আজকের মিটিংএ এইসব খরচপত্র নিয়ে কথাবার্ত্তা হবে।

গীতার মুখটা হয়তো একটু বিষন্ন ছিল, স্বামীজির চোখ এড়াল না সেটুকু। হাসতে হাসতে বললেন—

—কি হয়েছে মা, তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?

গীতা একটু চমকে উঠলো, বল্লে,

—কৈ নাতো?

—বল কেমন লাগল আজকের মহিলামহল?

—মন্দ কী! তবে প্রশ্নের বান গুলো ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

—হ্যাঁরে মা, এরপর বিষমাখান হবে। তখন সহ্য করতে পারবি তো?

স্বামীজির এই স্নেহ সম্ভাষণে একটু আগের নিভে যাওয়া উৎসাহটা আবার ফিরে পেল গীতা। সে গিয়ে আগেই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে ঘর খানাকে গোছগাছ করতে লাগল। তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে হবে। বিমল আসবে তার চায়ের যোগাড় ঠিক রাখতে হবে। স্বামীজির চা খাবার সময় হল। দ্বিগুণ উৎসাহে সংসারের কাজের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিল গীতা। মিটিং যথা সময়ে আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে গেল। বিমলের কিন্তু যাওয়ার তাড়া নেই। খুসী হল গীতা। সেই খুসীটুকুকে গোপন রেখেই জিজ্ঞাসা করল—

—তুমি ফিরে যাবে না?

অত্যন্ত সহজ ভাবেই প্রশ্ন করে বিমল—

—কোথায়?

হেসে ফেলে গীতা।

—উঃ এখন আর যেতে পারছিনা। বড্ড ক্লান্ত। জান গীতা, আজ তোমার.........না! থাক।

—কি থাক?

—নাঃ কিছু না।

—ওকি! ও রকম স্বভাব বিরুদ্ধ রহস্য করছ কেন?

—স্বভাব বিরুদ্ধ?

—বলনা বিমল! কি হয়েছে? আজ আমার? কি যেন বলছিলে?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় বিমল।

—বলব কিন্তু এখন নয় গীতা। একটু বিশ্রাম চাই। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বলব। —আর বলব বলেই তো আজ আর গেলাম না।

—গীতা আর কথা বাড়ায় না। সোজা রান্নাঘরে চলে যায়, বিমল চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে।

স্বামীজি তখনও তাঁর পূজোর ঘরে।

বিমল ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত তখন নটা বাজে। খাবার যোগাড় করে বিমলকে ডাকতে এল। ও ভেবেছিল বিমল বুঝি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কিন্তু আস্তে করে ডাকতেই বিমল সাড়া দিল।

—কি? ভাত বাড়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্বামীজি বসে আছেন। খাবে এস। কিন্তু তুমি ঘুমোও নি?

—একটুও না।

—ও:।

—ওরা দুজনে খেতে বসল। গীতা ওদের খাওয়াতে লাগল। খেতে খেতে স্বামীজির আজকের অধিবেশনের কথা তুললেন।

—জান বিমল! গীতা মা আমাদের খুব কাজের। আজ বড় আশাপ্রদ কথা পেলাম।

আগ্রহে উজ্জল হয়ে ওঠে গীতা। বিমল মুখ তুলে তার দিকে চাইল।

—হেড মাষ্টার মশাই প্রায় দুশো টাকা ডোনেশান তুলেছেন। উনি কিন্তু এইটাকা দিয়ে মেয়েদের স্কুলটা সুরু করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিকে বিমলের শিষ্য সামন্তরা দাবী জানিয়েছে সব আগে ওদের আখড়ার জন্যে কিছু জিনিষ পত্তর দিতে হবে।

—আপনি ওদের কি বললেন ? বিমল প্রশ্ন করে।

—এখনও কিছু বলিনি। আগে তোমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব। ওদের জানিয়েছি পরের মিটিং এ সম্বন্ধে কথা হবে। জান বিমল বার-জন থেকে এখন কতজন সদস্য হয়েছে ? প্রত্যেকে দুটাকা করে চাঁদা দিচ্ছে। এখন আমাদের মাসিক বাঁধা আয় পঞ্চাশ টাকা। এ ছাড়া মোটা মোটা ডোনেশান পাচ্ছি।

বিমলের হাসি পায়। কোলকাতায় একটা ক্লাব ঘরের ভাড়াই এ টাকায় ওঠে না। লাইব্রেরী মন্দ চলছেনা। ইস্কুলের জন্য মাত্র পাঁচটি ছাত্রী হয়েছে। বাড়ীতে ক্লাশ হবে সকালবেলায়। গীতাই পড়াবে। গীতাকে প্রশ্ন করলেন স্বামীজি—

—কি হল মা ? তোমার অভিযানের খবর কি ? মেয়ে টেয়ে পেলে ?

গীতার মনে পড়ে গেল দুপুরের কথাগুলো। কোন জবাব দিতে পারল না। শুধু অভিমান ভরা চোখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

—হবে হবে বৈকি ! ঘাবড়াচ্ছিস কেন মা ? অনেক ধৈর্য্যের দরকার। কত কাঠখড় পোড়াতে হবে। এইতো সবে সুরু।

(ক্রমশ)

লজ্জা-ঘৃণা

সরসী সরকার

প্রাণেশ, তুমি এখানে ?

নিজের নাম শুনে প্রাণেশ চমকে উঠল। পিছন ফিরে তাকাল।

রীতা সোম তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ। চোখে মুখে বিস্ময়।

মহাত্মা গান্ধী রোড। দশ নম্বর বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল প্রাণেশ। অনেকক্ষণ বাসের কোন পাত্তা নেই। এমন সময় রীতা সোম তার নাম ধরে ডাকল।

রীতার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল প্রাণেশ। বলল, তুমি এসময়ে এখানে ?

বা! এখান থেকেই তো রোজ বাড়ী ফিরি। আমি বেথুনে পড়াই।

ও, তাই বল। তা কেমন আছ তুমি ?

ভাল। রীতা মাথা কাৎ করল। মুচকি হাসল।

প্রাণেশ রীতাকে ভাল করে দেখল। রীতা ঠিক আগের মত আছে! আট বছর আগের রীতা আর আজকের রীতার মধ্যে বড় একটা তফাৎ নেই। শুধু একটু মোটা হয়েছে এই যা।

তুমি এখন কী করছ ?

রীতার প্রশ্ন শুনে চমক ভাঙল প্রাণেশের। বলল, একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে আছি। পাবলিসিটি অফিসার।

চল, কফি হাউসে বসি। কত দিন পর দেখা। জমিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক।

প্রাণেশ আপত্তি করতে পারল না। রীতাকে ভাল লাগছে। তার সঙ্গে কফি হাউসে এসে দাঁড়াল।

রীতা এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিল। একটা কোণে প্রাণেশের মুখোমুখি বসল। বলল, কতবছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল বল তো ?

আট বছর।

হ্যাঁ, বি, এ, অনার্স পরীক্ষার পর আর আমাদের দেখা হয়নি।

আমি চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে গিয়েছিলাম।

এ জন্যেই এম, এ, ক্লাসে তোমাকে দেখতে পাইনি।

আর সবার খবর কি বল? জয়ন্ত সেন এখন কোথায়?

জয়ন্তর কথা আর বল না। এম, এ, পড়তে পড়তে সামান্য একটা চাকরি নিয়ে বিলাসপুরে চলে গেল।

সে কি! কত ভাল কবিতা লিখত জয়ন্ত। মনে আছে তোমার? আমি তো ভাবতাম, জয়ন্ত মস্ত বড় কবি হ'বে। কত নাম করবে।

সত্যি জয়ন্ত কিছু করতে পারল না জীবনে। অথচ ওর ভিতরে পার্টস ছিল। অনার্স পড়ার সময় ওর কবিতার সুর, ছন্দ, ভাব আমাকে দিশেহারা করে তুলত। আমার ভীষণ ভাল লাগত। জয়ন্তকে আমি অন্য চোখে দেখতাম।

জানি। তুমি তো কবি, লেখকদের খুব ভক্ত ছিলে। এখনো তেমনি আছ? না পাগলামি কেটে গেছে?

রীতা সোমের কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগল। মন টনটন করে উঠল। জানালা দিয়ে হিন্দু স্কুলের দিকে তাকাল। আপন মনে কী যেন ভাবল। মনে মনে হাসল। বলল, এখন পাগলামি আরো বেড়ে গেছে প্রাণেশ। আধুনিক গল্প কবিতা আমার প্রাণ। এসব পড়তে না পেলে হাঁপিয়ে উঠি—অস্বস্তি বোধ করি।

কার লেখা তোমার ভাল লাগে এখন?

বরেন গুপ্ত। তুমি চিনবে না প্রাণেশ। সাহিত্য জগৎ নিয়ে তো মাথা ঘামালে না কোন দিন। কী করে নাম জানবে?

সে ঠিক। তবে বরেন গুপ্তের নাম শুনেছি। খুব ভাল লেখেন ভদ্রলোক।

রীতা সোম চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। নড়েচড়ে বসল। বলল, কী সুন্দর লেখেন বরেন গুপ্ত। তুলনা হয় না। তাঁর গল্প, উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় উপহার। উনি প্রাণের রস নিঙরে বার করেন যেন।

প্রাণেশ থ হ'য়ে গেল। রীতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবল, রীতা সাহিত্যের সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক।

ধর কফি দিয়ে গেল। রীতা দুধ চিনি মেশাল। এক কাপ প্রাণেশের দিকে এগিয়ে ধরল। বলল, জান, বরেন গুপ্তের লেখা পড়তে পড়তে আমি কেমন হ'য়ে যাই। তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, বরেন গুপ্তকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।

তাই বল। বরেনবাবুর সঙ্গে তোমার তা হ'লে রোজই দেখা হয়?

বা! হ'বে না! বরেনকে না দেখলে আমি ছটফট করে মরি। কোনকিছু আমার ভাল লাগে না।

একথা বলে রীতা সোম কী একটু ভাবল। মুখ নিচু করল। তারপর ফিসফিস করে বলল, সাহিত্য জগৎ সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড হ'লে বুঝতে পারতে ইন্টেলেক্‌চুয়াল মহলে বরেনের কত কদর, কত প্রশংসা।

প্রাণেশ মুচকি হাসল। বলল, তাহ'লে বেশ আনন্দেই আছ তুমি।

গর্বে ফুলে উঠল রীতা। এমনভাবে তাকাল প্রাণেশের দিকে যার অর্থ, আনন্দে থাকবে না! বরেন গুপ্তের মত সাহিত্যিকের সঙ্গে যার দহরম মহরম, চেনাজানা, ভাব ভালবাসা সে আনন্দে থাকবে না, থাকবে কে?

এক কাজ করো না। আসছে রোববার বেলা চারটে নাগাদ এস পাম এভিন্যুতে। আমার বন্ধু রুবী দত্তের বাড়ীতে ওই দিন বরেন গুপ্তকে সম্বর্দ্ধনা জানান হ'বে। ঘরোয়া অনুষ্ঠান। বরেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। জীবনে তো কোন গুণী লোকের সঙ্গে মিশলে না, অন্তত বরেনের সঙ্গে একবার আলাপ করে দেখ, এদের জগতটা কত ভাল, কত সুন্দর। দেখবে কত আনন্দ পাবে।

আচ্ছা আসব। এ কথা বলে পাম এভিন্যুর বাড়ীর নম্বর লিখে নিল প্রাণেশ।

রীতা এতটা ভাবে নি। প্রাণেশ যেতে রাজী হ'বে কল্পনাও করেনি। তাই কী যেন ভাবল। বলল, ঠিক চারটের সময় বাইরে দাঁড়াবে। আমি এসে তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাবো। কেন না আমি ছাড়া তোমাকে তো রুবীদের বাড়ীতে কেউ চিনবে না।

ঠিক আছে।

রীতা সোম। আশ্চর্য মেয়ে। সুন্দরী। চটপটে। সোবার। কালচার্ড। প্রাণেশের সঙ্গে পড়ত। চোখে তার হাজার আলোর দ্যুতি।

প্রাণেশ রীতাকে ভালবেসে ফেলল। তাকে আপন করে পেতে চাইল।

প্রাণেশ স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। তার অনেক গুণ। তবুও রীতা সোমের মন জয় করতে পারল না। রীতা সাহিত্যের ভক্ত। যারা কবিতা, গল্প লিখত তারা ছিল রীতার একান্ত প্রিয়।

জয়ন্ত সেন তাদের সঙ্গে পড়ত। চোখে চিন্তার গভীরতা, মুখে মিষ্টি হাসি। দারুণ কবিতা লিখত। যেমন ভাব তেমনি ভাষা। রীতা সোম জয়ন্তকে ভালবাসত। জয়ন্তকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখত। জয়ন্তই তার চির আকাংখিত পুরুষ, তার স্বপ্নের রাজকুমার।

প্রাণেশ এটা সহ্য করতে পারত না। কাঁটার মত একটা ব্যাথা তার বুকে খচখচ করত।

একদিন প্রাণেশ বলল, রীতা, তোমাকে ভালবাসি।

রীতা অবাক হ'ল। তার চোখ মুখ কুচকে উঠল। একটা নিদারুণ অবজ্ঞার ভাব সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

তোমার যেমন নাম, তেমনি বুদ্ধি। আনসোস্যাল, রুট তুমি। বই এর পোকা। তোমার আছে কী? পার সবার সঙ্গে মিশতে, প্রাণ খুলে কথা বলতে? জয়ন্ত সেনের মত কবিতা লিখে পারবে সম্মানের জয়টীকা পরতে? শুধু লেখাপড়ায় ভাল হলেই সবকিছু পাওয়া যায় না।

রীতা সোম আর দাঁড়ায়নি সেদিন। ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে চলে গিয়েছিল সেখান থেকে।

রীতা'র ব্যবহারে ব্যথা পেল প্রাণেশ। দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

জয়ন্ত সেনের কাছে হেরে গেল। এ পরাজয়ের গ্লানি মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক। এ বেদনা বুকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগল প্রাণেশ।

—

রোববার। পাম এভিন্যুর রুবী দত্তের বাড়ী পৌঁছাতে বেশ একটু দেরী হ'য়ে গেল রীতা সোমের। ট্রাফিক জ্যাম। উপায় কি!

রীতা আসলে বরেণ গুপ্তকে চাক্ষুস কোনদিন দেখেনি। তাকে চেনে না, তার সঙ্গে কোন পরিচয়ও নেই। তবে তাঁর লেখা রীতার খুব ভাল লাগে।

প্রাণেশ রীতাকে ভালবাসত কলেজ জীবনে। রীতা এখন প্রাণেশকে দেখতে চাইল, সে আনন্দে আছে, সুখে আছে। বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তার মেলামেশা, হৃদয়-দেয়ানেয়া। তাই বরেনগুপ্ত সম্বন্ধে নানা কথা বানিয়ে বলেছিল রীতা। প্রাণেশকে নিমন্ত্রণ করেছিল—ভেবেছিল প্রাণেশ আসতে কিছুতেই রাজী হ'বে না। কিন্তু কপালের ফের! নইলে এমন হয়! যে প্রাণেশের সাহিত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই সে কিনা এক কথায় রুবী দত্তের বাড়ী আসতে রাজী হয়ে গেল! আশ্চর্য!

রীতা মনে মনে ঠিক করেছিল, আগে ভাগে রুবীদের বাড়ীতে পৌঁছবে। বরেন গুপ্তের সঙ্গে আলাপ করে নেবে। তারপর চারটে নাগাদ যখন প্রাণেশ আসবে, এমনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে বরেন গুপ্তের সঙ্গে যাতে প্রাণেশ কিছুই বুঝতে না পারে। তাহ'লে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। দু'কূল রক্ষে পাবে।

কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল। রীতা সোম প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ রুবী দত্তের বাড়ীতে পৌঁছাল।

কিন্তু না এলেই বোধহয় ভাল করত। রীতা হল ঘরে ঢুকেই যেন ভূত দেখল। তার চোখ দাঁড়িয়ে গেল। তার সারা দেহ অবশ হ'ল। দু'পা ঘরের মোজাইক মেঝেতে আটকে গেল।

ঘরের একপাশে বরেন গুপ্তের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে আছে প্রাণেশ। গলায় ফুলের মালা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। মুখে স্মিত হাসি। তাকেই সম্বর্দ্ধনা জানান হ'চ্ছে।

ঘরের মধ্যে শ'দুয়েক নরনারী। বরেন গুপ্তের ভাষণ শোনার জন্যে উদগ্রীব।

একজন উঠে দাঁড়াল। বলল, এবার বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবরেন গুপ্তকে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

হাততালির মধ্যে দিয়ে এ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। গোটা হল ঘর গম গম শব্দে ফেটে পড়তে চাইল।

রীতা সোম লজ্জা পেল। নিজেকে ধিক্কার দিল। নিজের ওপর দারুণ ঘৃণা জন্মাল। সে পালিয়ে বাঁচতে চাইল।

প্রাণেশ উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ তার নজর পড়ল দরজার দিকে। রীতা সোম তখন পালাচ্ছে।

প্রাণেশ ওরফে বরেন গুপ্ত মুচকি হাসল। তারপর ভাষণ দিতে লাগল।

স্কেচ

হেনা মিত্র

অন্যান্য দিনাপেক্ষা বেশ একটু বিলম্বেই ঘোষবাবু আজ বাজার থেকে ফিরলেন। যেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে। ফিরেই সর্ব্বসমেত থলি দুটো রান্না ঘরের সামনে মনে হলো যেন ছুড়ে ফেলে দিলেন ক্ষোভে ও ক্রোধে, এবং বললেন, বুঝতে পারলে? বলি শুনতে পাচ্ছো? কাল থেকে তোমার ওই নবাব পুত্তুরটী যেন বাজার করে আনে। আমার দ্বারা আর হবে না. এই গুষ্টির জন্য পিণ্ডির যোগাড় করে আনা! বুঝলে?

যাঁর উদ্দেশ্যে এই বিষ-তিক্ত তীরক্ষেপণ তিনি তখন অতি মনোযোগে হাঁড়ির মধ্যে হাতার সাহায্যে সিদ্ধ-ডালের নিষ্পেষণ ক্রিয়ায় ব্যস্ত, তবুও বাক্য-বাণ বিদ্ধ হওয়া মাত্র বিরক্তিভরে উত্তর করলেন—এই এক হয়েছে তোমার সর্ব্বদা গুষ্টিগুষ্টি করে শোনাও যে আমাকে, বলি গুষ্টিটা আমার একার নাকি? বাজার তো এই সিকি মাইল রাস্তাও নয়—দুটী ঘণ্টা দেরীই বা হয় কেন? তাও তো বুঝি না বাপু! কি লম্বা কাণ্ডটা হয়েছে আজ শুনি!

সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো তিনপুরুষের পুরানো ওয়াল ক্লকটা সময়াল্পতা জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও; অন্ততঃ মিনিট দশেক বিশ্রাম-বাসনায় ঘোষবাবু, লোমশ উন্মুক্ত দেহে কাঁধের উপর সদ্যখোলা ঘর্ম্মসিক্ত গেঞ্জীটি ফেলে, জানুর উপর লুঙ্গি গুটিয়ে, বেশ গুছিয়ে বসবার আয়োজন করছিলেন। রোয়াকের ধারটিতে কিন্তু বসা আর হলো না, মানে গিন্নীর প্রশ্নই তাঁকে টেনে আনলো রান্নাঘরের দরজায়—শুনতে চাও তাহলে? তিনি উত্তেজিত ভাবে বলেন, আজ শালা পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে চলে যাচ্ছিলো যে তা জানো? খুনে মেছুনীটা এক কোপে গর্দ্দানটা আমার নামিয়ে নিচ্ছিল আর একটু হলে। পাঁচজনে ধরে ফেললে তাই।

এ হেন ভীতিপ্রদ বার্ত্তাটী শোনামাত্র ভয়ে উদ্বেগে গিন্নীর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। হাতাখানা হাত থেকে নামিয়ে রেখে, কর্ত্তার পাশটীতে

এসে দাঁড়ান একেবারে, ব্যাকুল ভাবে, একি অলুক্ষণে কথা গো, কি ব্যাপারটাই বলো না আগে—কি অপরাধটা করেছিলে তুমি ? এমন একটা কাণ্ড হতে যাচ্ছিলো যে ?

গিন্নীর উদ্বেগ ও ভীতি ব্যাকুল মুখের প্রতি এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন তিনি। হঠাৎ বিগত দিনের মধুর স্মৃতি বিজড়িত বহুছবি মানস পটে ছায়া ফেলে যায় চকিতের জন্য। অন্তরের অন্তস্থলটা বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—মনে মনে ভাবেন, নাঃ এখনো টান আছে তাহলে সত্য-সত্যই। বলেন—আরে, কি এমন অপরাধ করতে পারি বলো। মাছটা ওজন করে দিয়ে দেওয়ার পরেও বুঝলে কিনা, একটা বেশ বড়-সড় চকচকে মৌরোলা মাছ চোখে পড়লো, সেইটি তুলে নেওয়া মাত্র—ব্যাস একবারে চামুণ্ড মূর্ত্তিতে মেছুনীটা তেড়ে এলো।

পাশের ঘরে বড় কন্যাটি ফিল্মষ্টারদের ষ্টাইলে চোখের "মেক্-আপ"-এ ব্যাপৃতা ছিলো এতোক্ষণ; ফিনিসিং 'টাচ'টা সেরে নিয়ে, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বেই একটি মোহিনী কটাক্ষ হেনে ফোড়ন দিলে—জানোই তো বাবা, গণজাগরণের যুগ এটা; ভুললে কি চলে ? বিশ্রী একটা "সিন" ক্রিয়েট করে তুলতে গেলেই বা কেন ?

আজব আচরণে "ফ্লিম ষ্টার"-দের ট্রু কপি কন্যার এই ধরণের উক্তিতে প্রথমটা তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। কিছুক্ষণ পর ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলেন, শুনলে তোমার মেয়ের কথার বহরখানা। কি রকম ডেঁপোমী সব হয়েছে আজকালের ছেলেমেয়েরা—বাপের হোটেলে আছে সব—বুঝবেন কি।

এই বাক্ বিতণ্ডার মাঝে হঠাৎ সদর দরজার কড়াটা সশব্দে নড়ে উঠলো, এবং ডাক শোনা গেল—ঘোষ মশাই বাড়ী আছেন ? এটা অবনী ঘোষের বাড়ী কি ?

এমন অসময়ে আগন্তুকের আগমণে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করেন ঘোষ-বাবু। বলেন, আজ দেখছি সকলে ষড়যন্ত্র করে আমাকে জ্বালালে !—একবার দেখ তো রে মিন্টা কে এলো ? ছোট কন্যাটি হুকুম তামিল করতে ছুটলো।

দরজাটা অর্গলমুক্ত করতে করতেই প্রশ্ন করে—

কে ? কে আপনি ?

আগন্তুক, আমি—মানে—আজকের পেপারে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম।

তাই, একটু খোঁজ-খবর নিতে এলাম আর কি! ৬/৩—সি…লেন এই বাড়ীটাই তো ?

সাগ্রহে মিন্টা উত্তর দেয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ এই বাড়ীটাই—আপনি দাঁড়ান একটু, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি এক্ষুনি।

খুসিতে উপচে পড়ে এক ছুটে চলে আসে মিন্টা—আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে খবর দেয়, বাবা জানো—একজন এসেছেন, বলছেন, বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। ঐ যে দাদার বিয়ের জন্যে—কথাটা ওর সমাপ্ত হতে পারে না—ধমকে ওঠেন ঘোষবাবু—হয়েছে ব্যাস বুঝেছি। তা-এইটা সময় হলো নাকি কথা বলবার—সন্ধ্যেবেলাআসতে বলে দে।

গিন্নী বাধা দেন—না না, সেকি হয় ? তুমিই বলো না গিয়ে, যা বলবার, ও কি বলবে ?

নিজের মনের মধ্যে ও যে একটু খোঁচা না দিচ্ছিল অবনীবাবুর তা নয়। এই ভাবে ফিরিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে ? হাজার সময় না থাক, ছেলের বিয়ের ব্যাপার তো; অর্থাৎ কিনা পাণি-যোগের সম্ভাবনা; আর ছেলে বলতে তো ওই একটিই সবে ধন—অতএব—।

ইতিমধ্যে "রাখী সার্টটা ঘোষবাবুর হাতের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে বলে, লুঙ্গীটাও বদলে নাও না বাবা—।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি যেন এবার, বলেন মরবার পর্যান্ত ফুরসৎ নেই আমার, আর বলে কি না—যত্তো সব। সার্টটা কোন রকমে গায়ে গলিয়ে বাইরে আসেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ক্ষীণ দেহ, জীর্ণ বেশভূষা দর্শনে একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে যান। তৎক্ষণাৎ মনে মনে যেন প্রস্তুত হয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন,—কাকে খুঁজছেন মশাই ?

আগন্তুক, আজ্ঞে অবনীবাবুকে—তাঁর সাথে একটু দেখা হলে বড় ভালো হতো। তিনি যেমনটি চেয়েছেন, দেখলাম বিজ্ঞাপনে—আমার মেয়েটি ঠিক সেইরকম রূপবতী ও গুণবতী। গরীবের মেয়েটি যদি উদ্ধার হয়।

ঘোষবাবু উত্তর দেন—দেখুন আমি বড় দুঃখিত। ছেলেটির আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।

আগন্তুক, সেকি মশাই—আজই তো বিজ্ঞাপন…ঘোষবাবু—আর বলবেন

না মশাই। বহুদিন হলো পাঠিয়েছি। আজকে দেখছি প্রকাশ হয়েছে। ইতিমধ্যে—বুঝলেন কিনা।—

আশা ভঙ্গে ভদ্রলোক একটু বিচলিত হন। তারপর অগত্যা…এদিকে ঘোষ গিন্নী অন্তরালে থেকে সমস্ত কথোপোকথন শুনলেন; বিস্মিত কণ্ঠে স্বামীকে প্রশ্ন করেন—এটা কি রকম ভদ্রতা হলো? ভদ্রলোককে মিথ্যা কথা বলে বিদায় করে দিলে যে?

স্বামী, না বুঝেই বিদায় করেছি নাকি? এতোটা মূর্খ ভেবো না আমাকে। ভদ্রলোকের চেহারাখানা, বেশভূষা দেখেছিলে একবার? দেনা-পাওনার ঘরটা শূন্য হতো একবারেই তা বুঝলে?

ব্যঙ্গের স্বরে গিন্নী বলেন—না কিছু কথাবার্তা এগোতেই, তুমি বুঝে গেলে? আর তাও যদি বুঝতাম বাপু, ছেলেটি তোমার হীরের টুকরো হতো। কোনরকমে ইন্টারের দরজা হয়ে ঢুকেছে তো একটা কারখানায়।

অধৈর্য ঘোষবাবু বলেন—আরে থামাও বাপু তোমার লেকচার, আমার শোনবার মতো সময় হাতে নেই। চট্ করে দুটো পিণ্ডি বেড়ে দাও দিকি এখন—অনেক লেট হয়ে গেলো আজ আফসের। ঘাবড়াচ্ছো কেন? একজন কে মাত্র ফিরিয়েছি, এখন অনেকজন আসবে অমন। মেয়ে নয় তো রে বাপু—ছেলে তো আমার।

আহার নামক গলাধঃকরণ কার্য্যটি সবে মাত্র সমাধা করে অবনীবাবু হাতটি ধুচ্ছন, এমন সময় পাশের বাড়ীর ৪ বছর বয়সের ছেলেটি দৌড়ে এসে প্রশ্ন করলো, জ্যাঠাবাবু তুমি আজ গাড়ীতে করে আফিসে যাবে? আমাকে একটু চড়াবে? হ্যাঁ? কি বকছিস্ বাজে বাজে, ধমকান তিনি। ছেলেটি বল্লে, দেখবে চলো আমাকে বল্লে কি অবনীবাবুকে ডেকে দাও তো খোকা! এতো বড়ো গাড়ীতে বসে আছে একটা মোটা লোক।

খবরটার তাৎপর্য্য অনুধাবন করা মাত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অবনীবাবু বলেন, ওরে কে আছিস—দেখ তো একটু। আমি এই এলাম বলে।—

হুকুম পালন করতে এবার রাখী ছুটলো—এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে খবর দিলে, জানো বাবা এই ভদ্রলোককে আমি চিনি—তুমি ও চেনো বাবা—ওই যে মোড়ের মাথায় সিমেন্ট রং বাড়ীটায় থাকেন। ওঁর মেয়ে রিনি আমার ক্লাস মেট। একটাই মাত্র মেয়ে। বাবার পয়সা আছে বলে কি অহঙ্কার, আর

তাছাড়া ওর অনেক বয় ফ্রেণ্ড আছে এ পাড়ায় সকলে জানে। যদি বিয়ের কথা বলেন, তুমি রাজী হবে না কিছুতেই, জানো।

এবার বাষ্ট করেন তিনি—বলেন কি ভেবেছিস তোরা আমাকে। তুই তো দেখছি সবজান্তা হয়ে বসে আছিস একবারে, এঁ্যা!

চপ্পলটা কোন রকমে পায়ে গলিয়ে, যেন, স্ত্রী ও কন্যার কবল মুক্ত হবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে বাইরে চলে এলেন।

ষ্টিয়ারিং এ একটি হাত ও অন্য হাতে সানগগলস্‌টা নাচাতে নাচাতে ভদ্রলোক অবনীবাবুর আপাদমস্তক এক পলকে নিরীক্ষণ করে নেন। প্রশ্ন করেন,—আপনিই অবনীবাবু?

কৃতার্থ, উৎসাহিত অবনীবাবু বলেন আজ্ঞে আমিই, আমারই নাম। ভদ্রলোকের ঠোঁঠের কোণে যেন একটা বাঁকা হাসির ঝিলিক খেলে যায় নিমেষের জন্য।

মনে পড়ে যায় যেন হঠাৎ; সাড়ম্বরে জ্ঞাপন করেন—নমস্কার-মশাই নমস্কার! তা দেখুন আপনার কাছে যে জন্য আসা আমার। একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম—আজকের পেপারে—কিন্তু আপনি তো এখন অফিসে বেরুচ্ছেন—তা, অন্য কোন সময়ে আসবো না হয়।

শশব্যস্ত হয়ে বলেন ঘোষবাবু, আরে বিলক্ষণ মশাই—এ একটা কথা হলো, আপনি এলেন কষ্ট করে।

ভদ্রলোক—কষ্ট আর কি, এই পাড়াতেই তো থাকি বলতে গেলে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তো আসুন না, আপনাকে নামিয়ে দেবো, যেখানে বলবেন। আর ততক্ষণ কথা হতে পারবে কিছু, এই বিষয়ে। গাড়ীর দরজাটা দরাজ হাতে খুলে ধরেন তিনি।

ঘোষবাবু—এতে মনে করবার কি আছে মশাই—তারপর উচ্চগ্রামে স্বরটা তুলে বলেন—ওরে মিণ্টা, আমি বেরুচ্ছি। গাড়ীতে উঠে বসেন। মুখে একটা আত্ম প্রসাদের হাসির ঝিলিক।

নিমেষে গর্জ্জন তুলে, চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় এ্যাম্বাসাডারখানা।

স্তম্ভিত মা ও মেয়ে ঘরের মধ্যে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থা কন।

ও দিকে, রান্নাঘরের উনুনে চাপানো তরকারী আপনার মনে জলে পুড়ে কটুগন্ধে ভারাক্রান্ত করে তোলে পুরো বাড়ীর বাতাস।

ভালবাসা

নির্মলেন্দু গৌতম

বুবু হঠাৎ চালতে গাছের সব চাইতে উঁচু ডালের ওপর দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা কি যেন বের করলো। তার পর ঝুঁকে সেটা শংকরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অদ্ভুত গলায় বললো, 'এটা পকেটে রেখে দে, পরে দেখবি।'
এ ডাল ছুঁয়ে ও ডাল ছুঁয়ে, উড়ে উড়ে নীচে নেমে এলো জিনিসটা। শংকর কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো, শক্ত ক'রে মুখ আঁটা একখানা খাম। আর সেই খামের ওপর তারই নাম লেখা।

বুবু হঠাৎ তার নামে খামে লিখলো কেন? অবাক হয়ে গেলো শংকর। খামের মধ্যে তেমন কিছু নেই। বোধহয় একটুকরো কাগজ আছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খামখানা দেখলো শংকর। কিন্তু খুলতে পারলো না। কিন্তু ভারি অস্বস্তি অনুভব করতে থাকলো।

বিকেল ফুরিয়ে আসছে। ঝোপঝাড়ের ছায়ার মধ্য দিয়ে বুবুকে দেখতে থাকলো। ওপরের ডালে কি যেন করছে বুবু। কিন্তু ছায়ায়-অন্ধকারে জড়িয়ে চালতে গাছটা আরো নিবিড় হয়ে আছে বলে ঠিক দেখতে পেলো না। অস্বস্তিটুকু ক্রমে যেন বেড়ে উঠছে।

'বুবু।' ব'লে চেঁচিয়ে ডাকলো শংকর।

'আমায় ডাকিস না এখন।' কেমন যেন অপরিচিত কণ্ঠে বুবু বললো ওখান থেকে।

শংকর ভয় পেলো। বুবুর এমনি গলার স্বর শংকর কোনোদিন শোনে নি। শংকর ভাবলো, বোধহয় এমনি ফুরিয়ে আসা বিকেলে গাছের ওপর থেকে বলছে ব'লে বুবুর গলার স্বর অন্য রকম শোনাচ্ছে।

শংকর আর বুবুকে ডাকলো না। নেমে এলে জিজ্ঞেস করা যাবে ব্যাপারটা। এই ভেবেই অস্বস্তিটুকু অতিক্রম করতে চেষ্টা করলো।

বাঁদিকের ঝোপের পাশে পাখা ঝটপটানির শব্দে হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠে তাকিয়ে দেখলো, পাখা ঝাপটে অসম্ভব দ্রুত ছুটে আরেকটা ঝোপের

মধ্যে হারিয়ে গেলো একটা তাহক।

বুবু নেমে এলে শংকর আর একমুহূর্তও এখানে দাঁড়াবে না। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললো শংকর।

ফের চালতে গাছের দিকে মুখ উঁচিয়ে শংকর ডাকলো, 'বুবু তাড়াতাড়ি নেমে আয় না।'

বুবু কোনো উত্তর দিলো না।

শংকর ফের ডাকলো, 'এ্যাই বুবু—'

বুবু এবারও সাড়া দিলো না।

কী ব্যাপার, বুবু সাড়া দিচ্ছে না কেন? শংকর ভালো ক'রে দেখবার জন্য সরে এসে ওপরে তাকাতেই প্রবল ভয়ে চীৎকার করে উঠলো, 'বুবু—উ—উ—'

ডালপালার ভেতরে পাতার অন্ধকারে দোল খেতে থাকা বুবুর কাছ থেকে কোনো উত্তর এলো না। কেবল দোল খেতেই থাকলো ডালপালার ভেতরে।

মুহূর্তে শংকরের সমস্ত শরীর ভার হয়ে উঠলো।

ভাঙা গলায় শংকর আরেকবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'বুবু-উ—উ—উ—'

বুবু তেমনি নিরুত্তর।

আরেকবার বুবুর অস্পষ্ট এবং ঝুলন্ত, শরীরটা দেখে অন্ধকার হয়ে আসা ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবল বেগে ছুটতে থাকলো শংকর। ছুটতে ছুটতে দিক ঠিক রইলো না। কাঁটায় জামা ছিঁড়ে ছড়ে গেলো শরীর। এতো দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে থাকলো যে মনে হলো বুক এই মুহূর্তে ফেটে যাবে।

তবু ছুটতে হচ্ছে শংকরকে।

ছুটতে ছুটতে যখন বড়ো রাস্তায় এলো তখন আর পারলো না শংকর। পথের পাশে বিরাট কৃষ্ণচূড়ার তলায় প্রায় উবু হয়ে ব'সে প্রবল জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকলো।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভয় জমে উঠছে কাছের ঝোপ ঝাড়ে। পথের মধ্যে। শংকর কোনোরকমে উঠলো। মাতালের মতো টলতে টলতে হাঁটতে থাকলো তারপর।

কিন্তু কি হবে এখন? শংকর ভাবতে পারলো না। কেবল প্রবল ভয়-টাকে পেছনে নিয়ে শংকর ছুটতে থাকলো বাড়ির দিকে।

বাড়িতে পৌঁছে মা'র মুখোমুখি হলো শংকর।

'একী, কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ করেছে নাকি?' মা ভয় পেয়ে শুধালেন।

শংকর কোনরকমে শুকনো গলায় বললো, 'না না, খুব ছুটে এ'লাম কিনা।'

'এমনি ছুটে ছুটে আসতে হয়?' মা আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন অন্যদিকে।

বুবুর ছবি চোখের সামনে। শংকর একা বাথরুমে যেতে পারছে না। পড়ার ঘরে বসতে পারছে না। সমস্ত ঘটনা কেউকে বলে স্বাভাবিকও হতে পারছে না শংকর। এমন কি বুবুর দেয়া সেই চিঠিখানা ছুঁতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে।

মরে যাওয়াও এর চাইতে ভালো। শেষ পর্যন্ত মনে হলো শংকরের।

সমস্ত সন্ধ্যা আর রাত্রি ক্রমশঃ প্রবল ভয় আর অস্থিরতায় ফুরোলো শংকরের। অথচ বুবু আত্মহত্যা করেছে, একথা কেউকে বলতেও পারলো না।

রাত্রে সব আলো যখন নিবলো, তখন শংকর আর চোখ বুঁজতে পারলো না। আবার চোখ খুললেই বুবুর সেই ঝুলন্ত চেহারা ভয়াবহ ভাবে ভাসতে থাকলো চোখে।

এমনি ক'রে যতো রাত বাড়তে থাকলো, যন্ত্রণাও বাড়তে থাকলো ততো।

শংকরের চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। অনেকটা সময় দারুণ ভাবে সামলে থেকে শেষ পর্যন্ত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শংকর।

আর সেই মুহূর্তে মা আর বাবা দু'জনে লাফিয়ে উঠলেন। ঘরে আলো জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গেই।

'কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?' বাবা আর মা একসঙ্গেই ব'লে উঠলো।

শংকর তবু বলতে পারছে না। কান্নায় গলার স্বর বুঁজে আসছে শংকরের।

'কী হলো? কাঁদছিস কেন?' মা'র গলায় ভয়ের স্বর ভেসে এলো। শংকর এবার দু'হাতে মুখ ঢেকে বললো, 'বিকেলে বুবু গলায় দড়ি দিয়েছে।'

'বুবু আত্মহত্যা করেছে।' মা আর্তনাদ করে উঠলেন

তারপর আস্তে আস্তে অনেক সময় ধ'রে কেবল চিঠির কথা বাদ দিয়ে সব কথা বললো শংকর।

বাবা বললেন, 'ওদের বাড়িতে এখুনি খবরটা পৌঁছে দেয়া উচিত।'

'কি করে দেবে এই দুঃসংবাদ ?' মা বললেন।

বাবার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো।

মা বললেন, 'বরং সকালবেলা ওদের বাড়িতে যাও। তারপর দেখে শুনে যা করবার করবে।'

বাবা বললেন, 'সেই ভালো।'

মা আলো জ্বালিয়েই রাখলেন। শংকর আলোকিত ঘরের মধ্যে বিস্ফারিত চোখে নির্ঘুম রাত ফুরোতে থাকলো। মাঝে মাঝে মা'র দিকে তাকিয়ে দেখলো ; মা-ও তার মতোই নির্ঘুম রাত ফুরোচ্ছেন।

বুবুর ঘটনা ক'দিন অদ্ভুত ভয়ের বিস্ময়ের খবর হয়ে রইলো শহরের মধ্যে। আর শংকর ক্রমশঃ ভয়ে অদ্ভুত রক্ম নিঃসঙ্গ হয়ে উঠতে থাকলো। শংকর ভালো করে ঘুমোতে পারে না রাত্রে। একা চলতে পারে না। মনে হয় বুবু সর্বত্র তার চতুর্দিকে অজস্র শরীর হয়ে ঝুলছে।

বুবুর দেয়া সেই চিঠিখানাও খুলতে পারছে না শংকর। আলমারীর অজস্র বইয়ের ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছে চিঠিখানা। ছুঁতে গেলে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে ভয়ে। বুবু যেন এমন কিছু লিখে গেছে যা শংকরকে আরো বিপন্ন করে দেবে। শংকর সেজন্যে আর ছুঁতে পারছে না চিঠিখানা।

চিঠিখানা কোনোরকমে পুড়িয়ে ফেলবার কথা ভাবলো শংকর। মনে হলো, চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেললেই সুখ পাবে।

একটা দেশলাই নিয়ে এসে চিঠিখানা বের করবার আগেই হঠাৎ ঝুমুর এসে দাঁড়ালো দরজায়।

ঝুমুরকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলো শংকর।

ঝুমুর বললো, 'কি করছো একা একা ?'

অপরাধীর মতো শংকর বললো, 'কিছু না।'

কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো ঝুমুর। বিকেলের চুল বেঁধে এসেছে সে। ঝুমুরের চুলের গন্ধ পাচ্ছে শংকর। শংকরের কৈশোর যেন রোমাঞ্চিত হলো।

ঝুমুর বেদনার্ত গলায় বললো, 'বুবু হঠাৎ এমনি করতে গেলো কেন বলোতো ?'

শংকর অস্পষ্ট চোখে তাকালো ঝুমুরের দিকে।

ঝুমুর তেমনি ভাবে বললো, 'যত তাই ভাবছি, ততোই আমার কষ্ট হচ্ছে: কিসের যে দুঃখ ছিলো বুবুর।'

শংকর তেমনি অস্পষ্টভাবে তাকিয়ে রইলো ঝুমুরের দিকে। ঝুমুর যেন অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

ঝুমুর ফের বললো, 'ছোরদা বলে, যারা আত্মহত্যা ক'রে তারা কাপুরুষ। বুবুকে এখন আমার কাপুরুষ মনে হচ্ছে।'

শংকরের বুকের ভেতর ঝড়ের শব্দ যেন বেজে যাচ্ছে। কেন জানি হঠাৎ রক্ত ছাপিয়ে ওঠা একটা উত্তেজনা তাকে ঢেকে ফেললো।

মায়ের গলার স্বর কাছাকাছি শোনা যাচ্ছে।

ঝুমুর চোখের ভেতর আশ্চর্য হাসি ছড়িয়ে বললো, 'আমি মাসীমার কাছ থেকে আসছি। যাবার সময় দেখা হবে আবার।'

শংকরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠলো। তার ভয়টুকু যেন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে গেলো ঝুমুর। শংকরের সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। আলমারীর কাছে এলো অসম্ভব দ্রুত পায়ে। বুবুর চিঠিখানা বইয়ের ফাঁক থেকে তুলে নিলো।

এবার সে চিঠিখানা পড়তে পারে। কেন জানি একথাটা শংকরের মনে হলো। রুদ্ধ উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে তার সমস্ত শরীর।

খামটাকে ছিঁড়ে ফেলতেই একটুকরো চিঠি বেরিয়ে এলো।

শংকর এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেলো সেই চিঠিখানা। অসম্ভব তাড়াতাড়ি লেখার জন্য কেঁপে গেছে অক্ষরগুলো। কী করুণ মনে হচ্ছে চিঠিখানাকে।

শংকর ফের পড়লো চিঠিখানা। 'ঝুমুর তোকেই ভালোবাসে শংকর। আমার সঙ্গে সেদিন কথাও বললো না। জানিস, ঝুমুরের জন্যেই আমি মরে গেলাম। তুই কিন্তু কেউকে কিছু বলিস না।'

চিঠিখানা পড়েই স্থির হয়ে বসলো শংকর। ঝুমুর বলেছে, বুবু কাপুরুষ। না, বুবু কাপুরুষ নয়। শংকর অনুভব করতে পারলো, কী দুঃখ জমেছিলো বুবুর মধ্যে। বুকের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পারলো, ভালোবাসা জীবনের সব চাইতে মূল্যবান জিনিস। তা হারালে বেঁচে থাকা যায় না।

একা একাই শংকর বুবুর দুঃখে ফুঁপিয়ে উঠলো।

শহরতলীর আধুনিকতা

রজত রায়চৌধুরী

একদিকে উত্তরাধিকারসূত্রে আত্মীয়তার বিক্ষিপ্ত অকৃত্রিম আন্তরিকতা, অপরদিকে শহরে রীতিনীতি কালচারকে গ্রহণ করবার আগ্রহ; যেমন দেখা যায় গড্ডালিকাপ্রবাহের মতন অলস মন্থর জীবনযাত্রার প্রতি গতানুগতিক আকর্ষণ তেমন নূতনের জোয়ারে ভেসে যাবার প্রবল কামনা। যে সব অঞ্চল শহরের কাছাকাছি থেকেও দূরে—সেখানেও যা চিত্র, তার চেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলের মানসিকতার নিদর্শনও তদ্রূপ।

ইস্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, মেয়ে স্কুলও। মেয়েরা বইখাতা বুকে ধরে পড়তে যাচ্ছে। ঘুরিয়ে শাড়ি পরা, কপালে টিপ, চোখে টানা কাজল, পায়ে অনেকেরই চটি। তারা সিনেমা পত্রিকার সন্ধান রাখে, ছবি দেখে বলে দিতে পারে সে ছবি কোন্ অভিনেত্রীর। প্রায় অধিকাংশ বাড়িতেই ট্রানজিসটার চলে। অনুরোধের আসর, বিবিধ ভারতীর প্রোগ্রামে কোন্ চলচ্চিত্রাভিনেতা বা নেত্রী কোন দিন অংশ গ্রহণ করবেন, তা কণ্ঠস্থ। কোন্ নাটকের অভিনয় কেমন হল তা নিয়ে আলোচনা চলে। সিনেমা বড় একটা দেখা হয় না—কিন্তু খবর রাখতে দোষ কি ?

এরাই আবার চলেছে মা-ঠাকুমা দিদিমার সঙ্গে। কোথায় ? না অমুক গ্রামে কোথাকার একজন দুর্দান্ত সাধুবাবা এসেছেন। মেয়ের বিয়ের সন্ধান বলে দিচ্ছেন, আঁটকুড়েদের দুর্নাম ঘোচাবার মহৌষধ তাঁর করতলগত আর যে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। অন্ধ চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, পাগলের প্রলাপ সেরে যাচ্ছে। অতএব, কোলে-কাঁধে-হাতে বাচ্চা নিয়ে মাইল চারেক হেঁটে বাসে চিড়েচ্যাপটা হয়ে সাধু-বাবার কাছে চলেছে সবাই ! শুধু কি তাই, কোথায় কোন্ কোন্ ঠাঁই আছে দেবতাদের—চলো সেখানে। মানত করতে দ্বিধা নেই। ছেলে হলে জোড়া পাঁঠার মানত।

ছেলেরা একটু অন্য ধাঁচের। অনেকেরই গায়ে বুশ সার্ট, চোঙাপ্যান্ট। গলায় হিন্দি গানের সুর। বড়ো-মেজো-ছোটো-হেটো-যে কোন রাস্তার ধারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা চায়ের দোকানের মেঝে এদের সকাল-সন্ধ্যের প্রহর গুলো কাটে। পরনিন্দার চর্চাটা বড় গলায় হয়। কোথায় কবে কোন যাত্রার পার্টি আসছে তা তাদের নখদর্পনে। রাজনীতিটা ব্যক্তিগত স্বার্থকে নিয়ে মোড়লের রাজত্ব আর নেই বললেই চলে। বেপাড়ার মেয়ে দেখলে শিস চলে।

আরও একটু ভেতরের দিকে গেলে দেখা যাবে—কৃষকবর নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। কোরা ধুতির ওপর লংক্লথের পাঞ্জাবি। গলায় গাঁদাফুলের মালা। বাসিমালার ফুলগুলো শুকিয়ে এসেছে। দড়ি বেরিয়ে পড়েছে। আর নববধূ অপরিচিত যুবকের স্পর্শ এড়াবার জন্য কলাবৌয়ের মতন একগলা ঘোমটা দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে পাশে। এই চিত্রটিকে পাশে রেখে মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানের দিকে সন্ধ্যেবাতের জগতে আসুন। দেশি মদের গন্ধে ম'ম' করছে বাতাস। তেলে ভাজার দোকানে ভিড়। মাতালের চিৎকার।

প্রবীণ যারা তাদের কাপড় হাঁটুর ওপর। স্ত্রীলোকের অঙ্গে আধ ময়লা একখানা শাড়িই যথেষ্ট। তারা নাতি নাতনীর লেখাপড়ায় সন্তুষ্ট। গর্বিত। কিন্তু তাদের চালচলন হাবভাবে কথাবার্তায় অসন্তুষ্ট।

যখন কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হবে, তখন কথায় আন্তরিকতার সুরের অভাব হবে না আর যদি বলা যায়, পরিশ্রম করো, খাটো, চেষ্টা করো—তখনই হতাশার মধ্যে শহরবাসীদের ওপর নির্দিধায় দোষারোপ চাপানো।

দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটে গেলে বাড়তি খাটতে এরা অনেকেই নারাজি। শুধু তাই নয়, পুরানো প্রথার পরিবর্তে নূতন উপকরণ গ্রহণ করতে এরা আগ্রহী নয়। ফলত: এইরূপ অলস অপরিশ্রমী পরশ্রীকাতর মানসিকতার হাত থেকে উদ্ধার পাবার মতন মনোবল এরা অনেকেই অর্জন করতে পারেনি এখনো। বসে থাকতে দেখেছি, তবু রিক্সাওলারা রিক্সা চালাবে না—কারণ দৈনিক অর্থসঙ্কুলান হয়ে গেছে। চাষের ক্ষেত্রে দুটো কি তিনটে ফসল তোলবার জন্য উদ্যোগ নিতে অনেকেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু দোষারোপ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তাছাড়া রাজনৈতিক ব্যাধি তো আছেই।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৭২

সুপ্রিয় অনিমেষ,

কাল কলেজের লনে ঢুকে স্টাফরুমের দিকে সকাল ন'টার সময় যখন ব্যস্তভাবে এগুচ্ছি এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো। আমাদের ডিপার্টমেন্টের উপরেই মেয়েদের পলিটেকনিক। একদল মেয়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরে আমাকে উপহার দিলে The Penguine Book of New Zeland Verse। আমি অবাক। আমি বিস্মিত এদের কাণ্ডকারখানায়। এইসব মেয়েরা আমার ছাত্রী নয় কেউ-ই। ওরা পলিটেকনিকের ছাত্রী। কেবল ওদের মধ্যে আমি বীনা সাক্সেনাকে সামান্য চিনি। মুখচেনা। এইমাত্র। কবিতার সংকলনটা ওইই অবশ্য এগিয়ে দিলে। সঙ্গে অন্য মেয়েরা। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম – Why you are presenting this collection to me? ওদের মধ্যে একজন (সম্ভবতঃ বাঙালী) বললে—This is a rare collection Sir, and we know you are the only connoisseur of this in this institution। বললেম—How do you know? বললে—In the fresher's welcome day when all others delivered lectures you expressed your feelings in a self-composed poetry. বোধহয় অলক্ষ্য থেকে সেদিন ওরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। কারণ ওরাতো আমার ছাত্রী নয়। যাহোক্ কবিতার বইটা হাতে করে এসে স্টাফরুমে বসলুম।

তখনও এইঘরে অন্যান্য অধ্যাপক/অধ্যাপিকার আনাগোনা শুরু হয় নি। নিঃসঙ্গ মুহূর্ত। ভাবলাম আমার নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে একমাত্র কবিতাই। তাছাড়া অন্য কিছুই না। এর আগে নিউজিল্যাণ্ডের কোন কবিতা আমি পড়ি নি। কবিতার বইটা হাতে নিয়ে বড় আনন্দিত হলাম। অভিভূত তার চেয়েও বেশী।

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত আনন্দকে মনে হলো আরও অনেকের কাছে পৌছে না দিতে পারলে যেন আমার আত্মার তৃপ্তি নেই। নিস্তার নেই। মনে হলো

তোমাকে যদি এই কাব্যপাঠের নির্মল, নির্ভার আনন্দের কথা বলি তাহলে যোগাযোগ বিস্তৃত হবে আরও অনেকের সঙ্গে। নিউজিল্যাণ্ডের কবিরা ও তাঁদের লেখা কবিতা, বাঙালী মনের স্পর্শ পাবে। ছুঁয়ে যাবে স্বপ্নের উজান। ভেবেছি এইসব কবিতার বাংলা তর্জমা করবো একে একে সময় মতন।

এখন তোমাকে লিখছি আমার প্রথম অনুভূতির কথা—ফার্ষ্ট ইম্প্রেশান এ্যাবউট দ্য পোয়েট্রি অফ নিউজিল্যাণ্ড।

আমার মনে হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতার মতন এদেশের কবিতাতেও লক্ষণীয় এক বিচ্ছিন্নতা। অবশ্য অনেক কবিরই দুর্বার প্রচেষ্টা দেখা যায় এই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠবার দিকে—এক অন্তহীন উৎকাংখা সীমা-খণ্ডনের। মনের দিক থেকে মুক্ত হবার কি আকুতি অনিমেষ! ভাষা ব্যবহারে কবিরা অতিক্রম করে ফেলেছেন সীমান্ত, পুরোনো অধ্যায়ের সব কল্পনা। মনের রাজ্যে তাঁরা মানতে চাননি কোন প্রতিবন্ধক, কোন প্রাচীর। কীথ্ সিন্ক্লিয়ার বলছেন তার "ওয়েটারা" কবিতাতে—the clayless climate of the mind-এর কথা।

নিউজিল্যাণ্ডের কবিদের রচনার রীতি ও আঙ্গিকে আমারতো মনে হচ্ছে ইংরেজী ও আমেরিকান কবিদের প্রভাব তুমি দেখতে পাবে যত্রতত্র। জানো অনিমেষ, আমাদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই, বিশেষতঃ চিন্তার চর্চায় যারা কিছুটাও ব্যাপৃত, এক একটি মুহূর্ত আছে, তাকেই বলে "মুগ্ধ মুহূর্ত," আমরা অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ি। বিশেষতঃ কবিদের ক্ষেত্রে এমংটি ঘটে সচরাচর। সহসা কোন দীপ্তি, বিদ্যুতাভাস চোখে পড়া মাত্র আকৃষ্ট হয়ে যেতে হয়। হয়তো একেই বলা যায়—সূর্যদর্শন। বলা যায় বিকাশের 'লাবণ্য প্রভাত'। তারপর সেই প্রভাতের আলোর ঝর্ণাতে স্নাত হয় চরাচর। বিশ্বলোক। বিশ্বলোক। নিউজিল্যাণ্ডের তরুণ কবিদের সূর্যদর্শন, আমার মনে হচ্ছে যুগলে ইংরেজী ও মার্কিন কবিতার আকাশে। পরে অবশ্য আরও বলতে পারবো ওঁদের মানস প্রদক্ষিনের কথা। সে সব আরও পরের কথা। সময়ও সুযোগের প্রশ্ন।

নিউজিল্যাণ্ডের কবিতা দীপ্ত হয়ে উঠেছে দেখছি এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটির মানবিক ও ঐতিহাসিক আদর্শগুলিকেই কেন্দ্র করে। দ্বীপটির ঐতিহাসিকতাই কবিদের চোখে জেলে দিয়েছে একে একে অসংখ্য স্বপ্ন ও বাসনার বহ্নি।

একে না দেখলে, না অনুভব করলে অনিমেষ, আমার মনে হচ্ছে, আমাদের বঞ্চিত হতে হবে নিউজিল্যাণ্ডের কবিতার রসসম্ভোগ থেকে। বস্তুতঃ এঁদের কবিদের, কবিতাকেও নিউজিল্যাণ্ডের, তুলনামূলক পাঠ করতে পারবো না ইংরেজী কবিতার সঙ্গে একযোগে।

বাহির বিশ্বের সঙ্গে অত্যাল্প যোগাযোগ এই নিউজিল্যাণ্ডের। কতটুকু জানি? কতটুকু খবর রাখি আমরা এদেশের মানুষের? মানুষের যদিও বা রাখি, কতটুকু তাদের মানসিকতার? অচেনা আগন্তুকদের থেকেও অচেনা এই দেশ। কারণও এই অচেনা, অজানা অস্তিত্বের'। এদেরই একজন কবি তাই বলেছেন—

> ……Something different, something
> Nobody counted on.

অবশ্যই পৃথক, স্বতন্ত্র নিউজিল্যাণ্ড। নোতুন, সম্পূর্ণ নোতুন কণ্ঠ এদেশের কবিদের। নোতুন সুর কবিতার। এদেশের কবিদের প্রতিটি কাব্যিক উচ্চারণ এক একটি সংবাদ। কবি চার্লস ব্রাক্ তাঁর self to self কবিতাতে বলেছেন—"What can I take that will make my song news?" উত্তরও তিনিই দিয়েছেন—"If you would sing you mnst become news।"

এই একটি মাত্র উচ্চারণেই কি তোমার মনে হয় না, নিউজিল্যাণ্ডের কবিদের কবিতাতে মূলতঃ নীতিধর্ম বিদ্যমান হবে?

ঐতিহ্যানুসরণ—"খোয়ারী ঐতিহ্য" অনেক কবিদের রচনাতেই দেখা যাচ্ছে অনিমেষ। উপনিবেশিক বিস্তারের কালে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে এই পলিনেশীয় দ্বীপবাসীদের সংঘর্ষের স্মৃতি উদ্দীপ্ত করেছে অনেকেরই কবিতা। কিন্তু কী আশ্চর্য বলতো জাতীয়তাবাদী চিন্তা কদাচিৎ অভিব্যক্ত এঁদের কবিতায়? আমাদের বাংলা ভাষাতেও কি তাই না? বুকে হাত দিয়ে বলতো, জাতীয়তাবাদের স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেত কি প্রকৃতই রচনা করেছেন কোনদিনও আমাদের বাংলাভাষার কবিরা? না, কেবলই উত্তেজনার আগুন পোহানো? কি মনে হয়? কি মনে হয় তোমার? আসলে তীব্র যন্ত্রণা বোধ ছিল কি কোনদিনও আমাদের জাতীয়তাবাদকে বাঁচিয়ে রাখার পিছনে? যেমন ভিয়েতনামে, যেমন

হাউসে কাম্বোডিয়ায় এবং বিগত এক কী দু'শতকে ফ্রান্সে ও আমেরিকায়, আয়ারল্যাণ্ডে, ইটালীতে ?……

বর্তমান শতকের শেষার্ধে ক্যাথারিন ম্যাস্‌ফিল্ড, এইলিন ডুগলান, দ্য' আর্‌সি ক্রেস ওয়েনে তাঁদের লেখায় নিউজিল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও অপমানের মূক বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন কবিতাতে। বিগত তিন কী চার দশকেই গড়ে উঠেছে বলা যেতে পারে নিউজিল্যাণ্ডের যথার্থ কবিতা।

মোয়ারী ভাষাতেই মূলতঃ নিউজিল্যাণ্ডের কবিতার কলগুঞ্জন জেগে উঠেছে। এখন অবশ্য ইংরেজী ভাষাও সেখানে চলে। কবিরা মনকে অভিব্যক্ত করছেন অনবদ্য ইংরেজীতে। তার মধ্যে আছেন সি. সি, বোয়েন, এড্‌ওয়ার্ড ট্রেগিয়ার, উইলিয়াম পেম্বার রীভস্, আর্নল্ড ওয়াল, বি. ই. বাগ্‌হান, আর্থার এইচ এ্যাডামস্, মেরী আর্সুলা বেটহেল ক্রেমওয়েল ইত্যাদির মতন কবিরা। এঁদের প্রত্যেকেরই কবিতা গুঞ্জিত হয়ে উঠেছে উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশশতাব্দীর স্মরণীয় স্বর্ণ প্রভাতে।

মাত্র তো দু'দিন হলো পেয়েছি এই কবিদের কবিতার গুচ্ছ। কবিতার রসাস্বাদন তো জল কী চা পানের মতন সাময়িক ব্যাপার নয়। মন ও মেজাজ মিলিয়ে ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে হয় এর স্বাদ দুর্লভ দ্রাক্ষা নির্যাসে প্রস্তুত উৎকট মদের মতন। মনেতো হচ্ছে নিউজিল্যাণ্ডের কবিতাতেও উৎকৃষ্ট সুরাপানের সুখ থেকে হব না বঞ্চিত। হব না।

দু'ঘণ্টারও বেশী হলো তোমাকে লিখলেম। তিনটে বাজতে সামান্যই বিলম্ব। হেমন্তের আকাশ নিস্তেজ, নির্ভার। নিউজিল্যাণ্ডের কবিতার জন্যে হেমন্ত যথার্থ ঋতু বলে মনে হচ্ছে না। বোধ হয় বসন্ত কিংবা শরৎ এই কবিতার যোগ্য পটভূমি। পাঠভূমি। কি জানি ?

পড়ে বলতে পারবো আরও।

ভালোবাসা জেনো।

প্রীত্যন্তে – তোমাদের সুধরঞ্জন চক্রবর্তী।

অষ্টম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা ছন্দিতা চৈত্র ১৩৭৯

Vol. 8 No. 12 March 1973

সূচীপত্র

প্রচ্ছদশিল্পী

নিখিল বিশ্বাস

যুগ্ম-সম্পাদক

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় গৌরগোপাল দাস

সম্পাদকীয় দপ্তর

বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা—৭০০০১৮

হবে। নগদ টাকায় কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না। ৫) **প্রথম পুরস্কার ঃ** (১) সরকারী সমাধানের সঙ্গে যাদের মিলে যাবে তাদের দেওয়া হবে। ৬) **দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ** (১) যাদের উপরের তিনটি সারির সঙ্গে মিলে যাবে, তাদের দেওয়া হবে। ৭) **তৃতীয় পুরস্কার ঃ** (১০০) সরকারী ফলাফলের যে কোন সারি বা সংখ্যার সঙ্গে যাদের মিলে যাবে, তাদের দেওয়া হবে। ৮) **চতুর্থ পুরস্কার ঃ** দশজন (১০) প্রতিযোগিকে উদ্যোক্তাদের পছন্দমত দেওয়া হবে। ৯) ফলাফল ঘোষণার সংগে সংগেই পুরস্কার বিজেতাদের তাদের পুরস্কারের জন্য ডাক ব্যয়, প্যাকিং খরচ, লাইসেন্স ফি-র ব্যয়ভার বহন করতে হবে। ১০) ৩য় ও ৪র্থ পুরস্কার বিজেতাদের অন্যান্য খরচ ছাড়াও পুরস্কার ট্রানজিস্টারের অর্ধেক মূল্য দিতে হবে এবং তারা আমাদের নিয়ম কানুনে আবদ্ধ থাকবেন। ১১) ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পর বিজেতাদের পত্রদ্বারা জানান হবে লাইসেন্স ফি প্রভৃতি জমা দেওয়ার জন্য। ১২) ফলাফল জানতে হলে ৪৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান। ১৩) একটি পরিবার থেকে একটি মাত্র প্রবেশপত্র পাঠাতে পারবেন। ১৪) আপনার ঠিকানা ইংরাজীতে বা হিন্দীতে লিখুন। ১৫) নিয়মকানুন কেটে বা কপি করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিন।

DIRECTOR, CONTEST DEPARTMENT ঃ

MUSIC & SOUND (MCC—66)

P. O. Box No. 1576, DELHI—6

ছন্দিতার নববর্ষ ১৩৮০ সংখ্যা
শীঘ্র প্রকাশিত হবে।

এই বেঙ্গল একাডেমির উদ্দেশ্য কি ?

সম্প্রতি কোলকাতার কিছু নামকরা সাহিত্যসেবী শিল্পী সাংবাদিকগণ মিলিত হয়ে একটি বেঙ্গল একাডেমি স্থাপন করেছেন। অবশ্য এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে এখনও আমরা বিস্তারিত কিছু জানতে পারিনি। সুতরাং এক্ষুনি আমরা এই একাডেমিকে স্বাগত জানাতে পারছিনা। তবে এধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আমরা বহুদিন ধরেই অনুভব করে আসছিলাম। এদেশের সাহিত্য সাধনার রীতি নীতি ও ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এই রকম সংস্থা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ও প্রতিভাবান অখ্যাত সাহিত্যিকদের সাহার্য্যের জন্য বেঙ্গল একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ওপার বাংলায় এই একাডেমি বহুদিন পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু শত প্রচেষ্টা সত্বেও এখানে এতদিন গড়ে ওঠেনি। সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্ক উঠেছে এর উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী নিয়ে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন তবে কি সাহিত্য পরিষদের গুরুত্ব এবার হ্রাস পাবে ? আমাদের বক্তব্য, উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করুক। তাতে ক্ষতি হবার কোন শঙ্কা নেই। বরং ভাল হওয়ারই কথা।

আমাদের সন্দেহ বেঙ্গল একাডেমির পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে। এটির পরিচালন ব্যবস্থা যদি কোন আমলার উপর বর্তায় তবে এর বারটা বাজতে বেশী দিন দেরী হবেনা। সরকারী সাহায্যে সম্পূর্ণ বেসরকারী পরিচালনায় একাডেমির কাজ চালাতে হবে। আর একটি বিষয়ে একাডেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—তা হল পশ্চিমবঙ্গ থেকে যতো সাহিত্যপত্র পত্রিকা

(শেষাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

আমি কবি নহি

লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিশ্বের সমস্ত ঘটনার মূলে দেখেছেন দুঃখের অস্তিত্ব। তাঁর কাব্যে সমস্ত সুর ছাপিয়ে বেদনার সুর হয়ে উঠেছে সোচ্চার। যাঁদের কাব্য-সাহিত্যে দুঃখের রাগিনী বিচিত্র সুরে বেজে উঠেছে তাঁরা প্রধানত হতাশার ছবি এঁকেছেন। দুঃখ বরণের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেতে চেয়েছেন আত্মতৃপ্তি। যতীন্দ্রনাথের প্রথমদিককার কাব্যগুলি মরুভূমির ছবিকে সামনে রেখে নামকরণ হলেও সেগুলি জনহীনরৌদ্রালোকিত বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তরের ছবি নয়। তাঁর মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে কবি জীবনের যে ছবি এঁকেছেন, তা মোটেই নিঃস্ব, রিক্ত, বিবর্ণ জীবনের ছবি নয়। কবি সকৌতুকে লক্ষ্য করেছেন, এই বিশ্ব প্রকৃতিতে সৃষ্টির মূলে রয়েছে বেদনা। আনন্দ বেদনারই দান। সেই বেদনাই সুতীব্র সুরে বেজে উঠেছে কবির কাব্য বীণায়।

প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে সৃষ্টিকর্তার কোনো আনন্দের পরিচয় কবি পান না। এই বিপুল বিশ্ব যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির আনন্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, একথা কবির মনে কোনো রেখাপাত করে না। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই কবির সন্দেহ। চণ্ডীদাসের অতি পরিচিত পদটিকে তিনি নিজের ভাবে পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। 'সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।' যতীন্দ্রনাথের সংযোজনে চণ্ডীদাসের এই প্রসিদ্ধ পদটিতে দুঃখের কাঁদুনি ফোটেনি বরং ফুটে উঠেছে সংগ্রামী জীবনের বলিষ্ঠতা। এই বলিষ্টতাই যতীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-বেদনার কাছে আত্মসমর্পনের প্রশ্ন নয়। বিশ্ব জুড়ে যে আনন্দের জয়ধ্বনি শোনা যায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য তার বলিষ্ঠ

প্রতিবাদ। তিনি শুনেছেন ' সুখ দুন্দুভি ছাপায়ে দুঃখের জয়ধ্বনি ওঠে।' কান্নাটা কবির কাছে পরাজয় নয়। বরং কবির কাছে ' যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল, তারাই শ্রেষ্ঠতর।'

দুঃখই সৃষ্টি-সুখের উৎস। দুঃখেই মানুষের জীবন গড়া। দুঃখের সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্বে কবি বিস্মিত হননি বা দুঃখ দেবতার চরণে ভক্তিতে লুটিয়ে পড়েন নি। সৃষ্টির আনন্দের মূলে দুঃখের অস্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে কবির কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়েছে সুতীব্র ব্যঙ্গ। মেঘে মেঘে সঞ্চিত বিদ্যুতে কোন অধরার হাসির দীপ্তি দেখে মুগ্ধ হবার মত অবস্থা তার নয়, ওটা কবির কাছে বেদনার শিহরণ। তাইবে, যে আলোককে আমরা আনন্দের ঝর্ণাধারার সঙ্গে তুলনা করি, স্রষ্টার সুন্দর মুখের মুখর হাসিকে দেখতে পেয়ে পুলকিত হই, কবির চোখে সেই আলোকচ্ছটা ' অন্ধ ব্যোমের হাহাকার কম্পন ' বিশ্ব জোড়া দুঃখের অনুভূতি কবির তৃতীয় নয়নে নতুন দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। দুঃখ সম্পর্কে নিরাসক্ত এক কাব্যিক অনুভূতি কবি যতীন্দ্রনাথকে কেবল বাঙালী কবিদের মধ্যে নয়, পৃথিবীর কবিকুলের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র আসন দান করেছে। বাস্তবিক পক্ষে, কাব্য তো ' কবির বুকের দুঃখের কান্না।' কাব্য সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য কথা আর কি হতে পারে। মেঘে মেঘে যে ধ্বনি ওঠে, তাকে গর্জন না বলে ' গুরু ক্রন্দন ' বললেই যথার্থ বর্ণনা দেওয়া হয়। কুলুকুলু কলধ্বনির মধ্যে শোনা যায় নদীর বুকের ক্রন্দন ধ্বনি, যে ক্রন্দন নদীর বুকে জাগে মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে। রাত্রির আকাশে তারার দীপ্তিতে কবি কারুর হাসি মাখা চাহনি দেখতে পাননা। অসংখ্য জ্বালালে রাত্রির তারায় তারায় জ্বলে। গোটা কতক ছ্যাঁকা দিয়েই তলদা বাঁশে বাঁশী তৈরী হলো। বাঁশের বেদনাই ছিদ্র পথে সুরে সুরে পড়ছে ঝরে। সর্বত্রই বেদনার ছাপ। যে হাটের বুকে দেশ দেশান্তর থেকে মানুষ এসে মিলিত হয়েছে, সেই হাটের বুকে কবি কতনা মাঠের কাঁদন দেখতে পান। অস্তবেলার সূর্যকে কবি প্রচলিত প্রথায় এতটুকু সমীহ করেননি। সারাদিনমান খেটে খুটে ব্যর্থ দিনের সূর্য ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে দিনান্তে অস্ত শিখর পরে ছেঁড়া মেঘে মৃত্যুশয়ন পেতে রক্ত বমন করে। সূর্যের এই ভয়ংকর করুণ পরিণতির চিত্রে আতংকিত হলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। আমাদের জীবনের পরিণতি তো দিনান্তের এই অসহায় সূর্যের মতো। যতীন্দ্রনাথের বর্ণনার মধ্যে ব্যঙ্গের কষাঘাত যতই সুতীব্র হয়ে ফুটে উঠুক না কেন, কি প্রকৃতির জীবনে, কি

মানুষের জীবনে সেগুলো বড়ো নির্মম রূপে সত্য। সুকঠোর বাস্তবকে অস্বীকার করে যতীন্দ্রনাথ তার কাব্যের কুসুম ফুটিয়ে তোলেন নি। যতীন্দ্র-নাথের কৃতিত্ব, তিনি অনায়াস দক্ষতায় তাঁর কাব্যের কুসুম ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে অজস্র উপমার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ দেখে বিস্মিত হতে হয়। অথচ, উপমার ফাঁস বুনে তিনি আসল কথাটা চাপা দিতে কাব্যের জাল বোনেন নি। আমাদের চারপাশে অতিপরিচিত পরিবেশের মধ্য থেকে তিনি তাঁর কাব্যের উপাদান আহরণ করেছেন। অন্তরের সুগভীর প্রেম কবির কাব্যে এনে দিয়েছে এক অনাস্বাদিত আকাঙ্খিত লোকের সন্ধান। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি বিষয়ের গভীরে অবগাহন করেছেন। স্বভাব কবির মত তিনি অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে কাব্যলোকে বিচরণ করেছেন।

যা সত্য তাই সুন্দর। কবি সত্য ও সুন্দরের পূজারী। এই সত্য ও সুন্দরের পূজারী কবিদেরও ছলাকলার অন্ত নেই। সত্য ও সুন্দরের নামে কবিরা যে প্রায়শই বিদূষকের ভূমিকা নেন, কবি যতীন্দ্রনাথে তা একান্তই অনুপস্থিত। সহজ ও সরল কথাটাকে অত্যন্ত সহজ এবং সাদাসিধে ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। কাব্যের নানান্ ছলাকলা বা অলঙ্কারের পারি-পাট্যের আড়ালে কবির আত্মগোপণের এতটুকু প্রয়াস নেই। কাব্যভূমিতে সাবলীল সঞ্চরণে কবিকে সাহায্য করেছে তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টি।

কোনো বিশেষ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যতীন্দ্রনাথ কাব্য সাধনা করতে বসেন নি। সন তেরোশো সতেরো থেকে তেরোশো উনষাট— কবির এই সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের কাব্য জীবনে বাংলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা দ্রুত বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়েছে। সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকগণ নানা বিশ্বাস ও আদর্শের বশবর্তী হয়ে তাঁদের লেখনীকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু আগাগোড়া পথ চলেছেন আপনার অন্তরের আলোক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত পথরেখা ধরে। রবীন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাবের স্বাক্ষর যতীন্দ্রনাথের বহু কবিতার বহিরঙ্গ সজ্জায় বর্তমান। কিন্তু ভাবলোকে কবি যতীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ, একাকী। তাঁর পূবসূরী যেমন কেউ নেই, তেমনি নেই কোনো অনুগামী। উপঝরণ বাদল ধারায় কবি যে পাঁচীর ছেলের শব অকারণ পচতে দেখতে দেখেন, সেই দেখা তাঁর একান্ত নিজের। রহস্যঘেরা এই বিশ্বের অনন্ত রহস্যযবনিকা কবি ঈষৎ তুলে ধরেছেন। যবনিকা অন্তরালে যে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের তিনি মুখোমুখি হয়েছেন তাতে তিনি ব্যথা পেয়েছেন

বটে ; কিন্তু হাহাকারে আকাশ বাতাস ব্যাকুল করে তোলেন নি । এই আনন্দময় সংসারের বেদনার্ত হৃদয়ের পরিচয় সুগভীর সহানুভূতির সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ।

ইঞ্জিনীয়ার মানুষ যতীন্দ্রনাথ । কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির বিচিত্র পরিচয়ের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর । মানব জীবনের বিচিত্র পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন । বর্তমান জগৎ ছাড়াও পুরাণ ওইতিহাসের জগতেও সর্বত্র তিনি দেখেছিলেন সর্বগ্রাসী দুঃখের অস্তিত্ব । কবির মন বিশ্ববিধাতার এই খেয়ালীপনা নির্বিকার চিত্তে স্বীকার করে নেয়নি । কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন । বিধাতার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ সুতীব্র ব্যঙ্গের আকারে ঝরে পড়েছে । স্রষ্টার অস্তিত্বেই কবির সন্দেহ জন্মেছে সত্য ও সুন্দরের দেবতা শিব কবির কাছে ব্যথার দেবতা । নীলকণ্ঠের কাছে কবি তাঁর ব্যথার গোপন ইতিহাস শুনতে চান । কবি শিবের উদ্দেশ্যে স্তোত্রে অর্ঘ্য রচনা করেছেন । কবি জানেন, ' সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর— তুমি মৃত্যুঞ্জয় । ' দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি যতীন্দ্রনাথকে কাব্যের জগতে মৃত্যুঞ্জয় করেছে । আমরা যে চিনি মনের আনন্দে সেবা করি সেটাকে খেজুর গাছের নয়নের জল জ্বাল দেওয়া, সেকথা কবির কল্পনা মাত্র নয় । কবি হৃদয়ের সুগভীর উপলব্ধি সঞ্জাত । কবি স্পষ্টই দেখতে পান, ভাড়াটের সুখে দুঃখে ভাড়াটে বাড়ি ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা হয়েছে । কবির চোখে ধরা পড়েছে 'সর্বগ্রাসী স্থির কৃষ্ণহাসি ।' প্রচলিত কবি প্রথার কথা কবি এতটুকু ভাবেন নি । বিচিত্র অনুভূতির পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন আপনার কাব্য সাধনায় । জীবনে যাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিই সে সবই তো একটা আপেক্ষিক অর্থে । প্রেমের নামে কি এই পৃথিবীতে নারীমেধ চলে না । যৌবন কি মানুষের দায় নয় ! কবি যতীন্দ্রনাথ যৌবনের কবি নন ; তিনি প্রেমের কবিও হতে চান না । সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্বের মত তিনি প্রেমের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেন ।

' প্রেম বলে কিছু নাই,—

চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই । '

মানুষকে বিশেষ সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা এবং সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তার পরিচয় ফুটিয়ে তোলা কবিদের একটা ঝোঁক দেখা যায় । যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সস্তা খ্যাতির প্রয়াসী নন । সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর

কম নয়। কেমিন রিলিফের সময় কবি দেখেছেন মানুষকে ভোঙা পেট কোঙা করে গোঙা মাটি কাটতে। কচি ডাবের পশরা মাথায় দিয়ে বুড়োকে গলি পথে যেতে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেন না; ঝাঁকা সমেত ডাবগুলো কিনে নিয়ে বুড়োকে বোঝার হাত থেকে রেহাই দেন। কবির এই সহানুভূতি কেবল মানুষে সীমাবদ্ধ নয়। কামারের হাতুড়ির আঘাতে লোহায় যে ঠকাঠক্‌-ঠক্‌ শব্দ ওঠে, তার মধ্যে তিনি দেখেন বন্দী লোহার ব্যথা। যে ফল হাটে বিকোতে এসেছে তার বেদনাও কবির চোখ এড়ায় না। দুঃখের জারক রসে জারিত কবির চেতনা। কবি হওয়ার স্পর্ধা তাঁর নেই। তিনি বন্ধু, দুঃখবাদী বৈরাগী।' অন্তরের সুগভীর বেদনা তাঁকে এনে দিয়েছে বৈরাগ্য। তাই জীবন ও প্রকৃতি তাঁর কৌতুক দৃষ্টিতে পরম রমণীয় মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

'বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘে হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।' এই পঙক্তি দুটিতে জীবন সম্পর্কে কবির চেতনা আশ্চর্য সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। জীবন সম্পর্কে নিগূঢ় ব্যথাতুর অনুভূতি কবিকে প্রতিটি বস্তুর অন্তরালে যে দুঃখের অস্তিত্ব, তারই সন্ধানে উৎসাহিত করেছে। নিজেকে দুঃখবাদী বলে ঘোষণা করলেও বিদ্রোহী মনোভাবের বলিষ্ঠ ছন্দোময় প্রকাশে তিনি স্বকীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহী মনোভাব কবি শ্রীমধুসূদনের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবাই যখন নিজেকে কবি বলে ঘোষণা করে তৃপ্তি পান যতীন্দ্রনাথ তখন বলেন 'আমি কবি নহি।' তিনি অন্যান্য সতীর্থদের মত আনন্দ লোকের কবি নন। জীবনে আনন্দের ছবি তিনি আঁকেননি। প্রতিকারহীন যে ব্যথা অক্টোপাসের মত জীবনকে জড়িয়ে আছে, যে ব্যথা সকল সৃষ্টিকর্মের উৎসরূপে বর্তমান, কবি সেই মহাব্যথায় ব্যথিত। সুখ ও আনন্দের আপেক্ষিক অর্থে তিনি বিশ্বাসী নন। প্রকৃত মুক্তি বলে এই সংসারে কিছুই নেই। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টি থেকে যতীন্দ্রনাথের বাস্তব জাগতিক দৃষ্টির কোনো মিল নেই। যতীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। তিনি মুক্তির জন্য ঘুমের বিধান দেন। তাঁর ঘুমিওপ্যাথি সমস্ত রোগের ঔষধ। বিশ্বের মর্মজ্বালা সাধারণ বিশ্ববাসী হয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন; তাই কৌতুকের উচ্ছ্বাসকে দূরে ঠেলে দিয়ে কবির ব্যথিত অন্তর উন্মথিত করে উচ্চারিত হয়—

'কবি নহি আমি, কবি নহি তথাপ্রথিত,
অনাসৃষ্টির ঘন ঘমন মথিত
আমি অনাদি ব্যথায় ব্যথিত।'

বিজ্ঞান-প্রকৃতি-সভ্যতা

মৃগাঙ্ক শেখর রায়

সৃষ্টির আদিম প্রভাতে প্রকৃতি ছিল নির্মম ও নিষ্ঠুর। তার পাষাণ কঠিন হৃদয়ে ছিলনা এতটুকু দয়া মায়া-মমতা। জীবনের প্রথম স্তরে তারা প্রকৃতির হাতে ছিল ক্রীড়ণক। ভয়ঙ্কর-প্রাকৃতিক শক্তি হল তাদের আরাধ্য দেবতা; নানা পূজা উপচারে তারা প্রকৃতির উদ্দেশ্যে করল অর্ঘ রচনা। অন্তরের কামনা বাসনা নিবেদন করল প্রাকৃতিক শক্তির পাদপদ্মে। তখন তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল বন্য ও বর্ব্বর। সমাজ গড়বার পরিকল্পনা হয়ত তাদের মনের কোণায় বাসা বেঁধেছিল কিন্তু তা তখনও হয়নি বাস্তবে রূপায়িত। কারণ 'সমাজ ব্যবস্থা' ছিল তাদের কাছে রঙীন স্বপ্ন জাল। সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পিত বাস্তব রূপ ছিল তাদের অজানা। প্রকৃতির ভয়ঙ্করত্বের মাঝে যে সৃষ্টির বীজ সুপ্ত রয়েছে, উত্তর কালে যা বিরাট মহীরুহে রূপ নিতে পারে, তখনও এই বিষয়ের সামান্য ধারণাও আদিম মানব অন্তরে স্থান পায়নি। তারা দেখেছে প্রকৃতির ভয়ঙ্কররূপকে তারা দেখেছে প্রকৃতির মধ্যে দানবী শক্তির মারণরূপকে; আদিম বন্য মানবগোষ্ঠী-ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে করত প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা। এই ভক্তি ছিল ভয় হতে সঞ্জাত। এই ভাবে হাজার হাজার বছর পেছনে ফেলে এল আদিম বন্যরা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যাযাবর জীবন উদরপূর্ত্তির তাগিদে করত বন্য পশুর পিছু পিছু ধাওয়া; ------ এই ছিল তৎকালীন মানব সমাজের তৎকালীন জীবনাদর্শ ও ধর্ম। তখনও সুরু হয়নি বাঁচা মরার সংগ্রাম।

বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে অসভ্য-বন্য-মানব প্রবৃত্ত হল নির্মম প্রকৃতির-সাথে মরণ পণ সংগ্রাম। সুরু হল মরণ বাঁচন লড়াই, সুরু হল প্রকৃতির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরে টিকে থাকার সংগ্রাম ; যাকে বলা হয়— 'অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম। যার ওপর মানব সভ্যতার অস্তিত্ব পুরোপুরী নির্ভরশীল। পরাজয়ের অর্থ ভ্রূণ অবস্থায় সভ্যতার শিশুর অপমৃত্যু। অপর দিকে জয় লাভের অর্থ সভ্যতার অগ্রগতির পথকে সুপ্রশস্ত ও সমতলতটে পরিণত করা। সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন প্রয়োগোপযোগী হাতিয়ার, হাতিয়ার ব্যতীত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম অসম্ভব। বিজ্ঞান মেটাল তাদের প্রয়োজন। বিজ্ঞান হল তাদের দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথের মিত্যসঙ্গী, বিজ্ঞান যোগাল তাদের পথের, অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনের অমানিশায় তুলে ধরল জ্ঞানের আলো। বিজ্ঞান সভ্যতার ব্যবসায়ে যোগাল মূলধন, - - - নিত্য নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে ; অর্থাৎ এককথায় সভ্যতার অগ্রগতির মূলে বিজ্ঞান গ্রহণ করল এক বিশেষ ভূমিকা।

—সৃষ্টির আদি পর্ব্বের অন্তে, জন্ম হল মানব সভ্যতার, জন্মের প্রথম পর্য্যায়ে ছোট শিশুটির মত হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুতে লাগল। তার পর সে আরো কত হাজার বছর পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল। সে এখন শিশু বা কিশোর নয়, সে এখন পরিণত বয়স্ক-তরুণ। যৌবনের উদ্দাম উচ্ছলতা, তারুণ্যের সীমাহীন উদ্দীপনা, আর নবীন প্রেরণার মৃতসঞ্জীবনী তার ধমনীতে হল প্রবাহিত। নূতন সৃষ্টির প্রেরণাই তখন হল তার ধ্যান ধারণা সাধনা। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল সভ্যতার বন্দীর শকট। এবার কে করবে তার দুর্ব্বার গতিরোধ ?

আগুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আদিম সমাজে এল বিবর্ত্তন। সভ্যতা হল আরো প্রাণবন্ত, তার গতিহল দ্রুত থেকে দ্রুততর। সে জানতে পেরেছে বাঁচার অতীক মন্ত্র, সে সংগ্রামের মধ্যেই লাভ করেছে বাস্তব অভিজ্ঞতা—সে জেনেছে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুরন্ত প্রকৃতিকে আপন আয়ত্তে আনা যায়। তাই প্রকৃতি তাদের শত্রু নয়, বন্ধু। প্রকৃতি শুধু অশুভ শক্তির মূলাধারনয়। প্রকৃতি চলমান মানব সভ্যতাকে করেছে অনুপ্রাণিত। বিজ্ঞানের সাহচর্য্যতা আর প্রকৃতির গর্ভে লুক্কায়িত মূল্যবান সম্পদ, অগ্রসরমান সভ্যতাকে করেছে সচল ও গতিশীল, চলার পথে জুগিয়েছে প্রেরণা, খুলে দিয়েছে প্রাণ প্রবাহের উৎসমুখ। প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের সম্মিলিত প্রয়াস মানব সভ্যতায় এনেছে অভিনবত্ব। মানব সভ্যতার দুইটি মূল্যবান সম্পদ একটি প্রকৃতি অপরটি বিজ্ঞান।

প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের সম্মিলিত সভ্যতা : প্রকৃতির জন্মদাতা পিতা, স্রষ্টা নিজে; সভ্যতার স্রষ্টা আদিম মানব গোষ্ঠী। সৃষ্টির প্রেরণায় প্রকৃতির জন্ম। বিধাতার হাতে গড়া প্রকৃতিকে নিত্য নূতন ভাবে রূপ দান, তার স্থায়িত্ব বিধান, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে সজাগ ও গতিশীল করাই মানব সমাজের একমাত্র আদর্শ ও ধর্ম। সচলতা ও গতিশীল ছাড়া জীবনে অস্তিত্ব কল্পনা বিলাসীর অবাস্তব কল্পনা। প্রকৃতিদত্ত সম্পদ, বিজ্ঞানের মেধা ও সুপরিকল্পিত ধ্যান ধারণা এবং মানব গোষ্ঠীর বিচক্ষণ ও মেধাযুক্ত চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা, সংমিশ্রিত হল প্রকৃতির রসায়ণাগারে,---- এইভাবেই জন্ম হল মানব সভ্যতার। শুধুমাত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদেই নয়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির স্থায়িত্ব বিধানের তাগিদেও মানব সভ্যতার জন্ম। যার চলা সুরু হয়েছিল আদিম যুগে, তার চলা-আজো শেষ হয়নি। অনাগত-ভবিষ্যতে হবেওনা। সে চলেছে, চলেছে, চলেছে, আগামী ভবিষ্যতেও চলবে, চলবে, চলবে। একটির পর একটি মানব সমাজের উত্থান পতন ঘটবে, পুরাতন বিদায় নেবে, তার স্থান দখল করবে নূতন। কিন্তু চলমান মানব সভ্যতা নিত্য অগ্রসরমান তার প্রাণস্পন্দনের সমাপ্তি অথবা বিশ্রামের অর্থ, পৃথিবীর অবলুপ্তি।

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

[চৌদ্দ]

একদিন খুব জ্বর নিয়ে বিমল বাড়ী ফিরলো। খাটের ওপর বিছানা আগোছাল হয়ে পড়েছিল। বালিশগুলো রোদে দিয়েছিল, বেরিয়ে যাবার সময় নামিয়ে এনে চেয়ারের ওপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে বালিশ ছাড়াই শুয়ে পড়েছে। বালিশটা টেনে এনে মাথায় দেবার ক্ষমতা তার তখন ছিল না। ঠিক সেই সময় বই খাতা বুকের ওপর ধরে লতা এসে পৌঁছল। জ্বরের ঘোরে বিমলের মুখ তখন থমথমে। লতা তাকে সাবধানে ধরে বিছানা ঠিক করে মাথায় বালিশ দিয়ে শুইয়ে দিল। কপালে তার হাতের ছোঁয়ায় বিমল একবার চোখ মেলে চাইল। রক্তজবার মত চোখ দুটো। ক্লান্তি আর আচ্ছন্নতায় কেমন যেন অসহায়। মাথায় জলের হাত দিয়ে একখানা খাতা টেনে নিয়ে বাতাস করল লতা। কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে।

লতার মনের মধ্যে তখন কর্ত্তব্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। সে হয়ত এ ভাবে সারারাত বসে থাকতে পারে। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ার পরও একবার তার মনে হয়নি বাড়ীতে বৌদি কিছু ভাবছে কিনা। কিন্তু একটা কিছু করা দরকার। রামুকে ডেকে এনে তার কাছে বসিয়ে সুধীরকে সে ডাকতে চলে গেল। জ্বরের তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুধীর থারমোমেটারে জ্বর দেখে ডাক্তারের কাছে ছুটলো। জ্বর ছাড়তে দিন সাতেক লাগল।

এই কদিনের ইতিহাসে লতা বিমলের উপখ্যানে অনেক বিবর্ত্তন ঘটে গেল। হারিয়ে যাওয়া স্বামীর মাত্র কয়েকটা দিনের ইতিহাসকে ছাপিয়ে বিমলের স্মৃতিতে লতার মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। নি:সঙ্গ নিরলম্ব জীবনে এ ধরণের

উপলব্ধি বিমলের বড় একটা ঘটেনি। একটি সহজ, সরল, নরম মনের আন্ত-রিকতায় তার অনাদৃত যৌবন, কামনা বাসনায় তৃষিত হয়ে উঠলো। মমতার যাদুমন্ত্রে তার সমস্ত বোধ যেন স্বপ্ন হয়ে উঠছে। কিন্তু এই কি ভালবাসা? কৈ, মন তো পুরোপুরী সায় দিচ্ছে না? তেমন করে তারে তারে সংগীতের ধ্বনি তো বেজে উঠছে না। তবে কি লতা তাকে ব্লাকমেইল করছে? যত্নের বিনিময়ে ভালবাসার আস্তরণে ঢেকে রেখেছে তার তৃষ্ণা? কেন এমন ভাবে আকৃষ্ট করছে বিমলকে? কিন্তু যদি তা না হয়? যদি লতার এই মমতার পরিণতি হয় প্রেম তাহলে? সে ভার কি বইতে পারবে বিমল? নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল তার। দিনের পর দিন চুম্বকের মত তাকে আকর্ষণ করছে লতা। লতার অন্তরের সমস্ত রহস্য যেন পরতে পরতে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। বিমল বুঝতে পারছে লতা জড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। কিন্তু যে মহীরূহকে আশ্রয় করে সে বেঁচে উঠতে চাইছে সেটা যে ঘুণ ধরা। হয়তো এখনও সময় আছে। সংস্কারের দোহাই দিয়ে এখনও সে মুক্তি দিতে পারে ঐ বঞ্চিত আর ভাগ্যের তাড়নায় লাঞ্ছিতা মেয়েটিকে।

লতাকে বিমলের ভাল লাগছে কিন্তু সে শুধুই ভাললাগা। লতার স্বপ্নকে সে তো সার্থক করে তুলতে পারবে না। বাধা বাইরে থেকে নয় বাধা তার নিজের কাছ থেকেই।

এখনও সময় আছে, এখনও সে পালাতে পারে কিন্তু মেয়েদের জীবনে সংস্কারের খুঁটি যদি কখনও আলগা হয়ে যায় তখন তাকে ধরে রাখা বড় শক্ত। একবার হোঁচট খেলে গায়ে যেটুকু কাদা লাগে তার অপবিত্রতা থেকে কখনই মেয়েরা আর নিজেদের স্নান করিয়ে তুলে আনতে পারে না। নিজেদের যারা সংস্কার মুক্ত বলে ঘোষণা করে তাদের দৌড়ও জেনেছে বিমল। বড়জোর মাথার সিঁদুর আর হাতে লোহাটুকু ত্যাগ করতে পেরেছে, তার বেশী নয়। কাজেই পা যাদের একবার পিছলোয় ভুলক্রমেই হোক বা ইচ্ছাকৃতই হোক, নিজেদের তারা সূচির পর্য্যায় ফেলতে পারে না। তারপর ঘা খেয়ে খেয়ে জীবনটা তাদের শুষ্ক মরুভূমির মত শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

বিমল এদের চেনে, এড়িয়ে চলে এদের সযত্নে, কিন্তু এদের নিয়ে ওর বিবেকের বালাই নেই কারণ যারা মরেছে নিজেদের কাছে নতুন করে তার মরার যন্ত্রণাতো পাবে না। তাই ভাবনা ওর লতাদের নিয়ে। যারা

নিজেদের গুপ্ত কামনাকে গালভরা সংগা দিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ করে আসলে ভালবাসা বস্তুটাকে এরা চেনে না।

বিমল তাকে কতটা ভালবাসল? আদৌ ভালবাসল কিনা সে হিসেব লতা কোন দিনও নেয়নি। নিজের ভাললাগাটাকে নিজের মনের মাধুরী মিলিয়ে পরম যত্নে ভালবাসার রং-এ ছাপিয়ে নিয়েছে। বিপদ এদের নিয়েই। এরা ইমোসানাল হতে পারে না পাবে শুধু চূড়ান্তভাবে সেন্টিমেন্ট'ল হতে। এদের সম্বন্ধে বলা যায় যে আত্মপ্রেমে এরা এতই মশগুল যে স্বচ্ছ দৃষ্টি ভংগীটাকে সাময়িক ভাবে হারিয়ে ফেলে। আর এই সাময়িকের জেরটাকে টেনে নিয়ে চলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আর বাকী দিনগুলো বেঁচে থাকে আধমরা হয়ে।

লতা যখন কাছে থাকেনা তখনই বিমলের মনে এই যুক্তিগুলো বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যায় লতার উপস্থিতিতে। এই রকম দোলায়িত অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটাতে কাটাতে একদিন সে আবিষ্কার করতে পারল যে লতার জন্য সে রীতিমত অপেক্ষা করে থাকে। তার আসতে দেরী হলে কিসের একটা অস্বস্তিতে কষ্ট পায়।

একদিন ঘুম ভেঙ্গে দেখে লতা বসে আছে ওর খুব কাছে। একখানি হাত তার ক্লান্ত কপালে। কোন কিছু ভাববার অবকাশ ছিল না। সব বিবেচনা, সব যুক্তি ভাসিয়ে দিয়ে যে দুরন্ত স্রোত ওর শিরায় শিরায় বইতে সুরু করল। প্রচণ্ড আবেগে দুহাত দিয়ে লতাকে জড়িয়ে ধরল নিজের বুকের ওপর। আদরে আদরে ভরিয়ে দিল তার ভালবাসা। ভেঙ্গে দিল তার সমস্ত লজ্জা, দুরন্ত ব্যঞ্জনায় মথিত করল নিজেকে আর লতাকে।

লতার আত্মসমর্পণে খুসী হল, শান্ত হল বিমল। যে প্রবাহের প্রচণ্ডতায় সে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে সে প্রবাহ স্তিমিত হল। সে ফিরে এল নিজের স্বভাবে। এরপর লতার জীবনে এল আনন্দ আর বিমলের জীবনে এল অনুতাপ।

বিমল লতাকে ভালবেসেছিল কিন্তু সে ভালবাসায় ছিল স্নেহ, ছিল অনুকম্পা আর ছিল কৌতূহল। এখন লতার কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হল। কিন্তু লতা যদি তখন তা জানতে পারতো তাহলে কি হ'ত তা বলা যায় না।

লতা ক্রমশঃ প্রেমের দায়িত্বে পূর্ণ হয়ে উঠলো। নিজের মনের সুরভাতে

নিজেই ভয়ে রইল। বিমলের মনের অবস্থা নিয়ে কোন প্রশ্নই ছিল না তার মনে। কিন্তু বিমলের মনে এ স্মৃতিটুকু তো ছিল না। লতাকে সে এভাবে মন থেকে কোনদিনও চায়নি। লতাকে নিয়ে সে কোনদিনও ঘর বাঁধতে পারবে না। আর না বাঁধা ঘরের ফুটো চাল আর কাটা মেঝেতে প্রকাণ্ড হ'য়ে যে জুড়ে রয়েছে সে তো লতা নয় যে যে কে আজ লতার আবির্ভাবের সংগে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো।

বিমলের মনে পড়ল, ছেলেবেলায় তাদের বাড়ীর সামনের মাঠটাতে মস্ত একটা তালগাছ ছিল, একদিন বাজ পড়ে মরে গেল গাছটা। মরা গাছটাকে যেদিন উপড়ে ফেলা হল বিরাট একটা গহ্বর দেখেছিল সে। শেকড় শুদ্ধ গাছটা পড়ে রইল সেই গহ্বরটার পাশে। কাঠুরেকে জিজ্ঞাসা করেছিল বিমল, কি হবে ঐ গর্ত্তটায়? কাঠুরে বলেছিল,—গর্ত্তটা অমন হাঁ করেই পড়ে থাকবে খোকাবাবু!

—কেন ওখানে আর কোন গাছ বসানো যাবে না?

—না খোকাবাবু! ওখানে আর কোন গাছের সার লাগবে না। ও মাটিটা বরবাদ হয়ে গেল।

বিমলের মনে হ'ল লতা তার মনে একটা নতুন জায়গা হয়তো করে নিতে পেরেছে কিন্তু যে বিরাট শূন্যটা গীতা তৈরী করে গেছে সেটা চিরদিন শূন্যই থাকবে। বাতাসের হাহাকার, বৃষ্টির ঝাপটাই হ'বে তার একমাত্র সম্বল। কাজেই লতাকে নিয়ে ঘর বাঁধা তার কোন দিনই চলবে না।

একটা অসহ্য বন্ধন ভয়ে বিমলের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো। যৌবনের দাবিকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। এতো তার অপরাধ নয়। কিন্তু কেন লতা এল তার জীবনে, যদি বা এল কেন সেই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে এল না যে শক্তিতে সে ভুলিয়ে দিতে পারতো গীতার সমস্ত স্মৃতি। গীতা চলে যাবার পর বিমল বুঝেছিল গীতা তার কতখানি ছিল। সমস্ত অসংগতি সত্ত্বেও গীতা ছিল তার জীবনে অনিবার্য্য তবু সেই গীতাকে পিছনে ফেলে রেখে সে একদিন অগ্রসর হয়েছিল সেদিন কি বিমল বুঝেছিল শত সহস্রপাকে রুদ্ধ হয়েছে তার গতি? গীতাকে ছেড়ে সে একপাও এগুতে পারেনি। কিন্তু গীতা তো বুঝলো না সে কথা।

যে গীতাকে সে পেয়েছিল তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারল না সেদিন। লোভীর মত তাকে আরও সুন্দর, আরও সার্থক, করে তুলতে গিয়ে একেবারে পুড়িয়ে ফেললো।

আজকাল বিমল প্রায়ই চণ্ডীপুরে বলে আসে। অনিমেষ সে কথা জানে। অনিমেষের একান্ত অনুরোধেই বিমলের চণ্ডীপুরে যাওয়াটা বেড়েছে অমিমেষের অন্ততঃ তাই বিশ্বাস। অনিমেষ সেদিন বিমলের কাছে একটি অপরিচিত মেয়েকে অমন নিঃসংকোচে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হল। বিমলের তো এমন কোন আত্মীয় আছে বলে সে শোনেনি। বিমল লতাকে বললে আজকের মত বাড়ীতে গিয়ে পড়াশুনা করতে। সলজ্জ লতা বই খাতা পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে যায়।

অনিমেষের মুখ চোখ প্রগলভ হয়ে ওঠে

—কি হে, আজকাল খুব সুরে বাজছ নাকি ?

—বন্ধুর বিধবা বোন পড়তে আসে।

বাতাস ভারী দেখে অনিমেষ ওপ্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন তুললো না। তাছাড়া অনিমেষের মন এখন অনেক যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে আছে। বিমলকে প্রশ্ন করল।

—ওখানকার খবর কি ?

—ভালই।

—কাজকর্ম কি রকম চলছে ?

—বেশ ভালই।

—আশাপ্রদ ?

—নিশ্চয়ই।

কথা বলতে বলতে আধশোয়া হয়ে আরাম করে বসে বিমল। তার সেই নির্বিকার ভংগীতে অনিমেষের উৎসাহ যেন অনেকখানি ফিকে হ'য়ে গেল— বিমল হঠাৎ বলে উঠ্‌লো

—ভাল কথা, টুটুলের খবর বলতো ? তার কথা খুব জানতে চায়। কথার কোন জবাব দিল না—হঠাৎ বলে উঠ্‌লো

আমি কিছু টাকা ওদের স্কুল ফাণ্ডে যদি ডোনেট করি সেটা কেমন হ'বে বলে তোমার মনে হয় ?

—টাকা ?

টাকাটা যে কত দুর্লভ বিমল তা জান। তাই কেউ অনায়াসে টাকা পাচ্ছে অথচ তা গ্রহণ করছে না কেন তা বুঝতে তার কোন অসুবিধে হয় না কিন্তু অসুবিধে হয় অনিমেষের। বিমল জানে ও টাকা গীতা কিছুতেই নিতে

চাইবে না, আর এ ব্যাপারে ওকেই বিব্রত হ'তে হবে যখন স্বামীজির কাছে কথাটা উঠ্‌বে। ভাল কাজে একজন কিছু দান করতে চায় বিশেষ করে টাকার যখন এত প্রয়োজন তখন সে টাকা কেন নেওয়া হবে না একথাটা স্বামীজিকে কে বোঝাবে ? বিমল নিরুপায় হ'য়ে জবাব দিল

—অনিমেষ তুমি গীতাকে আমার চেয়ে বেশী জান কাজেই এ প্রশ্নের উত্তর তোমারই আমার চাইতে ভাল জানা উচিৎ। আচ্ছা তুমি কি গীতার এই চলে যাওয়াটাকে সমর্থন করনা ?

—এ প্রশ্ন করছ কেন ?

—তোমার এই টাকা দেওয়ার ইচ্ছে থেকেই তাই মনে হয়।

—প্রথমে সমর্থন করিনি কিন্তু এখন করছি। দেখ বিমল এইভাবে যদি সে চলে না যেত তাহলে তো তাকে এমন ভাবে বুঝতে পারতাম না। তাকে আমি উপেক্ষা করেছি। আসবাবপত্রের মত সযত্নে আমার বৈভবের মাঝে সাজিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু বিশ্বাস কর বিমল আমি জ্ঞানত: তা করিনি। সে যদি চলে না যেত তাহলে হয়তো এমন ভাবে আমার ভুলটা কখনই বুঝতে পারতাম না।

অনিমেষের মত ছেলেকে যে একদিন এমন ভাবে এই কথাগুলো বলতে হবে সেইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য। বিমল ভেবেছিল অনিমেষ রেগে ফেটে পড়বে কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়েই সে নিঃশব্দে রুমালে চোখের পাতাদুটো চেপে ধরে বসেছিল অনেকক্ষণ। বিমলের তখন কিছুই করবার ছিল না। সিগারেট ধরিয়ে আপন মনে সে তখন একটার পর একটা রিং তৈরী করে চলেছে।

অনেকক্ষণ বাদে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অত্যন্ত করুণ ভাবেই বললো—

—তুমি একটু জেনে নিতে পারবে বিমল ? এ সম্বন্ধে তার মনোভাবটা ? আমার নাম কোরনা কিন্তু শুধু জানিও একজন মানুষ তাদের এই কাজে সহযোগিতা করে নিজে খুসী হতে চায়।

—আচ্ছা চেষ্টা কোরবো। কিন্তু টুটুল কেমন আছে বললে নাতো।

—না, এ প্রশ্নের উত্তর এত সহজে দেবনা। টুটুলের প্রতি সে অবিচার করেছে, তার শাস্তি তাকে পেতেই হবে। টুটুলের খবর জানবার জন্যে টুটুলের কাছে তাকে আসতে হবে।

সে দিন অনিমেষ আর বসল না। টুটুল আর তার মায়ের সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে বিমলের মনে পড়ে গেল তার নিজের মায়ের কথা—আর মার কথা ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বিমল।

সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে লতা আর বিমলের মাঝখানে একটা অস্পষ্ট আড়ষ্টতা এসে দাঁড়িয়েছে। আগের মত সেই ফিকে মিষ্টি আচ্ছন্নতা কোথায় যে হারিয়ে গেল। বিমলের খুব খারাপ লাগে। মিষ্টি ফুলের সুরভির মত, ধূপের ধোঁয়ার মত যে টুকু আবেগ তৈরী হত তার মনে তাই নিয়ে সে ভারী খুশী হয়ে উঠ্‌তো। মুহূর্ত্তের দুরন্ত ইচ্ছের কাছে সেই নির্লোভ আনন্দটুকুকে বলি দিতে হল। খুব আপশোস হয় বিমলের। এই ক্ষতিটার জন্য রাগ হয় লতার প্রতি। লতাকি পারতনা তাকে একটু সাহায্য করতে? যাতে এই সুন্দর সম্পর্ক কামনার প্রবল তাড়নায় নষ্ট হয়ে না যেত। মাঝে মাঝে তাই বুঝি কঠিন হয়ে ওঠে বিমলের আচরণ। একটা অনড় দূরত্ব তৈরী হয়ে ওঠে দুজনের মাঝে। লতা বিভ্রান্ত হয়। বুঝে উঠ্‌তে পারেনা কি তখন তার করা উচিত। এত সূক্ষ্ম বিচার তো তার নেই। কেন বিমলের ব্যবহারে এই বৈপরীত্য? কেন সে মাঝে মাঝে এমন দুর্গেয় হয়ে ওঠে? তাই ভাবতে ভাবতে ভারী হয়ে আসে তার মন, সে কষ্ট পায়। অভিমান করেনা লতা, সে ভয় পায় শুধু ভয় পায়। অভিমান তার জীবনে মানায় না, তা সে জানে। তাই অভিমান করতেও সে ভয় পায়। পড়াশুনার চাপ খুব বেশী পড়েছে কারণ পরীক্ষার খুবজন্য এবার তাকে তৈরী করছে বিমল। পাশ তাকে করতেই হবে। প্রিয়জনের মনের মত হবার জন্য যে সংকল্প মেয়েরা একবার গ্রহণ করে তার দায় বড় গভীর। মনের প্রসাধনেও তৎপর হয়ে উঠ্‌লো কারণ মনটাকে বিমলের ইচ্ছেমত সে সাজাতে চায়—তবে এ বড় কঠিন কাজ।

বৌদি মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। তার দুর্ভাগ্যও বড় কম নয়। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে আজ অভাব, দৈন্য, রোগ শোকের মধ্যে পড়ে সে হিমসিম খাচ্ছে। ভবিষ্যৎ তো সম্পূর্ণ রুদ্ধ। বয়সে লতার থেকে সামান্যই বড় অথচ সংসারের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পাবার দিন যেন তার ফুরিয়ে গেছে। পর পর দুটি মৃত সন্তান প্রসব করে ক্ষীণ দুর্বল বুলুকে নিয়ে তার অতৃপ্ত, ক্লান্ত দিনগুলো কাটে। তারই চোখের সামনে দিয়ে লতা এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে।

লতা যখন বলে—"বৌদি, ভেবনা তোমার বুলুর সব ভার আমি নেব" ...
তখন গা জ্বলে যায় কমলার—বলে

—কি করে নেবে ? তোমার তো নিজেরই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা ।

—কেন ? আমি বি, এ, পাশ করে বি, টি, পাশ কোরবো তারপর চাকরী পাব। ততদিনে বুলুর বয়স বাড়বে । আমার স্কুলে ওকে ভর্ত্তি করে নেব ।

বুলুকে বুকে চেপে ভবিষ্যতের স্বপ্নে মসগুল হ'য়ে যায় লতা, তখন কমলার বুক চিরে ইষ্টার একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায় । তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না । সেই বা কি পেল জীবনে ? লতা মাঝে মাঝে অন্য স্বপ্নও দেখে, মনে মনে ভাবে বুলুকেও তার নতুন সংসারে নিয়ে যাবে । বৌদিকে একটা টনিক কিনে দেবে। গোটাকতক ভাল সাড়ী...আর...আর...আরও কত কি। বৌদির শ্লেষোক্তিতে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ।

—থাক্ থাক বুলুর কথা আর ভাবতে হবে না। নিজের ব্যবস্থা করে নাও দিকি আগে ।

আগে হলে এই খোঁচাটায় লতা আহত হত । কিন্তু এখন হয়না। কারণ ও জানে বেশীদিন এ সংসারের ভার বোঝা সে হয়ে থাকবেনা ।

সুধীরের সংগে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় কমলার । আদুরে বোনকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছে। সংসারের কাজে সে একা হিমসিম খাচ্ছে কৈ তাতো দেখতে পায় না সুধীর । এ সব কথার উত্তরে কোনদিন বা সুধীর চুপ করে থাকে কোনদিন বা চেঁচামেচি করে । অবস্থা এক একদিন এমনই চরমে ওঠে যে বস্তিতে তাদের আর বে-মানান লাগেনা ।

(ক্রমশ)

বীতশোকপ্রশান্ত কমলাকান্ত

বিনয়েন্দ্র নাথ সেন

শক্তি যবে মূর্ত্ত হয়ে জাগে
করুণ অনুরাগে,
আকাশ ছোঁয়া অশ্রুরাশি
উদার হয়ে আসি
বর্ষে ধরণীতে
মুক্ত বেদনাতে,

বেদনা বার,
অরুণ আধার
উর্ম্মিল রশ্মিপাতে,
ছড়ায়ে আলো পরতে পরতে,
অনু হতে অণু
ক্ষুদ্র পরমানু,
দুলে ওঠে অন্তর-গুহাতে
তরঙ্গের করপাতে
শত কম্পন নিয়া,
হৃদয় উত্তরিয়া
সৃজি যায় আনন্দ বেদনায়
সূক্ষ্ম সূত্র জালে,
অতীয় ভূমায়,
আত্মার-কমলদল
সহস্র পাদে অবিরল;
তার মাঝে আছো তুমি

আকাশ ধরণী চুমি
আনন্দ কান্তি বিহার;
হে কমলাকান্ত—
বীতশোক প্রশান্ত—
তোমায় নমস্কার;
শত শত বার ।
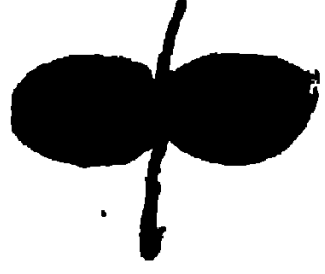
অন্তরালে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কী এক যন্ত্রণাবোধে উত্তপ্ত সে চিঠির অক্ষর
অথচ শালীন নম্র প্রস্তাবের সহজ ভূমিকায়
ক'টি সামাজিক চিঠি । অকথিত যৌবনের ঝড়
তাকে আলোড়িত করে – আন্দোলিত অনন্ত প্রভায়
এখনো সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠে অন্ধকারে
হৃদয়ের মুখোমুখি সে কখন বিপন্ন মায়ায় ।
বিসর্পিল ছায়া কাঁপে তার স্বপ্ন ভেজানো দুয়ারে ।

ভালোবাসা রক্তে তার ; তবুও সে হয়নি গৃহীতা ।
যৌবন-সংরাগী দিন আমি তারে কিছুই জানিনা ;
কেউ এসেছিল কিনা—তার সে মানসে মধুকর ।
যৌবনের আভিজাত্যে অথবা সে নিজেই দর্পিতা
খোলেনি জলসা-ঘর, বাজায়নি বীণা,
জ্বালেনি অনন্ত আলো—কাউকে করেনি সহচর ।

বয়স বেড়েছে ঢের। বড্ড বেশি হয়ে গেছে আহা।
প্রাণের সহজবোধে রাত্রি চায় স্নেহের নিরালা,
অন্যথা জীবন-পদ্ম আঁধারে যে ফুটে উঠবে না।
প্রথাবদ্ধ পথ ধরে অথচ সে চায়নি স্বাহা।
সে চেয়েছে অন্য কিছু। দ্যাখো আজো ঘৃতদীপ জ্বালা
রয়েছে নির্জনে, শুধু বেড়ে গেছে হৃদয়ের দেনা।

সর্বজনীন 'দিদি' হয়ে তবু থেকে গেছে গোপনীয় সাধ—
হয়তো কখনো কেউ তাঁর মুখে খুঁজবে আকাশ,
আঁধারে তির্যক পথে কেউ তুলে নেবে তার হাত ;
সন্ধ্যার সোনায় কোনো সন্ধি হবে, খুঁজে পাবে প্রসন্ন বিশ্বাস
সে সব ভাইয়েরা আজ সকলেই গৃহস্থ গৃহের ;
অনেকেই তবু তার সঙ্গে সাজো সম্বন্ধ রেখেছে—
বিজয়ায় নববর্ষে চিঠি লেখে, দেখা হলে নত নমস্কারে
পরিচয় হয়, তবু কেউ তাকে বড় জীবনের
স্বাধিকার দিল না যে। সম্প্রতি সে পিসীমা হয়েছে
কারু কারু। এখনো মঙ্গলঘট তবু বুঝি অপেক্ষিত থাকে।
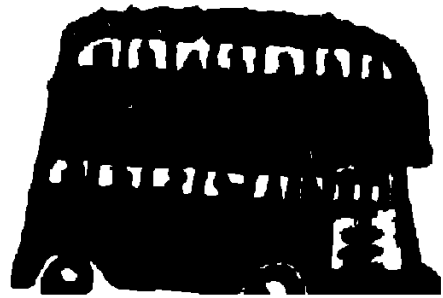
বুড়ো জগাইয়ের নিবেদন

লীলা মজুমদার

দোষ করেছি ঢের, ভুল করেছি কভু।
লুকিয়ে কোনো লাভ নেই তো, প্রভু,
সব নাকি তুমি জান, ভগবান;
নিজেও তো একেবারে নহি অজ্ঞান।
তাই স্বর্গে যদি মোর স্থান
হয় অকুলান,
গঞ্জনা দেব না তবু।
পন্টু, মন্টু, ঘণ্টা, গবা, কম ছিল না পাজি।
(যতই) চুল পাকিয়ে, দাড়ি বাগিয়ে, সাধু সাজুক আজি।
পরের গোরু দুইয়ে খাওয়া কি ভালো, অন্তর্যামী ?
তবু কোনদিন-ও কুচুটেপনা করি নি কো আমি।
স্বর্গে যাব সবে। আমার তাতে কি বা ক্ষতি হবে ?
যাবার আগে এই কথাটা শুধু বলে রাখি,
মলে পরে যদি মোর কিছু থাকে বাকি,
তবে দয়া করে,
থাকতে দিও মোরে
যেখানে দিনে রাতে শোনা যায় পাখির কুহুতান,
আর নদীর, কলগান সদা ঝালাপালা করে কান।
ঝরণার তলে, গভীর কালো জলে,
রোজ একবার করে করি যেন স্নান।
রোদ সইতে নারি,
দিও সারি সারি,
তোমার পছন্দ করা পাতাওয়ালা গাছ,
আর জলেতে ছেড়ে দিও মোটা মোটা মাছ
জয় ভগবান, করি তব গুণ-গান।
স্বর্গটর্গ চাই না আমি, নাই-বা হল স্থান।

ইচ্ছে হলেই দিতে পার, সর্বশক্তিমান,
ঐ জলের মাঝে, ছায়ায় ঢাকা, খুদে এক দ্বীপ
আর আমার হাতে বর্মি বাঁশের চোস্ত এক ছিপ।

এখনো জলায় নামলে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

এখনো জলায় নামলে জোঁকের মতন পায়ে অপমান আঁকড়ে ধরছে
কটূবাক্য-ঘোলা জল মুখে গেলে বমি হয়ে যায়।
এখনো হৃদয়ে পাঁচবার সন্তার মৌলবী নামাজ পড়ছে;
ভালোমন্দ বোধটুকু অন্ধকারে জোনাকি জ্বালায়।

হয়তো একদিন এই চেতনার সারা দেহ দাদে ভরে যাবে,
চোখের চামড়ার খোসা উঠে যাবে, হয়তো সেদিন
রেসের পরাজিত ঘোড়া চোখ বেঁধে একা ছোটাবে
এবং হা-ঘরে জুটবে বাসি ভাত, ফকিরের নোংরা কৌপিন।

তোমার সর্বস্ব ·· তোমার পরাজয়

স্মৃতিলেখা দাশগুপ্ত।

১) তুমি নাকি,

কবেকার অন্ধকারে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম ভালোবাসা পেয়েছ

আমি শাল সেগুনের জঙ্গলে কেবলি শুনি

"রোমাঞ্চ বিস্তার

এই নাও সবস্ব তোমার।"

ঈশান কোণে উঠেছে ঝড় ··· প্রতমুখে ইতঃস্তত লজ্জা ছড়ানো বৃষ্টি

বৃষ্টি! উদাসীনতায় কেঁপে উঠছে দূর্বাঘাস

"এ তোমার অহংকার

এ তোমার পরাজয়।"

অনেক পদচিহ্ন স্রোতের রেখায় কেঁপে উঠছে

নদীর মতো হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে

তুমি ওদের পুনর্জন্মে হাওয়াই ভাসাবে না?

একবার দেখাবে না উদাসীন জ্যোৎস্না?

২) তুমি নাকি,

কবেকার অন্ধকারে গভীরতম শোক চেয়েছিলে

নগ্ন মাটির বুকে মানুষের কাছাকাছি

আমিতো কেবলই শুনি

পৃথিবীর প্রাচীনতম শোকধ্বনি

ফিরে আসছে সাবধানি জানালায়

ভালোবাসায় ছেয়ে যাচ্ছে স্নিগ্ধ পরাজয়

ফিরিয়ে নাও সর্ব্বস্ব তোমার॥

কালের কপোল তলে

সমীরণ রুদ্র

অহংকার তেজ দম্ভ
কিছুই থাকে না দেখ—
কালের কপোল তলে।
সব ভেসে যায়
বটের প্রলম্বিত শাখা, রাজার সিংহদুয়ার
গাঁয়ের পর্ণ কুটির, স্মৃতি সৌধ সুউচ্চ মিনার
হুড়মুড় শব্দে ভেঙে যায়।
কোন এক বিষণ্ন সন্ধ্যায়।
সব কিছু ভেসে যায়
শকুন্তলার আংটি
আর সেই চঞ্চল হরিণশিশু—
টাইটানিক জাহাজ—
কোথায় হারিয়ে গেছে মহাকালের সিন্ধুতলে।
কিছুই থাকে না দেখ কালের কপোল তলে।
কোথায় শাজাহানের ময়ূর সিংহাসন
কোথায় ঔরঙ্গজেবের কুটিলতা ভীষণ
কিংবা দুর্যোধন ও দুঃশাসনের আস্ফালন—
কবে হয়ে গেছে সে সবের অবসান।
নেই আর নেই সে সব এখন
শেষ হয়ে গেছে চিরতরে পার্থের গাণ্ডীব ধারণ।
হিটলারের আধিপত্যের অভিমান
আর মুসোলিনীর মেসিন গান—
আজ শুধু স্মৃতি-হয়ে দোলে।
সে সব কবে ডুবে গেছে মৃত্যুর অন্ধকার নীলে।
প্রেমপ্রীতি ভালবাসা
মুছে যায় সব স্মৃতি
গাছের বিবর্ণ হলুদ পাতা
দেখ ঝরে যায় নিঃশব্দে মহাকালের কোলে।
সুখ দুঃখ কিছুই থাকেনা কালের কপোল তলে।

স্বপ্নের দিনগুলো

নইম চৌধুরী

অনেক আশার দিনগুলো মোর স্বপ্ন হলো
রঙ্গিন রঙ্গিন স্বপ্ন হলো কল্পনাতে।
গভীর আশায় ডুব দিলাম আর
ভাবছিলাম — কখন সেদিন নীল আকাশে
সবুজ সবুজ পাখনা মেলে পাখীর মতো
আসবে ফিরে আমার দ্বারে বলবে কথা ;
অভিসারে কানে কানে ফাগুন মাসে কুঞ্জবনে।

অনেক আশার দিনগুলো মোর স্বপ্ন হলো —
সফল হলো কুকিল ডাকা লাল পলাশের দিনে।
অনেক আশার দিনগুলো মোর মধুর মধুর,
পেলাম আমি অনেক অনেক এজীবনে ;
দিনগুলো মোর স্মৃতির পাতায় তারার মতো।
অনেক আশার দিনগুলো মোর যাত্রা পথে—
পথ দেখালো আমায় নিলো স্বপ্ন চূড়ায়।

দিনগুলো মোর সফলতার প্রতীকরূপে
উড়বে হাজার ডানা হয়ে নীল আকাশে। *

---

* বাংলাদেশের (পূর্বতন পূর্ব পাকিস্থান) চট্টগ্রাম থেকে ১৯৬৯ সালের ৫ই আগষ্ট কবি আমাদের দপ্তরে তার এই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর পর 'ছন্দিতায়' তাঁর কবিতাটি প্রকাশ করতে পেয়ে আমরা আনন্দিত। কবি বাংলাদেশবাসী।

অন্তর্মুখী

অমর দে

ঝন ঝিং ঝিং আই লাভ ইউ...উ...উ...উ।

শেষটুকু লম্বা করে টেনে দেয় ক্লারিওনেট।

ছন্দে ছন্দে চলে অর্কেষ্ট্রা। সুরের খাভাখানা সামনে মেলে দুলে দুলে তোলে তাল। হাত-পা-দেহগুলো নড়তে থাকে—গণ্ডদেশ লাল হয়ে আসে। তালে তালে চলে জোড়া জোড়া পা; সামনে-পিছনে সড়ে যায় এক এক জোড়া হাসি হাসি মুখ। চলে বল নাচ।

—হ্যালো; তাপস যে।

একটা মেয়ে এসে তাপস-লীনার সামনে দাঁড়াল।

—আরে মিলি, তুমি এখানে! গুড ইভ্‌নিং।

গুড ইভ্‌নিং।

এক জোড়া হাত ছিড়ে গিয়ে আর এক জোড়া হাত মিলল। গানের একটা সুরের পতন থেকে আর একটা সুরের উত্থান হল। লীনা নির্বাক; তাকিয়ে থাকে।

—ইনি কে? পার্টনার নিশ্চয়ই।

—পার্টনার তো নিশ্চয়ই—সেই সাথে কম্প্যানিয়ন—লাইক কম্প্যানিয়ন—জীবন-সঙ্গিনী।

—ওঃ, নমস্কার।

—নমস্কার।

লীনা হাত তুলল। লম্বা একটা সুরে টান পড়ল বাদকদের। ঝন-ঝন-ঝন সমানে বেজে চলল প্রাণ-মাতানো সুর।

—তাপস তুমি যে কি! সেই যে পশ্চিমে ডুব দিয়েছ তো আর দেখা নেই। কেন, আবার পূবে উদিত হলে ক্ষতি ছিল কি কিছু?

মিলি বলছে। সে স্বাভাবিক। যেন তাপসের উপরে কি এক অস্বাভাবিক অধিকাব রয়েছে তার। তাপস বলল—তুমি তো জানোই মিলি, সূর্য্য এক

সকালে যে পাখীকে দেখে গেল, ফির সকালেও তার দেখা পাবে এটা সে কখনও আশা করতে পারে না। তাছাড়া প্রতিদিনই তো তার পথ এক নয়; পথের দিক এক হতে পারে, কিন্তু পথটা ভিন্ন।

—তা হতে পারে! কিন্তু একবার খোঁজ করে নেওয়াটা কি তোমার কর্তব্য ছিলনা?

—তোমারও কি একই কর্তব্য ছিল বলে আমি দাবী করতে পারিনা?

দুজনেই হেসে উঠল। লীনা শুনল কি শুনল না। গানের সুর আর গান এক নেই; পাল্টে গেছে। গান হচ্ছে, বাজছে, নাচ চলেছে—'হোয়াই আই হাপেন্ট্‌ গট ইউ! লীনার হৃদয়টা তাল দিল—'হোয়াই আই হাপেন্ট গট ইউ—তোমাকে আমি কেন পেলাম না।

তাপস আর মিলি হয়ত অনেক কথা বলে ফেলেছে। অনেক কিছু—অনেক পুরোনো আনন্দপূর্ণ কথা। লীনা কিছুই শোনেনি; শোনবার প্রয়োজন নেই তাব। ওদের পুরোনো কথার সুরে ওরা মাতুক। লীনা তাতে তার হৃদয়-তার দিলে সে তার ছিঁড়ে যাবে। অদ্ভূত ভাবে বাজবে না—বাজবে ছিঁড়ে যাও—যার শেষ ব্যথাটুকু নিয়ে।

—সেই কথা মনে পড়ে, তাপস! —এ জীবনে আর কিছুর প্রয়োজন নেই; শুধু তুমি থেক আমি থাকি এই বেশী।

—মনে পড়লেও মনে করে লাভ কি? জীবনের এক এক পদক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা আসে। সব কিছুকেই প্রাধান্য দিয়ে মনে রাখতে হয়!

—কিন্তু আমি কেন ভুলিনি?

—তা তুমিই জান। হয়ত ভুলতে চেষ্টা করনি।

—না না তাপস আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। ভুলবার জন্যে কেউ ভরসাও দেয়নি।

লীনা দেখল, মিলির চোখে-মুখে তীব্র কাতরতা। কুলায় প্রত্যাবর্তনরত পাখী যেন ডানা ঝাপটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মনটা যেন নীড়ের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর তাপস? আর তাপস যেন এক ধীরস্থির বৌটাপির, বুক দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে কি এক নীড়ের আশা। কি এক বিশাল অধিকার তার যেন ঐ পাখীর উপরে,—আচ্ছা আমি তোমায় ভরসা দিচ্ছি—মিলি, তুমি ভুলতে চেষ্টা কোর!

লীনা তাপসের মুখের দিকে তাকাল। কপালে যেন একটু ঘাম জমেছে তার—ঘাম নয় হীরের কোঁটা। চোখে আকাশের উদারতা। তাপস ব্যর্থ প্রেমিক।

টু-টু—টু—উ—উ।

শানাই বাজত, এ সময়ে করুন সুরে যদি শানাই বাজত!

লীনা শুনল, বিয়েতে বাজা শানাইয়ের সুর। বেজে চলেছে সমানে। পিতৃগৃহ ছেড়ে কনে চলেছে স্বামীর ঘরে। স্নেহের বাঁধন ছেড়ে চলেছে প্রেমের বাঁধনে। জল আসছে। অশ্রুর বাঁধ ভেঙে গেছে। করুন।

দুহাত দিয়ে কান চেপে ধরল লীনা।

হা—হা—হা।

তাপস হেসে উঠেছে। মিলিও হাসছে। হয়ত কি একটা আনন্দঘন পুরোনো কোনো কথা বলে ফেলেছে তাপস। যে কথা মনকে করে তুলেছে নর্তকী, হৃদয়কে করে তুলেছে গায়ক।

উচ্ছল সুর বাজছে ক্লাব-ব্যাণ্ডে।

ট্যাঁ—ট্যাঁ—টু—ট্যাঁ—টাঁ—টু—। অদ্ভুত।

—সে দিনের স্বপ্ন দেখা যদি সার্থক হত!

দীর্ঘশ্বাস টানল মিলি। তাপস নিশ্চুপ। —কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো? তুমি তো চলে গেলে মামাবাড়ী না কোথায়। আর হঠাৎ এরই মাঝে আমার দাদার এক বন্ধু এল—তোমার থেকেও অদ্ভুত দেখতে! তিন চার দিন আমাদের ওখানে ছিল। আমি ভুললাম। ওকে দেখে—কি বোলব, তাপস—স্বর্গ ভেবেছিলাম।

—তারপর পরিচয় হয়ে যা হয়! আজ হাসি আসছে, তোমাকে তুচ্ছ ভেবে মন থেকে সড়িয়ে দিয়েছিলাম। ওকেই গ্রহণ করলাম। দেখলাম আর উপলব্ধি করলাম দীর্ঘস্থায়ী আর ক্ষণিকের মাঝে পার্থক্য কি! তারপর বিয়েও হ'ল।

একটা লম্বা বিপর্যয়ের সুর দিয়ে গানটা থেমে গেল। যে উচ্ছল গানটা চলছিল সেটা শেষ। নতুন গানের জন্যে বাদকেরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর কোথাও সুর ভাসছে না। তবুও লোকগুলো দুলছে; তাল রেখে চলেছে।

লীনা দেখল, তার পাশে, খানিকটা তফাতে যুবকটার বুকের পরে মাথাটা ছুইয়ে দিয়েছে মেয়েটা। যুবকটার ডান হাত খানা তার চুলের মাঝে আলোর বিনুনী বুনে চলেছে। তবুও ওরা দাঁড়িয়ে নেই। ওরা দুলছে। কি একটা সংগীতের আমেজ চলেছে ওদের মনে। কি একটা স্বপ্নের মোহ ওদের জগতে।

লীনার মরমে সে সুর পৌছাল না। লীনা নাচল না। নীরব হয়ে একাই যেন সে সে সংগীতের ভাব উপভোগ করতে পারল না।

—আমাদের ভালোবাসার শেষ হয়েছে, এই কি তুমি মনে কর তাপস ?

—আমি, এখনও তোমাকে ভালোবাসী মিলি। একবার যে ভালোবাসা, যে প্রেমের জন্ম হয়—সে শাশ্বত, তার মৃত্যু নেই—সে চিরন্তন !

—আঃ তাপস !

একটু হাসি আর একটা দীর্ঘশ্বাস মিলির উত্তেজনায়। মিলি অনুপম আনন্দে চোখ বুজেছে। লীনা দেখল, তাপসের হাতের আঙুলে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে মিলির আঙুলগুলো।

লীনা এ পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সে শুনতে পাচ্ছে একটা বাঁশীর ধ্বনি। বাঁশীর সুর। কোথায় বাজে, কোথায় ?

লীনা তাতড়িয়ে পাচ্ছে না।

লীনা ঘেমে গেছে।

তাপস থেমে গেছে।

ক্লাবের আলোগুলো সবাইকে থামাচ্ছে।

—মিলি, তোমাকে আমি এখনও ভালোবাসি। তোমার মঙ্গল আমি এখনও কামনা করি। তাই বলছি, জীবনকে ভেঙে দিওনা। বাধা অনেক আসে, বিপত্তি অনেক আসে। তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঐ বাঁধ-ভাঙা বিপত্তির সামনে। দাঁড়িয়ে থাকলেই সার্থকতা সড়ে গেলেই ধ্বংস। তুমি সড়ে যেওনা—আমার অনুরোধ। জীবনকে আবার গড়ে নাও !

বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা।

ফি লাভস ইউ ইয়া টা টা টা…।

ক্লাবঘরটা আবার দুলতে লাগল। ছায়ার পর ছায়া পড়ে গিয়ে সড়ে গেল। তালে তালে পা ফেলার শব্দ।

—আমি তাই করব তাপস। তোমাকে আমি ভরসা করি। যদি কোন দিন স্মরণ করি সাড়া দেবে নিশ্চয়ই !

— নিশ্চয়ই !

মিলি লীনার কাছে এগিয়ে এল—মিসেস চৌধুরী ।

— বলুন !

আপনি ভাগ্যপূর্ণা — আপনি তপস্বিনী ।

লীনা হাসল — কি যে বলেন ! কিন্তু কেন শুনি ?

—কিছু নয়, তাপস শুধু আপনার !

অর্কেষ্ট্রা খুব জোরে বাজছে । অদ্ভুত সুর; অদ্ভুত । সমস্ত লোকগুলো যেন মাতাল হয়ে দুলছে । বাদকেরা সুরের সুরায় মাতাল হয়ে বাজাচ্ছে । যেন হৃদয়তন্ত্রীর তারগুলো বেজে চলেছে ।

নাচ—আরো নাচ । গান—আরো গান । *

---

* বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান) খুলনা থেকে ১৯৬৮ সালের ২১শে জুলাই লেখক আমাদের দপ্তরে তাঁর এই গল্পটি পাঠিয়েছিলেন 'ছন্দিতার' প্রকাশের জন্য । কিন্তু নানা কারণে এতদিন লেখাটি আমাদের ফাইলবন্দী হয়েছিল । দীর্ঘ কয়েক বছর পর আজ লেখাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিন । এই প্রসংগ জানাই, বর্তমানে লেখক এপার বাংলার কলকাতাতেই থাকেন ।

মুখ আর মুখোশ

মানস সেনগুপ্ত

কিছুক্ষণ আগেই বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আলোয় ভাসছে বম্বে নগরী। এখনও বেশ গরম লাগছে। বৃষ্টি আরোও গুমোট বাড়িয়ে দিয়েছে। রাস্তা ঘাটে প্রচণ্ড ভিড়। ভাল করে হাটা যায়না। তারপর হকারের উৎপাত তো আছেই। মনে হয়েছিল বিকেলটা ঘরে বসেই কাটাই। খাবার পর একটা বই নিয়ে শুয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলনা। একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল মন। মেসের কেউ নেই। শনিবার হলেই ওরা কোথায় উবে যায় কে জানে। কাজেই পড়ন্ত বেলার দিকে মুখ রেখে আমাকেই বসে থাকতে হয়—কেননা আমি কথা বলতে জানিনা, আমি মুখচোরা আমি ভীরু। এসব আমার কথা নয়। তাপস, মনীষ অমলের কথা। রঙচঙে জামায় ওরা আধুনিক। বর্তমান সমাজের পচা মোড়া খোলসটা তাই ওরা বর্জন করতে চায়। যাইহোক হাতে কিছু ছিলনা তাই পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। কোথায় যাব ঠিক করিনি। মোটের ওপর চোখ যেদিকে যায়। আলপনাবৌদির বাড়ি বিশেষ দূরে নয়। লিকিঙ্ক রোডের ঠিক মোড়ে। বিমানদা ভোল্টাসের বড এক্সিকিউটিভ। দুহাজার টাকা মাইনে পান। ভোরবেলা হয়ত ম্যাস্নডকে গিয়ে বড রুই মাছ নিয়ে এসেছেন। কতদিন বলেছেন মাঝে মাঝে চলে আসবে। কিন্তু বিমানদার বড় মেয়ে সুজাতাকে আমার ভাল লাগেনা। কোন দিন অবশ্য ব্যবহার খারাপ করেনি। তবে সব সময় যেন বিজ্ঞাপন এঁটে চলে। কেমিনা ফ্যাসান শোতে ফাষ্ট হয়েছিল বলে একটা বিরাট পার্টি দিল। না এখন যাওয়া ঠিক হবেনা? ওরা অবেলায় খেয়ে হয়ত সবাই ঘুমোচ্ছে।

মোড়ের দোকান থেকে একটা চারমিনার কিনে ধরালাম। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের ওপাশ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। যাত্রা টকিজে প্রচুর লাইন পড়েছে। কি বই হচ্ছে যেন—? পরশ, বইটা দেখা হয়নি। আসলে সঙ্গীসাথী না পেলে ঠিক যুত হয়না। অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী একাই তিনবার দেখেছি। কমলদার বাড়িতেই যাওয়া যাক। কিন্তু এখন কি কমলদা বাড়ি থাকবে? আজ হয়ত ষ্টুডিও আছে। গেলে কিছু রেকর্ড শোনা যেত।

কি চিনতে পারছ?

চমকে ফিরে তাকালাম। একটা লোক। খোচা খোচা দাড়ি, নোংরা বস্ত্র। হাতে একটা বিড়ি।

চিনতে পারলেনাত? তুমি নিবারণ ঘোসের ছেলেনা?

মাথা নেড়ে বললাম 'হঁ্যা।'

ও! তোমাকে কত ছোট দেখেছি। তোমার দাদু তোমাকে হরিশ পার্কে ছেড়ে দিয়ে পাইচারি করতেন। মাঝে মাঝে যোগ ব্যায়ামও করতে দেখেছি ওনাকে। তোমার এক দিদি কি নাম যেন?

অনিমা—

হ্যা অনিমা, সে এখন কোথায়?

কানপুরে জামাইবাবু সার্ভিস করেন। আমি তখনও ঠিক চিনতে পারিনি। ও! কতদিনকার কথা। সুকুমারদার কথা মনে আছে? বংশীর দাদা। ধীরে ধীরে মনে পড়ল। পালবাবুদের পাশের হলদে বাড়ি।

ঠিক ঠিক। গণেশ ঘোষের উল্টোদিকে। চলনা কোথায় বসা যাক। বললাম চলুন। আমরা এক ইরানী চায়ের দোকানে এসে বসলাম। লোকজন বেশি নেই। একটা রেডিও বাজছে। এক ছোকরা দুগ্লাশ জল দিয়ে গেল সুকুমারদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে, দুতিনটে টান দিয়ে বললেন, কি করছ?

একটা কোম্পানীতে কাজ করি।

কি কাজ?

অ্যাকাউন্টস।

বেশ।

বিয়ে করেছ?

না, মানে নিজেই বড় কষ্টে আছি?

আবার বিড়িতে তুত্তিনটে টান দিলেন। বয় দুকাপ চা দিয়ে গেল। আমি টেবিলের কাঁচের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ পকেট থেকে একটা ফটো বার করে আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, একে চেন ?

একটি অল্প বয়েসী মেয়ের ছবি। অনেক দিন আগের তোলা। অংশ-বিশেষ হলদে হয়ে গেছে। কিন্তু চিনতে পারলাম না—মাথা নেড়ে বললাম, না।

এর নাম শিপ্রা। তোমার দিদি দেখলে চিনত। আমি যখন এম, এ পড়ি তখন আলাপ হয় শিপ্রার সংগে। অদ্ভুত কমনিয়তা ছিল ওর চেহারায়। তার চেয়েও সুন্দর ছিল ওর গলার ভাষা। এত সুন্দর গান আমি কখনও শুনিনি। ওকে আমি গোলাপের থেকেও বেশী ভালবাসতাম। তুমি কখনও ভালবাসার তাড়না অনুভব করেছ ?

কিছু বললাম না।

করনি, আমি করেছি।

শিপ্রাদিকে বিয়ে করলেন না কেন ?

করতাম। কিন্তু একটু ভুল হয়ে গেল। আমি জানতাম না ও ক্যান্সারে ভুগছে। আমি যখন সবকিছু নিয়ে ওর কাছে গেছি তখন—ও তখন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। ভাখ পৃথিবী ঘুড়ছে, ঘটনা ঘটছে সবকিছু তোমার আমার আয়ত্তের বাইরে। যতক্ষণ তুমি আমি কাছাকাছি আছি ততক্ষণ আমরা মানুষ, তার পরই আমরা মনের একটা প্রতিচ্ছবি, স্মৃতি, ইতিহাস।

তারপর আর বিয়ে করেননি।

চাটা শেষ করে বলল, করেছিলাম। ফ্রেনী লোবিয়া বলে একটি মেয়েকে। সিমলায় আলাপ হয়েছিল। পকেট থেকে আর একটা ছবি বের করেলন।

দেখলাম অদ্ভুত সুন্দর স্বাস্থ্য মেয়েটির। তবে বয়েস একটু বেশি। আমাদের আনুষ্ঠানিক কোন বিয়ে হয়নি, তবে তিনবছর আমরা ছিলাম বরোদায়। আমি তখন অ্যালেবিকে চাকরি করতাম। ফ্রেনী ছিল আমার অনুপ্রেরনা আমার বাঁচার স্বপ্ন। আমি কোনদিন ভাবিনি ফ্রেনীও এমনি করে হারিয়ে যাবে আমার জীবন থেকে।

কি হয়েছিল ?

কিছু হয়নি। শুধু একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি ঘর শূন্য। শুধু লেখা ছিল। আমি চলে যাচ্ছি—আমার সংসার ভাল লাগছেনা।

তারপর আর খোঁজ করেননি ?

করেছি, অনেক করেছি। কিন্তু পাইনি। আবার একটা বিড়ি ধরালাম। এখন আমার কি মনে হয় জান। যা কেন করেছে অন্য যে কোন মেয়েও তাই করতে পারত। যদি সমাজ আইন সংস্কার আমাদের না বাধত তাহলে আমরা সবাই একে অপরের থেকে পালিয়ে বেড়াতাম। কখনও ফুলের বাগানে ভ্রমরদের উড়ে বেড়াতে দেখছ। যে যার নিজের কাজ করছে। কেউ কাউকে স্বীকার করছেনা আবার অস্বীকারও করছেনা। আপনার ফেলে আসা জীবনের জন্য কষ্ট হয়না। হত, কিন্তু এখন হয়না। এখন সবাইকে আমি সমান ভালবাসি। কারোও প্রয়োজন খুব বেশি নেই আমার জীবনে।

দাঁড়াও আমি আসছি। বলে উঠে রেষ্টুরেন্টের বাইরে চলে গেল সুকুমারদা। অনেকক্ষণ বসে আছি। কিন্তু সুকুমারদার দেখা নেই। কোন লোক বসে নেই আমি ছাড়া। ফটো দুটো টেবিলের ওপর পড়ে আছে। এগুলি নিয়ে আমি কি করব। পুরো ব্যাপারটা গল্প না সত্যি ? বাইরে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ফটো দুটো তুলে পকেটে পুরলাম। পয়সা দিয়ে বেড়িয়ে এলাম। রাস্তার পুকুরটার সামনে এসে ফটো দুটো ছিড়ে জলে ফেলে দিলাম। টুকরোগুলো ভেসে ভেসে পদ্মপাতায় আটকে রইল। নিজেকে একটু অপরাধী মনে হল। কিন্তু কি করা। আমাব কাছে ওদের কোন দাম নেই। ওরা মুখোশ মাত্র। ধীরে ধীরে পোরবন্দর রোড ধরে হাটতে লাগলাম। প্রচণ্ড হাওয়া ছেড়েছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়।
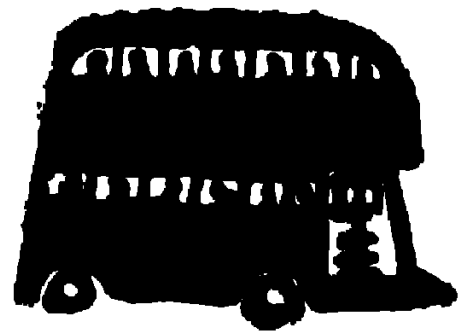
মন্থরার বৈঠক

রাণাঘাট লোকাল—লেডিস কামরায় উঠেছি। অনায়াসে ধারের দিকে সিট পেলাম কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সুরু হল ভীড়ের চাপ। পুরুষ মেয়ে দুরকমেরই যাত্রী কেউ কারো দিকে তাকাবার অবকাশ পাচ্ছেনা। নিজেকে কেমন ফালতু মনে হল। এ ট্রেনে না এলেই পারতাম। ওদের চাকুরী, আসতেই হবে। আমি না এলে একটা সিট তো একজন পেতো। কি আর করি। চাকুরে মেয়েদের গল্প শুনবে মন দিলাম। তাদের প্রত্যেকেরই বাড়ীর সমস্যা—কারো শাশুড়ীর অসুখ। কারো মাকে নার্সিংহোমে পাঠাতে হবে, কারো বা কোলের ছেলেটার অসুখ, কেউবা ডাই করে সাবান কাচা রেখে এসেছে বাড়ী গিয়ে সেই সব কেচে তুলতে হবে। ঘর বার সামলানোর গুরু দায়িত্বে প্রায় সব মেয়েই নাজেহাল। এমন সময় লেডিজ চেকার এলেন। মাথায় সিঁদুর গায়ে গহনা আমাদেরই মা খুড়ির মতন। তিনি এসেই পুরুষদের হাটালেন। যেমন রাশভারী চেহারা তেমনি ব্যক্তিত্ব। হঠাৎ আমারই সামনের এক মহিলাকে বেশ রেগেই বল্লেন, 'উঠে পড়'। সে বিন্দুমাত্র কেয়ার না কোরেই জবাব দিল 'কেন উঠ্‌বো কেন? আমি তো আগে এসেছি। 'টিকিট কেটেছ?' 'কাটবো না কেন।' 'কৈ দেখি?' সে মহিলা তখন রণচণ্ডিনী—'তুমি কে? তোমাকে কেন দেখাবো?' মহিলা চেকার সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। মুহূর্তে খণ্ড প্রলয় বেধে গেল। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। একটু পরেই আমার সামনে এসে বসলেন। বল্লেন, 'সামনের দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এলাম।' কিছুক্ষণ এই লাইনেই কথাবার্তা চললো। হঠাৎ একটি মেয়ের ব্যাগ থেকে একটি বছর দেড়েকের ছেলের ছবি পড়ে গেল। চেকার ভদ্রমহিলা সেটা তুলে নিয়ে বল্লেন—'কার ছবি?'—মেয়েটি উত্তর দিল আমার ছেলে—এরপর সেই ছেলের কথার সূত্র ধরে আরো অনেক চাকুরে মায়েদের বাৎসল্যরসের আলাপন চললো। তারই মাঝে চেকার বল্লেন, ঠিক আমার ছোট নাতিটার মত। এই যে ফিরবো কিছু না কিছু নিয়ে যেতেই

হবে, যতক্ষণ বাড়ী থাকবো কাছ ছাড়বেনা। কিন্তু ক দিনই বা—হঠাৎ যেন বিষাদ নেমে এল। সামনের মেয়েটি প্রশ্ন করল, কেন? সংক্ষেপে বললেন, যা আমার বৌমাটি তিনি যে আলাদা হবেন সংগে সংগে আলোচনার বিষয় বস্তু পাল্টে গেল। এ মুহূর্তে বোঝা গেলনা যে এই আলোচনাগুলো নির্গত হচ্ছে চাকুরে মেয়েদের মুখ থেকে। শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার অভ্যাস সব একাকার হয়ে গেল চিরন্তনী মহিলা মজলিশে। প্রগতির মালমশলায় যে ব্যঞ্জনাই পরিপাক হোক না কেন স্বরূপ তার প্রকাশ পাবেই পাবে। আমি তো মন্থরা, মন্দ কথাই বলি কিন্তু কৌশল্যা সুমিত্রাদের প্রশ্ন করি এর ব্যতিক্রম সচরাচর তাঁদের নজরে পড়ে কি?

ইতি

মন্থরা

(৪ পৃষ্ঠার পর)

উপন্যাস নাটক কাব্য প্রভৃতি প্রকাশিত হবে, তা প্রকাশের পূর্বে বেঙ্গল একাডেমির অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে। কারণ সাহিত্যের নামে এই বাংলায় বর্তমানে যা কারবার চলছে তাতে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদের মান মর্যাদা রাখা দায় হয়ে পড়েছে। তাই সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য একাডেমির নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। তবে প্রয়োজন রয়েছে বলেই যে প্রত্যেক মাসে একজন করে গুণীজন সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে একাডেমির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হবে তাও আমরা চাইনা। আমরা চাই একাডেমি কর্মে ও চিন্তায় দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন করুক।

ছন্দিতা'র নববর্ষ সংখ্যা

বিশেষ সংখ্যা হিসাবে শীঘ্র প্রকাশিত হবে

এ সংখ্যায় লিখছেন—

প্রবন্ধ

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ কুমার সেন,
ডঃ রমা চৌধুরী, গৌরী ঘোষ,
হেনা চৌধুরী।

গল্প

কামরুল ইসলাম (বাংলাদেশ), সরসী সরকার,
নির্মলেন্দু গৌতম, ঊষা ভট্টাচার্য,
অনুবাদ গল্প —সুকৃতি রায়চৌধুরী।

কবিতা

গোপাল ভৌমিক, জাহিদ হায়দার (বাংলাদেশ),
আবু সঈদ জুবেরী (বাংলাদেশ), হেনা হালদার,
মাকিদ হায়দার (বাংলাদেশ), তমাল চট্টোপাধ্যায়,
সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে

এছাড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস, ফিচার ও অন্যান্য আরো অনেক রচনা

দাম—একটাকা

ছন্দিতা

৮ম বর্ষ ৮-৯ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৭১

ধারাবাহিক উপন্যাস

গল্প

কবিতা

প্রচ্ছদ শিল্পী

নিখিল বিশ্বাস

যুগ্ম-সম্পাদক

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

গৌরগোপাল দাশ

ছন্দিতার আগামী সংখ্যাগুলোর জন্য

ছোট গল্প, প্রবন্ধ, ফিচার ও কবিতা পাঠানোর জন্য নতুন লেখক লেখিকাদের আহ্বান জানাই।

আসামে বঙ্গাল খেদাও আন্দোলন

সম্প্রতি ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে আসামে যা ঘটে গেল সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তা যেমনি বেদনাদায়ক তেমনি মর্মান্তিক। ইতিপূর্বে ১৯৬০ সালেও এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে এক হিংস্র ও নক্কারজনক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছিল। এই সমস্যার মোদ্দা কথা হলো আসামে বসবাসকারী বাঙ্গালীদের সভ্যতা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটান। অসমীয়া জনগণ ভাবছেন অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীদের ব্যাপক প্রভাবে সমগ্র আসামে বাঙ্গালীরা আধিপত্য বিস্তার করে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবে। বঙ্গাল খেদাও আন্দোলনের এটাই হলো মূল কথা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে আসাম কংগ্রেস, সরকার প্রশাসনের যুগ্ম উৎসাহে। আমরা বহুবার শুনেছি যে ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় ভারতীয় নাগরিকগণ বসবাসের এবং মাতৃ ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চার অধিকারী। এটিই নাকি সংবিধান সম্মত ব্যাপার। তাই যদি হয় তবে আসামে নিরপরাধ বাঙ্গালীরা আর কতকাল বসে বসে মার খাবে? সবচেয়ে লজ্জা ও আক্ষেপের কথা হলো সমগ্র আসামে যখন বাঙ্গালী মা ভাই বোনেরা অপমানে লাঞ্ছিত, আক্রমণে বিব্রত, হিংস্র তাণ্ডবে সন্ত্রস্ত তখন আমরা বঙ্গ প্রদেশের বুদ্ধিজীবি শিল্পী সাহিত্যিক এবং উৎসাহী জনগণ একটা অদ্ভুত নীরবতা পালন করেছি। এটাই আমাদের নিজস্ব ট্র্যাডিশন। আর এই ট্র্যাডিশনের আড়ালেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতীটা (বাংলা দেশের জনগণ বাদে) অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে কিন্তু কারও দৃষ্টি নেই। আসামের এই ঘটনার ব্যাপারটি সম্প্রতি বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশনে যথারীতি উত্থাপিত হয়েছিল —কোন কোন সদস্য ক্রুদ্ধ বক্তব্য রেখেছিলেন—কিন্তু সমস্যা যেখানে ছিল আজও সেখানেই রয়ে গেল। মধ্যিখানে শুধুমাত্র সংবিধানের রক্ষা কবচটা পুনরায় পড়ে শোনান হলো, অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতেই হবে।

ভাষা দাঙ্গার নামে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। ইত্যাদি।...কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়েছে—কিন্তু যা শেষ হলো না সেটা হলো আসামে বাঙ্গালীদের উপর অকথ্য অত্যাচার। আজও সেখানে ষোড়শীরা ধর্ষিতা হচ্ছে, মায়েরা অপমানিতা হচ্ছেন, গৃহদাহ লুণ্ঠন ও ব্যাপক পরিকল্পিত অত্যাচারে বাঙ্গালীরা রিক্ত নিঃস। এই অরাজকতা বেশী দিন চলতে পারে না। আমরা আসামের কংগ্রেস, সরকার ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে গভীর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করছি—এই সর্বনাশা আন্দোলন অবিলম্বে বন্ধ করুন। বাঙ্গালীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন—প্রতিটি অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতিকার করুন—নইলে...নইলে এই বাঙ্গালী জাতি কিন্তু কাউকেই ক্ষমা করবে না।
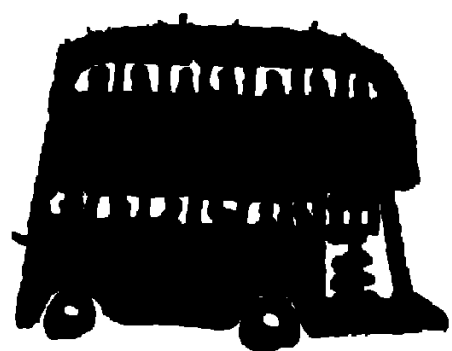
পুস্তক সমালোচনা

পত্র-পত্রিকা

স্বপ্ন : সম্পাদক—সরসী সরকার। পি-১৩২, সি, আই, টি রোড, কলকাতা-১০।

স্বপ্ন বার্ষিক সাহিত্য পত্র। ১৯৭২ সালের এটি শরৎ সংখ্যা। মূলতঃ নতুন লেখক লেখিকাদের এটি নিজস্ব কাগজ। প্রতিষ্ঠিত লেখকরাও এতে লিখে থাকেন, তবে আলোচ্য সংখ্যার সূচীতে ২/১ জন ব্যতীত সবাই নতুন। এবং এঁরা বাজারের বড় কাগজগুলো ছাড়া অন্য সব কাগজেই লিখে থাকেন।

স্বপ্ন'র আলোচ্য সংকলনটি ছাড়া আরো একটি সংখ্যা আমরা পেয়েছি। বোধহয় এটি দ্বিতীয় সংকলন। ছোট কাগজগুলোর মধ্যে স্বপ্ন খুব তাড়াতাড়ি তার নিজস্ব একটি স্থান করে নিতে পেরেছে। কাগজটির নিয়মিত সুষ্ঠু প্রকাশনা আশা করি।

শতাব্দীর সংলাপ : সম্পাদক—সত্যেন সাহা। ৭৪, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা।

শতাব্দীর সংলাপ নাটকের কাগজ—নাট্য আন্দোলনের মুখপত্র। সাহিত্য এবং সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকার ভীড়ে নাটকের উপর যতগুলো পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে সংলাপ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কাগজটির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

স্বপ্ন সবুজ : সম্পাদক—গোঁসাইলাল দে, সহ-সম্পাদিকা—গীতা চক্রবর্ত্তী। মিলন পার্ক, হুগলী। মূল্য—২০ পয়সা।

গল্প, কবিতা ইত্যাদির এটি একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটিতে 'সবুজ মেলা' শীর্ষক ছোটদের বিভাগ এবং সংবাদ পর্য্যায়ে 'বার্তা বিভাগ'-ও লক্ষ্য করা গেল। পত্রিকাটি পরিচ্ছন্ন।

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

(এগার)

রাতটা কোথা দিয়ে চলে গেল। ভোরের বেলা বেশ মনে আছে, আকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর ও ঘুমিয়েছে। সকালে ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। বেলা তখন প্রায় দশটা। অনিমেষ এসে ঘরে ঢুকলো। চোখে মুখে তার ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার ছাপ। অনিমেষকে দেখে বিমল অবাক হল।

এককালে অনিমেষের সঙ্গে ওর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। শুধু তাই নয়, অনিমেষের সততা আর সরলতার প্রতি ওর শ্রদ্ধা এবং স্নেহ ছিল। শ্রদ্ধা ছিল তার বলিষ্ঠ নিজস্বতার জন্য আর স্নেহ ছিল তার শিশুর মত সারল্যে।

অনিমেষই ছিল বিমলের একমাত্র বন্ধু যার কাছে মন খুলে দিতে পারতো অনায়াসে। গীতাকে নিয়ে ওর মনের প্রতিটি টানা পোড়েনের একমাত্র সাক্ষী ছিল অনিমেষ। সেই অণিমেষ আজ ওর পরম শত্রু। কৈ অনিমেষকে দেখে তো ওর কোন বিরাগ এল না, বিরক্তিও না। শুধু বিস্ময়।

—কি ব্যাপার অনিমেষ ?

—তোমাকে গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই। আশাকরি উত্তর পাব।

গম্ভীর আর খানিকটা যেন অফিসের ওপর ওয়ালার মত বলার ভংগী কিন্তু সে সব ছাপিয়েও ওর কণ্ঠস্বরে যেন অসহায় মনের দীর্ণ আকুলতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। যার ফলে বিমল রাগ করতে পারল না। শান্তসুরে হাসিমুখে বললো—

—বল কি জানতে চাও ? জবাব নিশ্চয়ই পাবে।

—তুমি কি প্রতিশোধ নিতে চাও ?

—প্রতিশোধ ? কিসের ?

—দেখ বিমল? গীতাকে তো আমি ছিনিয়ে নিইনি। সে নিজে থেকেই এসেছে আমার কাছে। তুমি বিশ্বাস কর। সে যখন বিবাহের প্রস্তাব তুললো তখন আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। অনেক বলেছি যে এটা সাময়িক অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বাস কর বিমল।

—তোমাকে কোনদিনই অবিশ্বাস করিনি অনিমেষ। আজও না।

—জান গীতা আমাকে কি বলেছিল?

—সে কথা বাদ দাও ভাই, আজ আর পুরোনো কথা তুলে কোন লাভ নেই।

—না, না. তোমাকে শুনতেই হবে। না হলে চিরদিন তুমিও আমাকে ভুল বুঝে থাকবে। আমাকে হাল্কা হতে দাও বিমল। যেদিন পাগলের মত আমাকে গিয়ে গীতা বললে "আমাকে বিয়ে করবে অনিমেষ?' সেদিন ভেবেছিলাম ও ঠাট্টা করছে। ওর রসিকতা তো বাঁধা ধরা নিয়ম মেনে চলতো না। কিন্তু যখন দেখলাম ওর চোখে জল, সে জল না মুছেই ও বলেছিল—প্রশ্ন কোরনা অনিমেষ 'শুধু, বল আমাকে বিয়ে করতে পার কিনা?' তখন আমি তাকে একটি মাত্র প্রশ্নই করেছিলাম, সে তোমার কথা—তার উত্তরে গীতা বলেছিল, "অনিমেষ তোমাকে আমি ঠকাব না। তাকে ভালবাসি সত্যিই কিন্তু তাকে বিয়ে করা যায় না। এ কথা জেনেও তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে কি না বল?" সত্যি বলছি বিমল একবার মনে হল বলি—'যদি না করি।' কিন্তু পারলাম না সে কথা বলতে কারণ সেই মুহূর্তেই আবিষ্কার করলাম যে আমিও তাকে নিজের অজান্তেই কবে ভালবেসে ফেলেছি।

বিমল হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে।

—ওকি হাসছ কেন অমন করে?

এ হাসির জন্য প্রস্তুত ছিল না অনিমেষ। এ হাসির মানে ও ধরতে পারছে না। নিজের মনেই বলে চলে,—জান বিমল! সেই মুহূর্তে একটা আশ্চর্য্য রকমের আশা আর হতাশা দুই আমার মনকে যেন অসাড় করে দিল। তোমার কথা মনে হল। মনে হল এমন কি কারণ থাকতে পারে যাতে ও তোমাকে বিয়ে করতে পারে না! তোমার প্রতি সন্দেহ হল। মনে মনে তোমাকে স্কাউণ্ড্রেল বলে গালাগালি দিলাম। তোমার ওপর কি সেদিন অবিচার করেছিলাম বি[illegible]! ও যে আমাকে সত্যিই ভালবাসতে পারেনি

সেটা তো আজ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। কিন্তু কেন ও আমাকে এমন সর্বশান্ত করে দিয়ে গেল বলতে পার? প্রথম যেদিন চলে গেল মনে হল এ একরকম ভালই হল। প্রতি পদে পদে মতের অমিল। প্রতিটি মুহূর্তে দুর্ভার। কিন্তু ও চলে যাবার পর বুঝছি ওকে না হলে আমার চলবে না। এ অসীম শূন্যতায় আমি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি। নিজেকেই নিজে চিনতে পারছি না, বুঝতে পারছিনা। আমার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। একটা কঠিন উদাসীনতা আমাকে নিষ্পেষণ করছে। ভাবছ যদি উদাসীনতাই এল, তবে আবার নিষ্পেষণের কথা ওঠে কেন? আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না বিমল। শুধু এইটুকুই বোঝাতে পারছি যে আমি তাকে ভালবাসি, আমি তাকে চাই। আমি আর পারছিনা। দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকা দিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাথাটা টেবিলের ওপর আর আহত প্রাণীর মত তার জবরদস্ত দেহটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করল।

—তুমি নিশ্চয়ই জান সে কোথায়? সে নিশ্চয়ই তোমার কাছেই এসেছে?

—অত্যন্ত উদাসীন ভাবেই জবাব দিল বিমল?

—অনিমেষ যে আশ্রয়টাকে সে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে সেখানে ফিরে যাবার মেয়ে নয়। তবে একটা খবর তোমাকে দিতে পারি। সে এখন ভয়ানক বদলে গেছে।' উপস্থিত এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে সে আছে। সেখানে গ্রাম সংস্কারের কাজে সে ব্যস্ত রয়েছে। নিজেকে হয়তো ঠিক বুঝতে পারছে না। আর আমিও বুঝতে পারছিনা সে কি চায়। মেয়েরা যখন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে তখন শিবেরও সাধ্য নেই তাকে বোঝায়। আমার ঠিকানা কি করে যোগাড় করেছিল জানিনা। হঠাৎ আমার কাছে এল বললে,— অনিমেষ আর টুটুল রইল আর রইলে তুমি। আমি এই বারটা পঞ্চান্নর ট্রেনে রওনা হচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানতে চেওনা। —আমি কিছুই জানতে চাইনি। ঘড়িতে তখন এগারটা তিরিশ। ঘড়িটা দেখালাম। বল্লে, "হ্যাঁ আর সময় নেই, চলি। তারপর বল্লে, কৈ কিছু জানতে চাইলে নাতো? —সে কথার জবাব দিইনি। সে যখন সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছে। ঘরে চাবি লাগিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। একবার জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছি। বল্লাম, তোমার সঙ্গে। ভয়ানক আপত্তি জানাল, কিন্তু আমি শুনিনি। ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করলাম। জানিনা। রেগে গেল না

খুশী হল। যেখানে গেলাম সেখানকার নাম, চণ্ডীপুর।" কেন যে ও নাম তা জানিনা। ষ্টেশনে নেমে ভেতরে যেতে হয় অনেকখানি। সন্ন্যাসী একাই থাকেন। গ্রাম সংস্কারের কাজের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেই বিজ্ঞাপন দেখেই গীতার এই অভিযান। জান অনিমেষ! কাজের মধ্যে সে একেবারে ডুবে গেছে। দেখলে অবাক হতে হয়। অনিমেষ প্রশ্ন করে—

—খাওয়া দাওয়া কিরকম ?

—খুবই সাধারণ।

—জিনিষপত্র তো কিছুই নিয়ে যায়নি।

—তাতো দেখলামই।

—বিছানা মাদুর ?

—বোধ হয় একটা মাদুর।

—শীতকালে কি হবে ? এ কথার জবাব বিমল দিতে পারল না। মায়া হল মানুষটার ওপর।

—তুমি কি বল বিমল ? আমি একবার যাব ?

—ভেবে দেখ।

—তুমি কি আর গিয়েছিলে পরে ?

—হ্যাঁ কালই তো গিয়েছিলাম। কাল যে ওদের লাইব্রেরীর উদ্বোধন হল! আমার মনে হয়, অনিমেষ ঠিক এই মুহূর্তে তোমার না যাওয়াই ভাল। এ কাজে যখন ওর ক্লান্তি আসবে, টুটুলের জন্য মন যখন খুবই অস্থির হবে তখন ও নিজেই ফিরে আসবে।

—মাঝে মাঝে আমি আসব বিমল। ওর খবর নেবার জন্যে। তুমি বিরক্ত হবে না তো ?

—না না, বিরক্ত হব কেন ? নিশ্চয়ই আসবে যখন খুশী।

সেদিন ডাক্তার গিন্নীর বাড়ীতে যখন গীতা পৌঁছল তখন সেখানে আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন। গীতাও তাই চেয়েছিল। তাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করে কুমকুম ভেতরে নিয়ে বসাল। পুরুত গিন্নীর সংগে আলাপ করিয়ে দিল। বয়োজ্যেষ্ঠা ভদ্রমহিলা দেখে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল কিন্তু ভদ্রমহিলা সভয়ে চেচিয়ে উঠলেন। অপ্রস্তুত হল কুমকুম। বিপন্ন মুখে বললে—উনি ভাই একটু আচারী বিচারী মানুষ। পুরুত গিন্নী

হাসিমুখে বল্লেন,—কিছু মনে কোরনা মা, আমাকে তো আবার বেশীর ভাগ সময়েই ঠাকুর ঘরের কাজ করতে হয়। গীতা ভাবল ওর ঠাকুরমাও তো পুজো আর্চা করেন। কিন্তু এরকম তো নন। অবশ্য তিনি কোলকাতার মানুষ। আর এঁরা অজ পাড়াগাঁয়ের, এই কথাটা মনে করে গীতা যেন কিছুটা স্বস্তি পেল।

হেডমাষ্টার মশাইর স্ত্রী ছিলেন কুমকুমের চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। কুমকুম তাঁকে দিদি বলেই ডাকে। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—

—কাল ওঁর মুখে শুনলাম সব। তা আপনারা তো বেশ ভাল কাজই করছেন ভাই। উনি তো কেবল বলেন 'তোমরা এক একটা জড়পিণ্ড। না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে কিছু। হ্যাঁ ভাই আপনার শ্বশুর বাড়ী কোথায়? গীতা মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল।

—কোলকাতাতেই।

—তা তোমার শ্বশুর শাশুড়ী তোমাকে ছেড়ে দিলেন? তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরনা ভাই। তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট।

—না, না, বেশ তো! তুমিই তো বেশ ভাল।

—হ্যাঁ তা যা বলছিলাম। ছেড়ে দিলেন তাঁরা তোমাকে?

—তাঁরা তো নেই।

—ওঃ

এদিক ওদিক মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলেন সকলে। দলের মধ্যে সকলের আড়ালে একটি ছোট্ট বউ বসে ছিল। বোধ হয় সদ্য বিবাহিত। যতবার তার দিকে চোখ পড়ছে দেখে সে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি যেন কিছু বলতে চায়?

অনন্তবাবুর কিছু জোৎজমি আছে। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সচ্ছল অবস্থা তাঁরই। এই বৌটি তাঁরই পুত্রবধূ। মেয়েটির স্বামী কোলকতার মার্চেন্ট অফিসে কাজ করে। সপ্তাহান্তে বাড়ী আসে। অনন্তবাবুর স্ত্রী মোটাসোটা। এক গা গহনা পরা প্রথম থেকেই বাঁকা চোখে দেখেছিলেন গীতাকে। বৌএর দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়ে নিয়ে বল্লেন—

—তা যা বল মা, ঘর সংসার ছেড়ে এখন এসব কাজে আসাটা তোমার উচিত হয়নি। শুনেছি তোমার মেয়েও আছে একটি। দেখ মা মেয়ে মানুষের কাছে স্বামী পুত্রই সব।

গীতা জানে এইসব প্রশ্নবান ও উপদেশের মধ্যে দিয়েই তাকে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। দারোগা গিন্নী হঠাৎ বলে উঠলেন—

—স্বামীর বুঝি তেমন রোজগার নেই গা ?

গীতার কান দুটো গরম হয়ে ওঠে।

—না, তা নয় আপনাদের আশীর্বাদে রোজগার তাঁর কম নয়, কিন্তু আমরা সবাই যদি ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাহলে আমাদের ভালমন্দর কথা কে ভাববে বলুন তো ?" গীতা যদি লক্ষ্য করতো তো দেখতে পেতো দারোগা গিন্নীর গায়ে চিমটি কেটে পুরুত গিন্নী চাপা গলায় বলে উঠলেন, "আমরণ।" গীতা বলে বলেছে

—আপনারাই তো বলেন মেয়ে ইস্কুলে মেয়ে টিচার নেই বলে তাদের ইস্কুলে পাঠাতে পারেন না। আমি যদি একটা মেয়ে ইস্কুল খুলি আর সব মেয়ে মাষ্টার নিয়ে আসি তাহলে কি গ্রামের পক্ষে মঙ্গল হবে না ?

অনন্ত গিন্নী আর একবার অপাঙ্গে বৌএর দিকে চেয়ে নিয়ে বল্লেন—

(ক্রমশঃ)
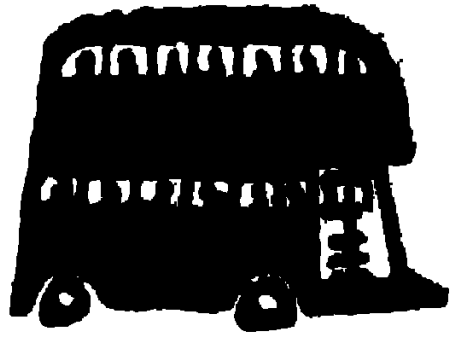
মনন

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বইটি একজন বিদেশী লেখকের মূলখণ্ড। অনুবাদ এখনও বের হয়নি। ছোট ছোট গল্পের সংকলন—যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মিল নেই অথচ সব মিলিয়ে নাকি একক উপন্যাস। বাবা, মা, মেয়ে, ছেলে সবাই আছেন এক একটি গল্পের জবানিতে অথচ প্রত্যেকেই নিঃসম্পর্কিত। কার বাবা কার মা কার মেয়ে কার ছেলে তার উল্লেখ নেই। এই নাকি আধুনিক গল্পের কাঠামো—হাই তুলল সুমিতেশ। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, এক কাপ চাও জোটেনি আজ। অথচ বাইরে বৌদির গলা পাওয়া যাচ্ছে। ছেলেকে পড়াচ্ছে কিম্বা তাড়াচ্ছে।

মাথার মধ্যে চিন্তার জটগুলো খুলছে। একরাশ নীল নীল বুদ্বুদ চোখের সামনে। টিউশনির টাকাটা এখনও বাকী রেখেছে। তাহোক পারে তো কাল শকুন্তলাকে নিয়ে কফি হাউসে ওর পয়সায় কিছু খাওয়া যাবে।

উঃ মাথার যন্ত্রণাটা যেন বাড়ছে। টাকাটা পেলে একটা সার্ট কেনা যেত। শকুন্তলা ওর সার্টটার দিকে কেমন করে যেন দেখে। হাসি পেল। কিন্তু আওয়াজ বেরুলনা কেন?

শকুন্তলা আজ একটি সমুদ্র নীল সাড়ী পরে এসেছিল। ওর গভীর ছটো চোখ থেকে ঝরে পড়ছিল স্বপ্নিল একটা দ্যুতি। ওর সান্নিধ্যে কেমন একটা মোহময় আবেশ আছে। আকর্ষণ করে। সেই ক্ষণিকের সান্নিধ্যটা যদি আরও দীর্ঘতর করা যেত। অথচ ও তো একা ছিল না, রঞ্জিত, সুখময়, এলা সবাই ছিল। তবুও শকুন্তলাই ওদের মধ্যমণি, আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওর ঐ হেঁয়ালির চরিত্র। ও কাছের মানুষ না দূরের ক্ষণে ক্ষণে বোঝা যায় না।

আচ্ছা ঐ নীল নীল বুদ্বুদগুলো ওর সাড়ী থেকে ঝরে পড়ছে না! মনে হচ্ছে শকুন্তলার সাড়ী আর শকুন্তলা নিজে গলে গলে বুদ্বুদ হয়ে যাচ্ছে। অথচ হেসে যাচ্ছে সমানে আর হাতছানি দিয়ে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে—সুমিতেশকে বলছে "এস" "এস" "এস না [illegible] একটু"। সুমিতেশ হাবুডুবু

যাচ্ছে বুদ্বুদের সমুদ্রে, ভারী শরীরটা নড়ছে না। আঃ শকুন্তলা মিলিয়ে গেল মুখে সেই হাসি, সুমিতেশ ধরতে পারলনা। কেউ পারল না—এলা, মদন, সুখময় কেউ না।

ভারী শরীরটার মধ্যে মনটা আবার শুনতে পেল বৌদির গলা, ছেলেকে আদর করছে এবার। সুমিতেশের মার কথা মনে হল। ছোটবেলায় এলোচুলে লালপাড় সাড়ী পরে সারা কপাল রাঙা সিঁদুরে মেখে মা যখন রান্নাঘরে কাজ করতেন সেও তো তখন এরকম জ্বালাতন করত, আদর খেত। আজ আর ২০।২২ বছর আগেকার সেই দিনগুলোর সঙ্গে কোন মিল নেই। আজ মার কাছে যেতে ভয় করে, উত্যক্ত লাগে।

দপ্ দপ্ করছে যন্ত্রণাটা—নীল বুদ্বুদের সারিগুলো যেন বাড়ছে। উপন্যাসটা মনে পড়ল। বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে সবাই আছে অথচ কারও মধ্যে সম্পর্ক নেই। কার বাবা কার মা কে জানে। গল্পগুলোর লাইনে পর্যন্ত মিল নেই। কিন্তু বইটার কাটতি আছে—প্রকাশক আর লেখকের পয়সার পাহাড় জমছে।

তার, দাদার, বৌদির, মার, ভাইপোর, শকুন্তলার কোন লাইনে মিল নেই, সম্পর্ক নেই। দিনান্তে দেখা হয় নাকি সন্দেহ। এই নাকি আধুনিক সমাজের intellectual development ! পাশের লোককে চেনা অকৌলীন। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র, জগত নিজস্ব। তাই এর চলন বেশী।

চা বোধহয় আজ আর পাওয়া যাবে না।
কটা বাজল কে জানে !
জ্বর আসছে বোধহয় !!

intellectual development ! সামনের মাসে বৌদির হাতে টাকা না দিলে থাকাও বোধহয় হবে না।

কাল যদি দাদাকে দুধ আর বাজার আনতে বলে তবে দাদার ঐ কোমল কোমল ভালমানুষী হাসিটা চোপসান বেলুনের মত বদলে যাবে।

শকুন্তলার কাছে যদি কাল একশটা টাকা চায় তবে ওর সুরেলা গলাটা দিয়ে কি আর সুর ঝরবে !

আঃ ! লাল নীল বুদ্বুদগুলো যেন বড্ড জ্বালাতন করছে। আসছে যাচ্ছে আর সুমিতেশকে ধাক্কা দিয়ে বলে যাচ্ছে। এত বিরক্ত মনটা তবু ওদের তাড়াতে পারছে না। আসছে যাচ্ছে—উপন্যাসটার পাতা উড়ছে আর

চেতনাটা চমকে উঠছে বার বার। আধুনিক উপন্যাস—আধুনিক জীবন! গতি-প্রাণ-সম্পর্ক! পয়সা-মোহ-জীবন! চাই অনেক টাকা, অনেক অনেক! তাহলে পৃথিবীর রূপটা বদলে দিতে পারবে। শকুন্তলার হেঁয়ালী অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দাদার হাসিতে স্নেহ থাকবে; আর —আর সারা পৃথিবী শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত রঙে রঙে রঙীন হয়ে উঠবে।

অসহ্য যন্ত্রণা বাড়ছে।

কড়াটা খুব জোরে কে নাড়ছে। আবার উঠানে। টেলিগ্রাম! সুমিতেশের। বেড়ালের ভাগ্যেও তবে শিকে ছেঁড়ে। একটা কাজ জুটেছে মোটামুটি। কলকাতার বাইরে—তবুও তো একটা কিছু।

বৌদির গলা শোনা যায়, সুমিতেশ চা খেয়েছে কিনা খোঁজ করছে৷ ভাইপোটা হঠাৎ আজ কাছে এসে বসেছে। কাকুকে নাকি তার রাজা রাজা মনে হচ্ছে। দাদার হাসিটা যেন আরও প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

খবর পেলে কাল সকালেই শকুন্তলার ফোন আসবে। চার মাস বাদে আবার ব্যক্তিগত কুশল প্রশ্ন করবে। ফোনটা দাদার নামে—দাদার ঘরে। চারমাস বাদে—আবার পাশের ঘরে যাবে। বৌদি আদো আদো করে বলবে "ঠাকুরপো ভারি দুষ্টু হয়েছে—খাওয়া দাওয়া ছেড়েই দিয়েছে।"

এর নাম affection—সামাজিক সম্পর্ক। অনেকদিন আগে যখন বন্য মানুষেরা ঘুরে বেড়াত দলবেধে আত্মরক্ষার জন্য তখনই তারাঘর বাঁধার বৃহত্তর প্রয়োজনে সমাজ গড়েছিল আর গড়েছিল পরিবার। এই স্নেহের সন্ধান পেয়েছিল বোধ হয়। পরস্পরের প্রয়োজনে তো পরস্পরকে দরকার হয়।

দাদা-বৌদির-শকুন্তলার মুখের মিষ্টি হাসিগুলো বিষাক্ত লাগছে। টাকা এলেই এবার সামাজিক সম্পর্ক বাড়ছে। সমাজের বিবর্তন হচ্ছে—হচ্ছে intellectual development.

মাসের প্রথমে মাইনে পেলে দাদা-বৌদি-শকুন্তলার জন্য খরচে খানিকটা বেরিয়ে যাবে। বিরক্ত লাগছে। মাথাটা বুঝি আবার ধরল।

ভাইপোটা এখনই বায়না ধরছে পুতুল কিনে দিতে হবে। বৌদির জন্য তো একটা শাড়ী চাইই আর মার ঠাকুরের মিষ্টি। শকুন্তলার জন্য কিছু না কিনলে কি চলবে। আর সঙ্গে থাকার জন্য সুখময়, এলা, রঞ্জিতদেরই বা কি করে

[illegible] যায়। না দিলে কথা। সুমিতেশের মনে হতে লাগল সারা দুনিয়াটা হাত বাড়িয়ে ওকে ঘিরে ধরেছে। সারি সারি জোড়া জোড়া হাত বিক্ষুব্ধ ভাবে বলছে দাও-দাও-দাও, আমাদের দাও।

কি বীভৎস দৃশ্য।

আঃ স্বপ্নগুলো সব ঝরে পড়ছে। নীল বুদ্বুদগুলো মিলে গিয়ে নীল ঢেউ হয়ে উঠেছে। সুমিতেশকে বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দাদা-বৌদি-ভাইপোটা-শকুন্তলা ঢেউ-এ পাক খাচ্ছে। তাদের মুখে একবার প্রসন্নতার হাসি একবার বিরক্তির। ঢেউ এর ওপর ঢেউ আসছে। কারা যেন দূরে হাতছানি দিচ্ছে—প্রেতাত্মার মত দৃষ্টি। কি ভাবছিল? কে জানে মনে পড়ছে না। এরা কারা? উঃ যন্ত্রণাটা যেন মাথার থেকে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। ঢেউ উঠছে পড়ছে। ঐ সুমিতেশের মুখটা দেখা যাচ্ছে—রুক্ষ চুল, ঘরে কাচা জামা, বিষন্ন মুখ। কই না! এই তো বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে—হাসিখুশি স্বচ্ছল সংসার। আঃ আবার বুঝি ব্যথাটা বাড়ল। সুমিতেশকে কিরকম অক্ষম লাগছে—জরাগ্রস্তের মত। তরুণদের চোখে অবহেলা-ঘৃণা-অবজ্ঞা। অক্ষমতার পাপ।

শেষ নেই সীমা নেই। ঢেউ উঠছে পড়ছে।

নীল বুদ্বুদের সারি ভেসে যাচ্ছে।

যন্ত্রণায় অচৈতন্য সুমিতেশ।

বিদেশী গল্পের বইটার পাতা উড়তে থাকে পাশে। বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে; কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই।

আধুনিক গল্পের হেঁয়ালী উদ্ধার করে পাঠক।

আধুনিক জীবনের হেঁয়ালী উদ্ধার হয় না।

কিন্তু ভোরের আলো রোজের মত আজও ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে মিষ্টি হেসে।

তাতে কোন হেঁয়ালী নেই ॥*

* বরোয়া বৈঠক সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত ছোট গল্প প্রতিযোগীতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।

কৃষ্ণচূড়া

ভারতী নিয়োগী

কৃষ্ণচূড়াকে আমি ভালবাসি,
লাল লাল থোকা থোকা,
পার্কের চারিদিকে গাছগুলো,
হৃষ্টপুষ্ট দেহ নিয়ে ; হাসি হাসি
মুখ দিয়ে অভ্যর্থনা জানায় সকলকে ;
বিকেলের পড়ন্ত রোদে
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি,
পার্কের কোণে বসে।

যতক্ষণ পারি দেখি ওদের।
আরও মিষ্টি দেখায় কৃষ্ণচূড়াকে
থাকে যখন রাধাচূড়কে পাশে নিয়ে।
ওদের মিষ্টি হাসি পথচারীদের আকর্ষণ করে।
যখন বিকেল গড়িয়ে আসে,
ওদের লাল রং আরও গাঢ় হয় ;
গাঢ় হয় পৃথিবীর বুকভরা অন্ধকার ;
আমি তখন আস্তে আস্তে উঠে আসি,
পৃথিবীর স্তব্ধতা তখন উপলব্ধি করি,
নিঃসঙ্গ, একাকী আমি ফিরে আসি 'শূন্যমনে।'
ওরা যথারীতি বাতাসে আন্দোলিত হয়,
গাছের পাতায় ঝিরিঝিরি শব্দ
কানে নিয়ে চলে আসি।

আলো

দীপক মৈত্র

জোনাকি অন্ধকারে কাঁদে
পথ তার গেছে চলে সুরঙ্গের আরো অন্ধকারে
নিঃসীম শূন্যতার মাঝে
ওরা এসেছিল জোনাকির জলন্ত আলোয়
একদিন—কোন এক ভোরে।
তারপর নামে রাত
অরণ্যের গা বেয়ে সাপের মত
হোঁচটের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে—
কাঁচের তৈরী চিন্তার জানালায়;
—পাখীর ডাক স্তব্ধ ধমকে।

ছিঁড়ে যায় স্বপ্নের জাল
ঝরে পড়ে গোলাপের কুঁড়ি
ভেসে যায় সাগরের অশান্ত ফেনিল
   স্বপ্নালু অরণ্য ছায়ায়।
জোনাকিরা আলো জ্বেলে দেখে
ঝিকিমিকি নক্ষত্র অনেক
—আলেয়ার আলো,
তাদের দেহের ছায়া তির্যক হোয়ে
ছড়িয়ে পড়ে এই পথের ধুলায়।

বর্ষ নয় সংখ্যা এক
Vol. 9 No. 1

ছন্দিতা

বৈশাখ ১৩৮০
April 1973

নববর্ষ ১৩৮০ সংখ্যা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গল্প

অনুবাদ গল্প

কবিতা

ফিচার

রম্য রচনা

প্রচ্ছদশিল্পী
কুমারঅজিত

যুগ্ম-সম্পাদক
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় গৌরগোপাল দাস

সম্পাদকীয় দপ্তর
বি-৫১, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা—৭০০০১৮

সবারে করি আহ্বান

নতুন বর্ষ সূচনায় প্রথমেই জানাই অগনিত পাঠক পাঠিকা লেখক লেখিকা এবং বিজ্ঞাপন দাতাদের আমাদের সশ্রদ্ধ প্রীতি ও শুভেচ্ছা। কামনা করি সকলের ব্যক্তিগত সুখ সমৃদ্ধি। এই নতুন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দিতা ও নয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করলো। লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে এটি একটি অভূতপূর্ব ও আশ্চর্য্যজনক ঘটনা বলতে হয়। সীমিত সহায় সম্বল হাতে নিয়ে, ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা ছন্দিতার দীর্ঘায়ুর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি—আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টায় আপনাদের সকলের অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশা নিয়ে এই নব বর্ষ সংখ্যা তুলে দিলাম—আশা রাখবো যে মমত্ববোধ নিয়ে ছন্দিতাকে এতকাল পৃষ্টপোষকতা করেছেন তা যেন সে চিরকাল পায়।

তারাশঙ্করের অপ্রকাশিত পত্র

এই কবিতাটি প্রথমা ও সবথেকে আদরের দৌহিত্রী শকুন্তলার জন্মদিনে দাদু তারাশঙ্করের উপহার। উভয়েরই জন্ম একই দিনে—৮ই শ্রাবণ। মানসিকতায় দিক থেকে এই দৌহিত্রী অনেকাংশে তারাশঙ্করের সমধর্মী। আবার, পরিণত বয়সে এই প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক যখন ছবি আঁকায় মেতে ছিলেন, রঙতুলি হাতে—এই দৌহিত্রীই রূপরসের জগতেও তার দাদুর যোগ্য সঙ্গিনী হয়েছিল। পত্রাকারে লেখা এই কবিতাটি আমরা অধ্যাপিকা শকুন্তলা ভট্টাচার্যের (কবিতায় উদ্দিষ্ট দৌহিত্রী) সৌজন্যে পেয়েছি। – যু: স:

শ্রীমতী শকুন্তলা

(আমার) সকল মালা তোমার তরে—
তাই তো তুমি আমার ঘরে
এসেছিলে বেছে বেছে আমার জন্মদিনে—
যা কিছু মোর এই ভুবনে
যা কিছু মোর গোপন মনে
এক টুকরা হাসির দামে সব নিয়েছ কিনে।
তোমার জন্ম দিনেতে তাই—
আমার মালা তোমায় পাঠাই—
একটুখানি হাসি যে চাই তাহার বিনিময়ে—
আমার যুদ্ধে বিজয় হবে-তোমার জগৎ জয়ে।

দাদু—
৮ই শ্রাবণ ১৩৭২

নববর্ষ সম্বন্ধে দুই কবি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

নববর্ষের বিশেষ সংখ্যার জন্য নববর্ষ সম্বন্ধে রচনাই প্রশস্ত। সুতরাং নববর্ষ সম্বন্ধে দুজন বিশিষ্ট কবি কি ধরণের চিন্তা করেছেন তা আলোচনা করবার প্রস্তাব করি। তাঁরা হলেন ইংরেজ কবি টেনিসন, যিনি বৃটিশ সম্রাটের সভা-কবি ছিলেন এবং আমাদেরই একান্ত আপন জন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টেনিসন রচিত কবিতার নাম 'Ring Out Wild Bells' এবং রবীন্দ্রনাথ রচিত কবিতার নাম 'বর্ষশেষ'। এই দুই কবিতার সংক্ষিপ্তভাবে একটি তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় হবে।

টেনিসন রচিত কবিতার মর্মকথা হল পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল অনাচার, সকল অশান্তি বিদায় নিক এবং নূতন বৎসর সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি এবং আনন্দ ডালি ভরে এনে আমাদের উপহার দিক। অতি মহৎ কল্যাণধর্মী চিন্তা তাঁর বিষয়। আগামী নূতন বর্ষ সর্বজনীন মঙ্গল সাধন করুক, এই হল কবির প্রার্থনা।

বিশ্বের মানুষের জন্য তিনি নূতন বৎসরের কাছে যা প্রার্থনা করেছেন তাতে অতি উচ্চ আদর্শের চিন্তা আছে। যে দুঃখ মনকে নিস্তেজ করে দেয়, যে বিবাদ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘাত আনে, যে দলাদলি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, যে লোভ মানুষের মনকে সংকুচিত করে পুরাতন বৎসরের সঙ্গে তাদের বিদায় দিতে চেয়েছেন :

Ring out : the griep that saps the mind,
fend of rich and poor,
ancient forms of party strife,
narrowing lust for gold.

অপরদিকে নববর্ষের সঙ্গে যাদের তাঁর কবিতায় স্বাগত জানিয়েছেন তাও মহৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত! তিনি চেয়েছেন সমগ্র মানবজাতির দুঃখের

প্রণোদন, মহত্তর জীবনের প্রেরণা, সত্য ও ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পৃথিবী সহস্রবৎসরস্থায় শান্তি :

> Ring in : redress for all mankind,
> nobler modes of life,
> love of truth and right,
> thousand years of peace.

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষ শেষ' কবিতাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে লেখা। তার প্রেরণা হল চৈত্র সংক্রান্তিতে এক দুরন্ত ঝড়ের আবির্ভাব। তিনি নববর্ষকে সম্বোধন করে বলছেন :

> এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ হিল্লোলে
> পুষ্পদল চুমি, —
> এবার আসনি তুমি মর্মরিত কূজন গুঞ্জনে,—
> ধন্য ধন্য তুমি।

ঝড়ের এই ভীষণ মধুর মূর্তিখানিই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাই তাকে প্রাণ ভরে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। বসন্তের পরিবেশে আগমন মনকে দোলা দেয় ; কিন্তু এই রুদ্রবেশে আবির্ভাব হৃদয়কে নাড়া দেয়।

ফলে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর মনে। তাঁর ইচ্ছা জেগেছিল ঝড় তাঁকে প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি হতে মুক্তি দিতে তার বুকে তাঁকে টেনে নিয়ে তুলুক :

> শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
> শরমের ডালি,
> নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমাঙ্কিত কালি,
> লাভক্ষতি টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
> কলহ সংশয়—
> সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
> দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥

এই মর্মান্তিক দৈন্যদশা হতে মুক্তির জন্যই তিনি চেয়েছিলেন ঝড় তাঁকে বুকে টেনে নিক ; ফলে মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি হওয়াও বেশী বাঞ্ছনীয় :

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করি ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে॥

সুতরাং আমরা পাচ্ছি দুই কবির দুই ভিন্ন সুর। টেনিসন যা-কিছু অবাঞ্ছনীয় তাকে বিদায় দিয়ে সর্বজনীন কল্যাণকে আহ্বান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কিন্তু সে পথে যায়নি। ঝড়ের রুদ্ররূপ তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে এবং প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি হতে মুক্তির জন্য তার কাছে ক্রোড়ে আত্মাহুতি দিতে চেয়েছেন। এর মধ্যে নূতন বৎসরকে স্বাগত জানানো অপেক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা হতে নিষ্কৃতিলাভই তাঁর বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উভয়েই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করেন। একজন 'পোয়েট লরিয়েট', অন্যজন 'নোবেল লরিয়েট'। টেনিসন-এর চিন্তা স্বাভাবিক পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা অপ্রত্যাশিত পথ ধরেছে। একই বিষয় বিভিন্ন কবির হৃদয়ের কোন তারে ঝঙ্কার তোলে তা বলা যায় না। কবিদের মন এমন ভাবেই বিচিত্র পথে চলে।

একটি ঘোষণা

ছন্দিতায় প্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাস 'নিঃসঙ্গ জনতা' আগামী তিন/চারটি সংখ্যাতেই সমাপ্ত হবে। তারপরও আমরা ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশ করব। ধারাবাহিক প্রকাশে ইচ্ছুক লেখক লেখিকাদের উপন্যাস পাঠাতে আহ্বান করা যাচ্ছে।

যুগ্ম-সম্পাদক

বঙ্গ রঙ্গালয় ও বাংলা নাটক

রণজিৎ কুমার সেন

'দি থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি অব বাগবাজার' পরবর্তীকালে পেশাদার থিয়েটারে পরিণত হয়। পূর্বে বড় বড় ধনীদের বাড়িতে নাটকানুষ্ঠান হওয়াতে দরিদ্র জন সাধারণ আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু এবারে তাঁদের টনক নড়লো। বাগবাজারের এ্যামেচার থিয়েটারের দল এই বিদ্রোহের অগ্রনী। তারা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে জনসাধারণের জন্য অভিনয় করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতিকে নিয়ে এই এ্যামেচার দল গড়ে উঠলো। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল যাত্রার আকারে অভিনয়াদি করা, কেননা তাতে বেশী দৃশ্য পরিবর্তনের দরকার হয় না। তাঁরা মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু করলেন। এতে দলের সাহস ও উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এঁদের দ্বিতীয় নাটক 'সধবার একাদশী'। ক্রমে গিরিশচন্দ্রই এই দলের নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। 'সধবার একাদশী' নিয়েই বঙ্গীয় জননাট্যশালার উদ্বোধন হয়। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। এই দলের পরবর্তী নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। কিন্তু বাঁধা স্টেজের অভাবে দলের আসর ভালো ক'রে জমলোনা। সুখের বিষয়, Maclean নামে এক ইংরেজ নাবিক এসময়ে তাঁদের সাহায্যে আসেন।

যোগেন্দ্রনাথ নামে এক ছাত্র এক অস্ট্রেলিয়ান থিয়েটার পার্টির কাছে এসময়ে নানাবিধ স্টেজ-কৌশল শিখবার সুযোগ পায়। গিরিশচন্দ্রের বন্ধু ব্রজবাবু স্টেজের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এই ভাবে কাজ যখন অনেক দূর অগ্রসর হয়, তখন টিকিট বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়। ফলে গিরিশচন্দ্র দল ত্যাগ করেন। অপরপক্ষ কিন্তু তখনও পিছু হটলেন না, দলের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করলেন 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি'। তাঁদের প্রথম অভিনীত নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন'। অমৃতলাল বসু এই অভিনয়ে এসে

'সৈরিন্ধ্রী'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর নাট্যশিক্ষার হাতেখড়ি অর্ধেন্দু-শেখরের কাছে, আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁর মনুষ্যত্বের গুরু। কিন্তু এত তোড়জোড় সত্ত্বেও ন্যাশনাল বেশীকাল স্থায়ী হলোনা; 'অমৃতবাজার পত্রিকা' —সম্পাদক মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ রচিত 'নয়শো রুপেয়া' নাটক অভিনীত হবার পর কয়েক রাত্রি 'কৃষ্ণকুমারী', 'ভারত মাতা', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি নাটক চললো এবং ক্রমে দল ভেঙ্গে গেল। ঢাকায় তখন 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' বেশ নাম করেছে। দেখাদেখি ন্যাশনালও ঢাকায় গিয়ে অভিনয় শুরু করেন। পরে দু'টি দল মিলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রধান উৎসাহী ছিলেন ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ। কমিটিতে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী। মাইকেল মধুসূদনই স্থায়ী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করতে এবং স্ত্রী অভিনেত্রী গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে বলেন: তোমরা গোঁফদাড়ি কামানো ব্যাটাছেলেকে স্ত্রীলোক সাজাতে পারবে না।' তাঁর 'মায়াকানন' নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রজনী উদ্‌যাপিত হবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে পূর্বরচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকই অভিনীত হয়। অতঃপর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মেঘনাদবধ', 'বিদ্যাসুন্দর', 'মালতীমাধব', 'নবনাটক' প্রভৃতি অভিনয় হবার পর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমৃতলাল বসু এসে এখানে যোগদান করেন এবং সম্প্রদায়ের নাম হয় বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী ও গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী। ১৮৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'মায়াকানন' নিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন রাতে এখানে অভিনীত হয় 'ভারতমাতা', 'বিধবা বিবাহ', 'প্রণয় পরীক্ষা', 'কৃষ্ণকুমারী', 'নন্দবংশোচ্ছেদ', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বাজারের লড়াই'। দর্শকবৃন্দের মধ্যেও তখন প্রচুর উন্মাদনা।

কিন্তু ১৮৭৫ সালে ভারতে যুবরাজ এডওয়ার্ডের আসাকালে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' প্রমুখ দু একটি সমাজ সমস্যা বিষয়ক প্রহসন নাটক নিয়ে মঞ্চের উপর সরকারী কর্তৃপক্ষের অর্ডিন্যান্স জারী হয়—যার বিরুদ্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেন—'গভর্নমেন্ট আমাদের ঘরোয়া কার্যেও এরূপ হস্তক্ষেপ করেন, আমরা আর বেশীদিন ইংরাজ রাজত্ব উপভোগ করিতে পারিবনা।

আমরা এমন স্থানে গমন করিব, যেন ইংরাজের শাসন ভ্রূকুটি আর আমাদের ছায়াও অনুসরণ করিতে না পারে।'

গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায় যে নবীন ছন্দের প্রচলন করেন, ক্রমে তা গৈরিশী ছন্দ নামে খ্যাতিলাভ করে। নাটককে সহজতর কথারূপ দেবার এই অভিনব প্রয়াস ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তা একদিকে যেমন অমিত্রাক্ষরের রীতিধর্মী, অন্যদিকে তেমনি মুক্ত ছন্দের ধারারক্ষী। গিরিশচন্দ্রের কথায় এতে 'ভাষা নীচ হতে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠবে। সে সুবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন।' এ ছন্দ মাইকেলের ছন্দের বিরোধী সন্দেহ নেই, অন্ততঃ 'ছুছুন্দরীবধ' কাব্য প্রকাশের ফলে জনসাধারণের কাছে তাই প্রমাণিত হলো। কিন্তু গৈরিশী ছন্দ তখন নাটকীয় ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধরচন্দ্র সংকার লিখলেন: 'এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।'

কিছুকাল তিনি এমারেল্ড থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে গুর্মুখ রায়ের সহযোগিতায় তিনি স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে 'দক্ষযজ্ঞ' দিয়ে অভিনয় শুরু করেন। তখন বাংলাদেশে নবতম ধর্মান্দোলনের যুগ। শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব, ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করছিলেন, আবার নিরীশ্বরবাদ ও নাস্তিকতাবাদও শিক্ষিত মনকে বিভ্রান্ত করে তুলছিল। এসময়ে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' এক নব ভাবের সৃষ্টি করে। স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই নাট্যাভিনয় দেখতে এসে মাঝে মাঝেই সমাধিস্থ হন। তাঁর সংস্পর্শে এসে গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর শিষ্যা বিনোদিনী এক দিব্য জীবনের সন্ধান পান।

বাংলায় এ যুগকে থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা যায়। Light of Asia প্রণেতা Edwin Arnold লেখেন: 'বঙ্গ রঙ্গভূমির দৃশ্যপটাদি দেখিয়া হয়তো বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষ উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু মনোবিজ্ঞানসম্ভূত উচ্চভাবসম্পন্ন নাটকের সুচারু অভিনয় ও কলাকুশলতা এবং বাংলা নাটকের উচ্চভাব ও দর্শকের বোধশক্তি পাশ্চাত্য থিয়েটারেও বিরল।'

স্টারের পর গিরিশচন্দ্র ১৮৯০ সালের ২৮শে জানুয়ারী 'ম্যাকবেথ' নাটক নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার আরম্ভ করেন। এসময়ে ক্লাসিক, বীনা, সিটি, নূতন, কোহিনূর প্রমুখ কয়েকটি নতুন থিয়েটার গড়ে ওঠে এবং নতুন ও প্রাচীন বহু নাটকের অভিনয়দ্বারা দর্শকবৃন্দ তৃপ্ত হন। সামাজিক নাটক হিসেবে

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি নাটকগুলি যেমন তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ছিল, তেমনি দর্শকবৃন্দকেও সামাজিক বৈষম্য ও অপকৃষ্টতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত নাটক প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত: ঐতিহাসিক ও প্রহসন। একদিকে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবারপতন', 'সাজাহান' প্রভৃতি, অন্যদিকে 'কল্কিঅবতার', 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি। তা একদিকে যেমন দর্শককে ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে অন্যদিকে সমসাময়িক সমাজের নানাবিষয়ক সমস্যাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছে। বিশেষতঃ প্যারডি, হাসির গান ও দেশাত্মবোধক কাব্য রচনায় সাথক প্রবণতা থাকার ফলে তিনি তাঁর নাটকগুলিকে অধিকতর মনোজ্ঞ ও রসগ্রাহী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং সর্বোপরি দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যে সুরুচি ও শ্লীলতা রক্ষার পক্ষপাতি হওয়ায় তাঁর নাটক ও নাটকান্তর্গত কথাগুলি শালীনতা লাভ করে। নাটকগুলি ক্লাসিক, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারে যশোগৌরবে অভিনীত হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকসমূহ শুধু ভারতীয় নাট্যসাহিত্যেই নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের নাট্যসাহিত্যের তুলনায় উজ্জল ও সার্থক। তাঁর গদ্য নাটক 'শারোদৎসব', 'মুক্তির উপায়', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'গৃহপ্রবেশ', 'চিরকুমারসভা', 'রক্তকরবী', 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', প্রভৃতির জন্য সাধারণ রঙ্গালয়গুলি উপযুক্ত ছিলনা। তা না থাকার কারণ নাটকান্তর্গতভাব ও বিষয়বস্তু এবং সেই সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যবাচ্য কথার ব্যবহার। ফলে রবীন্দ্রনাটক বিশেষভাবে ঠাকুর পরিবারের নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়ে বিদগ্ধ সমাজের প্রীতিসাধন করে। ইদানীংকালে সবাকচিত্রে এবং গণনাট্যসঙ্ঘ ও বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর প্রগতিশীল প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র-নাটক অগণিত জনচিত্তের রসপিপাসাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও কোনো সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের উপযোগী হয়ে দাঁড়ায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে যে সব নাটক গড়ে উঠেছিল, সাধারণ রঙ্গালয় ও সবাকচিত্রে সেগুলোর অভিনয় পূর্বেও যেমন, এখনও মাঝে মাঝে তেমনি দর্শক-মনকে তৃপ্তি দেয়।

সামাজিক নাটকের বোধ করি প্রথম এবং সার্থক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' সেই অর্থে শুধু সামাজিক নয়, যে অর্থে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি সামাজিক নাটক। ১৯১১ সালে তাঁর শেষ 'বলিদান

অভিনয় ; এই অভিনয়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং পরে লোকান্তরিত হন। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ—যিনি দানীবাবু নামে অধিক খ্যাত, পিতার অবর্তমানে বাংলার রঙ্গমঞ্চে বাংলানাটকের অভিনয়-ঐতিহ্য সগৌরবে বাঁচিয়ে রাখেন। অভিনয়ে অপরেশ মুখোপাধ্যায়েরও তখন খুব নাম। রঙ্গমঞ্চে তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশেষ অভাব নেই। কিন্তু কোথাও অভিনয়ের নতুন ফর্ম ও টেক্‌নিকের বড় একটা সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। চিরা-চরিত যা হয়ে আসছিল, তাই চলছিল।

ঠিক এই সময়ে ১৯২১ সালে কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে রঙ্গালয়ে অভিনেতা বৃত্তি গ্রহণ করেন শিশির কুমার ভাদুড়ী। সেই কালটা আইন অমান্য আন্দোলনের কাল—যদিও তার প্রভাব রঙ্গালয়ের উপর বিশেষ পড়েনি। এ সময়ে পার্শি ম্যাডান কোম্পানী একটি বাংলা রঙ্গমঞ্চ গঠনের সঙ্কল্প নিয়ে বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী নামে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার প্রথম অভিনয় একখানি হিন্দী নাটকের বাংলা অনুবাদ : 'অপরাধী কে ?' অনুবাদ করেন সত্যেন দে। শিশির কুমার ভাদুড়ীর প্রথম অভিনয় (১০ই ডিসেম্বর) ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর।' তিনি এমন কলাসম্মত ভাবে আলমগীরের কঠিন ভূমিকার মর্যাদা রক্ষা করেন যে, সেই রাত্রেই সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ চিরকালের মতো নিরূপিত হয়ে যায়। অভিনয়ে যে নতুন ফর্ম, নতুন টেকনিক ও নতুন ব্যঞ্জনা দেওয়া যায়, তা তাঁর পূর্বে অপর কোনো অভিনেতা ভাবতে পারেননি। তদানীন্তনকালীন সেই নির্বাক চিত্রের যুগে মঞ্চাভিনয়ে এই নতুন অভিব্যক্তি দর্শকমাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী হয়। অনেক সময় এই অভিব্যক্তি স্বাভাবিকতা অতিক্রম করলেও সেই যুগসন্ধিক্ষণে শিশির কুমার ও তাঁর সম্প্রদায়ের অঙ্গসঞ্চালন ও বাচনকুশলতা এক নবভাবের সৃষ্টি করে, সন্দেহ নেই, যার ফলে অভিনয় কুশলতায় নবতম প্রবর্তক হিসেবে আজও শিশির কুমারের নাম উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়। তাঁর সমসাময়িককালে আরও বহু থিয়েটারের সৃষ্টি হয়, যেমন—আর্ট থিয়েটার, নাট্যনিকেতন, নাট্য-ভারতী, রঙমহল, কালিকা, শ্রীরঙ্গম ও পরে বিশ্বরূপা।

এইসব সাধারণ পেশাদার রঙ্গালয়ের চাহিদা মেটাতে যেমন বিভিন্ন নটনটি এগিয়ে আসেন। তেম্‌নি এগিয়ে আসেন বিভিন্ন নাট্যকার তাঁদের বিভিন্ন ভাবের নাটক নিয়ে। এর বাইরেও বিভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায় এবং বিশেষ

করে গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী, নৌতনিক, থিয়েটার সেণ্টার প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন প্রগতিপন্থী নাট্যসঙ্ঘ আছে—যারা অনেক সময় পেশাদার রঙ্গালয়ের চাইতে ভালো নাটক পরিবেশন করে থাকে, অথচ তাদের নিজস্ব কোনো বাঁধা মঞ্চ না থাকার ফলে জনসাধারণের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়না। হয় তাদের পেশাদার মঞ্চ ভাড়া করে অভিনয় করতে হয়, নয়তো কোনো খোলা যায়গায় সাময়িক প্যাণ্ডেল ও মঞ্চ তৈরী করে অভিনয়ের সুযোগ নিতে হয়। এই ভাবেই অদ্যাবধি চলেছে। আধুনিক কালকে চলচ্চিত্রের যুগ বলা যায়। জনসাধারণের মনে আজ চলচ্চিত্রের প্রভাব অধিক। তার কি কি কারণ, তা নিয়ে এ আলোচনা নয়। কিন্তু তৎসত্বেও বলা যায়, উত্তর-স্বাধীনতাকালে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে স্বাধীনতাপূর্ব যুগের চাইতে নাটকের প্রসারতা বেড়েছে, যদিও মাঝে মাঝে কোনো কোনো নাটকে বাস্তবতার স্পর্শ থাকলেও বাংলার সমাজ মানসের এবং বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখ বিজড়িত বাস্তব আলেখ্যের পূর্ণ রূপায়ণ আজও রঙ্গালয়গুলিতে সার্থক হয়ে ওঠেনি। তার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা ছিল এবং এখনও আছে।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদী আধুনিকতা ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গৌরী ঘোষ

বিশশতকের প্রথম অর্ধের কবিতার দৃষ্টিভঙ্গি ও শেষ অর্ধের দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পার্থক্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। এই পরিবর্তনের পথ অনুসরণ করে পিছন দিকে দৃষ্টি দিলে যে সব কবিদের নাম মনে পড়ে যতীন্দ্রনাথ তার মধ্যে অন্যতম। ভাব ও রূপ উভয় দিক থেকেই বর্তমান বাস্তববাদী আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ কবি তিনি।

যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কালে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একটি সবিতৃমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। বাস্তবকে রঙিন আভায় মণ্ডিত করা ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথের দুঃসাধ্য অনুকরণে পেলবমসৃণ ভঙ্গি সর্বস্বতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

উপনিষদে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আনন্দবাদের 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি'—দুঃখ তাঁর কাছে আনন্দের রূপান্তর দুঃখদহনেই জীবনের সমুন্নতমহিমা এই ভাব পরিমণ্ডলে যতীন্দ্রনাথ আপন সুরে বিশিষ্ট।

এই সময় ইউরোপীয় জীবনধর্ম সাহিত্যের কিছু কিছু প্রতিধ্বনি বাংলা সাহিত্যে শোনা যাচ্ছিল। রোমান্টিক পথ একমাত্র পথ কিনা এ বিষয়ে সে যুগের মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। প্রকৃতপক্ষে ভিক্টোরীয় যুগের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চাপে বিশশতকের প্রথমভাগে সন্দেহ ও জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে। এ সম্বন্ধে A. C. Ward বলেছেন —"The change of out look that came with the twentieth century was due to the growth of a restless desire to probe and questions." ফলে জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি এ্যান্টি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিল।

যতীন্দ্রনাথ যে ইউরোপীয় আদর্শ দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা বলা সঙ্গত নয়। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা সেই যুগের প্রায় সকল দেশেই সাধারণ ধর্ম রূপে দেখা দিয়েছিল। বিশেষতঃ বিশশতকের দ্বিতীয় তৃতীয়

দশকে শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের অর্থনৈতিক সংকট হতাশা ও নৈরাশ্য তাঁর দৃষ্টিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে ।

এছাড়া ছিল তাঁর আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল বিশিষ্ট কবিমানস। কর্মজীবনে বাস্তববাদী কবি জীবনকেও বৈজ্ঞানিকের বাস্তবদৃষ্টিতে দেখেছেন। জীবন সম্পর্কে কল্পনার মোহাঞ্জন তাঁর ছিলনা। কর্মজীবনে বাস্তববাদী কবির অভিজ্ঞতাও জীবন সম্পর্কে কোন রঙিন মোহ সৃষ্টি করার অবকাশ দেয়নি। কর্মজীবনের পথে চলতে চলতে কবি দেখেছেন—"নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদী বুঁজে গেছে। খানা ডোবা পানায়পূর্ণ। চাষীরা সবহারা, নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট, শীর্ণকায়।"

জীবনের এই দুঃখজর্জর বাস্তবরূপকে তুলে ধরতে বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন :

"কে গাবে নূতন গীতা
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস গেরুয়ার বিলাসিতা ?
কোথা সে অগ্নিবাণী
জ্বালিয়া সত্য দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি ?"

যে প্রশ্ন তিনি করেছেন তাঁর কাব্যই তার উত্তর। সাম্প্রতিক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের যুগে তিনি পথিকৃৎ কবি।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছেন জগৎ যন্ত্রবিশেষ—যন্ত্রী খামখেয়ালী অন্ধ নিষ্ঠুর। জগতের সর্বত্র অন্যায় অবিচার, অসঙ্গতি। এই নেতিবাদী দৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি অমঙ্গলে অনির্বাণ দুঃখজ্বালায়।

'মিথ্যা প্রকৃতি মিছে আনন্দ মিথ্যা রঙিন সুখ।
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।"

জীবনের সমস্ত বিলাস ও সুন্দরের উপকরণের পিছনে আছে অলিখিত বেদনার ইতিহাস।

উনিশশতকের জার্মান দার্শনিক সোপেন হাউয়ারের সঙ্গে তাঁর মিল দেখি। সোপেন হাউয়ার বলেছেন, দুঃখই সৃষ্টির মূল দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নেই দুঃখময় জীবনের অবসানও নেই। শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদর্শনের নির্বানপন্থায় তিনি মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছেন। যতীন্দ্রনাথও সমধর্মী দৃষ্টিতে দেখলেন :

জন্ম মাত্র শিশু বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্ ওম্ ওম্

জন্মক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হল চিরন্তন।

কিন্তু সোপেন হাউয়র ছিলেন মানববিদ্বেষী দুঃখবাদী। জীবন থেকে পলাতক। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য মানুষের প্রতি মমতায়। তাঁর এক চোখে ক্রোধ, অন্য চোখে মমতা। মানুষের প্রতি সহানুভূতি অন্তঃসলিলার মত তাঁর কাব্য মধ্যে প্রবহমান। ব্যঙ্গের খর্গ হাতে নিয়ে তিনি আসরে নেমেছিলেন, কিন্তু শুধু ব্যঙ্গ ও নৈরাশ্যমূলক দুঃখবাদ যদি তাঁর উপজীব্য হত তাহলে তিনি মহৎ কবির মর্যাদা পেতেন না। মানুষের প্রতি সীমাহীন মমতা তাঁকে দুঃখবাদী দার্শনিকের স্তর থেকে মানবতাবাদী কবির পর্যায়ে উত্থিত করেছে। 'মানুষ', 'চাষার বেগার' 'বারনারী' প্রভৃতি কবিতা অকৃত্রিম বেদনায় সিক্ত। সেই জন্যই পাঁচীর মার প্রতি সহানুভূতি তাঁর জাগ্রত হয়ে ওঠে, সমস্ত বিলাসের উপকরণের মধ্যে 'কেতকী' ও 'ঝরাবকুলের কান্না' তাঁর হৃদয়কে মথিত করে তোলে। তথা কথিত 'Pessimistic outlook হলে শোষক ও শোষিতের এই পার্থক্য দেখা যেতনা।

তাঁর দুঃখবাদ একটি বীর্যোদ্দীপ্ত জীবনাদর্শ। সমস্ত পরাজয়ের গ্লানির মধ্যেও মানুষ দুঃখ জয়ের সাধনা করে চলেছে:

"আগুনের তাপে সাঁড়াশির চাপে আমি চির নিরুপায়
তবু সগবে ভুলনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।"

যতীন্দ্রনাথ এই দুঃখজয়ী নিপীড়িত মানুষেরই জয়গান করেছেন:

"সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ
স্রষ্টা আছে বা নাই।"

এই দৃষ্টি ভঙ্গির 'পরেই তাঁর কাব্যসৌধ নির্মিত।

কিন্তু তাঁর সহানুভূতি যেখানেই পড়ে সেখানেই দেখেন অন্যায়, অবিচার দুঃখ। সৃষ্টির দেবতা অন্ধ নিষ্ঠুর। তাঁর বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের অভিযোগ বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত:

চেরাপুঞ্জীর থেকে
একখানা মেঘ ধার দিতে পার
গোবি সাহারার বুকে?

কিন্তু তিনি দেখেছেন সৃষ্টির দেবতাও যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা।

তিনি দুঃখের বেদনায় নীলকণ্ঠ। মানুষের তৃষ্ণার্ত অঞ্জলিতে এক অঞ্জলি দুঃখের বিষই শুধু তিনি দিতে পারেন, তিনি যতীন্দ্রনাথের ইষ্ট দেবতা। তিনি পার্বতীশ্বর নন—সাধারণ মানুষের হাসিকান্নার পার্শ্বচর। নীলকণ্ঠ পান করেছেন দুঃখের গরল—অগ্নি তাঁর নিত্য সঙ্গী। সে অগ্নি ক্ষুধার অগ্নি, বেদনার অগ্নি, ক্রোধের অগ্নি।

জীবনের প্রতি মানুষের যে গভীর আকর্ষণ তার স্বাভাবিক পরিণতি সৌন্দর্যে ও প্রেমে। যতীন্দ্রনাথেরও ধূসর মরুর বহ্নিজ্বালা একদিন স্নিগ্ধ প্রশান্তির রূপ পেয়েছে। যে রোমান্টিকতা তাঁর মধ্যে সুপ্ত হয়েছিল জীবনের প্রদোষচ্ছায়ায় সেইটিই আত্মপ্রকাশ করেছে সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বীকৃতি দ্বারা। তাই কবিকণ্ঠে শুনি :

"শঙ্কর হও সঙ্কর্ষণ
মাটি ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ
শস্য শ্যামল হোক ধরাতল বাঁচুক অন্নপূর্ণা।"

কবির চোখে সেই অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন কামনা, রুদ্রের বন্দনার মধ্যদিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত এ্যান্টি রোমান্টিক কবি যতীন্দ্রনাথ নন। রোমান্টিকতার মূল কথা শুধু সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সমাজ চেতনা। ধর্মপ্রভাবমুক্ত, সর্বপ্রকার শাসন শোষণ মুক্ত বিকশিত মানবাত্মার মুক্তির জন্য বিদ্রোহবাণী—prometheus unbound এর স্বপ্ন। যতীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার অন্তর্নিহিত এই বিদ্রোহের উপাসক। প্রথম জীবনে বাস্তববাদী, বুদ্ধিবাদী কবি ব্যঙ্গের ছদ্মবেশে এই বিদ্রোহকে জীবনের মন্ত্র করে নিয়েছেন। কিন্তু শুধু বিদ্রোহে জীবনধর্ম সম্পূর্ণ হয়না, – রুদ্রের সঙ্গে চাই সৌন্দর্য। শিবের সঙ্গে উমা। তাই শেষ জীবনে কবি সুন্দরকে আহ্বান করে নিলেন। বুদ্ধি দুঃখবাদকে আশ্রয় করেছিল, মানবিকতা ও সহানুভূতি জীবনকে আশ্রয় করল। বুদ্ধি ও সহানুভূতির মিলিত ফসল যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন।

শুধু দৃষ্টিভঙ্গি নয় তাঁর কবিতার আঙ্গিকও বাংলা সাহিত্যে এক নূতন পথের দিশারী। কুন্তক বলেছেন—"কবিস্বভাব ভেদনিবন্ধনত্বেন কাব্যপ্রস্থান ভেদঃ।" অর্থাৎ কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি কবিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যতীন্দ্রনাথের কাব্যের বহিরঙ্গ রূপসজ্জাতেও আমরা দেখতে পাই বাস্তববাদী যুক্তি

ধর্মী বক্তব্য। বুদ্ধিপ্রধান মনের তির্যক বাক্‌ভঙ্গি ও গদ্যধর্মী ছন্দ।

যতীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই রূপকধর্মী। কবির বাস্তবধর্মী মন লৌকিক জীবন থেকে রূপক খুঁজে নিয়েছে। ভাড়াটে বাড়ী, ছাতার কথা, লোহার ব্যথা, গরুর গাড়ী, চামড়ার কারখানা, লাট্টু, মাকু প্রভৃতি শব্দ ও রূপক কল্পনা তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মনোভাবের অভিজ্ঞানবহ। শব্দগুলি 'means of reference' মাত্র নয়, 'emotive instrument'। ভাষাকে তার বহু ব্যবহৃত মামুলী অর্থে ব্যবহার না করে যতীন্দ্রনাথ তাকে নূতন সঙ্কেত শক্তির আধার করেছিলেন। ঘরোয়া অতি পরিচিত শব্দগুলি একদিকে যেমন কল্পনার উচ্চ জগৎ থেকে আমাদের মনকে মাটির পৃথিবীতে নিয়ে আসে অন্যদিকে নিপীড়িত মানুষের ব্যঞ্জনা বহন করে। পেলবমসৃণ শব্দকে বিদ্রূপ করে তীব্রকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন :

'তোমার আমার হয়ে থাক দুটো
কাঁটাছাঁটা সোজা কথা।"

বাংলা সাহিত্যে এই স্বাদ ছিল অনাস্বাদিতপূর্ব। বক্তব্যের দিক থেকে রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে মোহিতলালই অগ্রণী। কিন্তু শব্দ ব্যবহারে তিনি ছিলেন অভিজাত ক্লাসিক পন্থী। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রথম ইন্টেলেকটের দীপ্তি বিলাস ও লৌকিক সাধারণ জীবন ভাবে ও রূপে একত্র গ্রথিত হয়েছে। শুধু লৌকিক শব্দেই নয় যেখানে যে শব্দ পেয়েছেন তাকে তাঁর অনুভূতির অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করে আগ্নেয় দীপ্তিদান করেছেন। ব্যবহারের কৌশলে সংস্কৃত শব্দও তাঁর ভাষাকে আরও সংযত গভীর ও বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করেছে :

"ভরেছ আতরদানি
কত প্রভাতের আধফোটা ফুল মর্ম নিভারিছানি
কণ্ঠে দুলালে মিলন মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা
সদ্যছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডেরমালা।"

—এই বক্রোক্তিই তাঁর কাব্যজীবিত। চিত্রকল্প ব্যবহারেও তিনি অভিনব। রোমান্টিক কল্পনাবিলাস তাঁর বিদ্যুৎপ্রভ অতর্কিত চোরা আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়েছে :

"দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যু শয়ন রক্ত বমন করে।"

এই চিত্রকল্প রোমান্টিক কবির অধিকারের বাইরে। এই উপমা মনে করিয়ে দেয় এলিয়টের পাণ্ডু সন্ধ্যার বর্ণনা :

Let us go then you and I

When the evening is spread out

against the sky

Like a patient etherised upon a table.

তাঁর বক্তব্য বিষয় যোগ্য প্রকরণ গ্রহণ করে আমাদের মনে তীব্র অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। কবির লক্ষ্যারস, কিন্তু তার জন্য সৃষ্টি করতে হয় উপযুক্ত বাণীরূপ। যতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নির্বেদ রসসৃষ্টি নয়। পাঠকের মনে বহ্নিদাহের উত্তাপ সঞ্চারিত করাই তাঁর লক্ষ্য—সেদিক থেকে তিনি সার্থক হয়েছেন।

অবশ্য মরু'পর্ব থেকেই একটি রোমান্টিক মন তাঁর বিদ্রোহের আড়ালে সুপ্ত হয়েছিল। একদিন কবি জীবনের সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম ভালবাসা সকলকে দীপ্তকণ্ঠে অস্বীকার করেছিলেন। জীবনের ত্রিযামায় উপনীত হয়ে কবি দেখলেন, উপেক্ষিত জীবনপর্বের কত রঙ, কত মাধুর্য। মরু পার হয়ে আজ যেন তিনি মরুদ্যান খুঁজে পেলেন। ফলে 'সায়ম' থেকেই শব্দ ছন্দ ও চিত্রকল্প কান্ত কোমল সদৃশ্য। নামকরণেও সেই 'মরু' স্মৃতি আর নেই। জীবনের প্রদোষচ্ছায়ায় কাব্যের নামকরণেও প্রশান্তি নেমেছে 'সায়ম', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'।

জীবনের শেষবেলায় এই রোমান্টিকতা প্রকাশ পেলেও যতীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের অভি-ব্যঞ্জনার উপযোগী করে বাচ্য ও বাচকের উপনিবন্ধনে। আধুনিক বাংলা কাব্য সেদিক থেকে যতীন্দ্রনাথের কাছে বহুলাংশে ঋণী।

শ্রীনিকেতনের স্মৃতি

রত্না বন্দোপাধ্যায়

ছাত্রী জীবন থেকেই শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ঘুরে আসার আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল। শুনতাম সারা বছর ধরে সেখানে নানা মনোরম উৎসবের সমারোহ চলে এবং সে সব উৎসবের এমন বিশিষ্টতা আছে যে দূর দেশান্তর থেকে বহু লোকের সমাগম হয় উৎসবের সময়। কোলকাতা থেকে শান্তি-নিকেতনের দূরত্ব খুব বেশী নয়; তাই ছাত্রী থাকা কালীন বহুবারই কোন একটি উৎসবের সময় সেখানে ঘুরে আসার প্রবল ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু নানা-কারণে সে ইচ্ছা তখন পূর্ণ হয়নি।

ইচ্ছা যদি প্রবল হয় তবে তা পূরণের একটা পথও এসে পড়ে। আমার ভাগ্যেও তাই হল। আমার বিবাহ যাঁর সঙ্গে হল তিনি শ্রীনিকেতনে অধ্যাপনা করতেন। অতএব আমার বিবাহিত জীবন শ্রীনিকেতনেই আরম্ভ হল। কোথায় উৎসব দেখার কথাই ভেবেছিলাম, তা না একেবারে সংসার পেতে বসলাম সেখানে! যেখানে শুধু দেখার ইচ্ছাই ছিল সেখানে বসবাস করে তাকে আরও নিবিড় ভাবে জানার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

এই প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনের জন্ম কি করে হয় তা অল্প কথায় বলে নেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা জানি ভারতবর্ষ গ্রাম ভিত্তিক দেশ। গ্রামের ওপর নির্ভর করেই শহরগুলো এখানে গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ গ্রামে থাকে ও কৃষিই তাদের মুখ্য জীবিকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে গ্রামগুলির থেকে রসদ পেয়ে শহরগুলি বড় হয়ে উঠেছে, সেই গ্রামগুলি ও কৃষিভাইরাই সব চেয়ে বেশী অবহেলিত। যেখানে পাশ্চাত্যে গ্রাম ও শহরগুলি পরস্পর নির্ভরশীল সেখানে আমাদের দেশে দুটি একেবারে বিচ্ছিন্ন। গ্রামবাসীদের দুর্দশার সীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ যে সময় ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন সে সময় আমাদের দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। যাঁরা ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁরা বিদেশী কাজেই আমাদের দেশের প্রতি তাঁদের তেমন অনুরাগ ছিলনা। তাঁদের দিক থেকে তাই গ্রামগুলির উন্নতির কোন চেষ্টাই হয়নি। গ্রামগুলির এমন শোচনীয় অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথের মত দরদী দেশপ্রেমিক অত্যন্ত বেদনা

অনুভব করেছিলেন। কি করে ভারতবর্ষের গ্রামগুলিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান যায় ও গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা যায় এরই উপায় খুঁজতে গিয়ে শ্রীনিকেতনের জন্ম হয়। তাই শ্রীনিকেতনে তিনি এমন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করলেন যার থেকে গ্রামের সংগঠন মূলক উন্নয়নের একটা উপায় বেরিয়ে আসতে পারে। গ্রাম সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর একটি জিনিষ অনুভব করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল গ্রামের উন্নতির বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে পরস্পর নির্ভরশীল হতে হবে। কোন একটি বিশেষ সংস্থার দ্বারা গ্রামের মাত্র আংশিক উন্নতি হতে পারে। কিন্তু গ্রামের সামগ্রিক উন্নতি তখনই হতে পারে যদি এই সংস্থাগুলি এক সংগে কাজ করে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করেছিলেন।

শ্রীনিকেতনে এসে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি দেখার সুযোগ হয়ে গিয়েছিল। যে বিভাগটির নাম "শিল্প-সদন" সেখানে নানা রকম হাতের কাজ শেখান হত। "ডেয়ারী ও ফারমিং" বিভাগে গোপালন ও কৃষির নানা-বিধ শিক্ষা দেওয়া হত। তেমনি গ্রামবাসীদের উপযোগী লেখা পড়া শেখাবার জন্য, যা শিখে তাদের ভেতর থেকে উপযুক্ত নেতা তৈরী হতে পারে। তার জন্য "শিক্ষা-সত্র" স্থাপন করেছিলেন। এগুলি অবশ্য শ্রীনিকেতনের পূর্বতন ইতিহাস।

আমার স্বামী তৎকালীন "রুরাল ইন্‌স্টিটিয়ুট" (বর্তমানে যার নাম হয়েছে "পল্লী শিক্ষা সদন") এ অধ্যাপনা করতেন। তাই আমি এই বিভাগটির সঙ্গেই বিশেষ ঘনিষ্টভাবে জড়িত হবার সুযোগ পাই। বিবাহের আগে শহরে থেকে বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীর প্রতিবেশীদের দেখে প্রতিবেশী বা সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে যেমন ধারণা হয়েছিল, এখানে এসে তার পার্থক্য অনুভব করলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল সারাটা দিন ঐ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বর্জিত জায়গায় গিয়ে কি করে সময় কাটাব? কিন্তু গিয়ে দেখি কোন অসুবিধাই হল না। এমন সুন্দর community life এর পরিচয় আগে পাইনি। রুরাল ইন্‌স্টিটিয়ুটে (Rural Institute) পাশাপাশি সব অধ্যাপকদের বাসগৃহ ছিল। তাদের ভেতর এমন মধুর ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল যার জন্য সর্বদা মনে হত আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য (member)। প্রত্যেকের আলাদা সংসার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল ঠিকই, কিন্তু যখন কেউ কোন কিছুর প্রয়োজন বোধ করেছে বা অসুবিধায়

পড়েছে বিনা দ্বিধায় প্রতিবেশীর কাছে ছুটে গেছে ও পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে যথার্থ সাহায্য পেয়েছে। আমার মনে পড়ে একবার আমাদের এক অবিবাহিত প্রতিবেশীর ছোট বোনের টাইফয়েড হয়। বোনটি তার দাদার কাছে থেকে বিশ্ব-ভারতীতে পড়াশুনা করত। হঠাৎ এত বড় অসুখ করায় ভদ্রলোক খুবই বিব্রত হয়ে পড়েন কারণ বাড়ীতে আর কোন মহিলা নেই যে বোনটির সুশ্রুষা করে। আমরা এ খবর শোনামাত্র সেখানে ছুটে গেলাম ও নিজেদের ভেতর ঠিক করে ফেল্লাম সবাই মিলে পালা করে তার সেবা যত্ন করব যাতে তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়। ক'দিন colony এর মহিলারা কি ভাবে একাগ্রতার সঙ্গে মেয়েটির সেবা করেছে তা নিজের চোখে দেখে মনে হয়েছিল এ আন্তরিকতা শহরে সম্ভব নয়। এখানে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। প্রতিবেশীদের মধ্যে বাঙালী, উত্তর প্রদেশী, মহারাষ্ট্রবাসী, দক্ষিণভারতীয়, এই রকম নানা প্রদেশের অধিবাসী ছিলাম। কিন্তু সকলের মধ্যেই সমান সহৃদয়তা ছিল। ভাষা ও জাতের ভেদ থাকা সত্বেও কারুকে কোনদিন পর মনে হয়নি। বরং এই আপাত প্রভেদের চেয়ে আমরা সবাই "রুরাল ইন্‌স্টিটিয়ুট" বাসী এই সত্যটাই বড় মনে হত।

এই রকম নিবিড়তা বা আন্তরিকতা কিন্তু শ্রীনিকেতনের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিজেদের ভেতর যে ছিল তা বলতে পারি না। সত্যি কথা বলতে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের একটা আলাদা জগৎ করে নিয়েছিল আর তার ভেতর সদস্যদের মধ্যে বেশ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাই বলে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঠিক সেই ধরণের সম্পর্ক ছিলনা। যে পরস্পর নির্ভরতা ও সহৃদয়তার আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ-গুলি স্থাপন করেছিলেন, দুঃখের বিষয় সে আদর্শ আর খুঁজে পেলাম না। পরস্পর নির্ভরতা বা প্রীতির পরিবর্তে বরং অনেক সময় বেশ রেষারেষি ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করেছি।

তবে এর ভেতরও একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যেও একটা রেষারেষির ভাব বরাবর থেকে গেছে। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে রেষারেষি ভাব দেখেছি তা ঠিক সে রকম নয়। একটি ঘটনার কথা বলি। একবার রুরাল ইন্‌স্টিটিয়ুট বিশ্ব-ভারতী ফুটবল খেলায় চ্যামপিয়নশিপ পেল। খেলায় জয়লাভ করে

ছাত্ররা যখন trophy নিয়ে ফিরে এল। সারা শ্রীনিকেতন জুড়ে সকলের সে কি জয় উল্লাস! তখন সব বিভেদ মুছে গেল। তখন শুধু শ্রীনিকেতনের জয় হয়েছে, এই সত্তাটাই বড় হয়ে উঠল।

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব বা পৌষ মেলা একটি বিখ্যাত উৎসব। রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ পূর্তিতে পৌষ উৎসবের খুব বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য জন সমাগম অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশী হয়েছিল। মেলা প্রাঙ্গনে রুরাল ইন্স্টিটিয়ুটের ছাত্ররা এত শৃংখলাযুক্ত ভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিল যে তা শ্রীনিকেতনের প্রত্যেকের কাছেই গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার একবার শান্তি-নিকেতনের বিচিত্রা-ভবনের উদ্বোধনের সময়ও রুরাল ইন্স্টিটিয়ুটের ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিল। শান্তিনিকেতন বাসীরা তাদের কাজের অনেক ত্রুটি ধরেছিল ও অপবাদ দিয়েছিল যে ছাত্ররা সুষ্ঠুভাবে কাজ করেনি। সেবারও দেখেছিলাম সারা শ্রীনিকেতন এক জোট হয়ে এই অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। অর্থাৎ বহু ঘটনার মধ্যে এটা বুঝেছিলাম যে যখনই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে শ্রীনিকেতনের যে কোন বিভাগের সংঘর্ষ হয় তখনই সারা শ্রীনিকেতন এক জোট হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

এই শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন বিদ্বেষ রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ব্যর্থ করে দিয়েছে ও আজ সকলেই এক মত হবেন যে, যে আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন গড়েছিলেন তা আজ শ্রীহীন, অর্থাৎ যেখানে একে অন্যেকে প্রীতি ও পরস্পর নির্ভরশীল হতে শেখাবে, সেখানে তারা নিজেরাই পরস্পর বিরোধী। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীনিকেতনের জীবন আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের ছিল। সেখানে আমি মাত্র দু বছর ছিলাম। এই অল্প সময়ের ভেতর আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল এখানে শুধু তার কথাই লিখলাম। সেখান থেকে চলে আসার পর সঠিক কি ঘটেছে তা অবশ্য আমার জানা নেই কারণ আমার তেমন যোগাযোগ আর নেই। তবে একটা কথা আমার বার বার মনে হত তা এই যে, যে গ্রামের উন্নতির কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন গড়ে ছিলেন সেই গ্রামের সঙ্গে কোন রকম সংযোগ আমি সেখানে খুঁজে পাইনি। সেখানকার বিভিন্ন বিভাগে যাদের শিক্ষা পেতে দেখেছি তারা প্রত্যেকেই শহরবাসী ও তাদের বেশীর ভাগের লক্ষ্য ছিল শহরে গিয়ে চাকুরী করা। প্রতিষ্ঠানগুলির অধ্যাপনার কাজও শহরবাসীদের ওপর ন্যস্ত দেখেছি। এ সব দেখে আমার মনে হয়েছে যে শ্রীনিকেতন নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি।

সত্যি ভ্রমণকাহিনী

রজত রায় চৌধুরী

এই যে চৌধুরী, তোমাকেই খুঁজছিলাম, যাচ্ছ তো ?

কোথায় যেতে হবে ? কবে যেতে হবে ? কখন বেরুতে হবে ? সুকু মিত্তিরের কাছে এ সব প্রশ্ন অবান্তর।

শোনো, সকাল সাড়ে ছ'টায় স্টার্ট-পজিটিভ্‌লি—

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানানো আমারই দরকার, আমার বদলে সুকু মিত্তির নিজেই ঘাড়টা কাত করল। তারপরেই ফস্‌ করে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বললে, সাইন ইট।

যারা সুকু মিত্তিরকে জানে, তারা নির্দ্বিধায় সাদা কাগজে সই করে। এগুলো নেহাৎ ফরম্যালিটি। নেহাৎ লোক দেখানো ব্যাপার। নাহলে একটা ভ্রমণ কাহিনীর সমস্ত খরচ জোগানো সুকু মিত্তিরের কাছে কোনো একটা ব্যাপারই নয়।

কিন্তু এবার সই করতে গিয়ে থামতে হল।

একি ? ওপরে যাদের নাম দেখছি, তাদের মধ্যে ক্লাবের সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্টও রয়েছেন যে! জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার! ওনারাও যাচ্ছেন নাকি ?

নিশ্চয়। সুকু মিত্তির ভারিক্কী চালে হাসল। সই কর। কাগজটা ভাঁজ করে কোটের পকেটে ভরতে ভরতে বলল, ইট উইল বি এ ভি, আই.পি ট্যুর।

কিন্তু! ওনারা গেলে......

ডোণ্ট ওরি—সুকু মিত্তির আমাকে আশ্বস্ত করল। ওনারা যাবেনই এমন কোনো কথা নেই—সই করলেই কি সবাই যায়! তবু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। সুকু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ি, আর ড্রাইভার কে জানো ?

আমি প্রচণ্ড কিছু বিস্ময়জনক সংবাদ পাব মনে করে রীতিমত উৎসুক হয়ে উঠলাম। হয়তো শুনব প্রেসিডেন্ট নিজেই চালাবেন সেই ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িখানা।

মুখটা একটু ফাক করে চোখ দুটো নাচিয়ে ক্ষণকাল পরে সুকু মিত্তির বললে, পারলে না তো? গাড়ি চালাবে আজিজ। আজিজ সেখ!

ভূভারতে আজিজ সেখ নামে কোনো ড্রাইভারের বিখ্যাত ড্রাইভিঙের কথা কখনও কোথাও শুনিনি।

দমে গেলাম।

একটা ঢোক গিলে আমার বিমূঢ়তার জন্য বোধহয় সুকু মিত্তির করুণা প্রকাশ করল। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলল, বছর পাঁচেক আগের বারুইপুর টু ডায়মণ্ডহারবার মটোর রেসের খবর তোমাদের বলেছিলাম—মনে করে দেখো।

কত কথাই তো সুকু মিত্তির বলে।

মনে পড়ল না।

না! এই সর্ট মেমরি নিয়ে কী করে যে সাহিত্যের অধ্যাপনা কর—কে জানে? সত্যিই তো? এমন খবর যে ভুলে যেতে পারে, তার চাকরি যাওয়াই উচিত। উচিত কাজ কজন করে বলো। আমি যদি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হতাম, তো আলাদা কথা ছিল—বাই দি বাই—

হঠাৎ চেয়ারের হাতল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুকু মিত্তির। এই যে ভট্টাচার্য—তোমাকেই খুঁজছিলাম—

বুঝলাম সব। সুকু মিত্তির ঘাড় ফিরিয়ে বললে, নেকস্ট্ ইন্টিমেশন শুক্রবার পাবে। তবে প্রোগ্রাম কিন্তু রবিবারের।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে সকাল সাড়ে ছটার থেকে আমরা জনা ছয়েক দাঁড়িয়ে রইলাম।

কোথায় সুকু মিত্তির! কোথায় তার ফার্স্ট ক্লাশ গাড়ি!

অথচ এমন হবার কথা নয়। সুকু মিত্তির গতকাল রাত্তেও সবার সঙ্গে দেখা করেছে; এমন কি যার যার বাড়ি টেলিফোন আছে, তাদের রাত চারটের সময় ফোন করে ঘুম পর্যন্ত ভাঙিয়ে দিয়েছে।

অথচ......সাতটা বেজে গেল। সোয়া সাত ছুঁই ছুঁই। এমন সময় একটা কালো ফোর্ড মোড় বেঁকে সাঁ করে পাশ কাটিয়ে গিয়ে একটু এগিয়ে ক্যাচ্ করে ব্রেক কষে থামল।

আমরা দেখলাম। ড্রাইভারের দরজা দিয়ে নামল আর কেউ নয়, স্বয়ং সুকু মিত্তির। বলল, চলো সব, আর দেরী নয়—ওঠো ওঠো—

যেন দোষটা আমাদেরই, যেন আমরাই এতক্ষণ গাড়িতে উঠান বলে গাড়ি চলছিল না।

বিমলেন্দু বললে, ইউ আর লেট। এতখানি লঙ্‌জার্নি—

সুপ্রকাশ বললে, আর সব কই? যারা সই করেছিলেন।

আমি বললাম, বিশ্ববিখ্যাত বারুইপুর টু ডায়মণ্ডহারবার মটোর রেসের প্রাইজ উইনিং ড্রাইভার আজিজ সেখ কোথায়?

সবার উত্তরে গাড়িটা শুধু একটা জার্ক দিয়ে স্টার্ট নিল। সুকু মিস্ত্রির বললে, চৌধুরী, ঠাট্টা করলে তো! কিন্তু সেদিন তোমায় একটু ভুল বলেছিলাম, ওই রেসের ড্রাইভার আমিই ছিলাম; রেসটা হয়েছিল দীঘায়—বারুইপুর নয়—তোমাদের সব সর্ট মেমরি—মনে রাখতে পারো না কিছু—

হয়তো হবে। সুকু মিস্ত্রিরের কথা সত্যিই আমরা ভুলে যাই। কারণটা বোধকরি বুঝিয়ে বলবার দরকার হবেনা।

যদিও সকাল। যদিও পথে ভিড় নেই। তবু গাড়ি চলল ঢিমেতালে। কি যেন জায়গাটার নাম। ঠিক মনে নেই—গাড়ি থামিয়ে তড়াক করে নেমে পড়ল সুকু। তারপরেই বাজখাই গলার আওয়াজ: ওরে সনাতন, সনাতন —ব্যাটা নটা বাজে, এখনও ঘুমুচ্ছিস—

আমরা আঁত্‌কে উঠলাম। নটা! সে কি? আমাদের ঘড়িতে যে আটটা মাত্র। ব্যাপারটা বোঝা গেল তক্ষুণি। সুকু মিস্ত্রিরের কাঁধের ঝোলা থেকে বেরুল ক্যামেরা। এতো কাজ করে বেচারা। ফিল্ম কিনতেই ভুলে গেছে।

বুঝলে ভট্‌চায—সুকু মিস্ত্রিরকে চেনে না এমন লোক এ তল্লাটে খুব কমই আছে। আর চেনাশোনার জন্যই তো এই সাত সকালে ঘুম ভাঙিয়ে ফিল্ম পেলাম। কী—পারতে তোমরা?

স্বীকার করতে হল, এ ধরণের গুণ আমাদের নেই।

বিমলেন্দু বলল, আমাদের নেই, তাই মিস্ত্রিরের আছে। আমাদের থাকলে, মিস্ত্রিরের থাকত না।

সুপ্রকাশ বলল, সুকু, তুই চারটের সময় টেলিফোনে ঘুম ভাঙালি বটে, আমি কিন্তু ফের ঘুমিয়েছি এক ঘণ্টা।

কী বলতে চাও তুমি? ভট্টাচার্য প্রশ্ন করল।

উত্তরটা আমিই দিচ্ছি—সুকু মিস্তির ব্রেক কষল। গাড়ি থামল একটা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে।

সুপ্রকাশ আকর্ণ হাসি হেসে বলল, থ্রী চিয়াস´ ফার সুকু মিস্তির।

আমরা ধুয়া দিলাম, হিপ হিপ হুর্‌রে।

শেষ ডিসেম্বর হলেও হাওয়ায় শীতের আমেজ তেমন নেই। গাড়ি চলেছে কুলপী রোড় ধরে কাকদ্বীপের দিকে।

ফাঁকা রাস্তা। তবু গাড়িতে স্পীড নেই।

কী হল? আমরা মুখ তাকাতাকি করলাম।

তোমরা ঘাবড়াচ্ছ কেন? সুকু বললে, গাড়িটার স্পীড বেঁধে দেওয়া আছে। কুড়ি মাইলের বেশি যাবে না।

তখন সবাই দেখলাম। স্পীডোমিটারের কাঁটা অচল। তেল মাপবার যন্ত্র অকেজো।

আমি বললাম, রেসের গাড়ি কিনা, তাই স্পীডোমিটার ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

ঠাট্টা করো না চৌধুরী, এ গাড়ি তোমাদের অ্যামবাসাডরের চেয়ে অনেক ভালো। কত দিন রাণ করছে জানো?

কত? কয়টির মডেল তো?

নো। থারটি ফাইভের। কিন্তু যেমন বডি, তেমন ইঞ্জিন—কতবার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে জানো?

এ প্রশ্নে কে-ই বা বিরক্ত না হয়ে পারে। সুপ্রকাশ বলল, তোমরা বিরক্ত হচ্ছ, কিন্তু জানো তো, যারা রেসের মাঠের খরিদ্দার তারা ঘোড়ার ঠিকুজিকুষ্ঠী জানে—এ-ও বাবা, রেসের গাড়ি—তাতে চেপেছ—তার ঠিকুজিকুষ্ঠী জানবে না—

সুকু মিস্তিরের সব চেয়ে বড়ো গুণ সে রাগে না। বললে, ডানদিকের রাস্তা ডায়মণ্ডহারবারের। আমরা সোজা কাকদ্বীপ যাবো।

তখন সূর্য মাথার ওপরে। বেশ গরম লাগছে। আমরা এসে পৌঁছলাম নামখানায়। ভাবলাম, এসে গেছি আর কী? কিন্তু সুকু মিস্তির কোথায়? আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে সেই যে 'আসছি' বলে গেল, আর তার পাত্তা নেই। আমরা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম নদীর ঘাটে। আর

তখন, ঠিক তখনই চোখে পড়ল সুকু মিত্তিরকে। একজন মাঝির সঙ্গে কথা বলছে।

আমরা বুঝলাম কোথাও একটা গড়্‌বড়্‌ কিছু হয়েছে। কী হলো? আবার কী ব্যাঘাত ঘটালো?

তেমন কিছু নয়—জোয়ার—সুকু মিত্তির চোখ দুটো কপালে তুলে বলল।

জোয়ার!! আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

হ্যাঁ, জোয়ার। জোয়ার না এলে গাড়ি পার করা যাবে না—সুকু বললে।

আমি বললাম, সে তো গাড়ির বেলায়, কিন্তু রেসের গাড়ির বেলায়?

ঠিক! দুহাতে তালি দিয়ে উঠল সুকু। তারপর তিন লাফে আবার মাঝির কাছে গিয়ে কী সব কথাবার্তা বলতে লাগল।

একটু বাদে আমাদের কাছে এসে বললে, ভাঁটার সময় কাদায় গাড়ি আটকে যায়—তাই ওরা পার করে না। তবে আমাদের সুবিধে আছে। ছোট গাড়ি—টেনে নিয়ে যাব। দড়ির বন্দোবস্ত করছি—বলেই পলকের মধ্যে হাওয়া।

তারপর সে এক দৃশ্য। নদীর চরে বিচিত্র এক টাগ অব ওয়ার। এক-দিকে আমরা কজন আর অপরদিকে গাড়িখানা। আর তীরের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকশো দর্শক। যেন গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে শো দেখছে। এতো লোক এখানে এল কোত্থেকে তা ভেবে দেখবার সময় আমাদের ছিলনা। আমরা জুতো খুলে হাঁটুর ওপর প্যান্ট তুলে, কাদায় মাখামাখি হয়ে গাড়ি টানছি। সুকু বলেছে হেইও। আমরা ধুয়া দিচ্ছি, সাবাস্‌ জোয়ান —হেইও।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে কসরৎ করে গাড়ি তোলা হল ওপারে। সুকু মিত্তিরকে চেনা যাচ্ছে না। সারা গায়ে কাদা। হাঁটু অবধি সমস্ত ট্রাউজার কাদায় লেপটে রয়েছে। বেচারার চোঙা প্যান্ট—গুটোতেই পারেনি গালে মুখে কপালে কাদার ছিটে। মুখে বিজয়ীর হাসি।

আমরা পা ধুয়ে জুতো পরলাম। ঘেমে নেয়ে গেছি। খিদের পেটের নাড়ি চোঁ চোঁ করছে।

এবার কিন্তু বেঁকে বসল সুকু মিস্তির। নো, নেভার—খাওয়া হবে সমুদ্রে পৌঁছে—তার আগে নয়।

গাড়ি ধুয়ে মুছে যখন নামখানা ছাড়ব ছাড়ব, তখন ওরা সামনে এসে দাঁড়াল—ওরা দু'জন। ওরা না থাকলে গাড়ি ডাঙায় তোলা যেত না। ওদের সাহায্য তাহলে নিঃস্বার্থ ছিল না। কী চায় ওরা? টাকা? কত?

দেখতে তো ভদ্রলোকের মতন। একজনের কাঁধে তো ক্যামেরা ঝুলছে। অপর একজনের হাতে মিনি ট্রানজিসটার। ওই সামান্য সাহায্যের জন্য টাকা চাইছে! এ যুগে হলো কি?

না। টাকা নয়। ওরাও আমাদের সঙ্গে সমুদ্রে যেতে চায়। ওরা এখানে এসে স্ট্র্যাণ্ডেড হয়ে গেছে আরও কয়েক শো ভ্রমণার্থীর মতন। তাই বলো—ছি: ছি:—কী সব ভাবছিলাম। তাই অত লোক পাড়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল—টিটকিরি দিচ্ছিল। ভালোই হোল। ওদের নাকের ডগা দিয়ে আমরা হুস করে চলে যাব। সুকু মিস্তিরের রেসিং কারকে টিটকিরি দেওয়া!

সুকু এক কথায় রাজি। যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। হয়ে যাবে সবার জায়গা। হলোও। সামনের উইণ্ড স্ক্রীনের দুপাশে বসল দুজন। দুধারে দাঁড়াল দুজন। ভেতরে দুজন।

দুলতে দুলতে লাফাতে লাফাতে চলল সুকু মিস্তিরের রেসের গাড়ি। এবং কী আশ্চর্য ব্যাপার—আমরা পৌঁছেও গেলাম। ওরা দুজন ফ্রেজারগঞ্জের মোড়ের মাথায় নেমে গেল—আমরা বাঁদিকের কাঁচাপথে হুমরি খেতে খেতে এসে পৌঁছলাম বকখালির সমুদ্র সৈকতে।

আমরা সবাই যখন স্নানে ব্যস্ত, তখন সুকু মিস্তির কোথায়, তা কে জানে! হঠাৎ তার চিৎকার ভেসে এল, উঠো না তোমরা, আমি আসছি।

হাসিগাসি মুখ। ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে বলল, দাঁড়াও, সট নি—

সে এক দৃশ্য! সুকু মিস্তির এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির ছবি তুলল। বলল, এসব ছবি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তারপর খাওয়া। আমরা এত খেতে পারতাম জানতাম না। ছোটবেলায় বকরাক্ষসের খাওয়ার ছবিতে দেখেছিলাম, গামলা গামলা খাবার ভীম একা গোগ্রাসে গিলছে। আমরাও সেরকম খেলাম।

নোংরা অ্যালুমিনিয়ামের থালা, আধসেদ্ধ ভাত, গঙ্গাজলের মতন মাছের ঝোল, খোসাশুদ্ধ আলু কুমড়োর ঘ্যাট,—মনে হল অমৃত খাচ্ছি।

বাড়ি হলে, ভট্টাচার্য বলল, কৌয়েক্স বয়াক্সে অনেক দুর্ভোগ ছিল—

কেন ? সুপ্রকাশ প্রশ্ন করল।

কেন আবার ! এমন থালায় কোনোদিন খেয়েছি—এমন রান্না কোনো-দিন মুখে দিয়েছি—

দেন ইউ এগরি-ইট্‌স এ মেমরেবল্ ডে—সুকু মিত্তির সুযোগ বুঝে কোপ মারল।

যস্মিন দেশে যদাচার—বিমলেন্দু বলল।

আমি বললাম, তা হবে কেন ? এতো বেগানা দেশ নয়—আসলে আমরা পড়েছি মোগলের হাতে, খেতেও হচ্ছে—

প্লীজ তুমি থাম চোধুরী—একে তুমি মোগলাই খানা বলো !—ভট্টাচার্য ফেটে পড়ল আক্রোশে।

ক্লীক্—ছোটশব্দ হল একটা। ক্যামেরার মুখ বন্ধ করছে সুকু।

আমি বললাম, মোগলাই খানার রেকর্ড রয়ে গেল সুকুর ক্যামেরায়—

থামো—ভট্টাচার্য চেঁচিয়ে উঠল—চোদ্দপুরুষে এমন বিচ্ছিরি রান্না কখনও খাইনি—

তোমার দেশ কোথায় ভট্টাচার্য—সুকু প্রশ্ন করল।

আর যেখানেই হোক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা নয়—ভট্টাচার্য উঠে পড়ল। অবশ্য ভট্টাচার্যের রাগের ফলে লাভবান হলাম আমরা। বেড়াতে এসে অভুক্ত থাকবে কেউ সুকু মিত্তির থাকতে। কোথা থেকে সে যোগাড় করে আনল কয়েকডজন কলা, ডিমসেদ্ধ আর মাছভাজা। পুরো পেট ভাতখাবার পর আবার আমরা অম্লানবদনে সেগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিঃশেষ করে দিলাম।

পেট ভরতেই ভট্টাচার্যের গলার স্বর বদলে গেল। বলল, দেখলে তো, কাজ উদ্ধার করতে হলে, মেজাজ দেখাতে হয়—

এটা বুঝি তোমার হোম পলিসি—বিমলেন্দু বলল।

ভট্টাচার্য পৌরুষের হাসি হাসল। বিমলেন্দু বলল, পড়তে কোনো তেজির পাল্লায়, দেখতে ও থিয়োরী অচল।

হঠাৎ সুকু বলল, আর একটু পরেই 'সান সেট' যাবে—চলো আমরা মটোর নিয়ে নীচে যাই—নীচে ড্রাইভ করতে করতে সান সেট দেখব।

ভট্টাচার্য বলল, ফেরার কথাটা খেয়াল রেখো সুকু। আমার আবার বাড়িতে কেউ নেই।

যাবার সময় জোয়ার পাব—টাইম জেনে এসেছি—ডোণ্ট ওরি—সুকু মিস্তিরের গাড়ি গর্জন করে উঠল।

তখন সমস্ত সমুদ্র সৈকত প্রায় জনশূন্য। যারা ট্যুরিষ্ট লজে রাত কাটাবে, তারাই কেবল ইতঃস্তত পায়চারী করছে। শীত নেমেছে ঝপ করে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

মাইল দুয়েক যেতে না যেতে অন্ধকার নেমে এল সমুদ্রের জলে। তারই বুক চিরে লাল আলোর আভা। প্রকাণ্ড লাল গোলক তখন জল ছুঁয়েছে—এবার টুপ্ করে ডুব দেবে জলের তলায়।

এ দৃশ্য দেখে মোহিত হয় না—এমন মানুষ বিরল। আমাদের মনের মধ্যে সুর গুণগুনিয়ে উঠল। হেঁড়ে গলায় গান ধরল সুকু 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'—কিন্তু মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ড। তারপরেই গাড়ি হরহরিয়ে নেমে গেল সমুদ্রের মধ্যে।

কয়েক মুহূর্তের চিৎকার ও আর্তনাদ। গাড়ির অর্ধেক জলের তলায়। বালিতে গাড়ির সব যন্ত্র ঢাকা। নোনা জল আমাদের মুখে জিভে। চোখেও।

সুকু মিস্তির তখন সমুদ্রের জলে হাবুডুবু খেতে খেতে জলের তলা থেকে তার ক্যামেরাটা তুলে আনছে।

নিঃসঙ্গ জনতা

মীরা দেবী

[পনেরো]

ঘুমের মধ্যেই বিমলের সামনে অনেক ছবির আনাগোনা। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু আচ্ছন্নতা ভাঙ্গল না। পুরনো অনেক কথা মনে পড়ল কিন্তু আশ্চর্য্য গীতার কথা মনে পড়ল না। মনে পড়ল লতা একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল

—আচ্ছা আপনার মা, বাবা নেই ?

—না, পাঁচবছর বয়সেই বাবা মারা গেছেন। তাঁকে আমার মনেই পড়েনা।

—মা ?

—মা যখন মারা গেছেন তখন আমার বয়স ন'বছর। বাবা মারা যাবার পর আমাকে নিয়ে মামার বাড়ীতে চলে আসেন। আমার বড় মামাই আমাদের নিয়ে গেলেন। আমার পিতৃকুলে আর কেউ ছিলনা তো।

—কোথায় ছিল আপনার মামার বাড়ী ?

—মামার বাড়ী ছিল রানাঘাট।

—আর নিজেদের বাড়ী ?

—এই কোলকাতাতেই। শ্যামবাজারের বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে। একটা মাঝারি গোছের বাড়ী কিনেছিলেন বাবা।

—মামা মামী ওরা কেউ নেই।

—বড় মামা বিয়েই করেন নি। কেন তা জানিনা। কে জানে হয়তো কোন.........হেঁসে তাকায় লতার দিকে। লতা ধমক দেয়।

—আঃ কি হচ্ছে।

—মেজ মামা কিন্তু বড় রকমের সংসারী ছিলেন। চারটি ছেলেমেয়ে। সেখানে যখন গেলাম তখন নিতান্ত ছোট ছিলাম। কাজেই আমাদের হঠাৎ আবির্ভাবে মামার সংসারে কতখানি খুসী আর কতখানি বিরক্তি তৈরী হয়েছিল তা বলতে পারবনা। তবে আমার শ্রদ্ধেয়া মামীমাতা ঠাকুরানী মোটেই খুসী হননি

সেটা জোর গলায় বলতে পারি। একটু একটু মনে পড়ে মা দিবারাত্র কাজ করতেন আর বড়মামা মাকে বলতেন "এত খাটিস কেন?" সেজ মামার ছেলে মেয়েদের সংগে একসংগে পড়তে বসতাম। দুজন মামাতো দাদা আর একজন দিদি আর একজন ছিল আমার চেয়ে ছোট। যখন পড়তে আমরা বসতাম মামাতো ভাইটা হ্যাঁচকা টেনে এসে খুব জ্বালাতন করতো। আমার ওপর ভার ছিল তাকে সামলে রাখার। জান লতা আমি পড়তে বসলেই মামীমার তেল ডাল সব ফুরিয়ে যেত। হাজার বার দৌড়ুতে হ'ত দোকানে। বড় মামা একদিন তো ভীষণ রেগে গেলেন। তাই নিয়ে বড় মামা আর মেজমামাতে সে কি ঝগড়া। আর মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে সুরু করেন।

কেমন অবলীলাক্রমে নিতান্ত নিরপেক্ষ ভাবেই বলে চলে বিমল ওর ছোট-বেলার কথা। অভিযোগ নয়, প্রতিবাদ নয়, নির্বিকার, নিরুত্তাপ যেন একজন মাইনে করা রিপোর্টার। কিন্তু ওর কাহিনী শুনতে শুনতে লতার চোখ দুটো ভিজে গিয়েছিল। বিমল চিৎ হয়ে শুয়েছিল নিজের খাটে। গল্প করতে করতে এক সময় পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলেছিল। বুকের ওপর সিগারেটের টিনটা ঘোরাতে ঘোরাতে ছোটবেলার কাহিনী শোনাচ্ছে লতাকে। —সেবার ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে। রাত জেগে পড়ছি। বড়মামার শেষ কালটায় হাঁপানি হল। কি কষ্ট যে পেয়েছেন। বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "তোর মায়ের মত তুইও আমায় ফাঁকি দিবি নাতো।" যেদিন রেজাল্ট বেরুলো বড়মামার সে কি আনন্দ। কিন্তু তখন একেবারে শয্যাশয়ী। তার ঠিক এগার দিন পরেই বড়মামা কেটে পড়লেন। মেজো মামা জানিয়ে দিলেন আমার মত এতবড় ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে আর খাওয়াতে পারবেন না। অতএব পত্রপাঠ আমাদের পাড়ার সুবলদার তল্পীদার হয়ে তার আস্তানায় গিয়ে উঠ্‌লাম।

—সুবলদা কে?

— ও সে বড় মজাদার মানুষ। জাত বাউল। বীরভূম ছেড়ে কেন যে রাণাঘাটে এসে আশ্রয় নিলো তা কোন দিনও জানা হয়নি। তবে শুনতে পাই অনেক কথা। তার সম্বন্ধে কিন্তু নিজে কোনদিনও কোন প্রমাণ পাইনি।

—আপনার সুবলদা বাউলের মত চুড়ো ক'রে চুল বাঁধেন?

—বাঁধেন না, বাঁধতেন।

—এখন চুল ছোট করে ফেলেছেন?

—তুমি কি ছেলে মানুষ লতা। যে কাহিনী বলছি সে আমার ছেলেবেলার। সে সুবলদা আজ কোথায় ?

হো হো করে হেসে কথাটা বলেছিল বিমল। কিন্তু শেষে সেই হাসিটা মিলিয়ে এল। লতা একটু অপ্রস্তুত হল।

—সুবলদার কাছে জায়গা পেয়ে গেলাম। ভাবলাম বাউল হব। সামনেই বীরভূমের পোষমেলা। চলে গেলাম বোলপুরে। সুবলদা সেদিন যদি আমায় টেনে না নিতো তাহলে আজ কোথায় থাকতাম কে জানে। জান লতা তাই ভাবি সংসারে আমার মেজমামাদের পাশাপাশি সুবলদারাও আছে তাই পৃথিবীটা আজও টিকে আছে। অন্ধকারের পর আলো আছে। আলোর পর অন্ধকার তাই তো তোমায় বলি লতা ধৈর্য্য হারিও না আজকের দুর্যোগ একদিন কেটে যাবেই।

প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরে গেল। বিমলের হয়তো সেটা খেয়ালই হয়নি, লতা আবার ফিরিয়ে আনল বিমলকে।

—তারপর কি হল সুবলদার ?

—ও হরি! তুমি আমার কথা শুনছ না, সুবলদার কথাই শুনতে চাও ?

—দুজনের কথাই।

—জান! বোলপুরে গিয়ে যে সুবলদাকে দেখলাম সে যেন আর একজন। বাউলদের দেখলাম সেই প্রথম। সুবলদা আমাকে ওদের আখড়ায় নিয়ে গেল। সেখানে সব চুড়ো করে চুল বাঁধা, দো পাল্টা করে গেরুয়া পরনে, গায়ে আলখাল্লা, হাতে একতারা। বোষ্টমদের মত তাদের হাতে গুপিযন্ত্র থাকেনা। ওদের থাকে একতারা। সুবলদাও তার সাদা ধুতি ছেড়ে গেরুয়া পরে নিল। সারারাত চললো গান আর নাচ। সে যে কি গান তাদের মাঝখানে বসে না শুনলে তার মর্ম বোঝা যায় না। এখানে রেডিওতে তার কতটুকু রস গ্রহণ করা যায় ? সুবল বাউলের সে কি খাতির। একটা মাস কেটে গেল তাদের আখড়ায়। চুল কাটিনা, চুড়ো বাঁধবো বলে, সুবলদা বলে, হ্যাঁরে অমন বাউণ্ডুলে চেহারা করেছিস কেন? "বলি, আমিও যে বাউণ্ডুলে হব। শেখাও না গান দেখি বাউল হতে এবার পারি কিনা। সুবলদা একতারাটা তুলে আমায় মারতে এল। ততদিনে আমার গলায় কিন্তু গান বেশ বসে গেছে।

হঠাৎ হেসে ফেলে লতা বলে

—শোনান না একটা।

—ও, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

—তারপর কি হল বলুন ।

– ওরে বাবা, তুমি আমার জীবন চরিত লিখবে নাকি ? শোন একদিন নিজেই একটা গান লিখে ফেললাম । সুরও দিলাম তাগ বুঝে শুনিয়ে দিলাম সুবলদাকে । সে তো আমায় জড়িয়ে ধরল কিন্তু পরক্ষণেই ভীষণ ধমক দিল, বললো—'না, না, বাউল হতে তোকে দেবনা হতভাগা' । সেই দিনই আমাকে নিয়ে চলে এল কোলকাতায় বাদুড়বাগানে । পরে জানলাম সেটা একটা মেস বাড়ী সেখানে থাকে সুবলদার এক বন্ধু, অবনীবাবু । তাঁর হাতে আমাকে সমর্পন করে দিল । খরচ টানবে সুবলদা আমাকে ভর্ত্তি হতে হবে কলেজে । সুবলদার কাজে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আমার ছিলনা । ভর্ত্তি হলাম । মাঝে মাঝে সুবলদা আসতো । টাকা পয়সা দিয়ে যেত । মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেত রাণাঘাট । ফার্ষ্ট ইয়ারটা কাটল এইভাবে । সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে অবনীবাবুর চেষ্টাতেই একটা টিউসানি জুটে গেল । বড় লোকের বাড়ী থাকতে হবে । খেতে দেবে তারা আর পঁচিশ টাকা মাইনে । পড়াতে হবে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে । অভিজাত পাড়া । পার্কসার্কাস । প্রকাণ্ড এক বাড়ী । চওড়া ফটক । সামনে অল্প একটু বাগান । গ্যারেজে গাড়ী । প্রথম যেদিন নিয়ে গেলেন অবনীবাবু, নিজেকে সেদিন ভয়ানক বেমানান মনে হল । প্রথমেই তো একটা বিরাট কুকুর এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল । চাকর এসে কুকুরকে শাসন করে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসাল ড্রইং রুমে । আজও ছবিটা স্পষ্ট মনে পড়ছে । তারপর এলেন বাড়ীর গিন্নী । বিমল উঠে বসল । লতার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল । এ বিমলকে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেন নতুন করে দেখলো লতা । বিমল সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে থেকেই বলে চলেছে

—জান লতা ভদ্রমহিলাকে দেখে আমি চমকে উঠলাম । ঠিক যেন আমার মা । এত আশ্চর্য্য মিল দেখা যায় না । পার্থক্য শুধু এক জায়গায় । এর সর্ব অংগে স্বাচ্ছন্দের প্রলেপ আর মা আমার দুঃখ আর দারিদ্র্যের সংগে যুদ্ধ করে করে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ।

থেকে গেলাম সেই বাড়ীতে । একটা আলাদা ঘর পেলাম । আয়েস আরাম, স্বাচ্ছন্দ সমস্তই অপর্য্যাপ্ত । ব্যবহারও খুব ভাল । মাসীমা আমাকে অল্প দিনের মধ্যেই ভুলিয়ে দিলেন যে আমি বাহরের লোক । ছোট্ট ফুটফুটে

টুলুও আমার খুব ভক্ত হয়ে পড়ল। ক্রমশ: আমি যেন ওদেরই বাড়ীর একজন হয়ে উঠলাম। এই ভাবেই চলছিল দিনগুলো— কি ব্যাপার অমন স্তব্ধ হয়ে কি শুনছো? —'বিমল যেন হঠাৎ আবার বাস্তবে ফিরে এল। লতা সত্যিই স্তব্ধ হয়ে শুনছিল কত ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসেছে এই মানুষটি। হঠাৎ প্রশ্ন করল—

—সুবলদার সংগে আর দেখা হোত না?

—হ্যাঁ হোত কিন্তু তত বেশী নয়। আগ্রহটা আমার দিক থেকেই কমে এসেছিল। আমরা এই রকমই অকৃতজ্ঞ হই। দেখ, কোথায় আজ সুবলদা আর কোথায় আমি। জীবন মঞ্চের দুটো উইংস দিয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলাম দুজনে দুদিকে সে পথ দুটো কোথাও গিয়ে শেষ হল কিনা জানিনে—আর আমি? সে তো দেখতেই পাচ্ছ থার্ড ইয়ার কম্‌প্লিট্ করে ফোর্থ ইয়ারে পড়ছি। এতদিনে মাইনে বেড়েছে। মাসীমার যত্নে আর টুলুর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি কিন্তু তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তির খোঁচায় মনটা খচ্ খচ্ করতো। মাঝে মাঝে নিজেকে মনে হ'ত পরগাছা। এখানের জন্য আমি নয়। আমি এদের কেউ নয়। এখানে আমার কোন সামাজিক দাবি নেই। আইনের দাবি নেই, রক্তের দাবী নেই। আমি না হ'লেও টুলুর মাষ্টার জুটতো। অবনীবাবু ধরা কওয়া ক'রে আমার ব্যবস্থা করেছেন। মাঝে মাঝে আত্ম সম্মানে বড় লাগত। আলমারী ভর্ত্তি অজস্র বই। মাসীমা নিজে বেশ শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে যাঁরা আসা যাওয়া করতেন, তাঁদের সংগে আমার একটা সম্মানিত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে পড়াশুনার প্রতি ভালবাসা তাঁদের সংস্পর্শে এসেই বেড়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ রুচি তৈরী হয়েছিল সেই বাড়ীর সংস্পর্শে এসেই। ফোর্থ ইয়ারে উঠ্‌লাম—নিজেকে একটু স্বতন্ত্র বলেই মনে হত। জীবনে আরও অনেক অভিজ্ঞতার আসা যাওয়া সুরু হল। সেই ভীড়ে সুবলদার স্মৃতিটুকু ফিকে হয়ে এল। সুবলদাকে মনে হত ক্ষেপা বাউল মাত্র। যে সুবলদার গানের মানে খুঁজে পেয়ে একদিন তাঁকে অসম্ভব কিছু বলে মনে হয়েছিল এখন মনের কোণে ভালবাসার সংগে সংগে তার জন্যে একটু খানি অনুকম্পাও জমে উঠেছিল। যাইহোক কোকিলের মত নিজেকে পর ভৃত্তিকা ভাবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমার মন অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। সুবলদার খোঁজ করলাম। শুনলাম রাণাঘাটের আস্তানা গুটিয়ে কোথায় চলে গেছে। কেউই তার হদিস জানেনা। আশ্চর্য, যে

আমাকে নিয়ে তার এত ভাবনা, এত ভালবাসা সেই আমাকেও সে কিছু জানাল না। জাত বাউল, মায়ার ফাঁদ খোলাই ওদের ধর্ম। কোন্ ডাকে সাড়া দিয়ে কোন্ প্রান্তে চলে গেল তা কে জানে। অবনীবাবুও জানলে না কিছু। ইতিমধ্যে টুলুর এক দূর সম্পর্কের মামা এলেন। ভদ্রলোক বোধহয় আমাকে ফালতু বলেই মনে করতেন। বেশ বুঝতাম কোথায় যেন সুর কেটে গেল। আমারও ভাল লাগল না তাকে। ঠিক সেই বইটাই তার দরকার হত যেটা আমি পড়তে সুরু করেছি। একদিন দেখি বইর আলমারীতে তালা বন্ধ অথচ ঐ আলমারী এতদিন আমার হেফাজতেই থাকতো। টুলু প্রায়ই বাড়ী থাকেনা, মামার সংগে বেড়াতে যায়। মাসীমা আমার সংগে এক সংগে চা খেতেন—ইদানিং প্রায়ই চায়ের টেবিলে আমার ডাক পড়তনা, চাকর মারফৎ আমার ঘরে চা আসতো। ক্রমে ক্রমে যেন একটা এক তরফা ঠাণ্ডা লড়াই সুরু হয়ে গেল। এ একদিক দিয়ে ভালই হল। আলগা বাঁধন খুলে ফেলাই উচিত। নিজের মনের কাছে অন্ততঃ স্বস্তি পাওয়া যায়। ঠিক এমনি সময় অন্যদিক থেকে মনের ওপর ভয়ানক একটা চাপের সৃষ্টি হল। বিজ্ঞাপনে দেখি মাদ্রাজে একটা ভাল চাকরী আছে। কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়লাম। আমার আবেদন পত্রও পৌঁছল আমিও পৌঁছলাম। কি শুনতে ভাল লাগছে ? আচ্ছা এতটা যখন শুনলে তখন উপসংহারটুকুও শুনে নাও।

—উপসংহার কি এরই মধ্যে এসে গেল ?

বিমল মনে মনে লতার প্রশংসা করল। লতার তো বেশ ম্যাচিওরিটি এসেছে ভাবনায়।

—উপসংহার ? কি জানি আমার তো মনে হয় এসে গেছে। বিমলের একথায় লতার মনে কি ধরণের অভিঘাত তৈরী হতে পারে বিমল সেটা তলিয়ে ভাবেনি। ভাবলে হয়তো সেদিন ওভাবে বলত না। ভেবে বলেনি বলেই লতার মুখটাও তখন লক্ষ্য করেনি। বিমল আবার সুরু করল—

—বেকার একটা বছর নষ্ট করলাম। ফিরে এলাম।

—কেন চাকরীটা হয়নি ?

—হ্যাঁ হয়েছিল। কিছুদিন করলামও কিন্তু আমার পোষাল না। বি, এ এম, এ পরীক্ষাটাও পাশ করলাম টিউসানি আর মাষ্টারী করে। তারপরের আমাকে তো চোখের ওপরেই দেখছো। কথা শেষ করার সংগে সংগেই মনে হল বিমলের, লতা কতটুকু জানে। বুকের মধ্যে যে দগদগে দাগটা হঠাৎ

আবার বেড়ে উঠেছে, যে টাকে সে প্রাণপণে ব্যাণ্ডেজ করে রেখেছে তার খবর লতা কেমন করে জানবে ? কিন্তু লতা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। লতার জন্যেই লতাকে নিয়ে তার ভাবনা নিজের জন্য নয়। লতার দিকে তাকিয়ে বলে,

—আর কিছু জানতে চাও ? বাড়ী নেই তাই ট্যাক্স নেই গাড়ী নেই তাই পেট্রোল খরচ নেই, বৌ নেই তাই ঝামেলা নেই।

জোরে হেসে ওঠে বিমল, লতা কিন্তু সে হাসিতে তেমন ভাবে যোগ দিতে পারল না।

গতকাল থেকে স্বামীজির মুখটা কেমন যেন ভার ভার। গম্ভীর হয়ে আছেন। দুপুরে কাজকর্ম সেরে গীতা যখন স্বামীজিকে ডাক্তারের কথা বলতে গেল তখন স্বামীজি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। এমন তো কখনও হয়না। মনটা কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্থ হল গীতার। যাই হোক শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই পড়ল।

কুমকুম হাসিমুখে তাকে নিয়ে বসাল। কুমকুমের বিধবা দিদি এসেছেন। তিনি কোলকাতার কোন এক প্রাইমারী স্কুলের টিচার। গীতাকে নমস্কার করে বল্লেন—

—আপনাকে দেখতেই এসেছি ভাই। আমরা তো নিরুপায় হয়ে বাইরে বেরিয়েছি কিন্তু শুনেছি আপনি রাজার ঐশ্বর্য্য ফেলে রেখে দেশের কাজ করার জন্যে এপথে এসেছেন। আপনার দর্শন পাওয়া পুণ্য। ওদের কথার মাঝখানেই পুরুতগিন্নী আর অনন্তগিন্নী এলেন, সোমত্ত বউকে একলা কোথায় রেখে আসবেন তাই তাকে সংগে করেই নিয়ে এসেছেন। পুরুত গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন গীতাকে

—তোমার স্বামী বুঝি প্রায়ই আসেন ?

—আমার স্বামী ? কৈ না তো ? বিস্মিত হয় গীতা।

—ওমা, ঐ ভদ্রলোকটি তবে কে ? প্রায়ই তোমাদের আশ্রমে আসেন, মিটিং করেন, ছেলেদের বই দেন পড়তে। আর শুনছি ছেলেদের নিয়ে একটা আখড়া তৈরী করছেন। নির্মল বলে ছেলেটি তো ওর সংগেই আসে, তাই না ? আহা ! বেশ ছেলেটি। আমার শন্তু তো নির্মলদা বলতে অজ্ঞান।

—না, উনি আমার স্বামী নন।

স্বামী নন তবে কে ? কি সম্পর্ক বিমলের সংগে—এইসব প্রশ্নগুলি অব-

ধারিত। গীতা মনে মনে এর জন্যে প্রস্তুতই ছিল—বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললো

—উনি আমারি মত একজন কর্মী। তাছাড়া উনি আর আমি একসংগে পড়তাম। উনি আমার স্বামীর আর আমার বন্ধু।

—ও, বন্ধু বুঝি?

অনন্তগিন্নীর মুখখানার একধরণের অশ্লীলতা ফুটে উঠলো। মোটা শরীরটাকে যতখানি সম্ভব বেঁকিয়ে দুলে দুলে পুরুত গিন্নী এবার দ্বিতীয় বান ছাড়লেন।

—তা তোমার স্বামী জানেন যে তোমাদের বন্ধু নিত্য তোমার কাছে আনাগোনা করেন?

অপমানে গীতার মুখ লাল হয়ে ওঠে, এমন সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেই লাজুক বৌটি এগিয়ে এসে মরিয়া হ'য়ে বলে

—দিদি, উনি আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন। কাল তো এসেছিলেন, বলে গেছেন উনিও আপনাদের কাজে যোগ দেবেন আর আমাকে আপনার কাছে লেখা পড়া শিখতে দেবেন।

তার সেই মিষ্টি কথায় গীতার সব অপমান ধুয়ে গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই বেধে গেল এক খণ্ড প্রলয়।

—বৌমা! কি যা তা বকছ? লজ্জা করনা সোয়ামীর কথা মুখ নেড়ে নেড়ে বলতে? চলে এস বলছি। হ্যাঁচকা টানে হুমড়ী খেয়ে পড়ে গেল বেচারী। ভাঁজ ভেঙ্গে একরাশ এলোচুল পড়ল এলিয়ে পিঠ ছাপিয়ে। সাড়ীর আঁচল এলোমেলো হল। তাড়াতাড়ি কুমকুম গিয়ে তাকে তুলে ধরতেই তার বুকের মধ্যে মুখ রেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো মেয়েটি। এত দিনের সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত নীরব প্রতিবাদের বাঁধ ভেঙ্গে গেল বুঝি। অনন্তগিন্নী তো রুদ্রচণ্ডী—

—দেখ্ কুমি! আমাদের শাশুড়ী বৌএর ব্যাপারে নাক গলাতে আসিস নি। আমাদের সোনার সংসার দুখানা করে দিয়ে তোর কিছু লাভ হবে না। ধান্কী মাগীটাকে নিয়ে ঢলাতে হয় ঢলাগে যা, আমার সংসারে ঢোকাসনি বলে দিচ্ছি।

বিজয় দর্পে পাঁঠার মত বৌটিকে টানতে টানতে রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন। বাকী প্রাণীকটা বজ্রাহতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমকুম গীতার হাত দুটো ধরে আকুল হয়ে বলল—

—আমাকে ক্ষমা কর দিদি। আমারি বাড়ীতে বসে তোমাকে এমন অপমান করে গেল আমি কিছু করতে পারলাম না—ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওর দিদি বলে উঠলেন,—

—থাক কুমকুম! আর কথা বলিস না, তোর এত অধঃপতন হয়েছে ভাবতে পারিনি। একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারলি না। লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল কুমকুম। গীতা বললো—না, না, ওর কি দোষ? আচ্ছা চলি ভাই।

মথ মন্থর গতিতে ফিরে গেল গীতা। এখানে আব কোনদিনও হয়তো তার পায়ের চিহ্ন পড়বে না।

এই পরিস্থিতিতে কুমকুমের কাছ থেকে একটু অন্যরকম আচরণই সে আশা করেছিল। কিন্তু কি করবে বেচারী? এদের নিয়েই তো তার সমাজ এদের মধ্যে দিয়েই তো তার কাটাবে দিন আর রাত গুলো—

ধীরে ধীরে দরজা খুলে সে যখন উঠোনে পা দিল তখন স্বামীজি বসে ছিলেন বকুল তলার বেদীতে। গীতার মুখ দেখে কিছু আর বুঝতে বাকী রইল না তাঁর। গীতা তাঁর পায়ের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। এমন করে বুঝি আগে আর কখনও কাঁদেনি সে। স্বামীজি তার মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে ধরলেন। চিরাভ্যস্ত প্রশান্ত হাসিতে তখনও তাঁর মুখটি উজ্জ্বল। কোন প্রশ্ন নয়, সান্ত্বনা নয়, ধীরে ধীরে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বল্লেন—

—এত সহজে হেরে যাবি মা? যার তো এখনও সুরু হয় নি রে?

—কিন্তু আমি তো ওদের জন্যেই এত কষ্ট করছি স্বামীজি!

—তাই নিয়ম মা, যাদের জন্যে ভাল করবে তারাই তোমাকে শত্রু মনে কোরবে। যাদের মুখে ভাত তুলে দেবে তারাই তোমার গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারবে। ধৈর্য যদি হারাও তাহলে হার হোল তোমারই। স্বামীজি আর নিবেদিতাকে লোক কি নোংরা না ছুড়ে মেরেছে সে তো জানিস বেটি। চোখ মুছে ফেলে গীতা। একটু শান্ত হয়ে প্রশ্ন করে—বিমলকে কি আসতে বারণ করে দেব?

—কেন বারণ করবি? চিরদিন যেটা সত্য হয়ে আছে তোর মনে আজ কতকগুলো কাপুরুষের কথায় তাকে অস্বীকার করবি? তোর নাম না গীতা? ওঠ্, মুখে চোখে জল দে। কৈ আমায় চা করে দিবিনে?

গীতার মনের ভার এ স্নেহের স্পর্শে হালকা হয়ে যায়। (ক্রমশঃ)

তোমার নিষেধে

জয়ন্তী সেন

তোমার নিষেধে আমি পরিশুদ্ধ
মার্জিত বাগান।
নিয়মে সুগন্ধ পুষ্প পাতার বাহার
এবং কণ্টকশূন্য পটভূমি।
তুমি বলেছিলে
সার্থক মালঞ্চ গড়া জীবনের
প্রগাঢ় পিপাসা!
বৃষ্টিহীন হতে পারো, তাই ভেবে
নদীর আভাস
অসাধ্য সাধনে আমি ধরে রাখি
উর্বরতা মোহে।
তোমার নিষেধে আমি
বন্যতার তীব্র প্রতিরোধ।
সযত্নে আগাছা বেছে বাধ্য চারা
মাটিতে বুনেছি,
যেখানে রৌদ্রের তেজ, সেখানেই
ছায়া সুরচিত।
তবুও আশ্চর্য, আত্মা অন্তরালে
প্রচ্ছন্ন গভীর
অবাধ সম্মতি চেনে অসতর্ক
ঝড়ের প্রলাপে।

খেলা

গোপাল ভৌমিক

মাপা মাপা বল দিয়ে
কাউকে লোভ দেখানো যায়
কাউকে বা ভয়।
ভয় মৃত্যুর নামান্তর
এবং লোভে পাপ
পাপে মৃত্যু।
ফল যদি এক হয়
তবে ভয় পেয়ে লাভ ?
তার চেয়ে লোভ ভাল
সে বরং খেলার উৎসাহ দেয়।

যারা সহজে হাত খোলে না
তারা আলাদা জাতের খেলোয়াড় ;
তাদের আউট করা
কঠিন কি সহজ জানি না
তবে মাপা বলে তারা সাবধানী।
তাদের ভালমন্দ বল মিশিয়ে দিলে
বেপরোয়া হয় তারা
এবং পরিণামে ক্যাচ তুলে দেয় হাতে।

শরীর বনাম মন

হেনা হালদার

ইদানীং হঠাৎ-হঠাৎ
শরীরটা হুকুমজারি করে বসে :
'খালি কর, বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে
থাকতে দেবনা এক সেকেণ্ড......'
যেন অবিকল যুগাণ্ডার প্রেসিডেন্ট।
চোখ পাকিয়ে পা-ঠুঁকে দাঁত কিড়মিড় করে।
মনটা জোড় হাতে কাকুতি-মিনতি করে
আকুতি জানায় যেন এশিয়া বাসীর মত
অনুমতি ভিক্ষা চায় 'আর কটা দিন থাকতে দাও
বেশী নয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা......তোমাকে ঘিরেই
আমার সমস্ত তৃষ্ণা কল্পনা বিলাস।'
'এক্ষুণি বেরোও, এক্ষুণি ; এক্ষুণি, এক্ষুণি—'
চোটপাট চলতে থাকে।
ভিসা-পাসপোর্ট-লাইসেন্স-পারমিট
জমিজমা-বাসস্থান-গ্রাসাচ্ছাদন
বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।
লুটপাট খুন জখম রাহাজানি ছিনতাই
আগুন! আগুন!
মনটা তখনো ক্ষমতার বিপরীতে ক্ষমার ভঙ্গীতে
সময় ভিক্ষা করে একঘেয়ে
ভিক্ষুকের মত।
পল অনুপল দণ্ডের জন্যেই দণ্ডবৎ হয়ে।

বন্দীর বিকলাংগ স্বপ্ন

জাহিদ হায়দার

দীপাবলী জ্বালা রাত,
সবে ওঠা তরুণী মেয়ের স্তনে
জ্যোৎস্নার রূপালী কারুকাজ,
মেঘ মরুভূমিতে চাঁদ চলে যায় গভীর গহ্বরে,
হারানো কাঞ্চনের সন্ধানে ?
এ রাতে পাতা ঝরার শবযাত্রা খোলা জানালায়।
স্তোত্রহীন প্রার্থনা বোনো তুমি অতীন্দ্রিয় কঙ্কালে।

আমার হাত ধরে আছেন তৃষ্ণার দেব,
চোখে তার সমুদ্রের ছবি,
যেখানে তীর খোঁজে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ নাবিক।
হৃদয়ের বাচাল চেতনার আততায়ী
দাঁড়িয়ে চোরাবালির বিবরে,
দুহাতে শতাব্দীর ক্রুশ।

জীবননাথ আক্রান্ত শুকনো ভূমির পথভ্রষ্টে,
আলোর আড়ালে যেমন বসে আছি আমি।
সহস্রবার করেছি চেষ্টা,
এবার আওড়াবো আরোগ্যের গান,
আশ্চর্য নৈপুণ্যে চালায় চাবুক মূক-বধির ক্রীতদাস।

প্রোষিতপত্নীক

রবীন সুর

এতদিন ঘরে কোনো ইঁদুর ছিলনা হয়তো সঠিক অর্থে
চিমটি কাটলে নোঙরা ওঠেনা
তবু আরশোলার নাদিমাখা বেডশীট বিছানা ওয়াড়ের
দিব্য চেহারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে বোধ হয় কিছুটা
তৃপ্তি পাওয়া যায়
অগোছালো আলনায় এলোপাথাড়ি জামাকাপড়ের
মলিন স্তূপের আড়ালে দিনে ডাকাতের মত
যারা বিষাক্ত বল্লম শানায় তাদের নাম মশা
মধ্যরাত্রে পেটাঘড়ির সমস্ত শব্দগুলি
নির্ঘুম বালিশে মাথা রেখে নির্ভুল শোনা যায়
রান্নাঘর বন্ধ ইদানীং বেড়াল আসেনা
অন্ধকার মশারীর বিধ্বস্ত দুর্গের ভিতর থেকে
হঠাৎ হঠাৎ চপেটাঘাতের নিস্ফল শব্দে জেগে জেগে একা
স্পষ্ট বোঝা যায়
ঘরের সমস্ত মেজেয় কুৎসিৎ আরশোলার ছত্রাকার
টেবিল রেডিয়ো ঘড়ির অলিগলি ঘুরে ঘুরে
বুকশেল্ফ বেছে বেছে টিকটিকি ইঁদুরের সম্মিলিত মার্চ শুরু হয়ে গেছে
চোখে ঘুম নেই
ঘুমের মতন স্বপ্ন নেই
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত প্রাণধারণের উপজীব্য কবিতা নেই
মগজে কুটিল চিন্তার দাঁত
ঘরময় খোলো ইঁদুরের নষ্টামি
যুগপৎ আমাকে এবং আমার গ্রন্থগুলি কেটে কেটে করে সর্বনাশ !

শকুন

মাকিদ হায়দার

মাঝে মধ্যে দিবাস্বপ্ন পেয়ে বসে আমাকেই
তাই আমি,
খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে আবিষ্কার করি
ভাগাড়ে সতীর্থ হয় শকুন আমার ।

পাখীরা কিছুই বোঝেনা, ঘুম ছেড়ে
দ্রুত পদে হেঁটে যায়
মাংসের বন্দরে
মানুষের বিরাম ভূমিতে

পাখীরা বোঝে শুধু বাঁচার আনন্দ
উড়বার স্বাধীনতা,
মাংসের স্বাধীনতা ;

তবে কার কাছে যাবো আজ, গণক ঠাকুর
বলে যাও, তুমি আজ বলে যাও,
সারারাত জেগে থাকি,
নিজের স্বপ্নগুলো স্ত্রীর চোখের
কোটরে পরিয়ে দিয়ে, চুপচাপ
চতুর পুলিশের ভূমিকায়, ধরতে চাই
স্বপ্নের গূঢ়ার্থ,—

পিতামহ তুমি আজ মধ্যরাতে এসো,
আমার স্বপ্নগুলো, শুনে গিয়ে
বলে দিও, সুলায়মান নবীর কানে

ইদানিং কেন যেন মনে হয় শুভ্র সতীর্থ
শকুন আমার ।

কবিতার চোখের তারায়

অমিয় কুমার হাটি

আমি কি ক্ষমার যোগ্য ? বিশ্বাসের রামধনু ভেঙে
গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে পায়ে বারবার যেতে চাই দূরে
কিসের অলীক লোভে নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো
সমস্ত বিবেক পিছে ফেলে রেখে দারুণ ঘৃণায় ?

আঁধার দেখেছি চোখে। দেখেছি কি লুব্ধ ইশারায়
দালাল জড়াতে চায় ফাঁদে ফেলে। মিথ্যা কত শত
কোমল কাহিনী বলে। সাপ যেন কাঁদে নাকি সুরে !
জীবন গড়িয়ে চলে একে একে ধাপে ধাপে নেমে।

কবিতা, আজো কি তুমি দূরে রইবে ? অপরূপ প্রেমে
নেবেনা বুকের মধ্যে ? ক্ষমাগাঁথা মালাখানি ছুঁড়ে
গলায় দেবেনা দিয়ে ? অবহেলা যত পাব, তত
শোনিত বিষাক্ত হবে। ঘৃণা নয়। চোখের তারায়
তবুও বিষম দৃষ্টি ! ক্রোধাক্রান্ত তীব্র অগ্নিশিখা !

নিজেকে বাঁচাতে পার নিজে শুধু—এই আছে লেখা।

তৃষ্ণা

কামরুল ইসলাম

তৈমুর যখন পৌঁছলো তখন মেহমানদের কেউই আসেনি। মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতা হয়েছে। তারই উপর হারমোনিয়াম ও বাঁয়া-তবল। জানালার কপাট ও দরজার চৌকাটে এঁটে দেওয়া হয়েছে কাগজের ঝালর। দেয়ালের এ কোণ থেকে ঐ কোণে ঝুলছে রঙিন কাগজের শেকল।

কয়েকটা গ্যাসে-ফাঁপা বেলুন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরে। সেগুলো হালকা হালকা বাতাসে নড়ে নড়ে যাচ্ছে এখান থেকে সেখানে ঘরের ছাদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। অল্প খরচায় সুন্দর পরিবেশ। ভালই লাগছে, ভালই লাগছে তৈমুরের কাছে।

—কমু, তৈমুর এসেছে।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে কমু বেরিয়ে এলো। কোলে তার দেড় বছরের ফুটফুটে কলি।

—কি ব্যাপার এতো দেরী করে এলেন যে ?

—তোমার অন্যেরাতো আর কেউ এসে পৌঁছুল না।

—অন্যান্য কেউদের মধ্যে তো আর আপনি নন। আপনার তো আরও আগেই আসার কথা ছিল। আসেননি কেন ?

কমুর কথায় কৈফিয়ত তলবের সুর। তৈমুর কিছু বলে না, শুধু হাসে। কোদাল কোদাল দাঁতগুলো বের করে হাসে।

—বস তৈমুর। জুতো খুলে এখানে এসে বস।

শাকীর হারমোনিয়ামের রীডে হাত চালিয়ে গুণগুণ গাইছিল। শাকীর বসল ওর পাশে কলিকে কোলে নিয়ে। কমু, 'আমি আসছি' বলে চলে গেল রান্না ঘরে। ও বড় ব্যস্ত এখন। সমুসাগুলোর সব কয়টি এখনও ভাজা হয়নি। ডিমের পুডিংটাও কেটে কেটে প্লেটে সাজানো হয়নি। অতিথিরা চলে এলো বলে। তাড়াতাড়ি হাত চালায় কমু।

কমু আজ বাসন্তী রংয়ের শাড়ীটা পরেছে। খোঁপায় জড়িয়েছে বেলী ফুলের মালা। টান টান করে কাজল লাগিয়েছে চোখে। কপালে সুন্দর একখানা টিপ। নিজেকে আজ সুন্দর করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সাজিয়েছে কমু।

আজকে ওদের বিয়ের দিন। বড় খুশী খুশী কমু। ওর মন আজ দিগদিগন্তে উড়ে চলেছে। শাকীরও খুশী আজ। ও গাইছে—'...মন মোর মেঘের সঙ্গে উড়ে চলে...... ।'

এক জোড়া অতিথী এলো। কমুর বান্ধবী ও বান্ধবী-স্বামী। শাকীর উঠে এসে পরিচয় করিয়ে দিল : 'মিষ্টার বউফ। আর এ আমার আশৈশব বন্ধু তৈমুর।'

তৈমুর হাত মেলালো : আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম।

: আমিও।

তৈমুর হাসলো কোদাল কোদাল দাঁত বের করে।

বলল : বসুন।

ওরা ঢালা বিছানাটায় আবার বসল। ভদ্রমহিলা চলে গেল ভেতরে কমুর কাছে। ধীরে ধীরে আর আর অথিতিরাও এসে পৌছল। নিমন্ত্রিত সবাই এলো। এলেন কাসেম সাহেব ও তাঁর স্ত্রী। এলো রফিক, এলো আমেনা, এলো রুচি আর সব শেষে এলেন আজকের অনুষ্ঠানে যিনি গান গেয়ে শোনাবেন, কমুর বান্ধবী শাহানা। শাহানা অনেককেই চেনেনা। কমু একপাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে পরিচয় দিচ্ছে শাহানার কাছে – "ও আমার ননদ রুচি, উনি হচ্ছেন রফিক সাহেব। ইনি মিসেস কাসেম, সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন ভদ্রমহিলা। আর ঐ যে, ঐ উনি হচ্ছেন তোর শাকীর ভাইয়ের ছোট বেলাকার বন্ধু তৈমুর ভাই। ওনাকে দেখতে এমন হ্যাংলাটে হলে হবে কি মানুষটা কিন্তু খুব ভাল।"

তৈমুর কথাগুলো সব শুনল। শুনে একটু হাসল আর হাসতেই তার কোদাল কোদাল দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। তৈমুর হাসলেই কালো কালো ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে কোদালের মত সামনের দাঁত দু'টি বেড়িয়ে পড়ে। তৈমুরের নিজের কাছে ওর এই হাসিটা ভাল লাগে না। বড় বিচ্ছিরি ঠেকে। ওঁর এই হাসিতে যেন কোন সৌন্দর্য্য নেই, কোন মাধুর্য্য নেই। হাসলেই কোদাল কোদাল দাঁত দুটো বেরিয়ে – ওর এই হাসিটাকেই বিদ্রুপ করে যেন। তবু সে হাসে। দুঃখ পেলেও হাসে, সুখের সময়ও হাসে। মনটা আঘাতে

আঘাতে জর্জরিত হয়ে গেলে হাসে, বেদনায় নীল হয়ে গেলেও হাসে আর খুশীতে টগবগিয়ে উঠলেও হাসে। যেন এই হাসি দিয়েই সব আঘাত সব বেদনাকে সে ঢেকে রাখতে চায়।

সবাই উঠে টেবিলটার চার পাশে ঘিরে দাঁড়ালো। ওরা বিয়ের দিনের কেকটা কাটবে। কমু ও রতন দু'জন ছুরিটার মাথায় ধরে হাসি হাসি মুখে কেকটা কাটল। ও'রা বড় খুশী আজ। আনন্দ আজ ওদের মাঝ থেকে উৎলে উৎলে পড়ছে। অতিথিরাও আনন্দিত। তৈমুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো এক-জোড়া হাত ছুরিটা ধরে ধীরে ধীরে কেকটায় বসিয়ে দিচ্ছে। দুফাঁক হয়ে গেল কেকটা। তারপর টুকরো টুকরো করে কাটা হল। এই মুহূর্তে, ঠিক এই মুহূর্তে তৈমুরের মনে হলো ওর মনেরও কোথায় যেন ছুরির একটা পোঁচ পড়েছে। আর মনে হতেই ও' একটু হাসল। হেসে মুছে দিল ছুরির পোঁচটা যেন।

চা-নাস্তার পর্ব শেষ হতেই গানের আসর শুরু হল। আড়ম্বরহীন ছোট্ট অনুষ্ঠান। সুন্দর ও মার্জিত।

ওরা আবার ঢালা বিছানায় গোল হয়ে বসল। হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে শাহানার দিকে বাড়িয়ে দিল শাকীর। না, শাহানা এখন গাইবে না। আগে অন্য কেউ একজন আরম্ভ করুক, তারপর ধীরে সুস্থে সে গাইবেখন। রতনই শুরু করুক না কেন? রতনও গাইল না। হারমোনিয়ামটা বাড়িয়ে দিয়ে কচিকে আদেশ করল সে—"নে কচি তুইই শুরু কর" কচি শুরু করল। সে গাইল একটি আধুনিক গান। তারপর গাইলেন মিসেস রফিক, তারপর তৈমুর, তারপর শাহানা। একে একে সবাই হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে গাইছে এক আধটু। আর একপার্শ্বে বসে থেকে তাই দেখছে তৈমুর। তৈমুর গান ভালবাসে। গান ওকে পাগল করতে পারে, দেওয়ানা করতে পারে। ও' ভালবাসে গানকে, গানের সুরকে, গানের কথাকে, আর মিষ্টি করে যে গাইতে পারে সেই মিষ্টি গলার লোকটিকে। কিন্তু সে আজ গান শুনছে না, গানের সুর ও'র মরমে গিয়ে পৌছুছে না। সে আজ দেখছে, সে দেখছে ও'দের গান গাওয়াকে, ওদের আনন্দকে, ওদের উচ্ছাসকে। কমু ও শাকীরের মাঝে আনন্দের ঢল নেমেছে যেন। শাকীর গজল গাইছে আর কমু তাকিয়ে রয়েছে ও'রই পানে। চোখে তার হাসি, মনে তার রং।

কমু শাকীরকে ভালবাসে।

ভালবাসে ও'রা দু'জন দু'জনকে।

তৈমুর ভাবে এমনি করে, এমনি করে ওকে কি কেউ ভালবাসতে পারে না? ভালবাসতে পারে না ঐ গান গাওয়া মেয়েটা। কিংবা ঐ যে বসে আছে ডাগর ডাগর চোখের কমলা রংয়ের মেয়েটা। তৈমুর কমলা রংয়ের মেয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটা হঠাৎই যেনো ও'র দিকে তাকালো একবার আর তাকিয়ে চোখে চোখ পড়তেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল অন্য পাশে। তৈমুরের তখন মনে হলো, মনে হলো কেক কাটা ছুরিটা ও'র বুকে কে যেন আর একবার বসিয়ে দিলে। তৈমুর ও'র লিকলিকে শরীরটার দিকে একবার তাকালো। হাড বার করা চোয়ালটায় বোলাল একবার। তারপর হাসল। হেসে মুছে দিতে চাইল মনের দুঃখটা। আর হাসতেই কোদাল কোদাল দাঁতগুলা বেরিয়ে পড়ল।

তৈমুর ভাবে ও' একটা রাস্তার ডাষ্টবিন। সোহাগ করে কেউ ঘরে তুলে নেবে না। ভালবেসে প্রিয় বলে কেউ ডাকবে না। বিরক্তি ও উপেক্ষাই ও'র প্রাপ্য।

আনজুম ও'কে ভালবাসেনি।

ও'কি পারত না আনজুমকে নিয়ে শাকীরদের মত এমনি ছোট একটা নীড় বাঁধতে! বছর বছর বিয়ের দিন পালন করতে! এমনি আনন্দে আর উচ্ছাসে উছলে উছলে পড়তে!

সে পারেনি। আনজুম ও'র ভালবাসার দাম দেয়নি। ও'কে বিয়ে করে আনজুম সুখী হতে চায়নি।

তৈমুর আর ভাবতে পারে না। সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ধীরে ধীরে পাশের ঘরটায় গিয়ে সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরালো। আসরে তখন নজরুল গীতি চলছে—'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবুও আমারে দে ব না ভুলিতে……।'

তৈমুর ভাবে: আমিও আনজুমকে ভুলতে দেব না। ভুলতে দেবনা আমাকে, আমার ভালবাসাকে।

: কি তৈমুর ভাই খারাপ লাগছে?

কমু কলিকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ায় তৈমুর পাশে। জিজ্ঞাসা করে—শরীর খারাপ লাগছে কি?

: কৈ নাগে ?

: তবে একা একা বসে আছেন যে ?

: একমনে গান শুনবার জন্য ।

মিথ্যাই বলে চলে তৈমুর, সত্য সে বলতে পারে না। আর বলবেই বা কেমন করে ? কেমন করে সে বলবে যে আজকের উৎসব ও'র মনে আলোড়ন তুলে দিয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ও'র মনে। রয়ে রয়ে জ্বলছে যে আগুন আর সেই আগুনে সে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। ও'যে চায় ওদেরই মত—ভালবাসার সাসার গড়তে। আনন্দে খুশীতে ভরা যে সংসার। ভালবাসায় ভরা যে সংসার আনজুম ও'কে ভাল না বাসুক, কমলা রংয়ের মেয়েটা ও'কে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিক গান গাওয়া মেয়েটাও। কিন্তু তবু, কেউ একজন ও'কে ভালবাসুক। ভালবেসে রাজা করে দিক, সম্রাট করে দিক, মাতোয়ারা করে দিক। সে আজ তৃষ্ণার্ত। ভালবাসা মদিরায় ডুব দিয়ে সে আজ তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায়। সে আজ মজনু হতে চায় দেওয়ানা হতে চায়। তৈমুর আর ভাবতে পারে না। সমস্ত শরীরটা শীন শীন করে উঠে যেন, সে উঠে দাঁড়ায়।

: আমি চলি কমু।

: সে কি ! এত সকাল সকাল !

: আমার একটা কাজ আছে। আর একদিন শুনাবেন। শাকীর এগিয়ে এলো।

কৈ চললে যে তৈমুর ? বস, গান শেষ হলে যেয়ো।

: জরুরী একটা কাজ আছে, এখনি তা নইলে বসতাম নিশ্চয়ই।

তৈমুর বেড়িয়ে যায় ঘর থেকে। সে সইতে পারছে না। সইতে পারছে না এখানকার এ-আনন্দ এই উচ্ছ্বাস এই সুখ। বেড়িয়ে সে ছুটে চলে উদ্‌ভ্রান্তের মত কে যেন ওর মনটাকে চাবুক মেরে মেরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে ও'র মনটা, খালি খালি লাগছে ওর বুকটা। তৃষ্ণার্ত, বড় তৃষ্ণার্ত ওর হৃদয়টা আজ। বড় ক্ষুধার্ত আজ সে।

যে যা চায়

সরসী সরকার

চন্দ্রিমাদের বাড়ীতে আজ মহা ধুমধাম, দারুণ সোরগোল। সবাই ব্যস্ত, তটস্থ। গোটা বাড়ীটা ঘসেমেজে ঝকঝকে তকতকে করা হ'য়েছে। দোতালার হলঘরের চেহারা পাল্টে গেছে। মেঝেতে ফরেন কার্পেট, দেওয়ালে নতুন রঙ, জানালা দরজায় বাহারী পর্দা। ডানলোপিলোর সোফাসেট ঘরের মাঝখানে রাখা। সুন্দর সুন্দর ফ্লাওয়ার ভাস। প্রতিটিতে তাজা ফুলের গোছা। লাল, সাদা, হলদে, গোলাপী নানা রঙের। দেখলে ভাললাগে, মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ফ্লিরপো থেকে নামী ও দামী খাবার আনা হ'য়েছে। মোটকথা আজ এ বাড়ীতে এলাহি কাণ্ডকারখানা।

চন্দ্রিমার দাদা সন্দীপ চ্যাটার্জী আর মা অলকাদেবী ছটফট করছেন, চাকর বাকরদের উপদেশ দিচ্ছেন, কখন কী করতে হ'বে, কীভাবে করতে হ'বে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

এখন বিকেল পাঁচটা। একঘন্টা পরেই গৌতম মুখার্জী আসবে এবাড়ীতে। আসবে চন্দ্রিমাকে দেখতে। সেজন্যেই এসব ব্যবস্থা, এতসব আয়োজন।

গৌতম মুখার্জী। বিখ্যাত স্যার সি, আর, মুখার্জীর একমাত্র পুত্র। মুখার্জী এস্টেটের মালিক। রূপে গুণে নাকি অদ্বিতীয়। তার সঙ্গেই চন্দ্রিমা চ্যাটার্জীর বিয়ে হ'তে যাচ্ছে।

গৌতমের মা নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে এগিয়ে এসেছেন। আসবেন নাই বা কেন? গৌতমের বাবা তো মারা গেছেন বছর দু'য়েক আগে। ছেলের বিয়ের সব ব্যবস্থা তো মিসেস মুখার্জীকেই করতে হ'বে এখন।

গৌতম হীরের টুকরো। তার সারা অঙ্গে যেন হীরের দ্যুতি। টাকা-কড়ি, বাড়ীগাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এদের কম নয়। এরা কলকাতার বিখ্যাত ধনী ও অভিজাত পরিবার। এ ঘরে মেয়ে দেয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

অলকাদেবীর কানে গৌতমের মা মিসেস সি. আর, মুখার্জীর কথাগুলো এখনো সুর হ'য়ে বাজছে। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে মুখার্জী

ম্যানসন থেকে কোন আগ্রহে। আবার যে সে নন, স্বয়ং মিসেস মুখার্জি তাঁকে ফোনে কথা বললেন। তাই প্রথমে তিনি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। আমতা আমতা করে বলেছিলেন, আপনি, আপনি মিসেস সি, আর মুখার্জী। নমস্কার, নমস্কার। দেখুন তো আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি আমাকে ফোনে ডাকবেন।

শুনুন। অপর প্রান্ত থেকে মিসেস মুখার্জীর গলা ভেসে এসেছিল। আপনার মেয়ে চন্দ্রিমার সঙ্গে আমার ছেলে গৌতমের বিয়ে দিতে চাই। আপনার মত কী ?

অলকাদেবী হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন যেন। আনন্দে বিস্ময়ে কেমন যেন হ'য়ে গিয়েছিলেন। মেয়ে ও ছেলেকে ডেকে তখুনি কথাটা শোনাতে চেয়েছিলেন। চন্দ্রিমা এত ভাগ্য করে এসেছে তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। পরক্ষণে নিজেকে সংযত করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, মিসেস মুখার্জি, আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনি চন্দ্রিমাকে বৌ করতে চাইছেন। আমাদের কোন আপত্তি নেই। একদিন আসুন, চন্দ্রিমাকে দেখে যান।

অলকাদেবী বিয়ের কাজকথা একেবারে পাকা করে ফেলতে চেয়েছিলেন তাড়াতাড়ি।

না, না। আমার যাওয়ার দরকার হবে না। চন্দ্রিমাকে আমি দেখেছি। আমার ভাল লেগেছে, পছন্দ হয়েছে। গৌতম যাবে চন্দ্রিমাকে দেখতে। আপনারাও দেখবেন গৌতমকে। যদি উভয় পক্ষের পছন্দ হয়, আসছে মাসে বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে।

আজ গৌতম মুখার্জী আসছে। এজন্যেই তো এবাড়ীতে এত চঞ্চলতা, এত অস্থিরতা।

চন্দ্রিমার চোখে মুখে খুশীর আমেজ। সেজেগুজে বসে আছে। অবশ্য সাদাসিদে সাজগোজ। চন্দ্রিমা কলকাতা ইউনিভারসিটিতে এম, এ, পড়ে। চটপটে। আধুনিকা। সোবার, কালচার্ড। দেখতে সুন্দরী। অপূর্ব গড়ন। দেহে সৌন্দর্যের পসরা। উগ্র সাজসজ্জা মোটেই পছন্দ করে না।

চন্দ্রিমার মনে এত আনন্দ কেন ? তাহলে তার অবচেতন মনও কি মুখার্জী ম্যানসনের বৌ হবার জন্যে ব্যস্ত। নইলে এমন হচ্ছে কেন ? গৌতম মুখার্জীর নামে দেহমনে পুলক ছড়াচ্ছে, বুকের ভিতর টকটক শব্দ হচ্ছে। চন্দ্রিমা যেন স্বপ্ন দেখছে। জেগে জেগে স্বপ্ন। গৌতম এল। তার লম্বা

চওড়া বলিষ্ঠ দেহ, টানাটানা চোখ, দীর্ঘ চোয়াল, ফর্সা রঙ, চোখে মুখে সৌন্দর্যের দ্যুতি। চন্দ্রিমাকে দেখল। অবাক হল। চন্দ্রিমা এত সুন্দরী তা বোধহয় গৌতম কল্পনাও করতে পারেনি। তাই সে অপলক চোখে চন্দ্রিমাকে দেখতে লাগল। চন্দ্রিমাও কম যায় না। সেও তাকিয়ে রইল। গৌতম যেন তার কত যুগের চেনা জানা। তার মত সুপুরুষের জন্যেই যেন চন্দ্রিমা এতদিন অপেক্ষা করছিল—এমন ভাব দেখাল। কয়েকবার মুচকি হাসল। গৌতম চন্দ্রিমার সঙ্গে আলাপ করল, গল্পগুজব করল। তারপর ওখানেই বলে ফেলল, চন্দ্রিমাকে পছন্দ হয়েছে, সে তাকে বিয়ে করবে।

ভাবতেই চন্দ্রিমার গা শির শির করে উঠল। একটা মিষ্টি মধুর অনুভবের স্রোত বয়ে গেল তার দেহের শিরা উপশিরায়, অনুপরমানুতে। বিখ্যাত মুখার্জী ম্যানসনের একমাত্র ছেলে গৌতম মুখার্জী যাকে বিয়ে করার জন্যে বহু মেয়ে পাগল, তারই বৌ হতে চলেছে চন্দ্রিমা। বাড়ী গাড়ী, সোস্যাল স্ট্যাটাস, বিলাস ব্যসন কোন কিছুরই অভাব নেই গৌতম মুখার্জীর। আঃ! চিন্তা করতেই দেহমন পুলকে ভরে উঠছে চন্দ্রিমার। তার ইউনিভারসিটির বন্ধুরা টেরা হয়ে যাবে। ভাবতেই পারবে না এটা কীকরে সম্ভব হল!

আচ্ছা, মিসেস মুখার্জী কবে দেখলেন আমাকে? আপন মনে বলল চন্দ্রিমা। আশ্চর্য মহিলা! ভাবাই যায় না! এত মেয়ে থাকতে আমাকেই পছন্দ করে বসলেন শেষ পর্যন্ত। মহিলার শিল্পবোধ আছে দেখছি। থাকাই স্বাভাবিক। ওদের নেই কী? সব আছে। আধুনিক যুগে যা যা দরকার সব। যাক বাবা, মিসেস মুখার্জী, থুড়ি আমার ভাবী শাশুড়ীর যখন ভাল লেগেছে আমাকে তখন তাঁর পুত্রেরও নিশ্চয়ই অপছন্দ হবে না।

একথা ভাবতে ভাবতে চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী মস্ত ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর এক সময় নিজের জায়গায় এসে বসল।

মাসিমা, কেমন আছেন? ঘরে ঢুকেই অলকাদেবীর পায়ের ধুলো নিল সিদ্ধার্থ।

আরে কতদিন পর এলে! বস সিদ্ধার্থ। অলকাদেবী হেসে বললেন।

মনে মনে তিনি কিন্তু বিরক্ত হলেন। ঠিক এসময় সিদ্ধার্থকে দেখে খুশী হতে পারলেন না। তাঁর চোখ মুখ কুঁচকে উঠল। সিদ্ধার্থ ঠিক এসময়ে এ বাড়ীতে অবাঞ্ছিত।

চন্দ্রিমা সিদ্ধার্থের দিকে এক পলক তাকাল। ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

কী ব্যাপার তোমার এত সাজগোজ? কোথাও বেরোবে নাকি?

না। এমনি। চন্দ্রিমা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল। আজকের দিনে সিদ্ধার্থ আসুক, এখানে বসে বসে তার সঙ্গে গল্প করুক—চন্দ্রিমাও এটা চায় না।

কয়েক দিন তুমি ইউনিভারসিটি যাচ্ছ না? তাই আজ খোঁজ করতে এলাম। সিদ্ধার্থের গলায় আন্তরিকতার সুর।

আসলে কী জান সিদ্ধার্থ। আজকে এখুনি বিখ্যাত স্যার সি, আর, মুখার্জীর ছেলে গৌতম মুখার্জী চন্দ্রিমাকে দেখতে আসবে। গৌতম খুব ভাল ছেলে। সুন্দর দেখতে। আমাদের ভীষণ পছন্দ। মিসেস মুখার্জীও চন্দ্রিমাকে পছন্দ করে ফেলেছেন। এখন গৌতম রাজী হলেই বিয়ে হয়ে যাবে, চন্দ্রিমা মুখার্জী ম্যানসনের বৌ হবে। এসব ব্যাপারে আমরা কয়েক দিন দারুণ ব্যস্ত ছিলাম। অলকাদেবী টেনে টেনে বললেন।

সিদ্ধার্থের মুখে কে যেন কালি ছিটিয়ে দিল। সে কেমন হয়ে গেল। এরকম ভাবেনি। অসহায় অবস্থার মধ্যে সে একবার চন্দ্রিমার দিকে তাকাল।

চন্দ্রিমার মুখে হাসি, চোখে স্বপ্ন। সে বিখ্যাত মুখার্জী বংশের বৌ হতে চলেছে। এসব ছোটখাটো ব্যাপারে নজর দেবার তার এখন সময় কোথায়?

আমি আসছি। তোমরা বস। কথা বল। অলকাদেবী ঘর ছেড়ে বাইরে গেলেন।

সিদ্ধার্থ চন্দ্রিমার দিকে শুকনো মুখে তাকাল। তার দৃষ্টিতে কারুণ্য, বিষাদ।

এমন দিনে না এলেই ভাল করতাম বোধহয়। আমাকে তোমরা আজকে সহ্য করতে পারছ না। সিদ্ধার্থের গলার স্বরে বেদনা প্রকাশ পেল।

চন্দ্রিমা চুপচাপ, নীরব, ভাষাহীন।

তুমি কিছু বল, চন্দ্রা। চুপ করে থেক না। আমার খারাপ লাগছে।

কেন? খারাপ লাগার কী আছে?

আমি, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কি তা বোঝ না? তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী অবাক হল। সে এটা বোধহয় শুনতে চায়নি সিদ্ধার্থের কাছ থেকে। তাই চোখে মুখে বিস্ময় নিয়ে বলে উঠল, এসব কী বলছ ? তুমি আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড। তোমাকে বিয়ে করবো একথা ভাবতেই পারিনে।

কেন ? ক্লাস ফ্রেণ্ডকে কি বিয়ে করা যায় না ?

যাবে না কেন ? যায়। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি নে। কী করে বিয়ে করবো ?

বা ! তোমার আমার কত ঘোরাঘুরি, কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা, মেলামেশা—এসব বৃথা ! তুমি আমাকে ভালবাস না ! তাহলে এতদিন আমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্টভাবে মিশলে কেন ?

তুমি যে উকিলের মত জেরা সুরু করলে। আসলে তোমাকে আমার ভাললাগে, সিদ্ধার্থ। ভাললাগা আর ভালবাসা এক জিনিস নয়।

তাহলে এ ভাললাগার মোহে দিনের পর দিন আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছ, হেসেছ, কথা বলেছ, আমার বুকে মাথা রেখেছ, আমাকে চুমু দিয়েছ ? আশ্চর্য ! এসব প্রেম ভালবাসার তাগিদে নয় ? শুধু ভাললাগার জন্যে ? বিস্ময়ে ফেটে পড়তে চাইল সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ তোমাকে আমার ভাল লাগত, এখনো লাগে। কিন্তু তা বলে সে ভাললাগা বাসর ঘরে গিয়ে পৌঁছুক এ আমি চাইনে। তোমাকে নিয়ে ঘোরা ফেরা করা যায়। সিনেমা থিয়েটার যাওয়া যায়, হোটেল রেস্টুরেণ্টে খাওয়া যায়, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করা যায় না। বিয়ে একটা মস্ত ব্যাপার। সেখানে অনেক কিছু জড়িত। যার কিছুই নেই তোমার, সিদ্ধার্থ।

ও, বুঝেছি। তুমি ঐশ্বর্যের লালসায়, বিলাসিতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছ। আভিজাত্যের আসক্তি তোমাকে পেয়ে বসেছে। তাই তুমি এসব বলছ।

সিদ্ধার্থ এভাবে কথা বলনা প্লিজ। তুমি প্রাকৃটিক্যাল হও। জীবন কবিতা নয়, কল্পনা নয়। একে সিরিয়াসলি নেয়ার চেষ্টা করো। সাময়িক ভাবাবেগে কোন কাজ করো না। দুঃখ পাবে। স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়ে বাস্তববাদী হও, তবেই জীবনে শান্তি পাবে।

তোমার উপদেশ রাখ। প্রাকৃটিক্যাল হওয়া মানে তো তোমার মতে জীবনের অনুভূতিকে থেঁতলে মারা, প্রেম ভালবাসাকে মাড়িয়ে যাওয়া। দোহাই তোমার এমন এডভাইস আমাকে দিও না।

সিদ্ধার্থের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। চন্দ্রিমা এমন করবে সে ভাবতেই পারেনি। হায় ! হায় !

সিদ্ধার্থ চন্দ্রিমার দিকে ছলছল দৃষ্টিতে চাইল। বলল, আজ যদি গৌতম মুখার্জীর মত সুপুরুষ ও ধনবানের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা না হত, তাহলে তুমি আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে পারতে না।

কী হত আর কী হত না—তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তুমি আমাকে ভুলে যাও। তোমাকে আমি ভালবাসি নে। তুমি অন্য মেয়েকে বিয়ে করো, সুখী হও। আমাকে মুক্তি দাও।

সিদ্ধার্থ বোবা হয়ে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

অলকাদেবী ঘরে ঢুকলেন। বিরক্ত হলেন। মনে মনে বললেন, মহা জ্বালায় পড়া গেল। এখুনি গৌতম আসবে। যদি এসে চন্দ্রিমা আর সিদ্ধার্থকে এভাবে দেখে কী ভাববে কে জানে। কী বলে পরিচয় দেবেন তিনি? চন্দ্রিমার বয়ফ্রেণ্ড? ছিঃ ছিঃ! তাহলে গৌতম চন্দ্রিমাকে বিয়ে করবে? কী মুশকিলেই না পড়লেন অলকাদেবী।

বাইরে কিন্তু কিছুই বললেন না তিনি। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার তোমরা চুপচাপ কেন? কথা বলছ না যে?

না, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এখন চলি মাসিমা। চন্দ্রিমার বিয়েতে আসবো। সিদ্ধার্থের গলা ঠাণ্ডা, শীতল মনে হল।

অলকাদেবী খুশী হলেন। স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেললেন। ভদ্রতার খাতিরে বললেন, বসনা আরো কিছুক্ষণ। গৌতম আসবে আলাপ করে যাও। আনন্দ পাবে। খুব ভাল ছেলে। যেমন রূপে তেমনি গুণে। মুখার্জী এস্টেটের সর্বেসর্বা। এদের লাখ লাখ টাকা। ইম্পালা চড়ে আসবে। চন্দ্রিমা কপাল করে এসেছিল বটে। নইলে এমন কার্তিকের মত ছেলে পাচ্ছে। সুখ ঐশ্চর্যের রানী হয়ে সারা জীবন কাটাতে পারবে চন্দ্রিমা।

সিদ্ধার্থের মুখে তির্যক হাসি ফুটে উঠল। আশ্চর্য! এরা সব কী? এরা সব অর্থ পিশাচ। অর্থের. ধনসম্পদের লালসায় এরা অন্ধ। বিলাস ব্যাসনে. দেহেররূপে এরা মোহগ্রস্থ। এরা মনের দাম দেয় না, এরা হৃদয়ের অনুভূতির বিচার করে অর্থের মানদণ্ডে। এদের কাছে দয়ামায়া, প্রেম ভালবাসা বলে কিছুই নেই। এরা হৃদয়হীন স্বার্থপরের দল। শুধু এরা দাম দেয় বাড়ী গাড়ীকে, বিষয় সম্পদকে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সকে, সামাজিক পদমর্যাদা আর দৈহিক রূপকে।

চলি মাসিমা। বিদায় চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী। সিদ্ধার্থ আর দাঁড়াল না

পায়ে পায়ে রাস্তায় নেমে এল। কলকাতার রাজপথে হারিয়ে গেল।

ঘড়ির দিকে তাকালেন অলকাদেবী। অবাক কাণ্ড! সাড়ে ছ'টা বাজে। এখনো গৌতম এল না। ব্যাপার কী? ছটফট করতে লাগলেন. ব্যালকনিতে গেলেন। ঝুঁকে যতদূর দেখা যায় দেখলেন। না, কোন বড় গাড়ী নজরে এল না। আস্তে আস্তে চন্দ্রিমার কাছে এসে বসে পড়লেন অলকাদেবী।

চন্দ্রিমা বসে আছে। মিষ্টি মধুর স্বপ্নে বিভোর। মাঝখানে এ স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল। সিদ্ধার্থ এসে তাকে কিছুক্ষণ বিরক্ত করে গেল। এখন আবার গৌতমের স্বপ্নে চন্দ্রিমা সাঁতার কাটতে লাগল।

অলকাদেবী আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি যোধপুর পার্কে মুখার্জী ম্যানসনে ফোন করলেন।

মিসেস মুখার্জী বললেন, দেখুন তো কী লজ্জার কথা! গৌতম বেরিয়েছে সেই তিনটেয় জরুরী কাজে। এখনো ফিরল না।

ভদ্রতার হাসি হেসে অলকাদেবী বললেন, তাতে কী হয়েছে। কাজের মানুষ তো। কোথায় আটকে পড়েছে।

কালকে গৌতমকে নিয়ে আমি নিজে সকাল দশটায় যাবো। আপনারা রেডি থাকবেন।

আচ্ছা। আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো বুঝতে পারছিনে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

লাইনটা কেটে গেল। অলকাদেবী খুশী হলেন। গৌতমের মা আসছেন। ভালই হলো। এ যেন শাপে বর। সবদিক থেকে সুবিধে।

পরের দিন আটটা নাগাদ ফোন করলেন মিসেস মুখার্জী। তাঁরা আসতে পারবেন না। গৌতম দিল্লী যাচ্ছে এগারটার প্লেনে। বিশেষ কাজ। না গেলেই নয়। দিল্লী থেকে ফিরলে সব ব্যবস্থা হবে।

অলকাদেবী মুষড়ে পড়লেন। একটার পর একটা বাধা। শুভ কাজ কিছুতেই এগুতে চাইছেনা। কী আর করা যাবে! অপেক্ষাই করতে হবে।

চন্দ্রিমা ইউনিভারসিটি যায় আসে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু কথা হয় না। সিদ্ধার্থ চন্দ্রিমার দিকে ফিরেও তাকায় না। সিদ্ধার্থ মন মরা, সে যেন কেমন হয়ে গেছে। উচ্ছল, হাসিখুশী ছেলেটা যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রিমার মন কেমন করে উঠল। সিদ্ধার্থের জন্যে দুঃখ হল। সঙ্গে সঙ্গে রাগ পড়ল গৌতম মুখার্জীর ওপর। কী এমন কাজের লোক হে! কনে দেখার সময় নেই যার, বিয়ে করে সে বৌ এর সঙ্গে প্রেম করার সময় পাবে কোথায়?

গৌতম মুখার্জীর ওপর বিষিয়ে উঠল চন্দ্রিমার মন। আগের মত আর তাকে ভাল মনে মেনে নিতে পারছে না।

কয়েকদিন পর অলকাদেবী গৌতমের মাকে ফোন করলেন। মিসেস মুখার্জী আমতা আমতা করে বললেন, গৌতম বিয়ে করতে চাইছে না। আমাকে ক্ষমা করুণ। আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে আপনাকে এসব বলতে।

অলকাদেবী অগাধ জলে পড়লেন। বিয়েটা হল না। চন্দ্রিমার কপাল মন্দ। নইলে এমন হবে কেন?

চন্দ্রিমা শুনে কান্নার হয়ে উঠল। মুখার্জী পরিবারের ওপর শ্রদ্ধা হারাল। আশ্চর্য! ওরা এমন। কথা দিযে কথা রাখে না। ওদের টাকা আছে, ঐশ্বর্য আছে বলে ওরা যা তা বলবে, যা তা করবে। না, না। এসব চলবে না। এসব অন্যায়, এসব অশোভন। এসব মেনে নেয়া কখনোই উচিত নয়। গৌতম মুখার্জীর শিক্ষা হওয়া দরকার। যাতে অন্য কারো সঙ্গে ভবিষ্যতে সে এরকম ব্যবহার না করে।

চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী দৃঢ় সঙ্কল্প। গৌতম মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে হবে, কৈফিয়ৎ চাইতে হবে। কেন সে এমন খেলা করল তাকে নিয়ে।

চন্দ্রিমা দেরী করল না। একদিন কাউকে কিছু না বলে যোধপুর পার্কে মুখার্জী ম্যানসনে হাজির হল।

মস্ত কম্পাউণ্ড। বিরাট প্যালেসের মত বাড়ী। সাদা ধবধব করছে। লন পার হয়ে যেন বিল্ডিং-এ ঢুকল চন্দ্রিমা।

একজন দারোয়ান তার দিকে এগিযে এল। জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল।

গৌতম মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। চন্দ্রিমার গলা গম্ভীর, কঠোর।

যান, সোজা চলে যান লবি ধরে। দারোয়ান নিজের কাজে চলে গেল।

মোজাইক করা লবিতে দেহের ছন্দ তুলে তুলে হাঁটতে লাগল চন্দ্রিমা। একদিন এ বাড়ীতে মহাসমারোহে বৌ হয়ে তার ঢোকার কথা। অথচ আজ সে এখানে অনাহূত। কেউ তাকে চেনে না, জানে না। মন মোচড়

দিয়ে উঠল চন্দ্রিমার। একটা দারুণ ব্যথা অনুভব করল সে। চন্দ্রিমার খুব খারাপ লাগছে। তার চোখ মুখ বিষণ্ণ, করুণ। না এলেই বোধহয় ভাল করত সে।

সামনে একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল চন্দ্রিমা, আচ্ছা, গৌতম মুখার্জীকে কোথায় পাওয়া যাবে ?

লোকটি একবার ভালকরে দেখল চন্দ্রিমাকে। কী যেন ভাবল একটু। তারপর হাত লম্বা করে দেখিয়ে বলল, ওই যে দরজা দেখছেন। ভিতরে ঢুকে যান। ওকে পাবেন।

চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠোঁট কামড়ে কী যেন চিন্তা করল। তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

ঢুকেই যেন ভূত দেখল চন্দ্রিমা। সে আশাই করতে পারেনি এরকম হবে। কিন্তু হল। মানুষ যা ভাবে তা বোধহয় হয় না।

ঘরে বিরাট টেবিল। তার একপাশে বসে আছে একজন লোক। তিরিশ বত্রিশ বছর বয়স হবে। কালো। মুখে দাগ, মাথায় টাক। ঠোঁট মোটা নিগ্রোদের মত। নাদুস নুদুস চেহারা। দেখতে কুৎসিত, কদাকার।

চন্দ্রিমা ভয় পেয়ে গেল।

আমিই গৌতম মুখার্জী। বলুন কী বলবেন ? কর্কশ গলায় যেন দৈত্যের মত হুঙ্কার ছাড়ল লোকটি।

চন্দ্রিমা কেমন যেন হয়ে গেল। তার আর কৈফিয়ৎ চাওয়া হল না। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক, বাঁচা গেছে! এমন দৈত্যের সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। চন্দ্রিমার কপাল ভাল। চন্দ্রিমা চায় না এমন কুৎসিত পুরুষকে বিয়ে করতে। এর যত টাকা থাক, যত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থাক, যত ধনঐশ্বর্য আর বংশ মর্যদা থাক না। এমন কদাকার লোককে নিয়ে যে ঘর বাঁধবে বাঁধুক, চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী বাঁধবে না, মরে গেলেও না।

চন্দ্রিমা ঘুরে দাঁড়াল। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বাইরে এল।

অনেক দিন পর আজ রাতে আবার স্বপ্ন দেখল চন্দ্রিমা। সিদ্ধার্থের স্বপ্ন। সিদ্ধার্থ মুখ টিপে টিপে হাসছে শুধু।

ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘামতে লাগল চন্দ্রিমা চ্যাটার্জী।

স্বপ্নের ভেতর

নির্মলেন্দু গৌতম

অরুণ বুঝতে পারলো বাসবীর দু'চোখ ভ'রে ঘুম এসেছে। বাসবীর পেছনের সীটে একটুখানি বাঁদিক ঘেঁসে বসেছে অরুণ। বাসের অনুজ্জ্বল আলো ভীড় আর বাসের জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া পথের চলন্ত ছবির মধ্যে বাসবীর ঘুমে ভারী হয়ে ওঠা চোখ দুটো আশ্চর্য লাগছে অরুণের। চশমার পুরু কাঁচের দেয়ালের মধ্যে বাসবীর চোখে যেন কিছুটা ক্লান্তি জমে আছে। সব মিলিয়ে বাসবী যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে উদাসীনতার স্পর্শে।

অরুণ তাকিয়েই থাকলো বাসবীর দিকে।

বিকেলের দিকে ইউনিভারসিটি থেকে তারা একদল বেরিয়ে পড়েছিলো। বাগবাজারে শুভেনদের বাড়িতে বিরাট একটা নেমন্তন্ন ছিলো। শুভেন তাদের পুরোনো বন্ধু। হঠাৎ বিয়ে করছে। নেমন্তন্ন ক'রে গিয়েছিলো ইউনিভারসিটিতে এসে। না হ'লে অবশ্য পেতো না সবাইকে।

নেমন্তন্নটা শুধু খাবার জন্য ছিলো না। জমজমাট একটা আড্ডা দেবার জন্যেও নেমন্তন্ন ছিলো। দুটোই পুরোপুরি মিটিয়ে আসতে হয়েছে। অরুণের অসম্ভব ভালো লাগছিলো ব'লে একবারের জন্যেও ব্যস্ত হয়নি। বাসবীকে অন্যভাবে পেয়েছিলো আড্ডার সময়টুকুতে। সে পাওয়াটা একটা বাড়তি লাভ ব'লে মনে হয়েছিলো অরণের।

বোধহয় বাসবীরও অমনি কিছু একটা মনে হয়েছিলো। সে জন্যে বাসবীও ব্যস্ত হয়নি।

শুভেনের জন্য আড্ডা দিতে এসে অরুণ এবং বাসবী সবার অলক্ষ্যে নিজেরাই একটা উৎসব সাজিয়ে নিয়েছে নিজেদের বুকের মধ্যে। সে উৎসব অন্যরঙে, অন্য আলোয় অম্লান হয়ে থাকে। এই-ই বোধহয় হয়ে থাকে চিরদিন।

শুভেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাসবী বলেছিলো, 'ইস, অনেক দেরী হয়ে গেলো আজকে।'

অরুণ বলেছিলো, 'মাঝে মাঝে বোহিমেন্নীর মতো সময় খরচ করা উচিত।'

বাসবী বলেছিলো, 'কথাটা ঠিক বলেছো কিন্তু।'

বলেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো বাসবী। নিশ্চয়ই কিছু সময় আগের আড্ডার কথা মনে পড়েছিলো তার।

'তোমার বাড়িতে কেউ তোমার জন্য ভাববে না এ আমি জানি।'

ব'লে একটুখানি রহস্যময় হাসি হেসে অরুণ বলেছিলো, তোমার তো বাড়ির সবাই তো জানে, অরুণ নামে একটি ছেলে আজ তোমার বডিগার্ড হয়ে থাকবে।'

বাসবীও হেসে ফেলেছিলো সঙ্গে সঙ্গে। বলেছিলো, 'সত্যি কথা বলতে তোমার জুড়ি নেই কিন্তু।'

শুভেনের বাড়ি যাবার সময় ট্যাক্সিতে গিয়েছিলো সবাই। ফেরার সময় কিন্তু ট্যাক্সি করলো না। একটু রাত হবার জন্য ভীড ছিলো না বাসে। সুতরাং বাসেই উঠে পড়েছিলো তারা।

উঠেই জায়গা পেয়ে গিয়েছিলো বাসবী। তার অল্পক্ষণ পরে বাসবীর ঠিক পেছনেই জায়গা পেয়েছিলো অরুণ।

পেছনে বসেই অরুণ দেখতে পেয়েছিলো বাসবী যেন তলিয়ে যাচ্ছে ঘুমের মধ্যে। ইচ্ছে করেই বাসবীকে ডাকেনি অরুণ। সচেতনও ক'রে দেয়নি। ভেবেছে বাস থেকে নেমে এনিয়ে ঠাট্টা করবে বাসবীকে।

কথাটা এই মুহূর্তে আরেকবার ভেবেই বাসবীর ঘুমে নিবিড় হয়ে ওঠা চোখ দেখলো অরুণ। কেন জানি, অনেক বেশী ভালো লাগলো বাসবীকে।

বাসবীকে কোনোদিন ঘুমিয়ে থাকতে দেখেনি অরুণ। আজই প্রথম দেখলো। ঘুমোলে বাসবীকে নিষ্পাপ একটি কিশোরী বলে মনে হয়। কৈশোরে সম্ভবতঃ এমনিই দেখতে ছিলো বাসবী। একটা গাঢ় নীল রঙের ফ্রক কেউ যদি এখন বাসবীকে পরিয়ে দেয়, তাহলে কৈশোরের রমণীয় লাবণ্যে টলমল ক'রে উঠবে বাসবীর শরীর। ফ্রকের নীল রঙের আভায় বাসবীর কিশোরীর মতো মুখ আরো নিষ্পাপ হয়ে উঠবে।

'নিষ্পাপ' কথাটা মনে পড়তে অরুণের মনে হলো ঘুমিয়ে নিশ্চয়ই একটা স্বপ্ন দেখছে বাসবী। সে স্বপ্নের ভেতর বিস্ময় আছে, সুখ আছে। সে স্বপ্নে কৈশোরের নিবিড় ইচ্ছে জড়িয়ে আছে। না হলে এমনি কিশোরীর মতো নিষ্পাপ মুখ কি ক'রে হবে। অরুণ সেই স্বপ্ন নিয়ে গভীর ভাবে

ভাবলো। বাসবীর চোখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করলো।

টের পেলো মৃদু একটা উত্তেজনা বুকের ভেতর তরঙ্গিত হচ্ছে। বাস-বীকে ছুঁতে ইচ্ছে করলো তার।

মনে হলো, বাসটা কোনো স্টপে না দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে চলতে থাকুক। দু'পাশের মানুষ আলোয় ভেসে যাক। তারপর এক সময় নির্জনতার মধ্যে পৌঁছে যাক বাসটা। বাসবীর স্বপ্নের ভেতর অরুণ তাহলে অবলীলায় পৌঁছে যাবে। সেখানে বাসবীকে ছুঁলে ফুলের পাঁপড়ির মতো আলোয় হাওয়ায় নিজেকে মেলে ধরবে বাসবী। তার সৌরভে দুলে উঠবে চতুর্দিক। অরুণও দুলে উঠবে। আর সেখানেই জন্ম নেবে ভালোবাসার পুষ্পিত প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণে পাখীর মতো খেলা করবে তাদের ইচ্ছের শিশুরা।

এমনি অলৌকিক ভাবনার মধ্যে গোটা পথটাই ডুবে রইলো অরুণ। ট্রাঙ্গুলার পার্কের কাছে এসে বাসটা দাঁড়াতে হঠাৎ অরুণের যেন মনে পড়লো, এবার তাদের নেমে পড়তে হবে।

বাসবী এখনও ঘুমোচ্ছে। না ডাকলে বাস ডিপো পর্যন্ত চলে যাবে। মনে মনে হাসলো অরুণ। বাসবীর খুব কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললো, 'বাসবী, আমরা এখানে নামবো।'

চমকে ফিরে তাকালো বাসবী। দ্রুত উঠে দাঁড়ালো। একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো, 'তাইতো। এখানেই তো নামবো।'

দ্রুতপায়ে দু'জন বাস থেকে নীচে নেমে এলো।

একটা সিগারেট ধরালো অরুণ।

বাসবী ডানহাতে খোপাটাকে শিথিল ভাবে একটুখানি ঠেলে দিয়ে বললো, 'আমায় একটুখানি এগিয়ে দেবে নাকি?'

'হুঁ।'

এবার ছোট্ট একটা হাই তুলে বাসবী বললো, 'তাহলে চলো।'

ফুটপাথে উঠে এলো দু'জন।

ঘড়ি দেখলো অরুণ। দশটা। পথে তেমন লোক নেই। দু'জনে দিব্যি ছড়িয়ে হাঁটতে থাকলো।

বাসবীর চোখে এখনও সেই স্বপ্নের ছবি। হয়তো অন্যকথা বলতে গিয়ে সেই স্বপ্নের কথা অজান্তেই ব'লে ফেলবে বাসবী। নিবিড়ভাবে একবার

বাসবীর দিকে সেই স্বপ্নের কথা শুনবার জন্যেই কথা শুরু করলো অরুণ।

মৃদুস্বরে বললো, 'তুমি বেশ কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়েছো বাসে।'

স্বপ্নের ভেতরেই যেন সলজ্জভাবে হাসলো বাসবী। বললো, 'এতোক্ষণ বাসে ব'সে থাকলে ঘুম না এসে পারে?'

'তোমাকে দেখতে দেখতে এসেছি আমি। ভারি চমৎকার লাগছিলো তোমাকে।'

অবাক হয়ে বাসবী বললো, 'তুমি তো পেছনে বসেছিলে। আমায় দেখলে কি ক'রে?'

তোমার পেছনে বাঁ পাশে বসেছিলাম যে। তোমার বাঁ চোখ বাঁ ভুরু, বাঁ গাল—ঘুমের ভেতর দুলে ওঠা শরীর ভারি নরম মনে হচ্ছিলো। আমি তোমাকে হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলতেও পারতাম।'

তেমনি সলজ্জভাবে হাসলো বাসবী। কিছু বললো না।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে অরুণ বললো, 'আচ্ছা, ঘুমিয়ে তুমি কী স্বপ্ন দেখছিলে বলোতো?

অবাক হয়ে অরুণের দিকে তাকালো বাসবী।

'আমার মনে হচ্ছিলো, অসম্ভব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলে তুমি। এখনও সেই স্বপ্নের ভেতর তুমি আছো।' অরুণ ফের বললো।

বাসবীর চোখের ভেতরে সুখের একটা তরঙ্গ বোধহয় ভেঙে পড়লো। বোধহয় নীল ডানা একটা পাখীর মতো উড়েই হারিয়ে গেলো বাসবী। নিবিড় গলায় বললো, 'তুমি আমায় স্বপ্নের কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে অরুণ। সত্যি অসম্ভব সুন্দর সেই স্বপ্ন। সে স্বপ্নের খবর তুমিও তো জানো। তুমি রাজার মতো সেই স্বপ্নের ভেতর বেড়িয়ে বেড়াও।'

বাসবী আর কিছু বললো না।

বাসবীর সেই স্বপ্নকে বাসবীর সমস্ত শরীরে দেখলো অরুণ। নিজের পায়ে রাজার পায়ের শব্দ শুনলো। সেই পায়ের শব্দে চতুর্দিক ভ'রে দিয়ে বাসবীর পাশে হাঁটতে থাকলো অরুণ।

সাপুড়ে

চুণীলাল মাদিয়া

সাপুড়ে জখিরা গাল গলা ফুলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল। তার ফুঁ দেওয়ার ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল হাপরে হাওয়া ভরছে। সাপের খেলা দেখতে ভিড় হয়েছে খুব। জোড়া কেউটে সাপের খেলা ক্বচিৎ দেখা যায়। উজারিয়ার পাহাড় থেকে খুব কৌশলে এই জোড়া সাপকে ধরেছে জখিরা। বাঁশির সুরে হেলে দুলে ফণা নাচিয়ে যেন নাচছে দুটি সাপ।

খেলাটা খুব জমে উঠেছে। তাকে ঘিরে জনতা রুদ্ধশ্বাসে খেলা দেখছে আর খেলা দেখাতে দেখাতে মাতোয়ারা হয়ে জখিরা প্রাণপণে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। হাঁটু গেড়ে বসেছিল এতক্ষণ—এবার দাঁড়িয়ে উঠল। সাপ দুটি মন্ত্রপূত। মন্ত্র দিয়ে সাপকে বশীভূত করার কৌশল সে আয়ত্ত করেছে—এ দৈবশক্তি সে পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা মারা যাবার আগে তাকে সব শিখিয়ে দিয়ে গেছে। এ বিদ্যা এ অঞ্চলে কারও জানা নেই। গাঁয়ের মোড়লের অনুরোধে সেদিন বিকেলে এই প্রথম তার অর্জিত বিদ্যা প্রয়োগ করে খেলা দেখাচ্ছে।

বাঁশির তালে তালে দুলছে কেউটে সাপ দুটো। বাজরা ক্ষেতে যেমন দোলে তার শীষ, হাওয়ার বেগে ঢেউ তুলে তেমনি দুলছে এক জোড়া কেউটে। তাদের গুণ করেছে জখিরা। আনন্দের সীমা নেই তার। বাবার কাছে শিখেছে যে বিদ্যা তার যেন পরীক্ষা দিচ্ছে আজ—এ পরীক্ষার সামর্থ্য অর্জন করতে দরকার হয় অশেষ সংযম।

সে কত দিনকার কথা। ওর বাবা লাধু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে —আর বৃদ্ধ বয়সের স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম পেতে সংযমেরও বাঁধ ভেঙ্গেছে। তখনই সে মনস্থ করে জখিরাকে সব শিখিয়ে দিয়ে যাবার। এর জন্য প্রয়োজন দুর্জয় মনোবলের এ কাজে দরকার অসীম সংযম— এই কথা বার বার জখিরার কানের কাছে উচ্চারণ করে লাধু জখিরাকে সাবধান করে দিয়েছিল। সে বলেছিল, জখিরাকে তৈরী হতে হবে। যোগী ঋষিদের সাধনার সামিল হতে হবে তাকে। সামান্য বিচ্যুতি মানে সর্বনাশের আওতায়।

জখিরার তখন অল্প বয়স। তবু বাবার সঙ্গে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে শিখেছে সে অনেক। দুনিয়াকে দেখেছে সে একটু একটু করে। তার বাবা কাঁধে ঝোলা নিয়ে চলেছে আর সে চলেছে তার পিছু পিছু—তারও হাত ভর্তি। বিরাট একটা পোঁটলাতে থাকে ছেঁড়া চটের কাপড়। আর আছে ভিক্ষাপাত্র আর অন্যান্য তৈজসপত্র দু'একটা। তার বাবা যখন একনিবিষ্ট হয়ে খেলা দেখাত, জখিরা তখন শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত পথের ওপর—দর্শকরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে যে পয়সা ফেলত, সে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসত।

তার অন্য কাজও ছিল। খেলা দেখানোর আগে সে ঢোল বাজিয়ে লোক জড়ো করত। সে যখন এই সব করত, তখন তার বাবা লাধু গাঁজায় দম দিয়ে নিত শেষ বারের মতো। খেলা দেখানো শেষ হলে অনেকে দর্শনী না দিয়ে চলে যেত। তখন লাধু তাদের অভিসম্পাত দিত। অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত চকিত দর্শক তখন যার যা সাধ্য ছুড়ে ফেলত। কেউ বা পয়সার অভাবে বাড়ি থেকে চাল ডাল এনে দিত। আর সমস্ত কুড়িয়ে জড়ো করার ভার ছিল জখিরার ওপর।

ওরা ছিল যাযাবর। খেলা দেখানোর পর একই গ্রামে থাকবার অধিকার ছিল না তাদের। তাদের ঝোলাঝুলি আর পোষাক আশাক দেখে পুলিশ সন্দেহ করত তাদের ছেলে ধরা বলে--আর সেক্ষেত্রে হয়রানীর সীমা থাকত না। গ্রাম ছেড়ে কোন জংলা পথ ধরে অনেক দূরে চলে যেত ওরা, তারপর রুটি কিনে খেত। যেদিন উপায় হত কম, সেদিন লাধু নিজে উপোষী থেকে জখিরাকেই দিয়ে দিত সব। তারপর সাপ দুটোকে একটু দুধ খেতে দিয়ে ওরা একটু গড়িয়ে নিত। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এক টিলতে জ্যোৎস্না তখন জখিরার কচিমুখে এসে পড়ত। সে স্বর্গীয় সুষমা দেখতে দেখতে লাধুর মনে পড়ত তার স্ত্রীর কথা। মনে মনে বলত, ওই জেনানার প্রেমে পাগল হয়েছিলাম বলেই আমার ক্ষমতা গেল — দৈবশক্তি আমায় ছেড়ে গেল। সংযম চাই। সামান্য ভুল হলেই সর্বনাশ। ক্ষমতা অর্জন এক জিনিষ, তাকে প্রয়োগ করা আরো কঠিন। মনের মধ্যে যখন এমন চিন্তা তোলপাড় করে উঠত, তখন এ কথাও তার মনে উদয় হত আমি নিঃশেষ হয়ে যাবার আগে ছেলেটাকে সব শিখিয়ে দিয়ে যাবো। কেউটে সাপ বশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমার বেটা সব সাপুড়েদের হার মানাক।

একদিন সে জখিরাকে মনের কথা ব্যক্ত করলো। সে জখিরাকে বলল আজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে। সাত্ত্বিক জীবন কঠোর নিয়মে বাঁধা। ছেলে বেলা থেকে জখিরা আত্মসুখ বিসর্জন দিয়েছে। মেয়েদের দিকে সে তাকায় না। নারীমাত্রেই হয় ভগিনী—না হয় জননী। নিজেকে সে পবিত্র রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ যেন ফেটে পড়তে লাগল। বাপের 'শক্তি' আর মায়ের সৌন্দর্য—দুইই পেয়েছে সে। বিশেষ করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করায় সে যেন হয়ে উঠেছে আরও তেজোময়।

এইবার আসল পরীক্ষা। আর সর্ববিদ্যা প্রয়োগ করে এবার তাকে সাপ ধরতে হবে। মন্ত্র পড়ার পরীক্ষা। লোকের মুখে মুখে তখন উজ্জারিয়ার পাহাড়ের কথা। সেখানে নাকি এক জোড়া কেউটে সাপ আছে। অনেক সাপুড়ে তাদের কৌশলে ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সকলের চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। কেউটে সাপ ধরা যাচ্ছে না—এমন একটা খবর জখিরার কানে এসে পৌঁছুল। এই তার পরীক্ষার চরম সুযোগ। সেখানে পৌঁছুবার দুদিন পরেও সে কিছু করতে পারল না। কিন্তু তৃতীয় দিনে সে সফল হল। বাঁশির তালে তালে গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল বিষধর দুটি কেউটে। বিশাল ফণা তুলে নাচছে আবার পরক্ষণেই সর্পিল রেখায় এগিয়ে আসছে—তারপর। জখিরা অচিরেই তাদের মন্ত্র পড়ে বশীভূত করে ফেলল। দুটো সাপ মাটিতে পড়ে রইল যেন দুটো কঞ্চির মতো। ত্রস্ত হাতে তাদের ঝাঁপিতে পুরে ফেলল জখিরা। পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ তার মনে। তবু এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে।

মরবার আগে সাধু বলে গিয়েছিল—'সকল প্রাণী ঈশ্বরের জীব। দিন পনেরোর বেশি তাদের বন্দী করে রাখা উচিৎ নয়। পনের দিনের বেশি বন্দী করে রাখা মানে মূক প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া এবং এ পাপের শাস্তি দেবেন ঈশ্বর। আমাদের নিস্তার নেই। পনের দিনের দিন সাপকে ছেড়ে দিতে হয়। তার আগে সাপ খেলানো অনুচিৎ।'

জখিরা এ উপদেশ ভোলোনি। জখিরা ভেবেছিল বিষধর সাপের বিষ হরণ করে নিলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। তবু তার মনে ছিল অহঙ্কার। সে ভাবত বাঁশির ওপর তার যখন এত দখল, আর মন্ত্র যখন তার নখদর্পনে তখন বিষধর হলেও কেউটেকেও সে বশীভূত করতে পারবে।

এবং সে খবরও ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। সবাই বলাবলি করতে লাগল জখিরা নাকি দুটো এমন কেউটে সাপ ধরেছে যারা বাঁশি শুনেই

নাচে। জখিরা তাদের বিষ বের করে নেয়নি। সে কথা মোড়লের কানেও গেছে। আর তাই সেখানে ডাক পড়েছে জখিরার। গ্রামের মোড়লের অনুরোধেই তার সে দিনের খেলা।

লোক জমে উঠেছে বেশ। গাল গলা ফুলিয়ে একমনে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে জখিরা। তার চোখে এক উন্মাদনা, রঙীন স্বপ্ন। দুটি সাপ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে নাচছে তার বাঁশির মোহিনী মায়ায়—মনে মনে তার একটা আত্মপ্রসাদ লাভ হচ্ছিল। মোড়লের এক সুন্দরী মেয়ে ছিল দর্শকদের মধ্যে। তেজাবাইকে সবাই সে গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী বলে জানত। সাপের খেলা দেখতেই সে এসেছিল—কিন্তু তেজাবাইর চোখ সাপের দিকে নয় বা সাপুড়িয়ার বাঁশির দিকেও নয়—তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সুগঠিত দেহ বলবান ঐ সাপুড়ে জখিরার দিকে। অপলক নেত্র। মনের গভীরে বাসনার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এতদিনে বুঝি সে মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ—কিম্বা টাকাকড়ির লেনদেন—এ সব বিচার করবে তার বাবা—সে দিকে সে মাথা ঘামায় না। তেজার সাধ সে যার ঘরণী হবে, সে হবে সুপুরুষ, বলিষ্ঠ, সুন্দর, ঐ জখিরার মতোই।

নারী ছলনাময়ী। নানা রকম অছিলায় সে জখিরার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। অথচ জখিরা নির্বিকার ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো তার সাধনায় নিমগ্ন। দুটি বন্য প্রাণীকে সে বশীভূত করার সাধনায় ব্রতী। দুরূহ সে ব্রতপালনে অন্যদিকে চোখ দেবার অবকাশ নেই।

কিন্তু চোখ ফেরাতে হল। তেজার হাতের বালার রিণিঝিনি শব্দ শুনে এক পলকের জন্য সে তার দিকে তাকাল। অপূর্ব সুন্দরী তেজাবাইর মুখে দুষ্টু হাসি। জখিরার মন অত সহজে টলেনা। চোখ ফিরিয়ে আবার সে বাঁশিতে ফুঁ দিল।

ওদিকে বিপর্যয় যা হবার হয়ে গিয়েছে। সাপ দুটো যখন চরম আনন্দের শিখরে তখনই হল বাঁশির সুরে ছন্দপতন। একটি মুহূর্তের ত্রুটি—কিন্তু তাতেই তাদের ক্রোধ হল উগ্র। একটি সাপ ছোবল মারল জখিরার হাতে, ঢেলে দিল তার বিষ। তার হাত থেকে বাঁশি পড়ে গেল। জনতা বিভ্রান্ত হয়ে দেখতে লাগল একটা শোচনীয় পরিণতি। ব্যথায় যন্ত্রণায় অস্থির হয়েও জখিরা কোনমতে সাপদুটিকে ঝুলিতে পুরে ফেলল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জখিরা ঐ ঝোলার উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মাটিতে ছড়ানো পয়সা যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল

খবর। জখিরাকে সাপে কেটেছে—এ একটা খবরের মতো খবর।

কেউ বলল, 'দুধ দিয়ে সাপ পোষা যায়? ওর ধর্ম যাবে কোথায়?'

কেউ বলল, 'বিষ হল বিষ। অল্পই হোক, বেশিই হোক।'

কেউ বলল, 'সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্য অমন বিষধর সাপকে নিয়ে খেলা দেখানো নিতান্তই বোকামী।'

কেউ বলল, 'বাড়ি বানাতে গেলে রাজমিস্ত্রিও মরে, মুক্তো খুঁজতে গিয়ে ডুবুরীরাও মরে — সাপ যে সাপুড়েকে কাটবে। এতে আর আশ্চর্য কি!'

কেউ বলল, 'ব্রহ্মচর্য মানা কি চাট্টিখানি কথা — অনেক তপস্যা করলে দেহমন পবিত্র রাখা যায়।

এমনই সব মন্তব্য শোনা যেতে লাগল। ওই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ওঝাকে ডেকে পাঠাল মোড়ল। তার দায়িত্ববোধ আছে। তার আমন্ত্রণেই খেলা দেখানো হচ্ছিল। মন্ত্রের পর মন্ত্র পড়ে ওঝা বিষ নাবাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জখিরা যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তেমনি পড়ে রইল। ওঝা একটা কাপড়কে পাকিয়ে তার মন্ত্র পড়তে লাগলেন। ওই মন্ত্রের গুণে সাপতো বেরিয়ে আসবেই, জখিরার বিষও নেমে আসবে। তারপর ওঝা কাপড়টাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবেন, আর সাপও মরে যাবে। ওঝা প্রচণ্ড বিক্রমে মন্ত্র পড়ছেন, এমন সময় জখিরার মধ্যে একটু প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা গেল। জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। সাপের সঙ্গে মোকাবিলায় ওঝার জয় সুনিশ্চিত এমন একটা গুঞ্জরণও শোনা গেল।

জখিরা অস্ফুট স্বরে বলল, 'কেন ওই মূক প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছেন ওঝাজী। ওদের মেরে ফেলে লাভ কি? আমার শরীরে শুধু যে ওদেরই বিষ আছে, তাতো নয় — আর একটা বিষ আছে — কামনার বিষ। আমি কামের বিষের জ্বালাতে মরছি। আপনার মন্ত্রে কিছু হবে না। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়ল জখিরার প্রাণহীণ দেহ।

জনতা পাতলা হয়ে গেল। তখনও কিন্তু দুটি চোখ স্থির হয়ে আছে তার ওপর। মোড়লের মেয়ে তেজাবাইর কামনা লোলুপ দৃষ্টি একটিবারের জন্যও জখিরার ওপর থেকে সরে যায়নি। *

* গুজরাটি গল্পের অনুবাদ। অনুবাদ—সুকৃতি রায় চৌধুরী

প্রিয়া কে

আবু সাঈদ জুবেরী

বিমল সুখে পড়ে আছি,
আকাশ-করতলে বিম্বিত চাঁদ, মধ্যরাতে
স্বর্ণলতা তুমি, কেনো বা এলে বিবর্ণ হাসি নিয়ে ?

কেনোবা এলে বিবাগী হয়ে ?
সারাদেহে জ্যোৎস্না-শাড়ী,
আকাশ-গায়ে নক্ষত্রের এমব্রয়ডারি পরে,
তুমি এসময়, কেন এলে
সারা কপালে যেনো চাঁদ-ধুলো মেখে ?

কপাল ক্রমশঃ তোমার হচ্ছে বড়, সুখে,
তবে এলেইবা কেনো অযথা ? বিপাকে পড়ে ?
ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমার ? কোমলচেরা শয্যায় ।
বাকী-রাতটুকু শুধু মধুর খেলা, কাটিয়ে দেবে ভেবে ?

তারপর, কেনো বা রেখে যাবে স্মৃতি,
তোমার চুলের আধেক জগৎ,
কটির সুরভি-মাখা জোৎস্নাভুক ফুল-পাখি, সুখ,
আর সুখ নামে আমার বিবর্তিত দুঃখ ।

মামুলি

দুর্গাদাস সরকার

মামুলি কথার ছাঁদে অধুনা কবিতা বাঁধা আছে !
অথচ মানুষ হাঁটে—দুর্দিনের বোঝা নিয়ে তার
মাথার ওপরে। দেখি—শহরে যে-আলোর বাহার
হৃদয়ের সঙ্গে তার যোগ নেই। কবিদের কাছে
সত্য আজ ঢাকা আছে। মূর্ত হয় বাস্তবতা পাছে
সেই ভয়ে দলে দলে অবক্ষয় চিন্তার বিস্তার
করে' দানাপানি খোঁজে, রাজসভা থেকে পুরস্কার
হাতে নিয়ে বাসা বাঁধে একদিন নির্জন কানাচে।

এবং আরেক ধর্মে হতে গিয়ে আন্তর্জাতিক
অন্তর জগতে শূন্য। বোধ আর বোধিতে মেলে না।
নিজের সংসারে নিত্য লক্ষ্যভ্রষ্ট চরিত্রের দেনা
পরিশোধ করতে গিয়ে হোক তারা যতোই তাত্ত্বিক
তাদের পোছে না কেউ, সারাৎসার ব্যর্থ চতুরালি,
ব্যক্তিক উন্মার্গ-দোষে পড়ে থাকে ক'টা পদ্য খালি।

কিছু মনে ক'রনা

তমাল চট্টোপাধ্যায়

হে কবি,
তোমায় নিয়ে ছেলেখেলা করি বলে
কিছু মনে ক'রনা যেন :
আসলে কি-বৈশাখের পঁচিশ তারিখটা
সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের মনে আচমকা সুড় সুড়ি দেয়—
তখনই বিজ্ঞের গজদন্ত বের করে
'প্রশস্তি' 'শ্রদ্ধার্ঘ' ইত্যাদিকার
নিছক শব্দের টঙ্কানিনাদে
ছেলে খেলা করি তোমায় নিয়ে—
তুমি কিছু মনে কর না যেন।
আমরা যথেষ্ট জ্ঞানী বলে
তোমায় বুঝে ফেলতে সময় লাগে না তেমন,
তুমি যতখানি তার চেয়ে কিছুটা বেশীই জেনেছি তোমায়
না-জানার সাবলীল সহজ পথে।
ফলতঃ আমরা ঠিক
অন্ধকারের স্বাদ পাইনি—
শুধু তার শীতল অনুভূতিতে বিভোর হ'য়ে আছি:
তাই উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে তোমায় বসিয়ে রেখে
পাশের নিশ্ছিদ্র আঁধারে আমরা
আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি পাই।
মাঝের পুরু দেওয়াল ভাঙার বাসনা নেই কারও।
শুধু অন্ধকারে পরস্পর ছুঁয়ে ছুঁয়ে জ্ঞানী হ'য়ে যাই
আর কি-বৈশাখে পঁচিশের সুড়সুড় খেয়ে
তোমায় নিয়ে ছেলে খেলা করি।
তাই বলে তুমি
কিছু মনে করনা যেন।

আমি তো নায়ক নই

কবিরুল ইসলাম

আমি তো নায়ক নই: পেশাদারী ঢং-এ
চলা কিংবা বলা আমি কিছুই করি না,
দিবারাত্রি অস্তিত্বের মধ্যবিত্ত রণে
নিজেকে লুকাই পাদপ্রদীপে ধরি না।

এ আমার অহঙ্কার, প্রতি পদক্ষেপে
আমি নতশির নই, সহজ আপোষে
প্রভুভক্ত কুকুরের পরমায়ু টেঁপে
বাজিনা যেমন, তেমনি নই আত্মতোষে

গলিত স্বভাব। আমি স্ব-ভাবে সৈনিক
দিন যাপনের যুদ্ধে ক্ষত-অলঙ্কারে
আমার সর্বাঙ্গে ধরি। স্বর্ণেরও অধিক
যেহেতু সম্মান, তাই রক্ষা করি তারে।

যদিচ নেপথ্যে থাকি, হঠাৎ প্রকাশে
লণ্ডভণ্ড করতে পারি প্রাচীন অভ্যাসে।।

লাল সবুজের খেলা

দেবারতি মিত্র

রাত্রের আকাশ বেয়ে মুঠো মুঠো তারার বুদ্‌বুদ্
জমে দুয়ে নুয়ে পড়া ডালে শালে জারুলে পারুলে
ঘুমন্ত পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
সতেজ দুপুর বেলা
সমস্ত হেমন্ত যারা মরে থাকে
জলের সবুজ রম্য বিষধর সাপ
জেগে উঠে আড়মোড়া ভাঙে।
চারিদিকে পলাশের মেঘ রাশিরাশি,
গভীর আকাশ হাওয়ার উৎস খোলে —
উজ্জ্বল দুপুর ভীষণ সবুজে আর
অবিরল লালে মেশামিশি।

পঁচিশে বৈশাখ

উমা চট্টোপাধ্যায়

রবি করে আলোকিত
পঁচিশে বৈশাখ,
বর্ষে বর্ষে আসে বার বার
উন্মোচন করে দিতে
বৈশাখের অনুদ্‌ঘাট্য
আলোক দুয়ার।

নারী ও জীবিকা

হেনা চৌধুরী

ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগেও আমরা দেখতে পাই যে মেয়েরা যদিও গৃহকর্মেই প্রধানত নিযুক্ত থাকতেন তবুও অবসর মত নানা রকম হাতের কাজও করতেন তাঁরা। বৈদিক যুগের নারীরা বস্ত্রবয়ন শিল্পে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর যুগে তাঁরা কাপড় তো বুনতেনই এ ছাড়া নানা রকম মাটির কাজ করতেন। অলঙ্কারে নক্সা তৈরী করতেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে সে যুগের নারীদের মধ্যে বিশেষ শিল্পবোধ ও রুচী ছিল আর এ জীবিকার দ্বারা তাঁরা নিশ্চয় অর্থও উপার্জন করতেন। কিন্তু ইতিহাসের ধারার পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে নারীর জীবনধারারও পরিবর্ত্তন ঘটল। ইতিহাসে মুসলমান যুগেব আবির্ভাবের সংগে সংগে নারীর জীবনে এলো অবরোধ। গৃহেই বন্দিনী হয়ে পড়ল সে—তারপর ধীরে ধীরে সমাজ নারীর জীবনের ওপর এমন কতকগুলি প্রথা চাপিয়ে দিল যে নারীর যে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা আছে একথাটাই বুঝি ভুলে গেল সে দিনের মানুষেরা। সে দিনের নারী জীবনে না ছিল শিক্ষা না ছিল কোন রকম প্রগতি, এনিয়ে কোন রকম ক্ষোভও বুঝি ছিলনা তাঁর মনে। স্বামী, সংসার, সন্তান আত্মীয় পরিজন নিয়ে একান্ত গৃহ জীবনের মাঝেই সে ছিল সুখী, ছিল পরিতৃপ্ত। আসলে বলা যায় সে যুগের মেয়েদের জীবন ছিল মজলিসী জীবন। দুপুর বেলা গৃহের কাজকর্ম সেরে কোন এক বাড়ীতে একত্রিত হতেন পাড়ার বিভিন্ন বাড়ীর গৃহকর্ত্রীরা। সেই মহিলা-মহলকে বলা যায় নিছক পরচর্চার আসর। অন্যের হাড়ির খবর সবচেয়ে যার বেশী নখ দর্পণে থাকত তিনিই হতেন এই মজলিসের সভানেত্রী। তখনকার দিনে জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত দরিদ্র মেয়েরা। লোকের বাড়ী বাড়ী ঝিয়ের কাজ তারা করত। ফেরি করে বেড়াত বাসন, চুড়ি আরও কত কি। পুরুষের সংগে পাল্লা দিয়ে ট্রামবাসে চেপে দশটা পাঁচটা অফিস করার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারতেন না।

কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন ব্যাপক রূপ লাভ করল, এলেন বিবেকানন্দের মত মহামানব, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের মত নেতারা। তখন

এঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে গেলেন যে একটা গোটা জাতের অর্ধেক মানুষ যদি অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে তবে তাদের স্বাধীনতা সুদূর পরাহতই হবে। এর বহু পূর্বে বিদ্যাসাগর করে গেছেন বিধবা-বিবাহের প্রচলন। রামমোহন রায় নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, সহমরণের যন্ত্রণা থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। কিন্তু আত্মবিশ্বাস নিয়ে তখনও নারী তেমন করে জাগেনি।

এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এর ধাক্কায় সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ শিথিল হয়ে গেল। তখনও শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা খুব বেশী ছিলনা তবুও প্রয়োজন বোধেই ২/১ জন করে সমাজের প্রচলিত সংস্কারকে ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল জীবিকার সন্ধানে। নার্স আর স্কুলমাষ্টারী এই দুটো বৃত্তিই সেদিনের মেয়েদের কাছে প্রধান জীবিকা ছিল বলতে পারা যায়।

তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো—ততদিনে নারী প্রগতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করেছে। বিভিন্ন পেশায় মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন। এমন কী পর্বত অভিযানেও মেয়েরা রেখে গেছেন আপন জয়ের স্বাক্ষর ⁄ উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপিকা, সাংবাদিক—সব ভূমিকাতেই আজ মেয়েদের দেখতে পেয়ে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নারী তার অতীতের ইতিহাসের অন্ধকার যুগকে পেছনে ফেলে আজ এক নব দিগন্তের দিশারী। নারী আজ আপন ভাগ্য জয় করেছে।

কিন্তু আমার মনে হয় নারী আজও গৃহ জীবনকে যতটা আপন করে নিতে পেরেছে কর্ম জীবনকে ততখানি আপন করতে পারেনি। তাছাড়া জীবিকা মানে শুধুমাত্র চাকরী বোঝায়না। ব্যবসা বানিজ্য, হাতের কাজ অনেক কিছুই জীবিকার অবলম্বন হতে পারে। এসব দিকে ঠিক ততটা সহানুভূতিও সাহসের সংগে আমরা মেয়েরা আজও এগিয়ে আসিনি।

অনেকের মুখেই শুনতে পাই অবসর নেওয়া পর্যান্ত চাকরী চালিয়ে যাবে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে খুবই কম মেয়ে।

এর জন্য মেয়েরা যে দায়ী তা নয়। আমাদের জীবন যাত্রার পরিধি খুব বিস্তৃত। এখনও আমরা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ হতে পারিনি। দ্বিতীয়ত সমস্যা দেখা দেয় সন্তান জন্মাবার পর। কারণ আমাদের দেশে চাকুরী জীবিনী মেয়েদের সন্তানদের বেবিকোচ নেই—যার একান্ত দরকার।

তৃতীয়ত, মেয়েরা চাইলেও অনেক সময় শ্বশুর বাড়ীর বা স্বামীর আপত্তির জন্য বিয়ের পর চাকরী বজায় রাখতে পারেনা।

অবশ্য খুব মধ্যবিত্ত পরিবারে এ ব্যাপারে আপত্তি ওঠেনা—তবে ধনী গৃহে বাড়ীর বধূ চাকরী করুক এটা আজও কাম্য নয়। তাই ধনী পরিবারের বধূদের জীবন এখনও অনেকাংশেই মজলিসী জীবনই বলা যায়। শুধু ক্লাব, পার্টি বা সিনেমা, রেস্তোরায় তাঁর রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু এরা যদি অর্থ নিয়ে এবং উদ্যম নিয়ে শিল্প বানিজ্যের দিকে এগিয়ে আসেন তবে নারীর জীবিকা সংস্থান সহজ হয় এছাড়া আমাদের দেশে মেয়েরা আজও জীবিকা নিয়ে খুৎখুতে আছে। স্কুলমাষ্টারীই তাদের কাছে পরম কাম্য এবং সম্মানের। কিন্তু একটা কথা তারা ভুলে যায় যে আত্মসম্মান বজায় রাখতে জানলে যে কোন জায়গায়ই নিরাপদ।

শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক বিদ্যারমোহ ছেড়ে হাতের কাজ শিখে অর্থকরী বিদ্যার পথকে সুগম করে তুলতে হবে।

কতকগুলি স্বভাবের বৈশিষ্ট আছে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে—যার জন্য অনেক লেখা পড়া শিখেও তারা যথেষ্ট পরিমানে পশ্চাৎপদ। এখনও বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সপ্রতিভতার খুবই অভাব। যেটা অবাঙালী মেয়েদের নেই। দ্বিতীয়ত অকারণ সংকোচ বোধ। তৃতীয়ত formality ও সৌজন্য বোধ যা মানুষের চরিত্রকে বৈশিষ্ট দান করে তার একান্ত অভাব। আর এ সবের জন্যই বাঙালী মেয়েদের কাছে জীবিকা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
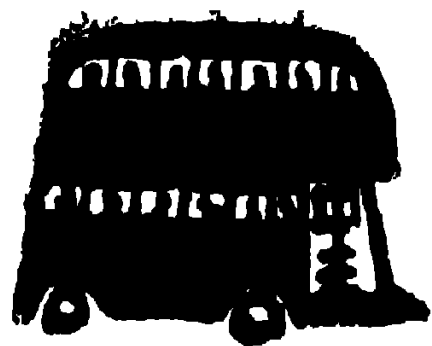
ওরা সুখের লাগি চাহে প্রেম

সমীরণ রুদ্র

প্রেম সত্যও নয় মিথ্যাও নয় অথচ প্রেমের জন্য মানুষ কীইনা করে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই সত্যভামার জন্যে নন্দন কানন থেকে পারিজাত বৃক্ষটি চুরি করতে যেতে হয়েছিল। ফলে যে মহাযুদ্ধ ঘটেছিল সে কথা কে নাজানেন। দান্তে ও বিয়াত্রিচের ভালবাসার কথা আমরা সকলেই জানি। প্রেমটা হল ভালবাসারই নির্যাস।

শ্রীকৃষ্ণের যুগ আর কলিযুগের অনেক তফাৎ, কিন্তু এখনও মানুষ প্রেমের জন্যে অনেক কিছুই করে। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমের জন্য সিংহাসনই ত্যাগ করলেন। স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিলেন।

বাহান্ন বছর বয়সের মিস আইসোবেলে কাটারের আজ তিরিশ বছর আগেকার একটা বুকের বোঝা নেমে গেল। আজ তিনি মিসেস আইসোবেল বব হলেন—গ্লাষ্টারসায়ারের সিডিংহ্যামের এক গীর্জায়।

তাঁদের এই ম্যারাথান কোর্টশিপের কারণ, আগেই দুজনে ঠিক করেছিলেন তাঁদের বাবা মা গত হলে তবেই তাঁরা দুজনে দুজনকে বিবাহবন্ধনে বাঁধবেন, তাই যা একটু দেরী হয়ে গেল বিয়ে করতে।

কিন্তু মনে করবেন না যেন এই ত্রিশ বছর সময়ই বুঝি প্রেমিক প্রেমিকার প্রতীক্ষার চরম নমুনা। বব্ ভ্যানসির কথাটা একবার ভেবে দেখুন। বব্ একজন ক্যানাডার রেল কর্মচারী। তিনি যখন তাঁর প্রেমিকার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন তখন ১৯১৭ সাল। সকরুন সজল নয়নে মেয়েটি তখন উত্তর দিয়েছিলেন, অসম্ভব, এখন নয়। আমার পঙ্গু মাকে একলা ফেলে নিজে বিয়ে করব কী করে এখন।'

আচ্ছা, আমি তা হলে অপেক্ষা করব, বব্ উত্তর দিয়েছিল। 'যখন তোমার সুবিধা হবে বোলো।

সত্যিই বব্ অপেক্ষা করেছিলেন ৩২ বছর। তাঁর ভাবী শাশুড়ী মারা যান ১৯৪৯ সালে, ৯৮ বছর বয়সে।

অবশ্য এও নস্যি। এডি হাওয়েসআর মড ইস্টল্যাণ্ডের প্রাক বৈবাহিক প্রণয়ের তুলনায়। ১৯০৩ সালের কথা। মড আর এডি প্রেমের পড়লেন আর

মনস্থ করলেন একদিন পরস্পর তাঁরা বিয়ে করে ঘর বাঁধবেন।

কিন্তু একটার পর একটা বাধা আসতে লাগল। শেষকালে ৫০ বছর কাটার পর তাঁরা দুজনে সত্যিই একসঙ্গে ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়ালেন। এডির বয়স তখন ৭১ মডের ৬৮।

আরও একটি বিলম্বিত ঘটনার খবর পাওয়া যায় ১৯৫০ সালে নিউইয়র্কের। এঁদের কোর্টশিপই বোধ হয় বিশ্ব রেকর্ড। বিয়ের আগে এঁদের প্রণয় চলে ৬৫ বছর ধরে। কারণ এরা মুখ ফুটে বিয়ের কথা কেউ কাউকে বলতেই পারেননি। কিন্তু পাত্রের বয়স যখন ৮৬ আর পাত্রীর ৮৪ তখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের আর দেরী করা চলেনা। মনস্থির করে প্রস্তাবটা তখনই তাঁরা করে ফেললেন। আর শুভ কাজটাও সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন হল।

অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের পরও প্রতীক্ষার কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগের একটা খবর, গত ১৮ বছর ধরে আরবানের এক ল্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সামনে স্থানীয় এক মহিলাকে বসে থাকতে দেখা যায়—যতক্ষণ কোর্ট খোলা থাকে।

মহিলাটি তাঁর স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করেন—কিন্তু জানেন না যে স্বামী আর ফিরে আসবেন না। কারণ খুনের দায়ে তাঁর স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোর্টে যাবার সময় স্বামী স্ত্রীকে বলে গেছেন 'তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। ফিরে আসতে আমার বেশী দেরী হবেনা।'

এই অপেক্ষমান মহিলাটি সারাদিন কারুর সঙ্গে কথা বলেন না এমনকি কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেও। দুপুরে খাবার সময়ে কাছেই চায়ের দোকানে গিয়ে তিনি একটু পানীয় গ্রহণ করে এসে আবার নিজের জায়গাটিতে বসেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোর্টের ছুটি হয়।

সব সময়েই তাঁর জামা কাপড়ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখে মনে হয়, বেশ অবস্থা ভাল। তবু তার অপেক্ষার অথবা তার দয়িতকে খোঁজার বিরাম নেই। তাই বলি হে প্রেম তুমি মৃতসঞ্জিবনী, কত বিচিত্র তুমি হে, কতো বিচিত্ররূপিণী।

ছন্দিতার আগামী সংখ্যায় লিখছেন

সুখময় ভট্টাচার্য, শান্তি রায়, সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীশ ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে।

এছাড়া—

ধারাবাহিক উপন্যাস, মন্থরার বৈঠক থাকবে।

বর্ষ নয় সংখ্যা এগার · Vol 9 No. 11

ছন্দিতা

ফাল্গুন ১৩৮০ · February 1974

প্রচ্ছদশিল্পী : মলয়শংকর দাশগুপ্ত

প্রধান সম্পাদক : অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : গৌরগোপাল দাশ ও হেনা চৌধুরী

একটি আবেদন

ছন্দিতার আগামী বৈশাখ ১৩৮১ নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যা থেকে ছন্দিতার বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬.০০ টাকার পরিবর্তে ৯.০০ টাকা হবে। বছরে তিনটি বিশেষ সংখ্যা সহ শারদ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের কোন রকম অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

যাঁদের গ্রাহক চাঁদার মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং যাঁরা নতুন করে গ্রাহক হবেন তাঁদের চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। চাঁদা মণি অর্ডার ; ক্রশ পোষ্টাল অর্ডার এবং চেক-এ পাঠান যেতে পারে ('CHHANDITA' নামে)।

আপনার গ্রাহক চাঁদা আজই পাঠান।

Unique Glimpses

G. S. Dhillon

Annals of human history throughout the ages, past, present and the future may never be able to record another instance of a freedom fighter as distinguished as Neta-ji Subhas Chandra Bose. Whether it was a child running after ash-laden sadhus in the search of a guru, or a student risking his life in the service of the poor suffering from cholera and small-pox in the slums of Calcutta, or a college student involved in and victimised for an assualt on an English Professor by students other than himself, or the pilgrim to the holly Himalayas, or the young Indian discarding the "heaven-born" Indian Civil Service or a dis-satisfied interviewer un-impressed and un-affected by Mahatma Gandhi's charisma or at disciple at the feet of Deshabandhu Chittaranjan Das, or a younger brother confiding in the elder Sarat and Mrs. Sarat Bose, or a prisoner in foreign and Indian jails, or the stormy petrel of the Indian Politics crossing swords with the combined forces of Mahatma Gandhi, Sardar Valabhbhai Patel, Pandit Jawahar Lal Nehru, Dr. Pattabi Sitaramayya alongwith all the top ranking leaders of India, defeating them all and yet chucking off the very trophy he had won by resigning the Presidency of the Indian National Congress then called the Rashtrapati, or a son deserting the sleeping mother Prabhavati to serve Mother India by escaping across continents and oceans at times disguised as a Pathan—Ziauddin—, at times as an Italian—Orlando Mazzota—, defying the British Empire's Intelligence services, or the Supreme Commander of the India's Army of Liberation proclaiming the Provisional Government of Free India to declare and wage the last War of Independence ; Netaji's exploits are

un-paralleled and unique. There will be "netas" and "netas" but Neta Ji willever remain one and one only the immortal— Subhas Chandra Bose.

Here is a glimpse of one of his journeys under the very nose of the British Navy and of their Allies. In her book "Jungle Alliance", Professor Dr. Joyce Lebra of the U. S. A. presents a picture as under :—

"Now that both Berlin and Tokyo had agreed on Bose's departure from Germany, there still remained the problem of what route and carrier Bose should take. Tokyo had already refused the polar route, and in any case Germany had no planes to spare. Italy was also short of planes now. Sea Lanes were unsafe. The only alternative, and the means finally selected, was for Bose to go secretly by German and Japanese submarines. This possibility had been considered earlier but had been abondoned in view of the long distance involved. Now there was no alternative, and Oshima [1] communicated with both Tokyo and the German Foreign Ministry, making final arrangements. In February 1943 Bose and his Indian Secretary Hassan [2] slipped away aboard a German submarine, as stealthily as Bose had left Calcutta two years earlier in his escape from India. On 20 April by prearrangement, a Japanese submarine left Penang Island for the tip of Africa under strict orders not to attack or risk detection. It was to rendezvous south-east of Madagascar with the German submarine. On 26 April the two submarines sighted each other and confirmed identity. After waiting a day for the sea to calm, the transfer was made on a rubber raft, and a drenched Bose was welcomed aboard the Japanese submarine.

1. General Oshima was the Japanese Ambassador to Berlin.

2. Major Abid Hassan.

The submarine avoided Penang, taking a circuitous route to Sabang Island off the north coast of Sumatra, where Bose was met by Colonel Yamamoto[3]. From Sabang Bose and Yamamoto left for Tokyo by plane, stopping enroute at Penang, Saigon, Manila and Taiwan. On the morning of 16 May the plane landed in Tokyo, where Bose was escorted immediately to the Imperial Hotel."

"After several weeks on a submarine Bose was exhausted and in need of rest. But he had one aim in Tokyo, an obsession. He had to meet Premier Tojo."

Neta Ji's meetings with the Japanese Army Chief of Staff General Sugiyama, Foreign Minister Shigemitsu, Navy Minister Yoai Mitsumasa and various Section Chiefs of the Army, Navy and Foreign Ministeries were arranged by Yamamoto. Sugiyama had briefed Nataji about Japan's military position and had assured of his sympathy with Neta Ji's aspirations. "But Bose was dis-satisfied. He had to meet Tojo and get a Japanese commitment. "Nothing could deter Netaji from his object though Yamamoto tried to distract his attention from Tojo and kept him occupied by arranging visits to various factories, schools, colleges and hospitals.

' Why was Tojo putting Bose off ? In the first place, there were many more pressing military problems than India, and Tojo's pleas that he was too busy were not simply excuses. Secondly, there was a group in the Operations Bureau of the Imperial General Headquarters which took a dim view of India and the I. N. A.......... But the main reason for Tojo's reluctance to meet Bose was Tojo's own attitude. Tojo was a man of strong prejudices and often formed opinion of a man before meeting him. The I. N. A. had

---

3. Colonel Yamamoto Bin (later Major General) was till then the Military Attache in Berlin. He had left Berlin for Tokyo in order to make arrangements for Neta Ji's reception in the East and to be at Neta Ji's disposal. As Russia and Japan had not been at war yet, Yamamoto had been able to officially cross Turkey and Russia on his way to Japan in the Autumn of 1942.

been only a headache so far as Tojo was concerned. The trouble between Mohan Singh and Rash Behari Bose had disposed Tojo unfavourably toward the I. N. A. And the demands in the Bangkok Resolutions Tojo regarded as presumptuous. How could a small revolutionary group which did not even represent a government presume to make demands on the Imperial Government of Japan ? There was no need for Tojo to meet another Indian, even if he had just come from Berlin.

"It was persuasion by Sugiyama and Shigemitsu which at length prevailed on Tojo to meet Bose. On 10 June the first of two meetings took place. The magic of Bose enchanted Tojo immediately. It had been the same with Sugiyama, Shigemitsu and nearly everyone Bose met, whether Japanese or Indian. Apart from the impact of Bose's words and passionate devotion to Indian Independence, there was something about his face, his voice, and his eyes that captured the minds and hearts of men Tojo was enthralled. The meeting was brief but Bose had succeeded, and Tojo promised another interview four days later. This time Shigemitsu and other officials also were present and there was a brief but fruitful exchange of views between Bose and Tojo. Tojo explained Japan's ideas on the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Bose with his customary frankness, asked Tojo, 'Can Japan give un-conditional help to the Indian Independence Movement ? I would like to confirm that there are no strings attached to the Japanese aid. 'Tojo immediately gave Bose an affirmative reply. Bose continued, 'Can the Japanese Army push its operations into India proper ? ' This time there were complex military matters involved, and Tojo was unable to answer as decisively, But Bose had been favourably impressed and was grateful he had made a friend in Tojo. If Bose was to secure meaningful help from Japan for the I. N. A. Tojo's sympathy and co-operation was the crucial point. In this Bose had succeeded admirably, and Tojo

was ready to make public his official support of Bose and the I. N. A.

"On 16 June Bose visited the House of Peers in the 82nd extraordinary session of the Diet. Tojo made an historic address" Concerning India Tojo said, "India has been for centuries under England's cruel rule. We wish to express righteous indignation at their agony and sympathy for their aspirations for complete independence. We firmly resolve that Japan will do everything possible to help Indian Independence. I am convinced the day of Indian freedom and prosperity is not far off...". As Netaji listened in the audiance he felt Toja was making a personal promise which he would follow through."

"On 19 June Netaji held his first Japanese Press Conference. Two days later he went on the air in his first broadcast to India from Tokyo. Thus Tojo and Netaji were both on record to co-operate against the common enemy for Indian Liberation."

Standing on such sound international understanding Netaji strode on the South East Asian theator of War like a Colossus. Here let me present another glimpse of Netaji as witnessed by a person of the imminence of Shri S. A. Ayer Minister for Publicity and Propaganda in his book.

UNTO HIM WITNESS :—

"The title of Supreme Commander, if it truly fitted any commander on the battle fields of Europe or Asia, fitted Netaji most superbly. HE LOOKED SUPREME, every inch of him. The way he talked and moved with the soldiers on or off the warfront was on of supreme dignity and selfconfidence.

"The word personality assumed a meaning when Netaji, in his Supreme Commander's uniform, stepped on to the saluting base and faced the serried ranks of the INA. And yet, the uniform itself was the simplest in the world......no

bright red cloth, no shining metal, no ribbons, no medals in a row, no shining leather belt or shoulder straps, nor a sword in its scabbard hanging from his waist, nor a horse to ride, Whatever clothes he wore, he wore them smartly. Normally he wore khaki cotton cloth except when he visited Japan. There he had to use khaki wollens as a protection against the severe cold weather. His forage cap with two tiny wellpolished brass buttons in the front sat majestically on his bright and broad forehead—the face beneath the cap of a rosy wheat complexion, now inscrutable, immobile, dignified, now wreathed in a charming smile, now reminding one of the Bengal Tiger as when he roared an inspiring exhortation to soldiers or civilians at mammoth gatherings.

"It was impossible to take one's eyes off his face whenever he ascended the platform ; he held one spellbound by its compelling magnetism...... ."

Now let me show the reader another glimpse of Netaji's creative qualities when he drafted the Proclamation of the Provisional Government of Azad Hind.

After a long busy day, a day just earlier to 21st October 1943, it was past midnight, this is how Shri Ayer narrates :—
"Then I witnessed a phenomenon. I had a glimpse of the great man. He took hold of a bunch of quartersheets of blank paper, took a pencil in hand, and started writing, "After their first defeaat at the hands of the British in 1857 in Bengal......" "He did not lift his eyes from the paper in front of him, silently handed it to me the first page as soon as he finished it, and I walked out of the room and sat at the typewriter. Abid and Swami went to his room in turn and brought me the Proclamation manuscript, sheet after sheet, as Netaji finished it.

"What amazed me was that he never even once wanted to see any of the earlier pages that he had written. How he

could remember every word that he had written in the preceding pages, how he could remember the sequence of the paragraphs. In the entire script there was not one word corrected or scored out, and the punctuation was complete.

"That he wrote out the whole proclamation sheet after sheet without a break and at one sitting was some measure of Netaji's clear thinking, remarkable memory and grasp and facile pen! The entire historic proclamation was written with the ease with which a brief letter could be penned."

In man-management Netaji's approach was incredibly humane and generous. His great-heartedness raised us out of the dust to the heights of heroism. Here is a glimpse of his magnanimous ways.

One of the Brigade Commanders Colonel Thaker Singh after the I phal Operations, while at Pyinmina (Central Burma) learnt that the rations of "Gur"—raw sugar—had gone unfit for human consumption due to fermentation caused by rains in poor storage condition. Thaker Singh arranged to get fresh gur for the men. He did not throw away the spoilt substance. He got it further fermented and got alcohol distilled out of it. When Netaji came to visit the front, General Shah Nawaz Khan was obliged to haul up Thaker Singh before Netaji on a charge of indiscipline. The dialogue that took place between Netaji and Thaker Singh was to the following effect :—

Netaji : (Speaking in Hindustani) Colonel Sahib, suna hai ap ne apni distillery khhol rakhi hai[4]?

Thaker Singh : (Replying in Hindustani) —Han Neta Ji kiya kia jae, yahan jangal main koi bazar bhi to nahi jo kuch kharida ja sake. Apni madad

4. I have heard that you have installed a distillery of your own ?

āp hi karni parti hai.[5]

Neta Ji : (Breaking into English) —How is the stuff ?
Thaker Singh : It is tolerable when nothing else is available.
Neta Ji : Thik hai ap ja sakte hain.[6]

Afterwards, when Neta Ji returned to Rangoon, he arranged to send two cases of Whisky alongwith a small and flat quarter-bottle encased in silver. On the bottle were engraved Netaji's autograph under the wording making the presentation to the Colonel.

What would not the soldier in Thaker Singh do for such an appreciative, humane, and wonderfully affectionate darling of a Supreme Commander ! Little wonder that Colonel Thaker Singh one of the greatest heroes of Imphal campaign of 1944, distinguished with the second highest decoration—Sardare Jang—, led "X" Brigade from Pyinmina to Bangkok (The capital of Thailand) fighting against the British forces and breaking through their encirelements cut across the vergin forests of Burma and Thailand straight as a crow flies. He thus performed an un-precedented military feat which even our enemies could not help appreciating publically in their Press at the time at the close of the World War.

Recently, on 5 December 1973, I visited Colonel Thaker Singh in his village—Kasso Chahal, 5 miles from Kapurthala in the Punjab—, where the Colonel is passing his old age in poverty and distress. Half of his body is paralysed, he walks dragging his left leg dangling against the right one as he takes each step aided by a walking stick. He owns no motor transport ; for making use of the omnibus, he walks for about half

5. Yes, Netaji, what else can be done when there is no bazar in this jungle to buy from. Self help is the only way out.

6. That is all right. You may please go.

a mile to the nearest bus stop. He has yet not applied for a pension as a freedom fighter. Physical disability, age and material hardships have not been able to cripple his self respect nor the intrepid spirit of patriotism in which he is as strong and young as ever. Visiting him was a pilgrimage for me. While talking about Netaji, his face would lit up in a celestial smile. He refuses to entertain any question concerning Netaji's death saying, "Do you ever talk about the death of an Avtar ? Netaji was not a man. He was an Avtar – an incarnation of God....... "Then there is a lump in his throat as he talks about his experiences with Netaji, with pride which is his.

In matters of personal safety of death Netaji was dangerously indifferent. Let me narrate an incidence in which I was concerned as a staff officer of No. 2 Division then under the Command of Colonel Aziz Ahmed (later Major General). We were at Mingaladon—about 7 miles from Rangoon. The day was 18 October 1944. A ceremonial parade comprising of No 2 Division and Rani Jhansi Brigade was to mark the beginning of a week to celebrate the first anniversary of the inauguration of the Provisional Government of Free India procliamed an year earlier at Singapore. Its Headquarters had now moved upto Rangoon. On the day, Netaji arrived punctually at 10 A. M. to the strains of the National Anthem – the Hindustani rendering of the "Jana Gana Mana"—"Sudh Sukh Chain ki Barkha Barse, Bharat Bhag hai Jaga—", After reviewing the troops lined up in series in the huge open parade ground, Netaji ascended the saluting base—a four feet high platform, twelve feet by twelve feet in area, open on all sides and without any shade or cover on top—specially erected for the occasion. A big Tricolour--4 by 6 feet—majestically fluttered atop a tall flag-mast in front of the base. On either side of the base sat the Burmese, the Japanese and the Indian dignitaries specially invited to the occasion. Netaji stood in the centre of the saluting base with General Aziz Ahmed and Colonel Habid-ul-Rehman two paces in the rear and then Major Riaz Ahmed

and myself further behind on either of the rear corners of the stage. The base had been decorated with a bright red carpet. It was a clear sunny morning. As Netaji stood there, he made a conspicuous target and could easily be singled out from the air.

Rangoon had not been visited by the enemy planes forquite sometime. While publishing orders for the parade, I had altogether omitted the paragraph concerning action to be taken in case of an air raid. I had pondered over the matter and decided it to be unnecessary. Why should I sound panicky when an air raid during the day-light hours was not expected at all ? It was a mistake I have ever regretted. A staff officer must provide for all the eventualities howsoever remote. I should have known that the enemy would not miss a chance to attack a parade where INA troops would be concentrated at one spot and especially where Netaji would be spotted out so easily. The parade was known to be held and we had been rehearsing it for some days. Rangoon was full of British spies. The British did learn about the parade, for when Netaji had just started addressing the parade, an air-raid started. Enemy fighter planes came as low as tree tops. To start with: We thought those were Japanese planes from the nearby aerodrome carrying out their routine exercises, but soon they were identified. Anti Aircraft Guns started registering. The Japanese fighter planes instantaneously took to the air to chase away the intruders. With each passing moment, the air battle grew in intensity but Netaji ignoring it all continued his address. The address over, the march-past began. Gegeral Aziz Ahmed requested Netaji for dismissing the parade. Netaji looked at him silently for a moment and then continued taking the salute unmindful of the dogfight going on overhead amongst the opposing aeroplanes. There was quite a commotion amongst the public and the invited V. I. Ps. who could not leave the ground when Netaji was still on the dias. The march past was very nearly over when a shrapnel hit a soldier on the head

blowing his skull off. The soldier dropped down dead—a martyr to the cause of the Indian Independence. General Shah Nawaz Khan from amongst the audience fearing more casualities and danger to Netaji's very life, took the initiative and blew whistle to disperse the parade. Only then Netaji started climbing down from the dias slowly and reluctantly, very slowly like a tiger who never runs in the face of a danger. Even then he did not take to a trench. He ordered me to go round different Units and report back to him about the safety of the troops, especially of the Rani Jhansi Brigade. He did not start to return to Rangoon till it was all clear and he had personally received the "All Correct" report. Before leaving he instructed me to attend the funeral of the martyr Jawan and to represent him. He had to attend a cabinet meeting scheduled to be held after the parade.

Before I close, let me describe one more incident in the words of General Shah Nawaz Khan one of Netaji's most trusted commanders, The day was 25 February 1945. The place, Meiktila the scene of the bloodiest and the decisive battle of Burma. Netaji had come up to see how Colonel Sahgal and I were fareing at Popa Hills about 50 miles west of Meiktila where we were then holding the front. Before Netaji could reach us, Meiktila got surrounded by the British forces. Shah Nawaz had pleaded unsuccessfully to Netaji to desist proceeding to Popa and to retire and not risk his life. In Shah Nawaz's words Netaji replied as under :—

"He listened to me very calmly because he knew that all that I said came from the very depths of my heart and was prompted by very extreme anxiety for his safety. He just smiled and said. 'Shah Nawaz, It is no use pleading with me. I have made up my mind to go to Popa and I am going there. You do not have to worry about my safety, as I know England has not yet produced the bomb that can kill Subhas Chandra Bose.' This last statement appeared particularly true, as Netaji seemed to lead a charmed

life. That afternoon, the place he was living in was heavily bombed by Sixty B-25s.

They caused terrible devastation all round, and it was difficult to imagine how Netaji escaped without even a scratch.'

Above are just a few of the glimpses of the unique personality and the un-parallaled leader, the immortal—Netaji—Subhas Chandra Bose.

NETAJI ZINDABAD.

JAI HIND,

শৈশবে সুভাষচন্দ্র বসু

গৌরী গুপ্তা

রিটায়ারড্ হেডমাষ্টার রায়সাহেব কৃষ্ণ চন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় রেভেন্সা কলিজিয়েট স্কুলের মাষ্টার মশাই ছিলেন যখন, তখনকার কথা বলছি।

রায়সাহেব কৃষ্ণ চন্দ্র সেন গুপ্ত আমার পিতা। তিনি এখন কটকে বাস করেন। প্রায় উচ্চ পদস্থ বহু উড়িষ্যা বাসী তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। প্রাক্তন-মন্ত্রী রাধানাথ রথও তাঁর ছাত্র। বাবা আমাদের নেতাজীর বিষয় সামান্য গল্প করেছিলেন তিনি। নেতাজীর বিষয় যেমন বলেছেন ঠিক সেই কথাই আপনাদের বলব।

ভোর বেলায় কাঠজুড়ির ধারে বেড়াতে যেতাম। প্রায় রোজ চার মাইল করে বেড়াতাম। বেড়িয়ে ফেরার পথে প্রায়ই সুভাষ পথ আগলে দাঁড়াত। স্যার আর একটু চলুন না ঘুরে আসি। আমি বলতাম স্যার আমার বেড়ান হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই ছাড়ত না, জোর করে ধরে নিয়ে যেত। আর চলতে চলতে নানান প্রশ্ন করত। কেমন ভাবে জীবন গড়া উচিৎ আমাদের, এখন প্রধান কর্ত্তব্য কি? আমি বললাম ছাত্রানাং অধ্যয়ন তপঃ তাতে সুভাষ বলত অধ্যয়ন তপঃ মানে কি স্যার এল জেবরা এরিথ মটিক তপঃ?

আমি হেসে উত্তর দিলাম না না শুধু এলজেবরা এরিথমেটিক কেন? স্কুলের বই ছাড়া পড় স্বামীজির বই বাণী।

আরো অনেক বই বললাম, আর একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি সুভাষ এসে হাজির। কিরে আজ আসিসনি কেন স্কুলে?

স্যার একজন লোকের কলেরা হয়েছে তার কাছে গিয়েছিলাম। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। আট আনা পয়সা আছে স্যার? আমার পকেটে আট আনাই পয়সা ছিল তাই দিয়ে দিলাম।

একদিন কাঠজুড়ির ধারে বেলা পাঁচটার সময় বসে আছি—দেখি সুভাষ একদল ছেলের সঙ্গে মাথায় চেয়ার বেঞ্চি সব নিয়ে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছে। আমায় দেখে সব ছেলেরা মাথার বোঝা নামিয়ে নমস্কার করল। আমি বললাম কিহে কাঠবেড়ালীর দল কোথায় যাত্রা হচ্ছে।

স্যার কুনেই পাড়ার কাছে একটি স্কুল খুলেছে, সেই স্কুলের চেয়ার বেঞ্চি কিছু নেই। গাছের তলায় চাটাই পেতে স্কুল হয়, তাই এসব স্কুলের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি স্যার। আমি দেখে মুগ্ধ হলাম। তখন সুভাষের বয়স ১১ / ১২ বৎসর হবে। এদিকে ছিল বলে ভাববেন না সুভাষ পড়ায় খারাপ ছিল। একবার সুভাষ ক্লাস টেনএ পরীক্ষা দিয়েছে। সব বিষয়ে সুভাষ ফুল মার্ক পেয়েছে—ইংরাজী খাতায় একটা ভুল নেই লেখা মুক্তর মত। তখন হেড মাষ্টার ছিলেন বিশম্ভর বাবু। তিনি আমায় ও আর দু চার জন মাষ্টারকে ডেকে দেখালেন দেখুন ত আমি কোন ভুল পাচ্ছিনা যদি আপনারা পান। তা ভুল ত পেলামই না উপরন্তু সকলের স্বীকার করতে হল যে এত সুন্দর ইংরাজী শুধু সুভাষের পক্ষেই সম্ভব।

বিশম্ভর বাবু সুভাষকে ডেকে বলেছিলেন যে, সুভাষ তোমার কোন ভুল পাইনি তবু তোমায় যদি ১ নম্বর কমদি ত তোমার কোন আপত্তি আছে? তাতে সুভাষ বললে, না স্যার আপত্তি কিসের? যা ভাল হয় তাই করবেন।

সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটা আজ জগৎ বরেণ্য চির স্মরণীয় সুভাষ চন্দ্র বোষ।

ছন্দিতার আগামী সংখ্যাগুলোর জন্য
উচ্চমানের ছোটগল্প, প্রবন্ধ,
কবিতা আহ্বান করা হচ্ছে।
আপনার লেখা পাঠান।

ধারাবাহিক মনস্তাত্বিক উপন্যাস

কানু কাছে রাই

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

দিবোন্দুর রোগটা বড় অদ্ভুত। মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধির শুরু তার ছোট বয়স থেকেই। সে নাকি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখতে পায়—সে একটি জাহাজের যাত্রী, সমুদ্রের সফেন নীল জলরাশির ওপর তার জাহাজটি যে.চার খোলার মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে...গভীর নিশুতি রাত, জাহাজের যাত্রীরা সব গভীর ঘুমে অচেতন...হঠাৎ ঐ জাহাজটির বিপদজ্ঞাপক বংশীধ্বনি —পি...পি...পি...একটানা সুরে শোনা গেল। যাত্রীরা সব নিদ্রাহত রক্তবর্ণ চক্ষু খুলে ভয়াতুর দৃষ্টি মেলে দিলো বাইরের দিকে—মুহূর্তের মধ্যে সবারই বাহ্যিক জ্ঞান যেন লোপ পেল। সমুদ্রের সে এক ভীষণ রুদ্র রূপ। ঝড় উঠেছে বাইরে। সাইক্লোন। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে এত বড় জাহাজটাকে নিতান্ত অসহায় মনে হলো। সেটি টলছে মাতালের মতো, দুলছে অদ্ভুত রকমের। অশান্ত ঢেউয়ের বুকের ওপর থেকে কখনো অসহায়ভাবে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, আবার কখনো-বা তলিয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে সমুদ্র-নিম্ন ভূমির সঙ্গে মিতালী পাতাতে চক্ষের নিমেষে। সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত চক্ষে যেন আগুনের ফুলঝুরি, কণ্ঠে অ্যাটম বোমার কর্ণপটাহবিদীর্ণকারী সুতীব্র আওয়াজ!......তারপর মনে পড়ে তার, জাহাজটা কিসের সঙ্গে যেন একটা বিরাট ধাক্কা খেল......সহস্র কণ্ঠের তীব্র কাতর আর্তনাদ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যেন দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো!...

আর কিছু মনে নেই দিবোন্দুর। শুধু মনে পড়ে ঐ বিপদের সময় আর একটি কোমল ভয়াতুর ছোট্ট হাত আশ্রয় করেছিল তারই হাতখানা। সেও সাধ্যমত প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরেছিল তার ছোট্ট কব্জীটা। কতই-বা বয়স তখন তার—বড় জোর সাত-আট হবে। সে হাতটি ছিল একটি সুন্দর

ফুটফুটে মেয়ের। এক মাথা কোঁকড়া কালো চুল, টানাটানা চোখ, পান-পানা মুখ, রক্তগোলাপের পাপড়ির মতো পাতলা ঠোঁট দুটি যেন তার ভয়ে সে সময় চুপসে নীল হয়ে গিয়েছিল।...

আবছা মনে পড়ে, জ্ঞান তখনও তার ফিরে আসেনি—সে যেন তার ছোট্ট শক্ত মুঠির মধ্যে সেই কচি মেয়ের নরম হাতখানা চেপে ধরেছিল তখনও, কিন্তু কে যেন জোর করে ছিনিয়ে নিলে তাকে তার ঐ কচি মুঠির বাঁধন থেকে। এরপর মনে নেই আর কিছু।

জাহাজটিকে ঢেউগুলো যেন একজোটে ধাক্কা দিয়ে আচড়ে ফেলেছিল সমুদ্রের বেলাভূমির ওপর। মুখ থুবড়ে আশপাশে অনেকেই আহত, মৃত ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল সাথী বা সঙ্গহারা হয়ে।

দিব্যেন্দু এখন যুবক। কিন্তু এখনো সে-দৃশ্য ভুলতে পারেনি সে। কল্পনায় এখনো সে-দৃশ্য দেখে সে চীৎকার করে ওঠে। আর্ত চীৎকার শোনা যায় তার কণ্ঠে—বাঁচাও...বাঁচাও...বাঁচাও...কল্পনা কল্পনা। ঐ যা! সব শেষ হয়ে গেল !!...

কল্পনা নাকি মেয়েটির নাম। অবশ্য সঠিক সে বলতে পারে না এটি তার মন-গড়া নাম কিনা।

দিব্যেন্দুর বাবা ব্যাঙ্কার সূর্যপ্রসাদ বোস বলেন—এ সবই আমার ছেলের কল্পনা। ওর ছোটবেলায় সস্ত্রীক আমরা একবার পুরী গিয়েছিলাম; সেই যা ওর সমুদ্র দর্শন। তবে ও তখন খুব ছোট।

তবু সূর্যপ্রসাদের এই জবাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী ডাঃ সুবিমল গুপ্ত খুশি হননি।

তবে যে শুনেছিলাম, আপনি প্রথম জীবনে রেঙ্গুনে ছিলেন?

হ্যাঁ তা ছিলাম। তবে তখন ওর জন্ম হয়নি। তাছাড়া রেঙ্গুনে আমার স্ত্রী থাকতেন না। তিনি বাপের বাড়িতেই ছিলেন। কারণ—

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ সূর্যপ্রসাদ থেমে যান। ডাঃ গুপ্ত অনুরোধ করেন—তারপর কি মিষ্টার বোস?

সেটা নিতান্তই ব্যক্তিগত।

ডাঃ গুপ্ত কি যেন ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—সেটা কি বলা সম্ভব নয় স্যার?

সূর্যপ্রসাদ খানিকটা ভেবে জবাব দিলেন—না, সেটা এমন কিছু না। তবে...

আপত্তি বিশেষ না থাকলে বলতে পারেন, কারণ তাতে হয়তো আমার চিকিৎসার সুবিধা হোতে পারে।

সূর্যপ্রসাদ ডাঃ গুপ্তের অনুরোধে যা বলেছিলেন তা হলো—তাঁর বিয়ে হয়েছিল ধনীর ঘরেই। ধনীর সন্তান—আদুরে দুলালী মেয়ে রেখা দত্ত সামাজিক নিয়মানুযায়ী রেখা বোস হয়েছিল সত্যি কথা; কিন্তু মনে-প্রাণে কোনো দিনই গরীব স্বামীকে সত্যিকার স্বামীর মর্যাদা দিতে পারেনি। বছরের বেশির ভাগ বাপের বাড়িতেই থাকতো। গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অশান্তির মধ্যে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে তাই সব সময় শহরে—কলকাতায় থাকতে চাইতো এবং আমাকেও কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকবার জন্যে অনুরোধ করতো। কিন্তু আমার মতো একজন দুশো-আড়াইশো টাকার গরীব কেরাণীর পক্ষে তাকে নিয়ে ঐভাবে থাকা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া রিটায়ার্ড বুড়ো বাপ এবং মাকে ছেড়েও এভাবে থাকাটাও সমীচীন ছিল না। তাই আমি রাজী হইনি তার ঐ প্রস্তাবে। শেষ পর্যন্ত সে বাপের বাড়িতেই থাকতো; আমি মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে যেতাম। অবশ্য এই বিয়েটা হওয়ার পিছনে একটা কারণ ছিল। আমার বাবা ছিলেন ওর বাবার বন্ধু। তাই ওঁরা চেয়েছিলেন এই বিয়েটার মাধ্যমে তাঁদের বন্ধুত্বের বন্ধনটাকে আরও দৃঢ় করে নিতে। কিন্তু তা হয়নি। বরং সেই মধুর সম্বন্ধটা আরও তিক্ত হয়েই গিয়েছিল।

একটু থেমে সূর্যপ্রসাদ যেন অতীতের স্মৃতিকে আরও খানিকটা মন্থন করে নিলেন। শুরু করলেন এরপর আবার—

এইভাবেই আমাদের দাম্পত্য-জীবন কাটছিল। তারপর এক সময় এক এক করে বুড়ো মা-বাবাকে হারালাম। দিব্যেন্দু জন্মালো কিন্তু মানুষ হতে লাগলো মামার বাড়িতেই। তখন দিব্যেন্দুর বয়েস বছর দুয়েক হবে হয়তো। কিছুদিন রোগে ভুগে ওর মায়ের শরীরটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই একদিন শ্বশুরমশায় বললেন আমায় ডেকে—"সূর্য, রেখার এখন একটু চেঞ্জে যাওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়, ওকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ভাল করতে।"

শ্বশুরমশায় জানতেন, ওঁর কোনরকম আর্থিক সাহায্য আমি নেবনা; তাই তিনি বললেন শেষ পর্যন্ত—আমার মনে হয়, কাছাকাছির মধ্যে কিছুদিন ওকে নিয়ে পুরীতে থেকে আসতে পারো।

অফিসের ছুটি নিয়ে তাই ওকে আর দিব্যেন্দুকে নিয়ে দিন কতকের জন্যে পুরী গিয়েছিলাম। কিন্তু টাকা আর ছুটি যখন ফুরিয়ে এল তখন বাধ্য হয়ে ওদের নিয়ে ফিরে আসতে হলো আমার। রেখার কিন্তু তাতে আপত্তি ছিল। সে চেয়েছিল আরও কিছুদিন থাকতে এবং বলেছিল, খরচার জন্যে তাকে ভাবতে হবে না, সে বাবাকে চিঠি লিখে জানাবে সব।

কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। শেষ পর্যন্ত সে যদিও ফিরে এসেছিল তবু তার একটি কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। সে বলেছিল—যে-স্বামী তার স্ত্রীকে সুখী করতে পারে না, সে স্বামীর থাকা না থাকা দুই-ই সমান।—

ওর সেই কথাটা আমার বুকে ধ্বক্ করে শক্তিশেলের মত বিঁধলো। তারপর—তারপর একদিন কাগজে বার্মায় এক প্রবাসী ধনী বাঙালীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজকর্ম চালাবার একজন সুযোগ্য কর্মীর চাকুরীর বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে দিলাম কাউকে না জানিয়েই।

ভাগ্য আমার সুপ্রসন্নই ছিল। মাসখানেকের মধ্যেই জবাব এল। শুভ খবর। তারপর একদিন কাউকে না জানিয়েই বার্মার বুকে পাড়ি জমালাম।

সূর্যপ্রসাদ থামলেন একটু।

ডাঃ গুপ্ত মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন—ভারি প্যাথাটিক। উপন্যাসের কাহিনী বলে যেন মনে হয়।

সূর্যপ্রসাদের ঠোটের কোণেও ব্যথার হাসি ক্ষণেকের জন্যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

তারপর ?

ডাঃ গুপ্ত জানতে চাইলেন পরের ঘটনা।

সূর্যপ্রসাদ জানালেন—তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ওখানে থাকতে থাকতে ব্যবসাটা বুঝে নিলাম ভাল করে। তারপর একদিন চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিজেই নেমে পড়লাম ব্যবসায় অল্প মূলধন নিয়ে। অর্থ আর প্রতিপত্তি দুই-ই হলো। শেষে যখন স্বাধীনতার পর ভারতীয় উচ্ছেদের হিড়িক পড়েছিল ঐখানে, তখন একদিন বাধ্য হয়ে অনেকেরই সঙ্গে ব্যবসা গুটিয়ে আমাকেও চলে আসতে হলো। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না বেশ কয়েক বছর আমার। খবর নিয়ে জানলাম, ইতিমধ্যে স্ত্রী আমার মারা গেছে এবং দিব্যেন্দু রয়েছে ওখানেই। আইনতঃ ছেলেকে আমার আটকে

পারে না ওর'। তাই একদিন দিব্যেন্দুকে নিয়ে এলাম শ্বশুরবাড়ি থেকে। চিরদিনের মত শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মুছে গেল আমার।

সূর্যপ্রসাদ বিরতি দিলেন তাঁর কথার এখানেই।

ডা: গুপ্ত কিন্তু এ কাহিনীর মধ্যে দিব্যেন্দুর চিকিৎসার সহায়ক হয় এমন কোন কিছুর হদিস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি মন্তব্য করেছিলেন—দিব্যেন্দুর এ রোগের সাধারণ কোন চিকিৎসাই সম্ভব নয়। তবে ওর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এইটুকুমাত্র তিনি বলতে পারেন—যদি কোনদিন স্বপ্নে দেখা ঐ কল্পনা মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে তবে ঐ রোগের সেদিনই উপশম হবে। কিন্তু তার আগে জোর করে যদি ওর মন থেকে কল্পনা নাম্নী ঐ মেয়েটির স্মৃতি মুছে ফেলবার চেষ্টা করা হয় বা তার স্বপ্নে দেখা কল্পনাকে সে যদি কোন মেয়ের মধ্যে খুঁজে পাবার পর ওদের দুজনের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে দিব্যেন্দুর পক্ষে পাগল হয়ে যাওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা হবে না। সুতরাং সেদিক দিয়ে বাপ হিসেবে তাঁর সর্বদা সচেতন থাকা দরকার।

ডা: গুপ্তের ঐ মন্তব্যে সেদিন ব্যাঙ্কার সূর্যপ্রসাদ বোস চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু তবু অন্তরের নিভৃত প্রদেশে সঞ্চিত একটি অশ্রুসজল কাহিনীকে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারেন নি সেদিন এবং আজও না। বিবেকের কশাঘাত এর জন্যে কম সহ্য করতে হয় না সূর্যপ্রসাদকে। তিন-তিনটে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ব্যাঙ্কার সূর্যপ্রসাদ একটু সুখী নয় জীবনে। তিনি জানেনই যে, কর্ম এবং কর্মের ফলভোগ—এই উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান। কর্মের ফলভোগ প্রত্যেককেই করতে হবে—কর্মফল কখনো বিনষ্ট হয় না। এ জীবনে না হলেও কোন পরবর্তী জীবনে পাপ-পুণ্য-শুভ-অশুভ—সব নৈতিক মূল্যই কর্মফলের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে এবং একেই বলা হয়—Laws of the conversation of moral values অর্থাৎ নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম।

সব থেকেও মনের দিক দিয়ে নিঃস্ব সূর্যপ্রসাদ এই খিরোরীর কথাই শুধু ভাবেন আর সবার আড়ালে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনাগত ভবিষ্যতকে যেন দূরে সরিয়ে রাখতে চান।

ক্রমশঃ

গল্প

সমুদ্র বড় দুষ্টু

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্রের ঢেউটা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পায়ের পাতা, হাঁটুর চারপাশ, তারও ওপরে আরও খানিকটা। শাড়ীটা পুরো ভিজে গেল ঈষিতার, সুমনের প্যান্টটাও। ঢেউটা দামাল বাচ্চার মত ছুটে এসে ওদের ভিজিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গেল। ওদের পায়ের নিচের বালি জলের টানে আলগা হয়ে গেল। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। কোনক্রমে ওরা নিজেদের ভার সামলাল। জলটা চলে যেতে ওরা নিজেদের অবস্থা দেখে হেসে ফেলল। এ অবস্থায় হোটেলে ফেরা চলে না। ওরা জল থেকে দূরেই ছিল। কিন্তু পূর্ণিমার কোটালে জল অনেকটা উঠে এসেছে হঠাৎ, ওরা আগে বুঝতে পারে নি।

ঈষিতা আর সুমন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সমুদ্রের তীর ধরে। জলে ওদের সব ভিজে যাওয়ায় ওরা বোধ হয় খুব অসুখী হয় নি। পূর্ণিমার চাঁদ উঠে গেছে সমুদ্রের মাথার ওপর পূর্ণশশী, নিচে উত্তাল জলরাশি। বার বার জল আসায় এতক্ষণে পুরো সমুদ্রের ধারটাই ভিজে গেছে। বসার মত জায়গা পাওয়া গেল না। ওরা কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জল শুকিয়ে গিয়ে ওদের পোষাকে এতক্ষণে বালি দেখা গেল। ঈষিতা ছেলেমানুষের মত খুসী হয়ে হাত দিয়ে নিজের শাড়ী থেকে সুমনের প্যান্ট থেকে বালি ঝাড়তে লাগল। সুমন একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করল। সেটা হাওয়ায় নিভে গেল। কিন্তু আজ কিছুতেই ওদের বিরক্ত লাগছে না।

কিছুদিন আগেও ওরা আজকের এই আনন্দের কথা ভাবতে পারে নি। ঈষিতা ওর হাতটা একজনকে দেখিয়েছিল, সে বলেছিল যে সামনে ওর বিরাট বাধা, সাফল্য অনেক দূর। বিষন্নতাটা যেন ওর সর্বাঙ্গকে আরও চেপে ধরেছিল। সে সব দিনগুলো এখন দুঃস্বপ্নের মত

জাগে। সকালের ঝলমলে রোদে ঘোর ভাঙায় মর্ত ও সেসব দিনগুলোকে ভুলে যেতে চায়। ওর হলদে সিল্কের শাড়ীর উজ্জ্বলতায় ফরসা পায়ের আলতায়, কপালে, সিঁথিতে টুকটুকে সিঁদুরে ওর মনের খুশী ঝলকে উঠছে। সুমন ওর দিকে বিহ্বল হয়ে দেখে, ওদের পরস্পরের হাত ওদের মুঠোয়।

'সুমন' 'ঈপ্সিতা' ওরা পরস্পরকে ডাকে, সে যেন শুধু ডাকার সুখেই, সাড়া পাবার আশায় নয়। পরস্পরে ডুবে গেছে পরস্পরের মধ্যে। ঈপ্সিতার চুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এখানে ওখানে, সুমনের সার্টের কোণে। ওরা হাসে, ভাবে, আবার হাসে। ঈপ্সিতার নরম হাতটা ছটফট করছে, সুমন ধরে রেখেছে। ঈপ্সিতার চোখের পাতায় কৌতুক ঝিক্‌মিক্‌ করছে, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। সুমনের শান্ত চোখে দীপ্ত আবেশ।

'ঈপ্সিতা'

'উঁ'

''এবার কি হবে?'

'আমরা বাড়ী যাব। সেখানে তো কিছুই গুছানো নেই। নতুন সংসার পাততে হবে। এতদিন তুমি একা ছিলে, এখন তো লোক বাড়ছে।'

'তোমায় সবই নূতন করে করতে হবে। ছেলেদের সংসারে মেয়েরা এলে সবই বদলাতে হয়। আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারে এবার শ্রী আসবে তাই না?'

'ছি! তোমার সংসার দেখেই তো আমার পছন্দ হয়েছে সুমন। তুমি আগের দিনগুলো ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'ঈপ্সিতা, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের দিনগুলো মনে আছে?'' সুমনের আবার শুনতে ইচ্ছে করে 'তুমি আমায় দেখে কেমন লজ্জা পেতে, চোখ তুলতে না।'

'বারে লজ্জা পাব কেন? তুমিই যেন আমায় দেখে কত উচ্ছ্বসিত ছিলে। কথাই বলতে না তো। কথা বলতে সবায়ের মুখের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে।'

'তার পরের দিনগুলো মনে আছে, যখন আমরা নিজেদের কাছে এগিয়ে এলাম নিজেদের অজান্তে?'

'থাকবে না তুমি আশা কর কি করে?' ঈষিতার চোখ দুটো বুজে এল আবেশে।

আলাপটা তখন ওদের প্রাথমিক পর্যায়ে। আর পাঁচজনের মতই ওরা যুক্ত। দুজনেই শান্ত অন্তর্মুখী সুতরাং উচ্ছ্বাসের ঢেউ আসে নি। হয়তো ওরা নিজেরাই বোঝে নি তখনও ওদের মন কখন আকর্ষণের জালে জড়িয়ে পড়েছে। সেদিন সময়টা ছিল সন্ধ্যা, ঈষিতা পরদিন বাসন্তী রঙের একটা শাড়ী, গোলাপী পাড়, গোলাপী জামা পড়ে এল—ওর নিষ্পাপ মুখটা সৌম্য সাজের জন্য যেন আরও মধুর হয়ে উঠেছিল। ওদের আড্ডায় পৌঁছে সিঁড়ির ধাপে ওঠে ঈষিতা দেখল সুমন বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদাসভাবে সিগারেট খাচ্ছে। কালপ্যাণ্ট আর ঘিয়ে রঙের সার্ট ওকেও সেদিন অপরূপ লাগছিল। ওরা দুজনে দুজনের দিকে দেখল মুগ্ধভাবে পরস্পর বুঝতে পারল মনের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ উঠল, কি একটা জিনিস স্থানচ্যুত হয়ে নূতন কিছুর সৃষ্টি হল। ক্ষণিক থেমে দুজনেই আবার নিজেদের সামলে নিল। একটু হাসল। ঈষিতা গিয়ে ঢুকল ঘরে। খানিকবাদে সুমিতেস নির্বিকারভাবে গিয়ে বসল নিজের জায়গায়।

কিন্তু ব্যাপারটা যে শুভক্ষণে ঘটতে শুরু করেছে ওরা অনুভব করছে। পরস্পরের আকর্ষণটাকে কিছুতেই এড়ানো যাচ্ছে না। বারবারই ঈষিতার ইচ্ছা হচ্ছে সুমনের দিকে দেখে অথচ সঙ্কোচ হচ্ছে। একবার চোখ তুলতেই চোখ পড়ল সুমনও ওর দিকে চোখ তুলে আছে। দুজনেই হেসে ফেলল।

আড্ডা যখন ভাঙল অম্লান হঠাৎ এসে সুমনের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলল কিরে আজ এত উদাস কেন? ব্যাপার ঘটেছে নাকি কিছু? 'অম্লানটা বরাবরই মুখফোঁড়। সুমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল, ওর অবস্থাটা অম্লানের চোখে পড়েছে কিনা কে জানে। পড়লে আর ওকে টিকতে হচ্ছে না। সবায়ের সামনে রসিয়ে গল্প করতে ওর জুড়ি নেই। ওর চোখে কিছু পড়ে নি, ও সুমনকে টেনে নিয়ে বলল, "আড্ডায় এমন খোয়াবী মেজাজটা নষ্ট করতে চাই না, চল কফি হাউসে। সুমন ওকে এড়াবার চেষ্টা করল, বাড়ীতে কাজ আছে সময় হবে না।

অম্লান কিছুতেই শুনল না। ওর হাতটা ধরে দরবারি কানাড়ার সুর ভাজতে ভাজতে টেনে নিয়ে চলল।

কফি হাউসে একটা চেয়ারে বসে সুমনের হাতটা ধরে বসিয়ে দিল, 'বাড়ীতে গিয়ে সারারাত ধরে আমার ওপর রাগ করিস, এখন কি খাবি বল।'

'পকেটের অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়, বেশী কিছু টানিস না।' সুমন বলল।

'কি ব্যাপার, বাড়ী ফেরার জন্য পয়সা জমাচ্ছিস নাকি? পকেট সম্বন্ধে চিন্তাটা করতে শিখেছিস দেখছি? ট্রেনিং দিচ্ছে কেউ নাকি?'

'এখনও দেয় নি, তবে দিতে পারে ভবিষ্যতে।'

'ধীরে বন্ধু ধীরে। ব্যাপারটা এখনও ঘটেনি, ঘটার জন্য ধ্যান করছি।'

'তাই বল।' অম্লান উচ্চস্বরে দরবারি কানাড়ার সুরটা আর একবার গেয়ে উঠল।

আশপাশের টেবিল থেকে দু'একজন চেয়ে দেখল, ওর এই পাগলামিটা এখানে বেশ পরিচিত।

সুমন ঘড়ি দেখল, এবার ওঠা দরকার। 'সমু, পারলে কাল একবার আমার ওখানে যাস, এর মধ্যে যদি বিশুর কাছ থেকে সেই বইটা ম্যানেজ দিতে পারিস তবে আরও ভাল হয়।'

'তোমার জন্য বই সাজিয়ে বসে আছে!' সুমন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, অম্লানকেও উঠতে হয়। সুমন জিজ্ঞাসা করল 'তুই আরও থাকবি নাকি?' 'অন্য আর একটা টেবিলে বসা যেত। কিন্তু বাবার বুকের ব্যথাটা আবার কাল থেকে বেড়েছে, রাত না করাই ভাল।' ওরা রাস্তায় নেমে গেল।

পরের দিন বিকেল বেলা অফিসে বসে কাজ করতে করতে সুমন ঘড়ির দিকে দেখল ৪টে বাজে। কতক্ষণ আগে দেখেছিল তখন ৪টে বাজতে পাঁচমিনিট বাকি ছিল, এতক্ষণে পাঁচ মিনিট হল! আর পারা যায় না। ফাইলটা গুছিয়ে তুলতে তুলতে চলতি একটা পঙক্তি ভাজতে লাগল। ফাইলের তাকগুলোয় বড্ড ধুলো, বনমালিটা কদিন আসছে না, ওর ছেলের অসুখ। ঈপ্সিতার মুখটা আবার মনে পড়ল, চোখদুটো খুব ঢলঢলে।

রাস্তায় আসতেই একটা বাস। সৌভাগ্য আসছে মনে হচ্ছে। সত্যিই তাই আড্ডায় পৌঁছেই দেখা গেল ঈষিতা বসে। ওরা হাসল, দূরত্বটা আজ আর রইল না। সেদিন কেন, এইভাবে দূরত্বটা ক্রমশ: দূরতম হয়ে শেষে বিলীন হয়ে গেল।

আজকাল ওরা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভবিষ্যতের কথা ভাবে, মাঠের ধারে বসে গুঞ্জন তোলে, চীনাবাদামের খোসাগুলো হাওয়ায় এদিক ওদিক উড়তে থাকে। লেকের জলে ছায়া দেখে ওরা যখন হাসে তখন ওদের বুকের মধ্যের ছায়াটা কাঁপে—শেষ পর্য্যন্ত সব ঠিক থাকবে তো। সেদিন হাসনাবাদের ইছামতীর জলের ধারে বসে সুমন বলে ফেলল 'ইতু আর কতদূর?' ঈষিতা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল 'এতেই ক্লান্ত? সারা জীবন চলবে কি করে সু? কত দায়িত্ব নিতে হবে, কত ঝড় ঝাপটা সামলাতে হবে। সুমন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হাসল। ঈষিতাকে দোষ দেওয়া যায় না। বাড়ীতে মা আর বোন, থাকে সম্পর্কিত পিসির বাড়ী, রোজগার করতে ও একা, উপরি পাওনা বাঁকা চোখের চাহনি আর টিপ্পনী। এখনই কয়েকবছরের মধ্যে বিয়ের চিন্তা ওর সাজে না। চিন্তাগুলো যদি ঢেউ-এর মত মিলিয়ে যেত কিম্বা স্তূপ হয়ে জমে খসে পড়ে যেত জীবন থেকে, এত বেদনার বোঝা নির্নিমেষভাবে ওদের দিকে চেয়ে থাকত না। ঈষিতার প্রাণের সজীবতাটা বিষন্নতার সুরে বাঁধা রয়েছে। কেউ কোনদিন বলবে না ওর বাঁধন খুলে দাও, কেউ কোনদিন দেখবে না ওর বেঁধে রাখা পাখাটার এত ব্যথা বাজে। একটা খাঁচার ভেতরে ও, বাইরে সুমন। ওরা পরস্পরের বেদনা বুঝতে পারে, হাত বাড়িয়ে পরস্পরের চোখের জল মুছাতে পারে, কিন্তু বেদনা দূর করতে পারে না, পারে না চোখের জল থামাতে। ওরা দেখল দুজনের দিকে, ওরা জানে ওদের দৃষ্টি বড় ক্লান্ত হয়ে আসছে, ওরা উঠে পড়ল।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলতে চলতে সুমন জিজ্ঞাসা করল 'শ্যামবাজার থেকে তুমি বাড়ী ফিরবে না আর কোথাও যাবে।' 'একবার রঞ্জনাদের ওখানে ঘুরে যাই। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, খবর নেওয়া হয়নি।'

'তাহলে তো তোমার হাত এখন খালি।'

'না। ওর বোন সামনের বার দেবে। একেবারে বিদায় দেয়নি।'

'তুমি অফিস ফেরত পড়াও, তারপর বাড়ীর সব কাজ তো আছেই। বিশ্রাম নাও কতটুকু?'

'রাতটা আমার জন্য অপেক্ষা করে' ছোট্ট করে হাসল ঈপ্সিতা 'আমার সঙ্গে আলাপ করে সব ভুলিয়ে দেয়।'

'তোমায় আজকাল খুব ক্লান্ত দেখায়, কিছু টনিক খাওয়া শুরু কর, তা নয়ত পারবে কি করে।'

'সুমন সব টাকা যদি এখন খরচ করি তবে ভবিষ্যতে কি হবে ? এখনই যদি কেউ না দেখে, তবে পরে শূন্যহাতে কে আমায় মাথায় করে রাখবে বল ?'

'এরকম করলে আমি তোমায় ছিড়ে বার করে আনব তোমার বাড়ী থেকে। সেটা ভাল হবে ?'

'তখন একদিনেই শুকিয়ে যাবার সুযোগ পাব, তিল তিল করে শুকোতে হবে না।'

'তুমি বললে কথা শোন না কেন ? বিয়ের পরও তোমার রোজগারটা ওদের দিতে পার।'

'ও বাবা, তুমি পিসিমা-পিসেমশাইকে চেন না। যার কাছ থেকে সব টাকা দেখা শোনা করার নাম করে নিয়ে অযথা কষ্ট দেবে। সুলতা যে আমার চেয়ে অনেক ছোট ও কিছু পারে না।

'কত ছোট ?'

'তা প্রায় ষোল বছরের'

'আলাদা থাক না কেন রে জগার তো কম নয় তোমার।'

'এইতেই এত কথা, তারপর মাথার উপর কেউ নেই, আলাদা থাকলে তো সমাজে কথার স্রোতে কানপাতা যাবে না।'

'বিয়ের পর ওঁরা আমাদের সঙ্গেই তো থাকতে পারেন। কতজনই তো থাকে।'

'মা জামায়ের বাড়ী থাকবেন না।'

বাসটা প্রায় ছাড়বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা পা চালাল।

বাড়ীর মুখে এসে দেখল ঈপ্সিতা কিসের গুঞ্জন। ব্যস্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল। পিসেমশাই কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন বন্ধুর বাড়ী, সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন সে জ্ঞান আর ফেরেনি। তারা গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে গেছে, পিসিমা আছড়ে পড়ে কাঁদছেন, মা চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে। পিসিমার ছেলেমেয়েরা সুলতা, একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে। পাড়ার ছেলেরা ইতিমধ্যে /

সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে, ঈষিতার জন্য অপেক্ষা করছিল। ও আসতেই বলল, 'দিদি, আমরা এবার রওনা হতে পারি।' ঈষিতা মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিল। বিমূঢ় অবস্থাটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে কিছু টাকা এনে দিয়ে বলল 'জগু, কাছে রাখ, লাগতে পারে।'

'আমাদের কাছে আছে দিদি, পরে সব নেব। এ সময় আর ব্যস্ত হয়ো না।' ওরা রওনা হয়ে গেল।

পিসিমাদের দু'চারজন আত্মীয়স্বজন যা আছে সবাইকে খবর দেওয়ার কাজটা ওরাই করেছিল, সবায়ের আসা যাওয়া ভীড় গুঞ্জন ক্রমশঃ একসময় পাতলা হয়ে এল। পিসিমা এখন উচ্ছ্বসিত কান্নাটা থামিয়েছেন, একটা মৃদু গোঙানি বেরিয়ে আসছে, চারদিকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা, দু'চারটে ফুলের কুটি এদিক সেদিক পড়ে আছে।

চারিদিক পরিষ্কার করানোর নাম করে জল ঢালাঢালি করে ঈষিতা স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পিসেমশাই-এর সঙ্গে ওদের হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিলনা, তাঁর মারা যাওয়ায় ওর কিছু আসে যায় না। তবে ঘটনাটা আকস্মিক, ওঁর বয়সও বেশী হয়নি, ছেলেমেয়েদের বয়স অল্প। ব্যাপারটা উল্টে গেল আর কি? ঈষিতাদেরই এবার সব দায়িত্ব নিতে হবে। মাথায় ও থাবড়ে থাবড়ে জল দিতে লাগল। ভীষণ গরম লাগছে।

শ্রাদ্ধশান্তি সব চুকে গেছে। পিসিমা থান পরে ঘুরছেন। ছেলেমেয়েদের বড়টার বয়স চোদ্দ, তারপরেরটার বারো, সবছোট দশ। ঈষিতা তৈরী হতে হতে একবার ওদের দিকে দেখল, বড়টা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ছোটদুটো খেলছে। সুলতা কি কথা বলছে বড় মেয়েটার সঙ্গে। ঈষিতাকে বেরুতেই হবে, কদিন অফিস থেকে ছুটী নিয়েছিল, যাওয়া দরকার মাইনেও পাবে। সুমনের সঙ্গে দেখা হয়নি কদিন, খবর পেয়েছে কিনা কে জানে। পাফটা দ্রুত হাতে কপালে গালে বুলিয়ে ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে নিল। পয়সা কড়িগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে চটীটা পরতে লাগল। ওর নিজেকে খুব স্বাধীন, বাঁধন ছাড়া মনে হচ্ছে, কেউ বাঁকা চোখে ওর বেরন দেখবে না, টিপ্পনী ছুড়বে না।

বেরনর সময় পিসিমা বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস মা, নিজের পরীক্ষার দিকে নজর রাখিস' ও থমকে দাঁড়াল, পঁয়ত্রিশ বছরের থানপরা একমূর্ত্তি ওর সামনে দাঁড়িয়ে, কণ্ঠার হাড়টা উঁচু হয়ে আছে, চোখের কোণে কালি। একটা ট্রেন জোরে ছুটছিল, হঠাৎ স্টেশনে পৌছবার আগে থেমে পড়ে খুব টেনে হিঁচড়ে

ক্রমশঃ শরীরটাকে যেন ষ্টেশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঈপ্সিতা পা চালায় দ্রুতগতিতে। জীবনের থেমে পড়া সমস্ত দিনগুলোকে যদি মাড়িয়ে ফেলে স্পীড্ নিতে পারে সমস্ত নেট্ রানটা ওখানেই পুরিয়ে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা সুমনের সঙ্গে দেখা হল। 'কি হয়েছিল ওঁনার ?'

'স্ট্রোক।'

'পিসিমারা কোথায় ?'

'আমাদের কাছে।'

'বৃত্তটা বড় তাড়াতাড়ি ঘুরে গেল, না ঈপ্সিতা ?'

'কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।'

লেকের ধারেও বিকেলগুলো আজকাল বড্ড বেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, রাস্তার ধারে পথচারীরা মাঝে মাঝে ওদের মশগুল হয়ে গল্প করতে করতে যাওয়ার দিকে ফিরে দেখে। আবার একদিন ওরা হাসনাবাদের ইছামতীর ধারে বসল। নৌকোগুলো ভেসে যাচ্ছে জলের ওপর। গাছের নীচে সুন্দর ঠাণ্ডা ছায়া, হাওয়া এসে ওদের গায়ে লাগছে, ঈপ্সিতার আচল উড়ছে, শ্যাম্পু করা চুলের খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর এলিয়ে রয়েছে, ওদের চোখে স্বপ্নটা ঘন হয়ে এল।

সুমন মুক্তো বসান একটা আঙটী বার করে বলল, 'ঈপ্সিতা আজ তো এটা পরাতে পারি তোমার আঙুলে।'

'ঈপ্সিতা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'শেষের কবিতায় অমিত যখন জলের ধারে বসে কেটীর হাতে আংটী পরাচ্ছিল, কেটী তখন কি বলেছিল তোমার মনে আছে ?'

সুমন ওর হাতে আংটীটা পরাতে পরাতে বলল, 'আমি ত অমিত রায় নই, তুমিও কেটী নও। সুতরাং এই আংটীটা এই হাতে অনন্তকাল থাকবে।'

নদীর জলটা যেন বড় বেশী উচ্ছল হয়ে উঠল ওদের সঙ্গে।

বিয়েটা বাড়ীতেই হল। পিসেমশাই মারা গেছেন মাত্র ছ'মাস। ঘটা না করে ওরা বাড়ীতেই রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেছিল। কিছু বন্ধুবান্ধব, কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন উপস্থিত থেকে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন। অম্লান সুমনের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললে 'ব্রাভো ব্রাদার, তুমিই জিতে গেলে। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা সেই উঠিয়েই ছাড়লে।'

সুমন গলাটা নামিয়ে বলল, 'ইচ্ছে হলে তুই পরতে পারিস, বলে দেখব নাকি ?'

'না ভাই, শেষে তোমাদের মধ্যে ঢুকে একপাশে ফোঁসফোঁসানি, আর একপাশে হাঁসফাঁসানি সহ্য করতে হবে।'

সবাই হেসে উঠল ওর কথা শুনে।

পিসিমা খুব খাটা খাটুনী করছেন বিয়েতে। এতদিনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঈষিতাদের উন্নতির পথে বাধা দেওয়া সব যেন মুছে নিতে চাইছেন। এখন সংসার এক, ঈষিতাই চালায়। এখনও ঈষিতাই চালাবে। ওরা কাল চলে যাবে তার আয়োজন করছেন এখন। ছেলেমেয়েগুলোও ঈষিতার চারপাশে ঘুরছে, কাল থেকে কেউ আর ওদের কথা শুনতে চাইবে না, কেউ আদর করবে না। ওরা কাঁদছে।

রাত্রে সুমন জিজ্ঞাসা করল, 'ইতু কোথাও যেতে চাও ?' 'কোথায় আর যাব ? কলকাতাতেই থাকিনা। আবার খরচও তো।'

'কি দরকার ! সারা জীবন তো থাকবই, পরে কখন কোথায় জড়িয়ে পড়ি। তার চেয়ে চল, কাল তো আমরা চলে যাবই। আমার বাসাটাও এখন গুছান নেই। এখান থেকেই বরঞ্চ সোজা দীঘায় যাই।'

'দীঘা ? কালই ? এখান থেকে ?' ঈষিতা অবাক হয়ে উঠে বসল— 'সে আবার কি ? কিছু ঠিক করা নেই, কাউকে বলা নেই।'

'সেই তো মজা, কেউ জানবে না, কিছু ঠিক থাকবে না। যেমন আমরা আগে বেড়াতে যেতাম, দূরের একটা বাসে উঠে মাঝপথে হঠাৎ নেমে বেড়িয়ে আসতাম, সেইভাবেই যাব। তুমি কি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেলে ইতু ?'

দীঘার সমুদ্রের ঢেউটা যখন ওদের পায়ের পাতা জড়িয়ে ধরে উঠতে চাইল, ঈষিতা নিচু হয়ে সেটাকে ছুঁয়ে বলল 'সুমন, এই ঢেউটা যে আমাদের আদর করল, কাছে এল এটাও কেউ জানবে না। এটাও পৃথিবীতে আর কোনদিন হবে না। এটা শুধু তোমার আর আমার তাই না ?'

ঢেউটা ততক্ষণে ছুটে পালিয়েছে।

কনটে এখন সন্ধ্যা

বিনয় ভৌমিক

জানুয়ারীর মাঝামাঝি,
কনট সার্কাসে কফি হাউসের বিস্তীর্ণ চত্বরে
এখন শীতের সন্ধ্যা।
ধূমায়িত কফির পেয়ালায়
হাজার লোকের কাকলিতে
ছোট্ট মেয়েটির কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়,
সান্ধ্য বার্তা পৌঁছে দেবার
অক্লান্ত প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে যায়
ব্যারোমিটারে পারদস্তম্ভের অবনতি।
ঘড়ির কাঁটার সাথে হিমেল হাওয়া বেড়ে চলে
রূপসী কনট এখন মুঘল বাদশার সরাবখানা।
নীল চন্দ্রাতপের নীচে
ক্রমবর্দ্ধমান ঘনত্বের বায়ুস্তর
যেন উত্তম ইন্‌স্যুলেটর—
অন্তত: ঐ হতভাগিনীর জন্য।
ইন্দ্রিয়ের প্রসুপ্তিতে তাই আনন্দের আতিশয্য
সান্ধ্য বার্তায় রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত—
দিল্লীর সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
কনটের সুপরিচিত বার্তাবাহিনী।

তোমার চিঠি এলো স্বপ্ন মাখা সবুজ বিকালে

তাপস কুমার দাশগুপ্ত

তোমার চিঠি এলো।
একরাশ হলুদ প্রজাপতির
সবুজ স্বপ্ন মাখা
নাম না জানা কোন পাখীর ডানায় ভর দিয়ে
হেমন্তের সোনালী রোদের মত।

তোমার চিঠি এলো
পূঞ্জীভূত কামনা-বাসনাময়
স্বপ্নের ঐতিহ্যের মত
কোন পাহাড়ী সন্ধ্যার হিমেল হাওয়ায় ভর দিয়ে।

তোমার চিঠি
ভালোবাসা সাতনরী হার নিয়ে
প্রলম্বিত আমার হৃদয়ে
চাতকী তৃষ্ণার শেষে দুই ফোঁটা হিমজল
বিষন্ন সন্ধ্যায়।

কে যেন কবে, উচ্ছ্বাসের বশে
মজে যাওয়া ছোট নদীটিরে
ডেকে বলেছিল "ভালোবাসি"।
ভালোবাসি পৃথিবীর ক্ষুদ্র অণুটিরে।
আজ তাই
অবরুদ্ধ প্রপাতের দ্বারে
কেঁদে মরে ভালোবাসা।
খোল দ্বার ওগো প্রিয়

সম্মুখের দিন হতে
কেটে গেছে বন্ধ্যাত্বের কাল।

সব কিছু ভেসে যায়
ভালোবাসা নীল নীল জলে।
নিদ্রিত চব্বিশের রক্তে বান ডেকে যায়
তোমার সংক্ষিপ্ত কথাটি
"ওগো প্রিয় মোর,
আমি তোমারেই
ভালোবাসি।"

আলোর প্রার্থনায় পথে বসে আছি

সমীরণ রুদ্র

আজ চারিদিকে অসত্যের দাবানল, বিষাক্ত বাতাস,
বিশুদ্ধ আলো পাবার মিথ্যা আশায় কতো কপাল ঠুকলাম,
কিন্তু হায় আমি আজ একা মরুভূমি, আমি বন্ধ্যা প্রান্তর,
নিঃসঙ্গ বেদনায় শুধু পথে বসে আছি ভোরের আশ্বাসে।
কিন্তু কোথায় আশ্বাস? তবু এ ব্যর্থ নাট্য বারবার অভিনীত—
কি এক অব্যক্ত অভিমানে তবু এ নিহিত ব্যথা।
হৃদয়ের অন্ধকারে কতো মেঘ,
তবু এক আলোর প্রার্থনা আমাকে যে ডেকে যায় বারবার।
হে পৃথিবী যাহা চাই তাহা পাই না।
এ আমার কি যন্ত্রনা।
তবু সাড়া নেই, দেবতা আমার নির্বাক।

সিঁদুর মুছোনা যেন কিছুতেই

কাঞ্চন বসু

সিঁথির সিঁদুর কি অনার্যের প্রতীক ?
কিসে বাধা সিঁথির সিঁদুরে ?
তন্নতন্ন করেও কেন খুঁজে পাই না আমার অস্তিত্বকে
তোমার প্রশস্ত কপালে ?
এটা নারীত্বের চরম অবমাননা ! পতিত্বের চরম অধিকার হনন
তাই সিঁদুর মুছোনা, মুছোনা যেন কিছুতেই।

ফেলে আসা কুমারীত্বের প্রতি কেন এত টান ?
কৈশোরে শিব পূজোয় কি বর চেয়েছিলে ?
তবে কেন এত সংকোচ বিবাহিত জীবনে ?

আমি আধুনিকতার পিয়াসী—
তবে
সৌন্দর্য্যতার কণ্ঠনালী রুদ্ধ করে নয়।
তাই
তোমার অপসৃয়মাণ সিঁদুর রেখায়
আমি আমার পতিত্বের গোঙানি শুনি।
তাই সিঁদুর মুছোনা, মুছোনা যেন কিছুতেই।

শ্রীমা স্মরণে

হেনা চৌধুরী

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীমা মহাপ্রয়াণ লাভ করলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠে দেখা গেছে যে ভারতের বুকে বৈদেশিক পুরুষ শক্তি বারবার লোভ ও উন্মত্ততা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ডকে ঝাঁজরা করে দিয়ে গেছে। কিন্তু বিদেশের নারীশক্তি বারেবারে আমাদের জাতীয় জীবনে ও জাতীয় ইতিহাসে আবির্ভূতা হয়েছেন কল্যাণরূপে। তাঁরা ধনরত্ন চাননি, ভারতের আত্মিক জীবন ও ভারতীয় জীবন সাধনা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করেছেন এই বিদেশিনীরা। নিজেদের জীবনের দীপ জ্বালিয়ে করে গেছেন আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল। এঁদের কথা বলতে গেলে আমাদের মনে পড়ে সিস্টার নিবেদিতার কথা পণ্ডিচেরীর শ্রীমার জীবনকথা এ্যানি বেসন্ট ও নেলী সেনগুপ্তার ভারতপ্রেম; —মনে পড়ে আরো একজন নারীকে যিনি ভীরু কম্পিত কুণ্ঠিতা হয়ে দূরেই সরে রইলেন তাঁর নাম শ্রীমতী এমিলি বোস।

সিস্টার নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হয়ে দেশগড়ার কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আর পণ্ডিচেরীর শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের সাধনসঙ্গিনী হয়ে আমাদের মানুষের জগতে এনেছেন এক নতুন অনুভূতি, সে অনুভূতি অতি মানসলোকের। আর সেই অতি মানসলোকে পৌঁছতে হলে সাধনার যেমন প্রয়োজন, কর্মেরও তেমনি প্রয়োজন। সাধনা এবং নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই মানুষ একদিন সত্যিই সেই অতিমানস লোকের অধিকারী হতে পারে।

শ্রীমার আধ্যাত্মিক জীবন সাধনার এই অনুভূতি কেবলমাত্র একদিনের সাধনার যোগফল নয় এই অনুভূতি তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল ছেলেবেলা থেকেই। এরজন্য তিনি নানা রকম কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন এমন কি সাপের গর্তের মুখে বসেও ধ্যান করেছেন। নির্জনে বসে ধ্যান করতে করতে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করেছেন—প্রকৃতির প্রাণীরাও গভীরভাবে ভালবেসেছিল এই ক্ষুদে সাধিকাকে, তাই তিনি ধ্যান করতে বসলে বন্য ক-

বিড়ালীরা আর গাছের পাখীরা দিব্যি তাঁর গায়ে মাথায় ছোটাছুটি করে বেড়াত।

আর একবার ক্রেম সেল থেকে ফেরার পথে দারুণ ঝড় উঠল সমুদ্রে। ভয়ে ভাবনায় যাত্রীদের তো প্রাণ যাবার অবস্থা, তিনি বলেছেন —"এই অবস্থায় আমি গিয়ে কেবিনে শুয়ে পড়লাম তারপর নিজের দেহ ছেড়ে সমুদ্রের ওপর বিচরণ করতে লাগলাম, তখন দেখি অসংখ্য অশরীরি আত্মা সেই সমুদ্র তরঙ্গে পাগলামি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাই দুষ্টামী করে জাহাজটাকে ধরে দোলা দিচ্ছে আর খুব আমোদ পাচ্ছে। আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম এই সব ভয় কাতর নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে, তুমি এদের নিষ্কৃতি দাও। আধ ঘন্টা ধরে তাদের 'বাবু-বাছা' করার পর তারা এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত হল—সমুদ্রের জল তখনই প্রশান্ত হল, আমি আমার দেহে ফিরে এলাম।"

আমরা পার্থিব মানুষেরা অবশ্য এই অনুভূতি ঠিক উপলব্ধি করতে পারবোনা —কিন্তু এই উপলব্ধির পূর্ণতাই ছিল শ্রীমার জীবন সাধনা।

ঈশ্বরকে তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, স্বপ্নে দেখেছেন এবং সেই স্বপ্নের কৃষ্ণই শ্রীঅরবিন্দরূপে এসেছেন তাঁর জীবনে—শ্রীঅরবিন্দের 'সাধনারও পূর্ণতা দিয়েছেন শ্রীমা। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই মায়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—যে আমরা দুজনে একই ভাগবতী সাধনার দুটি ধারা। তাই শ্রীমায়ের নিকট আত্মসমপর্ন করলে, শ্রীঅরবিন্দের নিকটেও আত্মসমর্পন করা হয়।

১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ এই বিদেশী তনয়া সাধনভূমি ও সাধকের অন্তরের নিগুঢ় আকর্ষণে এসে পৌছলেন শ্রীঅরবিন্দের সাধনাপীঠ পণ্ডিচেরী। শ্রীঅরবিন্দের সংগে প্রথম দিন দেখা হওয়ার পরে তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন —"মনে হচ্ছে যেন অন্য এক নতুন জীবন নিয়ে এবার আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আগেকার জীবনের কোন ব্যবস্থা আর আগেকার কোন অভ্যস্ত পন্থাই আমার কাজে লাগবেনা। অতীতের সবটাই এবার খসে পড়ল আমার যা কিছু ভুলভ্রান্তি ও সিদ্ধিলাভ সব একসঙ্গে কোথায় তলিয়ে গেল।

নবজন্ম নিয়ে তিনি দীক্ষিতা হলেন শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষায়। সাধন সংগিনী হয়ে গ্রহণ করলেন শ্রীঅরবিন্দের কার্যেরভার। বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত আর্য পত্রিকার ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় সম্পাদনায় তাঁরা স্বামী

স্ত্রী উভয়েই শ্রীঅরবিন্দকে সাহায্য করতে লাগলেন।

তিনি মনে মনে পণ্ডিচেরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার সঙ্কল্প করলেন—কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাসমর বেঁধে গেল। —তাই স্বামীর সংগে তাঁর আর এদেশে থাকা সম্ভবপর হলনা। অথচ এখনও কোনদিকেই তেমন ভালো কর্মক্ষেত্রই প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু উপায় নেই বাধ্য হয়েই স্বামীর সংগে তিনি ফিরে চললেন প্যারিসে। —কিন্তু মন খুবই খারাপ—মনের সেই নিগূঢ় বেদনার অনুভূতি তিনি লিখে চলেছেন জাহাজে বসে ডায়েরীতে—"নিঃসঙ্গতা অতি তীব্র রকমের। এই নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা যেন অন্ধকারে এক নরকুণ্ডের মধ্যে কেউ আমাকে ছুড়ে ফেলে দিলো।"

দেশে ফিরে গিয়ে আবার তিনি সাধনায় নিমগ্ন হলেন—কিন্তু পণ্ডিচেরী এই মেয়েটির মধ্যে যে নবরূপায়ণ ঘটিয়েছিল তা তিনি ভুলবেন কেমন করে। মানুষের বুকে যে যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে কত কান্না, কত ব্যথা সেই মানুষকে যে তাঁর পৌঁছে দিতে হবে আলোকের অভিসারে।

সেই সময় তাঁর মানস অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় তাঁর ডাইরীর পাতায়।

১৯২১ সালের ২৪শে এপ্রিল শ্রীমা আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষের মাটিতে।

এই সাধিকাকে পরম বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় শ্রীঅরবিন্দ দিলেন আশ্রমগড়ার ভার। তারপর ১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধিলাভ করে চলে গেলেন লোক চক্ষুর অগোচরে। মায়ের উপর পড়ল সমস্ত ভার। সেদিনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একজন বিদেশিনী নারীকে এই দায়িত্ব নিতে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীমা তাঁর বুকভরা প্রেম নিয়ে সব বাধা অপসারণ করেছিলেন। পরম ভালবাসায় তৃষিত, তাপিত ও ব্যথিত মানুষকে টেনে নিয়েছিলেন নিজের বুকে —বিশ্বের মানুষকে দিয়েছিলেন শান্তির অমৃতবাণী।

৪২ বছর বয়সে তিনি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য আসেন—সেদিন আশ্রম বলতে কিছুই ছিলনা—কিন্তু মা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন সুবিপুল পৈতৃক সম্পত্তি, তাই দিয়ে এবং ভক্তদের অর্থে গড়ে তুলছিলেন আজকের পণ্ডিচেরী।

তরুণ আইনজীবি এসেছেন এ পথে। তাঁরা ঘুরে ফিরে কাজ করেন। মাঝে মাঝে ভাবেন দূর! একাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য আদালতে প্রাকটিস করবেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা আর হয়ে ওঠে না। এরই বছর দুই বাদে ১৯২৪ সালের একটি অপ্রতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে জন্ম নিল কলকাতার আয় কর বিভাগের আইনজীবিদের এই সংস্থা। সে সময় তাঁদের বসবার বিশেষ অসুবিধে হত বলে শ্রীযুক্ত রায় বাড়ী থেকে টেবিল, চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে বসে কাজ করতেন। একদিন অফিসে এসে দেখেন চেয়ার টেবিল দুটো স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে আছে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের রাস্তায়।

জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার? জনৈক বেয়ারা জানালো কোন আফসারের চলাফেরায় অসুবিধে হচ্ছিল বলে তিনি সেগুলো সরিয়ে ফেলতে বলেছেন।

শ্রীরায় সহকর্মী শ্রদ্ধেয় ভূতনাথ করকে গিয়ে জানালেন ঘটনাটা—এই প্রথম তাঁরা প্রয়োজন অনুভব করলেন একটি সংস্থা গড়ে তুলবার।

তারই ফলে শ্যাম সরকার, শশী ভৌমিক, অমৃতলাল মজুমদার, ভূতনাথ কর এবং শ্রীযুক্ত রায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জন্ম হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটির।

তারপর বিডন ষ্ট্রীট থেকে এসপ্ল্যানেড সেখান থেকে ৩ নম্বর গভর্ণমেণ্ট প্লেস এবং নানা জায়গা ঘুরে প্রতিষ্ঠানটির বর্ত্তমান স্থান হয়েছে প্যারাডাইস সিনেমার পাশে আয়কর ভবনে।

প্রায় ৫০ বছরের সাফল্যপূর্ণ আইনজীবি জীবনে তিনি দেখেছেন বহুমানুষ, দেখেছেন ইতিহাসের পাতায় সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাসকে। প্রথম প্রথম জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে—তার কারণ নূতন একটা কিছু প্রবর্ত্তিত হলে তাকে আমাদের দেশের জনগণ তো কোনদিনই আন্তরিক অভিনন্দন জানায় না। তখন এ লাইনে এজেন্ট ছিলেন যারা মক্কেল যোগাড় করে এনে দিতেন। আর কলকাতার চেয়ে মফঃস্বলেই কাজ ছিল বেশী। তবে ফি ছিল ৫০-৬০ টাকা জোর ১০০ টাকা।

বললাম সে সময় তো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জীবিত ছিলেন তাঁর সংগে কখনও যোগাযোগ করেননি?

তিনি জবাব দিলেন, না? তা হয়নি। তবে কাজের ব্যাপারে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের সংগে যোগাযোগ হয়েছে কয়েকবার।

পেশাদারী জার্ণালিষ্টের মতন জিজ্ঞেস করা হয়ে উঠলনা যে এ লাইনে আপনি আনন্দ কি পেলেন? কিংবা এই লাইনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই বা আপনার অভিমত কি?

শুধু প্রশ্ন রাখলাম এই আইনজীবিদের প্রতি জনসাধারণ রুষ্ট কেন ?

আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন ওঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র (আমাদের সবার প্রিয় হেলুদা) বললেন ওটা লোকের ভুল ধারণা। আয়কর বিভাগের আইনজীবিরা নিযুক্ত হয়েছেন জনসাধারণকে উপযুক্ত পথে পরিচালনা করবার জন্য।

ওঁদের উৎসবে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র।

তাঁর উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :— আয়কর দাতাদের ঠিক পথে পরিচালনা করে এই প্রতিষ্ঠানের আইনজীবিরা রাষ্ট্রের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

আসলে ন্যায্য কর সরকারের হাতে তুলে দিতে সহায়তা করাই এঁদের কাজ—জনসাধারণকে কর ফাঁকির রাস্তা দেখাতে নয়।

অতএব আশা কোরব জনসাধারণ এঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণাটির নিরসন ঘটবেন।

যাক যা বলছিলাম—শ্রীযুক্ত রায় বর্ত্তমানে শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবং বার্দ্ধক্যের জন্য আইন ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

অর্থ, যশঃ, সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোত্তম সোপানে আরোহন করেও মানুষ হিসেবে তিনি নিরহংকারী। অমায়িক ও বিনয়ী। সবপরি ধীরস্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

মানুষ হিসেবে তিনি খুবই উদার দৃষ্টি সম্পন্ন—এ সম্পর্কে তাঁর পুত্রবধুর কাছে শোনা একটি কাহিনীর কথা বলি—

জাতিভেদ প্রথা মানুষেরই সৃষ্টি একহীন প্রথা—বন্ধু কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে গেছেন এক নেমতন্ন বাড়ী।

খাবার জায়গা করা হয়েছে। আজ থেকে ৪০ বছর আগেকার সমাজে এই জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার এবং নির্মমতা ছিল ভয়ানক তাই কাজীর খাবার জায়গা করা হল মুসলমানদের পংক্তিতে আর ব্রাহ্মণ তনয় জ্ঞানরঞ্জন রায়কে সমাদরেই বসতে দেওয়া হল ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে।

জাতিভেদ প্রথার এই নিষ্ঠুরতার অন্তরালে মানুষের মনুষ্যত্বের অপমানের তীব্র প্রতিবাদে বন্ধু কাজী নজরুলকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন নেমতন্ন বাড়ী থেকে অভুক্ত অবস্থায়।

পরে দুজনে হোটেলে খেয়ে বাড়ী ফিরলেন।

অধিকাংশ আইনজীবিদের মতন রুক্ষ মেজাজ ও দাম্ভিকতা তাঁর নেই—সার্থক জীবনবোধের উপলব্ধিতে কর্মে ও জীবনে আনন্দ ও অমৃতলোকের দিশারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন রায়ের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

রূপ ও রুচি

পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়

কোলকাতা শহরে ফাল্গুন চৈত্র মাস থেকেই গরমের প্রকোপ দেখা যায় তখন মেয়েদের একটা সূক্ষ্ম চিন্তা দেখা দেয় সাজটা আর মনের মতন হবে না। যাঁদের দুপুর বেলায় বাইরে যেতে হয় তাঁরা এখনই আশাকরি বুঝতে পারছেন স্নো পাউডারের কি পরিমাণ অপব্যবহার হচ্ছে। এই সময়টা ধুলোও ওড়ে প্রচুর। বাইরে থেকে এলে গায়ের রঙ বদলে যায়। সাবান দিয়ে স্নান করার পর একটা রুক্ষ ভাব জাগে। তাই যদি রাত্রে শোবার আগে এক টুকরো লেবুর রস গ্লিসারিনে গুলে হাতে মুখে মেখে একটু পরে একটা পাতলা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলি তাহলে দেখতে পাব কতটা আলগা ময়লা ছিল। এতে ময়লাও উঠল হাত মুখও মসৃণ হল।

গরমের দিনে সব থেকে অসুবিধা হয় জামা কাপড় পরা নিয়ে। দুপুর রোদে অনেকেই নির্বিকারভাবে গাঢ় রঙের জামা কাপড় পরেন। তাতে চোখ বড় বেশী পীড়িত হয়। সেদিন দুপুরে হেদুয়ার মোড়ে বছর ১৮/১৯ এর একটি মিষ্টি চেহারার শ্যামবর্ণা মেয়েকে দেখলাম। সুন্দর গাঢ় নীল রঙের একটা শাড়ী পরেছে। রঙটা এতই গাঢ় যে একবার তাকিয়ে আর তাকানো যায় না। দু তিনবার তাকানোর পর চোখ সরে এলে তারপর তাকাতে হয়। ভাবছিলাম মেয়েটি যদি একটু মানিয়ে পোষাক পরত—তাহলে কত প্রশংসা পেত। একথা নিশ্চয় সবাই জানেন গরমকালে কালো জামা কাপড়ে গরম বেশী লাগে। একেবারে ধবধবে সাদা কাপড় জামাও চোখ ঝলসে যায়। সব থেকে ভাল হয় যদি হালকা রঙের বেসাতি করা যায়। যে পরে ও যে দেখে উভয়ই সমান আরাম পায়।

স্নানের সময় সামান্য একটু ওডিকোলন জলে মিশিয়ে স্নান করলে শরীরটা ঝরঝরে লাগে। মাঝে মাঝে গরমের প্রকোপটা বাড়লে হাতের কনুই থেকে ভাল করে ধুয়ে নিলে সাময়িক আরাম পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে আমরা প্রায় সকলেই গরমকালে চুল ভিজিয়ে স্নান করি।

কিন্তু গরমের তাড়নায় কিছুক্ষণ পরেই চুল বেঁধে ফেলি। ফলে মাথা ভারী হয় চুলে গন্ধ হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে মাথায় শ্যাম্পু করা উচিত। অনেকের মতে প্রতি সপ্তাহে মাথায় শ্যাম্পু করলে চুল নষ্ট হয়। কিন্তু গরমের দিনে যাঁরা বেশী ঘামেন তাদের মাসে অন্ততঃ দুবার শ্যাম্পু করা উচিত। এতে পরিশ্রমও কম হয়। তেল না দেওয়াটা আজকাল একটা ফ্যাসান হয়েছে। বর্তমান যুগের তেলের যা অবস্থা না দিলে খুব কি একটা ক্ষতি হবে? গরম-কালের সন্ধ্যাবেলায় বিনুনীর থেকে হালকা আলগা সামান্য উঁচু একটা খোঁপা আপনাকে অনেক আরাম দেবে। বেড়াতে যাবার সময় খোঁপায় একটা ছোট্ট ফুল গুঁজে নিন—মনটা প্রফুল্ল লাগবে।

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিসাট্রেশন (কেন্দ্রীয়)
আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশের স্থান	বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮
প্রকাশের সময় ব্যবধান	মাসিক
মুদ্রক	গৌরগোপাল দাশ,
জাতি	ভারতীয়
	বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮
প্রকাশক	ঐ
সম্পাদক	গৌরগোপাল দাশ
	হেনা চৌধুরী
সত্বাধিকারী	গৌরগোপাল দাশ

আমি গৌরগোপাল দাশ ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর

২০-২-১৯৭৪ গৌরগোপাল দাশ

নেতাজী সংখ্যা প্রসঙ্গে একটি চিঠি

সি ২৮/২৪৪ গান্ধীনগর
বান্দ্রা পূর্ব, বোম্বাই-৫১
২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

প্রিয়বরেষু,

আপনারা মনে করে আমার জন্য এক কপি (ছন্দিতা নেতাজী শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা ১৩৮০) কাগজ পাঠিয়েছেন তারজন্য কৃতজ্ঞ।

হেনা চৌধুরীর লেখাটি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। নেতাজী সম্পর্কিত আলোচনাতে এ প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান সংযোজন। আমার যা সবচেয়ে ভাল লেগেছে লেখিকার পরিমিতিবোধ এবং সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের ক্ষমতা। এমন কি স্বর্গত: ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার ও ওটেন সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনায় perspetive যে ভুল করেছিলেন হেনা দেবী তা করেননি। এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। আশা করি তিনি প্রবন্ধ রচনায় যে তথ্যনিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সে অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের একটি তথ্যনিষ্ঠ (স্তাবকতা বর্জিত) জীবনী রচনায় মনযোগ দেবেন।

নেতাজী সংখ্যা বের করে আপনাদের সম্পাদকীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। খুবই ভাল হয়েছে। আশা করি অন্যান্য বিষয়ের ওপর এ ধরণের তথ্যনিষ্ঠ এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনা প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ ইতি—
আপনাদের
সুভাষচন্দ্র সরকার

সম্পাদকীয়

পাঠকদের প্রতি

সাম্প্রতিককালের কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, চড়া দাম এবং ছাপাখানার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ছোট পত্রপত্রিকাগুলি প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। এই অবস্থার মধ্য দিয়েও আমরা যাঁরা এই লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী তাঁদের সামনে আজ নানান সমস্যা। সরকারী বিজ্ঞাপন এইসব পত্রিকার জন্য বরাদ্দ হয় না বল্লেই চলে—বেসরকারী বিজ্ঞাপনও এদের ভাগ্যে জোটে না। এমতাবস্থায় এই পত্রপত্রিকাগুলিকে গ্রাহক-পাঠকদের সহানুভূতির উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। কাজেই একমাত্র গ্রাহক এবং পাঠকরা এইসব পত্রিকাগুলিকে বাঁচাতে পারেন। আমরা আশা করব সহৃদয় পাঠকেরা এই দুর্দিনে ছোট কাগজগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আসবেন—রুচীশীল সাহিত্য সৃষ্টি করতে ছোট পত্রিকাগুলির সংগে সহযোগিতা করবেন।

বর্ষ নয় সংখ্যা বার
Vol 9 No. 12

ছন্দিতা

চৈত্র ১৩৮০
March

—সূচীপত্র—

প্রচ্ছদশিল্পী : মলয়শংকর দাশগুপ্ত

প্রধান সম্পাদক : অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : গৌরগোপাল দাশ ও হেনা চৌধুরী

City Office
CHHANDITA
109/20, Hazra Road
Calcutta-26
Phone : 47-3003

Regd. No. WD
Registered

ছন্দিতা

নববর্ষ ১৩৮১ বিশেষ সংখ্যা

বিশেষ সংখ্যার জগতে একটি অসাধারণ সংখ্যা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও সংগীত, নৃত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সাজসজ্জা, চলচ্চিত্র, খেলাধূলা প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাদের এবং মেজাজের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে শীঘ্র প্রকাশিত হবে বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় সহ।

রূপ ও রুচীতে একটি অনন্য সাধারণ সংখ্যা

লিখছেন—ডঃ রমা চৌধুরী, জয়ন্তী সেন, ঊষা ভট্টাচার্য, বেলা দে, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, ডঃ জয়ন্তী দেবী, নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জলি চৌধুরী, দীপালি ধর, আভা পাকড়াশী, পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, হেনা চৌধুরী, সুচরিতা সেনগুপ্ত, কল্যাণী ভট্টাচার্য, উমা দাশগুপ্তা, হেনা হালদার, মঞ্জুলা বসু, করুণা মুখোপাধ্যায়, মীরা দেবী, গৌরী গুপ্তা, মালতী দাস, অমিতা রায়, গৌরী ঘোষ, আগমণী লাহিড়ী, রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়া ধর, নন্দিতা দত্ত, সুচিত্রা মিত্র, চন্দ্রাবতী দেবী, সবিতা ঘোষ, সুচেতা মিত্র, শ্যামা দে এবং আরো অনেকে।

মূল্য দুই টাকা

এজেন্টগণ সত্বর যোগাযোগ করুন।

এই সংখ্যা থেকে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা এই বিশেষ সংখ্যাটি ছাড়াও আরো দুটি বিশেষ সংখ্যা পাবেন মাত্র ৯৲ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার বিনিময়ে।

আজই আপনার গ্রাহক চাঁদা পাঠান।

সম্পাদকীয়

অথ আকাশবাণীর ৺বুদ্ধদেব পূজা

প্রখ্যাত কবি, কথাশিল্পী এবং শিক্ষাবিদ শ্রীবুদ্ধদেব বসুর পরলোক গমনের ফলে বাংলা সাহিত্যের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমরা এই অসাধারণ কথাশিল্পীর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে—একটি অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন সকলের উদ্দেশ্যে রাখছি। প্রশ্নটি এত অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব যা শুনে বুদ্ধদেবের ভক্তবৃন্দ এবং অনুরাগীগণ আমাদের উপর স্বাভাবিক কারণেই উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন। সকলেই জানেন ৺বুদ্ধদেববাবু শেষ বয়সে কি ধরণের সাহিত্যের বেসাতি করতেন। কল্লোল যুগের চিন্তা ও সাধনার ধারা একদিন ওঁর মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অতি সম্প্রতিকালে তিনি তাঁর সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে অশ্লীল সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই অবগত আছেন বছর কয়েক পূর্বে অশ্লীল ও যৌন স্বাদে ভরপুর তার বিখ্যাত উপন্যাস "রাত ভোর বৃষ্টির জন্য" তিনি আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শোনা যায় তাঁর নাকি যৎসামান্য জরিমানাও হয়েছিল। ত হলে যে দেশের বিচার ব্যবস্থার দ্বারা তিনি অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হলেন সেই দেশেরই সরকারী প্রচার যন্ত্র মারফৎ তিনি কিভাবে পূজিত হলেন? তাহলে সব অভিযুক্ত ব্যক্তিরাই বা আকাশবাণী থেকে পূজিত হবেন না কেন? চুরি, রাহাজানি, গুণ্ডামী এবং ছিনতাই এর অভিযোগে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত অথচ অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ও টেলেনটেড কোন কয়েদীকে নিয়ে আকাশবাণী ত এত হৈ চৈ করেন না? একটা উদাহরণ দিলে হয়ত আরও একটু পরিষ্কার হতে পারে। কোন ব্যক্তির যতই তার মহত্ব কিংবা সামাজিক খ্যাতি থাক না কেন যদি কখনও দেখা যায় তাকে অসামাজিক কাজের দায়ে অভিযুক্ত হতে, তখনও কি তিনি সমাজ এবং সরকার কর্তৃক সম্মানের যোগ্য? আমাদের মনে হয় আইনের চোখে সবাই সমান হওয়া উচিত— কারণ ওটা যখন সংবিধানের একটা লিখিত বস্তু। অন্ততঃ ছোটবেলায় যখন আমাদের তাই শেখান হয়।

একটি আবেদন

ছন্দিতার আগামী বৈশাখ ১৩৮১ নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যা থেকে ছন্দিতার বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬-০০ টাকার পরিবর্তে ৯-০০ টাকা হবে। বছরে তিনটি বিশেষ সংখ্যা সহ শারদ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের কোন রকম অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

যাঁদের গ্রাহক চাঁদার মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং যাঁরা নতুন করে গ্রহক হবেন তাঁদের চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। চাঁদা মণি অর্ডার ; ক্রশ পোষ্টাল অর্ডার এবং চেক-এ পাঠান যেতে পারে (CHHANDITA নামে)।

চুম্বন

অলক কুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

"অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।"

এই যে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের দুই তরঙ্গের আছড়ে পরা ধ্বনি তাকে নানা কবি তার কাব্যে স্থান দিয়েছেন বিভিন্ন নামে। গ্রীস দেশের কবিরা একে বলেছেন Key to Paradise. আবার অনেকেই চুম্বনের নাম দিয়েছেন The Blossom of love. কিন্তু যাকে নিয়ে এত আলোচনা সেই চুম্বনের সৃষ্টি কোথায়? এ ব্যাপারেও যথেচ্ছ মতানৈক্য রয়েছে। তবে আরনেষ্ট ক্রাউলি বলেছেন্ ভারতবর্ষে আর্যদের আসার পর থেকেই সারা পৃথিবীতে চুম্বনের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু চুম্বন এর সঠিক মানে কি? বিভিন্ন লেখক তার সংজ্ঞা দিয়েছেন। মিঃ আরনেষ্ট ক্রাউলি বলেছেন " চুম্বনের মধ্যে দিয়ে মানুষের আদিমতম দুইটি আবেগ প্রকটিত হয়ে ওঠে—ক্ষুধা ও প্রেম।" কিন্তু ডাঃ ভ্যান ডি ভেলডি অন্য কথা বললেন। তিনি বললেন "চুম্বনের উৎপত্তি ঘটেছিল দংশন করার স্পৃহা থেকে। মানুষের পূর্বপুরুষরা ছিলো জন্তু। অসভ্য মানুষের দংশনই সভ্য মানুষের কাছে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে চুম্বন। কিন্তু এতেও মনীষীরা চুপ করলেন না। প্লিনির বললেন স্বামীরা চুম্বন করে দেখতো যে স্ত্রীরা মদ খেয়েছে কিনা। আর তার থেকেইচুম্বনের সৃষ্টি।

রেঁমেসাস চুম্বনের জগতে আনল বিপ্লব। ফলে ইউরোপের রাজপথে প্রকাশ্যে যাকে তাকে চুম্বন করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ইতালির অবস্থা ছিল আরও মজার। সেখানে কোন যুবতীকে যদি কোন যুবক চুম্বন করে তবে তাকে বিয়ে করতেই হবে। একদল যুবক এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাল। তারা রাজপথের ধারে অপেক্ষা করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কোন যুবতীকে দেখলেই চুম্বন করা। ঐ সব যুবকদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্টি হল বড় বড় ওড়না। এবং প্রতিটি মেয়ের সঙ্গেই থাকত সশস্ত্র যুবক। রাজা পিয়েরতোলাগুের তরুণ পুত্র চুম্বন করল তার প্রেমিকাকে প্রকাশ্য রাস্তায়। ফলে পিতার আদেশে তাকে মাত্র একটি চুম্বনের জন্য প্রাণ দিতে হল। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই সব চাইতে করুণ মৃত্যু। তৎ-কালীন পৃথিবীতে চিঠির তলায় "X" চিহ্নের মাধ্যমে চুম্বন বোঝান হতো।

জাপানের মতো সভ্য দেশে কিন্তু চুম্বন প্রথাই ছিল না। এটিকে তারা অশোভন কাজ বলে মনে করতো। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপ শিল্পকলার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাদের দেশের "ওসাকায়" এতে বিশ্ব-বিখ্যাত ভাস্কর রুদিন এর "চুম্বন" টিও ছিল। উদ্যোক্তরা এর চারপাশে কাপড় দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল।

বিশ্বনন্দিত লেখক স্যার ওয়ালটার স্কট মৃত্যুর পূর্বে তার বন্ধু লকহারটের কাছে সামান্য একটি চুম্বন ভিক্ষা করেছিলেন। যেমন করেছিলেন "দি ভিকটরি" জাহাজে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বিখ্যাত বীর নেলসন তার প্রিয় বন্ধু হারডির কাছে।

কিন্তু চুম্বন কি শুধু মাত্র আনন্দই দেয়? ইতিহাসও কি তাই বলে? না, ইতিহাস তা বলে না। ইতিহাস বলে চুম্বন মানুষকে মৃত্যুও দেয়। ইতালির পাডিয়া শহরের এক কারখানায় কাজ করে উনিশ বছরের যুবতী আন্তোনিয়া। প্রতিদিনের মত সেদিনও সে কফি খেতে গেছিল ক্যান্টিনে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল তার এক বন্ধুর সাথে। স্বভাবতই বন্ধুকে তিনি আনন্দের সঙ্গেই চুম্বন করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ে গেলো আন্তোনিয়া। আর উঠলো না। সম্ভবত এটাই প্রথম মৃত্যু যা চুম্বন উপহার দিল। ঠিক এ ধরণের ঘটনা ঘটল ফ্রাঙ্কফুর্টে। যুবক উইসফ্রেড তার প্রেমিক মিমেলা ডিনজারকে চুম্বন করলেন। কিন্তু হায় একি হল। মিমেলা পড়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হল। হাইকোর্ট এর জন্যে উইসকে ডেকে সাজা দিল। সম্ভবত এটাই

চুম্বনের জন্যেই প্রথম সাজা। ২১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

কিন্তু ভারত ইতিহাস কি বলে? আলেকজাণ্ডার দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করলেন। রাজা বশ্যতা স্বীকার করে উপঢৌকন পাঠালেন সঙ্গে পাঠালেন চার অসামান্যা সুন্দরীকে। আলেকজাণ্ডার এর দৃষ্টি পড়ল এদের উপর। চুম্বন এর জন্য এগিয়ে যেতেই বাধা দিলেন গুরু সক্রেটিস। তিনি দুটি তেজী ঘোড়াকে ডেকে আনতে বললেন। ঘোড়া এলে সক্রেটিস বললেন চুম্বন করতে ঐ চার সুন্দরীকে। মুখ ছোঁয়াতেই ঘোড়া দুটি লুকিয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর এল দুজন কর্মচারী। তাদেরও ঐ একই অবস্থা হল। তখনই আলেকজাণ্ডার তরবারির আঘাতে তাদের শেষ করেদিলেন। তবে কি ঐ ব্যাপারের জন্যেই আলেকজাণ্ডার পরে কাউকেই চুম্বন করেননি? সম্ভবত তাই হবে।

বর্তমান যুগ অনেক পাল্টে গেছে। আজকাল প্রেমের জগতে চুম্বনের প্রয়োজন। তাইতো কবি হেরিক বলেছেন "চুম্বন প্রেমের মধুরতম ভাষা।" আজ চুম্বনও তাই অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ছন্দিতার আগামী সংখ্যায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'কানু কহে রাই' প্রকাশিত হবে না।
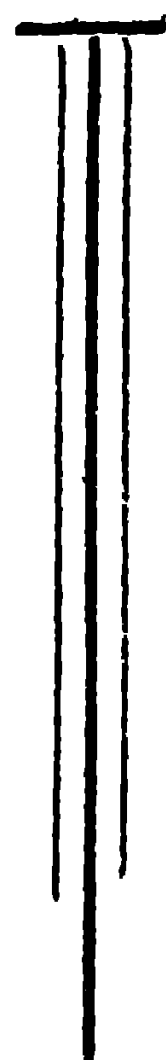
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে আবার যথারীতি প্রকাশিত হবে। সঃ হঃ

নেতাজী শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা—দু'টি পত্র

২৯/১/১ চেতলা সেন্ট্রাল রোড

কলিকাতা-২৭

২০।৩।৭৮

সুচরিতাসু,

আপনার সম্পাদিত নেতাজী শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যা ১৩৮০ 'ছন্দিতা' যথাসময়ে পেয়েছিলাম। পেয়ে পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যার বৈশিষ্টের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংখ্যাটি এত ভালো লাগে যে সেই-দিনই আপনার ঠিকানায় পত্র লিখে আপনাকে অভিনন্দন জানাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে আপনার একটি পত্রও হাতে আসে। আমার অসাবধানতায় সেটি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় জানি না। তাই ছন্দিতার প্রকাশ-স্থলের যে ঠিকানা আছে সেই ঠিকানায় এই চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি পাবেন কিনা জানি না। তবে আপনার নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সুভাষ-প্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার এই অক্লান্ত সাহিত্য সেবা জয়যুক্ত হোক এই প্রার্থনা করি। আপনি দীর্ঘজীবি হোন এবং আপনার সাহিত্য-সেবা সর্বজন স্বীকৃতি পাক এই আমার আন্তরিক কামনা। আপনি যে অমূল্য দলিল পুনর্মুদ্রন করেছেন তার জন্যে আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই পত্র শেষ করছি।

নমস্কারান্তে

বিমল মিত্র

কাঁচরাপাড়া

দোলপূর্ণিমা

মাননীয়া,

আপনার কথা মতো "ছন্দিতা"র জন্য একটি গল্প পাঠালাম। আপনার প্রবন্ধটি এখনও আমি পাইনি।

আপনাদের নেতাজী শ্রদ্ধাঞ্জলি সংখ্যাটি পড়লাম। খুব সুন্দর লাগলো। এ ধরণের মূল্যবান অথচ সুন্দর সংকলন বোধ করি খুব কমই হয়। প্রতিটি রচনাই বলিষ্ঠ। শুধু তাই নয় প্রতিটি মূল্যবান লেখাই সকল সারির পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে মনে হয় আমার।

আপনার "অধ্যাপক ওটেন ও সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধটি বাস্তবিক পক্ষে আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। আর কয়েকটি লেখা আমার ভালো লেগেছে। যথাক্রমে তাঁদের নাম উল্লেখকরলাম—ডা: নলিনাক্ষ সান্যাল, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, চারু চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার বসু, সুকৃতি রায়চৌধুরী, কল্যাণী ভট্টাচার্য্য, বনফুল প্রমুখ।

আর কি, আজ এখানেই শেষ করছি। যোগাযোগ রাখবেন আশা করি।

শুভেচ্ছান্তে

—[illegible]

মিলে কিনা মিলে

শিবাজী বোস

তবুও ওরা আগামী দিনের অপেক্ষায় :
আমার তো শেষ হলো।
প্রাত্যহিক দিন যাপনের গ্লানিতে,
বেমানান বেহিসেবী কথাগুলি
অর্থহীন অব্যক্ত হৃদয়ের মতো।
দিকে দিকে কৃষ্ণচূড়া ঝরে যায়
ওপারের গলিতে কান্না উঠে
হিংসা প্রেম, কিংবা এক গামলা ফ্যানের জন্য।
মৃত্যুর মহামিছিল বয়ে যায়
শান্তি আর সত্যের সরণীতে—
তবুও আমি তাকাতে পারিনা।
স্বার্থপরের মতো পাশ কাটিয়ে চলে যাই।
মিতালী আমার ঝরা পাতার সাথেই
ওদের অনেক আগেই।
গত কয়েক বছর ধরে নয়,
বুভুক্ষার পথ ধরে আজ পঁচিশটা বছর
দেখেছি অনেক.........
কিন্তু, না :
নিজেকে বাঁচাবার মন্ত্র এখনো শেখেনি,
এখনো ওদের দেহে রক্তের স্বাদ বর্তমান।
হয়তো ছাব্বিশ কি সাতাশ :
দেখি মেলে কিনা?
ব্যালেন্স মিটের ফাইনাল একাউন্টটা।

মৃত্যু কালো, যে যাই বলুক

বিনয়েন্দ্র নাথ সেন

ঘন বর্ষার নিবিড় কালো আকাশ,
গাঢ় আলকাতরা যেন ছোপ দিয়েছে তার গায়ে ;
আমি বসেছিলুম নিস্তরঙ্গ মনের আস্বাদে
ছাদের-ধারে বারান্দার কোণে,
আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে :—
—এক পেয়ালা চা ;
কখন জানি না ;
একটুখানি চুমুক দিলুম,
মনে যেন দিলো দোলা—
কি আনন্দ আস্বাদের তরঙ্গ।
খানিক বাদে আর এক চুমুক,
সমস্ত তরঙ্গ ছেয়ে কি আনন্দ যেন ফেললো ছেয়ে ?
আর এক চুমুক আছে ;—
জীবনের প্রতিটি কাঁপন শুনেছি,
বেঁধেছি তারে সুরে,
উপভোগ করেছি প্রতি শিরায়,
প্রতি চুমুকে নিঙড়ে নিয়েছি তার সবটুকু আনন্দ.
শেষ চুমুক আছে,
আমি চলে যাই মিশে অনন্ত কালোর সাথে
আকাশ ছাওয়া আনন্দের উর্মিল কাঁপন মদির নিয়ে
মৃত্যু কালো, যে যাই বলুক। *

---

* কবি অধ্যাপক ডা: বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ছিলেন মেদিনীপুর গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কলেজের রসায়ণ বিভাগের প্রধান। তিনি যেমন ছিলেন স্বল্পবাক্, তেমনি ছিলেন প্রাণবান পুরুষ। কলেজের নবীনবরণ উৎসবে যোগ দিতে এসে সহসা তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। 'ছন্দিতা' কে তিনি ভালোবাসতেন, তাই ছন্দিতাকেই তিনি তাঁর কবিতা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর কয়েকটি কবিতাই প্রকাশের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ প্রেরিত কবিতাটি এখানে প্রকাশ করে তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। —স: ছ:

কানু কহে রাই

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ দুই ॥

দিব্যেন্দু শিল্পী। মনের রঙ যেন তুলিতে মিশিয়ে ক্যানভাসের ওপর তার রূপ দেয়। ফাইন আর্টের ছাত্র দিব্যেন্দু বোস। অংকনে তার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে যেটা গতানুগতিকতাকে অতি সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে গেছে। দিব্যেন্দু শিল্পী—জাতশিল্পী। কল্পনাকে বাস্তবের ছাঁচে ঢেলে নিত্য নতুন সৃষ্টি করে চলে সে।

এয়ার কণ্ডিশনড স্টুডিও। নানান জাতের ছবিতে ভর্তি সেটা। দিব্যেন্দুর তুলি যখন ক্যানভাসের বুকে আঁচড় কেটে চলে কিংবা যখন সে মাটি কিংবা পাথরের বুকে নবজীবনের স্পর্শ দেবার জন্যে ব্যাকুল হয় তখন দিব্যেন্দু এক আলাদা জাতের মানুষ। দিব্যেন্দুর শিল্পপ্রতিভা একমুখী নয়—বিভিন্নমুখী।

সেদিন দিব্যেন্দু হঠাৎ তার টু-সিটার রেসিং কারে চেপে শিবপুরে বোটানিক্সে গিয়েছিল। আপন খেয়ালে ঘুরছিল সে বাগানের চারিধারে। দৃষ্টি তার সবুজ প্রকৃতির বুক থেকে মনের খোরাক সংগ্রহ করছিল।

হঠাৎ তার দৃষ্টি নেমে এল নীচে—মাটির বুকে। সেখানে দেখতে পেয়েছিল সে প্রকৃতির অনবদ্য এক জীবন্ত সৃষ্টি!

একটি মেয়ে। ভোরের কাঁচা সোনালী আলোয় সদ্য প্রস্ফুটিত একটি জীবন্ত গোলাপ যেন!...

শিল্পী দিব্যেন্দুর চোখে প্রকৃতির এই নবসাজ দেখে আবেশের সঞ্চার হলো। চোখ বুজে এল আপনিই। দৃষ্টি তার মনের অতল গহন গভীর তলে ডুব দিয়েছে!

বসেছিল মেয়েটি উদাস দৃষ্টি আকাশের বুকে মেলে দিয়ে জলেতে পা ডুবিয়ে একটি মোটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। ভাবুক প্রকৃতি যেন ভাবাবেশে আত্মভোলা।...

দিব্যেন্দু পেয়েছে। এতদিনে খুঁজে পেয়েছে সে তার মনের মানুষ। এতদিন স্বপ্নে জাগরণে মনের রঙ মিশিয়ে যে-কল্পনাকে সে অতি সন্তর্পণে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছিল আজ যেন তা দেবতার কৃপায় আপনিই নেমে এসেছে মাটির বুকে।

এই সে—তার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা!—

দিব্যেন্দুর ইচ্ছে হল, সে যেন—পেয়েছি পেয়েছি—অন্তরের ব্যাকুল জিজ্ঞাসাকে বাস্তবে খুঁজে পেয়েছি—এই বলে চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু সেটা ভদ্রতাসুলভ নয়। তাই তার মনের আবেগকে সে দারুণভাবে সংযত করলো।

শিল্পী দিব্যেন্দু তৃষিত চাতকের মত আকণ্ঠ পান করলো তার রূপমাধুর্য। তারপর আড়াল থেকে তার নজর এড়িয়ে তার সুন্দরভাবে বসে থাকার একটা স্কেচ এঁকে নিল।

মেয়েটি কিন্তু কিছুই জানতে পারলে না।

দিব্যেন্দু ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে অপরাধী মনে করলো এর জন্যে। বুকের কাঠগড়ায় নিজেকে দাঁড় করিয়েছিল সে অভিযুক্ত আসামী হিসেবে। না, না এটা ঠিক নয়। মেয়েটির কাছে তার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত।

দিব্যেন্দু এগিয়ে এল মেয়েটির কাছে। কাঁধে তার অঙ্কনের সাজ-সরঞ্জাম ভর্তি বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতনের তৈরী নকশা-কাটা সুন্দর নয়নলোভন ব্যাগ।

শুনছেন?

দিব্যেন্দু মিষ্টি করে বিনীত ভঙ্গীতে ডাকলো মেয়েটিকে।

মেয়েটি কিন্তু তার আহ্বান শুনতে পেল না। দৃষ্টি যেন তার আকাশ-ছোঁয়া দিগন্তের কোল ঘেঁসে সুদূরবিস্তারী। বাহ্যিক সত্তা লুপ্ত যেন হয়েছে সাময়িক।

দিব্যেন্দু আবার ডাকল। এবার একটু জোর গলায়।

শুনছেন মিস্—

এবার মেয়েটি শুনতে পেয়েছিল। ঘুরে বসে তাকাল তার দিকে। ভাবভোলা আত্মসমাহিত দৃষ্টি।

আমাকে কিছু বলছেন?

দিব্যেন্দু এগিয়ে এল আরও একটু।

মেয়েটি ততক্ষণে তার কথা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পিচ-ঢালা মসৃণ রাস্তার বুকের ওপর দিয়ে যেমন মিঃশব্দে টু-ডিবেকার গড়িয়ে চলে, তেমনই দিব্যেন্দুর অপলক দৃষ্টি পিছনে গড়িয়ে পড়লো মেয়েটির সারা অঙ্গ বেয়ে।

মেয়েটি তা লক্ষ্য করলো। কিন্তু দিব্যেন্দুর দৃষ্টিতে যে পাপের লেশমাত্র ছিল না সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কারণ পুরুষের দৃষ্টির অর্থ বুঝবার মতো বয়স তার হয়েছিল।

মেয়েটি মাথা নীচু করে আঁচলের খুঁট কোমলপেলব চম্পাকলির মতো দুটো আঙুল জড়াতে জড়াতে সরম বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—আপনি কি কিছু বলবেন ?

দিব্যেন্দু হাসলো। মিষ্টি-মধুর হাসি। হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে অপরাধী !

অপরাধী ?

মেয়েটি বিস্ময় প্রকাশ করলো।

হ্যাঁ। আমি একজন শিল্পী। জানি না, আমার নাম শুনেছেন কিনা—আমার নাম দিব্যেন্দু বোস।

দি...ব্যে...ন্দু...বো...স... !

মেয়েটি স্বগত: উক্তি করলো। অস্ফুট উচ্চারণ। নামটির সঙ্গে সেই-ই নয়, অনেকেই পরিচিত। এই তো গত মাসেই আর্ট সোসাইটিতে তার আঁকা ছবির একটা উপভোগ্য প্রদর্শনী হয়ে গেল। কয়েকটা ছবি বেশ মোটা দরেই বিক্রি হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন কাগজের কথা-সমালোচকরা তাঁর সৃষ্টির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে "শবরীর প্রতীক্ষা" তৈলচিত্রটি সবারই মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছিল সে-ছবিটিতে—খাঁটি ইণ্ডিয়ান আর্ট এটিকে বলা চলে না।

দিব্যেন্দু তার নামটা বলতেই মেয়েটির মানসপটে প্রদর্শনীতে দেখা সেই "শবরীর প্রতীক্ষা" ছবিটি ভেসে উঠলো।

দিব্যেন্দু মিষ্টি হেসে বললে আবার—কই, জানতে চাইলেন না তো, আমার অপরাধটা কি ?

মেয়েটি ওর সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের পরিচয় পেশ করলো তার কাছে—আমার নাম কল্পনা রায়, পোষ্টগ্রাজুয়েট ষ্টুডেন্ট—দর্শনের ছাত্রী।

তাই নাকি? ওয়াণ্ডারফুল!

কেন বলুন তো?

কল্পনা জানতে চাইলো তার ঐ মন্তব্যের মূল কারণ।

আমিও দর্শনের ছাত্র ছিলাম। এম, এ, দিয়েছি বছর পাঁচেক আগে।

ও, এই কথা! কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কি আছে দিব্যেন্দুবাবু?

আছে মিস্ রায়। যাক সে-কথা। আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

কেন দেব না—বলুন।

কথাবার্তায় আচার-আচরণে একটা স্বাভাবিকতা এতক্ষণে এসে গেছে ওদের মধ্যে। ওরা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উভয়ের কাছে।

দিব্যেন্দু জানতে চাইলো—বলুন তো ঠিক করে আপনি মুগের নাড়ু খেতে ভালবাসেন কিনা?

মুগের নাড়ু? হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

দিব্যেন্দু হাসলো। অদ্ভুত অকৃপণ অমায়িক হাসি।

কল্পনার কপোল-তলে স্বেদবিন্দুর নিঃসরণ ঘটলো।

দিব্যেন্দু আরও একটা প্রশ্ন তুলে ধরলো কল্পনার কাছে—মিস্ রায়, রবীন্দ্রনাথের "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো"—এ গানটি আপনার খুব প্রিয়, না?

কল্পনা দিব্যেন্দুর এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না। অদ্ভুতভাবে তাকালো তার দিকে। বললো ফিস্ ফিস্ করে আপন মনেই—অদ্ভুত! এ কেমন করে সম্ভব? মানুষটা কি যাদু জানে?...

কই, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না তো?

জবাব!...আপনার প্রশ্ন জবাবের অপেক্ষা রাখে না—দিব্যেন্দুবাবু। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি।

কি কথা বলুন তো?

ভাবছি, আপনার সঙ্গে আমার কোনদিনই পরিচয় ছিল না, অথচ আমার সম্বন্ধে আপনি এত খবর রাখলেন কি করে?

দিব্যেন্দুর হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। পুরুষের গাম্ভীর্য নেমে এল সেখানে। ব্যথার আলপনা কে যেন এঁকে দিলে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য তুলি দিয়ে তার মুখের ওপর।

কল্পনা কিন্তু জানে না তার অন্তরের কথা। তাই সে ভাবলো, হয়তো তার অশোভন উক্তি শিল্পীর মনে ব্যথার সঞ্চার করেছে। নিরপরাধী অপরিচিত এক ভদ্রলোককে এভাবে বলা ঠিক তার উচিত হয়নি। অথচ কেমন সহজভাবে সে তার অন্তরের জিজ্ঞাসাকে তার সামনে তুলে ধরলো, এতে সে একটুও লজ্জিত বা বিব্রত বোধ করলে না—এও কম বিস্ময়ের বস্তু নয়। মানুষটাকে দেখা অবধি কল্পনারও যেন মনে হচ্ছে—এ মানুষটি একদিনের নয়, বহুদিনের চেনা—মনের মানুষ যেন তার।

দিব্যেন্দু তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ করেই ছিল। ভাব-ভাবনার আলোড়ন চলছিল একটা তার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে, বাইরে তার কোনো প্রকাশই ছিল না। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী যেন!...

কল্পনা সসংকোচে বললো—দিব্যেন্দুবাবু, না বুঝে আপনাকে আঘাত করেছি, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না।

দিব্যেন্দু আবার সহজ হয়ে উঠলো তার কাছে।

না, না, আপনার জিজ্ঞাসার মধ্যে তো কোন অপরাধ নেই। যা সত্যি তাই আপনি জানতে চেয়েছেন। কিন্তু মিস্ রায়, একদিনেই সব বলা বা সব কিছু জানা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে কেমন করে জবাব পাবো আমার এ প্রশ্নের?

পাবেন মিস্ রায়। একদিন সবই জানতে পারবেন। আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে।

আপনাদের বাড়ি?

হ্যাঁ, ক্ষতি কি।

না ঠিক তা নয়। তবে...

কোনো ভয় নেই মিস্ রায়। লেশমাত্রও আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না সেখানে।

না না সেকথা বলছি না। মানে, আমার এই হঠাৎ উপস্থিতিটাকে আপনার মা-বাবা যদি কোনরকম অন্যভাবে নেন, তাহলে...

দিব্যেন্দু তার অন্তরের সংকোচ আর বিব্রতবোধকে অমায়িক সরল স্বচ্ছন্দ হাসি দিয়ে অনেকখানি হাল্কা করে দিল। বললে—মা মারা গেছেন আমার অনেকদিনই, আমি তখন খুবই ছোট, ভাল করে মনেও পড়ে না এখন আর। তাছাড়া বাবা? তিনি তো তাঁর ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। টাকা ছাড়া অন্য

কোনো চিন্তা তো তাঁর মধ্যে দেখি না—। সুতরাং সেদিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত।

দিব্যেন্দুর সহজভাবে কথা বলার ভঙ্গীটা সহজেই আকৃষ্ট করলে কল্পনাকে। কথা দিলে সে, একদিন নিশ্চয়ই যাবে।

দিব্যেন্দু ভিজিটিং কার্ড একখানা এগিয়ে দিল তার দিকে। কল্পনা সেটি তার ভ্যানিটি ব্যাগে সযত্নে রেখে দিলে। ২৪।৩ সাদার্ন অ্যাভিন্যু। বালিগঞ্জ।

একদল মেয়ে হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে আসছিল ওদের দিকে। দুজনেই তাকালো ওরা।

দিব্যেন্দু বললে—আপনারই সাথী বোধ হয়?

হ্যাঁ ছুটির দিন। তাই শীতের সকালেই প্ল্যান করে বেরিয়ে পড়েছিলাম সবাই। তবে ওদের মতো চঞ্চলতা আর উচ্ছ্বাস আমার মধ্যে নেই। তাই ওদের বিদায় দিয়ে এখানে একটু বিশ্রাম করছিলাম।

দিব্যেন্দু হাসলো। মুক্তার মতো দুপাটি দাঁত ঝকঝক করে উঠলো সকালের আলোয়। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল দিব্যেন্দু। বলে গেল, চলি মিস্ রায়; একদিন যাবেন কিন্তু।

কল্পনা রায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

দিব্যেন্দু চলে গেল। কিন্তু যে জন্য এগিয়ে এসেছিল, অর্থাৎ কল্পনার বিনানুমতিতে তার ছবি আঁকার অপরাধহেতু ক্ষমা চাওয়া হলো না আর তার।

সাথীরা এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে।

অনিমা তার মুখটা টিপে দিয়ে বললে—ওহো, বুঝেছি! এই ব্যাপার?

রেবা জিজ্ঞেস করলে—মনের মানুষটিকে জানিয়ে আসা হয়েছিল বুঝি?

নিশ্চয়ই। নইলে আমাদের হটিয়ে দিয়ে বিশ্রামের প্রয়োজন হবে কেন?

সীমা নাম্নী আর একটি মেয়ে রেবার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। কল্পনাকে কিছু বলতেই দিলে না।

কল্পনা হাসলো ওদের রকম-সকম দেখে। তারপর দিব্যেন্দুর ভিজিটিং কার্ডখানা বের করে দেখালে তাদের। বললে, তোমরা যা ভাবছো তা নয়, ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল।

শিল্পী দিব্যেন্দু বোস তাদেরও পরিচিত নাম।

কল্পনা কিন্তু আর কিছু জানায়নি ওদের। কারণ যুগের নাড়ুবে বা বিশ্বকবির গানের ইতিহাস শুনলে ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া বিজ্ঞানের যুগে এটা অবিশ্বাস্যও বটে!

॥ তিন ॥

দিব্যেন্দুর সাথে আলাপ হবার পর থেকে কল্পনার মনেও ভাবান্তর উপস্থিত হলো। দৃষ্টি তার ডুব দিল দিব্যেন্দুর হৃদয়-রহস্যে! আশ্চর্য ঐ মানুষটা। দৃষ্টিতে তার সম্মোহিনী শক্তি লুকিয়ে আছে—কণ্ঠে তার মানুষকে আপন করার সুর। অদ্ভুত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ দিব্যেন্দু বোস।

কলেজের ছুটির পর একদিন লাইব্রেরী-রুমে অধ্যয়নরত সদালাপী প্রফেসর শচীবিকাশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে। তিনি ওকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করতেন।

সে এসে সামনে দাঁড়ালে পর প্রফেসর চৌধুরী প্রথমে বুঝতে পারেন নি। তিনি আত্মসমাহিত ছিলেন তাঁর পঠিত বিষয়বস্তুর মধ্যে। কাঁচা-পাকা চুলগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে মুখের চারিধারে। ধ্যানমগ্ন আত্মভোলা মহাদেব যেন!...

কল্পনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তার ছায়া পড়লো বইয়ের পাতায়। ধ্যান ভঙ্গ হলো জ্ঞান-তপস্বী প্রফেসর শচীবিকাশ চৌধুরীর।

প্রফেসর চৌধুরীর মোটা কালো ফ্রেমের কঠিন চশমার ভেতর থেকে কোমল অথচ উজ্জ্বল দৃষ্টি গড়িয়ে পড়লো কল্পনার মুখের ওপর দিয়ে। লক্ষ্য করলেন তিনি ছাত্রীর চক্ষে জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা।

কিছু বলবে মা?

মাথা নীচু করে রইলো কল্পনা।

প্রফেসর চৌধুরী সস্নেহে তাকে বসালেন তাঁরই পাশের চেয়ারটিতে।

কল্পনা শিক্ষাগুরুর পাশে বসতে ইতস্তত: করলো।

প্রফেসর চৌধুরী হাসলেন। স্বচ্ছ অমায়িক শিশুসুলভ সরল হাসি।

বসো মা—লজ্জা কি?

বাধ্য হয়ে বসতে হয়েছিল তাকে।

তারপর কি খবর? কিছু বলবে আমায়?

হ্যাঁ স্যার। একটা দারুণ সংশয় উপস্থিত হয়েছে মনে। বিজ্ঞানের যুগে তা অবিশ্বাস্য অথচ...

কল্পনা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল কথাটুকু শেষ করতে গিয়ে।

প্রফেসর চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন—অথচ কি মা ? কল্পনা চুপ করেছিল তখনও।

তিনি বললেন ওকে সস্নেহে—কল্পনা, মনের কোনো সংশয়কে চেপে রাখতে নেই। সংশয় থেকেই অতৃপ্তির উৎপত্তি।

জানি স্যার।

তাই যদি জানো, তবে মনের, বিপর্যয়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন ? সন্দেহবাদের দ্বন্দ্বে আজকের দিনে আমাদের বিশেষ কোনো মূল্য দিতে হয় না। আজকের দিনে বিশ্বাসই হচ্ছে সেই বস্তু যার জন্যে প্রয়োজন সাহসের। ডক্টর রাধাকৃষ্ণান কি বলেছেন জানো ? বলেছেন—Sceptic does not cost up much. It is faith than requires courage now-a-days.

এর পর কল্পনা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেলল। সে হঠাৎ নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিলে প্রফেসর চৌধুরীর।

তিনি অপ্রস্তুত বোধ করলেন ছাত্রীর আকস্মিক এই অদ্ভুত আচরণে। বিস্ময়ের আলো-ছায়ার খেলা শুরু হলো তাঁর সারা মুখের ওপর। জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ প্রণাম কেন মা ?

কল্পনার সারা মুখে হাসির প্রলেপ। কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সুর—আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। এখন চলি স্যার।

এসো।

প্রফেসার চৌধুরীকেও বেশ খুশি মনে হলো।

কল্পনা বেরিয়ে গেল লাইব্রেরী ঘর থেকে।

একটা দুরন্ত বিদ্যুৎ-বহ্নি।

সে চলে যাবার পর প্রফেসর চৌধুরী আপন মনেই স্বগত: উক্তি করলেন—পাগল মেয়ে কোথাকার !......

তারপর তাঁর ভাবমুগ্ধ দৃষ্টি আবার ডুব দিল বইয়ের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরসমুদ্রের মধ্যে।

কল্পনা লাইব্রেরী-ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে হাতে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে দিব্যেন্দুর দেওয়া কার্ডখানা বের করে একবার দেখে নিল

ঠিকানাটা। তারপর সেটা ব্যাগে রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল হন হন করে বারান্দা পেরিয়ে একেবারে সিনেট হলের সামনে। হাত ঘড়িটা দেখে নিল একবার। পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

কল্পনাদের বাড়ি উত্তর কলকাতায়। শ্যামপুকুরে রামধন মিত্তির লেনে। এখন যেতে হবে তাকে দক্ষিণ কলকাতায় সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে। দিব্যেন্দুকে কথা দিয়েছিল, একদিন যাবে তাদের বাড়িতে। ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও অন্ততঃ যাওয়া উচিৎ একদিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো ভাবলো সে কিছুক্ষণ। উন্মুক্তদৃষ্টি তার গগনচুম্বী নতুন রবীন্দ্র হলের উপর দিয়ে পিছলে নীচে ফুটপাতের জনসমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গেল।...

এখানেও নতুনের সমারোহ। পুরনো সিনেট হল তার ঐতিহ্য আর সংস্কার নিয়ে কলকাতার পুরনো ইতিহাসের পাতায় মুখ লুকিয়েছে। এ যুগটাই হলো পরিবর্তনের। এ যুগের বিপ্লবী মানুষেরা—নব্যপন্থীরা পুরনোকে তার ঐতিহ্য নিয়ে বাঁচতে দেবে না। ভাঙছে। ভাঙনের সুর উঠেছে চারিদিকে। মানুষের মনের ওপরেও ধ্বংস নামছে ধীরে ধীরে। একে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মনে পড়ে সেই উক্তি—old order changeth yielding place to new!

কল্পনা রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম ফুটপাতের কোল ঘেঁষে বালীগঞ্জগামী বাস স্টপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দিব্যেন্দুর বাড়ি যেতে হবে তাকে।

ট্রামে-বাসে অসম্ভব রকমের ভীড়। নানান জাতের মানুষের মিছিল চলেছে যেন। এর মধ্যে বেশির ভাগই সরকারী-বেসরকারী অফিস-ফেরতা কর্মক্লান্ত মানুষ। স্বল্পায়ু সীমিত জীবন এদের নির্দ্দিষ্ট বিত্তের গণ্ডী দিয়ে বাঁধা! struggle for existence—বাঁচার জন্যে দৈনন্দিন সংগ্রাম এদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিয়েছে, বিবেক-বুদ্ধি সুপ্ত-প্রতিভাকে সমূলে ধূলিসাৎ করেছে। দৃষ্টি এদের নিষ্প্রভ। জীবনটা অত্যন্ত মেকানিক্যাল—একঘেয়ে একমুখী—যান্ত্রিক।

জওহরলালের বলা 'মিছিলের শহর' কলকাতার মানুষগুলো ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। ঘরমুখো মানুষের মিছিল। সবাই আগে ফিরতে চায়। অফিসের কর্মবিরতির পর একটা মিনিটও কেউ বৃথা নষ্ট করতে চায় না।

কল্পনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডালহৌসী-ধর্মতলার দিক থেকে আসা ট্রামবাস-গুলোর পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। শুধু পুরুষই নয়—মেয়েরাও ছিল ঐ ভীড়ের মধ্যে। অভাব রান্নাঘরে ঢুকে রান্নাঘরের শুচিতা নষ্ট করেছে। রান্নাঘরের মা-মেয়েদের দুটো পয়সার জন্য আজ রাস্তায় টেনে বের করেছে। নারী আজ শুধু পুরুষের সহধর্মিণী-ই নয়, সহকর্মিনীও বটে! অভাব এসে নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে এ যুগে অনেকখানি। পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার প্রচারে—ইংরেজের শাসন ও শোষণে যা সম্ভব হয়নি। অভাব আর দারিদ্র্যের ফলে তা সম্ভব হলো—অন্দরমহল আর বারমহলকে ভেঙ্গে একাকার করে দিল।—

মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে, মানুষের সবচেয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ আজ নিজে। তার সুখ-দুঃখ আজ অন্য কেউ মেপে দিতে পারে না। এ যুগের মানুষ আত্মকেন্দ্রিক। এ যুগের মানুষ নিজের নিজের সুখ সম্বন্ধেই সচেষ্ট। Bentham একদিন তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—স্বপ্নেও মনে করো না যে মানুষ তোমরা সেবা করবার জন্যে তার ছোট্ট আঙুলটি নাড়াবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা করাতে তার কী অসুবিধা হবে সেটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে না ওঠে—"Dream not that men will move their little finger to serve you unless their own advantage in so doing be obvious to them."

কল্পনার মনের ওপর দিয়ে ভাব-ভাবনার ঢেউ বয়ে গেল একটা। আর সে ভাববে না। অপ্রয়োজন ভাবনা মনকে দুর্বল করে দেয় অনেকখানি।

বালীগঞ্জগামী একটা বাস এসে দাঁড়ালো। পুরুষের ভীড় থাকলেও 'লেডিজ সীট'-এর তকমা আঁটা মেয়েদের বসার জায়গায় তার বসতে অসুবিধে হবে না। অগ্রাধিকার তাদের। তাদের দেখলে কিংবা কণ্ডাকটারের অনুরোধ—লেডিজ সীটটা ছেড়ে দেবেন স্যার...শুনলে যে কোন পুরুষ মানুষই ঐ সীট ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, এমনকি সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত! নারী পুরুষের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার এ চেষ্টা একমাত্র বাংলা দেশেই। অদ্ভুত বিচিত্র এ দেশে আবার এমনও সৎ বা সাহসী পুরুষ কিংবা অপাপবিদ্ধা দয়াবতী সাধ্বী নারীর সাক্ষাৎ মেলে, যে সমস্ত সংস্কার আর অহেতুক লজ্জা-শরমকে কাটিয়ে পরস্পরকে সাদরে আহ্বান করে নিজের পাশে বসার জায়গা করে দিতে পারে!...

কল্পনাও কিন্তু একদিন এ অঘটন ঘটিয়েছিল। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে ওঠা তার বাপের বয়সী এক ভদ্রলোককে তার পাশে বসতে আহ্বান জানিয়েছিল।

ভদ্রলোক কল্পনার অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়নি। ট্রামের সারা প্রথম শ্রেণীর কক্ষটির মধ্যে এ নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন...সবার চক্ষে অস্পষ্ট কদর্থ চাপা একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ভদ্রোলোক বাধ্য হয়ে শেষে লজ্জায় অপমানে শ্রীমানি বাজারের স্টপে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যাক্ সে কথা।

কল্পনা বাসে উঠতে বাস ছেড়ে দিল। আরেকবার কব্জী উল্টিয়ে ঘড়িটা দেখে নিল সে। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। মনে মনে ভাবলে, দিব্যেন্দুর বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আজকে না গেলেই হয়তো ভালো হতো।

ক্রমশ:

জয়-পরাজয়

দীপক মৈত্র

—আমি যাচ্ছি বিভাস…।

—এসো…।

মনা চলে গ্যাছে। একটু আগে চলে গ্যাছে। এখনো তার কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে বাজছে। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর। ভাবতে ভালো লাগছে। আজকের ঘটন—সমস্ত দিনের ঘট· একটু আগের ঘটনা—

আমি আর মনা বসে গল্প করছিলাম। খোলা মাঠের এক কোণে, সবুজ ঘাসের ওপরে বসে। পাশাপাশি বসেছিলাম। একসময় কি একটা কথার জবাব দিতে গিয়ে মনা আমার মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়েই দেখল, আমরা দুজনে একেবারে মুখোমুখি বসে আছি। আমার কথার সঠিক জবাব হারিয়ে গেল তার মুখে। সামান্য কাঁদল সে। কয়েক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল সবুজ অন্ধকার ঘাসের ওপরে।

ঘটনাটা একটু আগের। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার শুরু ঠিক এখানে নয়। আরেকটু সামনে। সামনের ফাল্গুন এলে ঠিক পুরোপুরি এক বছর হবে।

আমার অফিস-বন্ধু গৌতম রায়। একদিন অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পাঠানো হল কলকাতায় এক্স্-রে করানোর জন্যে। এক্স্-রের রিপোর্ট এলো। ক্যান্সার। অবশেষে ভর্তি করানো হল হাসপাতালে। ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়।

দিন যায়—মাস যায়। একদিন হাসপাতালে গ্যাছি গৌতমের সঙ্গে দেখা করতে। প্রথমদিন। আমার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় সেদিন থেকে হল শুরু।

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম একজন নার্স লীলায়িত সুঠাম ভঙ্গমায় হেঁটে যাচ্ছেন অন্যত্র। আচমকা বেসুর গলায় কেমন যেন ডেকে উঠলাম, শুনুন—

নার্স ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন নিঃশব্দে। তার সামনে গিয়ে জানতে চাইলাম, আচ্ছা বলতে পারেন গৌতম রায় কোন্ ওয়ার্ডে আছে?

—কি নাম বললেন?

—আজ্ঞে গৌতম। গৌতম রায়। ষ্টেট ব্যাংকে চাকরী করে। আপনাদের এখানে গত মাসে ভর্তি হয়েছে। যদি কাইগুলি একটু দেখিয়ে দিতেন তাহলে......

—আসুন আমার সঙ্গে।

সিস্টার আমাকে নিয়ে গেলেন একটি ঘরে। দরজার সামনে এসে দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন গৌতমকে এবং তারপর সেখান থেকেই তিনি বিদায় নিলেন।

গৌতমের সঙ্গে দেখা হল। আমাকে দেখে গৌতম খুশী। এরপর সেখানে প্রায়ই যাই। সপ্তাহে দু'তিন দিন। অফিস ছুটি হলেই অমনি ছুটে যাই। গৌতমের সঙ্গে দেখা হয়। কথা হয়। কত কথা। অতীত জীবনের ঘটনা থেকে বর্তমান স্বপ্নের কথা হয় আমাদের দুজনার মধ্যে। আমরা দুজন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। গৌতম একদিন কথা প্রসঙ্গে জানালে, জানিস বিভাস? ডাক্তার বলেছেন আমি নাকি সামনের মাসেই সম্পূর্ণ সেড়ে উঠব। তারপর ইচ্ছে করলেই আমি নাকি বিয়ে করতে পারব।

—তোর বিয়ে করার এত সখ কেনরে? আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। তার পাণ্ডুর মুখের ওপরে একটি নারীর ছায়া এসে পড়েছিল হয়ত।

তারপর থেকে আমি রোজ আসতে আরম্ভ করলাম হাসপাতালে। গৌতমের সঙ্গে দেখা হয়। কথা হয়। দেখা হয় আরেকজনের সঙ্গেও। কোনদিন বারান্দায়, কোনদিন ওয়ার্ডের মধ্যেই। মুখ তুলে তাকাই। সেও তাকায়। আমি সামান্য হাসবার চেষ্টা করলে সেও মৃদু হেসে অন্যত্র চলে যেত জরুরী কাজে।

গৌতম এর কিছু জানত না। সে জানত, আমি শুধু তার সঙ্গেই রোজ দেখা করতে যাই।

দিন-মাস-প্রহরের মালা গাথা ছন্দে কেটে গেল আরও একটি মাস। গৌতমকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু তবু মানুষের চিরাচরিত নিয়ম-অনুসারে আমি হাসপাতালে যাই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা—আমার জন্যে অপেক্ষায় থাকা। এক জোড়া নিটোল কালো উৎসুখ চোখ আমাকে এক সময় দেখতে পেয়ে আনন্দে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। আর আমার অন্তরে রিন্ রিন্ করে বেজে উঠত সেতারের তার। আলাপ-বিলম্বিত লয়-দ্রুত লয় সব মিশে একাকার হয়ে যেত।

ওকে নিয়ে সিনেমায় গ্যাছি। সেখান থেকে রেষ্টুরেন্টে। পকেটের কথা চিন্তাও করিনি। ট্যাক্সীতে চেপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটেছি। উধাও হয়ে গ্যাছি। কখনো দক্ষিণেশ্বর। কখনো আরো দূরে।

একদিন বাড়ি থেকে আমার বিয়ের কথা উঠল। বিভিন্নস্থান থেকে আসতে লাগল বিয়ের প্রস্তাব। কথাটা ওকে বললাম। আমার কথা শুনে খানিকটা চোখের জল ফেলল। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। তাকে ছাড়া আমি কাউকেই বিয়ে করব না।

একদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম, মনা ছুটি নিয়ে তার দেশের বাড়িতে গ্যাছে।

গৌতম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। অফিসে তার চেম্বারে ঢুকে দেখি সে নেই। পনের দিনের আর্নড্ লিভ নিয়ে কোথায় বেড়াতে গ্যাছে সময়টা মাঘের শেষ।

দিন পনের যে কিভাবে কাটিয়েছি তা বলা দুষ্কর। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে গৌতম একদিন অফিসে এল। সিল্কের পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী ধুতি। গায়ে এসেন্সের গন্ধ। গৌতম মৃদু হাসতে হাসতে, বলল বিয়ে করে এলাম। হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। অফিসের কাউকেই বলবার সুযোগ পেলাম না। একদিন সবাইকে পেট ভরে খাইয়ে দেব। তোকে নেমন্তন্ন করব আমাদের বাড়িতে স্পেশ্যালি। আসবি কিন্তু।

—কোথায় বিয়ে করলি? কেমন হল বৌ?

—গেলেই দেখতে পারবি। গৌতম আমাকে একটি সিগ্রেট দিয়ে নিজেও একটি ধরালো।

পাঁচটা বেজে গ্যাছে। অন্য মনস্কের মত হাঁটছিলাম রাস্তা দিয়ে। তারপর হঠাৎ মনে হল কি যেন একটা ভারী বস্তু আমার শরীরের ওপর দিয়ে চলে

গেল নিবেবে। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের একটি বিছানায় শুয়ে আছি। লক্ষ্য করলাম, আমার পায়ে প্ল্যাস্টার করা।

ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি। আমার বিছানার পাশে একদিন এসে দাঁড়াল মনা। আমি অবাক হলাম। মুগ্ধ আবেশে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার কপাল আর সিঁথির দিকে। তার চোখে-মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। আস্তে আমার পাশে বসল মনা। জিজ্ঞেস করলাম, কবে বিয়ে করলে ?

—কয়েকদিন হল।

—কোথায়-কার সঙ্গে হল জানতেও পারলাম না। মনা কোন জবাব দিল না। অপরাধিণীর মত মুখ নিচু করে বসে রইল অনেকক্ষণ।

নদীর স্রোত পেছনে আসে না। কেবল সামনেই এগিয়ে চলে। আজ জীবনের জয়-পরাজয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখানে কোন বিবেক নেই—ধর্ম নেই – আদর্শ নেই। তবু আমরা আছি। তবু আমরা থাকব।

একদিন রোববার। গৌতম আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গ্যাছে তাদের বাড়িতে। ড্রইং রুমে বসে আছি। এক সময় গৌতম তার নব পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ওদের দুজনকে এক সঙ্গে পাশাপাশি দেখব আশা করিনি। খানিকটা চমকেও উঠলাম হয়ত নিজের মনে। গৌতম আর মনা। মনা আমাকে দেখে কি চমকে উঠেছিল ? আমি জানি না।

গৌতম হাসতে থাকে। খুব অবাক হয়ে গেলি তো ? বলেছিলাম না আসলেই দেখতে পারবি ? আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল ; আমি হেরে গ্যাছি। আমি হেরে গ্যাছি।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্রাচে ভর দিতে দিতে একসময় এসে দাঁড়ালাম উন্মুক্ত সবুজ মাঠের সেই পুরনো জায়গাটায়। একদিন এখানে এসে বসতাম ; আমি আর মনা। হাসতাম, গল্প করতাম। আপনমনে সৃষ্টি করতাম নিজেদের ভবিষ্যৎ। আজ নিজেকে বড্ড একলা মনে হল। বড্ড ফাঁকা মনে হল মাঠটাও। সামনের আকাশে জমে উঠেছে বাষ্পহীন কুণ্ডলি পাকানো কালো মেঘ। আবছা সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন শান্ত পরিবেশ এখন আমার কাছে মনোরম মনে হল। কেমন একটা পরিতৃপ্তির স্বাদ পেলাম নির্জন একাকিত্বের মধ্যে। বসলাম সবুজ ঘাসের ওপরে।

ছোট বেলার বন্ধু গৌতম আজ কেমন যেন রিজার্ভড্‌ হয়ে যাচ্ছে। মনা যে এমন করবে ভাবাই যায় না। কতদিন চোখে জল ফেলেছে। কতদিন বলেছে, বিভাস! তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকেই গ্রহণ করতে পারব না। সেই মনা আজ দিব্যি অন্য ঘরে চলে যেতে পারল। বিবেকে বাধল না।

কোন এক অবচেতন মুহূর্তে আমার তপ্ত চোখে জল এসে গ্যাছিল। কি আশ্চর্য! অথচ এই আমি একটু আগেই মনার ওপরে রাগে—ঘৃণায়—হিংসায় জলে উঠেছিলাম। তাহলে কি আমার ভালোবাসার এখনো মৃত্যু হয়নি? আমি জানি না।

শীতের আকাশে তবু পুঞ্জিভূত মেঘ। ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাঠ ফাঁকা হয়ে গ্যাছে অনেক আগেই। দু একজন এখনো বসে গল্প করছে। হয়ত আমার মতই ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখছে। কিংবা হয়ত দেখ'ছ না।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে এলাম কোর্টের সামনে। এমন সময় দেখলাম মনা দাঁড়িয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। লাইট পোষ্টের নীয়ন আলোয় দেখলাম মনার মুখ থম্‌থম্‌ করছে। এড়িয়ে যেতে চাইলাম। পারলাম না।

অন্য রাস্তা ধরতেই মনা দ্রুত পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার একখানা হাত চেপে ধরে বলে উঠল অভিমানের সুরে, বিভাস! তোমার সংগে আমার কথা আছে বিভাস!'

দাঁতে দাঁত চেপে সংযত কণ্ঠে বললাম, সরে দাঁড়াও। সিন্‌ ক্রিয়েট্‌ কোরনা। —আমার কথা না শুনলে তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবনা। ঝংকার দিয়ে উঠল মনা।

কতকগুলো তরুণ ছেলে চট্‌পটি খাচ্ছিল অদূরে দাঁড়িয়ে আর মাসকরা করছিল। ওদের একজনকে আমি চিনি। আমার বন্ধুর ছোট ভাই। তাই কথা না বাড়িয়ে মুহূর্তে সেখান থেকে সরে এলাম। একটু দূরে অন্ধকারে মাঠের ওপরে এসে বসলাম। মনা আমার ঠিক পাশেই বসল।

কি বলব ভাবছিলাম। এমন সময় বলে উঠল মনা, আমি জানি—তুমি আমাকে ভুল বুঝবে। কিন্তু বিভাস, বিশ্বাস করো—এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলনা।

নিরুত্তাপ সুরে জবাব দিলাম, গৌতমকে কেন বিয়ে করেছ—এ জবাব দিচ্ছি বর্তমানে আমার কাছে অর্থহীন। অন্য কথা থাকলে বলতে পারো।

—অন্য কথা? অন্য কি কথা শুনতে চাও?

বললাম ফাঁকা অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে, এই তোমার চাকরীর কথা। শ্বশুর বাড়ির কথা। সিনেমার কথা। ভাল কথা, গৌতমের সংগে নতুন কি কি সিনেমা দেখলে বলো।

আমার দিকে অনেকক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে রইল মনা। ম্লান হাসবার চেষ্টা করলাম। মনার চোখে পড়তেই সরিয়ে নিলাম দৃষ্টি। এবার আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না সে। বলেই ফেলল সেই এড়িয়ে যাওয়া প্রশ্নের উত্তর।

—আমার কথা না শুনলে তুমি আমার ওপরে অবিচার করবে বিভাস!

—অবিচার? তোমার ওপরে অবিচার করব আমি?

সশব্দে হেসে উঠলাম। বলল মনা আগের সুরে, কেন? তুমি আমার ওপরে অবিচার করতে পারো না?

এবার জবাব দিলাম বেশ কঠিন সুরে, প্রশ্নটা করার আগে নিজেকে বিচার কোর।

অবিচার এর আগে কোনদিন করিনি। কোরবও না। আচ্ছা, বলতে পারো? কি প্রয়োজন ছিল এমন নাটকের?

—নাটক?

—হ্যাঁ নাটক। স্পষ্ট সুরে বলে উঠলাম আমি মনার চোখে চোখ রেখে, দীর্ঘ একটা বছর আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন জাল বিস্তার করেছি—রাত ভোর চিন্তা করেছি আগামী দিনের—সব নাটকের মত তুমি নিমেষে ভেঙ্গে চুড়ে গুড়িয়ে দিয়েছ। আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম, বলতে পারো?

—বলতে চাই বিভাস। তুমি আমাকে বলতে দাও। প্লীজ—আমাকে বলতে দাও।

মনা বলতে লাগল। সেই প্রথমদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে—সব অকপটে বলতে লাগল মনা।

—সেই প্রথমদিনই তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল বিভাস। তারপর যত দিন যেতে লাগল ততোই যেন তোমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু যেদিন জানলাম, গৌতম রায় তোমার প্রিয় বন্ধু—সেদিন থেকে তাকেও অন্যচোখে দেখতে আরম্ভ করলাম। আমার ওপরে দায়িত্ব ছিল তাকে দেখা শুনা করবার কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম একদিন। গৌতম প্রায়ই বলত, ক্যান্সার হলে নাকি মানুষ বাঁচে না। তার এই কথাটা আমার মনে

গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। সব সময় ভাবতাম। কি করে তাকে বাঁচানো যায়। আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত গৌতম কেমন উদাস আর করুণ দৃষ্টিতে। আমি সময় সময় জিজ্ঞেসও করতাম, কি দেখছেন এমন কোরে?

গৌতম বলত, আপনি খুব সুন্দর দেখতে। আপনাকে...আপনাকে......

—বলুন, বলুন না কি বলতে চান?

বলত গৌতম, আপনাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার মত অভিশপ্ত মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

—কেন নয়? আমি প্রশ্ন করেছিলাম। গৌতম বলেছিল, আমার যে ক্যান্সার! আমি তো বেশি দিন বাঁচব না সিস্টার! কি হবে ভালবেসে? বিভাসকে আমি ভালবাসি। একদিন, সেও আমার জন্যে কাঁদবে। তাকে আমি সব চেয়ে বেশি ভালবাসি। আর সেইজন্যেই তো আমার সব চেয়ে বেশি দুঃখ সিস্টার।

—বিভাস। তুমি বিশ্বাস করো। তোমাকে আমি সত্যি ভালো বেসেছিলাম, কিন্তু, গৌতম যা চায় তা আমার কাছে অজানা ছিলনা। তাই একদিন বলেছিলাম, যাদের ক্যান্সার হয় তারা অভিশপ্ত মানুষ এ কথা তোমায় কে বলল?

—কেউ বলেনি। আমার মন থেকে বলছে এ কথা।

গৌতমের জবাব শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। তাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলতে হবে। কাজেই মন-প্রাণ ঢেলে তাকে সেবা-শুশ্রূষা করতে আরম্ভ করলাম। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত তাকে সেবা করতে করতে, তার পাশে থাকতে থাকতে, তার করুণ আর অসহায় মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে, অন্তরের একটি দুটি শ্রদ্ধা আর সহানুভূতির কথা বলতে বলতে একদিন বুঝতে পারলাম, আমার মনে অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে গৌতম।

সেদিন ডাক্তার চন্দ খুশি মনে বলছিলেন গৌতমকে, এই তো আপনি সেরে উঠছেন। সামনের মাসেই ডিস্‌চার্জ করে দেব। তারপর আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত। এমন কি বিয়েও করতে পারবেন।

গৌতম বিস্মিত হয়ে বলেছিল, বিয়ে!

সহজ গলায় বলেছিলেন ডাক্তার চন্দ, হ্যাঁ বিয়ে। কেন, আপনি তো ব্যাচেলর? ব্যাঙ্কে অফিসার গ্রেডে চাকরী করেন। ফ্যামেলিতে তেমন কোন

বার্ডেনিং নেই। এবার অনায়াসে আপনি বিয়ে করতে পারবেন।

সেদিন ঠিক সন্ধ্যার পরেই আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম ওর পাশে। একখানা হাত আস্তে বাড়িয়ে দিয়েছিল গৌতম আমার দিকে। আমি তার সেই হাত ধরেছিলাম। তারপর বিভাস, তারপর আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না তার মুখ থেকে সেই স্বচ্ছ কথাটা শুনবার জন্যে।

বলেছিল গৌতম, সম্পূর্ণ সেরে উঠলে আমি তোমাকে বিয়ে করব মনা। বিভাস। বিশ্বাস করো। গৌতমের এই স্পষ্ট কথা শুনবার আগেই আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি তোমার কাছে কথা দিয়েছিলাম, একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর আমি কাউকে বিয়ে করব না।

তাই—এক দ্বান্দ্বিক জীবনের বাঁকে এসে আমার দিক নির্ণায়ক যন্ত্রটা কেবল ঘুরপাক খেতে লাগল। একদিকে প্রতিশ্রুতি—আরেকদিকে জীবন মরণ সমস্যা। আমি তখন দিশেহারা—উদ্ভ্রান্ত। অবশেষে অনেক ভাবলাম। অনেক রাত্রি কাটিয়ে দিলাম জেগে। একদিকে তুমি—আরেকদিকে গৌতম। কাকে? কাকে বেছে নেব? তোমাকে বলব ভেবেছিলাম। কতোদিন বলতে গিয়েও বলতে পারিনি। গলা শুকিয়ে গ্যাছে এক অজানা আশঙ্কায়। ঠিক সেই মুহূর্তে সি. এম্. ওর কাছ থেকে আমার নামে এলো শো কজ। হাসপাতালের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে কেন আমার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না—তারই সাত দিনের নোটিশ।

গৌতমকে বললাম। ও নিঃসংকোচে পরামর্শ দিল, চাকরীতে রেজিগনেশন্ দিতে আপত্তি করেছিলাম আমি। এই দুর্মূল্যের দিনে যেখানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোন একটি চাকরীর আশায় সেখানে আমার এই চাকরীতে রেজিগনেশন্ দেওয়াটা কি উচিৎ হবে?

দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল গৌতম, এ চাকরীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গ্যাছে মনা। এবার আমি তোমার সমস্ত সুখ দুঃখের সাথী হতে চাই। আমার ওপরে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পার তোমার ভবিষ্যৎ। আমি চালাব সংসার। কেন? পারব না ভেবেছ?

অবশেষে ছুটি নিলাম। নেওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তুমি সেদিন অফিসে আসোনি। কাজেই নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। গৌতমকে ডিস্‌চার্জ করে দেওয়া হয়েছে। সেও ছুটি নিলো। বিভাস—, বিয়ের পিঁড়িতে বসে শুধু চোখের জল ফেলেছি বিশ্বাস করো। একজনকে

পেয়ে আরেকজনকে সারা জীবনের মত হারানোর 'বেদনা'-কে কল্লো নির্মম তা ভাবিনি। বিয়ের পর সেই চাকরী আমি ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি শুধু গৌতমের স্ত্রী। তবু বলব, তুমি আমার প্রথম বন্ধু। তোমাকে আমি এখনো ভালবাসি বিভাস। বিশ্বাস করো। খানিকক্ষণ চুপ থেকে একসময় বিষন্ন স্বরে বলে উঠল মনা, অনেক রাত হল। এবার আমি যাই। আমি যাচ্ছি বিভাস।

—'এসো'। মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল একটি শব্দ।

ছন্দিতা

বর্ষ দশ সংখ্যা এক বৈশাখ ১৩৮১

April 1974 : 10th year of Publication

—সূচীপত্র—

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রধান সম্পাদক : অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : গৌরগোপাল দাস ও কেনা চৌধুরী

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য ছন্দিতার নববর্ষ সংখ্যায় শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীমতী রেণুকা দেবী, আইভি রাহা, দিপালী ধর, এবং আরো অনেকের লেখা প্রকাশ করা গেল না। এছাড়া পরিচিতি ও প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি। অপ্রকাশিত লেখাগুলো আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। সঃ ছঃ

—————— পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) ১২০৩/৭৪ ——————

মহিলাদের বেকার সমস্যা ঃ কয়েকটি যুক্তি

এষা মুখোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধের শিরোনামা অনেকের কাছেই 'বেখাপ্পা' বলে মনে হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে, বেখাপ্পা বিশেষণটি আদৌ সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত, না কি দেশের বর্তমান কর্মনীতি প্রসঙ্গেই সেটা প্রযোজ্য, সবচেয়ে আগে ভেবে দেখা দরকার সেই কথাটাই।

'বেকার' সমস্যার প্রসঙ্গে মহিলাদের কথা আদৌ উত্থাপিত হতে পারে না, যদি সমাজে তাদের একমাত্র স্বীকৃত কর্ম হয় ঘর-সংসারের চিরন্তনী কাজ। কিন্তু দেশের অথবা সমাজের উন্নয়নে যদি মেয়েদেরও কোনো ভূমিকা থাকে, অধিকার থাকে রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট কর্মী হবার, তবে মেয়েদের বেকার-সমস্যা সমষ্টিগতভাবে, সমস্ত দেশেরই এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হতে পারা উচিত, নিশ্চয়ই।

সমাজ-তত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হোল শিল্প-বিপ্লব। যন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্মী মানুষের গুরুত্ব ক্রমে হ্রাস পেলো। এর ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোল মেয়েদের কর্মী ভূমিকার সামাজিক রূপটি। প্রাক শিল্প-বিপ্লব যুগের সমাজে নারীর কর্মী ভূমিকা সবসময়েই স্বীকৃত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ আজও দেখা যায় কৃষিপ্রধান সমাজে নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র সংসারের সদস্যপদেই সীমিত হয়ে নেই, সেখানে তিনি অর্থ-উপার্জনকারী এক বিশিষ্ট কর্মীও বটে। নারীর মূল্য তাই সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের বাইরে বিস্তৃত, ব্যাপক অর্থে, পুরুষের কাজের চাইতে তার কাজের দাম তুচ্ছ নয় কোনও অর্থেই।

কৃষিপ্রধান সমাজের মেয়েদের ভূমিকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ছিল, তাদের ঘরের কাজ এবং 'বাইরের কাজ' এর মধ্যে কোনো প্রভেদ না করা। বাড়ীর বাইরের কাজকে বিকল্পরূপে না বিচার করে, সংসারের কাজের পরিপূরকরূপে গণ্য করা।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে, ঘর ও বাইরের কাজের এই অবিচ্ছেদ্য সংহতি গেল ভেঙে। প্রযুক্তিবিস্তার প্রয়োজনে, বাইরের জগতের জীবিকা হয়ে দাঁড়ালো অনেক বেশী পেশাদারী, বিশিষ্ট তালিম অথবা শিক্ষা-নির্ভর একান্তভাবেই যে সব জীবিকার প্রণালী। এবং ক্রমে সেই বিভেদ হয়ে দাঁড়ালো এমনই প্রধান যে, সংসারের কাজ করার পরেও, মেয়েদের পক্ষে চাকরী করতে চাওয়ার ইচ্ছেটাই হোল একটা অসম্ভব ঘটনা। হাস্যকর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এক বিষয় মাত্র! অতঃপর ঘর-সংসারের কাজই গণ্য হোল মেয়েদের জীবনের একমাত্র কাজ হিসাবে। নগণ্যসংখ্যক যে ক'জন মহিলা এই নীতি মেনে নিয়েও চাকরী করতে চাইলেন, পুরুষ-প্রধান চাকরী জগতে, প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করা হোল তাদের, দৈনন্দিন জীবনের কর্মসংগ্রামে ব্যাপৃত হয়ে, নতুন করে নিজেদের কর্ম-দক্ষতা প্রমান করার।

নতুন ভূমিকার বিশ্লেষণে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের যথাযোগ্য স্থান সূচিত হোল গৃহকোণে—বাইরের কাজে বেরোনর অর্থ হয়ে দাঁড়ালো দারিদ্র্য অথবা সাংসারিক অস্বচ্ছলতা। মেয়েদের 'চাকরী'র সামাজিক মর্যাদা গেল খর্ব হয়ে। এবং ক্রমে স্বয়ং মহিলারাও যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন তাদের এই নতুন 'পোশাকী' ভূমিকায়। বাড়ীর বাইরের কাজ মাত্রেই হয়ে দাঁড়ালো পুরুষালী কাজ।

প্রায় ভাগ্যের পরিহাসেই বোধহয় আধুনিক যুগের জনসংখ্যা-তত্ত্বের গবেষণার ফলে আবিস্কৃত হল জনশক্তি-পরিকল্পনা-তত্ত্ব (manpower planning)। দেখা গেল, যে কোনও সমাজ অথবা দেশের উন্নতি, সর্বাগ্রে, নির্ভর করে সেই দেশের জনশক্তির কর্মদক্ষতার ওপর। মোট জনসংখ্যার এক প্রধান অংশ হলেন নারীরা। তাই নারীরা শুধুমাত্র ঘরে বসে থাকলে মোট জনশক্তির উন্নয়ণ প্রয়োগ সম্ভব হবে না কখনোই। অতএব সাম্প্রতিক কালে আবার, দেশের পরিকল্পনার খাতিরে নতুন করে দেখা দিলো মেয়েদের কাজ করার প্রয়োজন।

আর্থিক কারণ ব্যতিরেকে, অন্ততঃ আমাদের ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রয়োজনেও মেয়েদের কাজের অধিকার একান্তই কাম্য। গণতন্ত্রের এক মূল সূত্র হোল: সুযোগের সমান অধিকার। আমাদের দেশে সংবিধান রচনা করার প্রথম দিন থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছে মেয়েদের ভোটাধিকার। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নারীকে দেওয়া হয়েছে এক বিশিষ্ট মর্যাদা। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের তেমন কোনও প্রভাবই পড়লো

না, ভারতীয় নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে। বিশেষ করে চাকরীর ক্ষেত্রে দেখা গেল খুব বড় রকমের বৈষম্য। যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই মহিলা প্রার্থী হলেন অবাঞ্ছিত।

শিক্ষিতা মহিলাদের চাকরীর প্রয়োজনকেও তেমন গুরুত্ব দিলেন না অনেকেই। বলা হল, মেয়েদের চাকরীর কোনও প্রয়োজনই নেই আদপে। তাই মহিলাদের চাকরীটা হোল নেহাৎই নাকি একটা 'সখ'। যে কাজের থাকা বা না থাকা একেবারেই সমান। অতএব মেয়েদের কাজের প্রসঙ্গে বেকার-সমস্যার কথা ওঠাই অসঙ্গত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বয়ং মহিলারাই বললেন যে, সাধারণভাবে, চাকরী করতে চাইবার কোনও প্রয়োজনই মেয়েদের নাকি নেই। প্রধানতঃ যে দুটি কারণে বর্তমানে মেয়েরা চাকরী করতে এগিয়ে এসেছেন তা হোল হয় বা সংসারে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন আর নয়তো বা নেহাৎই খেয়াল!

পুরুষদের তরফ থেকে বলা হোল আরও জরুরী কথা। সংখ্যাধিক কর্মদক্ষ পুরুষেরা যে দেশে চাকরী পাচ্ছেন না, সেই দেশে মেয়েদের চাকরীর কথা ওঠে কি করে? তথ্য হিসাবে এই অভিযোগ নির্ভুল কিন্তু তত্ত্বের বিচারে একেবারেই অচল। দেশজোড়া বেকারীত্ব হোল সমষ্টিগতভাবে সমাজের অব্যবস্থার এক লক্ষণ। সীমিত সংখ্যক এবং জনসংখ্যার আধিক্যই আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার একমাত্র কারণ নয়। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ Viola Klein এর মতে, "The social disease of which mass employment is a symptom, is a defect, not in the structure. but in the organization of society to allow the most important asset of any community, the productive capacity of it's members, to go unused." বেকার সমস্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থাই তার জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। যে কোনো দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হোল তার জনশক্তির কর্মক্ষমতা। যে সমাজ সেই জনশক্তিকে কাজে লাগাতে অক্ষম হয়, সেখানে এ ধরণের জটিল অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দৈনন্দিন বাঁচার সংগ্রামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, আরও ভালো করে বাঁচতে চাওয়ার আকাংখা। আধুনিক যুগের অর্থনীতি-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় সেই আকাংখা সফল হতে পারে একমাত্র সংসারের উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে। যতদিন না পর্যাপ্ত সংসারের প্রতিজন পূর্ণবয়স্ক সদস্য সেই উপার্জনে

সহায়তা করতে সক্ষম হবেন, ততদিন অবধি সংসারের আর্থিক প্রগতি ঘটাও অসম্ভব। আজকের সমাজে প্রতি সংসারেই মেয়েরা লেখাপড়া শিখছেন, অর্জন করছেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অথচ সেই ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছেন খুব কম জনই। বিবাহিতা মহিলাদের পক্ষে কথাটা আরও বেশী প্রযোজ্য। যেহেতু স্বামীর অমতের ফলে, প্রায় শতকরা সত্তরটি পরিবারেই, গৃহিনীদের চাকরী করতে চাওয়ার বাসনা কার্য্যকরী হতে পারে না।

মহিলাদের বেকার-সমস্যার প্রসঙ্গে জনমতের সংগঠন হবে একান্তই আবশ্যিক যে হেতু এই সমস্যার সমাধানের ওপর নির্ভর করছে: ১। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য; ২। জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন; ৩। দেশের জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার। তা ছাড়াও সমাজে ব্যক্তি-মানুষরূপে পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করার পক্ষেও মহিলাদের ক্ষেত্রে চাকুরী হবে এক মস্ত সহায়ক। আধুনিক যুগের দম্পতী-ভিত্তিক সংসারে বাড়ীর কাজ গেছে অনেক কমে। গৃহিনীদের অবসর গেছে বেড়ে। অনেক ক্ষেত্রে আবার সেইসব গৃহিনীদের শিক্ষা এবং অন্যান্য যোগ্যতাও বর্তমান, যার মাধ্যমে অনায়াসেই তারা জীবিকা উপার্জন করতে পারেন। নিজেদের মনের সন্তোষ এবং শান্তিও তারা পেতে পারেন এই কাজের ফলে। সমগ্র সমাজ ও দেশের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেই সেটা হবে এক শুভ লক্ষণ।

উনিশ শতক ঃ বাংলাদেশ ঃ স্ত্রীশিক্ষার সূচনা

শ্যামলী বসু

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মানব চিত্ত জাগরণের ক্ষেত্রে উনিশ শতক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বাঙালী তথা ভারতীয় মনোরাজ্যে য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের যাদুস্পর্শ এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা করে। তারই অনিবার্য পরিণতি সমাজ সংস্কার আন্দোলনে, ধর্ম চিন্তার নব প্রকরণে, মানবিক অধিকার বোধ অর্জনে নিগূঢ়, দার্শনিক চিন্তা দেখা যায়। বাঙালী-জাতির নব প্রাণ জাগৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন বাঙলা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ও অবিশ্রান্ত সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসে।

এই রেনেশাঁসের সর্বব্যাপী তরঙ্গ বাঙালী মেয়ের জীবনেও প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। যুগ সঞ্চিত অশিক্ষা- কু-সংস্কার ও অবিচারের নির্মম অভিশাপ থেকে বাঙালী মেয়েদের মুক্ত করে সমাজ জীবনের সুস্থির পরিবেশে নতুন শিক্ষার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন চিন্তাশীল মানববাদী বাঙালী মনীষী। পুরুষ ও প্রকৃতির সার্থক মিলনই ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম জীবনের ভিত্তি। সমাজের এক বৃহৎ অংশ অশিক্ষা ও অবিচারের শিকার হয়ে থাকলে সেজাতি কখনই সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করতে পারেনা — এই সত্য মর্মেমর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যুগন্ধর পুরুষ রাজা রামমোহন, করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য চিন্তাশীল সহৃদয় মনীষীগণ। কয়েক শতক যাবৎ কৌলীন্য প্রথার অসহায় শিকার হয়েছিলেন বাঙালী নারী। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের বিষময় পরিণাম —বৈধব্যজনিত ক্লিষ্টতা ও সর্বোপরি বীভৎস সহমরণ প্রথার প্রবল চাপে নারী জাতি নিজের মানবিক সত্তাটুকুও বিস্মৃত হয়েছিলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও গৌরব ছিল দূরের কথা। তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং নারী চিত্ত জাগরণের আবশ্যিক ভূমিকা হিসাবে কল্যাণ-কামী ও দরদী বাঙালী মনীষী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং সমাজের রক্ত চক্ষু শাসন উপেক্ষা করে এই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে আত্মনিয়োগ

করেছিলেন। তাঁরা যে দুরূহ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন তা ছিল সময় সাপেক্ষ এবং পরিশ্রম সাধ্য ; — কিন্তু তার ফল যে হবে সুদূর প্রসারী—সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত এই সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণেই নানাবিধ পুস্তক পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালী অন্তঃপুরিকার মনোরাজ্যের জড়ত্ব মুক্তির দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁরা।

বাংলা গদ্য সাহিত্য তখন নিতান্তই শৈশবাবস্থা কাটিয়ে উঠছে। শিক্ষিত বাঙালীর নিয়মিত লেখনী চালনায় ও অনলস পরিশ্রমে বাংলা গদ্য সাহিত্যের পরিণত রূপটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল—সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ও নানা পুস্তকের পৃষ্ঠায়। এই সময় স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ের নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ ও পুস্তক রচনার সুরু হয়। সংস্কার বিমুখ রক্ষণশীল বাঙালীগণ এই সাধু প্রচেষ্টার সর্ব প্রকার বিরোধিতা করেছিলেন—কিন্তু যুগ ধর্মের গুরুত্বে ও প্রয়োজনের সততায় সব বিরোধিতাই বিলীন হয়ে গেছে।

এই সময় Female Juverile Society স্থাপিত হয়—এবং রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকা (রাজা রাধাকান্তের নামেই প্রচলিত) এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়। এই পুস্তকায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" অংশে— সমকালীন সামাজিক অনুশাসন পিষ্ট ও অজ্ঞতাক্লিষ্ট নারীজীবন যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র দেখা যায়—

"হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয়না। যদি ছোট দুই কন্যারা বাটির বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করে কিছু শিখে ও পাহুতাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে যায়। সকলে কহে এই মন্দা ঢেঁকি ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে।"

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ এ্যাণ্ড ফরেন সোসাইটির সভ্যগণের উদ্যোগে মিস্ কুক্ নামে এক বিদেশিনী এদেশে আসেন—এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির সভ্যগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর চেষ্টায় অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আবার বেঙ্গলী লেডিস সোসাইটির নামে একটি সমিতিও দীর্ঘদিন নারী শিক্ষা প্রসারে ও প্রচারে নিযুক্ত ছিল। এই সমিতির প্রচেষ্টায়—শুধুমাত্র কলিকাতায় নয়—শ্রীরামপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ঢাকা বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রায় উনিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তবে এঁদের কার্যক্রমের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বিশেষ স্থান নিয়েছিল বলে সেকালের বাঙালী

—তাঁদের অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার ভার এদের ওপর নিশ্চিন্তে ন্যস্ত করতে পারতেন না—এবং বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন না।

কিন্তু 'সাম্প্রদায়িক-ধর্ম-শিক্ষা বিহীন' শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হলেন এডুকেশন কাউনসিলে সভাপতি এবং গভর্ণর জেনারেল মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন—বেথুন সাহেব নামেই যিনি সমধিক পরিচিত।

স্ত্রীজাতির উন্নতি ও কল্যাণ কামনায়—একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব তাঁকে ব্রতী করেছিল ১৮৪৯খ্রীঃ কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন বাঙালী রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানিয়ে ছলেন—নিজ নিজ আত্মজা ও আত্মীয়াদের প্রেরণ করে। এই বিদ্যালয়ের গাড়িতে মহানির্বান তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত থাকত – কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষনীয়া ত যত্নত:।"

বলাবাহুল্য স্ত্রীশিক্ষা প্রসরের এই সাধু প্রচেষ্টা রক্ষণশীল বাঙালীর কটুক্তির হাত এড়াতে পারেনি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ করে লিখলেন—

'আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রতধর্ম কর্ত্তো সবে / একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে? / যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে / তখন এ, বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।'

কিন্তু যতই পরিহাস ও কটাক্ষ বিদ্ধ বিরোধিতা বর্ষিত হোক না কেন নারী-শিক্ষার গুরুত্ব যুগ সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করেছিলেন। ধর্মের নামে ভণ্ডামি—অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বিবিধ লোকাচারের অনুশাসনে সে যুগে বাঙালী মেয়েরা ছিলেন অসহায়—নিরুপায়। তাঁদের জন্যই সহৃদয় বাঙালী লেখনী ধারণ করলেন—সৎ শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। উপদেশ হলে – চিত্তাকর্ষক গল্পের মাধ্যমে চিরপরিচিত বস্তু জগতের ঘটনার উদাহরণের সাহায্যে—বাঙালী মেয়ের প্রারম্ভিক শিক্ষার সূত্রপাত।

দ্বারিকানাথ রায় 'স্ত্রী শিক্ষা বিধান' রচনা করেন স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দান করে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিন্তু যুগোপযোগী বাস্তববুদ্ধি দ্বারা নারী জাতির শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন—'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে। ভারতীয় রক্ষণশীল যুক্তির বিরোধিতা করে ও জনসাধারণকে আগ্রহী করে তোলবার জন্য তিনি লেখেন—

'পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখাপড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারে আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয়—গৃহের গৃহিনী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমূহ সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ?'

আবার অন্যত্র অশিক্ষা জনিত নির্বুদ্ধিতার ফল বর্ণনা করেছেন—

'গৃহের স্ত্রীবর্গ অনেকেই এমত অবোধ যে গৃহস্থের দুঃসময় দুরবস্থা ও অসঙ্গতির প্রতি একবারও নেত্রপাত করেনা। কখন পুরোহিতের প্রতারণায় কখন বা প্রতিবেশিনীগণের কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যয় সাধ্য বৃথা ব্রতানুষ্ঠানে সঙ্কল্পারূঢ় হয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামীকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে।'

ইতিমধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪ খ্রীঃ) 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দের জন্য ছাপা হইতেছে—' এই আদর্শ নিয়ে। বহু সামাজিক সমস্যা ও লোকাচারের স্বরূপ এবং তাদের সমাধানের পথ নির্দেশক — প্যারীচাঁদের অনেক শিক্ষামূলক রচনাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সমকালীন নবীন ব্রাহ্মগণও নারী শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের মত এঁদের প্রচেষ্টায়ও অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার লাভ করে। এঁদের মধ্যেই কয়েকজন বিশেষ উৎসাহী হয়ে 'বামা-বোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা'ও স্থাপিত হয়। এই সভার সদস্যগণ শিক্ষা প্রসারে কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয় দিলে গভর্ণমেণ্ট থেকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'অবলাবান্ধব' পত্রিকাটিও ব্রাহ্মমহিলাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশে বিশেষ সহায়তা করেছিল।

১৮৭৩খ্রীঃ হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়— এবং মিস্ এ্যাক্রয়ড্ নামে এক শিক্ষিতা ইংরাজ মহিলা এর তত্ত্বাবধায়িকা হয়েছিলেন। পরে হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়—এবং প্রধানতঃ আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাসের উৎসাহে ও আর্থিক সাহায্যে চলতে থাকে। ক্রমে এই বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়—এবং বিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষাদানের জন্য বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগ খোলা হয়—স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু

যুগ্মভাবে প্রথম মহিলা স্নাতক হবার বিরল গৌরব অর্জন করেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রবীন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গরমণীর উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ করে লেখেন

কে বলেরে বাঙালীর জীবন অসার
সৌরভে আমোদ দেখ আজ কিবা তার।
... ...
হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা
... ...
বেঁচে থাক সুখে থাক চির সুখে আর!
কে বলেরে বাঙালীর জীবন অসার?
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দভেলা কালের জুয়ারে
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।"

এইভাবে রেনেশাঁসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং বাঙ্গালী মনীষীগণের সযত্ন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে যে সূচনার সূত্রপাত হয়—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তা বিশাল সম্ভাবনায় আত্মপ্রকাশ করে। তারই অভ্রান্ত ফলশ্রুতি সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষিত বঙ্গনারীর আবির্ভাব। সমাজ জীবনেও ক্রমেই বঙ্গরমণী আপন ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল কয়েক শতাব্দী।

আজকালকার গৃহিণীরা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

কেবলমাত্র গৃহিণী এই পরিচয় দিতে যাঁরা কুণ্ঠিত বোধ করেন আপনি কি তাঁদের একজন? আরশোলা বা ইঁদুরের মত নিজেকে নেহাত রান্না ভাঁড়ার ঘরের জীব মনে করে আপনার জীবনে কি ক্রমই হতাশার ভাব এসে যাচ্ছে? তাহলে খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, আপনার শক্তি সম্বন্ধে আপনি মোটেই সচেতন নন। আপনি নিশ্চয় জানেন না, কতকগুলি নিরক্ষর, অজ্ঞ এবং স্বার্থপর প্রকৃতির লোক নিয়ে নির্বিবাদে আপনি যেরকম সংসার ধর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন, তার চেয়ে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে ইন্দিরা গান্ধীর ভারত সাম্রাজ্য পরিচালনা করার। অনেক বড় বড় লোক এই কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। হ্যাঁ ইন্দিরা গান্ধীর কৃতিত্বের কথা শুধু নয়, এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মহিলা নীরবে সংসারের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলিদান করে চলেছেন এই মহৎ আত্মোৎসর্গের কথা খবরের কাগজে প্রত্যহ ছবি সহকারে ছাপা না হোক এঁদের কথা ইতিহাস কোনদিন বিস্মৃত হবেনা। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র এই রকমই বলে গেছেন। আপনি জেনে সুখি হবেন যে আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি নিষ্কাম কর্মযোগী (অথবা যোগিনী) অর্থাৎ আপনি নিজের সুখের কামনা না করে পরের সুখের সন্ধানে অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত।

সে সব তো বুঝলাম, আপনি হয়তো বলবেন। কিন্তু ফাঁকা সম্মানে কি সুবিধে হচ্ছে দেখান দেখি। এই যে উদয়াস্ত খাটুনি, ছুটি নেই, মাইনে নেই, পেনসান নেই, বোনাস নেই. এমন কি যথাসময়ে বিশ্রামটুকুও নেই: ছেলেরা যতদিন ছোট থাকছে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুম নেই, আবার রাত ভোর না হতেই বকে ঝকে হাঁড়ি ঠেলে সংসারের চাকা চালু রাখা—তার বিশদ বিবরণ দিতে গেলে পাঠক হয়তো বিরক্তি প্রকাশ করবেন। করবেনই তো। কারণ এঁরা সকলেই আপনার সহৃদয় পতিদেবের মত: যাঁরা মনে করেন জগৎসংসারে একমাত্র কাজের জীব তাঁরাই, তাঁরা আছেন বলেই ইংরেজ রাজত্ব

টিঁকে ছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, আপিস-আদালত চলছে, তাঁরা না থাকলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অচল হবে। অথচ আপনি খুব ভাল করেই জানেন আসল কাজের লোক কে, কারা নেপথ্যে থেকে সব ঝক্কি সামলাচ্ছেন। তবু আমাদের মুণিঋষিরা একবার মুখ ফুটে বলে গেলেন না 'দি হ্যাণ্ড দ্যাট রকস্ দি ক্রেডল' ইত্যাদি। তাঁরা উলটে বলেছেন পথি নারী বিবর্জিতা, পত্নির পূণ্যে সতীর পূণ্য ইত্যাদি। এমন কি আদি যুগে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের চাঁইরা পর্যন্ত বলে গেছেন 'আমরা যাঁহাদের লইয়া ঘর করিব তাঁহারা যদি আমাদের ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্খা বুঝিতেই না পারে, তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে।' সোজা কথায় এঁরা যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, আমরা পুরুষেরা শিক্ষিত। আমাদের জন্যে সৃষ্ট স্ত্রীজাতি যদি অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকেন তাহলে আমাদেরই প্রভূত ক্ষতি। কি রকম ভয়ানক স্বার্থ-সর্বস্ব চিন্তা ভেবে দেখুন। চিন্তা করলেই রক্ত গরম হয়ে ওঠে নয় কি?
হলেই বা কি করার আছে। কিন্তু ধৈর্য ধরুন, উপায় অবশ্যই কিছু থাকতে বাধ্য। কালিদাসের কালে জন্ম নিলে কি হত বলা মুস্কিল তবে বিংশ শতাব্দীতে জন্মে পুরুষদের জব্দ করার যেমন সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে এমন আর ইতিহাসে কখনো ঘটেছে কিনা সন্দেহ। চাঁদ সুলতানা বা ঝাঁসীর রাণী সেকালের রাজারাজড়াদের বিলক্ষণ ঘোড়দৌড় করিয়েছিলেন শোনা যায় কিন্তু তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন বলেই ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। ঋষি বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণীকে ডাকাতের দুঃসাহসিক জীবন থেকে এনে ফেললেন একেবারে স্বামীর পুকুরঘাটের পৈঠায়। বাসনমাজা মহৎ কাজ হতে পারে কিন্তু তাই বলে কি এই দর্মই সব স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম? অনর্থক অনুযোগ না করে একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে তৎকালীন পুরুষজাতির মনের গতি কোনদিকে চলেছিল। কিন্তু সে কাল আর নেই।
মহিলাদের ঘুম ভাঙলেই যে ভারতবর্ষের মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে এই ভবিষ্যদবাণী কবি হেমচন্দ্র বহুদিন পূর্বেই করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকলেই মুক্ত হয়ে গেলে সংসার কার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তাই স্বাধীনতার লাড্ড খেয়েও অনেকে স্বেচ্ছায় তার স্বাদ ভুলতে চাইলেন। আপনি ও আমি এই মহৎপ্রাণা পরহিতৈষিণীদেরই বংশধর।
কিন্তু এত স্বার্থত্যাগ করেও পরিণামে কি দেখা যাচ্ছে? আজকালকার গৃহিণীদের নাকি কেবল কাজে ফাঁকি দেওয়ার মতলব, প্রাচীনাদের কাছে

গৃহকর্মে নাকি এঁরা একেবারে শিশু। সেকালের গৃহিণীরা একহাতে চড়-চাপড় দিয়ে দশটি বারোটি ছেলে মানুষ করেছেন আর অপর হাতে বাদশা বাঞ্জন ভাত রেঁধে দুপুরে মস্ত কাঁথায় বালুচরী নক্সা তুলে চুলে একুশগুছি বিনুনি বেঁধে ফিটফাট হয়ে আবার বিকেল হতেই হেঁসেলে ঢুকেছেন—এসব নেহাত গল্প কাহিনী নাও হতে পারে। এঁরা নিছক কাজের লোক ছিলেন, ইস্কুল কলেজে গিয়ে কিম্বা চাকরী বাকরী করে বৃথা সময় নষ্ট করতেন না। বৃহত্তর জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে তাঁদের কিছুই আসতো যেতো না। তবু আজকালকার গৃহিণীরা রান্নাও করেন, চুলও বাঁধেন, তাঁরাই বা কম কিসে। আশ্চর্যের ব্যাপার স্ত্রী স্বাধীনতার এই স্বর্ণযুগেই আবার ধুয়ো উঠেছে রান্নাঘরের দিকে ফিরে আসুন। যে সব আধুনিকারা আগে স্বামীদের রেঁধে খাওয়ানোটা নোংরা ব্যাপার মনে করতেন তাঁরাই আবার উঠে পড়ে লেগে-ছেন হাত পুড়িয়ে রান্না করতে। এসব কাণ্ডে যে দেশ যত প্রগতিশীল তাদের রান্নাঘরের খুঁটিনাটির প্রতি তত বেশি মনোযোগ দেখা যাচ্ছে। পুরুষ-জাতি কোথায় এজন্যে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন তা নয় তাঁরা কি কৌশলে মেয়েদের একেবারে পরাধীন করে ফেলা যায় তার ফাঁক খুঁজতে ব্যস্ত। একজন মন্তব্য করেছেন পুরুষেরা প্রথম ভুল করেছে মেয়েদের ভোটের অধিকার দিয়ে। কোন ভদ্রলোক সুপুরুষ হলেই যে ভালো প্রেসিডেন্ট হবেন না এতটুকু জিনিস বোঝবার মত সাধারণ বুদ্ধি মেয়েদের এই বিশ বছরেও হল না। এ ছাড়া প্রবন্ধকার আরো অনেক কিছু বলেছেন যার সারমর্ম এই : ইংলণ্ডে ডিনারের পর মেয়েদের অন্য ঘরে পাঠিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবার রীতি আছে। কঙ্গোবাসী পুরুষরা যখন তালগাছের নিচে সভা বসান তখন তার মধ্যে মেয়েরা অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের সোজা কুমিরের মুখে ফেলে দেওয়া হয়। সুতরাং আমরাই বা কেন ইত্যাদি। মেয়েরা নাকি এত অনর্গল এবং অতিরিক্ত কথা বলেন যে ভদ্রসমাজে তাঁদের নিয়ে বেশিক্ষণ থাকলে কথোপকথনের সবটারই অকালমৃত্যু ঘটে। এর প্রতিবিধানের উপায় দুটো। এক সম্পূর্ণ বহিষ্করণ, দুই উপযুক্ত শিক্ষাদান। এই রকম ভয়ানক প্ররোচনামূলক কথা শুনলে কার না গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে? কিন্তু যতই উত্তপ্ত হোন মেয়েরা কখনই ট্রাম বাস পোড়াতে বা জুতোর দোকান লুঠ করতে এগিয়ে যাবেন না একথা পুরুষেরা ভাল করেই জানেন বলে এইরকম সব উক্তি করতে সাহসী হচ্ছেন। হয়তো তাঁদের

জানা আছে গৃহধর্ম অতি কঠিন ধর্ম। যথার্থ গৃহী হওয়া যে কিরকম কঠিন তার সঠিক বিবরণ বোধহয় একমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীরাই দিতে পারবেন। প্রত্যেক মানুষকে বুদ্ধিযুক্ত জন্তু মনে করা হয়ে থাকে কিন্তু সকলের বিচার বিবেচনা যেমন সমান নয় তেমনি সকলে সংসার ধর্ম পালন করছেন বলে সকলেই যে তা পালন করতে জানেন এটাও সর্বৈব ভুল। প্রথমত আগে থেকে প্রস্তুত হবার মত কোন ট্রেনিং পিরিয়ড না থাকায় ফলে সময় সময় নতুন রিক্রুটদের বিড়ম্বনার একশেষ হয়। যে মেয়েটি কোনদিন রান্নাঘরের চৌকাঠ মাড়ায়নি তাকে অকস্মাৎ বৌমা, আজ মাংসটা তাহলে তুমিই রাঁধো বলে কুড়ি জনের মত আহার তৈরী করার ফরমাস দিয়ে অন্যেরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় আনন্দ উপভোগ করেন। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে গৃহিণীদের ধারণার একান্ত অভাব। যোগ্যতার প্রশ্ন আসছে তারও পরে।

আজকাল আবার যুগ পরিবর্তনের ফলে গৃহিণীদের বিব্রত করার মত অনেক নতুন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যে মেয়েটি একসঙ্গে গৃহধর্ম আর চাকুরীধর্ম দুই নৌকায় পা রেখেছে তার সমস্যার কথা আর না তোলাই ভাল। তবে একটিকেও না ডুবিয়ে অনেকে যে সুদক্ষ ক্যাপ্টেনের মত দুটিকেই ঠিক পথে চালাচ্ছেন এটাই তাঁদের বাহাদুরী। যিনি সত্যিই কুশলী গৃহিণী, তাঁর কাছে কূটনৈতিক বিদ্যায় শিক্ষা নিতে অনেক ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ আসতে পারেন। কি করে কাউকে অসন্তুষ্ট না করে বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন লোকের জন্য চারবেলা আহারের আয়োজন করা যায় এরকম দুরূহ কাজ যিনি প্রত্যহ করছেন তিনি না পারেন এমন কাজ কি কোথাও থাকা সম্ভব? শাক চচ্চড়ির বাইরের জগতের ঠেলা সামলাতে এর অর্ধেকের বেশি স্নায়বিক যন্ত্রণা অনুভব করতে হয় কিনা সন্দেহ। সংসারের হাল যিনি দৃঢ় হস্তে ধরে থাকতে পারেন জগৎ সংসার সেই সুগৃহিণীর হাতের মুঠোয়।

আমার চোখে 'মৃণাল'

জয়ন্তী দেবী

'মৃণাল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পদ্মের ডাঁটা। পঙ্কের মধ্যে জন্ম নিয়ে, সর্বাঙ্গে কণ্টকজ্বালা বয়েও মৃণাল ঊর্দ্ধমুখে আলোর পদ্ম ফুটিয়ে তোলার তপস্যা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিদ্রোহিনী মানস কন্যার জন্য এই নামটিই বেছে নিলেন।

১৩২১ এর শ্রাবণে মৃণালের জন্ম অর্থাৎ এখন থেকে ষাট বছর আগে। তার আগে ১২৯৮তে 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার আর ১৩২১ এর জ্যৈষ্ঠ হৈমন্তী গল্পে চোখের জলে নারীত্বের 'ভস্ম অপমান শয্যা' রচনা করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-কেই। তার মধ্য থেকেই বোধহয় 'জলদর্পি তনু' নিয়ে জেগে উঠল মৃণাল। ইতিমধ্যে অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে; আধুনিক মনন আর মনীষায় পরি-শীলিত আজকের এ সমাজ মানস, আজও মৃণালের মর্যাদা দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা সংশয় জাগে, হয়ত এশুধু কবির স্বপ্ন। 'মৃণাল'দের বিদ্রোহ চারিদিকের বিরুদ্ধতার প্রতিঘাতে আলোর পদ্ম ফোটানর আগেই মরে যায়। বিচিত্র এই যুগ মানসিকতায় লক্ষ্য করি, নারীত্বের বিকৃতি অনা-য়াসে প্রশ্রয় পায় অথচ নারীত্বের বিকৃতি এখানে সহ্য হয় না। বুঝি বা এ সমাজমানসের সেই পুরনো complex, মনোবিজ্ঞানে যাকে বলে feeling of insecurity' নিরাপত্তাবোধের অভাব।

শরৎচন্দ্রের 'অন্নদাদিদিকে' কিশোর শ্রীকান্তের নিঃস্বার্থ পবিত্র দৃষ্টি দেখল—'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তর ব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।' এই শ্রদ্ধা নারী সম্বন্ধে কিশোর মনের অন্তর অনুভূতি ও বেদনায় সোচ্চার—"যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই—তাঁকে, তাঁর বাপ মা, আত্মীয়স্বজন জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া?' আর তার পারিপার্শ্বিক সমাজ-নির্মম অশালীন কৌতুকে ক্ষমাহীন তার বিচার—অন্নদা কলঙ্কিনী, সমাজের কোন ভদ্র আশ্রয় তার জন্য নেই স্বামীর জন্য একনিষ্ঠ প্রেমে যে নারী বিনা দ্বিধায় কলঙ্ক আর অসীম দুঃখের ভার অনায়াসে

মাথায় তুলে নিল, নারীত্বের সেই অতুলনীয় অনমনীয় দুঃখদহনের, ত্যাগ আর সহিষ্ণুতার মর্যাদা দেবার শক্তি, রসনারোচন আলাপ আর প্রলাপে রত সেদিনের কাপুরুষ মানসিকতা ছিল না। সেদিনের অনাধুনিক শরৎচন্দ্রের মত করে আজকের ক'জন আধুনিক মনস্বী সত্তা করে বলতে পারবেন জানি না—'নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। ...... না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।'

মানুষের দীনতার কাছে অন্নদা আশ্রয় ভিক্ষা করেনি, অবিচারের বিরুদ্ধে জেহাদ জানায়নি, নীরব অভিমানে আত্মবিলুপ্তির পথ বেছে নিয়েছে।

এই সমাজের স্বর্ণশিকারী মানুষের কাল লোভ আর নির্মমতার বলি হয়ে আত্মঘাতের পথ বেছে নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'নিরুপমা'ও। দরিদ্র পিতা পাত্রপক্ষের পাওনা মেটাতে সর্বস্ব বিকিয়েও মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন—'নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে।' প্রতিদিনের অপমান আর অমর্যাদার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যেতে যেতে নিরুপমা তার ক্ষুব্ধ নারীসত্তার অভিমানের স্ফুলিঙ্গ নিরুপায় পিতার বুকে রেখে গেল হৃৎপিণ্ডের এক আঁজল রক্তের মত। '—তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।'

আরও তেইশ বছর পরে কবি কল্পনার জন্ম নিল 'হৈমন্তী'—'সে সূর্যের মতো ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়।' এই মেয়েকে বিবাহ করে তার স্বামী অনুভব করেছিলেন—'দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহ মাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না।' হৈমন্তীকে লাভ করে তার স্বামী ভাবেন 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।' কিন্তু 'সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া'—পিতৃগৃহে যে 'নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে' বড় হয়ে উঠেছিল, সমাজ সংসারের অসম্মান আর হৃদয়হীনতার পরিবেশে প্রতিদিন নিঃশব্দে সে নিঃশেষিত হতে লাগল—'হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে মরিতেছিল।' —'নির্বাক আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক মনের কথা হয়।' 'হৈমন্তীর ভীরু নায়ক নিরুপায় দর্শকের বেদনা নিয়ে দেখেছেন—

কীভাবে চারিদিকের স্থূল মানসিকতায় শিকার হয়ে হেমন্তের শিশিরের মত হৈমন্তী ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে। নায়ক অন্তরের মধ্যে হৈমন্তীর মর্যাদা দিয়েও, সঙ্কুচিত পৌরুষের আক্ষেপে নিরুপায় দর্শক—'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে।'
'পয়লা নম্বর' গল্পের রহস্যময়ী নায়িকা অনিলাকে সামাজিক স্থূল নিপীড়নের মধ্যে প্রতিদিন আত্মার চিতাশয্যা রচনা করতে হয় না। স্ত্রীর মর্যাদা সে পেয়েছে, বলিষ্ঠ এবং সূক্ষ্ম মানসিকতায় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সিতাংশুমৌলির প্রেমের স্তবও, তবু অনিলাকে একদিন রহস্যময় নিরুদ্দেশের পথ বেছে নিতে হল। নারীর পূর্ণমূল্য কেউই দিতে পারেনি। স্বামীকে সক্ষোভে অনুভব করতে হল সেদিন—'পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিইনি।' দুজনেই অনিলাকে চেয়েছিলো, অনিলাও বুঝি দুজনের মধ্যে খুঁজেছিল তাঁর আত্মার আত্মীয়কে, কিন্তু এই রহস্যময়ী নারীর মিভৃতির মূলে প্রবেশ করার তপস্যা বুঝি কারোরই ছিলনা, তাই একটি নীলরং এর কাগজের দুটি টুকরোতেই দুজনকে একই কথা লিখে স্বীকৃতি অস্বীকৃতির রহস্যময় নীলমায় সে আত্মগোপন করল—'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।'
'নারী ব্যক্তিত্বে'র এই যে সূক্ষ্মতম মূল্যায়ণ এত আরও অনেক পরের কথা। ঐ গল্প রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন ১৩২৪এর আষাঢ়ে। অনিলাকে সমাজের লোহার গারদের পীড়নের জগদ্দল পাথরটাকে সরিয়ে নিজের মর্যাদাকে বাঁচাতে হয়নি, সে খুঁজেছে তার আত্মিক মূল্য যা অস্বীকৃত, অলক্ষিত।
নারীর মর্যাদা যেখানে বিকৃত ধিকৃত, অপমানিত সেই পঙ্কে 'মৃণালের জন্ম। শ্রাবণ ১৩২১ 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রকাশকাল। শুরুতেই দেখি মৃণালের নিজের সম্বন্ধে মারাত্মক স্বীকারোক্তি—'তোমাদের ঘরের বউ এর যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন…। ……আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পারনি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি।' মৃণালের ভেতরকার এই কবি তাকে দূরের বাঁশীতে ডাক দিল; তার মনের অত বড় বুদ্ধি আর ভাবের

আকাশটাকে সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির অন্ধকূপ আর বেঁধে রাখতে পারল না। তার ব্যক্তিগত দুঃখকে ছাপিয়েও নারীত্বের অপমান আর অমর্যাদায় রূপলাবণ্যময়ী, অসীম মমতায় কোমল এই মেজবৌ এর নিভৃত চোখের জল হৃৎপিণ্ডের ভেতরে বিদ্রোহের বজ্রশক্তিতে রূপান্তরিত হল। মরবার পুরনো রসিকতা সে করল না। তার বুদ্ধি প্রদীপ্ত আত্মসচেতন মন ভাবে 'বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। '......মরতে লজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।' মৃণালের সংসারবন্ধনের শেষ গেরোটা ভেঙে দিল তার বড় আদরের বিন্দু—তার নারীত্বের অপমান, তার মৃত্যুমুক্তির মধ্যে সে দেখতে পেল—'মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে।' সেইদিন বড় স্পর্দ্ধাভরে সেই সনাতন বাড়ীটার মেজবউ মৃণাল তার দেয়ালসীমার বাইরে দাঁড়িয়ে সমগ্র নারীত্বের অমর্যাদার বিরুদ্ধে একক জেহাদ জানাল এই সমাজকে—'তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়।'

মৃণাল শরৎচন্দ্রের অন্নদা দিদির মতো নিরুপায় অভিমানে আত্মবিলুপ্তির পথ বেছে নেয়নি, নিরুপমা আর বিন্দুর মতো জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে আত্মঘাতী হয়নি, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের অভিমান নিয়ে হৈমন্তীর মতো তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এই সমাজের বুকের ভেতরে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে এর মানসিক দৈন্যের চেহারা, এর কাপুরুষতা, এর অপরিসীম স্বার্থপরতা। মৃত্যুকে আর ভয় করেনা মৃণাল, স্বাপ্নমুগ্ধ মনে প্রত্যাশা রাখে না কোনো করুণার। জীবন আর সংসারের সঙ্গে সব লাভ ক্ষতির হিসেব মিটিয়ে, সমস্ত তুচ্ছ পাওয়াকে উপেক্ষা করে ধনীগৃহের বধূর স্বর্ণভূষণকে জীর্ণ বসনের মত ত্যাগ করে ভূষণবিহীনা হয়ে সর্বত্যাগিনী নারী সমুদ্রের সম্মুখে এসে বিরাটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বামীকে পত্র পাঠাল—'এ তোমাদের মেজোবউ এর চিঠি নয়।...

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল।...আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।' নারীত্বের মর্যাদার পরিপূর্ণ গৌরবে, আত্মিক বিকাশের সাধনায় মৃণালের ঊর্দ্ধমুখী হৃদয় সূর্যমুখী তপস্যা। অনন্তের আলোয় নিজেকে দেখে তার উদ্বুদ্ধ অন্তরলোক সমস্ত

অপমানিত নারীত্বের প্রতিবাদে যেন জেগে উঠে বলল—'তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে।'

'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল রবীন্দ্রনাথের নারীমুক্তি স্বপ্নের কল্পলোকের কবিতা—আত্মিক দীপ্তিতে সে কমলহীরের মত জ্বলছে। এই কল্পনার একটি তীক্ষ্ণ বাস্তব মূর্তি—'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা 'কল্যাণী' গল্পের প্রকাশকাল ১৩২১ এর কার্তিক। কল্যাণী কল্যাণদীপ্তিতে উজ্জ্বল সেই আশ্চর্য নারী যার 'গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব...সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে।' এই মেয়ে ভীরু ব্যক্তিত্বহীন পুরুষকে আশ্রয় দেবার শক্তি রাখে, নিজের স্বাধীন স্বতন্ত্র, হীরককঠিন ব্যক্তিত্বের বজ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে অপরিসীম মমতায় অপূর্ব বলিষ্ঠতায় বলতে পারে—'এখানে জায়গা আছে।' সেই কঠিনতার আঘাতে আর মমতায় মেরুদণ্ডহীন নায়কের রক্তে পৌরুষ সঞ্চারিত হয়, মুগ্ধ বিস্মিত প্রতীক্ষায় তার অন্তরাত্মা জেগে উঠে বলে—'ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।'

ঘর, সংসার, সমাজ সব ছেড়েছে মৃণাল—পুরুষের প্রেম অথবা তার স্বামীত্বের আশ্রয়ের ওপর নির্ভর করে নয়, নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মর্যাদার সন্ধানে সে একক পথিক। সুকঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তায় সে উপেক্ষা করেছে নারীপ্রগতিবিদ্বেষী সমাজের অত্যাচারী শক্তির দম্ভকে। তার চলার বলিষ্ঠ ছন্দে সমাজ সংসারের চোখ রাঙানি, সংস্কার আর স্বার্থপর অহমিকার শৃঙ্খল নিজের লজ্জায় ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে পেছনে পড়ে থেকেছে।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' উপনিষদের এই পুরনো বাণীটিরই যেন আধুনিক অভিনব রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথের এই নারীমুক্তির কল্পনা ও মননে। মানুষ যতদিন ভয়ে আর দুর্বলতায় নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখে ততদিন সেই বলহীনের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকে না। কিন্তু যেদিন তার রক্তের কণায় কণায় শক্তির আগুন জ্বলে ওঠে। আত্মিক মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন সে তুচ্ছ করতে পারে স্বার্থ, লোভ, মোহবন্ধনের শিকলকে সেদিন কোন বিরুদ্ধ শক্তিই আর তার গতিরোধ করতে পারে না। জীবনের মোহের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত প্রদীপ্ত, স্বপ্রতিষ্ঠিত সেই নারীব্যক্তিত্বেরই দ্বৈতরূপ 'মৃণাল' আর 'কল্যাণী'।

মেয়েরা রাজনীতিতে

রেখা চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান যুগে বাস করে মেয়েদের আলাদা করে দেখবার দিন শেষ হয়েছে। এক সময় বাড়ীতে পুত্রের জন্ম হলে শাঁখ বাজান হত আর মেয়ে হলে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠত বাড়ীর সকলের মনে। কারণটা ছিল অত্যন্ত সাধারণ ছেলে বড় হয়ে অর্থ উপার্জন করে সংসারের হাল ধরতে পারবে আর মেয়েকে মানুষ করে অর্থ সমেত পরের বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় অর্থ ঘরে না এসে ঘরের অর্থ বাইরে চলে যাবে। নিতান্ত এই স্বার্থের খাতিরেই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা আত্মীয় স্বজন না জন্ম সময় হতেই সোচ্চারে ঘোষণা করতেন। সে যুগের অবসান হয়েছে, শিক্ষা-ক্ষেত্র থেকে কর্মক্ষেত্র, তথা সমাজ জীবনের সর্বস্তরে আজ ছেলে ও মেয়ের ব্যবধান দূরে সরে গেছে। মেয়েদের আজ সর্বত্র গতি এবং এক কথায় বলতে গেলে সর্বক্ষেত্রেই সমাদৃত। নিজেদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিচয়ও মেয়েরা আজ ভাল ভাবেই দিতে পারছেন।

আজকের আলোচনায় আমরা মেয়েদের অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়ে কেবল রাজনীতিতে মেয়েদের কথাই বিচার করতে বসেছি। রাজনীতি কথাটার মধ্যেই বেশ একটা রাজসিক ভাব আছে। আর আজ পনের থেকে সুরু করে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বয়সের প্রায় প্রতিটি মানুষ তা ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে এই রাজনীতির আলাপ আলোচনায় কিছু না কিছু সময় কাটিয়ে থাকেন। রাজনীতির সঙ্গে তথা বিশেষ কোন দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও প্রতিদিন ট্রামে-বাসে, হাটে-বাজারে, ড্রইংরুমে বা খাওয়ার টেবিলে ছোট থেকে দীর্ঘস্থায়ী রাজনীতি বিষয় আলাপ করতে দেখা যায়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই চিত্র আজ সমাজ জীবনের প্রতিটি গৃহেই দেখা যায়।

আজ আমরা এখানে অবশ্য সমষ্টিগত মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ও রাজনীতি নিয়ে আলাপ আলোচনার বিষয় নিয়ে বিচার করতে বসিনি। আমাদের পরিবেশ আজ সীমিত শুধু মাত্র মেয়েদের রাজনীতি নিয়েই

আলোচনা করব, তাও আবার এই বাংলাদেশের মেয়েদের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে নজর রেখে চলতে চেষ্টা করব।

আজকে মেয়েরা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবেন কিনা এ প্রশ্নটা অনেকের মনেই দেখা যাচ্ছে। পরাধীন ভারতকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই বাংলার ঘরের যে-সব ছেলেরা একদিন ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রেরণা, উৎসাহ ও সাহস যাঁরা জুগিয়ে ছিলেন তাঁরা এই বাংলাদেশের মাতা, জায়া বা ভগিনী। ইতিহাসের পাতায় রাজপুত রমণীদের তিলক পরিয়ে স্বামী বা পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানর কথা লেখা আছে। কিন্তু এই যুগের মেয়েরা বাংলা মায়ের ঘরের আঁচল ছেড়ে ঘর ছাড়া হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। নিভৃতে চোখের জল নিশ্চয়ই মুছেছেন কিন্তু প্রকাশ্যে মনের দুর্বলতাকে কার কাছে ধরা পড়তে দেননি। গোপনে পুলিশের নজর এড়িয়ে এই সব বিপ্লবী ছেলেরা কখন গভীর রাত্রে ঘরে এসেছে কয়েক দিনের অনাহার ক্লিষ্ট শরীরকে কিছু খাবার যোগাবার জন্য। আবার কখন এসেছে নেতার নির্দেশে দূর দেশে চলে যাবার আগে একবার মায়ের চরণ স্পর্শ করে আশীর্বাদ নেবার জন্য। তখন মেয়েরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন নি বলে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে এক জায়গার কোন গোপন খবরা খবর মেয়েরাই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। ঘাটের পথে নদীর ধারে অপেক্ষমান দূতের কাছে চিঠি পৌঁছনর ভার ছিল মেয়েদের। অনেক সময় পুলিশের সন্দেহের পাত্রী এঁরা হয়েছেন তখন বিনা দ্বিধায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন বা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কাগজপত্র গিলে ফেলেছেন তবু পুলিশের হাতে তুলে দেননি। ইতিহাসের পাতায় এই সব মেয়েদের নাম লেখা না হলেও প্রাক্ স্বাধীনতার যুগ থেকেই বাংলার মেয়েরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সে বিষয় কোন সন্দেহের কারণ নেই। নিজেরা মেয়েরা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ না দিলেও এঁদের মনে প্রাণে যদি রাজনৈতিক চেতনা না থাকত তবে নিজেদের ঘরের দুলালদের নিশ্চিত মৃত্যুর পথে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হত না। শিশুরা বাড়ীর মেয়েদের কাছেই ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রেরণা উৎসাহ ও উদ্দিপণা পেয়ে থাকে। শিশু মনে দেশ প্রেমের বীজটি প্রোথিত না হলে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনার প্রকাশ ঘটা সম্ভব নয়।

বৈপ্লবিক চেতনার যুগে সাধারণ ঘরের বেশ কয়েকটি মেয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। এ দিনের ইতিহাস আজ সকলেরই জানা আছে। তখন তাঁরা

আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করার তালিম নেওয়া থেকে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজই করেছেন। মেয়েদের কর্ম পদ্ধতির সঙ্গে ছেলেদের কর্ম পদ্ধতির কোন পার্থক্য ছিল না। বোমা ও পিস্তলের ব্যবহারে তাঁরা যথেষ্ট আত্ম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দলপতির আদেশে যে কোন কঠিন কাজে এঁরা আত্ম নিয়োগ করেছেন বিনা দ্বিধায়। শারীরিক বা মানসিক কোন চাপের কাছেই নতি স্বীকার করেননি।

বাংলার মেয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার মত অতি বৃদ্ধা যেমন একদিন স্বাধীনতার মন্ত্র নিয়ে পথে নেমে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ দিয়েছিলেন তেমনি যুবতী ও গৃহবধূরাও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী ছেলের জননী বা জায়া হিসাবে পুলিশের নির্মম অত্যাচারও তাঁরা নীরবে সহ্য করেছেন। এছাড়া নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঝাঁসিররাণী বাহিনীতে দলে দলে মেয়েরা যোগদান করে এগিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অধ্যায়কে।

পরবর্তী যুগে মেয়েরা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে সর্বভারতীয় নেতৃত্বও গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরের জগতে আত্মনিয়োগ করলে গৃহ জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। আর ঘরে যদি ভাঙন ধরে তবে ভবিষ্যৎ সমাজ ধ্বংসের পথে চালিত হতে বাধ্য। অতএব রাজনীতির ক্ষেত্র মেয়েদের জন্য নয়। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যারা রাজনীতিকে গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন তাঁদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে গৃহধর্ম পালন করা সম্ভব নয়। তবে এমন ভাবে সব কিছু ছেড়ে সম্পূর্ণ রাজনীতি নিয়ে জীবন কাটাবার মত মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং তাঁদের কথা অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এছাড়া যাঁরা গৃহ জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যেও সমস্ত কাজ-কর্মের পরেও যে অপরিযাপ্ত অবসর সময় থাকে যখন তাঁরা দিবানিদ্রা, সিনেমার বই পড়া, পরচর্চা করে নষ্ট করেন সেই সময়টা অনায়াসেই রাজনৈতিক কাজে ব্যয় করতে পারেন। এতে মনের প্রসারতা বাড়ে এবং সমগ্র জীবনের একটা পরিপূর্ণ বিকাশ হতে সাহায্য করে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী একজন মেয়ে—তিনি একবার বলেছিলেন "বাইরের জগতে যে মেয়েরা কাজ করেন তাঁরা গৃহ-জীবনের কাজ কর্মের জন্য নির্দিষ্ট অবসর পান। এর ফলে অল্প সময়ে তারা অনেক ভালভাবে গৃহধর্ম পালন করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে যাঁদের গৃহজীবনের গণ্ডির বাইরে কোন কাজ নেই তাঁরা অপরিমিত সময় হাতে পাওয়াতে

গৃহধর্মের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ কর্মেও অনেকটা ঢিলে হয়ে পড়েন।' নিজে-দের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কথাটা মিলিয়ে নিতে পারেন তা হলেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব হবে। যেদিন সমস্ত দিন কাজের চাপ খুব বেশী থাকে এবং হাতে অবসর বলে কিছুই থাকে না সেদিন অনেক সুষ্ঠভাবে কাজকর্ম শেষ করা যায়। অথচ নিরলস অবসরের দিন কোন কাজই বাঁধা ধরা ছকে চলতে চায় না। তাই বাইরের জগতের সঙ্গে যে মেয়েরা জড়িত নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহকর্ম সম্পন্ন করতে তাঁরা অপারগ নয় এবং গৃহে আবদ্ধ মেয়েদের চেয়ে এঁদের কাজ অনেক বেশী সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে গৃহ জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্মও অনেক অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন করা যায়। নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই আধুনিক যুগের এইসব সুযোগ সুবিধায় কিছু না কিছু আয়ত্ত করে থাকেন। এছাড়া সামাজিক পরিবর্তন, উচ্চ শিক্ষা, স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধার ফলে আজ অনেক মেয়েই স্বাধীন জীবন যাপনের পথে নিজেদের চালিত করছেন। মেয়ে বলেই স্বামীর ঘর করতে হবে এমন নিয়ম আজ আর চলে না। এঁদের অধিকাংশই কর্মক্ষেত্রে যুক্ত। পারিবারিক দায় দায়িত্ব এঁদের ক্ষেত্রে অনেকটা শিথিল। সুতরাং ঘোরাফেরায় যেমন স্বাধীন তেমনি নির্দিষ্ট দলভুক্ত রাজনীতিতে কিছু সময় কাটান এঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

সবচেয়ে বড় কথা নিজেরা রাজনীতি না করলেও আজকের দিনে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির প্রভাব মুক্ত হয়ে সমাজে বাস করা সম্ভব নয় এ কথাটা আমি গোড়ায় বলেছি। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের অধিকার হওয়ার ফলে নিজেদের চিন্তা ভাবনা ও রাজনৈতিক জ্ঞান স্পষ্ট না থাকলে অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করতে হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ ও তাদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়া-কিবহাল না হলে নিজের মনের সঙ্গে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের মতবাদের যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব নয়। আর নিজের বিচারবুদ্ধিকে ঠিক মত কাজে লাগাতে না পারলে গণতন্ত্র ব্যাহত হতে বাধ্য। সুতরাং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মেয়েদের সচেতন থাকতেই হবে

বিবাহের মূল্যবোধের পরিবর্তন প্রয়োজন

হেনা চৌধুরী

আদিম যুগে বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিলনা—সমাজ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপরূপে নারী ও পুরুষের যৌন মিলনকে সীমিত করে দিল বিবাহ প্রথা আর এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো বিশেষ করে সমাজ রক্ষার জন্যই। এর অনেক পরে মানুষের সভ্যতার সংগে সংগে উদয় হল শাস্ত্র ও আইন। এরপর পৃথিবীর সব সভ্যদেশেই বিবাহ প্রথা হয়ে গেল শাস্ত্র ও আইনানুমোদিত জীবনের অতি পরম পবিত্র কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্রকারেরা অতি মধুর ভাষায় এই মিলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বললেন :—

"তোমার হৃদয় আমার হোক।
আমার হৃদয় তোমার হোক।"

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সেদিনের নারী পুরুষের কাছে বিয়েটা ছিল হৃদয় ঘটিত ব্যাপারের চেয়ে অনেক বেশিই দেহ ঘটিত ব্যাপার। সেকালের পুরুষেরা স্ত্রীকে বলত 'পরিবার' আর স্বামীর কাছে সেই স্ত্রীই ছিল অনেক আদরণীয়া।

সে যুগের মেয়েরা এই প্রথাবদ্ধ 'বিবাহিত' জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল কারণ এছাড়া তাঁদের বাঁচবার আর কোন পথও ছিলনা। এর মুখ্য কারণ সেদিনকার নারীসমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল অকল্পণীয় ব্যাপার। আর নারী পুরুষের মেলামেশার কোন সুযোগও ছিলনা।

দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল—কিন্তু জ্ঞানগরিমায় নারী পুরুষের মহিমা ম্লান করে দিয়েছিল—লীলাবতী, মৈত্রেয়ী এবং গার্গীর আবির্ভাবে। নারীর এই জ্ঞানগরিমার মহিমায় ভীত হয়েই বোধহয় আমাদের শাস্ত্রকারেরা নারীকে সমাজ ও সংসার জীবনে বেঁধে ফেলবার জন্য হাজারটা অনুশাসনের ফিরিস্তি দিলেন। মনু তো বিনাদ্বিধায় ঘোষণা করলেন—নারী সব সময়ই অধীন বাল্যে পিতার যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের। অবশ্য সহমরণ প্রথা সমাজে প্রচলিত হবার পর নারীর আর পুত্রের অধীন

হবার সৌভাগ্য ঘটতনা। রামমোহন রায় আমাদের সামাজিক জীবনে উদয় হলেন অন্ধকার যুগে আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে। সেই আলোর রশ্মিতে তিনি নানাশাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করলেন যে সহমরণ প্রথা আমাদের সমাজে শাস্ত্রানুমোদিত নয়। নারী চিরতরে মুক্ত পেল জগদ্দল পাথরের ভারবাহী জীবনের যন্ত্রণা থেকে।

তারপর আবির্ভাব ঘটলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের—নারী প্রগতির সোপানকে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন করে। কিন্তু নারীর প্রকৃত মুক্তির জন্য আরও অনেক রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রকৃত মানবদরদী ও সমাজবাদী মহামানবের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে তেমন আবির্ভাব আর ঘটেনি। অবশ্যই অস্বীকার করিনা এর পরের যুগ মহাপুরুষের আবির্ভাবে স্বর্ণময় যুগ—কিন্তু সেদিনকার মানুষদের সমাজ কল্যাণের চেয়ে রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তির যন্ত্রণা পাগল করেছিল, করেছিল ঘরছাড়া অবশ্য এঁরা নারী প্রগতিকে সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন, কিন্তু সমাজ জীবনে নারীকে অপ্রয়োজনীয় বন্ধনের হাত থেকে মুক্ত দিয়ে যেতে পারেন নি। তাই সমাজের বুকে নির্বিচারে রয়ে গেল পণপ্রথা কনে দেখা, শ্বাশুড়ী নির্যাতন, বিবাহের ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য ও প্রাদেশিকতা।

আজ সমাজ সব দিক দিয়েই অনেকখানি প্রগতিশীল হয়েছে—কিন্তু এই সমস্ত প্রথার মধ্যে যেগুলোতে পাত্রপক্ষের স্বার্থ আছে তা আজও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক, শিক্ষিত সমাজের উপর নির্বিচারে বহালতবিয়তে রাজত্ব করে চলেছে। আমাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষের তো কোনদিনই কোন দায়ভাগ ছিলনা। তাই এ ব্যাপারে কানা ছেলেও 'পদ্মলোচন' নামে চলে যায়। এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ বা আন্দোলন গড়ে তোলবার শক্তি সেদিনও মেয়েদের ছিলনা এবং আমি বলবো আজও নেই। আর সেটাই দুঃখের ও লজ্জার।

সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম ও সাহিত্যে নারীকে যতই শক্তিস্বরূপা বলে জয়গান করুণ না কেন—প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত বিকাশের পূর্বে আমাদের সমাজে মেয়েরা ছিল শক্তিহীনা, দুর্বল, রূপ ও রূপোয় মোড়া পুরুষের সংসারে একটি সম্পত্তি বিশেষ। অন্যঅর্থে সেছিল 'সেবাদাসী'। সারাটা জীবন পুরুষের কল্যাণে তাঁর সংসারে মঙ্গলপ্রদীপ হয়ে জলেছে—কিন্তু সে আলোর শিখার প্রান্ত

স্বার্থপর পুরুষসমাজই দেখিয়েছে চরম অবজ্ঞা। নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক হয়েও জ্ঞানবুদ্ধিতে পরস্পরের এই অসাম্য নিয়ে সেদিন পুরুষও পূর্ণতা পায়নি—তার মনের গহনেও রয়ে গেছে একটা চাপা ক্ষোভ এবং অতৃপ্তি। কিন্তু তবু সমাজের বিধানকর্তা পুরুষরা নিজেদের চরম স্বার্থ এবং পরম অসুবিধের কথা ভেবেই নারীকে এই অন্ধকার জীবন থেকে মুক্তি দেয়নি। প্রাণী জগতের মধ্যে পরনির্ভরশীলকারী এবং সমাজের পেষণে নিষ্পেষিত, রাষ্ট্রীয় অধিকার চ্যুত নারী হয়ে রইল এক অসহায় জীবমাত্র। ইংরেজ কবি মিল্টনের কথায় যাকে ব্যাখ্যা করা যায় 'fair defect of nature'. আর এই অভ্যস্ত জীবনেই সে ছিল সুখী—জানলা দিয়ে ভুলেও বাইরের নীল ও উদার আকাশটা দেখবার লোভ বা মোহ কোনটাই তার মনে জাগেনি। কিন্তু সেই নারীর জীবনের সেই সুখের বিবর্ণ আকাশটি কালো হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতে। সেদিনকার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক চাহিদাকে সুদৃঢ় করবার জন্য ডাক এলো নারীরও। আর তারই জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষার। নারীর জীবনে এলো মুক্তির লগ্ন। ত্রিশ / চল্লিশ বছরে সেই মুক্তিই তুলে দিলে নারীকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার অধিকার দিলো—কর্মজীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই সে পুরুষের সংগে সমান-তালে পা ফেলে চলতে শিখল। আজ স্বকীয় মর্য্যাদা ও প্রদীপ্ত আত্মবিশ্বাসে আমরা মেয়েরা শুধু কর্মসঙ্গিনী হিসেবে পুরুষের পাশেই দাঁড়াইনি—তার জীবনকে আলোকিত করেছি—সম্প্রতি থেকে আজ প্রকৃত আমরা মেয়েরা পুরুষের জীবনে উন্নীত হয়েছি সম্পদরূপে। আজ আর আমরা পুরুষের ভারবাহী ও পুরুষের আশ্রয়কামী এক অবলা জীবমাত্র নই। আজ আমরা মেয়েরা জীবন সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর।

সেই সম্পদের অধিকারিনী হতে পেরেছি বলেই আমরা আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা এই সনাতন বিবাহ প্রথার কিছুটা পরিবর্তন অভিলাষী হয়ে পড়েছি। আজ অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে জাতগোত্র বা দেশজ বাধার ব্যবধান আমরা খানিকটা দূর করতে পেরেছি—যদিও তা ঘটে Love marriage-এর ক্ষেত্রে। আর আশ্চর্য্যের কথা আজও আমাদের সমাজে শতকরা সত্তরটা ঘটে sattle marriage এবং ত্রিশটা Love marriage—যদিও সে তুলনায় পথে ঘাটে রোমিও জুলিয়েটদের দেখা অনেক বেশিই মেলে। এরা অবশ্যই চোখের নেশায় দিশাহারা—ভালবাসার মহাসমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোর খোঁজ এরা কোনদিন পায়নি এবং পাবেও না।

যাক! যা বলছিলাম। প্রথমত: আধুনিক মানুষদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সময় উভয়ই বড় সীমিত। কিন্তু তবুও পণযৌতুকের দাবীতে একটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া মানে পাত্রীর পিতার নাভিশ্বাস ওঠানো—আমার প্রশ্ন আধুনিক ভদ্রশিক্ষিত পাত্র পক্ষরা কি এই প্রথাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মিলনের পথটাকে সহজ ও সুগম করে দিতে পারেন না? অর্থনৈতিক সামর্থ্যহীন কন্যার পিতা আজও কেন এই নিষ্ঠুর ও নির্মম সমাজের কাছে ফাঁসীর আসামী। তাঁকে এই অহেতুক অর্থনৈতিক চাপ ও যন্ত্রণা থেকে কি মুক্তি দিতে পারেন না স্বয়ং পাত্র? আমার প্রশ্ন এ ব্যাপারে এই যুবকরা আর কতকাল বাপমায়ের বাধ্য ছেলে হয়ে থাকবেন?

দ্বিতীয়ত: বিয়ে মানেই যে বিরাট একটা সামাজিক উৎসব, দশ দিন ধরে তার নিয়ম কানুন পালন করা, এগুলো বর্ত্তমানে একটু সংক্ষেপ করা উচিত। এই বাজারে ছেলে বা মেয়ে যারই বিয়ে হোক না কেন আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব যে যেখানে আছে সকলকে নেমতন্ন করে এনে চর্ব্ব, চষ্য, লেহ্য, পেয় খাওয়াবার কোন মানেই হয় না। আর এই খাওয়ার জন্য যৌতুক স্বরূপ যে Taxটি দিতে হয় তার ঠেলা সামলাতে গিয়ে মাসের শেষে মধ্যবিত্ত গৃহিণীকে সংসারের হাল ধরতে বেশ কৌতুক বোধ করতে হয়।

বিয়েটা সামাজিক উৎসব হলেও এর প্রকৃত উদ্দেশ্য দুটি হৃদয়ের মিলন—সেই মিলনে তাই তাদেরই আমন্ত্রণ জানানো উচিত যারা প্রকৃত বন্ধু ও শুভার্থী—এখানে ব্যর্থ সামাজিকতা এবং শুষ্ক আত্মীয়তা করার কোন অর্থ হয়না অন্ততঃ এই বাজারে। লৌকিকতা এবং বাহ্যিক কতকগুলি প্রথাবদ্ধ আচার অনুষ্ঠান ও দায়দায়িত্ব থেকে বিবাহার্থীদের মুক্তি দিলেই বোধহয় ভাল।

এই বিয়েটা যেখানে প্রকৃতই প্রেমজ সেখানে পুরুত, নাপিত, শালগ্রামশিলা এসব বোধহয় না হলেও চলে। কারণ হৃদয়ের বন্ধনের দৃঢ়তাকে সুদৃঢ় করবার জন্য মানুষ বা ভগবান কারুর দরবারেই বোধহয় সাক্ষী মানবার প্রয়োজন নেই। এই 'ফ্রি ম্যারেজ' পাশ্চাত্য দেশে কিছুটা চালু হয়েছে এবং আমি আশা করব প্রকৃত শিক্ষিত নারী পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজে এই প্রথা চালু হলে বিয়ের ক্ষেত্রে অহেতুক অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে আর বিয়েটা সেইদিন সামাজিক মানুষের কাছে সবদিক দিয়েই একটা বিরাট সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না।

আর প্রত্যেক তরুণ তরুণীকে তাদের যোগ্য এবং মনোমত জীবনসাথী নির্বাচনের অধিকার সমাজকে দিতে হবে। সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিবেচিত হবে পরস্পরের আন্তরিকতা এবং যোগ্যতা। বৈধ বা অবৈধর প্রশ্নও সেখানে অবান্তর। তার কারণ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও দিয়েছে। আর এই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারের ফলেই আজকের মানুষ জীবনকে অনেক বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে।

আমাদের বিবাহের মন্ত্রে যদিও বলে যে দুটি হৃদয় এক হোক—কিন্তু নানা কারণেই অনেক সময় দেখা যায় যে মন্ত্রের যৌক্তিকতা রয়ে গেল পুঁথির পাতায়। স্বামী স্ত্রীর জীবনে একতানের সুর আর কোনদিনই বাজল না। কিন্তু সেই ভাঙ্গা বাঁশী নিয়ে যৌবন নিকুঞ্জে বসে হা হুতাশ করার চেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ অতি স্বাভাবিক পথ।

তবু এপথে আজও রয়ে গেছে মানুষের সমাজ ভয় এবং লোকলজ্জা। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের এক্ষেত্রে কিছুটা সাহস আছে কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষরা অসুখী জীবন নিয়ে যন্ত্রণায় রাতের পর রাত শুধু হুইস্কীর বোতল খালি করে যান — তবু আদালতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছবার পৌরুষ বা সাহস তাদের থাকেনা। তাই বলছিলাম যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথার প্রতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। নইলে সমাজের বুকে যুগ যুগান্তর ধরে পাকই বাড়বে অথচ প্রকৃত পঙ্কোদ্ধার কোনদিনই হবেনা।

বিবাহের ক্ষেত্রে আর একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়—তা হল পাত্র পাত্রীর প্রাকবিবাহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা। জীবনে সুখী হবার ক্ষেত্রে এটা এত প্রয়োজনীয় জিনিস যে তা নিয়ে অহেতুক লজ্জা বা সঙ্কোচের স্থান নেই। কারণ অনেক সময়ই বিয়েটাকে জীবনের পরমমোক্ষ ভেবে পাত্র এবং পাত্রী উভয়পক্ষই পরস্পরের অনেক কঠিন রোগ গোপন করে বিয়ে দেন—এবং তার পরিণামে অসুখী জীবন যাপন করতে হয় উভয়কেই এবং অনেক সময় বিচ্ছেদও আসে।

Settle marriage এও বিয়ে স্থির হবার পর পাত্র পাত্রীর পরস্পরের আলাপ পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুজনেরই উচিত ভদ্রতা এবং সৌজন্যতা ত্যাগ করে পরস্পরের স্বভাবের প্রকৃত স্বরূপটি অপরের কাছে মেলে ধরা।

তার মাঝে কোন লুকোচুরি করা মোটেই উচিত নয়। ধরুণ নির্বাচিত পাত্রটি হয়ত নিয়মিত ' ড্রিঙ্ক ' করেন এবং যে পাত্রীর সংগে বিয়ে স্থির হয়েছে সে হয়ত মদের নাম শুনলেই মূর্চ্ছা যায়। এক্ষেত্রে পাত্র যদি তার এই অভ্যাসটির কথা গোপন করেন তবে যে অদূর ভবিষ্যতে তাকে অসুখী বিবাহিত জীবনে বিচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবেনা একথা বলাই বাহুল্য।

বিয়ে মানে দুটি হৃদয়ের পরিপূর্ণ মিলন—সে মিলনে কোন ফাঁক নেই, নেই কোন ফাঁকি। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে স্বামী স্ত্রীর সংজ্ঞারও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রকৃত স্বামী স্ত্রী বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির ভাষায় বধূ তথা প্রাণের দোসর থেকে প্রকৃত বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। আর এই বন্ধুত্ব যদি ইংরেজ কবির ভাষায় 'একবারের এবং চিরকালের' হয় তবে মানুষের জীবনে তার চেয়ে সুখের আর কিছুই হতে পারেনা। এর জন্য পরস্পরের ত্যাগ, পরস্পরের আন্তরিক বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস এবং চাই ভালবাসার সুখস্বর্গে পৌছবার প্রকৃত চাবিকাঠির ঠিকানা জানা। এর জন্য উভয়কেই উভয়ের মনের মতন হয়ে উঠতে হবে। আর সেই হয়ে ওঠার সাধনাই হচ্ছে প্রকৃত প্রেমের সাধনা। আমাদের প্রাচীন কবি কালিদাস স্ত্রীকে গৃহিণী, সচিব, সখী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক একজন শিক্ষিতা স্ত্রীকে সব দিক দিয়েই সেই প্রাচীন কবির সংজ্ঞার উপযোগী হয়ে নিজেকে গড়ে নিতে হয়। সহধর্মিণী আজ সহমর্মিণীতে রূপান্তরিত। তাই দেখা যায় খাবার টেবিলে যে স্ত্রী স্বামীকে পরিচর্য্যা ও যত্ন করে, তার শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখে—আবার কাজের টেবিলে সে তাকে বুদ্ধি ও পরামর্শ দেয়। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে বাড়িয়ে তোলে তার কর্মশক্তি। 'মেয়েছেলে আবার কাজের কথার মধ্যে কেন ?' আজকাল নিশ্চয়ই কোন আধুনিক শিক্ষিত ও উদার হৃদয় পুরুষ একথা স্বীকার করেন না।

তেমনি স্বামীর একলার আয়ে যদি সংসারের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের অভাব ঘটে তবে শিক্ষিতা স্ত্রী হাসিমুখে সে দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নেয়। এর জন্য তাকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয় কিন্তু তা নিয়ে সে এতটুকু অভিযোগ করেনা, অভিমান করেনা।

সবশেষে বলবো সমাজের প্রগতির সংগে সংগে বিয়ে করার স্বাধীনতা এবং বিয়ে না করার স্বাধীনতা প্রত্যেক মেয়ের থাকবে। বিয়ে না করলেই

জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল এমন একটা সংস্কার বদ্ধ ধারণা থেকে সমাজের প্রতিটি মানুষকে মুক্তি পেতে হবে। কারণ জীবনের সবক্ষেত্রেই একথা মনে রাখতে হবে যে বিয়ের চেয়ে জীবনটা অনেক বড়। আর বিয়েটাকে জীবনের অতি সাধারণ একটা ঘটনা বলে মনে করতে হবে। এ হল যৌন জীবন চরিতার্থে সমাজ রক্ষার উপায়মাত্র। আমাদের এই সমস্যা বহুল অতি বাস্তব এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পৃথিবীতে তা নিয়ে এত রোমান্স এত কাব্য আর প্রলাপের বোধহয় প্রয়োজন নেই—তার ওপর বিয়ে মানেই শাস্ত্রাচার লোকাচার এবং দেশাচারানুযায়ী হাজার রকমের প্রথা তো আছেই। বিয়ের বরকনে যেন মিউজিয়ামের দর্শণীয় বস্তু—আজকের পৃথিবীতে কি এসব কিছুর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই ?

বর্তমান সমাজজীবন ও মেয়েরা

মালতী দাস

অনুকরণ করার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত ধর্ম। একে অন্যেকে দেখে অনেক কিছু শেখে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন সমষ্টিগতভাবেও এই অনুকরণ চলে। কিন্তু এই অনুকরণ সব সময় শুভফলপ্রসূ হয়না। বর্তমান অবস্থায় বাঙ্গালীর নৈতিক তথা সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। বাংলার সমাজ জীবন আজ অস্থির অশান্ত। এই অস্থিরতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে যেগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মধ্যে প্রধানত আজকের চরম দুর্দশাগ্রস্থ অর্থনৈতিক অবস্থা। তার ওপর রাজনৈতিক দলাদলি, বেকার সমস্যা, দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি তো আছেই। এগুলো আজকের মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। কিন্তু সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পরার মূলে শুধু এগুলোই নয়।

সমাজ জীবনে মেয়েদের ভূমিকা অনেক। অতীতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে। আগের দিনে শিক্ষার প্রসারতা এত ছিলনা তথাপি মেয়েদের প্রভাব সমাজের ওপর ছিল অনেক। বর্তমান যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতিকে অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্যের ভাবধারা বর্তমান সমাজে অনেক বিবর্তন এনে দিয়েছে এটা অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্যের ভাবধারা অনুকরণ করতে গিয়ে আজকের দিনে মেয়েরা যেপথে এগিয়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সমাজ জীবনের রূপটা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। স্কুল কলেজের শিক্ষার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে মেয়েরা অতিমাত্রায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ছাড়পত্র পেয়েছে। অপরিণত বয়স অপক্ক বুদ্ধি তাদের ভুল পথে চালিত করছে। অভিভাবকের শাসন, গুরুজনের নিষেধাজ্ঞা আজ অবান্তর। এক কথায় এর সমাধান শুনতে পাওয়া যায়—যুগ পাল্টে গেছে, যুগ পাল্টে যাচ্ছে! চারিদিকে নূতনের সমারোহ। অতীত কালের গর্ভে বিলীন। সুতরাং অতীতের দৃষ্টান্ত যতই উজ্জ্বল মহিমান্বিত হোক না তাকে অনুসরণ করা যায় না। এই ধরণের মতামত প্রায়ই শোনা যায়।

অপরদিকে এই বিভ্রান্তির মূল উৎস নানা ধরণের অপপ্রচার। শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটী, সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য ইত্যাদি। সিনেমা জগত আজকাল সংক্রামক ব্যাধির মতই ছড়িয়ে পরছে। বিশেষ করে হিন্দি সিনেমা—আজকাল হিন্দি সিনেমার বাজার জমজমাট। হিন্দি সিনেমার আকর্ষণ বাংলা সিনেমা অপেক্ষা অনেক বেশী। নানা ধরণের দৃশ্যাবলি যেগুলোর বেশীরভাগই যৌন আবেদনে ভরা। আর প্রচারের জন্যে রাস্তাঘাটে বড় বড় পোষ্টারে তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। সেখানেও মেয়েদের ভীড়। কম বয়সী মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি তত দৃঢ় নয় বলে লোভের এই হাতছানি তারা এড়াতে পারেনা। এর প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পায়না। মুষ্টিমেয় কিছু মেয়ের কথা বাদ দিলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের চালচলন আজকাল ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এটা অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান অবস্থায় প্রতিটি পরিবারই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রায় প্রতিটি পরিবারেই সিনেমা থিয়েটার রেষ্টুরেণ্ট ইত্যাদির পেছনে একটা টাকার অঙ্ক বরাদ্দ থাকে। সহজপথে না হলেও ছলে বলে কৌশলে ছেলেদের মত মেয়েদেরও আজকাল এটা প্রয়োজন। আর বেশীর ভাগ মা বাবাই এ দাবী মেটাতে বাধ্য হচ্ছেন। নানাধরণের ফাংশন, পিকনিকে যাওয়ার ঝোঁকটাও বেড়ে গেছে। এগুলোর বেশীর ভাগই ছেলেদের সাথে অবাধে মেলামেশার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা হয়। ফলে অনেকেই নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। অপরিণত বয়সে জেদের বশে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই ঠিক করে ফেলে। বলাবাহুল্য এর পরিণতি খুব কম ক্ষেত্রেই সুফল আনতে পারে।

আজকাল মেয়েদের সাজ পোশাকেও এসেছে যথেষ্ট পরিবর্তন। এই পরিবর্তন বহুক্ষেত্রেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। এখানেও রুচির বিকার লক্ষ্য করা যায়। এক-দিকে সাজ সজ্জায় চাকচিক্য—নামী ও দামী জিনিষের চাহিদা অপরদিকে নিজেদের বে আব্রু করে চলার একটা প্রতিযোগিতা চলছে। পরিবারিক জীবনে মেয়েদের ভূমিকাই প্রধান। বিশেষ করে বাঙ্গালী পরিবারে মেয়েদের দায়িত্ব অনেক। বিভিন্নরূপে তারা এ দায়িত্ব বহন করে এসেছে। স্নেহময়ী ভগিনী—সাধ্বী স্ত্রী, স্নেহেষু মাতা বিভিন্ন বয়সের প্রকার ভেদে মেয়েদের বিভিন্নরূপ। কিন্তু নানা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পরে যৌবনের প্রারম্ভেই মেয়েরা আজকাল ভুলপথে চালিত হচ্ছে। ফলে গোটা সমাজের চেহারাটাই দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

সীমাজ জীবন ক্ষয়, পঙ্গু। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম কিছু থাকে। সকলেই যে বিভ্রান্তির যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলী দিচ্ছে তা নয়। কিছু সংখ্যক এখনও লক্ষ্য স্থির রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলেছে। আধুনিকতার মোহাঞ্জন তাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তবে তাদের সংখ্যা নগন্য।

যুগ পাল্টে যাচ্ছে সত্যি কথা। অতীতের পুরোনো ধারা অনুযায়ী মেয়েরা ঘরে বসে থাকবে সেদিন আর নেই। শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীনদেশ শিক্ষা ও সভ্যতার পথে অনেক দূর এগিয়েছে। সভ্যতার সূর্য আজ মধ্যগগনে। তার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা সমাজের সর্বস্তরেই আলো বিকীরণ করে চলেছে। সমাজের অনেক কুসংস্কার লুপ্ত হয়েছে। মেয়েরা আজ স্কুল কলেজ, চাকুরী, খেলার মাঠ সর্বত্রই পুরুষের সাথে সমানতালে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু রন্ধ্রপথে অতি আধুনিকতার চোখ ধাঁধান আলেয়ার আলো প্রবেশ করে গোটা সমাজের ভিতটাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছে। এ আলো সত্যপথের দিশারী নয়। দুষ্টক্ষতের মত তা সুস্থ সমাজ জীবনকে গ্রাস করতে বসেছে। অনুকরণ করার মোহজাল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা আজ একান্ত প্রয়োজন। অতীতের আদর্শকে অনুকরণ করার প্রেরণা জাগাতে হবে।

গুরুজন স্থানীয়া মা ঠাকুমাদের জীবনযাত্রায় অনেক বাধা নিষেধ ছিল। নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি ছিল। অন্তঃপুরের মধ্যেই তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত ছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল কম। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাদের জীবনযাত্রায় ছিল নিষ্ঠা, সংযম, পবিত্রতা। পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যে তাদের অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হত। আজকের দিনে তাদের আদর্শ অনুসরণ করা একান্তভাবে দরকার। সিনেমা, থিয়েটার ছাড়াও নানা ধরণের পত্র পত্রিকা ও রেডিও মারফৎ কৌশলে যেসব যৌন আবেদনে ভর্তি অপপ্রচার অবাধে চলছে তা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সর্বোপরি প্রত্যেক পরিবারের মা বাবা অভিভাবক স্থানীয় যারা আছেন তাদের অধিক মাত্রায় সচেতন হওয়া দরকার। রাশ আলগা করে দিয়ে পরে হা হুতাশ করার চাইতে শক্ত হাতে লাগাম ধরতে হবে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। অন্যথায় উগ্র আধুনিকতার ঢেউ সুস্থ সমাজ জীবনকে সমূলে গ্রাস করবে। লুপ্ত হবে বাঙ্গালীর সুস্থ জীবনবোধ, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য।

বসন্ত অকাল

দেবারতি মিত্র

গাছটিকে পুরোপুরি গ্রাস করা এতই সহজ
রোদে ভূমিকম্পে ঝড়ে আমারও বাকল ক্ষয়ে গেছে
এতকাল পরে আর জোড়া লাগবে না ?
গাছ বেশি বেড়ে গেলে
তা থেকে কলম করা খুব শক্ত।
জোড়কলমের আশ্চর্য গাছ আর পৃথিবীকে
কি করে দেখাব
পান্থপাদপের ফুলে নদীকূল স্নিগ্ধ উচ্ছ্বসিত
ভাসে কাক জ্যোৎস্না, ঢেউ, হাঁস
মৃদু বাঁকা তরণীর মতো তেমনই তরল অতি লঘু
বিরুদ্ধ এ চরাচর পারাপার হয়।

কেন জন্ম নিয়েছি জগতে—
আজ প্রাণ ফেটে যায়!
মা না বলে মায়া মায়া কেঁদেছি কি
২১শে বিমর্ষ চৈত্র বসন্ত অকাল।
আমার মা জলজ্যান্ত নিজস্ব পুতুল দেখে
সুখ স্বপ্নে চোখ বুজেছেন।
আজন্ম অবধি তাঁর মেয়ের অজ্ঞাত মুগ্ধ ঘুম।
অশ্রুপাতে দৃষ্টির বিভ্রম
ছাড়া কোনো গভীর দর্শন প্রিয় নেই ;
অঘটন করে আমি
মানুষের ত্বকে ত্বকে সংযুক্তি ঘটাব।

লাইটার ফেলে গেছো

গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়

আমার টেবিলে—
লাইটার ফেলে গেছো—। তুমি বসেছিলে
ঘণ্টাখানেক হবে। আমাদের আলাপের রেশ,
এ্যাশট্রে বোঝাই হয়ে পড়ে আছে হয়ে তার ভগ্নাবশেষ।

জানি নিশ্চিত—
তোমার ও ফেলে যাওয়া রেখে গেছে কোন ইঙ্গিত ;
আমার মনের আলো জ্বালাবার একান্ত প্রয়াসে
মনে করে ভুলে গেছো। মনে ভাবো কেউ কি বোঝে না কি আশে ?

(এ ও হতে পারে,
মুখে দিয়ে সিগারেট তুমি বারে বারে—
এ পকেট ও পকেট লাইটার খুঁজে পরক্ষণে
মোড়ের দোকান থেকে দেশলাই কিনে নিলে বুঝি অন্যমনে।)

সে কথা থাকুক আজ—
এই ঘরে অন্ধকারে শুধুমাত্র ঘড়ির আওয়াজ,
এই ভেবে ভালো লাগে—তুমি যেন ভুলে যাওয়া ছলে—
আমার টেবিলে আজ লাইটার ফেলে রেখে দূরে গেছো চলে।

আত্ম পরিচিতি

জয়ন্তী সেন

নিজেকে চিনেছি বলে এতকাল
হেসে খেলে উৎক্রান্ত সময়—
পরিচিত সূর্যালোক দর্পণস্বচ্ছতা মেখে সুখে
বলেছে—নিজেকে চেনো এ কাচের মসৃণ প্রভায়।
বন্ধুর হৃদয় তার অতলান্ত অগাধ নদীর
পরিশুদ্ধ স্তব্ধতায় অবকীর্ণ ছায়াকে ডেকেছে
আনন্দিত নিমন্ত্রণে—বলেছে তোমার
হৃদয়ের অবয়ব এখানেই প্রতিবিম্ব করে
কতকাল ধরে আছি
চিনে নাও তোমার মানস।

আমিও নিশ্চিন্ত তৃপ্ত পরিচিতি ঘটে গেছে বলে
নিজের প্রতিমা দেখি ঘটে পটে অন্ধ অনুরাগে।

অথচ গোপনে আজো ভিতরের গায় অন্ধকারে
কে আমি আবহমান সঙ্গীহীন, আকণ্ঠ তৃষ্ণায়
পরিচিত হতে চায়, তবুও পারে না,
প্রকাশ বিহীন সেই আবরণ
উন্মোচিত করে
দেখাতে নিজস্ব মুখ, সুপ্রাচীন ভাস্কর্য্য মহিমা।

বীরভোগ্যা

মহাশ্বেতা দেবী

গাড়ীবারান্দাটার ঠিক নিচেই বসে থাকে ও, আজও বসেছিল। বাসস্টপের গায়েই ওর আস্তানা। চেয়ে চিন্তে, ভিক্ষে করে, ডাস্টবিন বা পথ থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে অনেক সম্পত্তি করে ফেলেছে ও। চিটধরা কাঁথা, ময়লা লেগে লেগে তেলচিটে মোলায়েম বালিশ, রবারের চটি, হাতলছেঁড়া প্লাস্টিকের বালতি ব্যাগ, টিনের কৌটো, একটা প্যাকিং বাক্স। ওই প্যাকিং বাক্সে ও কৌটোয় কৌটোয় ভিক্ষের চাল নুন, পচা আলু, গলা পেঁয়াজ, ফুটপাথ থেকে কুড়োন ডাল রাখে। রাখতেই হয় ওকে, কেননা ও অন্নপূর্ণা। ফুটপাথে যাদের ঘর, অথচ যাদের বাপ-মার বালাই নেই, সে রকম সাত আটটা ছেলে ওর ভরসায় বাঁচে।

অন্নপূর্ণার সবচেয়ে পছন্দ ওই বালিশটা বাসের। টাইমকিপার ছেলেটা রোজ নাক কুঁচকে বলে, 'বালিশটাকে তোর সঙ্গে বিদেয় করছি দাঁড়া! গন্ধে একেবারে বমি উঠে আসে।'

অন্নপূর্ণা গলিত দাঁত বের করে শনের নুড়ি কাঁপিয়ে হাসে। বলে, ক্যাওড়াতলায় যাব যখন বালিশটা মাথায় দে যাব।'

'ক্যাওড়াতলায় তোকে নিচ্ছে কে?'

'নিতেই হবে। তুই কেন নিবি? পুলিশ নেবে।'

পুলিশে খুব বিশ্বাস ওর। লেকবাজারের ফুটপাথে ধবধবির বাসিনী মরে গেল, পুলিশের গাড়ি নিয়ে গেল। সেবার লরি যাচ্ছে, চালের লরি, আর একটা ছ্যাঁদা দিয়ে বস্তা থেকে চাল পড়ছে। চাল পড়ছে, বাস আর গাড়িও আসছে। অন্নপূর্ণার সংসারের বাহাদুর ছেলে মটকা সেই চাল কুড়োচ্ছিল রাস্তা থেকে। বাস আসে, মটকা সরে আসে। বাস চলে যায়, মটকা হাত ঝাপটে চাল কুড়োয়। শেষে, কি নিয়তি, আরেকটা লরিই ওকে চাপা দিল।

পুলিশের গাড়ি মট্‌কাকেও নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের গাড়ি অন্নপূর্ণাকেও নেবে। তখন এই বালিশটা মাথায় দিয়ে দেবে ছেলেরা। বড় ভাল বালিশটা। সামনের বাড়ির বাবু মরে যেতে বিছানাপত্র সবাই রাস্তার ফেলে দিয়েছিল। আশ্চর্য নিয়ম! বাবু মরল হাসপাতালে, বিছানা হল অশুচি। বালিশটা অন্নপূর্ণা কুড়িয়ে এনেছিল। ময়লায়, ঘামে, কি সুন্দর আস্তরণ পড়েছে বালিশে। শুয়ে শুয়ে এক হাতে মাথার উকুন বাছে অন্নপূর্ণা, আরেক হাতের আঙুল বালিশে বোলায়। আর স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে লেকবাজারের দোকানীরা হঠাৎ স্বপ্নে দৈবাদেশ পেয়ে ওর ছেলেদের হাতে ঝুড়ি পচা কপিপাতা, মুলোশাক, আধপচা আলু, গলিত পেঁয়াজ, বাসি পোনামাছের পেটপচা নাড়িভুড়ি দিয়ে দিচ্ছে। অন্নপূর্ণা খিচুড়ির রান্না করছে।

মশলার দোকানের সামনের ফুটপাথ থেকে লঙ্কার বিচি, হলুদের টুকরো এনে অন্নপূর্ণা ক্যানেস্তারা টিনে রান্না চাপিয়েছে। ছেলেদের হাতে ভাঙা সানকি, টিন। ওদের মুখে হাসি, বিড়ি, নোংরা কথা। আজ ওরা পেটপুরে খাবে তাই লালুটা ডিগবাজি খাচ্ছে।

ঘুমের সময়ে ওকে আরো সুন্দর দেখায়। পলিত কেশ, গলিত দাঁত, লোল চামড়া, ঘোর কালো রং, কোমরে একটা সায়া, গায়ে একটা কানি, যেন জরতী বেশে অন্নপূর্ণা। আশপাশের ছেলেগুলোকে ও ভগবান হয়ে আগলে রেখেছে। তাই ওরা এমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

খুব নিশ্চিন্তে থাকে ওরা। বাসস্টপে যাত্রীদের কাছে পয়সা চায়, সকালে ড্যালাউসি! ড্যালাউসি! বলে অপিসের যাত্রীদের ট্যাক্সি দেখিয়ে দিয়ে পয়সা পায়, বাজার থেকে যা পায় কুড়িয়ে আনে, খায়। সুযোগ পেলেই চুরি করে।

কেউ বা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির নিচের কাচঢাকা তাক থেকে কি রেটে মিষ্টি আর দই বেরোচ্ছে দেখে, আর যারা খেয়ে বেরোয় তাদের কাছে এঁটো ভাঁড় চেয়ে নিয়ে চেটে খায়।

তারপর একসময়ে ওরা অন্নপূর্ণার সংসারে ফিরে আসে। পাঁঠার মলনাড়ি, পচা আলু, শাকপাতা, নুন দিয়েও একটা দুর্গন্ধ ঘ্যাঁট প্রত্যহ রান্না করে। তাই কাতাখানেক খেয়ে ওরা শুয়ে পড়ে।

ওই মাঝে মাঝে খবর আনে। 'আজ রান্না করবনি, চ, অমুক বাড়িতে ম্যারাপ বেঁধেছে।'

সে দিনগুলো সুখের দিন, উৎসবের দিন। কুকুর আর বেপাড়ায় ভিখিরিদের সঙ্গে মারামারি করে ডাস্টবিন থেকে কত কিছু যে পাওয়া যায়। এঁটো পাতা চেটে খেয়ে অন্নপূর্ণা সেদিন আর হাইড্রান্ট খুলে ঘোলাজলে হাত ধোয় না। খাবারের গন্ধমাখা এঁটো হাতটা বালিশে বোলাতে থাকে শুয়ে শুয়ে। ফলে বালিশের চটচটে আস্তরণে আরো একটা আস্তরণ পড়ে। ও ভাবে, এই বেশ। আজ ভালমন্দ খেয়েছি, কাল হতে-য্যাখন শোব, ত্যাখন ভালমন্দের গন্ধ পাব। সবাই যে ডাস্টবিন থেকে খেতে পায়, তা পায়না। উলটো ফুটপাথের নুলো মাদ্রাজী ভিখিরি রামানা বলে, 'আমি কখনো পাই না কেন বল ত ?'

অন্নপূর্ণা তখন দুখানা ইঁটের ওপর কাগজ পেতে যুত করে বসে। বলে, 'তুই হাবা বলে পাস্‌ না। য্যামন পাতা ঝপ করে পড়চে, ত্যামন বাতাস হতে পাঁজা করে পাতা গুড়িয়ে নিয়ে নিবি। যদি পড়েই গেল, তখন তোরে কুকুর-টাকেও দিতে হবে, বেপাড়ার ক্যাঙালদেরকেও। তোর চে' ওদের জোর বেশি গায়ে, তাই নয় ?'

অন্নপূর্ণা বিড়ি ধরায়। বলে, 'হাবা কোথাকারে।'

নুলো রামানা বলে 'একদিন একটা বড় ভোজ খেতে হবে।'

অন্নপূর্ণা চিপটেন কেটে বলে 'বড় ভোজ! তুই হাবাটা ম্যারাপ দেখলে ভোজ বুঝিস না, তুই ভোজ খাবি!'

রামানা তখন বলে, 'আজ কিছু দিবি ?'

'দোব। অন্নপূর্ণার ঘরে অভাব কি ?'

অন্নপূর্ণা হাসে। টিন থেকে সযত্নে রামানাকে এক কৌটো খ্যাট তুলে দেয়। তারপর বলে 'আজ নে চারদিন হল।'

রামানা বলে 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হল!'

'তুই বলেছিলি!'

'এবার আনব। মহারাজা বিড়ি খাওয়াব দেখিস্।'

অন্নপূর্ণা প্রসন্ন হয়ে হাসে। ওর ফোকলা গহ্বরের হাসিতে বাসস্টপ আলো হয়ে যায়। কোঁচকানো কাঁধের চামড়া দেখে মনে হয় যেন গঙ্গার নরম মাটি দিয়ে কেঁচো চলে গিয়েছে তাই এমন কুঞ্চিত দাগ পড়েছে। সেই চামড়া ঢেকে শনের নুড়িগুলো দোলে। অন্নপূর্ণা ঘন ঘন বিড়ি খায়। বিড়ি বা সিগারেট অবধি ওর কাছে চাইলে পাওয়া যায়। বাসস্টপে ঘর বাঁধবার এই এক সুবিধে। হাবাগুলো আধখাওয়া সিগারেট ফেলে রেখে বাসে উঠে পড়ে। অন্নপূর্ণা যত্নে সেগুলো কুড়িয়ে রাখে।

কেউ ছোঁ মারতে আসে না। সবাই জানে কলকাতার থানা-কে-থানা, অঞ্চল-কে-অঞ্চল, ওয়ার্ড-কে-ওয়ার্ড, বড়রাস্তা, ফুটপাথ, গাড়িবারান্দা, ছোটরাস্তা, পার্ক, সব ভিখিরিরা নিলাম ডেকে কিনে নিয়েছে।

এক এক ভিখিরি, এক একটা জায়গা, আইনসঙ্গতভাবে অধিকার করে রেখেছে। অন্নপূর্ণা এই আটের-বি আর সাতচল্লিশ নম্বর বাসস্টপের গাড়ি বারান্দার স্বত্ব পেয়েছে। বাসস্টপে যত পোড়া বিড়ি সিগারেট পড়বে তাও স্বত্ব ও ভোগ করবে। এই কয়েকটা বাড়ি থেকে রাস্তায় যত জঞ্জাল পড়বে, তা থেকে ও কৌটা, রবারের ব্যাণ্ড, সিগারেটের কৌটা কুড়োবে। মাঝে মাঝে এখানে অন্য ফুটপাথের রামানা বা পিতাবিকে দেখা যেতে পারে। সে অন্নপূর্ণার ইচ্ছেতে। ওর অধিকারে কলকাতার যতটুকু আছে, ততটুকুতে ওর বিনানুমতিতে কোন ভিখিরির নাকের পোঁটা ফেলবারও অধিকার নেই। বহু বছর এখানকার স্বত্ব ভোগ করছে অন্নপূর্ণা, রামানা মাঝে মাঝে বলে, 'তোর পর আমি হেথা আসব।'

অন্নপূর্ণা ঘৃণায় তাচ্ছিল্যে হাসে। বলে 'ভারি মুরোদ তোর!'

কেননা ও বিশ্বাস করে বীরভোগ্যা ফুটপাথ। যে ভিখিরির হিম্মত আছে, সেই অন্নপূর্ণার জায়গা দখল করবে। অন্নপূর্ণা যখন থাকবে না, তখন ওর মত হিম্মৎদার লড়কু কোন ভিখিরি 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' লেখা কাগজ পেতে ক্যালেণ্ডারে মহান নেত্রীর ময়লা ছবি দেওয়ালে সেঁটে এখানে শুয়ে শুয়ে দুনিয়াকে জলি ফলি বলতে বলতে ঘুমোবে। নির্বীর্য, ভিতু, কেঁচোগুলো কিছু পাবে না। তারা পঞ্চাশের মন্বন্তরের পোকাগুলোর মত খাবি খেয়ে ফুটপাথে মরবে। বীর ও শৌর্যসম্পন্ন কানা, নুলো, ঘেয়ো এবং কুঠেরা কলকাতা নিলামে কিনে নেবে, ভোগ করবে। কলকাতা ভিখিরিদের ছিল, আছে, থাকবে। এ দখল বীর্যবানের দখল।

আজ ওরা কেউ নেই। সবাই গেছে সাদার্ন অ্যাভিনিউ। এক হবু মন্ত্রী মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। ও বাড়ির সামনের ফুটপাথের ভানু খবর দিয়ে গেল। বলে গেল 'বাহান্ন রকম জিনিস খাওয়াবে। পঁচিশ হাজার টাকার ম্যারাপ আর আলো হচ্ছে। তিন হাজার লোক খাবে। খুব খাবি সবাই। মদ আসছে দু গাড়ি। মদ খেলে বাবুরা খাবার খায় না।'

সবাই গিয়েছে। অন্নপূর্ণা যায়নি। শুনেই ও হেসেছে খলখলিয়ে। বলেছে 'যা! তোদের শিক্ষে হক। বাবুর বউ পেত্তাহ ন্যাটা মাছ কেনে বাজারে,

জন্যে পোনা কেনে না। যা তোরা!'

সবাই নেমন্তন্ন খেতে গেলে পরে আজ অন্নপূর্ণা নিজে বাজারে বেরোল। নিজে ও সব ঘাঁতঘোঁত জানে। ছেলেগুলো জানবে বলে নিজে যায় না। বাজারে গিয়ে ওরা শিখে নিক সব। ও কি চিরকাল থাকবে?

বাজার থেকে ও আলু পচা, গলা পেঁয়াজ, পাঁটা ও মুরগির মলনাড়ি, রেশনের দোকান ঝেঁটোন গমের দানা নিল। দোকান থেকে নুন চেয়ে নিল।

সযত্নে সব ও রাস্তায় হাইড্র্যান্টের জলে ধুয়ে নিল। তারপর কৌটো হাতড়ে এক খুঁচি চাল বের করল। সব যখন চাপিয়ে দিল, তখন চেনা, বুকজুড়োন দুর্গন্ধে চারদিক ভরে গেল।

অনেক রাতে ওরা সবাই ফিরে এল। কেউ পায়নি কিছু। অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকা গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। গোটা গোটা চপ, ফ্রাই, কাটলেট, মাংস, মাছ, রাজভোগ, সন্দেশ, আরো কত জিনিস ওরা আনল আর গাড়িতে ফেলল। ফুটপাথ আর ডাস্টবিন নোংরা করেনি। পুলিশ দাঁড়িয়ে গাড়ি পাস করাচ্ছিল, ভিখিরিদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

শুনে অন্নপূর্ণা হাসল। ও জানত এমনটা হবে। এরা জানত না। যাক, শিক্ষা হক। ওরা শিখুক।

সকলকে ঘ্যাট কৌটোয় কৌটোয় দিতে দিতে অন্নপূর্ণা জিগ্যেস করল, 'মুলোটা কোথা? মাদ্রাজী মুলোটা?

সে খেপে গিয়ে পুলিশকে ঢিল ছুঁড়ছিল। ম্যারাপে ঢিল মেরে বাতি ভাঙছিল। তা বাদে প্যাঁদানি খেয়ে নাক মুখ কেটে পথে বসে মুখ ধুচ্ছে। বাদে আসবে। ওঃ, আজ আবার টুপিটা মাথায় দিয়েছিল, তাতে পালক গোঁজা।

'মুলোটা?'

অন্নপূর্ণার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। গভীর চিন্তা ও ভাবনায় হৃদয় আলোড়িত হচ্ছে। তবে কি ওই মুলোটাকেই ও ফুটপাথের স্বত্বটা দিয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে ও কেড়ে নিতে পারবে? মনে হচ্ছে ওই একদিন মহান নেত্রীর ছবির নিচে ঘুমোবে?

ও বড় কৌটোটায় রামানার জন্যে বেশি করে ঘ্যাট সরিয়ে রাখল। রামানার শরীরে এখন শক্তি দরকার হবে। ফুটপাথ বীরভোগ্যা। রামানা বীর।

প্রভু আমার

নীলিমা সেনগঙ্গোপাধ্যায়

ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করতে যা দেরী—বেরোতে দেরী হয় না। লেস্‌লি উইলিয়ামস মস্ত চুল ঝাঁকিয়ে বলে—কি করব বস্! নাইজামের দোকান, বাগারস্ একটা রোল বানাতে দু ঘন্টা লাগিয়ে দিল। – বিফ্‌ রোল—একেবারে ফ্রেশ্‌! দুটো এনেছি—ওয়ান ফর ইউ। বিলিভ্‌ মি—আই সোয়ার অন্ জিসাজ্‌—এ্যাণ্ড ওয়ান ফর মি।"

"আমার জন্যে রোল না এনে সময় মত কাজে এলেই তো পার; পরপর দুদিন তোমার এ্যাটেণ্ডাস্ লেট্‌।"

—"ও. কে! আই ওন্ট বি লেট্‌ টুমরো—ছাট্‌ বাগার আমাকে ফাঁসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গলার সুরটা নামিয়ে বলে—ওয়েল বস্! তোমার মেয়ে কেমন আছে? ভাল তো? ভাল হবেই। রবিবার গির্জায় গিয়ে আমি মারিয়ার সামনে প্রে করেছিলাম। বিলিভ্‌ মি বস্—আমি মারিয়ার কথা শুনতে পেয়েছি। বলেছে – কম্প্লিট্‌লি কিওরড্‌ হবে উইদিন এ উইক।"

—"থ্যাঙ্ক ইউ লেস্‌লি! এখন কাজে যাও; তুমি অলরেডি লেট্‌।

এই ধরণের একটা সংলাপ প্রায় প্রাত্যহিকই হয় ডিউটি অফিসারের সঙ্গে লেস্‌লির।

ছেলেটা ফাঁকিবাজ; কিন্তু ওর সরল, আনন্দময় হৃদয়টাকে সকলেই তারিফ করে। সাজগোজ চমৎকার! অতি আধুনিক ছাঁটের প্যান্টের সঙ্গে কোমরে প্রকাণ্ড কোমরবন্ধ। মড্‌ শার্ট—বিচিত্র বর্ণের; কানের পাশ দিয়ে বড় বড় জুলফি নেমে এসেছে প্রায় চিবুক পর্যন্ত; ঝাঁকড়া চুল সব সময় অবিন্যস্ত। চোখগুলো জলজলে; গায়ের রং গোলাপী। বাংলা বলে অধিকাংশ সময়; রবীন্দ্র সঙ্গীত গুণ গুণ করে অহরহ। আত্মীয়স্বজন নাকি সবই ওর বিলিতি তাই বড়ো অহংকার। বাবা নেই; মা পুনরায় বিয়ে করে অষ্ট্রেলিয়ায় ঘর বেঁধেছেন। দাদা ক্যানাডায়। যে কোন মুহূর্তে লেসলি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ওদেশে চলে যেতে পারে।

ধর্মতলার আইরিশ বা ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের ইংলিশ অথবা বৌবাজারের স্কট্ ম্যান নয়—ওরা মুখেই লম্বা চওড়া বাক্য বলে—; সবাই চাল মারে ক্যানাডা কি অষ্ট্রেলিয়া হোমে চলে যাবে বলে! আরে যাওয়া কি সোজা? তবে লেসলি অমন চাল মারে না। ওর দাদা কিংবা মায়ের কাছে ইচ্ছে হলেই চলে যেতে পারে! কিন্তু ইণ্ডিয়া যদিও নোংরা তবু ইণ্ডিয়া ছেড়ে লেসলি যেতে পারে না; আফটার অল ও মনে প্রাণে ইণ্ডিয়ান।

খানদানী আত্মজনের মান রাখতে লেসলি মাসের প্রথম দিকে বড় বড় হোটেলে যায়—ভাল ভাল পোশাক কেনে—অজস্র ধার দেয়; সে ধার কখনও কেউ শোধ করে না। তারপর যতক্ষণ না টাকা ফুরোয় ততক্ষণ মদ খায়। তখন কাজকর্ম কিংবা ফ্যাক্টরীতে হাজিরা দেওয়ার কথা মনেই থাকে না।

অফিস আর কত সহ্য করবে? অতএব লেস্লির চাকরী গেল। সবারই মন খারাপ। দোষ ছিল বটে; ছেলেটার হৃদয়ও ছিল। একটা তাজা হৃদয়—একটা শিশুর উচ্ছলতা—অহেতুক হাসি—অবান্তর কথা, সমগ্র ফ্যাক্টরীটাকে জীবন্ত করে রাখত কতখানি—লেসলি চলে যাবার পর সকলে বুঝল।

তিনমাসের মাইনে এবং তার পরে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এর চমৎকার একটা অঙ্ক পেয়ে প্রথম ধাক্কায় ফ্যাক্টরী শুদ্ধ লোককে লেস্লি স্ন্যাক্স্ খাওয়ালো। যাকে যা ধার দেবার বেশ উদার হস্তেই দিয়ে দিল। তারপর পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে অহোরাত্র মদের আড্ডায় পড়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ আবিষ্কার করল সে এখন চালচুলোহীন পপার।

প্রথমে দিনকতক এখানে ওখানে চাকরী খুঁজলো। কোথাও শূন্য স্থান নেই বরং ছাটাই চলছে।

তারপর এ যাবৎকাল যাদের ধার দিয়েছে অসংখ্যবার অফুরন্ত সহানুভূতির সঙ্গে—তারা দরজা বন্ধ করল।

বন্ধু বান্ধবরা সভয়ে পলায়ন করল পাছে সে ধার চেয়ে বিব্রত করে। চাকরী নেই, শোধ দেবে কি করে?

বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত লেসলি পুরাতন ফ্যাক্টরীতে এসে কান্নাকাটি করতে লাগল। হোমরা চোমরা সাহেবরা দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

লেস্লিকে দেখা গেল উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিড় বিড় করে বকছে। কখনও টেগোরের গান গাইছে—প্রভু আমার প্রিয় আমার'—। নিজস্ব

যা কিছু ছিল বিক্রী হয়ে গেছে। না খেয়ে অসুখে পড়ল। এ্যাপার্টমেণ্ট হাউস থেকে দিল বার করে।

একদিন লেসলিকে ফ্যাক্টরীর কাছে মোড়ের মাথায় বসে থাকতে দেখা গেল; চুলগুলো খড়ের মতো—যত্নের জুল্‌ফি ঢেকে এখন দাড়ির আগাছা; গায়ের গোলাপী রং তামাটে। লেসলি একদিন একটা তাজা প্রাণ ছিল — এখন তার চেহারার মধ্যে লেসলি-নাম, লেসলি-প্রাণ কোথাও নেই।

'প্রভু আমার প্রিয় আমার' গাইতে গাইতে ওখানেই লেসলির মৃত্যু হলো।

চাকরী পেল না। ধার দেওয়া টাকা কেউ শোধ করতে এলো না। খানদানী বিলিতি হোম-নিবাসী আত্মীয় স্বজনরা কেউ দেখল না —পাদ্রী এসে ঈশ্বরের নাম করল না; দুনিয়ার লোক আহা বলল না। পথচারীরা একবার দেখে কেউ বা থম্‌কে দাঁড়ালো; ফ্যাক্টরী ওয়ার্কাররা আলোচনা করতে করতে যে যার ডিউটিতে চলে গেল।

ফ্যাক্টরীর ডিউটি অফিসার খবরটা শুনে নিশ্বাস ফেলে বললেন — 'দেখি ফোন করে খৃস্টান সংকার সমিতিকে, — যদিও তাঁর নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

লেসলির মৃতদেহ পড়ে রইল। দু চারটে পথের কুকুর আর কিছু মাছি সঙ্গ দিতে লাগল।

ঠিক সেই সময় ঈশ্বর যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে। হঠাৎ পায়ে ঠোক্কর লাগতে নীচু হয়ে দেখেন একটা তেইশ বছরের আত্মা—ফুলের মতো পবিত্র—জননীর স্নেহের মতো কোমল,—ভোরের শিশিরের মতো তাজা ঝকঝকে।

ঈশ্বর তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। চিনেছেন। ওঃ! বাংলা দেশের বেকার।

ফুলের মতো পবিত্র, জননীর স্নেহের মতো কোমল—ভোরের শিশিরের মতো তাজা আত্মাটাকে বিরক্ত হয়ে—লেসলির প্রভু — লেসলির প্রিয় ঈশ্বরও পুনরায় অবজ্ঞা ভরে রাস্তার ধুলোয় ফেলে রেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। বেকারের দিকে কে তাকাবে?

অভাগার স্বর্গ

সবিতা ঘোষ

ধরুন একটা মস্তবড় বিশ্ববিদ্যালয়। তার মস্ত সুন্দর কম্পাউণ্ড। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান, মাঠ। বড় বড় সুন্দর অট্টালিকা। সুখে লালিত ছেলে মেয়ে বছর বছর দলে দলে ডিগ্রী নিয়ে বেরোয়। তারপর জনারণ্যে মিসে যায়। ওপার এপার মাঝের তলার সমাজে ভীড় বাড়ায়। আবার তাদের সন্তান সন্ততি, একই পথ ধরে। অন্যদিকে নীচের তলার খবর? সেও সেই একই — 'ডাষ্টবিন' ঘিরে কলরব। কুকুরের মুখ থেকে কেড়ে খাওয়া। ফুটপাথে গড়াগড়ি! আশ্চর্য্য সৃষ্টি রক্ষার কারসাজি। মা ধুকছে মুমূর্ষু। তার ভেতর একটি তাজা প্রাণ। মা ধুলোর মধ্যে, কঠিন মাটির ওপর সুপুষ্ট ছেলের জন্ম দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এরাও বাড়ছে, সংখ্যায় বাড়ছে। চিহ্ন রেখে যেতে হবে না পৃথিবীতে?

যাক্, এ সব আমার আসল বক্তব্য নয়। এ পর্য্যন্ত পড়ে যেন মনে হচ্ছে বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা। যেন নকশাল গন্ধী ········ কিন্তু তা নয়। এ হল একটি সত্য চিত্রমাত্র। আপনি যেমন নিশ্চিন্তে আছেন থাকুন না। কোন ভয় নেই। উগ্রপন্থীরা যতই চ্যাচাক, এই আধমরা মুখ্যুদের কখনো দলে টানতে পারবেন ভেবেছেন? এই ভিখারীর দল, আপনার চাকচিক্য দেখে, আপনার মস্ত মটর গাড়ি দেখে আপনাকে দেবতার চেয়ে বেশী ভক্তি করে। ওরা ধরেই নিয়েছে গত জন্মের কোন পুণ্যের জোরে আপনার এই সৌভাগ্য। ভগবানের বিধানই এই। ওরা গেল জন্মে ঘোরতর পাপ করেছিল তাই এজন্মে এই দুর্ভোগ। সেজন্য সর্বদাই কুণ্ঠায় কেঁচো হয়ে থাকে।

আপনার গাড়ি যখন ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়ায়, তখন দেখেন না, ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসে হাত পেতে দাঁড়ায়? "রাজাবাবু, ভগবান আপনাদের আরো সুখে রাখবে। আপনি আমাদের মা, বাবা। একটি পয়সা দাও বাবা। ছেলেটা খিদেয় কাঁদছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।" বলে না? এরা কিন্তু আর যাই হোক ন্যাকামী; ভণ্ডামী জানে না। আপনাকে আন্তরিক আশীর্বাদই করে। আপনার ধন সম্পদ সম্ভ্রম জাগায়। সত্যিই ভাবে

আপনি এদের মা বাপ। আপনার মত দয়ালু লোকের কাছ থেকে সত্যিই তো দু পয়সা, এমন কি তিন পয়সার মুদ্রা পর্য্যন্ত পায়। আর তারই জোরে এখনো শ্বাস টেনে চলেছে। আপনিও তো পাষান নন সত্যিই। যদিও দেখছেন, লোকটা অন্ধও নয়, খঞ্জও নয়, দিব্যি খেটে খেতে পারে, তবু কানের কাছের ঘ্যানঘ্যানানি এড়াতে, অন্ততঃ দু একজনকেও রোজইতো এ রকম দু পয়সা তিন পয়সা দিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। আবার যদি সঙ্গে আপনার কোন কড়া নীতিবাগীশ বন্ধু থাকেন তিনি আপনাকে এই দানধ্যান থেকে বিরত করবেন। তিনি এ অনাচার সহ্য করবেন না। বলবেন — 'এত করে আপনার পুণ্যতো নয়ই পাপ বাড়ছে। ভিখিরিকে এভাবে আসকারা দিলে ভিখিরির সংখ্যা বেড়ে চলবে। সমস্যার সমাধান হবে না।

কোথা থেকে কোথায় এলাম। এ সব আমার বক্তব্য নয়।

এখন বিকেল। এই ধরুন সাড়ে চারটে আন্দাজ। বাইরে বেরোবার পোষাকে, আর্থাৎ ফর্সা ধুতি, পাঞ্জাবী, কাব্‌লী চপ্পল পায়ে গলিয়ে বাড়ির সামনে ইজি চেয়ারে বসে আছি। পাঁচটায় একটি অনুষ্ঠান আছে। সেখ নে যেতে হবে। লাল সুরকী ঢালা পায়ে চলার পথ দুপাশে মেহেদীর বেড়ার বাঁধনে এঁকে বেঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। ওপাশে ফটকের পাশে দেওয়ালের গা ঘেঁসেই একটা সুন্দর নতুন একতলা বড় বাড়ি উঠেছে—নাম 'সেবা ভবন'। আজ তারই দারোদ্‌ঘাটন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু এক ইংরেজ ভদ্রলোকের স্মৃতিরক্ষার্থে ভবনটি তৈরী হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী অতিথিদের জন্যে এটি হবে অতিথিশালা।

দূর থেকে ছাত্রছাত্রীদের কলরব শোনা যাচ্ছে। মেয়েরা ফুলের গোছা পাতার বোঝা নিয়ে সব ছুটোছুটি করছে। ছেলেরা চারমো নিয়ম, বাঁয়া তব্‌লা টানাটানি করছে। সব দেখছি। অপেক্ষা করছি। সময় দিয়েছে পাঁচটায়। এখনো আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নি। সুরু হতে হতে সাড়ে পাঁচটা।

হঠাৎ নজর পড়ল, একটি শীর্ণ আকৃতি, ঈষৎ নুয়ে, একদিকে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একজন এই দিকেই আসছে।

খলিল না? হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাছাড়া আর কার হাঁটা অমন হবে? কাছে আসতে দেখলাম, সবুজ চেককাটা লুঙ্গীটা, তলাকার পাড় টাড় সব

ছিঁড়ে গেছে। নীচের দিকে আধ হাতটাক ধুলোয় লাল হয়ে আছে। গায়ে একটা সাদা—মানে এককালে সাদা ছিল — অসম্ভব ঢলঢলে সার্ট, বোতাম একটাও নেই, বলাই বাহুল্য। আর তার একটা হাতা কাঁধ থেকেই টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছে। ঐ হাতটা বের করে না রাখলে খলিলের নাকি লাঠি গাছনা বাগিয়ে ধরতে অসুবিধে হয়। জামার অন্ত হাতাটা অবশ্য ঠিকই আছে। মাথায় একটি তেলচিট্‌-চিটে ন্যাকড়ার টুপি। মুসলমানরা যেমন পরে। তবে অতীতে তার কি রং ছিল বলা সম্ভব নয়। উপস্থিত তার কোন রং নেই, বর্ণহীন। মুখে মাসখানেকের জমান কাঁচা পাকা দাড়ি। সামনের ওপর পাটিতে একটা দাঁত আধখানা ভাঙ্গা। সব জুড়িয়ে খলিলের পাকানো ত্রিভঙ্গ মূর্তী দেখে তার বয়স আন্দাজ করা মুস্কিল। পঞ্চাশের এদিক ওদিক হবে বলাই নিরাপদ। কানে একটা বিড়ি গোঁজা। খালি পা। একহাতে লাঠি, অন্য হাতটায় একটা টাট্‌কা কেয়াফুল দড়ি দিয়ে ঝোলানো। এসে দাঁড়াতেই কেয়াফুলের সুগন্ধে জায়গাটা ভরে উঠল।

খলিল প্রতি মাসের প্রথম দিকটায় এসে আমার কাছ থেকে দুটি টাকা সাহায্য নিয়ে যায়। আমরা পুরনো অধ্যাপকরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করেছিলাম খলিলকে সকলে প্রতিমাসে দুটাকা করে সাহায্য করব। অধ্যক্ষমশায় অবশ্য পাঁচ টাকা দেন। তাছাড়া নিজেদের ছিঁড়ে যাওয়া ধুতি, পাজামা, জামা তারই প্রাপ্য। পুরনো ছাতা, পুরনো জুতো, গায়ের চাদর তাতেও সর্বাগ্রে তারই অধিকার। এইভাবে তার বেশ চলে যায়। ক্রোশ খানেক দূরে একটা কুঁড়ে বেঁধে সে থাকে। শোনা যায় দেশ বিভাগের পরেই সে দেশে, মানে পূর্ববঙ্গে তার মা, বৌ, ছেলেমেয়ে সবফেলে এখানে পালিয়ে এসেছে। কাপুরুষ! জীবন যুদ্ধে রণেভঙ্গ দিয়ে আত্মগোপন ক'রে আছে। তাদের কি করে চলে কে জানে? খলিলের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। বলতো সামান্য জমি জমা আছে, তাই থেকে তাদের চলে যায়। না খেয়ে মরবে না।

খলিল এক কালে রাজমিস্ত্রী ছিল। এখানকার অনেক বাড়ির ইঁটের গাঁথুনী খলিলের হাতের। তারপর একদিন ভারা থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙ্গে যায়। তারপর থেকেই এই অবস্থা।

এ হেন খলিলকে দেখেই মনে হল — এইতো সেদিন টাকা নিয়ে গেছে।

আজ তো মাসের মাত্র উনিশ তারিখ, আজই আবার কেন? নিশ্চয় কিছু চাইতেই এসেছে। মনটা একটু অপ্রসন্ন হল। ভাবলাম অভাবে স্বভাব নষ্ট। চাইতে, হাত পাততে আজ আর তার লজ্জা নেই। দাবী যেন! মনে পড়ল, বলেছিলাম — একটা বিছানার চাদর ধোপার বাড়ি গেছে, প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। সেটা ধুইয়ে এনে ওকে দেব। তারই খোঁজে এসেছে নিশ্চয়।

খলিল কাছে এসে বললে — বাবু, কেয়া ফুল নেবেন? একদম টাট্‌কা এক্ষুনি তুলে আনলাম। আমি উঠে ফুলটি নিতেই, খলিল সাবধান করে দিল — 'বাবু খুব সাবধানে ধরবেন, কাঁটা লাগবে।' ওকে পকেট থেকে বের করে একটি সিকি দিলাম। ও বললে — না, না। এটার দাম নেব না। এমনি দিলাম'। বললাম—"এই চার আনায় কি বা হবে তোমার! বিড়ি খেও। খলিল সিকিটা কানে গুঁজল। কুণ্ঠিত মুখে তখনো দাঁড়িয়ে রইল দেখে বললাম — 'আবার কি? সেই চাদর? ধোপাই আসে নি এখনো! আর আজতো মাসের উনিশ তারিখ'। সে বললে—'বাবু, আমারে একটা টাকা দ্যান। সামনের মাসে নয় কেটে নেবেন। মাজাটাতো ভাঙ্গা বাবু। মাজার জোর তো নেই। লাঠির ওপর ভর দিয়ে একদিকে বেঁকে বেঁকে হেঁটে প্রায়ই আমার বাঁ পায়ের কুঁচ্‌কিতে বিচি উঠে খুব ব্যথা হয়। এবারে খুব বেশী হয়েছে। গাঁয়ের হাকিমকে দেখালাম। সে বললে তেল পড়া দেবে। মালিশ করতে হবে। তা এক টাকা লাগবে। বাবু, আমার হাত শূণ্য। বাড়তি টাকায় ঘর ছাইলাম। বর্ষণ তো নামল বলে। বড় জল পড়তো। তখন তো জানতাম না……'
কি আর করি, একটা টাকা দিলাম। বললাম, 'খলিল তোমার বয়স কত?' বললে—'বাবু তার কি লেখাজোখা আছে, না হিসাব আছে? যখন স্বদেশী হল; সায়েবরা সব পাততাড়ি গোটালো, তখন আমার আর কতো বয়স? বড়জোর বছর কুড়ি বাইশ। আর এই স্বদেশী আমলের পঁচিশ বছর ধরেন। কত্তো হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি না? ধরেন ঐ রকম হবে আর কি। আচ্ছা বাবু, একটা কথা বলি। শুনলে তো আপনারা রাগ করেন। কিন্তু আমি বলি—সায়েবদের আমলেই আমরা ছিলাম ভাল। আপনাদের কথা জানি না। কিন্তু আমরা গরীব লোক, স্বদেশীর কিই বা বুঝি? কিন্তু সায়েবদের মন ছিল দরাজ। বাবু, আমি কিছুদিন রেসকা

চালিয়েছি। (খলিল পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসে এখানকার কিছু ভাষা রপ্ত করেছে। ফলে ঘটি বাঙাল মিশিয়ে খিচুড়ি ভাষায় কথা বলে।) তখন সায়েবরা দরদস্তুর করতো না। প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে, মুঠো করে টাকা নিয়ে দিয়ে দিত। জানেন বাবু, আমি পাঁচ সিকের জায়গায় পাঁচ টাকাও পেয়েছি। মিথ্যে বলব না। তবে যদি ধরো মদে চুর থাকতো, তো পয়সা চাইলে নির্দয় মার। কিন্তু সে দৈবাৎ। ভাগ্য মন্দ থাকলে তবেই। ...কি বাবু, অন্যায় বললাম?' — 'আচ্ছা খলিল, তুমি তো খোড়ো ঘরে একলা থাক। চাল দিয়ে জল পড়ে। ঘর বাড়ি তুলে, তোমায় বললে, আমার কাছে এসে এই পাকা কোঠায় থাকবে? রাত দিনের লোক হিসাবে আমার ঘরের কিছু কিছু কাজকর্ম করবে।' খলিল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত মুখ করে বলল — 'না বাবু। খাই না খাই, সেই খোড়ো ঘরে আমায় হুকুম করার কেউ নেই। পোড়া পেটের দুমুঠো জুটে গেলেই আমি নিজের মালিক। আমার তো এখনো আপনাদের আশীর্ব্বাদে কষ্টে সৃষ্টে দিন কেটে যাচ্ছে।' আমি বললাম — 'তবেই দেখ। খাই না খাই নিজেই নিজের মালিক হতে সবাই চায়। দেশটাও ঠিক তাই। ইংরেজ অনেক দিত। কিছু লোককে হয়তো এখনকার চেয়ে আরামেই রাখত। তবু দেশটাকে কানে ধরে দিন রাত্রি ওঠাত, বসাতো। এখন তা তো কেউ পারে না। আমরা খাই না খাই স্বাধীন। এ সব বোঝান বড় শক্ত। অবশ্য আমার অবস্থায় এসব কথা বলা সহজ। সত্যি না খেতে পেলে মনে মনে কি ভাবতাম কে জানে?

'বাবু, এখানে একটু বসব? আপনি কোথায় যাবেন মনে হচ্ছে।' — 'হ্যাঁ সভা আছে।'. — 'বাবু, ভেতরে কি হচ্ছে আজ? নিতাইবাবু, হরেনবাবু সব ঘোরাঘুরি করছেন?' বললাম — "সেবা ভবন" খোলা হবে আজ। তারই উৎসব। ঐ খানেই যাব। এখনো মিনিট দশেক বাকী আছে।' খলিল বললে— 'যাক্, এতোদিনে খুলছে তাহলে! বছর তিনেক তো তৈরী বাড়ী বন্ধ থেকে ছাতা পড়ে গেল! এতো দেরী কেন হল বাবু?' বললাম—'বাড়িটা সাধারণের অতিথি শালা হবে, না শুধু বিদেশীদের জন্যে আলাদা রাখা হবে এই নিয়ে কর্তাদের মধ্যে মতের তফাৎ হচ্ছিল।' — 'বাবু, ঐ বাড়ীর ছাদ তৈরী করতেই তো পড়ে গেলাম। আবদুল ভারার দড়ি ভালকরে বাঁধতে জানে না। কেমন

বেকায়দায় পড়েই জ্ঞান হারাই। পরদিন চোখ খুলতে দেখি হাসপাতালে পড়ে আছি। কোমর থেকে পা অবধি প্লাসটার! দশমাস রেখেছিল। আমার বড় ভাগ্যি বাবু এই গেরাষে ছিলাম, আর এই ইস্কুল না বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা কি বল তারই কাজ নিয়েছিলাম তাই বেঁচে গেলাম। আহা, এখানকার সবাই দেবতা! মাষ্টাররা সকলে আর সেই তখ-কার হেডমাস্টার যা করলে কি বলব। ডাক্তাররা একটি পয়সা নিলে না। খাও আর শুয়ে থাক। তখনো জানি না যে উঠে আর কাজ করতে পারব না। চিরটাকাল আপনাদের মত লোকেদের দয়ার অন্ন খেয়ে বাঁচতে হবে। হাসপাতাল থেকে যেদিন বেরোলাম, হেডমাষ্টার নিজে এসে আমায় নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ি তুললেন। সেখানে দুদিন থেকে চাঁপাডাঙ্গায় নিজের কুঁড়েয় যাই। মাষ্টারেরা চাঁদা করে একটা তক্তপোষ কিনে দিলেন। তখন শীতকাল, বলব কি, শীত বস্তর, নতুন কম্বল পর্য্যন্ত দিলেম। অধম্মো হবে বাবু যদি নিমকহারাম হই। কাজতো নেই-ই। হেডমাষ্টার দু মাসের টাকা হাতে দিয়ে বললেন 'খলিল রেঁধে বেড়ে খেয়ে দিন কাটাও তোমার খবর নেব। আইন আদালত করলে খোরপোষ বাবদ হয়তো কিছু মিলতে পারে, কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট করে কে বলো? আমার তো সময়ই নেই। তাছাড়া তাতে ঢাকের দায়ে মনষা বিকোবে। তার দরকার নেই। তুমিতো মার্টিনবার্ণের মত কোন বড় কোম্পানীতে কাজ করতে না। ছুটকো ভাড়া করা মিস্ত্রী। যখন হাটতে পারবে. আমি মাষ্টারদের বলে রেখেছি, চাঁদা করে তোমার খাইখরচ তুলে দেব। একটা তো পেট, তুমি চিন্তা কোরো না।' 'তা, সেই থেকে আজ বোধহয় বছর পাঁচেক হয়ে গেল বাবু আপনাদের আশীর্ব্বাদে শুকিয়ে তো মরি নি! কিন্তু আর যেন দিন কাটতে চায় না। আরো কতকাল বাঁচব কে জানে? বাবু, গোড়ায় গোড়ায় দশ বারোজন ছিলেন আপনারা। দু টাকা করে সাহায্যে বেশ চলে যেত। কিন্তু এদানী, পুরানোদের মধ্যে আপনারা চারজন মাত্তর। তাও ননীবাবু রিটার হলেন, সেখানে আর গিয়ে দাঁড়াতে মন চায় না। একদিন তো স্পষ্টই বললেন — 'এমন করে আর কতদিন চলবে খলিল! দেশে চলে যাওনা, জমিজমা আছে যখন।' বাবু নতুন বাবুরা একদিন ঘুরতে দেখে বলাবলি করছিলেন — এসব দাতব্য করায় তো জোরজুলুম চলে না। পুরানো যাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরাই দিন। আমাদের সুবিধে হলে ছেঁড়া জামাটা,

কাপড়টা, কি দু, চার আনা দেবো বইকি, তা বলে মাসে দু টাকা করে অসম্ভব। সে দিনকাল আর আছে কি? এখন বলে তাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না! বাবু, সত্যি বলি আপনাকে, এখন আমার মাসে দশ টাকাও হয় না। রঞ্জিতবাবু তো একবারে দেন না। তিন চারবার ঘোরান। গতমাসে টাকা পেলামই না। বললেন—এ মাসে মন্টুর অসুখে বড্ড খরচ হয়ে গেছে। আসলে কি জানেন–সব পুরনো লোক তো চলে যাচ্ছেন। নতুনদের কাছে এমনিতেই হাত পাততে লজ্জা করে। ভিক্ষে তো বাবু অগে কখনো করি নাই। মনকে বোঝাই ভিখিরী তো নই। বাবুরা চাঁদা দেন, ভিক্ষে নয়। এই আর কি!

খলিলের কাহিনী শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ভাবছি ইউরোপ আমেরিকার কথা। আমি ওসব দেশ সফর করে এসেছি। পাশ্চাত্যদেশে ব্যবস্থা আছে যারা এই ভাবে এ্যাক্সিডেন্টে হঠাৎ অকর্মন্য হয়ে পড়ে সরকার তার, এমন কি তার পরিবারের যাবজ্জীবন ভরণ পোষনের দায় দায়িত্ব নিয়ে থাকে। তারা সাধারণের দয়ার ওপর নির্ভর করে না। সব সভ্য দেশেই এই নিয়ম। আমরা স্বাধীন সত্যিই কিন্তু সভ্য কি?? এ বেচারী জানেও না, অন্য দেশে ওর মত লোক কত নিশ্চিন্তে থাকে। তবু তাদের তৃপ্তি নেই। মনে করে সমাজের কাছে তাদের আরো সুখ স্বাচ্ছন্দ পাওনা আছে। খলিল কিছু না পেয়েও তৃপ্ত, কৃতার্থ!! কোনটা মানুষের কাম্য? সুখ, স্বাচ্ছন্দ না তৃপ্তি,—হোক না সে তৃপ্তি অজ্ঞতাপ্রসূত!......

নিজের চিন্তায় ডুবে আছি। হঠাৎ কানে গেল—'বাবু, আপনি কি রাগ করলেন? আপনার দেরী হয়ে গেল। সভায় যাবেন না? ঐ শুনুন গান শুরু হয়ে গেছে। আমি উঠি বাবু। বড় উপকার হল টাকাটা পেয়ে। তাই তো বলি, আমার মত ভাগ্যবান কজন আছে?'

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। খলিল আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হাত ঘড়িতে দেখি ওর কথা শুনতে শুনতে কখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। সভায় যাবার উৎসাহ আর পেলাম না। অন্ধকারে বসেই রইলাম।

শাশ্বতী

গৌরী ঘোষ

অফিস থেকে ফেরার পথে একটি লেডিস স্পেসালে কোনমতে জায়গা পায় অনীতা। যেদিন পায় সেদিন ভাগ্য বলে মানে। সেদিন পায়না সেদিন অনেকটা পথ না হেঁটে উপায় থাকে না তার। সহযাত্রিনীদের আলাপে মুখর বাসটি দ্রুতবেগে চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে বালিগঞ্জের দিকে এগোতে থাকে।
— উনি ভাই এক একদিন আমার আগেই বাড়ী পৌঁছে যান। গিয়ে দেখব চা তৈরী করে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার ভাই খুব খারাপ লাগে। কোথায় আমারই শ্রান্ত স্বামীর সুখ সুবিধা দেখার কথা। তা নয় এমন চড়া বাজার যে ঘর সংস্কার সব মাথায় তুলে কি করে রোজ-গার বাড়ান যায় তার চেষ্টাতেই দিন কেটে যায়। একটু যে স্বামী ছেলেদের দেখা শুনা করব আমাদের স্বাধীন সরকার সে উপায় রাখেননি।
— ছেলে দুটো সারাদিন পর চারটের সময় বাড়ী ফেরে। বুড়ো ঝিটা যা দেয় তাই খেয়েই খেলতে চলে যায়। সারাদিন ঝিএর হাতে সংসার, দু'হাতে চুরি করছে। ছেলে দুটোর পড়াশুনার দিকে যে একটু নজর রাখব তা একটুও সময় পাইনা। ঘর সংসার ঐ রাত্রিটুকুই যা দেখি। তার মাঝে ওদের পড়াবার আর সময় কোথায় পাই বলুন?
কথাবার্তাগুলি কান দিয়ে শোনে অনীতা। দুঃখের সুর একটু বাজে বৈকি। কিন্তু সেই দুঃখের মেঘের মধ্যেও এক টুকরো সুখের আকাশ যেন তার নীল প্রশান্তির আভাস দিয়ে উকি মারতে থাকে। অনীতা অনুভব করে সহযাত্রিনীদের সকলেই যার যার সুখের নীড়ে ফিরে যাবে। সেখানে আছে তাদের স্বামীপুত্র কন্যা আছে আনন্দ আছে জীবন। কিন্তু তার নিজের? একটি ভদ্র পরিবারের গ্যারাজের উপরে দেড়তলা ঘরটা ভাড়া নিয়ে থাকে সে ইকমিক্ কুকারে রাঁধে। সকালে অফুরন্ত অবসর। কোন শিশু এসে তাকে বিরক্ত করে না। কোন মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বা শ্রান্তি দূর করার জন্য একটুকুও পরিশ্রম করতে হয়না তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকচিড়ে বেড়িয়ে আসে।

বাড়ী ফিরেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে সহযাত্রিনীদের মুখগুলো ভুলতে পারে না। তাদের কেন্দ্র করে এক একটা সুন্দর সুখের ছবি তার মনের গভীরে আঁকা হয়ে যায়। এতক্ষণে কেউ হয়তো তার স্বামীর সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছে। কোন শিশু তার মায়ের গলাটা জড়িয়ে বলছে— কাল আমার জন্যে একটা প্লেন এনে দিতে হবে মা।

ভাবতে ভাবতে অনীতা চলে যায় একুশ বছর আগের সেই দিন গুলোতে। গরীব ছাপোষা দাদার সংসারে অনাদরে অবহেলায় মানুষ সে। কিন্তু সে মনে মনে জানতো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর অমন সুশ্রী চেহারা হাজারে একটা মেলে না। কিন্তু রূপের জন্য গর্ব করার সাহস বা অবকাশ কোনটাই তার ছিল না। কিন্তু ভাগ্যদেবতা হঠাৎ সুপ্রসন্ন হলেন তার উপর। সে শুনতে পেল কিছু দূরের যে লাল রং এর দোতলা বাড়ীর মালিক নরেশ চ্যাটার্জ্জীর নাকি তাকে খুব পছন্দ। তিনি নিজে যেচেই সম্বন্ধ করেছেন তার মেজছেলের সঙ্গে। গরীব দাদাতো হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলেন। পাত্রপক্ষ থেকে দাবীর কথা ওঠেনি। বলেছেন সাধ্যমত দিলেই হবে। সেই সাধ্যটিকে লোকের কাছে কত কম ক'রে দেখান যায় তারই চিন্তায় রাত্রিটা কেটে যায় দাদাবৌদির। অনীতা যেন তার নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারেনা। ঐ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান বিদ্বান ছেলেটি স্বামী হবে তার? একান্ত আপন করে পাবে? আর সেই সঙ্গে ঐ ঝকঝকে আভিজাত্যের সেও হবে একজন অংশীদার?

ক্রমশঃ এগিয়ে আসে সেই বাঞ্ছিত দিনটি। সুখে আনন্দে তার হৃদয়পদ্ম যেন ফোটবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু বিয়ের আগের দিন খবর আসে পাত্র অর্থাৎ কিংশুকের জ্বর এসেছে। অজানা একটা ভয়ে কাঁপতে থাকে অনীতা। কিন্তু নরেশবাবু সে বাধা মানেন না। তাঁর এত আয়োজন সব নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবেন দু' একদিন বিশ্রাম নিলে আর ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।

আনন্দ কোলাহলের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল তার। শুভদৃষ্টির সময় ঈষৎ আরক্ত দুটি আয়ত চোখের দৃষ্টি তাকে যেন ভালবাসায় অভিষিক্ত করে দিল। বাসর পাকস্পর্শ কোন রকমে কেটে গেল। ফুলশয্যার রাত্রে কিংশুক আর চোখ মেলতে পারলো না। বেনারসী চন্দন গহনা আর ফুলে সজ্জিত অনীতা জ্বরতপ্ত স্বামীর মাথার কাছে পাথরের মত সারারাত বসে রইল।

কত কল্পনা, কত আশা তার ছিল এই রাতটিকে ঘিরে। সব আশা তার বিলীন হয়ে গেল।

তারপর সতেরটা দিন শুধু যমে মানুষে টানাটানি। সে তার অন্তরের সমস্ত মমত্বটুকু ঢেলে অক্লান্ত ভাবে স্বামীর সেবা করেছে। খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম সব ভুলে খালি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে — ঠাকুর আমার স্বামীকে ভাল করে দাও। আমার এই একুশ বছরের ছোট্ট জীবনের সব আশা আনন্দ নির্মূল করে দিওনা।

মনে পড়ে একদিন কিংশুক অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সকলের অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বলেছিলো—

— বিয়ের দিন থেকে কেবল তোমার সেবাই নিলাম। কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নই। ভাল হয়ে উঠি, তারপর সারাজীবন ধরে তোমার এই ঋণ পরিশোধ করব।

তারপর শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে তাকে কাছে টেনে তার ওষ্ঠে আদরের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলো। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা ঋণ পরিশোধ করার অবকাশ তাকে দিল না। বিয়ের সতের দিন পরে সকলের সব ঋণ মাথায় নিয়ে সে চলে গেল কোন অজানা লোকে। যেখান থেকে কেউ কোনদিন ঋণ পরিশোধ করতে পারে না।

প্রথম শোকের দুঃসহ বেগটা থিতিয়ে এলে অনীতা নিজের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করে যেন শিউরে উঠল। তার বৃদ্ধ স্নেহময় শ্বশুর তাকে ডেকে বললেন, — আমিই তোমার জীবনটা নষ্ট করলাম মা তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দিয়ে। তুমি তো বলতে গেলে কুমারীই আছ মা। আমাদের যা গেল তা গেল। কিন্তু তোমার ঐ ফুলের মতন জীবনটা আমি নষ্ট হতে দেব না। তুমি আমার মেয়ে। আমি আবার তোমার বিয়ে দেব।

অনীতা দৃঢ় গলায় বলেছিল

— তা হয় না বাবা। স্বামীসুখ আমার কপালে থাকলে আমার এই বয়সে এমন দুর্দ্দশা হত না। আপনি বরং আমার থাকার জন্য একটা ভাল জায়গার বন্দোবস্ত করে দিন। দাদার কাছে গিয়ে আর আমি বোঝা বাড়াতে চাই না।

নরেশবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। উচ্ছসিত ক্রন্দন কোনরকমে রোধ করে ধরা গলায় বললেন—ঠিক আছে মা তোমায় কোথাও যেতে হবে না।

তুমি এই বুড়ো ছেলের ভার নিয়ে আমার কাছে মেয়ের মত থাক। আমি জানব ভগবান আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে মেয়ে দিয়েছেন।

তারপর থেকে স্নেহময় শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহছায়ায় অনীতার দিন কেটে গেছে। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ রাত্রে ঘুম ভেঙে কিসের একটা ব্যথায় তার বুকটা মোচর দিয়ে উঠত। মাঝে মাঝে কোন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিতে অভিষিক্ত তার নবীন যৌবন থর থর করে কেঁপে উঠত। কিন্তু না কোন সময়ই সে নিজেকে প্রশ্রয় দেয়নি। কাজেকর্মে পড়াশুনায় সেতার বাজনায় নিজের একটি নিটোল জগত সে গড়ে তুলেছিল।

গোলমাল বাধল নরেশবাবুর মৃত্যুর পর। ভাসুর জায়ের স্নেহশীল সংসারে বেশিদিন টিঁকতে পারেনি সে। চলে এসেছে এখানে একটা অফিসে কেরানীর চাকরী নিয়ে।

আজ এতদিন পরে নিজেকে প্রশ্ন করে অনীতা, কি লাভ হল তার সতীত্বের মহিমায় মহিমান্বিতা হয়ে এতগুলো বছর নিঃসঙ্গ কাটিয়ে? সেদিন যে সে শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজী হয়নি সে কি স্বামীর প্রতি ভালবাসার আবেগে? কিংশুকের মুখটাই তার স্মৃতির আয়নায় ঝাপসা হয়ে গেছে। আজ চেষ্টা করেও তার কথা বিশেষ মনে পড়ে না। সতীত্ব, দেবীত্ব প্রশংসার উচ্ছ্বাস এই সব অলংকার দিয়ে নিজের জীবন প্রতিমাকে সে রঙেরূপে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কিন্তু দুঃখের ধারায় স্নাত হয়ে সে রঙ ও রূপ আজ ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে শুধু জীবনের খড়মাটি টুকুই অবশিষ্ট আছে। দেবী প্রতিমার মুখোস আজ সরে গেছে, অন্তরাল থেকে বেড়িয়ে এসেছে চিরন্তনী নারী, যে একটুখানি নীড়ের কাঙাল একটি ভালবাসার মানুষের সঙ্গ প্রত্যাশী। একটি শিশুর ছোট্ট দুটি বাহুবন্ধনের জন্য ব্যাকুল। শ্রীহীন রঙহীন অলংকারহীন তার এই বর্তমান জীবন প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বঞ্চিত ক্ষুব্ধ ব্যথিত হৃদয় হাহাকার করে ওঠে।

সুখের সাহারায়

মীরা দেবী

কোথায় যেন শাঁখ বেজে উঠলো।

বিয়ে বাড়ীর শাঁখ নয়। অন্নপ্রাশন কি কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেরও নয়। নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যার শাঁখ। সন্ধ্যা বন্দনা। সূর্য্যাস্তের শেষ আলোর রেশটুকু মিলিয়ে যাবার আগে এই শঙ্খধ্বনি। রঞ্জনার মন বরাবরই এই রকম সময়তে কেমন একটা উদাসীনতার অস্পষ্ট নেশার মত আবেশে বিষন্ন হয়ে ওঠে অথচ এই সময়টা ওর খুব প্রিয়। এ সময়টাতে ও একেবারে একলা থাকতে ভালবাসে আর মনটা চলে যায় কোন এক বিস্তির্ণ গেরুয়া নদীর ধারে। বাতাসে জলের গন্ধ মাটিতে সন্ধ্যার ছায়া। ও অবশ্য বেশীর ভাগই নিজের ঘরের পশ্চিমের জানলার গরাদ ধরে এই সময়টাতে দূরের দিকে চেয়ে থাকে উদ্দেশ্য-হীন। ওর মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটা শূন্য গহ্বরের মত নিঃসঙ্গ। আবার কথনও মনে হয় রূপ, রস গন্ধ সমস্তই একটা দারুণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় যেন থর থর করে কাঁপছে। রোজ রোজই এই অবস্থা হয় মনের, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। দূরাগত কোন স্মৃতির স্পর্শ এতে আছে কি? অনেকভাবে রঞ্জনা হবেও বা।

শহরের জটিলতা নেই। ব্যস্ততা নেই। এমনি এক শান্ত পরিবেশে ওর কৈশোরের কাল উত্তীর্ণ হয়েছিল। যৌবনের সদর দরজায় যখন সবে ওর পদক্ষেপ তখনই রঞ্জনার বাবা চাকরীর দাবীতে বদলী হয়ে এলেন বীরভূমের এই আধা শহরে। সিউড়ি পরের ষ্টেশনেই ওঁর কোয়াটার। জায়গাটা বড় ভাল লেগে গেল ভদ্রলোকের। শেষ পর্য্যন্ত ওখানেই অর্থাৎ ওখান থেকে মাইল ছয়েকের পথ পেরিয়ে একটা ডাংলা জমি কিনে ফেললেন। হয়তো ইচ্ছে ছিল এ শান্ত সরল জায়গাটুকুতে বাড়ী করে অবসর প্রাপ্ত জীবনের বাকী কটা দিন শান্তিতে কাটাবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হল না। বাড়ী করার অনেক আগেই তাকে বাড়ীর মায়া কাটাতে হল। রঞ্জনার দাদা তখন সংসারের দায়িত্ব নেবার মত সমর্থ হয়ে উঠেছে। রঞ্জনা এম, এ, পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। অরূপই এ ডাংলা জমিটার নামকরণ করেছিল শালবনী।

বীরভূমের মেয়ে কোলকাতায় পড়তে এসে রূপসী কোলকাতার ছলাকলায় মজে গেছে। বেশভূষায়, কথাবার্তায় কোলকাতার ছাপ বেশ প্রগাঢ় হল। ওর চাল-চলন হাব ভাবে সে কথা বুঝিয়ে দিত। রঞ্জনা থাকতো ওর এক কাকার বাড়ী। হষ্টেলে ছিল দিনকতক কিন্তু খোলামেলায় যে মেয়ে মানুষ হয়েছে তার হষ্টেলের নিয়ম কানুন ধাতে আর সইল না। কান্নাকাটি করে লোকাল গার্জেন ওর সেই কাকার বাড়ীতেই চলে এল। কাকারও নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। ছেলেপিলে নেই। রঞ্জনাকে পেয়ে স্বামী স্ত্রী বেশ খুশীই হলেন।

বলাবাহুল্য যথা নিয়মেই রঞ্জনার জীবনের তারগুলো একসময় সুরে সুরে বেজে উঠলো। অরূপ ছেলেটি রূপে গুণে সত্যিই অপরূপ। কোলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দা।

বেশীর ভাগ সময়েই সাজানো গোছানো পুতুল পুতুল মেয়েদের মিছিল দেখতেই সে বেশী অভ্যস্ত ছিল কারণ তার বাড়ীর আবহাওয়াটা তাকে সেই ভাবেই তৈরী করে তুলেছিল। রঞ্জনার অনাড়ম্বর সারল্য তাকে মুগ্ধ করেছিল, ইউনিভারসিটিতে অরূপ ছিল সবদিক দিয়ে সেরা ছেলে। কফি হাউসের মধ্যমণি। তাব অমন ভীতু ভীতু: সব কিছুতেই অবাক হয়ে যাওয়া বান্ধবীকে দেখে আর সব বন্ধু বান্ধবেরা বিস্মিত হল। ভাবল এটা বোধহয় অরূপের আর একটা স্টাণ্ট। কিন্তু গুজব শেষে বাস্তবে পরিণত হল।

অরূপ আর রঞ্জনাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল না। দুপক্ষের অভি-ভাবকরাই খুশী। এমন জাতে ধর্মে মিলে যাওয়া প্রায় দেখাই যায় না। অরূপের বোনেদের যেটুকু আপত্তি হয়েছিল সেটুকু পুষিয়ে গেল রঞ্জনার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের জোরে। জংলা জমিটাতে শেষ পর্যান্ত মেয়ের নামেই উইল করে দিয়েছিলেন ওর বাবা। বিয়ের পর ওরা হাসিমুখে আর কোথাও গেলনা। গেল সেই শালবনীর মাটির ঘরে। দিনকতক প্রদীপের আলোয় খড়ের চালের তলায় ওরা ওদের স্বপ্ন সার্থক করল। মাটির বাড়ী কিন্তু সাজানো ছিল শান্তিনিকেতনী কায়দায় কাজেই সংস্কৃতির পুরো ছাপ তাদের কাব্যিকে দিন-গুলোকে আরও চন্দময় করে তুলেছিল। সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে ওরা ভোরের মিষ্টি রোদ্দুর আর রাতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না উপভোগ করতো। কখনও রবীন্দ্রনাথ কখনও জীবনানন্দ কখনও বা মাইকেল থেকে আবৃত্তি সেই মাঠটাকে ভরিয়ে তুলতো। ওদের কাণ্ড দেখে মালী তো অবাক। নিজের দলের কাছে গল্প করার মত মুখরোচক খবর সরবরাহ করার সুযোগ পেয়ে

সে খুসী। কিন্তু কোলকাতার অভ্যাসগুলো যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো তখন শালবনীর কাছে বিদায় নিয়ে ওরা আবার চলে আসতো নগর জীবনে। কোলকাতাকে বেশী দিন ভাল লাগতনা রঞ্জনার। বিশেষ করে ওর ছুই ননদের সান্নিধ্য। আজও কোলকাতার আদব কায়দা ও পুরোপুরি রপ্ত করে নিতে পারেনি যদিও একদিন এই কোলকাতাই হয়ে উঠেছিল ওর কাছে স্বর্গ। কফি হাউসের বেশীর ভাগই মলাটের বিদ্যের কচকচানি, ওর অসহ্য লাগতো। পেপার ব্যাকের বইগুলোর পেছনের মলাটে যে জিস্টটুকু লেখা থাকতো তাই পড়েই অনেকে বাজীমাৎ করতো ও সেটা বুঝতে পারতো। কিন্তু কেন এই ছলনা ? রঞ্জনা চিরদিনই একটু গম্ভীর প্রকৃতির কিম্বা বলা যায় আত্মকেন্দ্রিক। সব কিছুর সংগে মানিয়ে নেবার মনও ছিল না ক্ষমতাও ছিল না। রঞ্জনা তাই ক্রমে ক্রমে ওদের সংসারে যেন একটা তালভঙ্গ ছন্দের মত বেখাপ্পা হয়েই রইল। ওরা ওকে নিয়ে খুসী হতে পারছেনা। উপরন্তু রঞ্জনার নির্বিকার উদাসীনতায় মাঝে মাঝে ওদের মনেও প্রশ্ন জাগছে। সত্যি কথা বলতে কি অরূপও আর যেন রঞ্জনার মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। এরই মধ্যে কি সব প্রসাধন মুছে গেল ? সব রহস্য কি জানা হয়ে গেল ? সব জানা হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষ নতুনত্বের সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু সে কায়দাটা জানা ছিল না রঞ্জনার তাই তার সান্নিধ্য ক্রমে নিরুত্তাপ হয়ে আসছিল অরূপের কাছে। ভালবাসার সম্পর্কগুলো এমনিই যে হয়ে ওঠে তা নয় সেগুলোকে তৈরী করে নিতে হয় আর যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হয় সেটাও তো একটা আর্ট। ইদানিং রঞ্জনা অরূপের জীবনে অনেকটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রঞ্জনা আঘাত পেতো কিন্তু কিছু করার ছিল না। অরূপ কেন আর তাকে নিয়ে খুসী হতে পারছেনা এই প্রশ্নটাকে তাকে অস্থির করে তুলতো কিন্তু সে অস্থিরতার কোন প্রকাশ ছিল না। রঞ্জনা যদি অরূপের পারিপার্শিকের সংগে একটু পরিচয় করে নিতে পারতো যদি অরূপকে অরূপের কেন্দ্রে রেখেই বুঝবার চেষ্টা করতো তাহলে হয়তো এভাবে শীতল কঠিন আস্তরণের দুপ্রান্তে দুজনকে অদৃশ্য হতে হতনা।

এর পর বৈচিত্র এল বৈকী! রঞ্জনা আর কিছু ভাবেনা। অবলম্বন সে পেয়ে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তার কোলে আসবে এক নতুন মানুষ। সেই ছোট্ট মানুষটির কল্পনাতেই সে নতুন করে তৈরী হয়ে উঠতে লাগল। সমস্ত সংসারটাতেই একটা খুসী উচ্ছলতার স্রোত বয়ে যেতে লাগল। সকলের মধ্যেই প্রস্তুতি চলতে লাগল নতুন মানুষটীর অভ্যর্থনার জন্য। রঞ্জনাকে এখন সকলেই যত্ন করে।

নার্সিং হোম। বেবিফুড রাবার ক্লথ। ফিডিং বটল। ডেটল ইত্যাদি এই সব করে দ্রুত কেটে গেল কটা দিন। ওরা বলেছিল ভাল আয়া রাখা হোক। রঞ্জনা রাজী হয়নি। ছেলের কাজ সে নিজেই করবে কিন্তু সে ইচ্ছে তার বজায় থাকল না। কঠিন অসুখে পড়ল রঞ্জনা। ছেলেকে স'রয়ে নিতে হল তার কাছ থেকে। তাকে নিয়ে গেল অরূপের দিদি। রঞ্জনা রইল অন্য নার্সিং হোমে। এইভাবে কেটে গেল প্রায় ছমাস। সেরে উঠলো রঞ্জনা কিন্তু ফিরে এল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললো। ছেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ভুলে গেল। এ অবস্থায় প্রায় দুবছর কেটে গেল। তার দাদা তাকে নিয়ে এল। ছেলে রইল পিসির কাছে। দাদা চিকিৎসার কসুর করেনি। কিন্তু অনেক সময় নিল রঞ্জনার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে। তারপর সেরে উঠে জানতে পারল তার সংসার, তার ছেলে, তার স্বামী অনেক দূরে চলে গেছে। মনের দিক থেকেও, বাইরে থেকেও। প্রথম প্রথম বছর খানেক যোগাযোগ ছিল। অরূপ আসতো কিন্তু রঞ্জনা তাকে চিনতে পারতনা। এরপর এল আর এক পর্ব।

কোর্ট-ঘর আইন আদালত তবু কিছু হলনা। ছেলেকে রঞ্জনার দাদা রঞ্জনার কাছে এনে দিতে পারল না। ওকে এখন থেকে চেষ্টা করতে হল অতীতকে ভুলে যাবার জন্য। ক্রমে ক্রমে রঞ্জনা সুস্থ হয়ে উঠলো জীবনের অনেক সৌরভ হারিয়ে।

লোক পরম্পরায় জানতে পারল অরূপরা আর কোলকাতায় নেই। অরূপ চলে গেছে সুদূর লণ্ডনের অখ্যাত এক গ্রামে। দুই বোনের হয়তো এতদিন বিয়ে হয়ে গেছে। কার সংগে কে জানে?

রঞ্জনা বীরভূমেরই একটা স্কুলে চাকরী করছে। দাদা বৌদির সংসারে সে অযত্নে নেই, বৌদি ভালইবাসে তাকে। সংসারে স্বচ্ছন্দ আছে হয়তো তাই শান্তিও আছে। কিন্তু সুখ? রঞ্জনা ভুলে গেছে সুখ কাকে বলে। অনেক-গুলো বছর পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘ আট বছর। আলাপ হল মৌলীনাথের সংগে ভদ্রলোক সবই জানেন। সহানুভূতির প্রলেপে রঞ্জনার পাথরের মত মনটাতেও যেন চন্দনের সুবাস উঠলো। পরিচয় ক্রমশঃ দাবী তৈরী করতে লাগল দুপক্ষেই কিন্তু রঞ্জনা পারলনা সেই দাবীকে স্বীকার করে নিতে। অরূপকে সে ক্ষমা করতে পারেনি কিন্তু মৌলীনাথের সংস্পর্শে এসে সে নতুন করে বুঝতে পারল যে অরূপকে সে ভুলে যেতে পারেনি। সে কথা মৌলীনাথ বুঝতে পারায়

পর থেকে ওদের সম্পর্কটাকে বন্ধুত্বের সীমারেখায় ধরে রাখতে পেরেছিলেন দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও ছ সাতটা বছর।

মৌলীনাথই একদিন খবর আনলেন অরূপ ব্যানার্জীর ছেলে অনিরুদ্ধ বিশ্বভারতীতে ভর্তি হয়েছে। মৌলীনাথ বিশ্বভারতীতেই চাকরী করেন। নতুন ছেলেদের প্রবেশ পত্রের আবেদন তাঁর হাতেই আসে তাতেই তিনি জানতে পেরেছেন যে এ ছেলে অরূপের। সে খবর শুনে রঞ্জনার পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হল না। বুকের মধ্যে তার অজস্র শব্দে হৃদপিণ্ড বুঝি ফেটে বেরিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেল ছেলেকে। দুহাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে নিতে চায় কিন্তু ছেলেতো তাকে চেনে না। সমস্ত শক্তি দিয়ে সংযত করল নিজেকে। এখনও কৈশোর কাটেনি। সেই মুখ। সেই চোখের তারা—সবাই বলতো "অরূপের ছেলে অরূপের মতই কটা চোখ পেয়েছে।" রোজই যায় রঞ্জনা অনিরুদ্ধকে দেখতে। অনিরুদ্ধ নামটা তো ওর দেওয়া নয়। ও তো ডাকতো রাজা বলে—"রাজাবাবু।" অরূপও বলতো রাজাবাবু। পিসি হয়তো নামকরণ করেছে অনিরুদ্ধ। নামটা তো ভালই। ওর খুব ইচ্ছে করে রাজাবাবু বলে ডাকতে কিন্তু সে কি ওর মনে আছে আর ?

রোজই যায় রঞ্জনা ছেলেকে দেখবার জন্য। দূর থেকে দেখে অনাস্বাদিত মাতৃত্বের তৃষ্ণা বুকে করে নিয়ে ফিরে আসে। অবশ্য মৌলীনাথ ভরসা দিয়েছেন ছেলেকে সে ফিরে পাবেই।

শান্তিনিকেতনে দোলের উৎসব। রঞ্জনা বসেছিল মাঠের এক ধারে। মৌলীনাথ অনিরুদ্ধকে সংগে করে নিয়ে এলেন। রঞ্জনার বুকের মধ্যে আবার সেই দ্রুততান। জিজ্ঞাসা কোরলো—

—কি নাম তোমার ?

বিস্মিত দুটি নীল চোখ মেলে উত্তর দিল

—অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী।

—কোথা থেকে এসেছ তুমি ?

—রানীগঞ্জ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর তবু রঞ্জনা থামেনা আলাপ করেই চলে।

—রানীগঞ্জেই কি বরাবর থেকেছ ?

—না, এক বছর হল এসেছি। আগে ছিলাম বাইরে ?

—বাইরে মানে ?

—লণ্ডনে।

—চলে এলে যে ?

—বাবার ভাল লাগল না ওখানে থাকতে। রানীগঞ্জে একটা খনির ম্যানেজার হয়ে চলে এলেন।

তোমার খারাপ লাগছে না ওখান থেকে এসে ?

—না :

—এখানে ভাল লাগছে ?

—এই এক রকম।

আশ্চর্য্য এইটুকু ছেলের এত উদাসীন কথাবার্তা কিন্তু অরূপ খনির ম্যানেজার হল কি করে ? তবে কি সে তার কোয়াটার একেবারে বদলে ফেলেছে !

জানো তোমার বাবা আর আমি একই সংগে পড়তাম।

—জানি মৌলীকাকা বলেছেন।

—আচ্ছা আগে তোমার কি যেন ডাক নাম ছিল ?

কি বলে ডাকতো সবাই ?

—কেন 'অনি'। আমায় তো সকলে অনি বলেই ডাকে।

কোথায় একটা মৃদু যন্ত্রণা খোঁচা দিয়ে গেল ওর মনে। ওর দেওয়া নামটাও মুছে ফেলেছে ওরা।

—বাড়ীতে কে আছেন ?

—বাবা আছেন। ছোট্ট একটা ভাই আছে।

—মা নেই ?

—না।

আর কোন সংশয় থাকেনা রঞ্জনার মনে। রঞ্জনা বললো

—তুমি অরূপের ছেলে। তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগল এবার যখন বাড়ী যাবে আমি যাব তোমার সংগে কেমন ? রানীগঞ্জে আমার এক বন্ধু আছে তার বাড়ী যাব তোমাদের বাড়ীতেও ঘুরে আসব কেমন ? অনিরুদ্ধ খুব নিস্পৃহ ভাবেই উত্তর দিল—যাবেন। দাদার অনুমতি নিয়ে রঞ্জনা রওনা হল কিন্তু অনিরুদ্ধর কথা জানাল না। মৌলীনাথকে আগেই বারণ করে দিয়েছিল না জানাতে। রঞ্জনা এতদিনে পরিপূর্ণ মাতৃত্বের আস্বাদে সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো। যদি বা জানলো অনিরুদ্ধ তার পরিচয়। কিন্তু আর নয়। যে সম্পর্ক একদিন আইনের

অনুশাসন না নিয়েই গড়ে উঠেছিল তা কি আইনের একটা খোঁচায় মিথ্যে হয়ে যেতে পারে? অরূপকে সর্বান্তকরণে ক্ষমা করেছে রঞ্জনা। অরূপকে বাদ দিয়ে তার জীবন কখনই পরিপূর্ণ হতে পারেনা। সে যখন গিয়ে দাঁড়াবে অরূপের সামনে ছেলের হাত ধরে তখন অরূপ কি বিস্ময়ে পুলকে অভিভূত হবে না? সে বলবে "অরূপ বুঝিয়ে দাও ছেলেকে আমি কে?" অরূপ কি তখনও নিশ্চুপ হয়ে থাকতে পারবে? অরূপ তো তার জন্য অপেক্ষা করেই আছে। আঘাত পেয়েই তো বিদেশে চলে গিয়েছিল সে।

ট্রেনটা একের পর এক ষ্টেশানে থেমে থেমে এগিয়ে চলেছে। রঞ্জনার বুকের স্পন্দন সেই অগ্রসরের সংগে তাল রাখতে পারছেনা। হাত পা যেন অবশ হয়ে আসছে। প্রায় ষোল বছর পরে অরূপের সংগে তার দেখা হবে। আচ্ছা অরূপ তাকে চিনতে পারবে তো?

চেহারায় কি খুবই বয়সের ছাপ পড়ে গেছে? বাড়ীটা ষ্টেশান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। এখন রঞ্জনার মনে হচ্ছে যত দেরীতে পৌঁছয় ততই বোধহয় ভাল। বুকের এই কাঁপনটা আগে থামুক।

—ঐ যে বাড়ী—নামুন।

—কে? অনি এসেছ?

—হ্যাঁ।

কে ইনি? দুজনেই দুজনের দিকে অপরিচয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। না, না, এতো অরূপ নয়। না, অরূপ নয়। সত্যিই অরূপ নয়। অনিরুদ্ধ আলাপ করিয়ে দিল।

—মৃগাংক সেন। আমার বাবা।

অনিরুদ্ধ জানতো রঞ্জনা এই আঘাতটা পাবে তাই বিমূঢ় রঞ্জনার হাত ধরে সে বললো—চলুন মাসীমা আমার ঘরে। অনিরুদ্ধ নিয়ে গেল রঞ্জনাকে নিজের ঘরে। কিন্তু আঘাতের গুরুত্বটা যে কতখানি, কত গভীর তা সে কোনদিনও জানতে পারল না।

—উনি আমার বাবা নন। আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী।

তোমার মা?

—গত বছর মারা গেছেন।

—তোমাব বাবা?

—বাবা অনেক দিন আগে মারা গেছেন। বাবার প্রথম স্ত্রী পাগল হয়ে যান তারপর তাঁর ছেলেটিও মারা যায়। বাবা তখন খুবই কাতর হয়ে পড়েন, অসুস্থ হন সেই সময় থেকে তখন আমার মা তাঁকে নার্সিং করতেন। মা হসপিটাল ছেড়ে দিলেন। বাবার সংগে বিয়ের পর তার একবছর পরে আমি জন্মালাম আর আমার দু বছর বয়সেই বাবা মারা গেলেন। আমার মা যখন খুবই বিব্রত তখন মৃগাংক কাকা মাকে খুবই সাহায্য করতেন। উনি মাকে বিয়ে করলেন বলেই আজ আমি বেঁচে থাকতে পেরেছি। কিন্তু মা থাকলেন না। গত বছর মারা গেলেন। অনিরুদ্ধ কি কথা থামিয়েছে? রঞ্জনা কিছু বুঝতে পারছে না। তবে অনিরুদ্ধ ওর কেউ নয়? তারও তো অমনি দুটি নীল চোখ ছিল। সোনালী চুল। ছোট্ট দুটি মুঠি তুলে যেভাবে তাকাত—অনিরুদ্ধর চোখের দৃষ্টিতে কি তার ছায়া নেই। মাঝখানের কটা বছর ভুলে গিয়েছিল রঞ্জনা কিন্তু ইদানিং ওর সব মনে পড়ে গিয়েছিল। এখন অসম্ভব অন্ধকার একটা স্মৃতির ঢেউয়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল রঞ্জনার সমগ্র অস্তিত্ব।
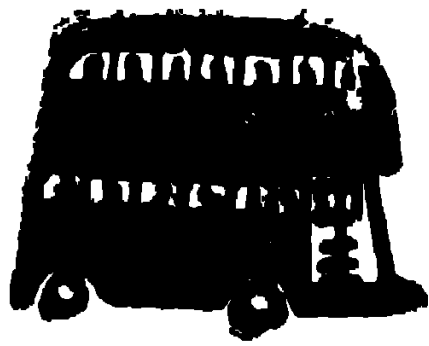
সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি

শোভারানী চৌধুরী

সে সব আজ বহুদিনের কথা। কিন্তু আজও সে সব দিনের স্মৃতি আমার মনকে আনন্দ দেয়। আজ শহরের জীবনে দেখি উৎসব আসে উল্লাস নিয়ে—কিন্তু সে উৎসবে উন্মত্ততা যতটা আছে প্রাণের গভীরের সুর ততখানি নেই। কিন্তু আমরা ছেলেবেলায় সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি উৎসবের অন্তরের সুরকে।

ঢাকার বুড়ী গঙ্গার ওপারে শুভাঢ্যা দারোগাবাড়ী ছিল আমার বাপের বাড়ী। বিরাট জমিদার বংশ, যেমন ছিল নামডাক তেমনি ছিল প্রতাপ। আর শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গেই নয়—শুনেছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতেও নাকি তাদের জমিদারী ছিল। বাড়ী কি? যেন সাতমহলা রাজপুরী! ঠাকুরদালান, দুর্গা মণ্ডপ, বাইর বাড়ী, ভেতরবাড়ী। ঝি, চাকর, ভূঁইমালী, ধোপা, নাপিত সবাই ছিল আমাদের প্রজা। এছাড়া ছিল শোলারমালী, ঢাকি, কুমারেরা। যেন একটি ছোটখাট রাজত্ব! এই রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমার বাবার ঠাকুর্দা ৺কমলাকান্ত রায়।

কমলাকান্ত রায়ের মা একবার ছেলের কাছে আবদার ধরলেন যে, তিনি পুরীতে রথযাত্রা দেখতে যাবেন। ছেলে বিপদে পড়লেন কারণ তখনও যাতায়াতের জন্য তেমন রেলপথ চালু হয়নি। কিন্তু পয়সা থাকলে কি না হয়? পুরীর রথের মতই বিরাট রথ তিনি তৈরী করিয়ে এবং সেই বছর থেকে নিষ্ঠা ও সমারোহ সহকারে রথযাত্রা উৎসব পালন করে মায়ের আবদার পূরণ করলেন।

বাড়ীর কাছেই এক আখড়াতে থাকতেন গোপীনাথ। সেখানে বারোমাস পূজো হত। রথের দিন তিনি দিব্যি সেজেগুজে নৌকো করে আসতেন। দুপুরবেলা ভোগ হত। আর বিকেলবেলা গোপীনাথকে রথে বসিয়ে মহাধুম-ধাম আলো ও বাজনা সহযোগে চলত রথটানা। সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ত রথের দড়িস্পর্শ করবার জন্য। বাড়ীর বড় মেয়ে বৌরা দোতলার

বৈঠকখানা থেকে তা দেখত। কিন্তু আমরা ছিলাম একেবারেই ছোটর দলে তাই এই উৎসবে যোগ দেবার অনুমতি আমাদের ছিল। রথের সংগে বিশেষ আকর্ষণ ছিল মেলা। বিরাট জায়গা জুড়ে মেলা বসত। কত রকমের মণ্ডা মিঠাই খাবার ও খেলনা মেলায় বিক্রয়ের সামগ্রী। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, কারণ আমরা যে জমিদার বাড়ীর মেয়ে তাই শতলোভ হলেও মণ্ডা মিঠাই কিনে খাবার উপায় ছিলনা আমাদের।

রথ হয়ে গেলে বেশ কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হত। তারপর একদিন ভোরবেলা উঠে দেখতাম শিউলি গাছগুলো ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে। বুঝতাম বছরের সেরা আনন্দের দিনগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দুর্গাপুজা এসে গেছে।

প্রায় মাসখানেক বাকী থাকতে আসত কুমার। আমাদের মণ্ডপেই চলত প্রতিমা গড়ার কাজ। আমরা ছোটরা চুপচাপ বসে বসে দেখতাম। বড় ভাল লাগত। প্রথমে কাঠামোটির উপর শণ ও সুতলী দিয়ে প্রতিমার একটা আকৃতি তৈরী করে নিত কুমারেরা। তারপর তুসমাটি—পরে নরম মাটির ওপর গোলা মাটি লাগিয়ে কাপড় দিয়ে মসৃণ করে নিত। সেটা শুকালে তার ওপর খড়িমাটি লাগিয়ে তার উপর লাগাত রং।

যতদিন এগিয়ে আসতো ততকাজ চলত দ্রুত গতিতে। আর সংগে চলত মধুর কণ্ঠের আগমনী গান। তেমন গান আজ আর শুনি না।

তারপর এক সময় পূজার আনন্দের প্রাথমিক পর্বশেষ হত। কুমাররা টাকা পয়সা নিয়ে বিদায় নিত। প্রতিমা মণ্ডপে তোলা হত।

পঞ্চমীর দিন ঘুম ভাঙত ঢাকিদের ঢাকের বাজনায়। এসে গেছে সেই চরম আনন্দের দিনগুলি। মনে হত এর প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দের। প্রতিটি মুহূর্ত সুন্দরতম ও পবিত্রতম।

সন্ধ্যেবেলায় বেলতলায় হত বেলবরণ, যাকে বলে বোধন। বিরাট বড় এক প্রদীপ সেদিন থেকে জ্বলত প্রতিমার সামনে। চারিদিকে ঝাড় লণ্ঠন, সামিয়ানা, বাজনা বাদ্যি, লোকজন হৈ চৈ—সে এক রাজকীয় সমারোহের ব্যাপার। সে আনন্দ সে সমারোহ আজকের ছেলেমেয়েরা উপলব্ধি করতে পারবে না। ঘুম ভাঙত ভোররাতে দেউড়ীর সানাইয়ের মধুর সুরে।

ঘুম থেকে উঠলেই স্নান সেরে নিয়ে নতুন জামা কাপড় পরতে হত। আর শুধু জামা কাপড়ই নয়—চুড়, চুড়ি, বালা, অনন্ত, হার, বাজুবন্ধ আরও কত কে

শাড়ী পরতে হত সেই বাচ্চা বয়সে। কারণ বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর মেয়ে যে আমরা।

পুজা মণ্ডপ গমগম্‌ করতো সারাদিন দুজন পুরোহিতের পূজা ও চণ্ডীপাঠে। পূজার প্রসাদ সাজাবার আলাদা লোক থাকত। তারা সারাক্ষণ উপোস করে কাজ করত—তাদের বলা হত মণ্ডপী।

অষ্টমী দিন ঠাকুর দালানে সারিসারি সাজানো বাদ্যগুলো বাজত—সেদিন মায়ের কাছে পাঠাবলি হত। শুনেছি আমাদের এই আড়াইশো বছরের পুরনো বাড়ীতে বহু আগে নাকি মহিষ বলিও হত। অষ্টমী দিন গ্রামের অনেক লোকের পাঁঠা মানত থাকত আমাদের প্রতিমার কাছে। অতএব তারাও বলি নিয়ে এসে হাজির হত। আর পূজোতে আনতই বহুলোক।

পাঁচদিন ধরে সমানভাবে আনন্দ—এছাড়া ছিল যাত্রা, থিয়েটার। কিন্তু কখন হঠাৎ বুঝি পেছনে ছোট্ট শিবঠাকুর বৌকে নেবার জন্য এসে দাঁড়াত—দশমীর প্রভাত বুঝি বড় তাড়াতাড়ি এসে যেত।

সকাল থেকেই মনের কোণে বাজত বেদনা বিধুর সুর। প্রতিমা দর্পণ বিসর্জন হয়ে গেলে আমাদের ছোট্ট প্রাণের আনন্দের সোনালী রেখাগুলি যেন সেই দর্পণের দিগন্তে হারিয়ে যেত।

বিকেলবেলা প্রায় একশ জন প্রজা মিলে প্রতিমা নৌকোয় তুলত। অবশ্য আজকাল আর এত লোক লাগে না। কারণ অতবড় প্রতিমাও আর আজকাল হয় না। নিয়ম ছিল আমাদের প্রতিমার নৌকো না গেলে অন্যকোন প্রতিমার নৌকো বুড়ী গঙ্গার ওপর দিয়ে যেতে পারবে না। বাড়ীর ছেলেরা যেত প্রতিমার নৌকোয়। আর মেয়েরা যেতেন কোষনৌকো করে।

রাতের অন্ধকারে আলো বাজনায় বুড়ী গঙ্গা দিনের মতন মুখর হয়ে উঠতো। সারা রাত ধরে বুড়ী গঙ্গার ওপর চলত সারিসারি নৌকোর শোভাযাত্রা। শেষ-রাতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে সবাই বাড়ী ফিরতেন। তারপর চলত শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ ও ভালবাসার বিনিময়। পুজোর শেষে বিজয়া উৎসব—দেবী ও গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে আবার চলত জীবনের পথপরিক্রমা। আজও তা চলে—কিন্তু শহরে আবহাওয়ায় তার রূপ, রস ও বর্ণই গেছে পালটে।

আমার দেখা শান্তিনিকেতন

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় তেরো বছর আগে শ্রীনিকেতনে বছর দুয়েক বসবাস করার সময় আমার শান্তিনিকেতনে যাবার প্রথম সুযোগ হয়েছিল। সেই প্রথম শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সৌভাগ্যবশতঃ সে বছরটি ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষ পূর্তি বছর। প্রথম বছরটি তাই নানা রকম উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমার খুবই আনন্দে কেটেছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী সারা বিশ্বে নানাভাবে পালিত হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের নিজের আদর্শে ও নিজের হাতে গড়া শান্তিনিকেতনে যে শতবার্ষিকী উৎসব বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই পালিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হবার আগে প্রথম যে উৎসবটি দেখার আমার সৌভাগ্য হয় সেটি হল ওখানকার "বসন্তোৎসব"। এমন সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ দোল উৎসব আগে কখনও দেখিনি। বলতে গেলে শান্তিনিকেতনের সমস্ত উৎসবের মধ্যে এই উৎসবটিই আমাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিল। প্রচণ্ড শীতের পর বসন্তের শুভাগমনে পারিপার্শিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও তৎকালীন আবহাওয়া মনকে স্বভাবতঃই উৎফুল্ল করে। প্রকৃতি দেবী যখন তাঁর সৌন্দর্য্যের ডালি উজাড় করে আমাদের দ্বারে উপস্থিত ঠিক সেই সময় এই উৎসবটি পালিত হয় বলে এটি আরও মনোরম রূপ ধারণ করে। সকালে সকল আশ্রমবাসীরা আম্রকুঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি মাঝখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সুন্দর আল্পনা করা ও সেখানে নানা রংয়ের ফাগ অনেকটা উঁচু পাহাড়ের মত করে সাজান রয়েছে। উৎসবের সূচনা হল শঙ্খধ্বনি দিয়ে ও তারপর দেখি দূর থেকে দু'সারী ছাত্র-ছাত্রী "ওরে গৃহবাসী" গানটি গাইতে গাইতে ও তার সঙ্গে নাচতে নাচতে ঐ নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর তারা নাচ শেষ হতে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। এরপর কিছু একক ও কিছু দ্বৈত নৃত্য পরিবেশিত হল। সবশেষে আবার "রঙে রঙে রাঙা হল" এই সমবেত সঙ্গীতের

সঙ্গে আবার সেই আগের ছাত্র-ছাত্রীরা এক সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করল ও নৃত্য শেষে নাচতে নাচতেই তারা নিজেদের মধ্যে ও দর্শক মণ্ডলীর দিকে ঐ সব নানা রঙের ফাগ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। মনে হল হঠাৎ যেন ফাগের ঝড় উঠেছে ও তাতে ঐ নৃত্যরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমরা সবাই ফাগ খেলায় মেতে গেছি। দেখলাম, শান্তিনিকেতনে দোল খেলা এই ফাগ খেলাতেই সীমিত—রঙীন জলে সেখানে কাউকে খেলতে দেখিনি। অবশ্য বোলপুরে পুরোদমে জল নিয়ে খেলা হয় ও যারা শুধু শুকনো ফাগ খেলায় তৃপ্ত হয় না তারা মনের খেদ মেটাতে চলে যায় বোলপুরে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমার শান্তিনিকেতনের দোল খেলার এই নূতন রূপটি খুবই ভাল লেগেছিল।

বসন্তোৎসবের আর একটি অঙ্গ হিসাবে সন্ধ্যায় কিছু আমোদ প্রমোদের আয়োজন থাকে। এখানেও শান্তিনিকেতন তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। আম্রকুঞ্জের মুক্ত প্রাঙ্গণে আম গাছের শাখায় শাখায় রঙীন উত্তরীয় বেঁধে মঞ্চ সজ্জা করা হয় আর ঐ গাছ তলাতেই নৃত্যনাট্য বা অন্যান্য আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা হয়। মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশে দোলপূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র আর সারা মাঠ জুড়ে সেই চাঁদের রূপোলী আলোকে চারদিক এমন এক মনোরম পরিবেশ রচনা করে যা প্রত্যক্ষ না করলে উপলব্ধি করা যায় না।

শতবার্ষিকী উৎসব রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব দিয়েই আরম্ভ হয়। জন্মোৎসব সাধারণতঃ শান্তিনিকেতনে নববর্ষের সময়ই পালন করা হয়। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমতঃ বৈশাখের আরম্ভেই বিশ্ব-ভারতীর গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হয়ে যায়, যার ফলে পঁচিশ শে বৈশাখে আশ্রমবাসীরা সংখ্যায় খুব কমই শান্তিনিকেতনে থাকেন; দ্বিতীয়তঃ ঐ সময় শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা খুব বেশী হয়। শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের ক্ষেত্রে অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল ও পঁচিশ শে বৈশাখেই জন্মোৎসব পালন করা হয়েছিল।

সারা বছর ধরেই সে বছর নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সাধারণতঃ পৌষ মাসে, পৌষ মেলার উৎসবের মধ্যেই বিশ্ব-ভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন হয়ে থাকত। তবে সে বছর বৈশাখ মাসে অর্থাৎ গুরুদেবের জন্মমাসেও একটি বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। তখন

বিশ্ব-ভারতীর আচার্য্য ছিলেন আমাদের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তিনি এই বিশেষ সমাবর্তনে কয়েকজন গুণী ব্যক্তিকে "দেশিকোত্তম" উপাধি প্রদান করেন। ঠিক কাকে কাকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছিল আজ তেরো বছর পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে করতে পারছি না। একমাত্র স্বর্গীয় শ্রীপ্রশান্ত-কুমার মহলানবীশ ছাড়া আর কারো নাম ঠিক এখন স্মরণে আসছে না। তবে আমার জীবনে এই প্রথম বিশ্ব-ভারতীর সমাবর্তন দেখার সুযোগ এল। আম্রকুঞ্জের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমাবর্তন উৎসবের সম্পূর্ণ এক অন্য রূপ দেখলাম। এমন সমাবর্তন দেখার সুযোগ আগে কখনও হয়নি, সেখানে বড়, ছোট কারো প্রবেশে বাধা নেই ও সবারই বসবার স্থান এক রকম অর্থাৎ ভূমিতে। কলকাতা বা অন্য কোথাও যখনই প্রধান মন্ত্রীকে দেখেছি এত বাধা ও দূরত্ব থেকে মাত্র এক ঝলক দেখার সুযোগ হয়েছে যে তাতে মন তৃপ্ত হয়নি; তাকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়েছে। অথচ সেই একই ব্যক্তিকে এখানে আচার্য্যরূপে যখন দেখলাম মনে হল তিনি আমাদের কত আপনার, কত কাছের মানুষ! শ্রীনেহরুও এমন সহজভাবে আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করে বক্তৃতা দিলেন যে মনে হল যেন তিনি ঘরের মানুষের মতই নিজের ঘরের লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। এখানেই শান্তিনিকেতনের বিশিষ্টতা। সেখানকার আকাশে, বাতাসে এমন গুণ আছে যার প্রভাবে সকলকে খুব সহজে আপন বলে মনে হয়।

শতবার্ষিকী উৎসবের একটি অনুষ্ঠান ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের "সঙ্গীত সম্মেলন"। সারা ভারতবর্ষের সকল নাম করা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের দেখার ও তাঁদের গান শোনার এমন সুবর্ণ সুযোগ সহজে জোটে না। এই সঙ্গীত সম্মেলন শান্তিনিকেতনের বিচিত্রা ভবনে তিন দিন ধরে হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে দুটি করে অধিবেশন হত; একটি সকাল থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয়টি বিকাল থেকে রাত দশটা, এগারোটা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যার অধিবেশনে নানা রকম ভারতীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান থাকত ও বলাবাহুল্য নানা কৃতি নৃত্য শিল্পীরা এই সব নৃত্য পরিবেশন করতেন। এই সঙ্গীত সম্মেলন চলা কালীন সকল আশ্রমবাসীর সে কি উৎসাহ! ঘুম না ভাঙতেই সকলে দলে দলে সবাই হাজির হতাম বিচিত্রাভবনে। দুপুরে বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে অল্প বিশ্রাম নিয়ে আবার ছুটতাম বিচিত্রা ভবন অভিমুখে। এছাড়া কয়েকটি সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনা চক্রের (Seminar) আয়োজন

করা হয়েছিল। অনেক জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের দেখার ও তাঁদের মুখে তাঁদের অভিমত জানার সুযোগ হয়েছিল এই সব আলোচনা চক্রের মাধ্যমে। শান্তিনিকেতনের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত উৎসব হল 'পৌষ-মেলা'। সকলেই জানেন এই উৎসবটি পৌষ মাসে পালিত হয়। সাতই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই 'পৌষ-মেলা' সাতই পৌষ আরম্ভ হয় ও তিন দিন নানা উৎসবের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। জন্মশতবার্ষিকীতে এই উৎসবটি আরও আড়ম্বরের সঙ্গে সাত দিন ধরে পালন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা ভাল যে এই বছর থেকেই প্রথম 'পৌষ-মেলা' উত্তরায়ণের মাঠের পরিবর্তে পূর্ব্বপল্লীর মাঠে স্থানান্তরিত করা হল। পূর্ব্বপল্লীর মাঠটি অপেক্ষাকৃত বড় তাই যাতে মেলাটি আরও ব্যাপকভাবে করা যায় সেজন্যই এ পরিবর্তন করা হয়েছিল। মেলা প্রাঙ্গনে অন্যান্য বারের মতই নানা রকম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে সেবারকার মত আতস-বাজির খেলা অন্য কোনবার দেখিনি। বাজি খেলা দেখার জন্য আশাতীত জনসমাগম হয়েছিল। খেলা আরম্ভ হবার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে মাঠে লোক জমায়েত আরম্ভ হয়েছিল। প্রতি বছরের মত দড়ি দিয়ে মাঠের বেশ খানিক জায়গায় বেষ্টিত করে রাখা হয়েছিল, বাজি খেলা দেখাবার জন্যে ও সেখানে জনতার প্রবেশ নিষেধ ছিল। দড়ির পাশে পাশেই স্বেচ্ছা সেবক দল কড়া পাহারায় ছিল যাতে কেউ না ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। পৌষ মেলার সময় প্রতি বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতের আগমন হয়। শতবার্ষিকী উৎসবের আকর্ষণে আমাদের বাড়ীতেও কিছু নিকট আত্মীয় স্বজন এসেছিলেন। তাঁদের সবাইকে নিয়ে বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ খানিক খেলা দেখার পর পিছন দিক থেকে জনতার প্রচণ্ড চাপ অনুভব করলাম ও তাঁদের চাপেই আমাদের সবাইকে বাধ্য হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হল। হঠাৎ ঐ রকম চাপের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলাম না আর এমনই প্রচণ্ড সে চাপ যে কে কোথায় ছিট্‌কে গেলাম তার ঠিক নেই। রাতের ঘন অন্ধকারে কাউকে খুঁজে পাওয়াও সহজ ছিল না। আমার সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা আমাদের ছাড়া শান্তিনিকেতনের কিছুই চিনতেন না। তাই তাদের ঐ ভিড়ে হারিয়ে ফেলে খুব অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। কি করে তাঁদের উদ্ধার করা যাবে এই ভাবনায় দিশাহারা লাগছিল। কিন্তু ছাত্র স্বেচ্ছা-সেবকদের প্রশংসা না করে পারি না; তাঁদেরই সাহায্যে আমার অতিথিরা ঠিক গন্তব্যস্থল খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটি মজার ঘটনা আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে। শতবার্ষিকীর নানা উৎসব দেখার জন্য সেবার বাইরে থেকে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। জনতার তত্ত্বাবধানে বিশ্ব-ভারতীর ছাত্ররাই স্বেচ্ছা সেবকের কাজ করেছিল। কোন একটি উৎসবের সময় শান্তিনিকেতনের বিচিত্রা-ভবন ও উত্তরায়ণের ভার পড়েছিল তৎকালীন রুরাল ইনষ্টিটিয়টের ছাত্রদের ওপর। আমার স্বামী রুরাল ইনষ্টিটিয়ুটে অধ্যাপনা করতেন। তাই সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গেই আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেবার জনসমাগম বেশী হওয়ায় বিশ্ব-ভারতী থেকে প্রত্যেকে কার্ড দেখিয়ে প্রবেশ করতে দেবার নিয়ম করা হয়েছিল। অর্থাৎ বিনা কার্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে একটি খুব মজার ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। সে বছরই প্রথম বিচিত্রা ভবনের উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধন সভায় ঢোকার মুখে বিশ্ব-ভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য বিজ্ঞানাচার্য্য স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিনা কার্ডে প্রবেশ করতে চাইলে একটি ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক তাঁকে বাধা দেয়। বলাবাহুল্য ছাত্রটি নবাগত ছিল এবং সে প্রাক্তন উপাচার্যাকে চিনত না। ছাত্রটি সত্যেনবাবুকে কার্ড দেখাতে বলায় তিনি স্পষ্ট বলেন 'আমি তোকে কার্ড দেখাব না, তুই কি করবি দেখি!' ছাত্রটি সোজা উত্তর দেয় 'আমিও তাহলে আপনাকে ঢুকতে দেব না।' হঠাৎ দূর থেকে বিশ্ব-ভারতীর এক অধ্যাপক প্রাক্তন উপাচার্য্যকে ঐ ছাত্রটির সঙ্গে কথায় লিপ্ত দেখে ব্যাপার কি দেখার জন্যে সেখানে ছুটে আসেন ও তখন ছাত্রটিকে সত্যেনবাবুর পরিচয় দেন। ছাত্রটি তথাপি অবিচলিত হয়ে বলে 'কিন্তু উনি যে বিনা কার্ডে ঢুকতে চেয়েছিলেন তাই ত ওঁকে ঢুকতে দিনি।' অগত্যা সত্যেনবাবু ও অধ্যাপকটি হেসে ফেলেন। তবে সত্যেনবাবু ছাত্রটির পিঠ চাপড়ে বলেন 'আমি তোর কর্ত্তব্যবোধ দেখে খুব খুশী হয়েছি। এতক্ষণ তোর পরীক্ষা নিচ্ছিলাম ও সে পরীক্ষায় তুই খুব ভালভাবে পাশ করেছিস।'

নানা উৎসবের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী বছরটি খুব হৈ হৈ করে বেশ আনন্দেই কেটেছিল। তবে আজ তেরো বছর বাদে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে এমন এক বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মশতবার্ষিকীতে শান্তিনিকেতনে এমন একটা কিছু করা হয়নি যা ভবিষ্যতে সকলকে ঐ বছরটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কালের স্রোতে মাত্র এই ক'বছরের মধ্যেই কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সে বছরটি। অন্যান্য বছরের তুলনায় এখন আর তার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

উঁচু মঞ্চের জন্য কান্না

কবিতা সিংহ

কান্না উঠছে উঁচু মঞ্চে দাঁড়াবার গভীর বাসনায়
কান্না ঘুরছে !
আমরা সব বিভিন্ন পর্যায়ে, আমরা নিজেদের
দাঁড়ানোর নিজস্ব স্থানের
লজিকের মধ্যে ঘূর্ণায়মান ।
মঞ্চ থেকে যতটা দূরত্ব বেশি ততটাই মঞ্চের বিরোধী
বাম আর ডান এভাবেই তৈরী হয়, আবার এভাবে
মেরু বদলের দায়ে বদলায় অস্তিত্বের নাম !
কান্না উঠছে !
লোভ ঘুরছে !
কখনো কখনো লোভ ক্রন্দনেরও ছদ্মবেশ নেয়
কখনো কখনো ঘৃণা, প্রসাধিত চাটুকারিতায়
কখনো কখনো কাম নিরূপায় কুণ্ডলী পাকায়
শরীরের উর্দ্ধ দিয়ে পদ্মচয় কুঁড়ি হয়ে থাকে চিরকাল
আত্মা ঘোরে বদ্ধ প্রেত উর্দ্ধস্খলিত
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কামে, গুহ্যে যোনিতে আর
অস্ত্রের ক্ষুধায়—
ক্বচিৎ কখনো কেউ সরে আসে দুঃখে উন্মিলিত
ভীড় ঠিক চলে যায় মঞ্চের নিকটে যায়
পার্থিব মৃত্যুতে ।

ইচ্ছা অনিচ্ছায় যুক্ত

হেনা হালদার

অভ্যস্ত অনিচ্ছা আর অনভ্যস্ত ইচ্ছার সঙ্গতে
হৃৎপিণ্ডের দোলাচল, ওঠা পড়া……
'প্রাণচায় চক্ষু না চায়' খেলার
লুকোচুরি।
জীবন এখন জতুগৃহের মত দাহ
অথচ অমৃত গন্ধী…
যেখানেই হাত রাখি ফোস্কা পড়ে যায়
চতুর্দিকে আগুনের চরকিবাজী,
বারুদের স্তূপ।
এখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে জলন্ত চিতায়
বসতে লোভ হয়…
চেতন-অচেতনের ওপর ভোরের গোধুলি আভাস
কখনো ক্লোরোফর্ম কখনো
স্মেলিং সল্ট।
সত্য আর অসত্যের মধ্যে ভয় আর ভালবাসাকে
আবিস্কার করে কখনো সাপের গালে
কখনো ব্যাঙের গালে চুমু খাই।
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জোড়া পায়ে
গড় করি।
এক চোখের আগুন, অন্য চোখের জলে
নিভোতে চাই।
আশীর্ব্বাদের ঝাঁপি খুলে অভিশাপ
ফণা তোলে।
ঈশ্বর আর শয়তান যেন এক অঙ্গে
সুন্দরী গুপ্তচরের মত নৃত্য করে।
আমি মদের বোতলে গঙ্গা জল পুরে
পবিত্রতার লেবেল লাগাই।

অভ্যাস অনিচ্ছা আর অনভ্যাস ইচ্ছার সঙ্গমে

হৃৎপিণ্ড অকস্মাৎ থমকে থাকে।

আমি জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তবু

মুক্ত হতে চাই।

৩

তোমাকে বলা হয় না

শ্যামা দে

সারাদিন আমার হৃদয়ের—

গোপনীয়তায়,

কত কথা জন্ম নেয়

আবার মরে যায়।

আমার সমস্ত কথা

একটি একটি ফুলে মালা গাঁথার—

মতো করে,

তোমাকে বলতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু, যখন দেখি,

ঘরে ঘরে হাহাকার,

রাজপথে কেবলই মিছিল

আর অত্যাচার,

আর যখন শতাব্দীর

বুক ফাটা কান্না আমার

হৃদয়কে তোলপাড় করে

তখন, আমার সেই কবিতার মতো

কথাগুলো মরে যায়।

শূন্য মন অপূর্ণ নয়

সুতপা চক্রবর্ত্তী

শূন্য মন অপূর্ণ নয় এ সত্য জেনেও
নিরবধি বিশীর্ণ বুকের পাঁজরে
অতৃপ্তির ধুনী জেলে
নিজেকে নিয়ত দগ্ধ করা—
আত্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শূন্য মনের সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট করা
আত্মহননেরই সামিল।
কেন না, কোন পাত্রই রিক্ত নয়
কোন মন শূন্য নয়
শূন্যতা নির্বোধ নির্জ্জন এক অনুভূতি শুধু।

তাই শূন্যতার শিকার বন্দী মনে
যখন প্রচণ্ড সংবেদনশীলতা জন্ম নেয়—
বন্ধ্যাত্ব তখনই যায় ঘুচে,
সৃষ্টির জারকে সঞ্জীবিত জীবনের পুণ্য তপোবন
ভ'রে যায় কবিতার পুণ্য আস্বাদনে।

বেঁচে থাকার জন্যে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

কাজের পরে কাজ, তারপরে কাজ, তার পরেও-
এর নাম কর্তব্য।
অথচ কর্তব্যের পরেও কিছু থেকে যায় সংসারে
সে উদ্‌বৃত্তের নাম যাই হোক
বেঁচে থাকার জন্যে সেটুকুই সম্বল
যেমন, অন্ধের হাতে তার শিশুপুত্রটি।

স্মৃতি আমার সোনার ফসল

সুচেতা মিত্র

স্মৃতি আমার সোনার ফসল একদা কোন্ ভরা দিনের
স্মৃতি আমার সঞ্চয়ে তাই নেশার মতো জড়িয়ে ছিলে
একটু করে শূন্য ভাঁড়ার কখন যে সব বাড়-বাড়ন্ত
স্মৃতি এখন প্রতারণা আমার সঙ্গে খেলায় মাতে।

নতুন ফসল তোলার বেলা কোথায় মড়াই খুঁজতে যাব
চালচুলো নেই উড়নচণ্ডী দিনে এখন খেই হারানো
উপোস-করা মেজাজ নিয়ে শূন্য ভাঁড়ার হাতড়ানো ফের

স্মৃতি এখন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মাতে।

জিজ্ঞাসা না করাই ভালো

মলয়া ধর

মেয়েদের বয়স ?—ভুলেও জিজ্ঞাসা করবেন না। এতে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে, বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। মেয়েরা সাধারণতঃ সঠিক বয়স বলতে নারাজ। কিন্তু তারাই সবচেয়ে আগ্রহী তার পরিচিতার বয়স জানতে। আন্দাজ করে নিন্ ক্ষতি নেই, কিন্তু সাবধান, বয়স জিজ্ঞাসা করে বিপদ ডেকে আনবেন না। এ ব্যাপারটাকে অলিখিত গর্হিত কাজ বলে ধরে নিতে পারেন।

অমিতাদি একবার ঠিক এমনি এক বিপদে পড়েছিলেন সেদিন। সামনের বাড়ী নতুন প্রতিবেশিনী এলো সঙ্গে একটা বছর চারেকের বাচ্চা। ভদ্রমহিলার মুখখানি ভারি সুন্দর। আর হাসি ? বলতে দ্বিধা নেই হাসিটী দেখে তাকে এককথায় সুহাসিনী বলতে ইচ্ছা করে। দেখেই মেয়েটাকে ভালো লেগেছিলো অমিতাদির। তারপর আস্তে আস্তে বন্ধুত্বের বাঁধনেও বাঁধা পড়েছিলো দু'জনে। মেয়েটীর কাছে শুনেছিলো বি, এ পাশ করে মেয়েটী বিয়ে করেছে। অমিতাদির কৌতুহলী মন কথাটা শুনেই মনে মনে হিসাব করে নিলেন, তাহলে মেয়েটীর বয়স চব্বিশ অথবা পঁচিশ বছর হবে। দেখতে যদিও তারচেয়ে বয়স্কা। কিন্তু এতেও অমিতাদির মন তৃপ্ত হলো না। একদিন সরাসরি প্রশ্নটা করেই ফেললেন। মেয়েটী প্রস্তুত ছিলো না এমন প্রশ্নের জন্য, তবু মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললো 'একুশ'। বিস্মিত চোখে অমিতাদি বলে ওঠে মাত্র 'একুশ' ?

বান্ধবী বলে—জানোই তো ভাই আমার খুব ছোট্ট বয়সে বিয়ে হয়েছে।

অমিতাদি বলে—গ্রাজুয়েট হয়ে বিয়ে করেছিলে তো ?

বান্ধবীটি অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। ক্ষণিক থেমে ভেবে নিয়ে বলে—হ্যাঁ, মাত্র ষোল বছর বয়সে আমি বি, এ, পাশ করেছি। অমিতাদির বুঝতে বাকী থাকেনা যে, মেয়েটী বয়স কমাতে চাইছে। তাই সেদিন ঐ প্রসঙ্গ আর বেশী দূর টেনে নিয়ে যেতে চায়নি অমিতাদি। তবে জেনে রাখুন, সেদিনের ঘটনা থেকেই ওদের বন্ধুত্বের বাঁধন শিথিল হয়ে গেছে।

প্রতিটী বছর বিদায়কালে নারীকে এক নতুন সৌন্দর্য্য দিয়ে যায় যা তাকে আরো রমণীয় করে তোলে। তবু নারীরা কেন বয়স কমাতে ভালবাসে? কেন প্রকৃত বয়স না বলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়? তারা বোধহয় জানেন না প্রকৃত বয়স বললে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই।

একদিন এক সভায় গিয়েছিলাম, দেখলাম এক ভদ্রমহিলা একটী মহিলাকে তার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। আমি ছিলাম দর্শকমাত্র। মেয়েটী উত্তর দিলো পঁয়ত্রিশ বছর। ভদ্রমহিলা জানায়—পঁ-য়-ত্রি-শ বছর? নারীটী এবার জিজ্ঞাসা করে—কেন আমাকে কি তারচেয়ে বড় মনে হয়? ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে জবাব দেয় 'তোমাকে তো দেখে মনে হয় কিছুতেই সাতাশ / আঠাশ বছরের বেশী নয়। আমার মনে হলো এক্ষেত্রে প্রকৃত বয়স বলে মেয়েটীর লাভই হয়েছে! বয়সের চেয়ে ছেলেমানুষ দেখতে একথাই তো সবাই শুনতে চায়, আর তার জন্যই তো মেয়েদের মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। যে মেয়ে এমন compliment পায় সেতো অন্যের কাছে ঈর্ষার পাত্রী তাই নয়? বিভিন্ন নারীর যেমন আলাদা সৌন্দর্য আছে তেমনি বিভিন্ন বয়সের একটা আলাদা মাধুর্য্য আছে। তাকে না লুকিয়ে দেহের মাঝে তার প্রকৃত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নারীদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এতে সহজ সরল রূপটি বিকৃত না হয়ে সুন্দরতর হয়ে ওঠে। কোন বর্ষীয়সী নারী যদি ছেলেমানুষ মেয়ের মত সাজেন বলুনতো তাতে কি তিনি সত্যিই ছেলেমানুষ হবেন, না সমালোচনার পাত্রী হবেন? প্রকৃত বয়স, সৌন্দর্য্যের সাথে সাথে সম্মানও বৃদ্ধি করে। এই সহজলভ্য সম্মানটুকুও নিশ্চয়ই অবহেলার জিনিষ নয়। অতএব প্রকৃত বয়স বলতে বাধা কোথায়? যদি ছেলেমানুষ দেখায় তাহলে compliment তো আছেই আর বয়স বেশী দেখালে সম্মানটুকুই উপরি লাভ ঠিক নয় কি?

শৈশবের চপলতা হয়তো হারিয়ে যায় কৈশোরের উচ্ছলতায়। প্রাণপ্রাচুর্যে-ভরা কিশোরী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে সমুখের পথে, শৈশবের চপলতার জন্য সেতো একটুকুও ব্যাকুল হয় না। ক্রমে আসে নারীর দেহে মনে যৌবনের জোয়ার। ফুটন্ত ফুলের মত সে পাপড়ি মেলে দেয়। ভরা নদীর মত সে দুকূল ছাপিয়ে ভরে ওঠে। তখন কি নারী আর ফিরে পেতে চায় তার ফেলে আসা শৈশব আর কৈশোরকে? আর যদিও বা ফিরে আসে

তবে কি তা যৌবনের সৌন্দর্য্যের চেয়েও রমণীয় হবে? যে বয়স চলে যাচ্ছে তারজন্য বেদনার কিছু নেই, কারণ পরে যে বয়স আসছে তাও অসুন্দর নয়। সে বয়সেরও আছে একটা আলাদা মাধুর্য্য, আছে আর এক পৃথক সৌন্দর্য্য। যৌবন বিদায় নিলে নারীরা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। হয় ব্যথিত। করুণসুরে হাহাকার করে ওঠে—'মরি হায় আমার বসন্তের দিন চলে যায়……।'

সেদিন রঙিন শাড়ীর আবরণে যৌবনের আঁচলে টান দেবার চেষ্টা হয়তো অনেকে করেন। এযুগে মেয়েরা আর কুড়ি পেরোলেই বুড়ী হয়না। যৌবনের মেয়াদ শাড়ী, ব্লাউজ আর কস্‌মেটিকসের সহায়তায় বেশ কিছু বেড়ে গেছে আধুনিককালে। শরীরের বাঁধুনি থাক্‌লে বেশ কিছুদিন যৌবনকে ধরে রাখা যায়। একদিন সেই জোরকরে ধরে রাখা যৌবন চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে, বার্দ্ধক্যকে বরণ করা ছাড়া কোন পথ থাকে না। অতএব সাজবার আগে আসুন আপনি, আমি সবাই একবার চেষ্টা করে দেখি—সাজসজ্জা আর শাড়ী নির্বাচন যেন আমাদের নির্ভুল হয়। আর বয়স বিচারের ভারটুকু না হয় অন্যদের হাতেই থাক্ কেমন?

মা

প্রতিমা গুপ্ত

"সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার
অতল অপার মাতৃ স্নেহ পারাবার"—

আজকাল এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবের দিনে বাংলাদেশ যখন কঠোর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তখন আমরা মায়েরা কি শুধু ঘরে বসে অশ্রু-বিসর্জ্জন করব ? আমাদের করণীয় কি কিছুই নাই? একটু শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য মায়েদের কি অবদান ও কি প্রয়াস ?

এই বিশাল সংগ্রাম ক্ষেত্রে আমরা শুধু নেপথ্যের দর্শক হয়েই রইলাম। মায়ের রক্ত, মাংসে সন্তান গড়া, তবে তাদের সারাজীবনই ত মায়ের সঙ্গে নিবিড় ভাবে বাঁধা—তাই মা যতদিন বেঁচে আছেন, তাঁর কর্ত্তব্যের শেষ নাই।

যে যুব সমাজের মধ্যে এ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তারা আমাদেরই স্নেহের সন্তান। মায়ের স্নেহে তারা বড় হল। কিন্তু মায়ের শিক্ষা বুঝি তারা ঠিকমত পেল না। এর কি কারণ একটু ভেবে দেখা দরকার। কোনও সমস্যারই সমাধান-এত সহজে হয়না তবুও সকলে মিলে চিন্তা করলে হয়ত সুফল পাওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক পরিবারের মা যদি নিজের সন্তানের কথা ভাবেন তবে বৃহত্তর পৃথিবীতে যুব সমাজের মঙ্গল সুনিশ্চিত। ফেলে আসা দিনগুলি কে পুরাণ বলে অবহেলা করি কিন্তু আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন যদি খুঁজতে চায় তবে অনেক নূতন কিছুই আমরা শিখতে পারি। পুরাতনীতেই আমাদের ঐতিহ্য লুকান আছে।

আজকাল প্রায় সব ছেলে মেয়ে, মা, বাবা বহির্মুখী কিন্তু আগেকার দিনে গৃহ ছিল একটি মন্দির। পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সবাই একত্রে বাস করতেন। বাপ, মা, আত্মীয় স্বজনের সেবায় ও যত্নে ও সুশিক্ষায় ছেলেমেয়েরা পেত 'ভগবানের আশীর্ব্বাদের আভাস। তখন ছিল যৌথ পরিবারের প্রচলন।

সারাদিন পর স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, বন্ধুদের বাড়ী থেকে একটা নির্দ্দিষ্ট

সময় ছোটদের, বাড়ীর জন্য মনটা উতলা হত। মনে হত এই সময় পেরিয়ে গেলে মা, বাবা অসন্তুষ্ট হবেন ও চিন্তা করবেন। ঠাকুমার গল্পের ঝুলি বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা মার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়া ও সারাদিনের ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করা—সবই বাতিল হয়ে যাবে। কত আত্মীয় বন্ধু এসে ফিরে যাবেন আর পড়তে বসার ও একটা সময় আছে ত! বাড়ীর মেয়েদের একা বেরবার বিশেষ চলন ছিলনা। বাবা, মায়ের সঙ্গে আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী যাওয়া ও উৎসবের দিনে সমবয়সীদের সঙ্গে আনন্দ করা—রেষ্টুরেন্টে বসে অজস্র টাকা খরচ করে কফি খাওয়া নয়। তখন সবাই ছিল একসঙ্গে আজ সবাই একা।

আজকাল মা ও মেয়ের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান এসে গেছে। যে যার মনে চলেছেন। মায়েরা ভুলে যান, তাঁদের জীবন কঠিন কর্ত্তব্যময়। তাঁরা অনেক সময় সমাজ কল্যাণের কাজে যোগ দেন, তাতে সাময়িকভাবে নিশ্চয়ই কারো উপকার হয় কিন্তু তার বাড়ীর মঙ্গল কার হাতে। দাস, দাসীর হাতে ছেলে, মেয়ে বড় হবে। যৌথ পরিবারও ভেঙ্গে গেছে—তাই দাদু, ঠাকুমা, কাকা, জেঠা কারো সঙ্গই তারা পায় না। মায়েরা অনেক সখ করে কাজে যান। তাঁরা একবারটি ভাবেন না তাঁর ছোট, ছোট ছেলেমেয়েকে কে আদর্শ পথে পরিচালিত করবে? তারা কতটুকু মায়ের সাহচর্য্য পায়। অবশ্য যে মা চাকুরী করে সংসারে সাহায্য করেন, তাঁর তুলনা হয় না।

এই যে সখ করে মায়েদের বাইরে ঘুরে বেড়ান ও কাজে যাওয়া—সেটা একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সাজসজ্জা, কেশ বিন্যাস এ-সবের খরচ ও তাঁদের মেটাতে হবে। স্বামী হয়ত কয়েকদিন দেবেন কিন্তু পরে তারই মনে হবে এ খরচ অহেতুক—সুতরাং হাত খরচের জন্যও টাকা রোজগার করা দরকার। যতদূর সম্ভব সন্তানকে সঙ্গ দেওয়া উচিৎ—নাহলে আমরা মস্ত বড় কর্ত্তব্য থেকে পালিয়ে বেড়াব।

আমাদের সন্তানরাই ত ভবিষ্যৎ ভারতের নির্মানকর্ত্তা, আমরা নিজেরা যা করতে পারিনি — সেই অসমাপ্ত কাজগুলি সন্তানরা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে।

মা কর্মক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘরে ফিরলেন– সংসারের নানারকম সমস্যা ও নালিশ এসে পৌছিল তাঁর কাছে। মন মেজাজ খিটখিটে,—ছেলেমেয়েরা কাছে

আসার সাহস পায় না। মাতৃস্নেহের যে ক্ষুধা তাদের মিটল না—যদিও জঠর জ্বালা মিটিয়েছে দাস, দাসী। আমরা মায়েরা এখন অনুযোগ, অভিযোগ করলে কি হবে, আমাদের সম্মান আমরা নিজেরাই নষ্ট করছি। ছেলেমেয়ে যত আধুনিকই হোক, বন্ধুর আধুনিকা মায়ের তারা প্রশংসা করবে, কিন্তু নিজের মায়ের জন্য তাদের মতামত ভিন্ন। সে মাকে তারা দেখতে চায় স্নেহময়ী, কল্যাণী, গৃহলক্ষ্মীরূপে। তা না করলে আমরা শ্রদ্ধা হারাই।

অথচ সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমাদের এ যুগের সঙ্গে চলতে হবে। 'আমরা ছোটবেলায় এই করতাম'—বলে চমৎকার একটি সুবোধ বালকের জীবন কাহিনী তাদের শোনালাম—সেটাও অন্যায়। যুগের ব্যবধান যাকে বলে generation gap সেটা যতই বেশী হোক—মাকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করে ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ। তারা শিক্ষিত, তারা মানতে চাইবেনা কড়া শাসন কিংবা কোনও বাধা। তখনই মাকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। সন্তানের সুন্দর, কোমল মনে কোনও রকম আঘাত না করে যাতে সুন্দরভাবে সকলকে সুখী করে একটা মিমাংসায় পৌছন যায় — সেইখানেই মায়ের বাহাদুরী। সব সময় যদি বলি এটা কোরনা, ওটা অন্যায়, তাহলেই তারা বিদ্রোহ করবে। তাদের আনন্দ উৎসবে মাঝে মাঝে মা বাবা যোগ দিলে তারা উৎসাহই পাবে। তারা হবেন বন্ধু ও সাথী। আমাদের মনও কিন্তু আমাদের অজান্তে পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলবার চেষ্টা করছে। পুরাতনের যে অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে নূতন থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি এবং তাতে আমাদের সন্তানদের মঙ্গলই হবে।

আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকাল গুরুজনদের বিশেষ শ্রদ্ধা দেখায় না। সতেরো, আঠার বছর আগে ইংলণ্ডে তাই দেখে এসেছি, ছোটবেলা থেকে তারা এত স্বাবলম্বী যে কারো পরোয়া করার দরকার মনে করে না। শিক্ষক, পিতা, মাতা সবাই সমান। তাঁরাও এইভাবে চলে এসেছেন; তাই ছেলে মেয়েদের কিছু বলবার নাই। কিন্তু আমার কাছে তা দৃষ্টিকটু ও বেদনাদায়ক। দেশে ফিরে দেখলাম—আস্তে আস্তে সেই হাওয়া এখানেও বইছে। স্বাবলম্বী না হয়েও তারা বেপরোয়া। পাশ্চাত্যের ভাল কিছু নেবার আগেই মন্দের প্রভাব দেখা দিল আমাদের দেশে। দুরকমের সংস্কৃতির মেলামেশা হয়ে কিরকম একটা অদ্ভুত সমাজ যেন তৈরী হয়ে গেল। এর মধ্যেও আমাদের

দোষ দেখতে পাই। সেদিন রাস্তায় একটি ছোট ছেলেদের মিছিল দেখলাম। তার স্লোগান হচ্ছে "বাবাগিরি চলবে না।" জিজ্ঞাসা করে জানলাম—একটি ছেলেকে তার বাপ মেরেছেন তাই তার স্কুলের বন্ধুরা পড়া ফেলে এই মিছিল বের করেছে। শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। এটুকু শাসনেরও উপায় নাই। আমরা আমাদের মেয়েদের আজকাল যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে থাকি কিন্তু তাদের বিবাহের সময় জাল গুটিয়ে ফেলি। তখন বাপ মায়ের পছন্দমত ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হলে তাতে পরে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। ছোটবেলায় শাসন না করে বিবাহের বেলায় কড়া শাসন করলে ফল ভাল হয়না। তারা বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে—বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তারা চায় জীবনযাত্রা সুরু করতে—সেখানে বাপ মায়ের সহায়তা দরকার। আমরা যদি সংযমের ও শৃঙ্খলার আদর্শ শিশু বয়স থেকে ছেলে মেয়েদের সামনে তুলে ধরতে পারি তবে তারা সেই পথেই চলবে। মুখে বেশী কিছু বলে বাধা দেবার দরকার নাই—মাতা পিতার নিত্যকার জীবনযাত্রা দেখেই তারা সব শিখবে। তাই আমাদের প্রতিপদক্ষেপে সাবধানে চলতে হবে। ছেলেমেয়েদের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ। আমরা তাদের এনেছি পৃথিবীতে তাদের প্রতি প্রথম কর্তব্য আমাদের। বেশী কিছু আশা করলে নিরাশ হতে হয়। সন্তান বড় হবে, নিজে সংসার করবে, তখনও আমরা ভাবি সে বাপ মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটী করছে। এর জন্য দোষ দিই পরের মেয়েকে। নববধূকে সাদরে বরণ করি গৃহলক্ষ্মী বলে,—কিন্তু যতই দিন যায়, ততই আমরা বলতে থাকি ছেলে পর হয়ে গেলো। কিন্তু তা কেন? মা বাপকে ছেলে ভোলেনা। তবে তার নূতন জীবনের একটা বৈশিষ্ট থাকবেই তার কাছে। সে সময় সে যদি একটু কর্ত্তব্যে অবহেলা করে তা মার্জ্জনীয়। আমাদের মনমত কিছু না হলে আমরা ভাবি ওরা অন্যায় করছে আর আমরা কখনও অন্যায় করতে পারি না কারণ আমরা প্রবীণ ও বিজ্ঞ। শিশুকালে স্বাধীন চিন্তায় বাধা দিলে বড় হয়ে নিজেদের সত্বার অভিব্যক্তি ঠিক মত হয় না। প্রতি শিশুরই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকার আছে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার। তাতে বাধা দেবার আগে ভাবা উচিৎ এখনকার সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে তা মানাচ্ছে কিনা। বেশী শক্ত করে বাঁধতে গেলে বাধন ছিড়ে যায়। তখনই আমরা পৃথক হয়ে যাই সন্তানের থেকে। সন্তান জন্মাবার পর থেকে আমরা যতদিন বেঁচে থাকব তাদের ভালবাসব, সুখে দুঃখে তাদের পাশে এসে

দাঁড়াব। অনুযোগ অভিযোগ ভুলে গিয়ে তাদের একটি সুখের সংসার দেখে আনন্দ পাব। তবেই ত আমরা 'মা' হবার অধিকারী। মায়ের ভালবাসায় স্বার্থ নাই, মলিনতা নাই, এ এক অপার স্নেহ পাবাবার। এখানে নিষ্ঠুরতার স্থান নাই, এ স্নেহ স্বর্গীয়। পুরাতন ও নূতনের মিলন হতে হবে। সম্পর্ক মধুর থেকে মধুরতর হবে। আদর ভালবাসা স্নেহ দিয়ে যা পাওয়া যায়, অহিংসা দিয়ে যা জয় করা যায় তার তুলনা কোথাও নাই। এই ত ভারতের ঐতিহ্য। আমরা সেই ভারতের নারী। সন্তানকে ভালভাবে গড়ে তোলা মানেই সমাজ গঠন। আপোষের অভ্যাস করতে হবে। নূতনকে কিছু ছাড়তে হবে এবং পুরাতনকে আরো কিছু বেশী ছাড়তে হবে—এই সুন্দর সামঞ্জস্যই আমাদের সন্তানদের আবার আমাদের কাছে এনে দেবে।

মা ও শিশু

পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়

'নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে'। মাতৃত্ব কথাটি শুনতে যেমন গম্ভীর তার বাস্তব রূপায়ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। সকল মাতৃত্বের প্রতিটি সময়, প্রতিটি পদক্ষেপ দায়িত্বের সাক্ষরে ভরা। বীজটি থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারাগাছ। চারা-গাছ থেকেই মহীরূহ রূপ পাবে। সুতরাং মহীরূহকে আগলে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবত মনে প্রশ্ন আসতে পারে—সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্বের পালা সুরু হয় কবে থেকে? বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যেদিন থেকে মা হতে চলেছি। সন্তান মার গর্ভে যেদিন থেকে এলো।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী বেড়ে যায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য মাকে সব সময়েই বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। কারণ এই পরিবেশে শিশু অভ্যস্ত না হলে তার দেহযন্ত্র স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে পারবে না। এবং না পারলেই শিশুর দেহের অস্বস্তি মায়ের অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে। আর অশান্তির মাত্রাধিক্য মায়ের মনে বিরক্তি আসবে। জীবনের প্রথম কমাস পর থেকেই শিশু মার সামান্য অবজ্ঞা বা অবহেলা বোঝবার চেষ্টা করে এবং সেই অনুযায়ী নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করে। শিশুর দেহযন্ত্রের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সে কাঁদে। এবং বুঝতে পারে যে কাঁদলেই এমন একজন আছে যে, যাতে শিশু স্বস্তি পায়।

ছেলেমেয়ে ভালো হলে মায়ের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। সংসারের সাধ্যমত ছেলেমেয়ে মানুষ করার উপকরণগুলি সংগ্রহ করার দায়িত্ব বাবা ও মা উভয়েরই কিন্তু সেগুলিকে যথাযথ পালন ও কাজে লাগানোর দায়িত্ব মায়ের। মায়ের স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, শাসন দক্ষতা, ছেলেমেয়েদের বুঝতে পারার বিচক্ষণতা সব কিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। মায়ের আচরণ বিধি সব সময়েই সংযত হবে। মায়ের দায়িত্বের সঙ্গে অবশ্য পারিবারিক পরিবেশও সুস্থ হওয়া চাই। দেহ ও মনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সহজ ভাবী ক্ষমতাগুলি এবং পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নেপোলিয়ান বলেছেন,—"Give me some good mothers. I shall give you a good nation."

ভারতনেত্রী ইন্দিরা গান্ধী

সুষমা মৈত্র

'দি হ্যাণ্ডস দ্যাট রকস দি ক্র্যাডেল, রুলস দি ওয়ারল্ড।'

একদা যে হাতে শিশুর দোলনা ঠেলেছেন তিনি, সেই যোগ্য হাত দিয়েই তাঁর প্রিয় সন্তানকে শাসন করার রাজদণ্ড তুলে নিয়েছেন ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর বয়স যখন উনপঞ্চাশ বছর তখনই তাঁর নাম সূর্য-রশ্মির ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অকস্মাৎ ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে দেশ থেকে দেশ দেশান্তরে। কত না ঔৎসুক্য, উদ্দীপনা কৌতূহল, বিস্ময় বিশ্বের বিভিন্ন লোকের মনে আচম্বিতে ঐ খবরে—ভারতের মত সমস্যাবহুল বিশাল গণতন্ত্রের দেশের প্রধান মন্ত্রী হলেন একজন মহিলা!

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ন্যায় বিশ্বের আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান আশৈশব চলমান গোটা বিশ্বের মহা মনীষী ও মহা মহিমান্বিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে একাধিকবার অবলীলায় আসার এবং সে দেশের ভৌগলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বৈপ্লবিক উত্থান পতনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরম সৌভাগ্য লাভ করার সুকৃতি অর্জন করেন নি। ফলে যে কোন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নির্দ্বিধায় যে কোন জটিল সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে তাঁর নারীসুলভ কুণ্ঠা বা জড়তা নেই।

ইন্দিরা গান্ধীর পূর্বে সিংহলের (অধুনা শ্রীলংকা) শ্রীমাভো বন্দরনায়েক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বিশ্বাস ঘাতকের হস্তে নিহত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যেই মূলত: শ্রীমাভো বন্দরনায়ককে তাঁর দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীপদে অলংকৃত করেন। তদুপরি সিংহল একটি ক্ষুদ্র দেশ। ইজ-রাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ারও একটি ক্ষুদ্র দেশের প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি অবশ্য তিনি রাজনৈতিক কারণে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই তিন প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে ভারতবর্ষের ন্যায় সমস্যাসঙ্কুল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পুরুষ শাসিত বিশ্বে জয়ী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান

মন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভে বিস্ময়ে হতবাক্, বিমূঢ় স্তম্ভিত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দৃষ্টি স্বভাবতঃই তাঁর কার্যকলাপ পদ্ধতির দিগদর্শনের দিকে নিবদ্ধ হয়।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। এটি একটি দীর্ঘ দিনের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর চরম সীমায় পৌঁছানোর পরিণতি।

১৭৭৪ সালে রাজা রামমোহনের জন্মের পর থেকে ভারতবর্ষে যে বহুমুখী জাগরণের সূচনা দেখা যায়—তার পূর্বে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও নানাবিধ সামাজিক বিধি নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ নারী নিগ্রো সমান ক্রীতদাস থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার অর্জনের দাবী জানিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনীতি থেকে দেশপ্রেমে নারীর অবদান অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। ভারতবর্ষ এইসব মহিয়সী বীরাঙ্গনার জন্যে গর্বিত। এরই ফলশ্রুতি ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী। বিশ্বের সব-চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠা প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্বের অধিকাংশ অংশের এ মনোভাব এমন কি ভারতবর্ষের লোক সেদিন যাঁকে প্রিয়নেতা জওহরলাল নেহেরুর কন্যারূপে জানত—তারাও ইন্দিরা গান্ধীকে পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রধানমন্ত্রী ভেবে তাঁর নেত্রীত্বের প্রতি বিপুল উদ্দীপনায় জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে রইলেন অপার বিস্ময়ে।

১৯৬৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী চতুর রাজনীতিবিদ মোরারজী দেশাই-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিতা হবার পর, দিল্লীর সংসদের বাইরে অপেক্ষামান হাজার হাজার উদ্বেলিত জনতা আকাশ বাতাস মুখরিত করে ধ্বনি করেদিলেন, "জওহরলাল কী জয়—লাল গোলাপ কী জয়।"

সেদিন ইন্দিরার পরণে ছিল—সাদা খদ্দরের শাড়ী, বাদামী রংএর কাশ্মীরী শাল—তাতে একটি লাল গোলাপ ফুল শোভা পাচ্ছিল।

দূরদর্শিনী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব তথা ভারতীয় জনগণের মনোভাব যেন কত না সহজেই উপলব্ধি করলেন! কংগ্রেস পার্লামেন্টারী কমিটির নেতা নির্বাচিতা হয়েই ঘোষণা করলেন ; 'আমি কিন্তু নিজেকে কেবল মেয়ে বলে মনে করিনা। আমি কাজের লোক, কাজ করতে এসেছি।' কৌতূহলী মানুষ বুঝতে পারল—এ মেয়ে কেবল মেয়ে নয়......উপরন্তু আরো কিছু। নেহেরু পরিবারের সহজাত নেতৃত্ব দেবার রক্ত ধমনিতে প্রবাহিত।

১৯৬২ সালে অকস্মাৎ চীনা আক্রমণের মুখে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী বিপর্যস্ত হয়

এবং বোমডিলার পতন ঘটে। আসামের তেজপুর শহর থেকে এমন কি সরকারী কর্মচারীরাও প্রাণ ভয়ে দলে দলে পালাতে সুরু করে—কিন্তু সেই বিপদ সঙ্কুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যিনি জওয়ান ভাইদের পাশে গিয়ে তাদের মনবল ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন—তিনি বীরাঙ্গনা ইন্দিরা গান্ধী। কাশ্মীরেও তিনি পাক হানাদারদের মধ্যে গিয়ে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অবস্থার মোকাবিলা করেন। জনৈক মন্ত্রীও যেখানে পাক হানাদারদের ভয়ে পালাবার কথা ভাবছিলেন কিন্তু দুর্জয় সাহসে ভর করে ইন্দিরা গান্ধী পাক হানাদারদের মধ্যে থেকে যান। তাঁর এই দুর্জয় সাহস দেখে অনেকেই মন্তব্য করলেন, কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভায় আর না হোক্—অন্ততঃ একজন ব্যাটাছেলে আছেন।' ইন্দিরা গান্ধী তখন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী। আগে পরে এরকম অনেক প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পর জনৈক সাক্ষাৎকারীর এক প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, 'মেয়েমানুষও মানুষ এবং জনসংখ্যার একটি অংশ—অন্য কিছু নয়। পৃথিবীতে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই মেয়েরা পুরুষের মতই বুদ্ধি বিবেচনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'জোয়ান অব আর্ক', রাণী লক্ষ্মীবাঈ, ম্যাদাম কুরী, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি। তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন।'

ক্রমশঃ

ভানুমতীর ডাকে

যাদু সম্রাজ্ঞী উমা দাশগুপ্ত

আমি স্বপ্ন দেখি। হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—জেগে জেগে—বসে বসে আমি স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নর ভেতরই অতীতকে রোমন্থন করি—ভবিষ্যতের ছবি আঁকি, আর এই স্বপ্নর ভেতরই কল্পনার রঙীন ফানুসটা আছড়ে এসে পড়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে। কোনটা ফেটে যায়, কোনটা বা রূপ রস আলো আরও বেশী করে ছড়িয়ে দেয় ব্যক্তিগত'র সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জীবনে।

এমনি একটি স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে। সেই স্বপ্নে অতীতের ভানুমতী মূর্ত্ত হোয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল—বলেছিল তাঁর ছায়া কেন ম্লান বর্তমানে! ভবিষ্যতটা কেন মনে হয় ফাঁকা। পারি নাকি আমরা বর্তমানের জন-মানসে তাঁকে আবার মূর্ত্ত করে তুলতে! পারি নাকি আমরা ভবিষ্যতে তাঁর ছবি আরও বাস্তব করে আঁকতে!

স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল তারপরে। কিন্তু মনে জাগল অদ্ভুত এক প্রশ্ন। সত্যিই তো, মেয়েরা যখন সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বকাজে কসর্ব্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছেন দেশে বিদেশে তখন আমরা কেন পারব না বিগতযুগের যাদুপটিয়সী ভানুমতী মত এযুগে মহিলা যাদুকর গড়তে! অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে একাকার করে দিয়ে ভবিষ্যতের যাদুজগতে মহিলাদের জন্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করতে।

স্বপ্নর কথা বললাম বন্ধুদের। ওরা তো শুনে হেসেই অস্থির। —বলে, পাগল হোয়েছিল তুই! ভানুমতী তো ইতিহাসের কথা। তার যথার্থতা প্রমাণ করতে যাবনা কেউ। তবে দোহাই তোর, তুই নিজে ইতিহাস হোতে যাসনা যেন। এসব উদ্ভট কল্পনা উপড়ে ফেলে দে এখন থেকেই।

ওরা যত আমাকে ঠাট্টা করে তত আমার মন দৃঢ় হয়। পুরুষের মতন উড়ো জাহাজ চালিয়ে আকাশে যখন উড়াত পারেন মেয়েরা—যুদ্ধক্ষেত্রে সমানভাবে যুদ্ধ করতে পারেন মেয়েরা—শাসন কাজে একইভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন মেয়েরা তখন যাদুজগতে 'পা' বাড়াতেও দ্বিধা কেন?

এসব ভাবি আর চারিদিক থেকে চেষ্টা চালাতে থাকি নতুন যাত্রার। আর তারই ফল হিসাবে ১৯৬৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এক শুভদিনে সকালবেলা নিউ এম্পায়ার মঞ্চে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সামনে আমি প্রথম নামলাম আমার বহু দিনের আয়োজিত বিরাট যাদুভাণ্ডার নিয়ে। অতীতের ভানুমতীর আশীর্বাদের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সহর্ষ উচ্ছ্বাস একাকার হোয়ে জয়ের টীকা পড়িয়ে দিল আমার কপালে। সাংবাদিকদের অভিনন্দন, বন্ধুদের শুভেচ্ছা আর বড়দের আশীর্বাদ 'পাথেয়' করে সেদিন থেকেই শুরু করলাম নতুন পথে যাত্রা। অতীতের ভানুমতী বর্তমানে বাস্তব হোয়ে উঠে ভবিষ্যতে উজ্জ্বল ছাপ রাখতে এগিয়ে চললো যাদুর রাজ্যে।

বন্ধুরা বলে, ভয় করে না তোর! আমি বলি মোটেই না। প্রথমেই যদি কথা দিয়ে দর্শকদের আপন করে নিতে পারি আমি তবে তাঁরা সাহায্যই করবেন আমাকে। ভয় করার কথা তো অবান্তর। চলন বলন, দেখাবার ধরণের সঙ্গে যদি স্বাচ্ছন্দ, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি মিশিয়ে দিতে পারেন কেউ তবে যাদুকর হিসাবে সফল তিনি হবেনই—তা তিনি ছেলেই হোন কি মেয়েই হোন। আর এসব গুণ কি কোন মেয়ের পক্ষে থাকা অসম্ভব!

বন্ধুরা শুনে চুপ করে থাকে। আমি হাসি।

ওরা বলে, ভাল লাগে তোর এসব দেখাতে! নিশ্চয়ই, আমি বলি। কত রকমারী অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি এর ভেতর দিয়ে বলতো!

এই তো সেবার '৭১ এর নভেম্বরে যখন ভুটান গেলাম সদলবলে যাদুর খেলা দেখাতে তখন কি আনন্দই না পেয়েছিলাম সকলে। দারুণ এক অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছিলাম সেখানে। তিনদিন ধরে 'শো' ছিল আমার। দ্বিতীয় দিন 'শো' পর এর এক ভুটানীজ ভদ্রমহিলা এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দী আর ইংরেজী মিশিয়ে বললেন—স্টেজে যেমন একটি মেয়েকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখি আমি ঠিক তেমনি পারব নাকি তাঁর স্বামীকে সন্ধ্যেবেলা ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতে! কেননা স্বামী ভদ্রলোকটি সন্ধ্যে থেকেই মদ খেতে শুরু করেন দারুণভাবে; তারপর মারতে থাকেন স্ত্রীকে। সরল-প্রাণা মহিলার কথা শুনে মনে হচ্ছিল এই একই সমস্যা কি ছড়িয়ে আছে সকল দেশে! আর ঠিক তখনই নিজেকে ভীষণ অক্ষম মনে হোচ্ছিল যাদুকর হিসাবে। কেননা যাদু দিয়ে তো কোন সমস্যাই সমাধান করতে পারিনা আমরা বাস্তবজীবনে! কারণ সকল সমস্যার সমাধানের চাবি কাঠি তো আছে তারই কাছে যিনি ত্রিভুবন নিয়ে প্রতিনিয়ত যাদুর খেলা দেখাচ্ছেন অলক্ষ্যে থেকে!

নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্র

চন্দ্রাবতী দেবী

প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ছন্দিতা' মাসিক পত্রিকা থেকে কিছু লেখা দেবার জন্য অনুরোধ এসেছে— শঙ্কিতচিত্তে এই কথাই ভাবছি পারবো তো আপনাদের কাছে পরিস্ফুট করে তুলতে ? বিগত কালের কথা তখন কলকাতা শহরের ভিন্ন রূপ ছিল। রাজপথ ছিল অনেকটা নির্জন। আজকের মত এত ট্যাক্সি, মোটর, লরি, টেম্পো, ঠেলাগাড়ী ও রিকশার ভিড় ছিল না। লোক সংখ্যাও এত বেশী ছিল না। সে যুগের সামাজিক রীতিনীতি, আচার পদ্ধতিও অত্যন্ত কনজার্ভেটিভ ছিল। অনেকেই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে কিংবা ছায়াছবির পর্দায় অভিনয় করাটা সুনজরে দেখতেন না। ভদ্রঘরের মেয়েরাও সিনেমা অথবা থিয়েটার থেকে শত যোজন দূরে থাকতেন। ফলে সমাজ আমাদের এক প্রকার একঘরে করে রেখেছিল। সে দিনের সেই স্বর্ণময় যুগের অভিজাত প্রতিষ্ঠানে বাংলা তথা ভারতের গৌরব যুগল হস্তী চিহ্নিত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিউ থিয়েটারে যে অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে সে দিন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে 'রবীন্দ্রনাথের' 'পূজারিনী' কবিতা কাঁপা কাঁপা গলায় আবৃত্তি করেছিলাম। চাপা কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে বলাবলি কানে এলো—সুন্দর চেহারা চমৎকার মানাবে। নির্বাক যুগে "পিয়ারী" নামে একটি ছবি আমরা তৈরী করেছিলাম। সবাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটে ১৯৩০-৩১ এর মধ্যে। নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রচলন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৩ থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু ছবিতে অভিনয় করেছি। আমার উপর বিধাতার একটি বড় আশীর্বাদ—শিল্পী জীবনে সাফল্য অথবা স্বীকৃতির জন্য আমাকে কারও দ্বারস্থ হতে হয়নি। 'মীরাবাঈ' সংগীত বহুল ছবি—তখন প্লে ব্যাক প্রথা চালু হয়নি। অতএব শিল্পীকে অভিনয় করতে করতেই গাইতে হোতো। নির্বাক যুগে ছবি তোলার ব্যাপারে সূর্য্য রশ্মির উপর নির্ভর করতে হোতো। রূপালী রাংতা পাতার শিট্‌, কাঠের ফ্রেমে এঁটে রিফ্লেক্টার হিসেবে ব্যবহার করা হোত। বড় বড় বাগান বাড়ি, পল্লীগ্রামে পর্ণকুটির, পুকুরঘাট, রাস্তায় ও

জঙ্গলে দলবল যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে ছবি তোলা হোতো। আজ চলচ্চিত্র সমগ্র পৃথিবীর পরম বিস্ময়। সমাজের প্রতিটি স্তরে চলচ্চিত্রের প্রভাব আজ সুদূর প্রসারী। আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকুসম্ভব বলতে চেষ্টা করছি, এ দেশের শিল্প বিকাশের ইতিহাসে বাংলা শিল্প বহু প্রতিকূলতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে। এ শিল্পের সম্ভাবনার মূলে আর্থিক আনুকুল্য যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বহুজনের সম্মিলিত শ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহক হিসাবেও এ শিল্পের দায়িত্ব কিছু কম নয়। প্রথম যুগ থেকে আশা নিরাশার ঘাত প্রতিঘাত ও বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে। চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িগণ অর্থোপার্জনের নবনব ফিকিরে মত্ত—কি করে আরো অধিক উপার্জন সম্ভব এই বিষয়ে অর্থনীতি বিপদের ও চিন্তার শেষ নেই। আমাদের যুগে বাংলাদেশে শুধু বাংলা ভাষা বলে নয়—হিন্দী, উর্দু, অসমিয়া, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবী ও ফরাসী ভাষায়ও ছবি রচিত হয়েছে। বাংলা ও বাঙ্গালীর এই গৌরবের ইতিহাস নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু আজ সব বিষয়েই যেন নৈরাশ্যের হাহাকারে বাঙ্গালী হাবুডুবু খাচ্ছে। আজ বাঙ্গালা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বাংলার এই দুর্দিনে বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যত সমাজ যদি সচেতন হয়ে না ওঠেন—বাঙ্গালী জাতিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে কে বাঁচাতে আসবে? বাংলার চিত্র জগতের অবস্থাও অন্ধকারে আচ্ছন্ন—বাংলার চিত্রজগত আজ বাঙ্গালীকেও খুশী করতে পারছে না। অথচ প্রথম যুগে বাংলার এই অবস্থা ছিল না। সারা ভারতে বাঙ্গালীই অগ্রসর হয়েছিল সকলের আগে। একদিন কলকাতাই ছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের পীঠস্থান।

আজও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে ভারত যে গৌরবের আসন অধিকার করতে পেরেছে তার মূলেও রয়েছে বাঙ্গালী। আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে, ভাবছি হয়তো শেষের ছবিটা করবার আগেই বিদায় নেবো দুনিয়া থেকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে। ভেতর থেকে বলে ওঠে শেষের কথা ভাবতে নেই শিল্পীর। শিল্পীর পরকাল নেই সে ইহকাল থেকে চলে যায় চিরকালে। অতীতের স্মৃতির ছবিগুলি অস্পষ্ট—এ ব্যাপারে আপনাদের কতখানি সাহায্য করতে পারবো জানি না। বিশেষ পাতাটি মেলে ধরবার আগে তাই আর ও আগের কিছু ছবি দেখিয়ে রাখলাম।

ক্রিকেট ও আজকের মেয়েরা

ফুল্লরা গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেট সারা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। আমাদের দেশের মেয়েরা এতদিন ক্রিকেট মাঠের দর্শকের ভূমিকাই নিয়েছিল, আজ আর তা নয়। ভারতীয় মেয়েরা আজকাল রীতিমত ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে খেলার মাঠকে আলোড়িত করে তুলেছে। পাশ্চাত্যের মহিলারা এই খেলার ব্যাপারে অনেকখানিই এগিয়ে গেছেন। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ত্রিনিদাদ, জামাইকা, আফ্রিকা অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় সর্ব্বত্রই মহিলারা ক্রিকেটদল গঠন করে এই খেলাটিকে বেশ আয়ত্বের মধ্যেই এনে ফেলেছেন। এদের মধ্যে ভারতের নাম অবশ্য এতদিন ছিলনা—।

হ্যারি আলথম এর History of Cricket থেকে জানা যায় ১৭৪৫ সালে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেই মহিলাদের ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, এবং বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে টেষ্ট খেলা চলে আসছে। ১৯৭৩ সালে ষোলই জুন সর্ব্বপ্রথম এজবাষ্টনে World Cup Tournament অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাতটি দেশ যোগ দেয়। ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, জামাইকা, ত্রিনিদাদ, নিউজিল্যাণ্ড, টোবার্গো এবং ইয়ং ইংলণ্ড, তাছাড়া ইন্টারন্যাশানাল ইনভিটেশন ইলেভেন অর্থাৎ আমন্ত্রিত প্রতিটি দল থেকে দু'জন করে খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি দল। এই খেলাটি World cup rule অনুসারেই হয়েছিল। এই খেলাটিতে ইংল্যাণ্ড মহিলা দলটি বিজয়িণী হবার গৌরব লাভ করে। বিরানব্বই রাণের ব্যবধানে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাস্ত করে।

এ তো গেল বিদেশিনীদের খবর। কিছুদিন আগেও বোম্বাই, বিহার, মধ্য-প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্য থেকে মহিলা ক্রিকেট দল পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খেলার জগতে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে All India Women's Cricket Association গড়ে ওঠে। মহিলাদের এই খেলাতে উৎসাহ দেবার

জন্য প্রচার এবং উন্নতির উদ্দেশ্যই এই গোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য। নয়াদিল্লীতেই এই সংস্থাটি গড়ে ওঠে। প্রতি বছর জাতীয় ক্রিকেট খেলা ছাড়াও সাগরপারের বিদেশিনীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, এদের একটি বিশেষ পরিকল্পনা। এতদিন ভারতে ক্রিকেট খেলায় বোম্বাইয়ের পুরুষদের মত মেয়েরাও বেশ প্রধান হয়ে উঠেছিল অবশ্য কারণও ছিল। বোম্বাইয়ের অনেক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরাই মেয়েদের এই খেলাতে যোগদেবার জন্য সাহায্য করেছেন। অনেক নাম করা খেলোয়াড়ই শিক্ষকতা করেছেন, আবার দলগঠন করতে সাহায্য করেছেন কোন কোন খেলোয়াড়দের আত্মীয়ারা খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে অন্যান্য মেয়েদের উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং বোম্বাইয়ের মহিলা ক্রিকেট বাহিনী অনায়াসেই নাম করে ফেলবে এ আর বেশী কথা কি। কিন্তু সদ্য গঠিত পশ্চিম বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলটি বারাণসীতে মিগ্রা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গত শীতকালে যে খেলাটি দেখালেন তাতে চমৎকৃত হবারই কথা। ভাবতে অবাক লাগে এক মাসেরও কম অনুশীলনে বাঙ্গালী মেয়েরা এই খেলাটাকে কি ভাবেই রপ্ত করেছে। এই খেলাটিতে পশ্চিমবাংলার এই দলটি মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও বোম্বাই ইত্যাদি দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসে এখানকার খেলার জগতে বেশ আলোড়ন তুলে দিয়েছে। ফাইনালে কর্ণাটককে পরাস্ত করে পশ্চিম বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলটি ১৯৭৩ সালের ভারতের চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জ্জন করে।

মোটকথা দেখা যাচ্ছে খেলার নামে ছেলেখেলা কেউই করছে না। বিভিন্ন কাজেকর্মে পড়াশোনায় ইত্যাদিতে আজকাল মেয়েরা আর পেছিয়ে নেই, তেমনি খেলার জগতকেও মেয়েরা যে বেশ রপ্ত করে নিয়েছে আজকের মেয়েদের ক্রিকেট এই কথাই জানাচ্ছে। ক্রিকেটের আগামী মরশুমে ভারতীয় প্রমীলা বাহিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া থেকে মহিলা ক্রিকেট দল আসছেন বলে জানা গেছে, তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছি।

আগামী সংখ্যায় গল্প লিখছেন সুকৃতি রায়চৌধুরী, নির্মলেন্দু গৌতম, আনন্দ বক্সী এছাড়া প্রবন্ধ, ফিচার, কবিতা, ধারাবাহিক উপন্যাস এবং ধারাবাহিক জীবন-কথা ভারতনেত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য রচনা।

সম্পাদকীয়

হে চির নূতন

নতুন বছরের শুরুতেই ছন্দিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিনম্রচিত্তে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ; সকলের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি শুভকামনা ; সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক সকলের জীবন। সত্য শিব এবং সুন্দরের আরাধনায় আমরা যেন ফিরে পাই আমাদের সকল হৃত গৌরব।

নানা কারণে আজ আমরা ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, চিন্তিত ; রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয় এবং সাংস্কৃতিক মানের অধোগতি আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে প্রায় পঙ্গু করে তুলেছে। এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথই হলো সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করা। সত্যকে জেনে নির্ভয়ে প্রকাশ করে, জাতীয় জীবনের সকল দোষ ত্রুটি সংশোধন করে, নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়ন করে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক বৈষম্যহ্রাস সামাজিক কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের সকল সহায় সম্বলকে মূলধন করে এগিয়ে যেতে হবে রোগ ব্যাধি ও ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে একটি গোটা জাতিকে রক্ষা করতে।

নতুন বছরের প্রথম প্রভাতের পুণ্যলগ্নে, এই কামনা করেই ছন্দিতার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা সকলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলো।

ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

ছন্দিতার উদ্যোগে ছোটগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। উৎসাহী গল্পকারদের ছোটগল্প পাঠিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে। প্রতিযোগি শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের পুরস্কৃত করা হবে। গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ ১৯৭৫।

যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক : ছন্দিতা
বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-১৮

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ছন্দিতার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে।

আপনার লেখা পাঠান

ছন্দিতা

বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর কলকাতা-১৮

বর্ষ দশ সংখ্যা এগার
Vol. 10 No. 11

ছন্দিতা

ফাল্গুন ১৩৮১
February 1975

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

গল্প

আলোচনা

প্রবন্ধ

জীবন-কথা

কবিতা

প্রচ্ছদ শিল্পী
দীপক দে
প্রধান সম্পাদক
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
গৌরগোপাল দাশ ও হেনা চৌধুরী

নগদ 100 টাকা

পেতে পারেন

কারও বসন্ত হওয়ার খবর দিতে পারলে

কারও জ্বরের সঙ্গে গায়ে লালচে দানা দানা বেরিয়েছে বলে যদি আপনি খবর পান এবং তা বসন্ত বলে সন্দেহ হয়, তাহলে নীচের যে কোনও ঠিকানায় অবিলম্বে খবর দিন ঃ

নিকটতম স্বাস্থ্য কেন্দ্র/উপকেন্দ্র/টীকা-দান ও জন্ম রেজিস্ট্রীকরণ কেন্দ্র/পৌর স্বাস্থ্য দপ্তর/জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর

আপনার দেওয়া খবর যদি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় এবং সে খবর আপনার আগে আর কেউ না দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি হাতে হাতে নগদ একশ টাকা পুরস্কার পাবেন।

ধারাবাহিক উপন্যাস

কানু কাছে রাই

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইদানীং প্রায়ই কলেজ থেকে কল্পনার ফিরতে দেরী হতো বাড়িতে। অবশ্য এ দেরীটা কলেজের বাড়তি ক্লাসহেতু নয়। এর কারণ হলো প্রায়ই দেখা যেত দিব্যেন্দুকে তার রেসিং কার-টা নিয়ে কলেজ স্কোয়ারের মুখে তার জন্যে অপেক্ষা করতে।

কল্পনাও দিব্যেন্দুর প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করতো। তার সাদর আমন্ত্রণকে কিছুতেই প্রত্যাখান করতে পারতো না। এক এক সময় আড়ালে আপন মনেই ভাবতো কল্পনা - এ কী হলো তার? দিব্যেন্দুর প্রতি এই দুর্বলতা তার কেন?

কিন্তু আশ্চর্য! বিবেক তার এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিত না। ভাবনা তার বেড়াজাল বিস্তার করে বরং আরও বেশি আচ্ছন্ন করে ফেলত তাকে। সাধারণ বোধশক্তিও যেন লোপ পেত তার। বৈষ্ণব পদাবলীর একটা রোমান্টিক ব্যাকুলতা, একটা অতৃপ্তির ছোঁয়া যেন ভেসে উঠতো তার চোখে-মুখে।

দিব্যেন্দুকে সে পেয়েছে নিবিড় করেই পেয়েছে তাকে সে তার প্রেমের গভীরতার মধ্যে। কিন্তু তবু একদিন তার অদর্শনে কৃষ্ণকাতর বিরহিনী রাধার মতো ভাবী বিচ্ছেদ বেদনায় বিধুর হয়ে উঠতো সে। মন তার কাঁদতো উঠতো তখন। কিন্তু তবু অন্তরে তার অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো দিব্যেন্দুর সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য অনুভূতির সকরুণ প্রবাহ বয়ে যেত,—

> 'সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে
> নিত্যকাল সে শুধু আসিছে॥'

কল্পনার প্রকৃতি এমনিতেই ছিল একটু গম্ভীর। দিব্যেন্দুর সঙ্গে আলাপ হবার পর সে যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। জীবনের একটা দিকের শূন্যতা হঠাৎ যেন পূর্ণতার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল।....

রেবা আর সীমার দল ঠাট্টা করতো তাকে—কি রে, শিল্পী বন্ধু পেয়ে তুই

যে আরো বেশি ভাবুক হয়ে উঠলি ? বৈরাগ্য নিবি নাকি ?

কল্পনা নীরব হাসি দিয়ে তার অন্তরের ব্যাকুলতাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতো।

কোন কোন দিন দিব্যেন্দু—বিশেষ করে ছুটির দিনে কল্পনাকে তার গাড়ীতে পাশে বসিয়ে শহর থেকে দূরে—প্রকৃতির সবুজ কোলে গিয়ে আশ্রয় নিত।

কল্পনার উদাস ভাবভোলা দৃষ্টি চমক লাগাতো শিল্পী দিব্যেন্দু বোসের অন্তরে····

কি ভাবছো ?

কই, কিছু না তো !

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু ভাবছো। আমার কাছে লুকিয়ে তোমার লাভ কি ?

লাভ !

অদ্ভুত এক হাসি কল্পনার ঠোঁটের কোণে। বললে—দিব্যেন্দুদা, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর লাভ-লোকসানের জের টানতে একেবারেই ভুলে গেছি।

কি রকম ?

হ্যাঁ, বিশ্বাস করো। গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি। সীমিত অল্প পরিসর জীবনে তাই আমার চাওয়ার এবং পাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে কিন্তু···

হঠাৎ কথা শেষ না করেই থেমে যায় কল্পনা।

দিব্যেন্দু ষ্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে বাঁ হাতটা তার কাঁধের ওপর রেখে একটু চাপ দেয়; মুখখানা তার ঘুরিয়ে নেয় নিজের দিকে। হাসে। নির্ভেজাল হাসি। কণ্ঠে তার প্রশ্নের আকুলতা।

কই, বাকীটা বললে না তো ?

বাকীটা আর কি বলবো দিব্যেন্দুদা—সেটা বলার নয়, ভাববার।

কি রকম ?

হ্যাঁ, জীবনের কোন্ এক মুহূর্তে হঠাৎ তোমার পাশে এসে যাওয়ায় আমার ভেতরে একটা দারুণ ওলট-পালট হয়ে গেছে।

দিব্যেন্দু গম্ভীর হয়ে পড়লো। গাড়ীর স্পীড বাড়ছে। ধুলো উড়ছে গাড়ীর দুপাশে ভীড় করে। দৃষ্টি তার প্রসারিত সামনের পানে। দিব্যেন্দুর

রুক্ষ কালো কালো চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে—যেন বাঁধন ছেঁড়ার সংকল্প করেছে তারাও।

দিব্যেন্দুর কণ্ঠে শুধু একটি কথা-ই প্রতিধ্বনিত হলো—কল্পনা, পঁচিশ-তিরিশ বছরের স্বপ্ন যখন মিথ্যে হয়নি, তখন যেন বাকীটাও কোনোদিন মিথ্যে হবে না।

কল্পনা পরম নিশ্চিন্তে নিজের মাথাটা দিব্যেন্দুর বাঁ কাঁধের ওপর রাখলে।

অদ্ভুত গতি নিয়ে বি. টি. রোড ধরে দিব্যেন্দুর গাড়ীটা ছুটে চলেছে।

এগিয়ে ওরা যাবেই।

দিব্যেন্দুর কাঁধের ওপর মাথা রেখেই পুরনো চিরপ্রিয় সেই গানটা কল্পনার সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন—

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো...

দিবেন্দ্যুর এয়ার কণ্ডিশন্‌ড্‌ ষ্টুডিও।

শিল্পী দিব্যেন্দুর তুলি আঁচড় কেটে চলেছে ক্যানভাসের ওপর। রেখায় রেখায় অনবদ্য হয়ে উঠছে ক্যানভাসের সারা অঙ্গ। জীবন্ত সৃষ্টি। বাস্তবের সার্থক প্রতিফলন। বাস্তবের সার্থক রূপায়ণ।

মডেল হয়ে বসেছে রূপসী কল্পনা রায়!....সার্থক শিল্পীর এক একটি তুলির আঁচড়ে কল্পনার নানা লোভনীয় ভঙ্গীমা, ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠছে। উন্মুক্ত প্রকৃতি যেন ভর করেছে তার ওপর—বাহ্যিক মানবিক সত্তা লুপ্ত।

সে আদি-অন্তহীন চির নতুন ও পুরানোর হিসেবের বাইরে চির অনন্ত-যৌবনা পরমা প্রকৃতির অনন্ত বিন্দু....পরম পুরুষের পরমাকাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী!....সবকালের সবযুগের পুরুষ-প্রকৃতি যুগলের সে অন্যতমা ইভ্‌!!...

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে টিক্‌ টিক্‌ করে।

ডিং ডং ঘণ্টা বেজে ওঠে ঘড়িটির।

রাত আটটা।

মডেলরূপী কল্পনার কণ্ঠস্বর শিল্পীর সৃষ্টির নেশায় ব্যাঘাত ঘটায়। তুলির অবিরাম গতি স্তব্ধ হয়।

এবার আমায় যেতে হবে দিব্যেন্দুদা।

সে কি!

হ্যাঁ, বাবার ফিরে আসার আগে বাসায় পৌঁছতেই হবে আমায়।

অ। উনি ফেরেন ক'টায়?

রাত ন'টার মধ্যেই।

রাত ন'টা...!

কি যেন ভাবলে দিব্যেন্দু। সিগারেটের মুখে জমে-ওঠা ছাই অ্যাশ-ট্রের মধ্যে ঝেড়ে ফেলে কুণ্ঠিত স্বরে জবাব দিলে—আমার অন্যায় হয়ে গেছে কল্পনা, এতক্ষণ তোমার আটকে রাখা উচিত হয়নি।

এমন সময়ে টাটকা ভাজা গরম গরম লুচি আর আলু ভাজা নিয়ে নীলকণ্ঠ প্রবেশ করলো। দিব্যেন্দুর শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছিল সে। একটু হেসে কল্পনার হয়ে সেই-ই জবাব দিলে—ও কথাটা তোমার খুবই পুরনো হয়ে গেছে দেবু। একটা নতুন কিছু বল।

নীলকণ্ঠ টেবলের ওপর ওদের দুজনের জন্যে লুচি আর আলু ভাজা ভাগ করে দিলে। তারপর রেফ্রিজারেটর থেকে নানান রকম মিষ্টি বের করে আনলে। মুগের নাড়ু বাদ যায়নি। ওটা চাই-ই।

দিব্যেন্দু ওর কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি বলতে চাও নীলুদা?

বলতে চাই—আটটা তো রোজই বাজে, রোজই কল্পনা দিদিমণিকে বলো, 'অন্যায় হয়ে গেছে, এবার থেকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব' কিন্তু কই, কোনোদিনই তো দেখলাম না আটটা সাড়ে আটটার আগে কল্পনা দিদিমণিকে ছেড়ে দিলে! তাই বলছিলাম আর কি।

হেসে উঠলো দিব্যেন্দু এক আপনভোলা হাসি।

তুমি হাসছো?

নীলকণ্ঠের কণ্ঠে অবাক বিস্ময়।

হ্যাঁ হাসছি; হাসি পেল যে তোমার কথায়।

তারপর কল্পনার দিকে তাকিয়ে বললে দিব্যেন্দু—এসো, চটপট খেয়ে নেওয়া যাক।

এরপর এগিয়ে গেল সে খাবার টেবল-এর দিকে। কল্পনাও তার আসন ছেড়ে উঠে অনুসরণ করলে তাকে। যেতে যেতে সে নীলকণ্ঠের দিকে তাকিয়ে শোনালে তাকে—এত খাবার খাবে কে নীলুদা? বাড়ির খাওয়া তো এখানেই হয়ে গেল দেখছি। না নীলুদা, তোমায় নিয়ে আর পারা যাবে না।

কল্পনা এসে পাশে বসলো দিব্যেন্দুর। দিব্যেন্দু ততক্ষণে খাওয়া শুরু করেছে। খেতে খেতেই বললে কল্পনাকে—এক্সকিউজ মি কল্পনা, তোমার আগেই খেতে আরম্ভ করেছি কিন্তু। কিছু মনে কোরো না যেন। পেট বিদ্রোহ করলে সে কারও অনুশাসন মানে না!....

কল্পনা হাসলো মিষ্টি করে। জবাব দিল তার কথায়—না না তাতে কি হয়েছে।

নীলকণ্ঠ এতক্ষণ তাকিয়ে ওদের দুজনকে দেখছিল। এরপর বললে সে কল্পনাকে শুনিয়ে—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দিদিমণি, তোমার অনেকটা পথ যেতে হবে—একেবারে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

দিব্যেন্দুকে একটু বিরক্ত মনে হলো যেন। নীলকণ্ঠ যেন তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

নীলকণ্ঠ বুঝতে পারলো দিব্যেন্দুর মনের কথা। তাই সে যাবার সময় একটা কথা শুনিয়ে গেল তাকে—দেবু ভাই, আমার কথায় রাগ কোরো না; যা বলি তা তোমাদের ভালোর জন্যেই।

দিব্যেন্দু অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তার মুখের পানে। রহস্যময় মন্তব্য।

....হ্যাঁ ঠিকই বলছি। আমার কি ভয় হয় জানো দেবু ভাই—ভয় হয় কল্পনা দিদিমণিকে বেশি করে পেতে গিয়ে শেষে না তাকে চিরদিনের মতো....

দিব্যেন্দু শেষ করতে দিলে না তাকে তার কথা। হঠাৎ সে উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠলো। লুচিগুলো সব হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেললে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। লাফিয়ে উঠল আসন ছেড়ে।

নীলুদা!....

কল্পনা অবাক। স্তম্ভিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা।

নীলকণ্ঠ দরজার দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এল আবার সে দিব্যেন্দুর কাছে। সে-ও কম বিস্মিত হয়নি দিব্যেন্দুর ব্যবহারে। তবে এইটুকু সে উপলব্ধি করল, কল্পনাকে ছেড়ে দিব্যেন্দুর পক্ষে আজ আর থাকা সম্ভব নয়। মনে পড়ল মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার গুপ্তের কথা—দিব্যেন্দুবাবু কোনদিন যদি তাঁর স্বপ্নে দেখা মেয়েটিকে খুঁজে পান তাহলে যেন কোন রকমেই ওদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা না করা হয়। বরং ওদের দুজনের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত হবে সেদিন। এর ব্যতিক্রম ঘটলে দিব্যেন্দুবাবুর পক্ষে পাগল হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

নীলকণ্ঠ অনুতপ্ত। কুণ্ঠিত। এভাবে কঠিন সত্যটাকে প্রকাশ না করাই উচিত ছিল তার পক্ষে। অন্যায় তারই। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে ওর দিকে।

দিব্যেন্দু তখনও দাঁড়িয়েছিল ঐ একই ভাবে।

নীলকণ্ঠ এগিয়ে এসে ওর গায়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করলে। চোখে তারও জল এসে গিয়েছিল ।

বসো দেবু ভাই; আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এমন কথা আর কোন দিনও বলব না।

দিব্যেন্দু বসলো। মাথাটা টেবিল-এর উপর রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলো।

নীলকণ্ঠ তখনও ভাবছিল ডাক্তার গুপ্তর শেষ কথাগুলো।

সেদিন রাত্রে স্বভাবতই কল্পনার বাসায় ফিরতে দেরী হয়েছিল। কারণ অন্যান্য দিনের মতো দিব্যেন্দু তাকে গাড়ী করে তার বাসার কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়নি। সাধারণতঃ সে কল্পনাকে হাতীবাগান গ্রে-ষ্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যেত। কল্পনার আপত্তির জন্যেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। নচেৎ সে প্রায়ই অনুরোধ করতো—বাসা পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দেবার।

কল্পনা বলতো—গরীবের ঘরের মেয়ে আমরা। প্রতিপদে আমাদের হিসেব করে পা ফেলতে হয়। তুমি হয়তো জান না দেবুদা, আমাদের সমাজের মানুষগুলোর সত্যিকার প্রকৃতি। ওরা নিজের যা পায়নি তা অন্য কাউকে পেতে দেখলে সহ্য করতে পারে না।

নরেন্দু রায় সেদিন দরজার পাশেই ছোট ফালি গলিটায় পায়চারি করছিল পেছনে দুটো হাত দিয়ে। না. এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কল্পনাকে একটু শাসন করা প্রয়োজন।

ইদানীং সন্ধ্যাটা প্রায়ই দিব্যেন্দুর ওখানে কাটাতে হতো বলে সে রাত জেগে প্রায়ই দুটো পড়াশুনো করতো। মা কয়েকদিন আপত্তি জানিয়েছেন—এভাবে রাত জেগে পড়লে তোর শরীর খারাপ হবে মা। শুয়ে পড়্। আর···

কথাটা প্রথমে শেষ করতে পারেন নি তিনি। কল্পনা ওঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালে পর বাধ্য হয়ে শেষ করতে হয়েছিল তাঁকে সে-কথাটা।

...তুমি বড় হয়েছ, ভাল-মন্দ বোঝার বয়েস তোমার হয়েছে। কোন কুমারী পড়ুয়া মেয়ে যদি রাত্তির পর্যন্ত বাইরে বাইরে থাকে লোকে তাকে ভাল চোখে দেখে না। চলা-পা আর বলা-মুখকে আমার বড় ভয় মা!...

এর পর থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসতো কল্পনা। কিন্তু তবু কোন কোনদিন ফিরতে তার দেরী হয়ে যেত! মায়ের চেয়েও ভয় বেশি করতো সে বাবাকে। কাজ-পাগল শান্ত প্রকৃতির মানুষ নবেন্দু রায়ের রাগ হলে কোন জ্ঞান থাকত না। ছোটবেলায় মায়ের থেকে বাবার হাতেই বেশি মার খেয়েছে। সে সব কথা আজও ভোলেনি কল্পনা। বাবার কাছে আদর আর আবদার যেমন পেয়েছে, তেমনই ও তরফের শাসনটাও মেনে নিতে হয়েছে তাকে।

এই তো দু-একদিন আগের কথা। নবেন্দু যখন অফিসগামী ট্রাম ধরবার জন্যে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল তখন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনিও ধর্মতলার ট্রাম ধরবেন।

প্রাথমিক দু-একটা অফিসের কাজকর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা হবার পর ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন নবেন্দু রায়কে—আচ্ছা রায়, ক'দিন আগে তোমার মেয়েকে দেখলাম একটা হ্যাণ্ডসাম ইয়ং বয়—বেশ বড়লোক বলেই মনে হয়, তার গাড়ী থেকে রাত আটটা হাতীবাগানের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেল। কে ঐ ছোকরা, নিশ্চয়ই তোমাদেরই কেউ হবে?

শেষের দিকটায় তাঁর কথার মধ্যে সামান্য প্রচ্ছন্ন একটা ব্যঙ্গের আভাসও ছিল হয়তো।

নবেন্দু রায় বন্ধুর কথায় প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন সেদিন এবং তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে পাকা অভিনেতার মতো সহজ ভঙ্গিতে বন্ধুর কথার জবাব দিয়েছিলেন—ওহো! বুঝতে পেরেছি, আমারই দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে।

বন্ধুটি হেসেছিলেন এর পর।

তাই বল, আমি তো ভাবলাম অন্য কিছু। যা দিনকাল পড়েছে—ছেলেই বলো আর মেয়েই বলো মা-বাবার মুখ পোড়াতে আর কতক্ষণ! ..

নবেন্দুর বরাত সুপ্রসন্ন ছিল সেদিন বলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধর্মতলাগামী ট্রাম এসে পড়েছিল। ভদ্রলোক ছুটে ছিলেন এর পর ট্রাম ধরতে। কথা আর এগোয়নি। তিনি নবেন্দুকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন—

রায় এসো, এ ট্রামটা মিস্ করলে আরও কতক্ষণ নেকস্ট ট্রামের জন্যে ভুগতে হবে তা কে জানে।

নবেন্দু কিন্তু যাননি। সসম্মানে বন্ধুর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—না ভাই, খেয়ে উঠে অত ভীড় সহ্য হবেনা, পরেরটাতেই যাবো।

নবেন্দু ইচ্ছা করেই যাননি সেদিন একই গাড়ীতে বন্ধুর সঙ্গে। পাছে ঐ সম্বন্ধে আরও বেশি কথা হয় এই ভয়ে।

নবেন্দু রায় এর পর স্থির করেছিলেন, আজই তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ফিরে এসে সঠিক ঘটনাটা জানতে হবে।

তাই করেছিলেন। য়ুনিভার্সিটির ক্লাস শেষ হবার আগেই তিনি এসে কলেজ স্কোয়ারের ভেতরে রেলিংএর ধারে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁরই সামনে দিব্যেন্দু তার রেসিং-কারটা নিয়ে এসে থামল। তারপর এক সময় দেখা গেল—সীমা, রেবার সঙ্গে কল্পনা বেরিয়ে এল য়ুনিভার্সিটি থেকে। আরও অনেক ছেলেমেয়েও বেরিয়ে এল।

সীমা, রেবা আর কল্পনা ঐ ফুটপাত থেকেই দিব্যেন্দুকে দেখতে পেয়েছিল। সহাস্যভঙ্গীতে ওরা রাস্তা পার হয়ে এ পারে এল। দু-একটা মামুলী কথা। তারপর সীমা আর রেবা দিব্যেন্দুকে নমস্কার জানালে। কল্পনা ততক্ষণে দিব্যেন্দুর পাশে এসে তার সীট-এ বসেছিল।

অবশ্য ততক্ষণে নবেন্দুবাবু কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে অদূরে অপেক্ষমান তাঁর ট্যাক্সিতে উঠে এসে বসেছিলেন। তারপর বাঙালী ট্যাক্সি ড্রাইভারটিকে দিব্যেন্দুর গাড়ীটির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন - ঐ গাড়ীটার পেছনে পেছনে যেতে হবে তোমায়। কিন্তু সাবধান, ওরা যেন বুঝতে না পারে।

ড্রাইভার ভদ্রলোক সন্দেহের চক্ষে তাকালো নবেন্দুর দিকে।

নবেন্দু অদ্ভুত অভিনয় করলেন। গম্ভীর মেজাজে বললেন লালবাজার থেকে আসছি। ভয়ের কিছু নেই তোমার।

ড্রাইভার ভদ্রলোককে অনেকখানি আশ্বস্ত মনে হলো। নবেন্দুকে একটা সেলাম ঠুকে জবাব দিলে—ঠিক আছে স্যার, আর কিছু বলতে হবে না।

স্কাউণ্ড্রেল

অর্দ্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

অন্ধকার ছিল পুরো পাড়াটা। আকাশে খা' কটা তারা। গাছের মাথায় ঘন রাত। জোনাকী ছাড়া আর কোনো আলো নেই কোথাও। জোনাকীর আলোয় কারো মুখ দেখা যায় না। কলকাতার এত কাছে এমন অন্ধকার ভাবাই যায় না।

অমিত সুনীল ও সঞ্জয় তিনটি চেয়ারে বসে গল্প করছিল। আরও একটা খালি চেয়ার রয়েছে। সুনীল সঞ্জয় সিগারেট খায় না, সিগারেট কেন কোন নেশাই ওদের নেই। অমিত শুধু বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল বসে বসে।

মাঝে মাঝে ছুটে আসছিল হাওয়া। ঝাপটে পড়ছিল ওদের চুলে, শরীরে, গাছের ডালপালায়। গাছে গাছে শব্দ হচ্ছিল শন্‌শন্‌। সিগারেট থেকে ছিট্‌কে যাচ্ছিল ফুল্‌কি।

সঞ্জয় ও সুনীল বিবাহিত। সুনীলের বৌ এখন বোনের বাড়ীতে বেড়াতে গেছে, দু' একদিন পরে ফিরবে। সঞ্জয়ের স্ত্রী ভেতরে চা করছে। পাশে টিমটিম করছে হেরিকেন, ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে চিম্‌নি। ধোঁয়া ভেদ করে খানিকটা দুর্বল আলো এসে পড়েছে সঞ্জয়ের স্ত্রী রমলার মুখের একপাশে।

অনেকদিন হল সঞ্জয় ও রমলার বিয়ে হয়েছে। প্রেমের বিয়ে। কলেজের গণ্ডী বেরুবার আগেই বিয়েটা চুকে গেছে। এখন দু'টি সন্তান, বয়স বেড়েছে, তবু এতটুকু ভাঙ্গন নেই শরীরে। বয়স বাড়লে অনেকেই যেন আরো বেশী উদ্ধত ও নিটোল হয়, যেমন হয়েছে রমলা। এখন ওর পিঠের দিকে অপরূপ একটা ভাঁজ ব্লাউজ থেকে কোমর অবধি খুব স্পষ্ট দেখা দেয় হাঁটবার সময়। ওর শরীর যেন চোখ আটকার ফাঁদ জানে।

যদিও একটু দূরে তিনজন পুরুষ বসে আছে তবু ঘরের ধোঁয়াটে অন্ধকারে গা ছমছম করছিল রমলার। বাচ্চা দুটো ঘুমোচ্ছে। রমলা ওদের আধখানা করে ঘুমের বড়ি দিয়েছে। আজকাল ছেলে দুটোকে ঘুম পাড়াতে হলে রমলা তাই করে। ছেলেদের নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি ওর আর ভাল লাগে না, অবসাদ আসে। বুকের ভিতর হাঁপ ধরে।

সঞ্জয় এসব জানেনা। সঞ্জয়কে অনেককিছু গোপন করতে হয় এখন, অথচ আগে কিছুই গোপন থাকত না। দেয়ালে ছায়া দুলছে রমলার। স্টোভের দিকে তাকিয়ে দুই হাঁটুতে চিবুক রেখে চুপচাপ তাকিয়ে আছে সে। তার মুখে আগুনের উষ্ণ রঙ।

অন্ধকার যেমন খুব কাছাকাছি এনে দেয় মানুষকে আবার অনেক দূরেও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অন্ধকারে কিছুই স্বাভাবিক থাকেনা। স্টোভের মৃদু একটানা শব্দটা একটা অর্থহীন অতীতের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল রমলাকে। হঠাৎ হাসি পেল রমলার।

সঞ্জয় ও অমিত পুরোনো বন্ধু। আগে খুব ঘন ঘন আসত, এখন আসত না। আজ অনেকদিন বাদে অমিত এসছে। বাইরে বসে বেশ নিশ্চিন্তে গল্প করছে। কিন্তু এত নিশ্চিন্ত আগে সে ছিল না। হাত কাঁপত সিগারেট খেতে খেতে, ভিখারীর মত তাকিয়ে থাকত রমলার মুখের দিকে। সঞ্জয় রমলাকে একটু ঠাট্টাও করত এসব নিয়ে। রমলা ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করত, সঞ্জয় রমলার ছেলেমানুষিকে হো হো করে হেসে উঠত। অমিত কিন্তু নিয়মিত আসত। অমিতের এই আসাটা গোড়ায় যত স্বাভাবিক ছিল, দিনের পর দিন তা যেন একটু অন্যরকম হয়ে উঠল। রমলাও একটু একটু করে বেশী মনস্ক হয়ে উঠল অমিতের প্রতি।

রাত্রে যখন সঞ্জয় ও রমলা মিলিত হত, মিলনের পর কোনো কোনোদিন হঠাৎ বড় ক্লান্তি লাগত রমলার। সঞ্জয়ের অফুরন্ত প্রাণশক্তি দম আটকে দিত রমলার, অকস্মাৎ সমস্ত কিছু কর্কশ মনে হত তার। সঞ্জয়ের লোভ যেন শেষ হতে চাইত না। তখন মনে পড়ে যেত অমিতের ছেলেমানুষি মুখটা, নরম সরু সরু আঙুলের কাঁপা উত্তেজনা। অমিতের দেহে ও আচরণে সবসময় একটা কোমলতা লেগে থাকত।

হ্যারিকেনের মরা আলোয় আজ আর এক অন্ধকার রমলার মনে পড়ে গেল। বাইরে কেমন নিশ্চিনে অমিত বসে আছে। কোথাও যেন কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

একদিন, সেদিন সন্ধ্যায় সঞ্জয় বাড়ী ছিল না। ছেলে দুটি খেলছিল, অমিত এসছিল আড্ডা দিতে।

অমিতকে ডেকে ভিতরের ঘরে বসিয়েছিল রমলা। শোবার ঘরে। অমিত সঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। সঞ্জয় কোথাও গেছে, এখুনি ফিরবে।

তাতে কি? অমিতের কি অসুবিধে হচ্ছে? অমিতকে বসিয়ে রমলা বাথরুমে ঢুকেছিল, মুখ হাত ধুয়ে একটু প্রসাধন করে নিয়েছিল সেই ফাঁকে। ছেলেদুটোকে সেদিনই প্রথম আধখানা করে ঘুমের বড়ি দিয়েছিল দুধের সঙ্গে। ঘরেই ঘুমের বড়ি ছিল। মাঝে মাঝে সঞ্জয় খায়। ছেলেদুটোকে ঘুমের বড়ি দিতে একটু ভয় হয়েছিল তার। যদি কিছু খারাপ হয়? কিন্তু সঞ্জয়ের তো হয় না, ওদের কেন হবে?

অমিত পর পর দুটো সিগারেট শেষ করে তৃতীয়টা ধরাবার মুখেই রমলা এসে ঘরে ঢুকেছিল। রমলার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল সেদিন। ওর চেহারায় আলগা একটা লাবণ্য আছে যার কোনো তুলনা নেই। তাকিয়ে থাকলে স্পর্শ লাগে গায়ে।

রমলা অমিতের পাশে এসে বসেছিল। গল্প করতে করতে একসময় অমিতের বাঁ হাতটা বুকের কাছে এনে একটুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দিয়েছিল। তারপর জানলার পর্দাগুলো টেনে দিতে উঠেগিয়ে ছিল অলস পায়ে। একটা জানলা থেকে আর একটা জানলায় যাবার সময় আঁচলটা গড়িয়ে পড়েছিল মেঝেয়। পর্দাগুলো টানা হয়ে গেলে, দেয়ালে হেলান দিয়ে অমিতের দিকে তাকিয়েছিল ভারী ঘুমন্ত চোখে। কানের দুপাশে চুল উড়ছিল থিরথির।

হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'অমিত তুমি বড্ড ভিখারী' একটু থেমে 'রোজ রোজ কী চাও তুমি, কীসের জন্য বসে থাক?' কি জবাব দেবে বুঝতে পারেনি অমিত। জবাবের আগেই রমলা আলো নিভিয়ে মুহূর্তে পাশে এসে বসে পড়েছিল ঝুপ করে। অমিতকে বুক দিয়ে চেপে ফিসফিস করে বলেছিল, 'সঞ্জয় আমাকে একটুও ভালবাসে না, শুধু লুঠ করে। তোমায় আমি সব দেব যদি তুমি ভালবাসা দাও। বল দেবে?' অমিত ভেসে গিয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল রমলার শরীরে। তারপর হালকা পাখির মত শরীর নিয়ে বাড়ী ফিরেছিল, বাড়ী ফিরে সুখ ও অন্যমনস্কতায় কাটিয়ে দিয়েছিল সারাটা রাত।

চারকাপ চা নিয়ে রমলা অন্ধকারে তিনজন পুরুষের সামনে দাঁড়ালো। তিনজনকে দিল, নিজেও দিলো বসল। এবার চারজনের পুরো একটা টিম। কথা বলছিল সঞ্জয়। একটু চুপ করে ছিল চা দেবার সময়, আবার শুরু

করল। কথা হচ্ছিল ভালবাসার। অমিতের হাতে সিগারেট। মাঝে মাঝে দপদপ করছে জলন্ত কয়লার মত। সঞ্জয় বলে বাঘের চোখ।

আকাশে মেঘ হয়েছে অন্ধকারে। বাতাস পড়ে গিয়ে চারদিকটা থমথমে। বেশ গুমোট।

অমিত তুই তোর ভালবাসার গল্প বল—সঞ্জয় বলল।

ভালবাসার গল্প একটা বলা যেতে পারে কিন্তু সত্যিকারের কিছু শোনাতে পারব না।

কেন তুই কী কাউকে ভালবাসিস নি ?

অমিত একটু ভাবল। রমলার দিকে অন্ধকারে তাকালো। মনে হল রমলা যেন কুঁকড়ে বসে আছে। রমলাকে জড়িয়ে অমিত নিশ্চয় কিছু বলবে না। রমলা ভাবল। হাজার হোক সঞ্জয়ের সামনে সে সব কিছুতেই বলা যায় না।

অমিত বলল, দেখ্‌ কাউকে ঠিক ভালবাসার সুযোগ পাইনি।

সঞ্জয় তবু অমিতকে ছাড়ল না। অন্ততঃ এমন কারো কথা বল যাকে তোর ভালবাসতে ইচ্ছে হয়েছিল।

সুনীল চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। হঠাৎ বলে উঠল, বল্‌না শালা, রমলাকে জড়িয়েই কিছু একটা বলে দে না। গল্প শোনার শখ মিটুক।

ফোঁস করে উঠল রমলা, আহা আর বুঝি লোক নেই, আপনার বউও তো রয়েছে।

সুনীল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, রমা ? তাহলে তো নিজেকে ওথেলো ভেবে মনে মনে নায়ক হয়ে যেতাম। ওর সেক্‌স্‌ই নেই। ও আবার ভালবাসবে ?

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল, কী করে বুঝলি সেক্‌স্‌ নেই ? সুনীল রমলার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য না করেই বলল, রাত্রে একদিন শোবার ঘরে লুকিয়ে দেখিস, তাহলে বুঝবি। খালি বলবে তোমার ও-ছাড়া কি আর কিছু নেই ? দিনের পর দিন আমরা ভাই বোনের মত শুয়ে থাকি।

যাঃ আপনার যত কথা। রমলা খিলখিল করে হেসে উঠল। অমিত চুপচাপ বসেছিল এতক্ষণ। সঞ্জয় আবার ওকে ধরল। অমিত তুই লুকোচ্ছিস।

লুকোবো কী। সবাই ঠিক ভালবাসতে পারে না সঞ্জয়। অনেক কিছু ভেবে যখন ভালবাসার কাছাকাছি পৌঁছোনো যায়, তখন কেমন ছত্রখান হয়ে যায় সব।

হুঁ, গল্পের একটা গন্ধ পাচ্ছি যেন—সঞ্জয় বলল।

তার মানে আপনি কারো কাছে নিরাশ হয়েছেন এই তো?

রমলা অমিতকে জিজ্ঞেস করল নীচু গলায়।

ঠিক নিরাশ না হতাশ হয়েছি বলতে পার। অথবা বলা যায় ভালবাসা ব্যাপারটাই গোলমেলে।

কি রকম? সঞ্জয় জানতে চাইল।

আমার মনে হয় নিরন্তর নানা ধরণের শরীরে মিলিত হওয়াকে যদি ভালবাসা বল তাহলে কথাটার একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়। কিন্তু ভাল-বাসা বলতে তোমরা যা বোঝ আমার কাছে তা গোলমেলে। একসময় একটি মেয়েকে মনে হত খুব ভালবাসি। তার সঙ্গে মিলিত হবার পর, অর্থাৎ দৈহিক মিলনের পর সব যেন ফুরিয়ে গেল। তারপর পালাতে পারলে বাঁচি। কী বলবে একে? এমন সময় বিদ্যুৎ চমকে দু' এক ফোঁটা জল পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় পরস্পর পরস্পরের কাছে মুহূর্তের জন্য আলো-কিত হয়ে আবার—অন্ধকারে ডুবে গেল। একটু হাওয়া দিয়ে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। চারজন ঘরের দিকে দৌড়োল। অমিতের পাশে রমলা।

স্কাউণ্ড্রেল। আপনি একটা জানোয়ার। চাপা গলায় অমিতকে কথাটা বলে দৌড়ে এগিয়ে গেল রমলা।

পাকেটমার

রেখা চট্টোপাধ্যায়

বেসরকারী অফিসের বড়বাবু অনুকূল চন্দ্র বোসের একুশ বছরের মেয়ে সুমিতা বি. এ পাশ করার খবর নিয়ে বাড়ী ফিরল। বাবা মা চারটি ছোটছোট ভাইবোন সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করতে লাগল। নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার সেদিন আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। অনুকূল বাবু বাজার করে নিয়ে এলেন মাংস, দই আর রসগোল্লা। সবাই খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে শুতে গেল। হঠাৎ মাঝ রাত্রে মায়ের চিৎকারে সুমিতার ঘুম ভেঙ্গে গেল—তাড়াতাড়ি বাবার ঘরে গিয়ে দেখে তিনি মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছেন। সুমিতা কি করবে কিছু ভেবে পেলনা—ছুটে পাশের বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে লাগল। প্রখ্যাত ডাক্তার ঘোষ রাত্রে রুগী দেখতে যান না, নেহাৎ পাড়ার ব্যাপার তাই জামা কাপড় বদলে ব্যাগ নিয়ে সুমিতার সঙ্গে এলেন তারপর ঘণ্টা দুই ধরে চলল একের পর এক ইঞ্জেকশন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হলনা; ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূলবাবু শেষ নিশ্বাস ফেললেন। মা পাগলের মত কান্নাকাটি করতে লাগলেন। ছোট ছোট ভাইবোনেরাও সেই সঙ্গে যোগ দিল। আর সুমিতা একেবারে পাথর, তার চোখে জল নেই বোধহয় মনে কোন অনুভূতিও জাগছে না।

একে একে পাড়ার পাঁচজন এলেন—যা হবার তাতো হয়েছে, এখন পরের ব্যবস্থা করতে হবে সবাই সুমিতাকে উপদেশ দিতে লাগল—তুমিই বড় তোমাকেই সব করতে হবে. শক্ত হতে হবে। সুমিতাতো শক্তই হয়ে গেছে। তাই পাঁচজনের সঙ্গে বাপের শেষ কাজ করতে শশ্মানের পথে যাত্রা করল। যথা নিয়মে বাবার শ্রাদ্ধের কাজও শেষ করল।

এবার সুরু হল জীবনযাত্রা নির্বাহ করার প্রশ্ন। অনুকূলবাবুর এমন কোন আত্মীয় স্বজন ছিলেন না যারা এসময় মাথা দিয়ে দাঁড়াতে পারে।

বি এ পাশের ছাপ নিয়ে রোজগারের আশায় সুমিতা এবার চাকরীর উমেদারীতে লেগে গেল। সুমিতার বরাত নিতান্ত ভাল তাই অল্প পরিচিত এক প্রাইভেট অফিসের ম্যানেজারের পি-এর চাকরী হয়ে গেল। খবরটা শুনে মা কালীঘাটে পূজা মানত করলেন—ভাইবোনগুলো আবার হাসতে

লাগল, একটা কালছায়া যেন নামতে নামতে মাঝ পথে থেমে গেল।

সুমিতা বেলা নটায় খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়মিত অফিসে যাতায়াত শুরু করল। পি-এর কাজ তার জানা না থাকলেও সুমিতা চালাক চতুর মেয়ে তাই কাজকর্ম খুব দ্রুতই আয়ত্ব করে ফেলল। ম্যানেজারও তার কাজে খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আর সুমিতার চাকরীটাও স্থায়ী হল।

ক্রমে ম্যানেজারের ঘরে কাজে অ-কাজে ডাক পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে তার আদর আপ্যায়ণের সীমা ছাড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখা দায় হয়ে উঠতে লাগল। অথচ বিধবা মা ও ভাইবোনগুলোর কথা মনে করে সুমিতা সব কিছুই সহ্য করতে বাধ্য হয়।

রোজ সকালে কোন রকমে নাকে মুখে ভাত গুঁজে ট্রামেবাসে ধাক্কাধাক্কি করে অফিসে পৌঁছয়। সমস্ত দিন চলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সেই সঙ্গে ম্যানেজারের দৌরাত্ম্য; এই সব সেরে আবার বাসে ট্রামে যুদ্ধ করে বাড়ী ফিরে শুকনো রুটি ও তরকারি খেয়ে একেবারে বিছানায় এলিয়ে পড়ে।

মাস ঘুরতে ঘুরে বছর ঘুরতে যায়, সুমিতা নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা আর ভাবতে পারেনা। যা টাকা সে রোজগার করে তাতে চারটি ভাইবোন ও মায়ের খাওয়া পরা চালানই কষ্টকর। এর ওপর জামাকাপড় ভাইবোনদের পড়ার খরচা যোগাবে কোথা থেকে। বাধ্য হয়ে সন্ধ্যায় একটা টিউশনি জোগাড় করে নেয়। কায়ক্লেশে দিন কাটে।

সামনে পূজা আসছে -ভাই বোনেরা নতুন জামা কাপড়ের জন্য বায়না ধরে। বর্ষাস্নাত বাংলার আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের খেলা—বাগানে শিউলি ঝড়ে পড়ে ঝোপে ঝাড়ে কাশের মাতামাতি—আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে সব ভরে। ছোটবোন টুনটুন বলে, দিদি এবার পূজায় আমায় একটা অনামিকা শাড়ী কিনে দিবি? ছোটভাই বান্টু বলে দিদি এবার আর হাফপ্যান্ট সার্ট নেবনা, বনপলাশীতে নায়ক যে পাঞ্জাবী পরে ছিল সেই পাঞ্জাবী এবারের পূজার ফ্যাসান চলেছে। বাবু রঞ্জন খোকা সবাই কিনেছে—আমারও ঐ জামাই চাই কিন্তু। অনিতা বলেছে তার চাই ম্যাক্সী, রণিতা বলেছে চিকন শাড়ী—পাশের বাড়ীর বৌদি যেমন কিনেছে। মা বলেছেন—তাঁর এবার কিছু চাইনা—তবে পূজা করবার ছালের থানখানা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। অথচ সুমিতা ভাবে মা ভাইবোনেরা কেউ কিন্তু একবারও সুমিতার নিজের জন্য কি কিনবে তার কথা চিন্তা করেনা বা মুখেও

উচ্চারণ করেনা। সেই বাড়ীর বড় মেয়ে তার ও রোগশেবে মেয়ে অতএব সবাইকে তারই দিতে নিজের দিকের অঙ্ক শূন্যই থাকবে।

সুমিতা ভাবে দিন চালানই কষ্টকর এর ওপর পূজার বাজারের খরচা চালাবে কেমন করে? কোথায় পাবে এত টাকা? এদিকে ম্যানেজারের চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে—শেষ পর্যন্ত সুমিতাকে একদিন চাকরী ছাড়তে হল। ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরে মা-ভাইবোনগুলোর দিকে তাকিয়ে সুমিতা আড়ষ্ট হয়ে যায়। মুখ খুলে মাকেও জানাতে পারল না তার চাকরী নেই।

যথা সময়ে খেয়ে প্রতিদিন বেড়োতে লাগল—আর নতুন চাকরীর সন্ধানে চেনা অচেনা সব জায়গায় ধর্না দিতে লাগল। সন্ধ্যায় টিউশনি সেরে একেবারে রাত্রে বাড়ী ফিরে খেয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর সারারাত ধরে জেগে জেগে চিন্তা করতে থাকে খাওয়া চালাবে কি করে—তার ওপর পূজার জামা-কাপড়ের কথা ভাববে কি করে? অথচ ভাইবোনগুলোর মুখের দিকে চাইতে গেলে তার মনটা বেদনায় কুঁকড়ে যায়। কি করবে?

একদিন বিকেলে ক্লান্ত শরীরে সুমিতা ধর্মতলার স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছে—একটার পর একটা বাস আসছে আর উপছে পড়া লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে কোনটাতেই উঠতে ইচ্ছা করছে না। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটি মাঝ বয়সী ভদ্রলোক সঙ্গে আপাদমস্তক গহনায় মোড়া এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বাস থেকে নামলেন। সঙ্গে বড় বড় খালি ব্যাগগুলো দুজনে হাতে করেই নামলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে সুমিতা বুঝতে পারল এঁরা নিউ-মার্কেটে পূজার বাজার করতে চলেছেন। তাঁরা ভীড়ের চাপে একেবারে সুমিতার প্রায় গায়ের কাছে এসে পড়লেন। রাস্তায় তখন ট্রাফিক সিগনাল দিয়েছে তাই গাড়ীর স্রোত বয়ে চলেছে। রাস্তা পার হবার জন্য ভদ্রলোক মহিলার হাতখানি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সুমিতা ভদ্রলোকের বাঁদিকের পকেটে মণিব্যাগটা উঁচু হয়ে থাকতে দেখল। ভদ্রলোক রাস্তা পার হবার জন্য ব্যস্ত—সুমিতা আর একটু এগিয়ে ভদ্রলোকের গা ঘেঁসে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে, মণিব্যাগটা বেশ সহজেই তুলে নিয়ে চট করে নিজের ব্লাউজের ভেতর লুকিয়ে ফেলল। ভদ্রলোক কিছুই টের পেলেন না। [illegible] হবার সংকেত দেখে মহিলার হাত ধরে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে [illegible]।

একটু পরে ভীড়ের মধ্যে তাঁদের আর কোথাও দেখা গেল না। সুমিতার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল মনে হল তাকে কর্তৃপক্ষ যদি কেউ দেখে থাকে তবে নিশ্চয়ই পুলিশ ডেকে তাকে তাদের হাতে তুলে দেবে।

চট্ করে সুমিতা একটা ট্যাক্সীতে চড়ে বসল—ড্রাইভারকে গড়িয়াহাট যাবার নির্দেশ দিয়ে গাড়ীর সিটে একেবারে এলিয়ে পড়ল। যথাস্থানে গাড়ী থেকে নেমে সোজা বাজারে ঢুকল এবং ভাইবোনেদের হুকুম মত সমস্ত জামা কাপড় ও মার চালের থান্ কিনে ট্যাক্সী করে টালীগঞ্জে তাদের বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। হাতে নতুন জামা কাপড়ের প্যাকেট দেখে সকলেই একসঙ্গে হৈ চৈ শুরু করে দিল। সুমিতার চক্ষের সামনে তার বি. এ পরীক্ষা পাশের দিনটির কথা মনে পড়ে গেল। সকলেই খুশী। মা বললেন হ্যাঁরে এবার পুজায় বোনাস পেয়েছিস? সুমিতা নীরবে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

রাত্রে শরীরটা ভাল নেই এই কথা বলে সুমিতা বিছানায় শুয়ে পড়ে। এইবার আরম্ভ হল মানসিক যুদ্ধ। সুমিতার কানের কাছে বাজতে থাকে 'আমি চুরি করেছি—আমি চোর।' এবার সুমিতা নিজের মনের সঙ্গে যুক্তিতর্কে নেমে যায়—চুরি তো আমার নিজের জন্য করিনি। বিধবা মা ও ছোট ভাইবোনগুলোর মুখে হাসি ফোটাবার আর কোন্ পথ ছিলনা—পুজার আর মাত্র চারদিন বাকি আমি আর কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না তাই ওদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যই আমি এ কাজ করলাম।

বোধহয় একটু তন্দ্রা এসে থাকবে হঠাৎ সুমিতা চীৎকার করে ওঠে মা মাগো আমি চোর—ওই দেখ পুলিস আসছে আমাকে ধরবে বলে। একি হাতকড়া পরাচ্ছ কেন? সত্যি বলছি আমি ইচ্ছে করে চুরি করিনি—আমার যে কোন পথ ছিলনা— আমি কি করব?

সুমিতার চীৎকারে মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়—তাড়াতাড়ি কাছে এসে দেখল সুমিতা প্রবল জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হয়ে পড়েছে। আর বিড়বিড় করে বকছে -আমি পকেটমার' 'পকেটমার'

মল্লিকা

উমা দাশগুপ্ত

মল্লিকা আমার বন্ধু। অনেক দিনের বান্ধু মনের কাছের বন্ধু। থাকিও আমরা কাছাকাছি। বিয়ের আগে তো মল্লিকা ছিল আমাদের পাশের বাড়ী। এখন থাকে আমাদের গলিটা ছাড়িয়ে পরের গলিতে। বয়সেও আমরা প্রায় এক। তাই এতগুলো বিষয়ে এক হওয়াতে দুজনে আমরা হয়ে গিয়েছিলাম প্রায় একাত্ম। হয়ে গিয়েছিলাম বলছি এই জন্ম যে মল্লিকা এখন কাছে থেকেও আছে অনেক দূরে। মনের সবক'টা দরজা যার ছিল আমার কাছে একেবারে খোলা সে আজ সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে অজানা হোয়ে উঠেছে। মল্লিকা আজ দুর্ব্বোধ্য হোয়ে গেছে। হাসিখুশীতে ভরপুর প্রাণবন্ত একমেয়ে আজ বেঁচে থেকেও প্রাণটা হাড়িয়ে ফেলেছে। মল্লিকা বেঁচে মরে আছে। আর তার ঐ প্রাণহীন বাঁচার কারণ হোলাম আমি। তার বড় প্রিয়, বড় কাছের প্রাণের বন্ধু আমি। কিন্তু আমি তো চাইনি! মল্লিকার ক্ষতি হোক এ আমি কল্পনাও করিনি। অথচ—

হাঁা. এই অথচ কেমন অদ্ভুত ভাবে ঘ'টে গেল একদিন।

অরিন্দম, অরিন্দম বোস স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছেলে। ভাল চাকরী করেন। মাকে নিয়ে বছর খানেক হোল বাসা নিয়েছেন এই দিকে। আসা-যাওয়ার পথে মল্লিকাকে দেখে নিজের থেকেই আলাপ করে নিয়েছিলেন ওর সঙ্গে। তারপর বছর না ঘুরতেই সিঁথের সিঁদুর পড়িয়ে একদিন ঘরে এনে তুললেন ওকে।

মল্লিকা সুখী হোয়েছিল। ভীষণ সুখী। সুখের আলোয় আরও সুন্দর দেখাত ওর মুখ। বলতো, এত সুখ আমার বোধহয় সহ্য হবেনা ভানু।

মল্লিকার এই এক দোষ। আমি যাদুর খেলা দেখাতে আরম্ভ করার পর থেকে একটু খুশী হোলেই ও আমাকে ভানু বলে ডাকত। ভানু মানে ভানুমতী। ওই আমাকে বলেছিল স্টেজে এই নাম নিয়ে নামতে। তখন কি একবারও বুঝেছিলাম যে এই নামটাই ওর জীবনে কাল হোয়ে উঠবে!

মল্লিকা আমার কাছে যতটা পরিচিত ছিল অরিন্দম ছিল ঠিক তার উল্টো। বলতে গেলে একরকম অপরিচিতই ছিল অরিন্দম বোস আমার কাছে।

কারণ সময় অথবা সুযোগের অভাব।

প্রথম যেদিন ওর কথা শুনলাম মল্লিকার মুখে সেদিন ভীষণ খুশী হোয়ে বলেছিলাম. আলাপ করিয়ে দিবিনা আমার সঙ্গে !

সমান উৎসাহে ও বলেছিল. নিশ্চয়ই, কবে করবি বল !

এই কবের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে তক্ষুণি সম্ভব হয়নি। কারণ তার দুদিন পরেই আমাকে দিল্লী ম্যাজিক দেখাতে যেতে হয়েছিল। দিল্লীর পরই গেলাম ভুটান। তারপর আসাম। পরপর দূরদেশে এতগুলো প্রোগ্রাম পড়ে যাওয়ায় আমি আর অরিন্দমের সঙ্গে আলাপ করতে পারিনি। এমনকি মল্লিকার সম্বন্ধেও যেন আমি অনেকটা অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েছিলাম। তারপর ওদের বিয়ে হোয়ে গেলে বেশ কয়েকমাস টানা যখন কলকাতা ছিলাম আমি তখন অরিন্দম আবার দিল্লী গেলেন কি একটা ট্রেনিং নিতে। তাই ওর সঙ্গে তেমন করে পরিচিত হবার সুযোগ আর আমি পেলাম না। মল্লিকার কাছে শুনলাম ট্রেনিং থেকে ফিরে এলে যে পোস্টে যাবেন ভদ্রলোক তাতে গাড়ী-বাড়ী সব পাবেন। এখন পেয়েছেন শুধু ফোন। এই ফোনই মল্লিকার ভাগ্য ফাটিয়ে চৌচির করে দিল একেবারে।

বিয়ের পরই অরিন্দম বাইরে। মল্লিকার তাই ভীষণ একলা লাগত নিজেকে। ফলে প্রত্যেক দিন একবার করে ফোন করত আমাকে। আর একবার ফোন পেলে সহজে ছাড়তে চাইতাম না কেউ।

মল্লিকার শাশুড়ী কিন্তু ঠিক এসব পছন্দ করতে পারলেন না। মল্লিকাকেও তিনি কখনও আপন করে নিতে পারেননি। অরিন্দম তাঁর একমাত্র ছেলে। পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে বিধবা হোয়েছিলেন। তারপর অনেক কষ্ট করে, অনেক ধৈর্য্য ধরে সেই ছেলেকে বড় করেছেন - মানুষ করেছেন। ছেলের ওপর তারই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। এই রাজ্যে এতদিন পর ভাগ বসাতে এসেছে আর এক বাড়ীর একটি মেয়ে যাকে আবার ছেলে ভালবেসে ঘরে এনেছে !. মনের কোণে কোথায় যেন তাই খচখচ করত মায়ের. যার খোঁচায় মল্লিকাকে কোন দিনই কাছে টানতে পারেননি তিনি। আমার কাছে মল্লিকার প্রতিদিনের ফোন ভাল চোখে দেখলেন না ভদ্রমহিলা। কাকে ফোন করছে - কেন কোরছে ইত্যাদি জানতে না চেয়েই অহেতুক ছেলেকে লিখেদিলেন কথাটা।

দিল্লী থেকে ফিরে এসেই অরিন্দম বোস কথাটা বললেন মল্লিকাকে। মল্লিকা তো হেসেই অস্থির শুনে। নিয়তির এমনই পরিহাস যে ঠিক তখুনি আমি ফোন করেছিলাম ওকে। একে অরিন্দম ফিরেছেন এতদিন পর, তারপর আমাকে ফোন করা নিয়েই আলোচনা হোচ্ছিল ওদের মধ্যে; ঠিক এই সময় আমার ফোন পেয়ে দারুণ খুশী হোয়ে মল্লিকা স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে বলে উঠল, কে। ভানু? তারপরই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে বললো, এই, ও এসেছে। এখন আর কারুর সঙ্গে কথা না। সময় হোলে আমিই পরে ফোন করব।

অরিন্দমের ভুরু দুটো বোধহয় কুঁচকে উঠেছিল। বোধহয় প্রশ্ন তুলে-ছিলেন এই ভানু ব্যক্তিটি কে। কারণ শুনলাম মল্লিকা বলছে, ভানু, একটু ধর। অরিন্দম কথা বলবে। দুষ্টু বুদ্ধি আমার মধ্যে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। মল্লিকার দুর্ভাগ্য আমার ভেতর দিয়ে কথা বলে গেল। অরিন্দম গলা শুনে—কথা শুনে একটু পরেই খটাস করে ফোনটা কেটে দিলেন।

তারপর পরপর তিনদিন আমি কলকাতা ছিলাম না। ঘাটশিলায় 'শো' করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই ফোন করলাম মল্লিকাকে। অরিন্দম ধরলেন। বললেন, মল্লিকার শরীর নাকি ভাল নেই। ফোনে কথা বলা সম্ভব না ওর পক্ষে।

শুনে মনটা খারাপ হোয়ে গেল খুব। সেদিন বিকেলেই গেলাম ওকে দেখতে। দেখে চমকে উঠলাম আমি। এ কোন মল্লিকাকে দেখছি! ওর সেই সুন্দর চোখদুটোতে শূন্য দৃষ্টি! লাবণ্য মাথা মিষ্টি মুখখানা ফ্যাকাশে-মলিন, মল্লিকা কি মরে গেছে! একি ওর মরা!.........

অরিন্দম বোস ঠিক তখুনি ফিরলেন অফিস থেকে। বললেন, কদিন ধরেই এই অবস্থা হোয়েছে। বিড় বিড় করে নাকি আমার নাম মাঝে মধ্যে বলে মল্লিকা। আর একটা নামও বলে, তবে সে কে তা তিনি জানেন না।

কী নাম বলে? —আমি জিজ্ঞেস করি।

ভানু। ভানু নামটা প্রায়ই বলে ও। মাথাটা নীচু করে অরিন্দম বলেন।

আমি আর একবার চমকে উঠি। অরিন্দম তা লক্ষ্য করেন। বলেন, আপনি চেনেন তাকে?

—কেন বলুন তো! কী করেছে সে?

—আমাদের দুটো জীবন নষ্ট করে দিয়েছে।

সারা শরীরটা আমার ঝিম ঝিম করে উঠল। গলার ভেতর কী একটা পাকিয়ে উঠে ঠেলে বাইরে আসতে চাইল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, প্লীজ, কী হয়েছে সব খুলে বলুন।

—ভানু কে আমি জানি না ; তবে ও তাকে ভীষণ ভালবাসে, মল্লিকাকে দেখতে দেখতে অরিন্দম বলেন, মা লিখেছিলেন, আমি না থাকাতে ও রোজ কাকে যেন ফোন করত। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করায় হেসেছিল খুব। আর ঠিক সেই সময় ফোন আসে ভানুর। কৌতূহল থেকেই আমি ফোনে কথা বলেছিলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। মল্লিকা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করেনি আমার কথা। ওর মতে ফোনে আমি ভানু নামে যার সঙ্গে কথা বলেছি সে মেয়ে — ছেলে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন, সত্যি কথা বললে কী ক্ষতি হোত! ওর মিথ্যে কথাই তো আমার মনে অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে! শেষের দিকে বড় করুণ শোনাল কথাগুলো।

—মল্লিকা মিথ্যে বলেনি। কোন দূর দেশ থেকে যেন আমার গলা ভেসে আসে।

— কিন্তু আমি নিজে শুনেছি তার গলা। কথা বলেছি পর্য্যন্ত। কী করে বিশ্বাস করব আপনার কথা! তাই ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছি — যা-তা বলেছি। সব শেষে ও এক সময় স্তব্ধ হোয়ে গেছে। তারপর দাঁড়িয়েছে এই অবস্থা।

এবার স্তব্ধ হবার পালা আমার। বেশ কয়েক মিনিট চুপ করেছিলাম। পরে মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

অরিন্দম স্থির থাকতে না পেরে চিৎকার করে বললেন, এই ভানু ভদ্রলোকটির পরিচয় আপনি বলুন দয়া করে।

অপরাধীর মতন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, আসামী হাজির। যা শাস্তি দিতে চান আমাকে দিন।

ভদ্রলোক যেন ক্ষেপে গেলেন। বললেন, রহস্য করবেন না আর—

—বিশ্বাস করুন। এক তিল রহস্য নেই আমার কথায়। আমি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলি। জানেন তো আমি ম্যাজিক দেখাই। ভেনট্রিকুইলিজম্ (Ventrquilism) শিখতে হোয়েছে তার জন্য। ফলে গলায় ইচ্ছেমত স্বর আনতে পারি। ফোনে শুনলাম আপনি

কথা বলতে চাইছেন আমার সঙ্গে। তাই দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় চাপল আমার। তাই ফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় গলায় আনলাম ছেলের স্বর। ফলে, আপনি আমাকে ছেলে ভাবলেন—ভুল বুঝলেন মল্লিকাকে।

অরিন্দম বোস শক্ত পাথর হোয়ে গেলেন যেন। ফর্সা সুন্দর মুখটা টসটসে লাল হোয়ে গেল। সারা শরীরের রক্ত বোধ হয় মুখে এসে জমেছিল তখন। ঐ ভাবে কিছুক্ষণ থেকে মল্লিকার পায়ের কাছে পড়ে বাচ্চা ছেলের মতন কাঁদতে লাগলেন তিনি। আমি ঘর ছেড়ে চলে এলাম।

পরে শুনেছিলাম তার পর দিনই নাকি মল্লিকাকে নিয়ে অরিন্দম চেঞ্জে গেছেন, যদি ওর মনের পরিবর্তন আসে এই আশায়। আর আমি! আমি মাথা কুট্‌ছি ঠাকুরের পায় যাতে ওদের জীবন থেকে 'যদি' কথাটা বাদ হোয়ে যায়—আবার ফুটে ওঠে মল্লিকা।

আলোচনা

একটি নতুন নাটক

রুদ্র আচার্য

এক

অতি সাম্প্রতিক কালে, বলা যায় গত বছর দশেক সময়ে, তরুণ সাহিত্য ব্রতীদের কিছু অংশের মধ্যে টেকনিক বা আঙ্গিক সর্বস্বতার একটা ঝোঁক বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই আঙ্গিকও আবার শিল্প কর্মে উপস্থিত হয়ে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত নয়। তা নাকি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হবে পাঠকের চেতনায় গিয়ে। এবস্ট্রাক্ট চিত্রকলার ভাই বহিরঙ্গ লক্ষণটি এরা শিল্পকেও আক্রমণ করেছে। ফলে সুগঠিত ফর্ম বা বিশিষ্ট বক্তব্য —এই দুইটিই নবীন সাহিত্যাকৃতিতে দুর্লভ হয়ে উঠছে। এমতপরিস্থিতিতে আমরা একটি বক্তব্য প্রধান নতুন নাটকের পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করব। আলোচ্য নাটকের নাম "দ্বিতীয় পৃথিবী", নাট্যকার শ্রীসমরেশ ঘোষ।

দুই

নাট্য বস্তু বেশ সরল। এক গবেষক, লোকে যাকে বলে উন্মাদ, লিখতে উদ্যত হয়েছেন সাধারণ মানুষের ইতিহাস। কোলকাতার বাইরে এক বাগান বাড়িতে সেই উপলক্ষ্যে তিনি ডেকে এনেছে সমাজের বিভিন্ন পেশার ও অবস্থার গুটিকয় লোক : নেতা, অভিনেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ছাত্র ছাত্রী এবং চারণ। লেখকের কাছে তাঁরা নিজের নিজের পরিচয় বর্ণনা করেন। কোলকাতা থেকে একটি টেলিফোন এসে ঐ লোকগুলিকে সন্ত্রস্ত করে তুলল : বাগান বাড়ীতে তারা অন্তরীন। এই বন্দীদশার মধ্যে উন্মোচিত হয় তাদের আসল চেহারাগুলি। দেখা যায় অবস্থার দাস এই মানুষগুলির প্রকৃত পরিচয় ভিন্নতর, ঠিক মানুষটি ঠিক যায়গায় নেই। এর যা দুঃখ ও দহন, পাত্র পাত্রীর মর্মে রয়েছে তারই জ্বালা। তারা সকলে যেন এক বিধ্বংসী চক্রের ঘূর্ণনে আবর্তমান। মানব ভাগ্য সম্বন্ধে তবে এই কি শেষ কথা? প্রসঙ্গক্রমে নাটকটি থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যায় :

অভিজিৎ ॥....ধরুন যেদিন চশমার আবিষ্কার হয়নি, সেদিন অন্ধ হয়ে যাওয়া বা চোখে দেখতে না পাওয়াটাই মানুষের ভাগ্য বলে জানতাম। কিন্তু যেদিন চশমা আবিষ্কার হোল, সেদিন অন্ধ হয়ে যাওয়াটা মানুষের অনিবার্য ভাগ্য বলে মানিনি—

সতীশ ॥ ঠিক। নিরাপদদা এটাতো আমরা ভেবে দেখিনি — আমরা যতই এগুচ্ছি ততই আমাদের ভাগ্য বদল হচ্ছে।

অভিজিৎ ॥ ভাগ্য বদল হচ্ছেনা, বলো ভাগ্যকে আয়ত্বে আনতে পারছি। ভাগ্য তৈরী করছি—ভবিষ্যতে আরও পারব।....

তিন

নাট্যউপস্থাপনার পদ্ধতি ডায়ালেকটিক। চরিত্র সমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে তা প্রকাশিত। আলোচ্য নাটকে সংঘাতের এই ঘনঘটা বহিরঙ্গগত নয়; প্রতিচরিত্রেই তা রয়েছে অন্তর্গত হয়ে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এখানে লড়াই নয়, লেগে গেছে নিজেরই সাথে নিজের লড়াই এবং এরই মধ্যদিয়ে যৌথ-সার্থেরও গুরুত্ব আভাষিত হয়েছে। নাটকটি যৌথ-স্বার্থ রহিত একসার্ভনাটক হয়ে উঠতে পারত হয়ে ওঠেনি—এটি একটি অভিনবত্বও বটে।

নাটকটিতে দুটি মৌলিক চরিত্র হল বৃদ্ধার নাতি এবং চারণ (বৈরাগী)। নাতি আগাগোড়া অনুপস্থিত থেকে নাটকটিতে ব্যঞ্জনার গভীরতা এনেছে। চারণ এই নাটকে কেবল একটি নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূর্তি নয়; (যা সচরাচর দেখা যায়) ব্যক্তি সত্তারও প্রতিষ্ঠিত। তবে পটল টাইপ চরিত্রটি বহু ব্যবহারে বাহুল্য মনে হয়।

শ্রীহীন গোস্বামী শুধু একজন পুঁথি পড়ো গবেষক নন; জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় 'অদৃষ্ট মানুষই গড়ে—মানুষই গড়বে।' এমন আশার কথা আজকের দিনে শোনবার প্রয়োজন আছে।

চার

নাট্যবিচারে যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁরা হয়তো নাটকটিতে দুয়েকটি বৈকল্য লক্ষ্য করবেন। নবীন নাট্যকারদের একটা অংশ হয়তো বক্তব্যপ্রধান এই নাটকের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। আর একথাও সত্যবটে যে নাটকটিতে দ্বিতীয় পৃথিবীও চিত্রিত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় পৃথিবীর আকাঙ্খাটিই বা কমকি? দুঃখের সত্যপরিচয়ের মূলটাই বা কমকি? দুঃখকে আড়াল করে নয়; তাকে চিনে নিয়ে জয় করে দ্বিতীয় পৃথিবী গড়ার জন্য বেড়িয়ে পড়বে দুঃখজয়ীরদল। গোটা মানুষের প্রতিষ্ঠার সন্ধানে নাট্যকার বেরিয়ে পড়েছেন। এই প্রয়াসকে নিছক শিল্পগত মূল্যেরও অতিরিক্ত অভিনন্দন প্রদেয়।

বিদ্রোহী চৈতন্য

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥
হরি হরি বলে লোকে হরষিত হঞা।
জন্মিলেন চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া॥

তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাংলাদেশকে এক ধর্মসূত্রে বেঁধে দেবার জন্য শুভ ফাল্গুন পূর্ণিমায় নবদ্বীপে শচীমাতার কোলে জন্ম নিলেন নরচন্দ্রমা শ্রীগৌরাঙ্গদেব। দৈবযোগে সেদিন আবার চন্দ্রগ্রহণ স্নানদান হরি-ধ্বনি পুণ্যতিথি। নবদ্বীপের নরনারী দলে দলে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে এলেন নবজাতককে দেখতে। শিশুর অপরূপ রূপ দেখে কারো মুখে আর কথা সরে না। একী আশ্চর্য রূপলাবণ্য, একী অপরূপ দিব্যজ্যোতিঃ। আকাশের চাঁদ কি মাটিতে নেমে এসেছে? না, না, আকাশের চাঁদে তো কলঙ্ক আছে, সে তো রাহুগ্রস্ত, খণ্ডিত। আর এযে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র! আকাশের চাঁদে আর নদীয়াবাসীর কি প্রয়োজন! 'এ কে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তাহে পূর্ণকলা।' আনন্দিত পুরনারীগণ নাম দিলেন 'গৌরহরি'। অদ্বৈতপত্নী সীতাঠাকুরাণী নাম রাখলেন নিমাই:

ডাকিনী শাকিনী হইতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।

শৈশবাবধি নিমাই বড় দুরন্ত। পাড়াপড়সীর বাড়িতে ঢুকে পূজার নৈবেদ্য খেয়ে ফেলে, বালক সঙ্গীদের নিয়ে সর্বত্র উৎপাত করে বেড়ায়। যে বালক এইসব দুষ্কর্মের সঙ্গী হতে আপত্তি করে তাকে ধরে মারে। সকলে মিলে শচীমায়ের কাছে নালিশ জানালো। মা নিমাইকে ডেকে ভৎসনা করলেন। ফল হল:

শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হঞা ঘরভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥

কুমারীগণ গঙ্গাতীরে দেবতার পূজা করতে আসে; নিমাই তাদের মাঝখানে বসে বলে, 'আমা পূজ আমি দিব বর, তোমা সবার ভর্তা হবে পরমসুন্দর।' যে বালিকা পূজার উপকরণ নিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় তাকে সক্রোধে ডেকে বলে, 'বুড়া ভর্তা হবে আর চারি চারি সতিনী।'

বিদ্রোহী পুত্রের উৎপাতে অস্থির হয়ে শচীদেবী তাকে শাসন করতে গেলে সে গিয়ে 'উচ্ছিষ্ট গর্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর' বসে মিটি মিটি হাসে।

. বালক নিমাই কৈশোরে পদার্পণ করে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তরুণ নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্র বিচারে মহা মহা পণ্ডিতেরা পরাজিত। যৌবনাগমে গৌরাঙ্গের বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তখন অধ্যাপনাও আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উল্লাস বাক্‌যুদ্ধে বড় বড় পণ্ডিতের মাথা হেঁট করে দেওয়া :

বিদ্যারসে কাহাকেও না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥

গোপালচাপাল নামে এক দুর্মুখ ব্রাহ্মণকে শাসন করে চৈতন্যদেব বলছেন :

পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥

মুসলমান শাসিত বঙ্গদেশে হরিসংকীর্তনাদি নিষিদ্ধ হয়েছিল। অত্যাচারী কাজীর ভয়ে নবদ্বীপের নাগরিকগণ প্রকাশ্যে কোনরকম 'হিন্দুয়ানী' থেকে বিরত থাকতো। চৈতন্যদেব তাদের অভয় দিয়ে আজ্ঞা দিলেন ঘরে ঘরে সংকীর্তন করতে। তারাও মহোল্লাসে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে কীর্ত্তনে মেতে উঠলো। কাজীর কাছে খবর পৌঁছতে দেরী হল না। ক্রোধে অগ্নিতুল্য হয়ে কাজী কীর্ত্তনীয়াদের মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দিয়ে আদেশ প্রচার করলো :

আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥

ভীত সন্ত্রস্ত নাগরিকেরা চৈতন্যদেবের কাছে এসে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলো। এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণকে সংঘবদ্ধ করে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাবার জন্য তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। আজকের দিনে অবশ্য এতে আর কোন অভিনবত্ব নেই; আজ এটা প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে একটি শক্তিশালী এবং বিধর্মী সরকারের বিরুদ্ধে একজন জননেতা যে উপায়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে-

ছিলেন তাকে অভূতপূর্ব আখ্যা না দিলে সত্যের অপলাপ হবে।

চৈতন্যদেব সব নাগরিকদের সমবেত করে একটি বিক্ষোভ মিছিল সাজালেন। এই মিছিল সাজানোতেও তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। মিছিলটিকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করলেন। প্রথম অংশের পুরোভাগে রইলেন যবন হরিদাস—যবন কাজীর যোগ্য প্রত্যুত্তর; মাঝখানে রইলেন আচার্য গোসাঁই, আর পশ্চাৎভাগ রক্ষা করে চললেন স্বয়ং গৌরচন্দ্র এবং নিত্যানন্দ। এই মিছিল মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে কীর্তন করতে করতে সমস্ত নগর পরিক্রমণ করতে লাগলো। ক্রমে এর কলেবর স্ফীত হল এবং কাজীর দরজায় গিয়ে যখন পৌঁছল তখন কীর্ত্তনের কোলাহলে আকাশবাতাস কেঁপে উঠছে। সেই বিশাল জনতা কাজীর আবাসগৃহ ঘিরে ফেলে তাকে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্য মুহুর্মুহুঃ ধ্বনি দিতে লাগলো। কিন্তু কোথায় কাজী? সে ভয়ে ঘরের কোণায় লুকিয়ে আছে, 'তর্জন গর্জন শুনি না হয় বাহিরে।'

সেই বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত অশান্ত জনতা তখন কি করলো? শান্তভাবে যে যার ঘরে ফিরে গেল? একেবারেই না। আজকের দিনের জনতা যা করে তারাও ঠিক তাই করলো। কাজীকে না পেয়ে তারা কাজীর ঘরদোর ভেঙ্গে তার সাধের ফুলের বাগান তছনছ করে দিল—'উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।'

এইভাবে কাজীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে চৈতন্যদেব একজন 'ভব্যলোক' দিয়ে কাজীকে ডেকে পাঠালেন। চৈতন্যের ভরসা পেয়ে কাজী বাইরে বেরিয়ে এলো এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অঙ্গীকার করলো:

> মোর বংশে যত উপজিবে।
> তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাঁধিবে॥

কাজীর অঙ্গীকারের মাধ্যমে এই প্রথম প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনতার সংঘবদ্ধশক্তি জয়ী হলো। এই 'কাজীদলন' চৈতন্যদেবের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

চৈতন্যদেবের সিংহরাশি সিংহলগ্নে জন্ম। সিংহবিক্রমে তিনি সমস্ত অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজরোষ, সমাজের ভ্রূকুটি, বর্ণহিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধ কিছুই তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। যবন, চণ্ডাল পাপীতাপী সকলকেই তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ। তিনি বক্তৃতা করেননি, বই লেখেননি, বাণী দেননি; নিজের জীবন দিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, নিজের কর্ম দিয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। আজ অত্যাচারী কাজীতে দেশ ছেয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় সেই বিদ্রোহী চৈতন্য, এই কাজীদের কে দলন করবে!

ভারতনেত্রী ইন্দিরা গান্ধী

সুষমা মৈত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফিরোজ গান্ধীর নাম শুনেই রেগে গেলেন বাবা। ও বিয়েতে আমার মত নেই, তুমি আরো কোন ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ করতে পার—সাফ জবাব দিলেন বাবা।

মুহূর্তে কি যেন চিন্তা করল ইন্দিরা—একী বলেন বাবা, তাঁরই শিক্ষা যা সত্য বলে জানবে—তা থেকে একচুলও নড়বে না—পিছপা হবেনা—এখন, এখন কিনা ?

'সত্যের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করা যায়—কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' ইন্দিরা তার পিসি কৃষ্ণা হাতি সিং ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে ধরে বসল। তোমরাও তো অসবর্ণ বিয়ে করেছ আমিও ফিরোজকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু পিসিরাও পুরোপুরি মত দিলেন না। ইন্দিরা যুক্তি দেখাল, ফিরোজকে ছোটবেলা থেকে চিনি. নতুন করে কারো সঙ্গে আলাপ সম্ভব নয়। আর তা করার বা কি প্রয়োজন ! ফিরোজকেই আমি বিয়ে করব।'

জওহরলালের আপত্তি দুই পরিবারের মধ্যে কৃষ্টিগত পার্থক্যের জন্যে অসবর্ণের জন্য নয়। নেহেরু পরিবারে অসবর্ণ বিয়ে থেকে আন্তর্জাতিক বিয়েও হয়েছে।

ফিরোজের জন্ম ১৯১২ সালে। জাতিতে পার্শী বাবা জাহাঙ্গীর গান্ধী একজন নৌ-ইঞ্জিনিয়র। ফিরোজরা পাঁচ ভাইবোন। বাবা প্রায় সব সময় জাহাজে জাহাজে কাটাতেন। মা ওদের নিয়ে এলাহাবাদে এক আত্মীয় ডঃ কমিসারিয়েট এলাহাবাদের লেডি ডাফরিণ হাসপাতালে বিরাট কোয়ার্টারে বাস করতেন। নেহেরু পরিবারের সঙ্গে পরিচয় অনেকদিনের। ১৯৩২ সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফিরোজ গান্ধী জেলও খেটেছে অনেকবার। আনন্দভবনেই কাটাতেন অধিকাংশ সময়। শৈশব থেকেই আলাপ পরিচয়।

বাবা জেল থেকে ছাড়া পেলে ১৯৪২ সালের ২৬শে মার্চ ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গেই ইন্দিরার বিয়ে হয়। বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে অগ্নি সাক্ষী রেখে জওহরলাল তাঁর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এ বিয়েতে নিমন্ত্রিত হন। ইন্দিরার এ বিয়েতে বাবা থেকে আরম্ভ করে দেশশুদ্ধ লোক অসুখী ছিল। কিন্তু একবার ইন্দিরা যদি কিছু করব বলে ঠিক করে—আর কেউ তাকে রুখতে পারেনা—সে যত প্রতিকূল অবস্থা আসুক। সে নাছোড়—সংকল্পে অটল। ইন্দিরার বয়স তখন ২৬ বছর ৫ মাস।

এক সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা বলেন, 'আমি যদি জানতে পারি যে, 'আমি কি চাই—তাহলে অপরে কি বললো না বললো—কেউ বিরোধিতা করলো না করলো তাকে আমি বড় একটা তোয়াক্কা করিনা। আমি যদি একবার আমার মন ঠিক করে ফেলি তবে আমি তা করবই করব। কেউ আমাকে রুখতে পারবেনা।'

.........না, আমার বিয়ের ব্যাপারে বাবার তেমন মত ছিলনা। শুধু বাবা কেন, দেশ শুদ্ধ সবাই ছিল এ বিয়ের বিরুদ্ধে। এর কারণ আর কিছু নয়। ফিরোজের সংস্কৃতিই বাদ সেধেছিল। ওরা ছিল পার্শী। আমাদের সঙ্গে গোড়াতেই গরমিল। কাজেই বাবা প্রথম দিকে খুব খুসী ছিলেন না। শেষে অবশ্য হ্যাঁ, বা না কিছুই বলেননি। কিন্তু বাদ বাকী সবাই ছিল বিরোধী। দেশশুদ্ধ সকলের ছিল আপত্তি।'

ইন্দিরা আরো বলেন, 'প্রগতিশীল যাঁরা তাঁরা এ বিয়েকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন যে, এমন ধরণের মিশ্র বিয়ে আরও হওয়া দরকার। আর যাঁরা গোঁড়াপন্থী তাঁরা অবশ্য এর বিরোধিতা করতে ছাড়েননি।' এ থেকেই ইন্দিরার দৃঢ় চরিত্রের একটি দিক সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। বিয়ের পর ইন্দিরা আর ফিরোজ চলল হাসিমুখে কাশ্মীরে। এর অব্যবহিত পরই স্বামী স্ত্রী উভয়েই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়।

১৯৪২ সালের ৯ই অগাষ্ট 'কুইট ইণ্ডিয়া' ভারত ছাড় প্রস্তাব নেবার দিন ধার্য হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার সুরু করলেন। জামাই মেয়েকে নিয়ে জওহরলাল বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে চললেন। ভগিনী কৃষ্ণা হাতিসিংহের বাড়ীতে উঠলেন। সেখানেই ভগ্নিপতি রাজাসহ জওহরলাল গ্রেপ্তার হলেন। ইন্দিরা গান্ধী পতাকা তুলতে গিয়ে পুলিশের

হাতে নিগৃহীত হল। ফিরোজ গান্ধী আত্মগোপন করলেন সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে। সকলেই কারান্তরালে থাকলে সংগঠন চলে কি করে!

ফিরোজ গান্ধীর চেহারা ছিল ঠিক সাহেবের মত। একবার সংগঠনের কাজে দূরে গিয়ে ফেরার পথে কোন গাড়ী ঘোড়া যানবাহন না পেয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সৈনিকদের ট্রাকে চেপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যান। কিন্তু গোরা সৈন্যরা তাকে নামতে দিতে চায়না—পাছে নেটিভরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতিচারণ করেছেন। দেখতে উনি ভালই ছিলেন। গায়ের রঙ সাহেবের মত কটা। কাজেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সৈন্য হিসাবে নিজকে উনি চালিয়ে নিলেন নির্বিচারে।

১৯৪২ এর মুভমেণ্টে স্বামী স্ত্রী দুজনেই গ্রেপ্তার হলেন। জেলে ইন্দিরার শরীর ভাল যাচ্ছিল না তবু তার জেলেই ভাল লাগে। কারণ বাবা, পিসিরা, স্বামী পিসতুতো বোনেরা সকলেই জেলে– বাইরে যখন কেউ নেই তখন আর কি হবে জেল থেকে ছাড়া পেযে! অনেক স্মৃতি বিজড়িত কারান্তরালের দিনগুলি।

স্বাস্থ্য খারা.পর জন্য ১৯৪৩ সালের ১৩ই মে ইন্দিরা জেল ছাড়া পেল। একই দিনে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও। কিন্তু সভাসমিতির নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন। ইন্দিরা পিতার নির্দেশে বোম্বের এক শৈলাবাসে গিয়ে থাকলেন। অগাষ্ট মাসে স্বামী ছাড়া পেলে এলাহাবাদে ফিরে এলেন।

নারীর গৌরব তার মাতৃত্বে। ভারতে নারীর শেষ কথা তার মা হওয়া। ভারতে দেবদেবীকেও মাতৃরূপে দেখে।

জায়া, জননী, ধাত্রী একে একে নারীর তিনরূপেই ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতে পাব। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ দাম্পত্য জীবনের এক অনুপমেয় সুখের দিন ছিল ওদের। ১৯৪৪ সালের ২০শে আগষ্ট প্রথম সন্তান রাজীবের জন্ম হয়। দ্বিতীয় পুত্র সঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। ইন্দিরার সাত ছেলেমেয়ের জননী হবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্বামী তাতে রাজি ছিলনা বলেই....তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার দুমুখী নীতির দ্বারা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেল। ভারতবর্ষ ভাগ হল। পাকিস্থানের জন্ম হল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদ এতে বাড়ল

ছাড়া কমল না। এরজন্যে চরম মূল্য দিতে হল ভারতকে। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী বিকেলে প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন গান্ধীজী আভা গান্ধী ও মানু গান্ধীর সঙ্গে। নাথুরাম গডসে নামে এক হিন্দুযুবক তাঁকে পর পর তিনটি গুলিবিদ্ধ করে—হা রাম বলে গান্ধীজী মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন।

গান্ধীজীর মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ ২৯শে জানুয়ারী ইন্দিরা তার পুত্র রাজীবকে সঙ্গে নিয়ে পিসি কৃষ্ণা হাতি সিংহ ও পদ্মজা নাইডু সহ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে যান। ইন্দিরার চার বছরের পুত্র রাজীব কোথা থেকে একটি ফুলের মালা সংগ্রহ করে এনে গান্ধীজীর পায়ে রাখে। গান্ধীজী হেসে রাজীবের কানটি সস্নেহে মলে দিয়ে বলেন, 'জানিস না দাদু ভাই জ্যান্ত মানুষের পায়ে ফুল দিতে নেই। কৃষ্ণা হাতি সিং ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দেন তক্ষুনিই। কিন্তু পরদিন বিকেলে গোটা ভারতবর্ষের ইথারে ইথারে ভেসে আসল 'গান্ধীজী ইজ নো মোর, হি ইজ মার্ডাড বাই এ হিন্দু ' পাছে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বেধে যায়—তাই এ সতর্ক উচ্চারণ :— 'গান্ধীজী আর নেই, তিনি একজন হিন্দু যুবককর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।'

স্বামী পুত্র নিয়ে দুটি বছর (১৯৪৪-৪৬) ইন্দিরার সুখেই কেটেছে। ফিরোজ গান্ধী লক্ষ্ণৌ-এর ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর। একটি ছোট্ট বাড়ী সুন্দরভাবে সাজনো। সামনে একটি ছোট্ট বাগান। তাতে নানারকম ফুলের বাহার। .ইন্দিরা গান্ধীর শিল্পী মনের পরিচয় প্রস্ফুটিত। দুটি ছেলে ও স্বামী স্ত্রী মিলে বেশ সুখেই কাটছিল ওদের।

১৯৪৭ সালে ১৫ই অগাষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে জওহরলাল দিল্লী বসবাস করতে থাকেন। প্রথমে তিনি একটি ছোট্ট বাড়ী ইয়র্ক রোডে থাকতেন। পরে বিরাট প্রাসাদোপম তিনমূর্তি ভবন গোছগাছ করে দিতে আসেন। জনৈক সাক্ষাৎকারী স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে ইন্দিরা গান্ধী কি হবেন—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, তিনি ডেকরেটর হবেন। সে প্রমাণ তিনি দিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী যে একজন প্রকৃত জীবন শিল্পী তা তাঁর তিনমূর্তি ভবনের রূপসজ্জা দেখে যে কেউ তা উপলব্ধি করেছেন। কবিতা লিখলেই যেমন কবি হওয়া যায় না—কবিতা জীবন থেকে বাদ নয়—তাঁর ঘর সাজানো চলন-বলন-চেহারায় সর্বসাকুল্যে একটি শিল্পের অপূর্ব দ্যোতনা দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর বিরাট দায়িত্ব, তদুপরি বিপত্নীক—দ্বিতীয় কোন কেউ এমন নেই দেখাশুনা করে। একমাত্র প্রিয়দর্শিনী কন্যা ইন্দু ছাড়া তাঁর হিমালয় সম সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের কাছে ঘেঁসে কিছু বলতে পারে। অগত্যা বাবার ধাত্রী হিসাবেই কন্যা ইন্দুকে বাবার তিন মূর্তি ভবনে অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়।

১৯৪৮ সালে বাবার সঙ্গে লণ্ডনেরকমন ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করতে যান ইন্দিরা গান্ধী। ভারতবর্ষ তখনও কমনওয়েলথ ভুক্ত ছিল। অতঃপর ১৯৪৯ সালে চললেন আমেরিকায়। এই তাঁর প্রথম আমেরিকায় গমন। পিসিমা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তখন আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ছোট পিসি কৃষ্ণা হাতি সিং আগেই গিয়ে পৌঁছেছেন। পিসি ভাইঝি মিলে কখনও ওয়াশিংটন কখনও নিউইয়র্ক ও আমেরিকার অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ান। প্রোটোকলের বালাই নেই। আমেরিকার জনগণের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রধান-মন্ত্রী হয়ে তিনি কয়েকবারই গেছেন। প্রোটোকল মেনে চলতে হয়েছে।

দেশে ফিরে ইন্দিরা মনে প্রাণে বাবার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কারণ রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে পড়ে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আকস্মিক মৃত্যু, রাজনীতির নানারকম ঘূর্ণাবর্তে নেহেরুকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এ সময় কন্যা ইন্দুর সান্নিধ্য তাঁর একান্ত অপরিহার্য। কন্যা ইন্দিরাই একমাত্র বাবাকে বুঝতে পারত কিসে তিনি উত্তেজিত হন আর কিসে তিনি উৎসাহিত হন। অতি অল্পতেই পণ্ডিত নেহেরু রেগে যেতেন।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে জওহরলালকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। নির্ব্বাচন উপলক্ষে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে অজস্র উদ্বেলিত জনগণের সামনে। প্রিয় নেতা জওহরলালের বক্তব্য শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান হাজার হাজার মানুষ। এই সময় কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ইন্দিরাকে লোকসভার সদস্যপদে দাঁড়াতে অনুরোধ করে। কিন্তু এখনও নয় বলে তিনি এড়িয়ে যান ২১ বছর বয়সে কংগ্রেসের সভ্যা হয়ে তিনি এ যাবৎ বহু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হন। এখন পিতার দর্শন প্রার্থীদের সঙ্গে আরো আলাপ করে জেনে নেন—কে কি জন্যে এসেছেন—কোনটা জরুরী কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত। অনেক ব্যাপার বাবা ছাড়াই নিজে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে ফয়সালা করে দিতেন। অনেকেই ইন্দিরার প্রখর বুদ্ধি বিবেচনার তারিফ করেন।

ক্রমশঃ

স্বরাজের পথে দেশবন্ধু

হেনা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাউন্সিল প্রবেশ : আমার বর্তমান প্রশ্ন কাউন্সিল প্রবেশনীতি সম্পর্কে। আমি অলইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। কারণ বাস্তবিকপক্ষে এটা খুবই হাস্যকর ব্যাপার হোত যে কংগ্রেসেরই একটি অংশ ভোটযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং অপর অংশ বাদ বলে বেড়াচ্ছেন এদের কাউকেই ভোট দেবেন না। তবে এটুকুই শুধু জানিয়ে রাখি যে প্রয়োজন হলে কংগ্রেসের সংগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার সাহস আমার আছে।

কাউন্সিল প্রবেশের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে এই চিন্তায়ই লোকেরা উৎকণ্ঠিত। আমি কাউন্সিল প্রবেশ নীতিকে যেভাবে গ্রহণ করেছি তার তাৎপর্য্য অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি। আমার প্রশ্ন তেমনি অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য্য অথবা তাকে সার্থক করার জন্য তেমন কোন প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করা হয়নি। অমৃতসর কংগ্রেসে আমিই প্রথম অসহযোগের মন্ত্র উচ্চাচরণ করি কিন্তু গান্ধীজী সহযোগিতার প্রস্তাব এনে আমার বিরুদ্ধবাদিতা করেছিলেন। তার পূর্বে অসহযোগের যেটুকু রূপ প্রকাশ পেয়েছিল তা কেবলমাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।

একথা আমি সর্বান্তকরণে স্বীকার করব যে গত দুবছর ধরে আমরা যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করেছি তা আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে কুড়ি বছর এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত কাজ সম্পর্কে মোহান্ধ হলে চলবে না। দিনের পর দিন আমরা শুধুমাত্র অসহযোগ আন্দোলনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে চলেছি। আর সেই শক্তিকেই কাজে লাগাতে হবে। তারজন্যই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপক প্রচার কার্য্যের দরকার। এই কিছুদিন আগে বোম্বাই থেকে একদল প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন—তাদের কাছ থেকে জানতে পারি যে সেখানে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ তেমন সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে না।

সংগ্রামের ক্ষেত্র তেমন উৎকর্ষভাবে প্রস্তুত না থাকলে সরকারের প্রতিরোধ ক্ষমতাও দিন দিনই বেড়ে যাবে।

গণ আন্দোলন : সোজা কথায় গণ আন্দোলনই এর একমাত্র

উপায়। গণ আন্দোলন তর্ক বিতর্ক বা আলোচনার বস্তু নয়। এর জন্য কতকগুলি প্রথাগত পথও তৈরী নেই। এই আন্দোলন সুরু করার জন্য চাই দেশবাসীর আন্তরিক প্রস্তুতি। আর জনগণের এই মানস প্রস্তুতি ঘটলেই দেশে সুরু হবে গণ আন্দোলন অথবা আইন আন্দোলন। কিন্তু তবু আমি বলবো যে বর্ত্তমানে দেশবাসীর কাছে এই আইন অমান্য আন্দোলন কেবলমাত্র একটা কথার কথা। এই যাদুমন্ত্রের বলে যেন শুধু মানুষদের সঞ্জীবিত করে রাখা হয়েছে। এপ্রিল থেকে জুন পর্য্যন্ত এই আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়েছে। আর আমার কোন সন্দেহই নেই যে জুনমাস শেষ হলেই আবার তা পুনরায় ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হবে—আর ডিসেম্বর মাসে যদি রক্ষণশীল দলের জয়লাভ ঘটে তবে তা আবার মার্চ মাস অবধি টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং বার বার এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

দলীয় কাজ: দেশের এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে আমাদের দল যদি ঠিকমত কাজ না করতো তাহলে বিগত দুবছর ধরে ত্যাগ, সাহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আমরা যে শক্তি অর্জন করেছি তা বিনষ্ট হয়ে যেত। অবশ্য আমি শুধুমাত্র সেইজন্যই দল সৃষ্টি করিনি। আপনারা বর্তমানে আমাকে দেশদ্রোহী বা অন্য যা কিছুই ভাবুন না কেন দেশের ভাগ্য বর্তমানে যে সংশয়াতীত সংকটাপন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তাতে আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে দেশমাতৃকার পূজায় যদি আমি নিঃশেষে আত্মনিবেদন না করতে পারি তাহলে স্বরাজলাভের পথে আরও কুড়ি বছর বিলম্ব ঘটবে। আমাকে বিদ্রোহীরূপে আখ্যা দেওয়া হয় কারণ কংগ্রেসের সব নির্দ্দেশ আমি মেনে নিতে পারিনি। প্রয়োজন হলে কংগ্রেস অথবা ভারতবর্ষের যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করব। আমি মুক্তিকামী—আমি আমার দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্ত করতে চাই। আমি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন-দিনই ভীরুতা বা কাপুরুষতার পরিচয় দিইনি। আমি সংগ্রাম চাই—এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে আত্মোৎসর্গের জন্যও প্রস্তুত। আজ থেকেই সুরু হোক আমার সে সাধনা। তখন যদি কোন কারণে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারি তখন না হয় আপনারা আমায় যা ইচ্ছে বলবেন। কারণ আমি আর এক মুহূর্ত্তও সময়ের অপব্যয় করতে রাজী নই। দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য যে নেতৃত্বের প্রয়োজন তা আমি আপনাদের দিচ্ছি। আপনারা আমাকে দুই দুইবার কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন করেছেন। আমি আশা

করছি আপনারা আমার প্রতি আস্থা রাখবেন। আমি অবশ্যই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আমার এই অভিযান সুরু করব। ভবিষ্যতই শুধু বিচার করবে যে আমি ঠিকপথে চলেছি না আপনারা ঠিকপথে চলেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি।

প্রকাশের স্থান—বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮। প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক। মুদ্রক—গৌরগোপাল দাশ। জাতি—ভারতীয়। বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮। প্রকাশক—ঐ। সম্পাদক—গৌরগোপাল দাশ ও হেনা চৌধুরী। সত্বাধিকারী—গৌরগোপাল দাশ।

আমি গৌরগোপাল দাশ ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর

২০-২-১৯৭৫ গৌরগোপাল দাশ

গল্প

সুভদ্রাহরণ

সন্ধ্যা মণ্ডল

নারাণপুরের এই মাঠটায় চৌধুরী আসর জমিয়েছে আজ নিয়ে পনের দিন হল। নতুন নায়কের গুণে এবার পয়সা কুড়িয়ে উঠতে পারছে না। বিগত পনের বিশ বছরে এত পয়সা লুঠতে পারেনি। ছেলেটা গত বছর বীরভূমে পালা করতে গিয়ে দলে এসে ভিড়ে গিয়েছিল। ভাব চেহারা দেখে তো বেশ বড় ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। বোধহয় খেয়ালী গোছের নাহলে চৌধুরীর এই কুখ্যাত পালায় ঢুকতে সাহস করে, যেখানে নামের চেয়ে বদনামের ভয় বেশী। আজকের পালা হল সুভদ্রাহরণ।

গ্রীণরুমের দেওয়ালে টাঙান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ নিচ্ছিল সুভদ্রাবেশী মিটু।

হেমাঙ্গিনী তার কানে ফিসফিস করে কি বলে গেল। শুনতে না পেলেও কথাটা অনুমান করতে শঙ্কর খুব দেরী লাগেনা। চৌধুরীর কোন হুমকি নিশ্চয়ই। প্রমাণস্বরূপ মিটুর মুখ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে চোরা চোখে একবার তাকে দেখতে গিয়েও চমকে উঠল। মহাভারতের সুভদ্রা কি ওর চেয়েও বেশী সুন্দরী ছিল ? মনে হয়না।

দরজার বাইরে চৌধুরীর খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ দিতেই মুখটায় শেষবারের মত তুলিটা বুলিয়ে নিয়ে শঙ্খ ষ্টেজে যাবার জন্য তৈরী হয়। সিধু ওপাশ থেকে মুখে ইঙ্গিতসূত্রে এক শব্দ তুলে ঘরের সবাইকে সচেতন করে দেয় দি লায়ন ইজ কাম ইন।

সবার দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চৌধুরী ভারী গলায় বলে ওঠে—সবাই রেডি তো ?

—হ্যাঁ। বীণাদি জবাব দেয়।

জনতার চাপে আসর গমগম করছে। সুভদ্রাহরণে যে এত ভীড় হবে চৌধুরী ভাবতেই পারেনি।

শঙ্কর পাঠ আজকে যেন দর্শকদের পাগল করে তুলেছে। করতালির শব্দে অস্থির হয়ে চৌধুরী গ্রীণরুমে গিয়ে সরস মনে একটা সিগারেট ধরাল।

দৃশ্য শেষ হতে আর মিনিট দুই দেরী আছে। শেষের দৃশ্যে অর্জুন সুভদ্রাকে আলিঙ্গন পাশে বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীণ পড়ে যাবে। তখনই তাদের অডিটোরিয়ামে চলে আসার নির্দেশ। কিন্তু একি কাণ্ড! অর্জুন বেসী শঙ্খ সুভদ্রা বেসী মিঠুকে নির্দিষ্ট সময়ের অধিকক্ষণ আলিঙ্গনের ফোয়ারায় ধরে রাখল। স্থান কাল পাত্র ভুলে শঙ্খ মিঠুকে তখনও জড়িয়ে রয়েছে।

মিঠুর বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠল—আঃ ছাড়ুন। —মিটু! চৌধুরীর তীক্ষ্ণ স্বর কানে আসতেই ওরা ছিটকে পরে ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

পরে খেতে বসে মিঠুর কাছে শুনেছিল চৌধুরী আজ মিঠুকে ওদের সামনে যথেচ্ছ অপমান-করেও ছাড়েনি ওর ঘরে নিয়ে বেমালুম বেত চালিয়েছে ওর ওপর।

সিধুর পাশে শুয়ে আজ অনেকক্ষণ ছটফট করেও ঘুম এলনা শঙ্খর। মাথার মধ্যে সহস্র আগুনের ফুলকি জ্বলছিল। চৌধুরী তাকে সরাসরি কিছু বলতে চায় না। জানে সে চলে গেলে তার দল অচল। তাই প্রতিশোধটা মিঠুর ওপর দিয়েই নিতে চায়। তাই বলে ওই রকম পাশবিক অত্যাচার? সিধুর কাছেই শোনা ছোটবেলায় মা বাবা হারা এই মিঠুকে কুড়িয়ে এনে চৌধুরী মানুষ করেছিল দূর সম্পর্কের ভাগ্নী হত তার। বারুদ ওঠা ম্যাচ বাক্সের মত তার এই অখ্যাত যাত্রাদলের নায়িকা করে তুলেছিল তাকে। তার অভিনয়ে চৌধুরী সন্তুষ্ট হলেও মিঠু সর্বদা তার কড়া নজরবন্দী। ছোটবেলার ঋণ সুদ সুদ্ধ শোধ হয়ে গেলেও তাকে দিয়ে যত্রতত্র পয়সা লুটে নেওয়াই চৌধুরীর লক্ষ্য। অভিনয়ের বাইরের জগতে চোখ ফেলতে গেলেই চৌধুরীর খড়্গ ছুটে আসবে তার কপাল লক্ষ্য করে। ওর কালো চোখের কোণে চৌধুরীর জন্ত সব সময় একরাশ ভয় জমা হয়ে থাকে। যৌবনের উপবনে বসন্তের ফুল একটা একটা করে ঝরে যাচ্ছে। অসহায় নারীত্ব আর একটা কবোষ্ণ হৃদয়ের কাছাকাছি আসার জন্তে গুমরে মরে। অথচ ওই কসাই এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে শঙ্খ। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চৌধুরীর ঘরে একবার উঁকি দিয়ে নেয় সে। বিবস্ত্র বীণাদিকে জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে চৌধুরী। বীণাদির সাথে ওর নাকি এক অবৈধ সম্পর্ক আছে। নিশ্চিন্ত মনে বাঁদিকের গলি বারাণ্ডাটা পেরিয়ে আসে শঙ্খ। মাথার কাছে জানালা খুলে হেমাঙ্গিনীর পাহারায় ঘুমোচ্ছে মিঠু।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তবে কি ও-ও ঘুমোয়নি? জানালার গরাদ দিয়ে একমুঠো জ্যোৎস্না ঢুকে ওর মিষ্টি মুখটায় পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। শঙ্খ ছল করে উঃ বলে একটা শব্দ করল। হেমাঙ্গিনীর নাসিকা গর্জনে সে শব্দ চাপা পড়ে গেল। পুনরাবৃত্তি করতেই 'কে' বলে মিঠু ধড়মড় করে উঠে বসল।

—এই চুপ। একটু বাইরে আসবে একটা কথা ছিল। শঙ্খ চুপি চুপি বললে।

মিঠুর চোখে আবার সেই কাঁপা কাঁপা ভয়টা এসে জুড়ে বসল।

—সবাই ঘুমোচ্ছে এসোনা। শঙ্খ সাহস দেয়।

পা টিপে টিপে দরজা পেরিয়ে এল মিঠু

দোল পূর্ণিমার রাত। সারা অঙ্গে সোনালী আবির মেখে চুরি করে যেন প্রকৃতি ওদের লুকোচুরি খেলা দেখছে।

শঙ্খ গিয়ে চামেলী গাছগুলোর পাশে বসেছিল।

—কাছে এস। শঙ্খ ডাকল।

মিঠুর পা দুটো যেন মাটির সাথে আটকে গেছে। একপাও নড়তে পারল না। শঙ্খ হাত ধরে তাকে কাছে এনে বসায়।

—আমার আজকের ব্যবহারের জন্য আমি খুব লজ্জিত। তুমি আমায় ক্ষমা কর মিঠু। হঠাৎ কি যেন হল সামনের হাজার দর্শক ষ্টেজে চৌধুরী কিছু আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। আমি যেন কিসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম। কই তুমি কিছু বলছ না তো?

চিবুক ধরে তুলতেই থতমত খেল শঙ্খ। মিঠুর গণ্ডদেশ অশ্রু ধারায় প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে।

—একি তুমি কাঁদছ। তোমার দুহাতে এত লাল দাগ কেন? আর বুঝি নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সে।

—গুরু দক্ষিণা। বলে শঙ্খর কোলে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল মিঠু।

শঙ্খ চোখ মুছিয়ে দিতেই অভিমানে শঙ্খর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল মিঠু।

মিঠুর কানের কাছে মুখ এনে শঙ্খ দিশেহারা কপোতের মত বলে—এই কঠিন লোহার শেকল ছিঁড়ে অর্জুন তার সুভদ্রাকে এখুনি হরণ করে নিয়ে

যাবে। যাবে না? শঙ্খর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে মিঠু বলে—যাব গো যাব। তোমার পথ চেয়েই তো তোমার সুভদ্রা জন্ম জন্মান্তর বসে আছে। কবে তুমি আমার সাহারার বৃষ্টি হয়ে আসবে সেই আশায়।

—বেশ তবে চল সাড়ে পাঁচটার ট্রেনটায় করে বাকী আঁধারটুকু আমরা আড়াল করে যাই। প্রতিবারে দর্শকদের সামনে অভিনয়ের সাথে নিজের কাছেও আমি অভিনয় করেছি। সর্বদা এই আত্মপ্রবঞ্চনা করে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি মিঠু। নিজেকে উপোষী রেখে এত গরল আমি একা পান করতে পারছি না। দিনের আলোয় তুমি হারিয়ে যাবে তাই রাতের আঁধারে তোমাকে অপহরণ করে আলোর ঠিকানায় নিয়ে যাব চল।

চৌধুরীর অন্ধকার ঘরের দিকে আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মিঠুর হাত ধরে ফটক পেরিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল শঙ্খ।

সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী

নৈবেদ্য ডালি ভ'রে হৃদয়-আধারে,
আজি এসেছি তোমার দ্বারে,
মাগো! তোমার চরণপুটে
অযুত আনত শির যেথা মাথা কুটে,
প্রণত সন্তান সদা· ভক্তি অর্ঘ ভরে.
সাজায় পুষ্প-বিল্ব যেথা থরে থরে,
সেই রাঙা পদ-পল্লব তলে রাখিব পরাণ
মাতৃ স্নেহামৃত-ধারা, যেথ বহে অনির্বাণ।
অনন্ত সিন্ধু পরে. বিন্দু বিন্দু বারি ঝরে,
অনুসম ক্ষুদ্র আমি ধরার জঠরে—
আজি পৃথ্বীজয়ী মাতার চরণতলে,
রাখিব পূজার অঞ্জলি, ভরিয়া অঞ্চলে।
বীরজায়া, কীর্ত্তিযশা, বীরাঙ্গনা নারী!
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত-চক্র, মুক্তি ধ্বজা ধারী।
শৃঙ্খলিত ভারতীর মোচন করিতে ভার,
বাধার শৃঙ্খল তুমি ছিঁড়িলে বারম্বার.
অবহেলে। স্বদেশ-সংকট কালে—
গৃহকাজ রাখি ফেলে, হেলায় সঁপিলে
প্রাণ। দেশমাতা পূজা লাগি—
গৃহে গৃহে ফিরিলে মাগি মাগি
মায়ের পূজার সাজ। যার যাহা
সাধ্য ছিল, উজাড় করিল তাহা;
লক্ষ্মী ভাণ্ড মাঝে অকৃপণ হাতে।

গৌর-স্বর্ণ অলঙ্কার ফেলে, রাঙা হাতে
পরিলে শৃঙ্খল। নির্মম কঠোর কারা
করিলে বরণ। যেথা শাসক, পোষাক-পরা—
অরণ্য শার্দ্দূল। লয়ে হিংস্র দন্তরাজি
শকুনির অট্টরবে করিত নিনাদ। আজি
ইতিহাস কথা বলে, স্বর্ণ লেখনীতে
ভরা আছে স্মৃতি গাথা, বেদনার গীতে।
সর্বজন ধন্য মাগো, রত্নগর্ভা তুমি!
কত পুত্র কন্যা তব চরণ যুগল চুমি
রাখিল আপন প্রাণ, দেশ ত্রাণ তরে।
তার লাগি বিলায়েছ স্নেহ-সুধা ভাণ্ড ভ'রে
অযুত সন্তানকুলে। স্নেহের অঞ্চল পাতি
পূর্ণ হ'তে শূন্য হয়ে—বিলায়েছ দিবারাতি,
ধরিত্রীর মতো দুই হাতে, জনে জনে।
উজ্জ্বল বর্ত্তিকা যাহা ছিল এতকালে গৃহকোণে
প্রজ্জ্বলিত, আজি অনন্ত আনন্দ মাঝে—
সঙ্গীত বীনা-বাদ্য যেথা সদা বাজে,
তারকা সভার মাঝে জ্যোতিপুঞ্জ ধামে
মিশিল অমৃত স্রোতে। যেথা ডাহিনে ও বামে
বহিছে নন্দন বনে উল্লাসে পবন, মর্মরি;
সেথা তারকারা দীপ জ্বালে দিবস-শর্বরী।
বঙ্গমাতা আজি সেথা মান্দাকিনীকূলে,
শ্বেতপদ্ম হস্তে লয়ে, দেবী পাদমূলে,
সাজাইছ যত্ন ভরে বিশ্বমাতৃ পূজা তরে
অর্ঘ থরে থরে। বর্ষিছে শান্তি-বারি সন্তান অন্তরে।

৺বাসন্তী দেবীর চরণ পদ্মমূলে

সুখের সন্ধানে

আলোক সেনগুপ্ত

সুখ,
যদি, একটু সুখের সন্ধান
আমি পেতাম,
তাহলে—
দুঃখের সাথে না হয়
একহাত লড়েই যেতাম।
কিন্তু
কোথায় সেই সুখ ?
আমি তো শ্রান্ত হলাম
খুঁজে খুঁজে—
কোথাও নেই,
কোথাও নেই।
সারা দেশটাতেই আজ
দুঃখের কঠিন স্পর্শ।
অথচ,
আমি
আমার এই একরত্তি ঘণ্টায়
সুখ চাইছি!
যদিও এক টুকরো মাত্র।
তুমি বললে,
এক টুকরো কেন—
অনেক অনেক সুখের সন্ধান
আমি তোমায় দেবো,
আগে ছুরি শানাও।
অবাক হয়ে চেয়েছিলাম,
বুঝিবা শঙ্কিত!

ছুরি! কেন?
কারো বুকে বসাতে হবে নাকি?
তুমি বললে,
আস্তে, আস্তে,
দাঁতে দাঁত চেপে—
হ্যাঁ, বসাতে হবে
তোমার মনের বিশাল
দুঃখের বুকে।

হুঁশিয়ারী

হর দত্ত

ধনীগ্রস্ত পৃথিবীকে আমি
বলে দিতে চাই
মাথার ওপরে গনগনে সূর্য
তবু দেখো অনুর্বর মাটিতে
কতো শস্যের উৎসব।

অথর্ব পৃথিবীকে আমি
জানিয়ে দিতে চাই—
অন্ধকার প্রলয়ের সিংহদ্বার পেরিয়ে
মানুষ আজও তাইকে
গভীর ভাবে আলিংগন করে।

নির্লজ্জ পৃথিবীকে আমি
সাবধান করে দিতে চাই—
ফুটপাতে শুয়ে থাকা শীর্ণ ছেলেটি
এখুনি অভিশাপ দেবে
সনাতনী ভগবানকে।

সম্পাদকীয়

বঙ্গ সংস্কৃতিতে ক্ষুদে সাহিত্য পত্রিকার ভীড়

সম্প্রতি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে এবারে একটি অভিনব সংযোজন হয়েছিল— তা হ'ল লিট্‌ল ম্যাগাজীনের বিচিত্র সমাবেশ। অন্যান্যবার কিন্তু এ বিভাগটি ছিলনা। সেদিক থেকে উদ্যোক্তাদের প্রশংসনীয় মনোভাবের জন্য আমরা গর্বিত। আমাদেরও বিশ্বাস এ ধরণের সর্ব্বজনীন মেলার মারফৎই জনগণের সঙ্গে লিট্‌ল ম্যাগাজীনের যোগাযোগ ঘটান সম্ভব। তবে মেলাতে লিট্‌ল ম্যাগাজীনগুলি সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রদর্শনী মণ্ডপে যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তা যেমন সুব্যবস্থার পরিচায়ক নয় তেমনি এমন একটি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার কোলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে একটু জায়গা পেলনা এটাও পরিতাপের বিষয়। বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারে লিট্‌ল ম্যাগাজীন তার নিজস্ব আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতে এরা এখনও অবাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ সরকারী ব্যবস্থা, এবং বেসরকারী উদ্যোগের কোন নাম গন্ধ নেই এই মেলাতে। একেই লিট্‌ল ম্যাগাজীনের রয়েছে নানা সমস্যা—তার উপর এদের যদি গোষ্ঠীতন্ত্রের অনুকূলে চামচাগিরি করতে হয় তবে তাদের স্বকীয় মান মর্য্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের রেশটুকু বিলীন হয়ে যায়।

দুঃখ হয় ক্ষতি নেই কিন্তু লজ্জা হয় যখন দেখি এই পত্র পত্রিকাগুলিকে নিয়ে বড় বড় সংবাদপত্রগুলিতে উপেক্ষ বহুল আলোচনা বের হয়। আধুনিক সমাজে ক্ষুদে পত্র পত্রিকাগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে তার তুলনা নেই—সৃজনশীল রচনা, প্রতিভাবান লেখক লেখিকার আত্মপ্রকাশ, বারে বারে এই পত্র পত্রিকাতেই আবির্ভাব হয় তারজন্য বড় বড় সংবাদপত্র-গুলি অপেক্ষাকৃত উপকৃত হয়। কিন্তু তবু বড়র কর্ত্তব্য এরা কখনও করেনা। এই উপেক্ষা ও অনাদরের অবহেলা নিয়েই বাংলার ক্ষুদে পত্র পত্রিকাগুলি এগিয়ে চলেছে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ধ্বজা উড়িয়ে—বিপদ সংকুল পথে প্রতি পায়ে পায়ে মৃত্যুর ভাবনা নিয়ে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন বোধ কার ক্ষুদে পত্র পত্রিকাগুলির সেই ভাবনার প্রতিই জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন—তাই ওদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় সংবাদপত্রগুলির নির্লজ্জ আচরণে অন্যদিকে হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

দশ সংখ্যা বার | Vol. 10 No. 12
চৈত্র ১৩৮১ | March 1975

ছন্দিতা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী
দীপক দে

প্রধান সম্পাদক—অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক
গৌরগোপাল দাশ
হেনা চৌধুরী

With best compliments from—
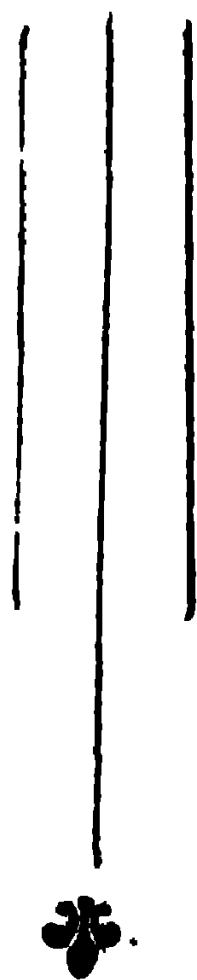
G. D. & COMPANY

ছন্দিতার নববর্ষ সংখ্যা

বিশেষ গল্প সংখ্যা

হিসেবে প্রকাশিত হবে।

মূল্য – ১.৫০

এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির আহ্বান

কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় বড় বড় সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকদের একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে বলেছিলেন যে বড় বড় সংবাদপত্রগুলির উচিত সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে পল্লীর জনসাধারণের জীবন যাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। সাধারণত আজকালের দিনে গ্রামবাসী এবং পল্লীজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন যাত্রার কোন খবরই প্রকাশিত হয়না। অথবা যেটুকু হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। বড় বড় সংবাদপত্রগুলি সাধারণত নিজেদের স্ফীতি মুনাফালাভের জন্যই তাদের সমস্ত উদ্যোগকে সংগঠিত করে সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। অথচ পল্লীতে গাঁথা ভারতের মোট জন সংখ্যার শতকরা আশীভাগ পল্লীতে বাস করেন। এই পল্লীজীবনের নানান সমস্যা, বিশেষ করে পল্লীবাসীদের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র স্থাপন করার মাধ্যমই হলো সংবাদপত্র। অথচ আধুনিক সমাজ জীবনে শহরের অধিবাসী-দের সংবাদই সংবাদপত্রগুলিতে বেশী গুরুত্ব পায়। সংবাদপত্রের এই ত্রুটির দিকেই রাষ্ট্রপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সেদিক থেকে ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকাগুলি বরং তাদের ভূমিকা খুব দক্ষতার সঙ্গেই পালন করছেন। এই বাংলারই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলি পল্লীভিত্তিক সংবাদ ও সাহিত্যের সাধনা করে চলেছে। অথচ এই লিটল ম্যাগাজিনগুলি না পায় সরকারী উৎসাহ, না পায় বড় বড় সংবাদ-পত্রগুলির করুণা। অথচ জনগণের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। পল্লীবাসীদের জীবনে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা যুগ যুগ ধরে অক্টোপাশের মত ঘিরে রয়েছে অথচ প্রতিকারের যেমন উপায় নেই তেমনি সমস্যা তুলে ধরার উদ্যোগও নেই। এই অবস্থায় পল্লীবাসীদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করা বৃথা। আমাদের সৌভাগ্য রাষ্ট্রপতি নিজে সহানুভূতিশীল হয়ে এই সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়ার জন্য বড় বড় সংবাদপত্রগুলির কাছে আবেদন রেখেছেন। আশাকরা যায় অতঃপর এই বড় বড় সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্রপতির আহ্বানের প্রতি সদয় হবেন।

জানুয়ারী ১৯৭৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীমতী লাজী [illegible]। ভুলবশতঃ উক্ত সংখ্যায় প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম ছাপা হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত। —সঃ দঃ

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির আহ্বান

কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় বড় বড় সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকদের একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে বলেছিলেন যে বড় বড় সংবাদপত্রগুলির উচিত সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে পল্লীর জনসাধারণের জীবন যাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। সাধারণত আজকালের দিনে গ্রামবাসী এবং পল্লীজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন যাত্রার কোন খবরই প্রকাশিত হয়না। অথবা যেটুকু হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। বড় বড় সংবাদপত্রগুলি সাধারণত নিজেদের স্বার্থে মুনাফালাভের জন্যই তাদের সমস্ত উদ্যোগকে সংগঠিত করে সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। অথচ পল্লীতে গাঁথা ভারতের মোট জন সংখ্যার শতকরা আশিভাগ পল্লীতে বাস করেন। এই পল্লীজীবনের নানান সমস্যা, বিশেষ করে পল্লীবাসীদের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র স্থাপন করার মাধ্যমই হলো সংবাদপত্র। অথচ আধুনিক সমাজ জীবনে শহরের অধিবাসী-দের সংবাদই সংবাদপত্রগুলিতে বেশী গুরুত্ব পায়। সংবাদপত্রের এই ত্রুটির দিকেই রাষ্ট্রপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সেদিক থেকে ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকাগুলি বরং তাদের ভূমিকা খুব দক্ষতার সঙ্গেই পালন করছেন। এই বাংলারই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলি পল্লীভিত্তিক সংবাদ ও সাহিত্যের সাধনা করে চলেছে। অথচ এই লিটল ম্যাগাজিনগুলি না পায় সরকারী উৎসাহ, না পায় বড় বড় সংবাদ-পত্রগুলির করুণা। অথচ জনগণের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। পল্লীবাসীদের জীবনে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা যুগ যুগ ধরে অক্টোপাশের মত ঘিরে রয়েছে অথচ প্রতিকারের যেমন উপায় নেই তেমনি সমস্যা তুলে ধরার উদ্যোগও নেই। এই অবস্থায় পল্লীবাসীদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করা বৃথা। আমাদের সৌভাগ্য রাষ্ট্রপতি নিজে সহানুভূতিশীল হয়ে এই সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়ার জন্য বড় বড় সংবাদপত্রগুলির কাছে আবেদন রেখেছেন। আশাকরা যায় অতঃপর এই বড় বড় সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্রপতির আহ্বানের প্রতি সদয় হবেন।

ছন্দিতার জানুয়ারী ১৯৭৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীমতী লালী গুপ্ত। ভুলবশতঃ উক্ত সংখ্যায় প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম ছাপা হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত। —সঃ ছঃ

স্রষ্টা

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত আদালত কক্ষটি চাপা উত্তেজনায় নিস্তব্ধ, বিক্ষুব্ধ, সকলেই পরম আগ্রহে জজ সাহেবের রায়ের জন্য উন্মুখ প্রতীক্ষায় মগ্ন। আদালত কক্ষ জনসমাগমে পরিপূর্ণ। একপাশে জুরীরা প্রথম সাড়িতে বসে আছেন শান্তভাবে। বাদি বিবাদি, পাবলিক প্রসিকিউটর, শাক্ষী সকলেই রায় শোনার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বহু মূল্যবান ষোলটি শুনানীর পর জজ সাহেব আজ তাঁর ঐতিহাসিক রায় দেবেন। উৎসাহী জনতার ভীড়, কৌতূহলী মানুষের প্রতীক্ষা কোলকাতার নাম করা প্রায় সকল উকিল ব্যারিষ্টারদের আদালতকক্ষে ব্যস্তভাবে আনাগোনা, চাপা শলাপরামর্শ—সব মিলিয়ে চ্যাটার্জী সাহেবের আদালতের এক অপরূপ এরিষ্ট্রক্যাট চেহারার রূপ নিয়েছিল স্মরণাতীত কালের মধ্যে হাইকোর্টের এই এজলাসে এমন চাঁদের হাট আর কখনও বসেনি। কেউ জানে না কার ভাগ্যে কি আছে, প্রতিটি মুহূর্ত তাই তাদের কাছে বেদনায় ভারাক্রান্ত। একদিকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন অন্যতম সেরা ব্যারিষ্টার উৎসা সেন—রাগে ক্ষোভে উত্তেজনায় তার সমস্ত মুখমণ্ডল যেন হিংস্র বাঘিনীর উন্মত্ততায় ক্ষিপ্ত অন্যদিকে শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ নির্বাক সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক শ্যামলী—উৎসা সেনের একমাত্র মেয়ে। সারাটি আদালত জুড়ে এক বিরাট অস্থির নিরবতা বিরাজ করছে, মাঝে মাঝে শুধু দেওয়ালের বড় ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে উপস্থিত সকলের মানসিকতাকে অব্যক্ত বেদনার অংশীদার করে তুলছে। ন্যায়পথে সত্যানুসন্ধানের জন্য নির্দেশ দেওয়া অবস্থায় তোলা এবং দেওয়ালে টানান গান্ধীজীর ছবির ঠিক নিচে অপেক্ষাকৃত উঁচু মঞ্চে বসে একমনে রায় লিখে চলেছেন জজ সাহেব। লিখতে লিখতে কখনও আবেগে বিভোর, কখন উত্তেজনায় কম্পিত আবার কখনও সহানুভূতিতে শ্রদ্ধাশীল। এমন এক অদ্ভুত ও বিচিত্র ধরণের অপরাধের বিচার তাকে কখনও করতে হয়নি। এ এক বিচিত্র ঘটনা। দিনের পর দিন এই অপরাধকে কেন্দ্র করে সমস্ত অভিজাত মহলে কানাঘুষা শোনা যায়। সাড়া পড়ে যায় হাই কোর্টের আনাচে কানাচে—বার লাইব্রেরীর বারান্দায়, সন্ধ্যার পার্ক ষ্ট্রীটের

অভিজাত ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমে। জজ সাহেবের রায়ের উপর নির্ভর করছে গোটা বার কমিউনিটির ইজ্জত—ভবিষ্যত। কাজেই তাকে একটু সতর্ক হয়েই রায় দিতে হচ্ছে।

নিস্তব্ধ ঘরে বসে জজ সাহেব একমনে রায় লিখে চলেছেন। তার বা পাশে রয়েছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সরকারী নথিপত্র টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, আর একটি শক্তিশালী স্বয়ংক্রিয় রিভলবার—। একজিবিটেড আইটেম-গুলি। দেরী হলেও আজকেই রায় বের হবে বের করতেই হবে; কারণ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা জড়িয়ে পড়েছেন তারা প্রায় সকলেই কোলকাতার উচুতলার মানুষ। তারপর রয়েছে পুলিশের তৎপরতা এবং সরকারী প্রশাসনের চাপ। তাই জজ সাহেব একমনেই লিখে চলেছেন। কিন্তু কি রায় তিনি দেবেন ভেবেই পাচ্ছেন না। মানব জীবনের এমন জঘন্যতম নারকীয় ঘটনার কথা তিনি ইতিপূর্বে শোনেন নি। তাই বার বারই তিনি পুলিশের রিপোর্ট. সাক্ষীদের শুনানী ভাল করে খতিয়ে দেখতে লাগলেন। যিনি একদিন স্বেচ্ছায় ভালবেসে একজন পুরুষকে বিয়ে করেছেন তিনিই আবার কি করে এমন পৈশাচিক কাজ করলেন তা কিছুতেই জজ সাহেবের বোধগম্য হ'ল না।

বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে ফিরে এসে উৎসা রায় তার নিজের লী রোডের বাংলো বাড়ীতে এক বিরাট রিসেপশন পার্টির আয়োজন করলেন উদ্দেশ্য সমাজের গণ্যমান্য কর্তাব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সঙ্গে নিজের পরিচয় ঘটিয়ে কোলকাতায় পুরোপুরি ভাবে ব্যবহারজীবির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা হবেন। ঐ পার্টিতেই প্রথম আলাপ হয় সাংবাদিক—সাহিত্যিক পরেশ সেনের সঙ্গে। উচুতলার মানুষের জীবনে প্রেম ভালবাসা যে রকম হয়ে থাকে—এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। উৎসা রায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরেশ বাবুকে ঘন ঘন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন, নিজের গাড়ী করে তাকে অফিসে পৌছে দেন। আবার কখনও বিকেলের স্নিগ্ধ ছায়ায় কখন ভিক্টোরিয়া কখন বা প্রিন্সেপে আবার কখন সন্ধ্যার অন্ধকারে লেকের পারে নিয়ে যান। নিজের মনের মাধুরী দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ পুষবার যে স্বপ্ন একদিন দেখতেন তা সার্থক হলো রেজেষ্ট্রি ম্যারেজের মধ্যদিয়ে। কিন্তু রেজিষ্ট্রেসনের পর মাত্র ক টি মাস শান্তিতে কেটেছিল তারপরই শুরু হলো ওদের মধ্যে অশান্তি, ঝগড়া, উক্তি প্রত্যুক্তি। এরি মধ্যে জন্ম নিল তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান। মিসেস

সেন আদর করে মেয়ের নাম দিলেন মিলি ; পরেশ বাবু রাখলেন শ্যামলী ।
মিসেস সেন চাইলেন ওকে পুরোপুরি ইংরেজ করে তুলবেন পরেশ বাবুর ইচ্ছা
এই বাংলাদেশেরই শিক্ষা দীক্ষায় গড়ে উঠুক শ্যামলী । এই থেকেই সুরু হলো
সংঘাত ।

কেস সংক্রান্ত নথিপত্রের উপর আর একবার ভাল করে চোখ
বুলিয়ে নিলেন জজ সাহেব । হাতের কলম টেবিলের উপর রেখে দিলেন.
চোখের চশমা নামিয়ে চোখ দুটির ওপর আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে গভীর
চিন্তায় মগ্ন হলেন ।

এমন সময় সারা হলঘরটির নিরবতা ভেঙ্গে মিসেস সেনের কৌশলী মিঃ
রায় পরিচিত প্রথায় জজ সাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে বলে উঠলেন,

—মিঃ লর্ড !

— ইয়েস্

—মিঃ লর্ড, বলছিলাম আপনার রায়ের জন্য আমরা সকলে অধীর আগ্রহে
অপেক্ষা করছি ···আপনিও আপনার রায় লিখতে ব্যস্ত কিন্তু শ্যামলী দেবী,
আই মিন মিস সেনকে তো আমরা এখনও জেরা করিনি ··

— উনিতো লিখিত জবানবন্দী দিয়েছেন ।

— ইয়ুর অনার আদালত মিস সেনের লিখিত জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন
বটে. তবে তাকে জেরা করার সুযোগ প্রার্থনা করছি

জজ সাহেব লেখা বন্ধ করে নিজের হাতেই কলমটি একপাশে সড়িয়ে
রেখে গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন.

—প্রেয়ার সাস্‌টেইণ্ড—প্রসিড অন ।

আবার ঝিমিয়ে পড়া আদালত চাঙ্গা হয়ে উঠলো । এতক্ষণ যারা চুপ-
চাপ বসেছিলেন তারাও একটু নড়ে চড়ে বসলেন ।

মিসেস সেনের কৌশলী তার গলার টাইটি একটু টেনে ঠিক করতে করতে
গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন শ্যামলী সেনের কাঠগোড়ার কাছে । শুরু
হলো জেরা ।

—মিস সেন, একটু ভাল করে চেয়ে দেখুন তো উনি কে ?

শান্ত কণ্ঠে—শ্যামলী উত্তর দিল ।

—চিনি, উনি আমার মা ।

—মেয়ে হয়েও আপনি মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন ?

—মায়ের ঋণ শোধ করা যায় না কিন্তু তবু…

—তবু কি ?

—তবু মা যা করেছেন তার তুলনা নেই।

—আর আপনি, আই মিন—মেয়ে হয়ে তারই বিরুদ্ধে—

—ভেবে দেখুন মিস সেন—চেয়ে দেখুন মায়ের দিকে একবার…

আস্তে আস্তে শ্যামলীর দু চোখ ভরে জল গড়িয়ে এলো। একদিকে কর্তব্য অন্যদিকে স্নেহের বন্ধন।

—আপনি আপনার লিখিত জবানবন্দীতে বলেছেন যে আপনার মা ও বাবার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো কথা কাটাকাটি হতো।

—হ্যাঁ, তাই সত্য।

—এর কারণ কি ? ওরা তো দুজনেই দুজনকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, তবে ওদের সেই ভালবাসার এই পরিণতি কেন ?

শ্যামলী দেবীর কৌশলী এ সময় নাটকীয় ভঙ্গীতে আদালতকে প্রচলিত প্রথায় অভিবাদন জানিয়ে বলে উঠলেন—

— মি লর্ড, আমার মাননীয় বন্ধু আমার মক্কেলকে যেভাবে জেরা করছেন তা অত্যন্ত আপত্তিকর। বাবা মায়ের প্রেম ভালবাসা কেন দীর্ঘস্থায়ী হলো না তা মেয়ে হয়ে শ্যামলী দেবীর পক্ষে বলা মুশকিল। তাছাড়া আদালতে পেশ করা টেপ রেকর্ডার উইল স্পিক্ এভরিথিং। কাজেই এভাবে জেরা করা রীতি বিরুদ্ধ। এই সময় উভয় কৌশলীর মধ্যে দারুণ কথা কাটাকাটি হয়—উত্তেজনা চরমে উঠলে জজ সাহেব টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে শোনাবার আদেশ দেন। দুই কাঠগোড়ায় দুই আসামী মা উৎসা সেন—মেয়ে শ্যামলী সেন। একজন উত্তেজনায় লোহিত অন্যজন নির্বাক শান্ত। আদালতের একজন কর্মী এসে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিলেন—সমবেত সকলে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলেন—

সেদিন ছিল বর্ষার রাত। একটানা বৃষ্টিতে সারা শহরটার চেহারা পাল্টে গেছে। পরেশ বাবু তার ড্রইং রুমে বসে অন্যান্য দিনের মত তার স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন, টেপ রেকর্ডার চালিয়ে—

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো শঙ্খচীল শালিখের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের
নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুক ভেসে একদিন আসিব
এ কাঁঠাল ছায়ায়।"

এমন সময় উত্তেজিত ভাবে ঘরে ঢুকলেন মিসেস সেন। শুরু হলো স্বামী স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি।

—আমি জানতে চাই এসব কি হচ্ছে ?

—কিসের ?

—মিলিকে কোথায় রেখে এসেছো ?

—শ্যামলীকে আমি হোষ্টেলে রেখে এসেছি।

—হোয়াট ? কার অনুমতি নিয়ে ওকে বাংলা কলেজে ভর্ত্তি করেছো ?

—কার অনুমতি নিয়ে তুমিই বা ওর চুল ছেঁটে দিয়েছো, কাপড় খুলিয়ে স্ল্যাক্স পড়িয়েছো, ··· ? চটি খুলে হাই হিল পড়িয়েছো ?

—কারও অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি,

—সে কথাটা কি আমার বেলায় খাটে না ?

—না, না, ইম্‌পসিবল। আমার মিলি, প্রেটি মিলি, ওকে ম্যানার শেখাব বলে ইংরেজী কলেজে দিয়েছিলাম, সোসাইটি গার্ল করবো বলে পোষাক বদলে দিয়েছি ওকে ওকে আমি চাই পুরোপুরী ইংরেজ সমাজের করে গড়ে তুলতে, লাইফে ও এস্টাব্লিশড হবে।

নিজেও তো একদিন ম্যানার শিখবে বলে লরেটোতে যাতায়াত করতে, তাই আজ, ম্যানার শিখে রাত করে বাড়ী ফের, বাড়ী ফিরে আকণ্ঠ ড্রিংক করে ঝি চাকরদের গালাগালি করো, চমৎকার ! ম্যানার বোধহয় একেই বলে তাই না ?

তাতে কি হয়েছে ইংরেজ সমাজের এটাই ম্যানার !

ইংরেজ সমাজের আরও একটা ম্যানার আছে, পার্টিতে গিয়ে অন্য পুরুষের গায়ে ঢলে পড়া, কথায় কথায় দাঁত দেখিয়ে হাসা, তারপর কোমর ধরে বেল্লেপনা করা।

ষ্টপ ননসেন্স !

উৎসা ! সাবধান। এটা তোমার পার্কষ্ট্রিটের রেষ্টুরেন্ট

[illegible] মক্কেলের বাগান বাড়ী নয়, একটু সংযত হয়ে কথা বলো!
[illegible] ভরে থাক, সিন্ করোনা।

—আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু হিয়ার অল রাবিশ, বলো আমার মিলি কোথায়?

—বলছিতো শ্যামলীকে নরেন্দ্রপুরে দিয়ে এসেছি, তুমি গোল্লায় গেছো, মেয়েটাও গোল্লায় যাক এটা আমি চাই না, আমি চাই শ্যামলী এদেশের আর পাঁচটা মেয়ের মতই স্বভাবে নম্রা, রুচিতে মার্জিত, বুদ্ধিতে প্রখরা হয়ে উঠুক,

—ফরগেট দিজ ড্যাম থিংস্। বলো মিলিকে হোস্টেল থেকে ফিরিয়ে আনবে কিনা?

—না। শ্যামলীর উপর তোমার কোন রাইট নেই?

—হোয়াট্, রাইট নেই?

—না।

—তুমি কি আমার উপর হাজ্‌বেনড্রি করতে চাও?

—সেটা কি অন্যায়?

—অপ কোরস্। অন্যায় বৈকি। আমার এমবিশন ফুলফিল করতে, যারা বাধা দেয় আমি তাদের জন্য এই অটমেটিক রিভলবারটা সঙ্গেই রাখি।

—উৎসা!

—নাউ গেট ইয়রসেল্‌ফ রেডি। পরপর কয়েকটা গুলীর আওয়াজের পর একটা বুকফাটা করুণ আর্তনাদ শুধু শোনা গেল।

টেপ রেকর্ডার বাজান শেষ হলো। মিসেস সেনের কৌশলী মিঃ রায় শ্যামলী সেনের কাঠগোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে জেড়া করার ভঙ্গিমায় আবার বল্লেন,

—মিস সেন, আশা করি এইবার অন্ততঃ আপনার ঐ দুখিনী মায়ের জীবন রক্ষায় এগিয়ে আসবেন?

—জীবন রক্ষাটা বড় কথা নয়—বড় কথা সত্যকে জেনে নির্ভয়ে প্রকাশ করা....

—মিস সেন এসব আপনি কি বলছেন? চেয়ে দেখুন একবার, ঐ দেখুন আপনার মা—যে মা কতশত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দশমাস নিজের দেহে আপনাকে ধারণ করেছেন, জন্মের পর অমৃত স্পর্শে মানুষ করে তুলেছেন...

—অস্বীকার করছিনা—

—তবে, তবে প্লিজ, মিস সেন, একবার শুধু বলুন আপনার মা নির্দোষ...

—এই কথাটাই বলতে আমার সমস্ত বিবেক কেঁদে ওঠে...

শুনেও আমি কি করে...কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শ্যামলী।

—আপনার বাবার নাম কি ?

—পরেশ সেন।

—আর ইউ ভেরি শিওর ?

—আদালতে দাঁড়িয়ে এ ধরণের অশোভন প্রশ্নের জবাব দিতে আমি...

—অশোভন নয় ! বলুন ব্যারিষ্টার ঘনশ্যাম সাক্সেনা আপনার কে হন ?

—আমার কেও নন।

—তাকে চেনেন ?

—চিনি। তিনি আমার মায়ের ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহকর্ম্মী।

—তার আর একটি পরিচয়ও আছে। আড়ালে কিন্তু তিনিই আপনার বাবা...

—এসব আপনি কি বলছেন ! ..

—মি লর্ড ! আই অবজেক্ট। এ প্রশ্নের অবতারণা করা অত্যন্ত অন্যায়। বিশেষ করে শ্যামলী দেবীর স্বীকৃতির পরও এ প্রশ্ন অশোভণীয়।

শুরু হলো দুই প্রখ্যাত কৌঁশলীর লড়াই।

—মোটেই অশোভনীয় নয়। কারণ শ্যামলী দেবী নিজেই স্বীকার করেছেন যে ঘনশ্যাম সাকসেনা তার মায়ের ঘনিষ্ট বন্ধু।

—মায়ের ঘনিষ্ট বন্ধু হওয়া আর বাবা তা হওয়া এক কথা নয়।

—হতে বাধা নেই—

—মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের বন্ধুত্বের সীমারেখা এখনও এদেশে নির্দ্দিষ্ট হয়নি।

—নির্দ্দিষ্ট হয়নি—তবু কোন মহিলার যদি কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ট বা হৃদ্যতা হয় তবে সেই মহিলার পক্ষে অন্তঃসত্বা হওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

—তার সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ চাই।

—প্রমাণ ইতিপূর্বেই আদালতে পেশ করা হয়েছে।

এবার মিসেস সেনের কৌঁশলী জজ সাহেবের দিকে দাঁড়িয়ে শান্ত এবং সংযত হয়ে বলতে লাগলেন,

—মি লর্ড ! ইতিপূর্বে আদালতে যে ক্যামেরাটি পেশ করা হয়েছে তার

ভেতরে লোড করা ফিল্মের রীল থেকে আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন কি অবস্থায় মিসেস সেন এবং ঘনশ্যাম সাকসেনার ছবি তোলা হয়েছে।

জজ সাহেবের উত্তর।

—ইয়েস। আমি দেখেছি। দীঘার সমুদ্রসৈকতে বেইদিং কষ্টউম পড়িহিতা অবস্থায় মিসেস সেনের সঙ্গে সাকসেনার একটি ছবি আছে যা প্রকাশ্যে একজিবিট করা যায় না। এছাড়া আরও কয়েকটি ছবির নিগেটিভ রয়েছে যা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে মিসেস সেন ঘনশ্যাম সাকসেনার প্রতি পুর্ণ আসক্তা এবং তাদের মধ্যে····

—একজাকটলি মি লর্ড। ঘনিষ্টতার সূত্রেই একে অপরের বায়োলজিক্যাল এপিটাইটের প্রতি ঝুকে পড়ে····এবং·· তাকে বাধা দিয়ে শ্যামলী সেনের কৌশলী বলে ওঠেন—

মি মর্ড! এটা আরও জঘন্য অপরাধ যে মিসেস সেন বিবাহিতা হয়েও অন্যপুরুষের সঙ্গে বায়োলজিক্যাল কণ্ট্যাকটে আসেন।

মিসেস সেনের কৌশলী কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করে শুরু করলেন জোর তর্ক।

স্বামীর অক্ষমতার জন্যই মিসেস সেনকে অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে।

পরেশ বাবুর অক্ষমতা ছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই···পুরুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত সক্ষম ছিলেন।

সক্ষম হলে মিসেস সেনের পক্ষে অন্যপুরুষের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না····

ঘটনা তা নয়। আসলে মিসেস সেন একজন পুরো ভ্রষ্টা····তিনি ঘরেও পুরুষ চাইতেন বাইরেও প্রয়োজন হতো।

আই অবজেকট ···

তিনি ব্যভিচারিণী।

আই প্রটেস্ট

তার নিষ্টুরতার জন্যই একজন সাহিত্যানুরাগী সাংবাদিকের অকাল বিয়োগ হলো····

উভয়ের কথা কাটাকাটির মধ্যে জজ সাহেব শুনানীর সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

উপস্থিত সকলেই চাপা গুঞ্জণে ব্যস্ত। ওদিকে আসামী মিসেস সেন নির্বাক। জজ সাহেব হাতুড়ি পিটিয়ে আদালত কক্ষে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তার ঐতিহাসিক রায় দিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। প্রথমে তিনি সমগ্র ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু পাঠ করে শোনালেন। তারপর আস্তে আস্তে এক একটি পর্ব পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এক সময় তিনি জুরীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হয়েছি— আসামী মিসেস সেনকে কিছুতেই তার জঘন্যতম অপরাধের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না। এটা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে একজন মহিলার পক্ষে একই সময়ে দুই পুরুষের সঙ্গে কিভাবে বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব। পরেশ বাবুর সঙ্গে তার মতবিরোধ লেগেই ছিল, তাদের ভালবাসা শেষ পর্যন্ত মর্য্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি….। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক যে তার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না করেই ঘনশ্যাম সাকসেনার সঙ্গে আবার বিবাহিত জীবন যাপন করলেন। এবং সেই কারণেই এটা প্রমাণ করা গেলনা—শ্যামলী সেন পরেশ বাবুর না ঘনশ্যাম সাকসেনার ঔরসজাত কন্যা। মিসেস সেন তার অসামাজিক এবং অবৈধ কার্যকলাপের জন্য নিশ্চয়ই দণ্ড পাবেন কিন্তু শ্যামলী সেনের সামাজিক জীবন কোন দিকে ধাবিত হবে সেটাই এখন দেখার প্রশ্ন। একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলার বেপরোয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রার জন্য একটি তরুণীর জীবনে এমন মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভাবতে আমাদের সমস্ত বিবেক বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে আসে। যাইহোক, মাননীয় জুরীদের অভিমত গ্রহণ করে মত্ত অবস্থায় স্বামীকে হত্যার অপরাধে এবং অবৈধ ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার দরুণ আসামী মিসেস সেনকে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে যাবজ্জীবন কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করলাম। সত্যকে অনুসন্ধান করে প্রকাশ করার মধ্যেই রয়েছে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় ভাবমূর্তিটি। এক্ষেত্রে আসামীর অপরাধ লঘু করে উপস্থাপনা করার যে চেষ্টা ও কৌশল আসামীর কৌশলী করেছেন তার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাইনা। এই আদালতের পুনরায় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শ্যামলী সেন সরকারী আশ্রমে থাকবে।

রায় পাঠ শেষ করে জজ সাহেব মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। সমস্ত আদালত ভেঙ্গে পড়েছে। একদিকে মিসেস সেন অন্যদিকে শ্যামলী স্থির ভাবে কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

পালিয়ে বাঁচার আনন্দ

গোপাল ভট্টাচার্য

পালিয়ে পালিয়ে তো বাঁচার
আস্বাদ পাওয়া যায়।
এতোক্ষণ তাই ভেবে ভেবে
অস্থিরতা।

কারণ, পৃথিবীর সবদেশে
প্রতিদিন প্রেম আর বন্ধুত্ব
মাপামাপি নিয়ে এ সময়ে
(মানুষের কথাই বলছি)
সব সমাজে সবার ঘরেই
সংঘর্ষ চলছে ।

ভবিষ্যৎ আছে বলেই
বর্তমান
উদার ঐশ্বর্য—
যেন অনেকটা মতামত
জ্ঞাপন করার মতো
অনুভব।

বেঁচে বর্তে
নীড়ের মধ্যেকার জীবন
অন্তরঙ্গ শখ ইত্যাদি তো
আছেই।

পালিয়ে পালিয়ে তো
বাঁচার 'আনন্দ' কিংবা প্রাত্যহিক
আস্বাদ করতে পারা যায়।

বেশী নয়

অতীন রায়

রূপালী মুদ্রা নয়, রূপবতী নারী নয়
যশ অথবা যশেরই অন্যনাম সম্মান নয়
সুখ-সুখ, বিলাস-টিলাস এসব কিছুই নয়
এবম্বিধ কিছুই চাই না আমি
এ সুদূর প্রান্তরে অনেক কিছু আছে ছড়িয়ে
ভাগকরে নিয়ে নাও সব
শুধু রেখো
অরুণ আলো, বিজন বাতাস, বৃষ্টি
বেশী হলে দিও
লেবুফুল গন্ধ
ঈগলপাখির পালক
ঝরাপাতা
এর বেশী কিছু নয়
এর বেশী নেই কোন প্রয়োজন।

অনেক স্বপ্ন জমেছিল

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

অনেক স্বপ্ন জমেছিল—
আকাশে মেঘে মেঘে অনেক আলো মেখেছিল
তারপর মাটিতেই পড়েছিল গড়িয়ে
সবুজ শ্যামল মাঠে ছড়িয়ে।

সেই থেকে খুঁজে খুঁজে ফিরেছি
রাতের তারায় তারায়। কত মায়াজালে দিয়েছি
সবুজ শ্যামল মাঠ দিগন্ত রেখার ধারে ধারে।
স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে উষর পাহাড়ে

আমি যে নিজেকে ফেলেছি হারিয়ে
স্বপ্নের সাথে সাথে। তাই তো রয়েছি দাঁড়িয়ে
নিজেকে কখন পাব-চিনে নেব তারার আলোকে
উষর পাহাড়ে ম্লান ব্যথার ঝলকে।

সবুজ শ্যামল মাঠে-গিয়েছে হারিয়ে
আমার স্বপ্ন। উষর পাহাড় রিক্ত নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে।

আগমণী গান

দেবারুণ রায়

অনেক অনেক খুরি মামা গাছের
আবডালে, রাতের নিকষ কালো পৃথিবীটা
অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো, অজান্তে ;
প্রতিবাদ ধ্বনিত হল শুধু ক্ষণিকের ।

দূরন্ত অজানার ভয়ে ওরা নির্বাক ।
ওদের পরিচয় নামহীন ঠিকানার প্রতীক ।
কিন্তু ওদের ছিঁড়ে যাওয়া, আর
ফেটে যাওয়া অসংখ্য বেনামী বুক ?

সেই ঝাঁকড়া হওয়া ঝাঁকড়া গাছের,
সেই জুতোর কাঁটায় দীর্ণ পৃথিবীর,
ক্ষতের তাজা রক্তের হিসেব পাবে
রক্তবীজে উপ্ত অম্লান ঘাসের কাছে ।

চরম প্রতিশোধের মন্ত্রে ওরা সোচ্চার ।
কিন্তু শতাব্দীর আকাশের তারাদের সাথে
গুটিকয়েক বৃদ্ধ প্রাচীন, অনিমেষে কান পেতে
দূর দিগন্ত স্রোতে ভেসে আসা শারদের আগমণী-গান শোনে ।

সাহস

শান্তি রায়

এমন দুর্বিনীত স্পর্ধা তুমি পেয়েছো কোথায়
এখন চারিদিকে ভয় ও নড়ে ভিত / টালমাটাল
হৃৎপিণ্ড ও বিবেক
বিবেকের মগ্ন জ্বরে সবকিছু হুহু পুড়ে যায়....

বাঁচবার মানষিক সাহস সেখানে তবেই তো ধরা পড়ে
আলোর হরিণ
কিছু স্বপ্ন রূপোলি রূপকথা, ভোর...!

কানু কহে রাই

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিব্যেন্দু সেদিন সরাসরি তাদের বাড়িতেই এল। ওদের গাড়ী গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলে দারোয়ান আবার গেট বন্ধ করে দিলে।

নবেন্দু খানিকটা আগেই তার গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়েছিলেন। ওরা বাড়ির ভেতরে চলে গেলে পর তিনি আস্তে আস্তে বাড়ির সামনে এগিয়ে এসে দেখলেন গেটের থামের গায়ে বসানো শ্বেত পাথরের প্লেটটার ওপর—

॥ শান্তি কুটীর ॥
শ্রীসূর্যপ্রসাদ বসু
সাদার্ন অ্যাভিন্যু
বালিগঞ্জ

বাড়ির মালিকের নামটা ধ্বক করে যেন বুকে বাজলো নবেন্দুর। বড় পরিচিত নাম। অবশ্য এক নামে অন্য ব্যক্তি থাকাও বিচিত্র কিছু না। কিন্তু তবু ঐ নামটা যেন ফেলে-আসা প্রায় বিশ বছর আগের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। ঐ নামটা কয়েক বার আপন মনেই আবৃত্তি করলেন তিনি।

বাবুর দেরী হচ্ছে দেখে বাঙালী ড্রাইভার ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে কাছে এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গীতেই জিজ্ঞেস করলে স্যার আপনি কি ফিরবেন ?

নবেন্দুবাবুর মনে পড়ে গেল—এখন তিনি পুলিসের লোক। সুতরাং সেই গাম্ভীর্য বজায় রেখে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, চলো যাচ্ছি।

এদের কথাবার্তা দারোয়ানজী বোধ হয় শুনতে পেয়েছিল। সে তার খৈনীর দলাটায় বার কয়েক চাপড় মেরে সেটা ঠোঁটের ফাঁকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এগিয়ে এল ওদের দুজনের দিকে। গেট অবশ্য বন্ধই ছিল। ভেতর থেকেই হাঁকলে সে—বাবুসাব, কাকে খুঁজছেন ?

নবেন্দুবাবু এমন একটা ভঙ্গী করলেন—যেন তাঁর ভুল হয়ে গেছে। চটপট জবাব দিলেন ওর কথায়—না দারোয়ানজী. কাউকে না।

তারপর স্বগতঃ উক্তি করলেন—হুঁং নাম্বার।

এরপর ট্যাক্সী-ড্রাইভারকে বললেন—চলো।

নবেন্দুবাবু গাড়ীতে যেতে যেতে ভাবলেন—বরাত তাঁর ভালই, একদিনেই সব কিছু জানা হয়ে গেল।....

বাড়ি পর্যন্ত অবশ্য ট্যাক্সীর খরচা বাড়াননি তিনি। কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর কাছে ট্যাক্সীর ভাড়া তিনি মিটিয়ে দিয়ে ধর্মতলার ট্রামে চেপে বসলেন।

বাসায় যখন ফিরলেন তখন তাঁকে বেশ গম্ভীর মনে হলো।

কল্পনার মা অবাক। তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন একবার—তোমার কি শরীরটা খারাপ।

না, ভালই আছি।

সংক্ষিপ্ত জবাব।

এরপর নবেন্দু রায় যথারীতি স্নানাদি সেরে চা-জলখাবার খেয়ে অফিসের ফাইলের স্তূপ নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু কাজের মানুষ আজ কাজ করতে পারলেন না। কল্পনার কথা, সূর্যপ্রসাদ বোসের ইতিহাস বারবার তাঁর মনে পড়তে লাগলো। অস্থিরভাবে তিনি পেছনে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারী করতে লাগলেন।

সাধারণতঃ রাত সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে খেতেন তিনি। সকালের দিকে সম্ভব না হলেও অন্ততঃ রাত্রের দিকে প্রত্যহ তিনি কল্পনার সঙ্গেই খেতে বসতেন। একজনের অনুপস্থিতিতে আর একজনেরও খেতে দেরী হয়ে যেত অনেক সময়।

আজ কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলো। রাত নটা বাজতে না বাজতেই গিন্নীকে ডেকে বললেন—আমায় খেতে দাও।

কল্পনার মা অবাক।

সে কি! খুকী এখনো ফেরেনি যে?

অদ্ভুত কুপিত দৃষ্টি নবেন্দু রায়ের।

এরপর আর কথা চলে না।

সেই দিনই রাত্রে—

কল্পনা খেতে বসে অবাক হলো। মা তার চিন্তার নিরসন ঘটালেন—বাবা তোর আগেই খেয়ে নিয়েছে আজ।

সে কি?

হাঁ।

কিন্তু বাবা তো কোনো দিন এমন করেন নি—এ রকম দেরী তো আমার আরো অনেক দিন হয়েছে।

তা জানি না মা। মনে হলো, মানুষটার মেজাজটা আজ ভালো নেই।

কল্পনার বুকটা ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠলো? ভাবলো, সেকি তবে ধরা পড়ে গেছে বাবার কাছে?

নবেন্দুবাবু ঘুমান নি। ইজিচেয়ারে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। মা—মেয়ের অস্পষ্ট কথা ভেসে আসছিল ভেতর থেকে। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন ইজিচেয়ার ছেড়ে। এগিয়ে এলেন দরজা বরাবর। তারপর গলার স্বরটা একটু উঁচু করে বললেন—

খুকীর খাওয়া হলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও। ওর সঙ্গে দুটো কথা আছে।

বাবার কণ্ঠস্বর শুনে কল্পনার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো। সেদিন রাত্রে ঠিকমতো খেতে পারলে না সে। কোন রকমে আহার-পর্বটা সমাধা করে বলির পাঁঠার মতো ভেতরে ভেতরে কাঁপতে কাঁপতে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মা ওর সাহস করে ঘরে ঢোকেন নি—দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন বাপ-বেটির মধ্যে কি কথা হয় তা শোনবার জন্যে।

নবেন্দুবাবু ইজিচেয়ারটাতেই বসেছিলেন। বেশ গম্ভীর। কল্পনা গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়ালো।

আমায় কিছু বলবেন বাবা?

নবেন্দু সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারটাতে। সোজা স্পষ্ট করে তাকালেন মেয়ের দিকে। তার অন্তরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে চান যেন। দৃষ্টি তাঁর এক্স-রে মেসিনের মতো মর্মভেদী।

কল্পনা মুখ নীচু করলো।

বসো।

কঠোর কঠিন কণ্ঠস্বর নবেন্দু রায়ের।

কল্পনা বসলো খাটের একপাশে।

কল্পনা, আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার। তাই আমরা এমন কোনো কাজ করবো না যা আমাদের সীমার বাইরে চলে যাবে। উচ্চ আশা থাকা ভালো, বড়লোক বন্ধু থাকা ভালো কিন্তু তবু যে-সমাজে এখনো মেয়ের বাপকে মেয়ের

বিয়ের দেওয়ার সময় আড়ালে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়, টাকার তুলাদণ্ডে মেয়েকে ওজন করে বিক্রি করতে হয় সেখানে অন্তঃ আজকের দিনের শিক্ষিতা মেয়েদের সাবধান হওয়া উচিৎ। যা নাগালের বাইরে তাকে পাবার জন্যে হাত বাড়ালে শেষ পর্যন্ত পস্তাতে হয়। তাই বলি, জীবনটাকে খেলার বস্তু করে তুলো না।

কল্পনা প্রথমে জবাব দেয়নি বাবার কথায়। কিন্তু ভাবলো, এ সব ব্যাপারে চুপচাপ থাকা উচিত নয়। তাছাড়া বাবার অহেতুক সন্দেহ, ভুল বা অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিলে কালে হয়তো তা একদিন বিষম পরিস্থিতির সূচনা করবে। তাই সে জবাব দিলে নীচু গলায় বাবাকে—দিব্যেন্দুদাকে আপনি চেনেন না বাবা, অমন মানুষ হয় না। উনি অনেক দিনই চেয়েছেন আপনার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে। আমিই তা পারিনি ভয়েতে করিয়ে দিতে। তাছাড়া আর একটা কথা—জানি না, আপনি তা বিশ্বাস করবেন কিনা। মানুষটার আচার-আচরণে কথাবার্তায় মনে হয় উনি যেন আমাদের বিশেষ পরিচিত। এমন কি, মুগের নাড়ু যা আমি খেতে ভালবাসি, রবীন্দ্রনাথের যে-গানটি আমার বিশেষ প্রিয় সেটিও যেন ওঁর জানা ! এটা কেমন কোরে সম্ভব হয় বাবা ?

এরপর দিব্যেন্দুর স্বপ্নদর্শনের কাহিনী বলেছিল সে। এমন কি—তাদের উভয়ের হাতে-আঁকা প্যাগোডা আর A. S. আমার ত্রুটির কথাও জানালো। আরও বলেছিল সে ওঁর সাথে চাক্ষুষ আলাপ হবার পূর্বেই তিনি ওর কতক-গুলি ছবি এঁকেছিলেন যেগুলি এখানকার চেহারার সঙ্গে হুবহু এক।

নবেন্দুর কানে কিন্তু ঐ একটা মর্মস্পর্শী কাহিনী মাত্র প্রবেশ করেছিল—সেটা হলো ঐ সাইক্লোন আর জাহাজডুবির কথা। তিনি সামলাতে পারেন নি নিজেকে। ইজিচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন তিনি। ফেলে আসা জীবনের একটা ছেঁড়া পাতা চোখের সামনে দুলতে লাগলো। ... জীবনটা পেছিয়ে গেল পঁচিশ-তিরিশ বছর প্রায়। তখন তাঁর সংসারে এসেছে নতুন অতিথি—বড় কামনার ধন স্বামী-স্ত্রীর একান্ত প্রিয় সন্তান—ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু। দিন গড়িয়ে চলে—শিশুটি বাড়তে থাকে প্রকৃতির বাঁধাধরা ছক অনুযায়ী। ভাঙা ভাঙা আধো আধো বোল ফোটে ছেলেটির। কিন্তু বড়ো অদ্ভুত তার জীবন রহস্য। ব্যাকুল দৃষ্টি তার কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়—অস্পষ্ট ভাষা তার শুধু চোখেরই নয়—মুখেরও। একটি কথাই শুধু তার মুখে শোনা যেত বারবার—কপ্‌পনা কই ? কপ্‌পনা ?...

অদ্ভুত জিজ্ঞাসা। ঐ শিশুর।

শেষ পর্যন্ত সবাই বললে—পূর্বজীবনের স্মৃতি ভুলতে পারে নি ও। তাই এ জন্মেও সে তার একান্ত মনের মানুষ—কপ্‌পনা অর্থাৎ কল্পনা নাম্নী কোনো মেয়েকে খোঁজে।

প্রসঙ্গটা আসলে জন্মান্তরবাদের। মনোবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয়।

এর পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। ঘটনাটি ঘটে অবশ্য বছর তিনেক পরে। নবেন্দু রায় যে অফিসে চাকরী করতেন তাঁর মালিক হরিহর দত্ত একটু বেশি বয়সেই সন্তানের মুখ দেখলেন। একটি কন্যা।

বার্মাবাসী প্রতিটি বাঙালী পরিবার খুশি হয়েছিল। সবাই দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল অশেষ সৌভাগ্যবতী নবজাতক কন্যাটিকে। দত্ত সায়েবের অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। মনে মনে সেদিন একটি মানুষ খুশি হ'তে পারে নি—বাইরে খুশির ভাব দেখালেও। সে হলো দত্ত সায়েবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সূর্যপ্রসাদ বোস। হরিহর দত্ত প্রায়ই একটা কথা বলতেন—আমার আর কে আছে—সূর্যর বুদ্ধির জোরে ব্যবসা আমার ফেঁপে উঠেছে, ওকেই আমি আমার সব দিয়ে যাবো। ও আমার ছোট ভায়ের মতো। ···

স্বাগতার জন্মের পর একথা আর ওঠে না। মেয়েটির নামকরণও করেছিল দত্ত মশাইয়ের বাড়িতে সারা বার্মাবাসী বাঙালীরা। আনন্দোৎসবে সবারই কণ্ঠে একটি কথাই শুধু ধ্বনিত হলো—"দত্ত মশায়ের একটি সন্তান হোক—এটা ছিল আমাদের সবারই কাম্য বিষয়। আজ ভগবান আমাদের সে-আশা পূর্ণ করেছেন। তাই ওঁর ঐ কন্যা-সন্তানকে স্বাগত জানিয়ে ওর নাম স্বাগতা রাখা হোক।"

দত্ত-দম্পতি সানন্দে মেনে নিলেন তাঁদের প্রস্তাব।

আর সেই দিনই নবেন্দুবাবুর ছেলে অরবিন্দ মায়ের কোলে থেকেই বারবার নবজাতক স্বাগতাকে দেখিয়ে বলছিল—মা, ঐ তো আমার কপ্‌পনা!—

নবেন্দুবাবুর স্ত্রী ধমক দিয়ে ছেলেকে চুপ করিয়ে দিলেও সে কিন্তু তার কল্পনাকে ভোলেনি—মাঝে মাঝে আপন মনেই খেয়ালের ঝোঁকে ঐ কথাগুলোই বলেছিল।

ব্যাপারটার শেষ এখানেই হয়নি। দত্ত সায়েবের স্ত্রীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন নবেন্দুবাবুর স্ত্রী। বয়েসে কয়েক বছরের তারতম্য থাকলেও উভয়ে বন্ধুর মতনই ছিলেন। কারণ মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক বড়ো একটা বয়সের

সীমারেখা দিয়ে আলাদা করা যায় না।

যাই হোক, অরবিন্দ ও স্বাগতার ব্যাপারটা সবারই কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত। অনেকেই মন্তব্য করলে—গত জন্মে হয়তো এরা খুব নিকট-সম্পর্কীয় ছিল—স্বামী-স্ত্রী থাকাও বিচিত্র নয়।—

সূর্যপ্রসাদ বোস ছিলেন এ ব্যাপারে নিরুত্তর। এ ব্যাপারটা তাঁর মনে কৌতূহলের সঞ্চার না করে বরং ভয়েরই সৃষ্টি করলো। সূর্যপ্রসাদের মনে হলো ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ যেন তাঁর কাছে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বপ্ন বুঝি তাঁর সার্থক হবে না।—

স্বাগতার মধ্যেও কেমন যেন অরবিন্দর জন্য একটা আকর্ষণ অনুভব করা যেতে লাগলো বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। দত্ত দম্পতীর ইচ্ছায় দিনের বেশির ভাগটা সময়ই অরবিন্দর কাটতো স্বাগতাদের বাড়িতে—এমন কি খাওয়া-দাওয়া সবকিছু। সন্ধ্যার দিকে হয়তো দত্ত গিন্নী বা তাঁর ঝি বাড়ির গাড়ী করে ওকে ওর বাড়িতে দিয়ে আসতো। আবার কোনদিন নবেন্দুবাবু বা তাঁর স্ত্রী এসে অরবিন্দকে নিয়ে যেতেন। এইভাবে দুটি পরিবারের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য থাকলেও ক্রমশঃ উভয়ে উভয়ের একান্ত আপনজন হয়ে উঠলো।

নবেন্দুবাবুকে তাঁর স্ত্রী বলতেন মাঝে মাঝে—জানো, অরু আমাদের খুব পয়মন্ত।

কথাটা মিথ্যে নয়। অরবিন্দ—স্বাগতার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করেই নবেন্দুবাবুর উন্নতি হলো। সামান্য বড়বাবু থেকে মালিকের কৃপায় সহকারী ম্যানেজার পদে উন্নীত হলেন। সূর্যপ্রসাদের সহকারী। সূর্য সাদ কিন্তু এতে খুশি হননি। আড়ালে মালিকের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। উপরন্তু যা শুনলেন তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হয়ে উঠলো।

হরিহর দত্ত শুনিয়েছিলেন—সূর্য, মনে মনে এটা আমি সংকল্প করেছি—নবেন্দুর ছেলে অরু বড়ো হলে ওর হাতেই স্বাগতাকে তুলে দেব। ওদের গত জন্মের ভালবাসাকে সার্থক করে তুলবো।—

হরিহর দত্তের যে সাধ পূর্ণ হয়নি। এর আগেই শুরু হয়েছিল সারা বার্মায় ভারতীয় বিতাড়ন। তিনিও একটা জংগলে কর্মরত শ্রমিকদের

কর্মবিরতির ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে তাদের দাবী দাওয়া মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করে ফিরে আসার পর অসুখে পড়লেন এবং সেই অসুখই তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটালো। মৃত্যুর পূর্বেও হরিহর দত্ত অবোধ শিশু স্বাগতা—অরবিন্দের হাত দুটি এক করে দিয়ে বিশেষ করে সূর্যপ্রসাদকে বলে গেলেন—এদের সবার ভার তোমার ওপরেই দিয়ে গেলাম সূর্য, তুমি আমার ছোট ভায়ের মত—এদের তুমি দেখ।

সূর্যপ্রসাদ সেদিন মিথ্যে কথা দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন মৃত্যুপথযাত্রীকে। অন্তরের পিশাচটা সেদিন তাঁর আনন্দে নৃত্য করছিল। বিধবার অবর্তমানে নাবালিকার সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আইনতঃ এসে পড়লো। দত্ত সায়েবের স্ত্রী-ও সরল বিশ্বাসে সূর্যপ্রসাদের হাতে তুলে দিলেন সব কিছু। সূর্যপ্রসাদের স্বপ্ন সার্থক হলো। বিধবা জানতেও পারলেন না তিনি কি হারাচ্ছেন। কারণ এর আগেই নবেন্দুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন সূর্যপ্রসাদ বোস। মিথ্যে একটা তহবিল তছরূপের অজুহাত দেখিয়ে তাকে চাকরী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। দত্ত সাহেবের স্ত্রীকে বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে—দেখলেন তো বৌদি. দাদা মারা যেতে না যেতেই কর্মচারীরা কেমন বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠলো! যাকে আপনারা বিশ্বাস করতেন সব থেকে বেশি—এমন কি যার ছেলেকে জামাই করতে চেয়েছিলেন—সেই-ই কিনা সবার আগে বিশ্বাসঘাতকী করলে!!

সরলা বিধবা সূর্যপ্রসাদের কূটনৈতিক চাল বুঝতে পারেন নি। তিনি তাই বলেছিলেন—ঠাকুরপো, তুমি যা ভালো বুঝবে কোরো; আমি মেয়েমানুষ—এ সবের কি বুঝি?

শুধু চাকরী নয়-দত্ত বাড়িতে আসাও বন্ধ হয়েছিল এর পর নবেন্দু-দম্পতীর।

নবেন্দুবাবুর স্ত্রী এর প্রতিবাদ করলে পর নবেন্দুবাবু জবাব দিয়েছিলেন—কোনো লাভ নেই অরুণা। সূর্যপ্রসাদের পক্ষে ক্ষমতার গদীতে বসে রাতকে দিন ক'রে দেওয়াও সম্ভব। তবু ভালো, সে আমায় কোর্ট পর্যন্ত টেনে না নিয়ে গিয়ে তার আগেই মুক্তি দিয়েছে।—

সূর্যপ্রসাদ এরপর সুদূর বাংলা দেশ থেকে শ্বশুর বাড়িতে লালিত-পালিত মাতৃহারা সন্তানকে নিয়ে এসেছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর ঔরসজাত সন্তানকে তিনি দূরে ঠেলে দেননি। ইতিমধ্যে

সূর্যপ্রসাদের শ্বশুর-শাশুড়িও মারা গিয়েছিলেন। বিত্তশালী একমাত্র অ্যাটর্নী শ্যালক সূর্যপ্রসাদের হাতে তাঁর শিশু সন্তানকে তুলে দিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করেননি। বিদায়কালে সূর্যপ্রসাদকে বলেছিলেন—সূর্য, তুমি আমায় ভুল বুঝ না, তোমার দুঃখ আমার মা-বাবা এবং ছোট বোন না বুঝলেও আমি বুঝি। চিরদিন আঘাতই তুমি পেয়ে গেলে—আঘাত ফিরিয়ে দাওনি কোনদিন।

সূর্যপ্রসাদের ঠোঁটের ফাঁকে ব্যথার হাসি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল! মনে মনে ভাবেন তিনি—বড়লোকের ছেলেরা বড়ো অসহায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিসর তাদের জীবনে খুবই অল্প পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির লোভে অনেক সময় অনেক অন্যায়কেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হয়। ভয় হয় পাছে না বাপ-পিতামহের অপ্রিয় হয়ে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এক্ষেত্রে বিকাশকান্তি মিত্তিরেরও তাই হয়েছিল। বাপ-মার কিংবা বোনের অন্যায়কে সে নির্বিবাদেই প্রশ্রয় দিয়েছিল, প্রতিবাদ জানিয়ে কারও অপ্রিয় হয়নি সেদিন।

সূর্যপ্রসাদ বিনা কারণে তাঁর একমাত্র সন্তান দিব্যেন্দুকে বার্মায় আনেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বাগতা ও দিব্যেন্দুকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে তোলা এবং দত্ত সায়েবের বিধবার মনে অরবিন্দ সম্পর্কে যে দুর্বলতা স্বভাবতই গড়ে উঠেছিল তাকে সমুখে নষ্ট করে দেওয়া। অনেকেই এটা আন্দাজ করেছিলেন কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করে বোস সায়েবের অপ্রিয় হতে চাননি কেউ।

স্বাগতা কিন্তু অরবিন্দকে ভুলতে পারে না। দিব্যেন্দুর সান্নিধ্য তাকে খুশি করতে পারেনি। দত্ত-গিন্নী সব বুঝেও নির্বাক থাকেন। বোবা মন গুমরে কেঁদে ওঠে তাঁরও। কিন্তু সূর্যপ্রসাদের কাছে প্রতিবাদ জানাবার মতো মানসিক প্রস্তুতি বা সাহস তাঁর ছিল না।

এর পরের ইতিহাস যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই করুণ ও মর্মস্পর্শী। সারা বার্মাবাসী প্রবাসী ভারতীয়দের জীবনে একটা বিরাট ওলট-পালট! কাজ কারবার গুটিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।...

ক্রমশঃ

কাপুরুষ

লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্যাক্সিটা শেষ পর্যন্ত গাড়ী বারান্দার সামনে ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সুব্রতা একবার সেদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। তার ব্যাগে যা আছে তাতে বাড়ী পর্যন্ত ট্যাক্সি ভাড়া হবে না। টিফিনে বন্ধুদের সংগে খাওয়াটা একটু বেহিসেবী হয়েছে। ব্যাগটা প্রায় খালি। খরচা সুব্রতার একলার হয়নি। মীরা, জলি, সীমা, আরতি সবাই খরচ করেছে। আজ দিনটা সুব্রতার স্মরণীয়ও বটে। জীবনের আর একটা অধ্যায় তার শেষ হতে চলেছে।

সুব্রতা ভাবলে, বৃষ্টিতো আর সারাক্ষণ হচ্ছে না; এখুনি না থামে আর খানিকবাদে তো থামছে। গাড়ীটা তো জলের মধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় বেশ খানিক জল জমেছে। এটা কোলকাতা শহরে নতুন কোন দৃশ্য নয়। এবার সিএমডিএ এসেছে কোলকাতার মানুষকে বৈতরণী পার করাতে। এখানে ওখানে সমুদ্রের মিনি সংস্করণ দেখা যায়।

সুব্রতা মনে মনে ট্যাক্সি ড্রাইভারের প্রশংসা করে। বেশ ভদ্রতো! প্যাসেঞ্জারকে একেবারে শুকনো জায়গায় নামবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। গাড়ীটা থামতেই গাড়ী বারান্দার নীচে থেকে কয়েকজন বৃষ্টির জল মাথায় করে ছুটে যায় সেদিকে। বেশ ভীড় জমেছে এখানটায়। মাথা বাঁচাতে সুব্রতার মত আফিস ফেরৎ অনেক মেয়েপুরুষ আশ্রয় নিয়েছে।

সুব্রতা শুকনো মুখে পাশের দোকানের শো কেসের গয়নাগুলো দেখছিল। কয়েকদিন আগের দেখা গয়নাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছিল। মনে পড়ছিল আপিসের কথা। গত বছর দুয়েক ধরে অনেকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আপনাকে ডাকে।

পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের কথায় সে ফিরে তাকাল।

আমাকে? কে! সুব্রতা পরিচিত মুখের খোঁজে এদিক ওদিক তাকায়।

ঐ যে ট্যাক্সি থেকে। ভদ্রলোক দেখিয়ে দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে হাসেন।

আসুন মিস্ দত্ত। যাবেন তো?—গাড়ীর পিছনের সিটের দরজা খুলে সুদর্শন এক ভদ্রলোক তাকে হাতছানি দিচ্ছে।

এই বৃষ্টি বাদলার দিনে অপরিচিত ভদ্রলোক এতলোক থাকতে তাকে ডাকতে যাবে কেন? সুব্রতা দত্ত এখনও মিস দত্তই বটে। কে এই ভদ্রলোক? বিস্মিতা হয় সুব্রতা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে তার বেশীক্ষণ লাগে না। ভদ্রলোককে সে দেখেছে বটে। তাদের বিল্ডিংসএ উপর তলার কোন আপিসে কাজ করেন। একই লিফ্‌টে ওঠানামা করেছে। অনেক সময় সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি উঠেছে, নেমেছেও। টিফিনে বান্ধবীদের সঙ্গে যখন আপিসের কাছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাটা পেঁপে, কলা, আনারস কাঠি ফুটিয়ে ফুটিয়ে টপাটপ মুখে দিয়েছে, এই ভদ্রলোককে পাশ দিয়ে এক চিলতে হেসে চলে যেতে দেখেছে। একদিন তো ভদ্রলোকের মুখের উপরেই লিফ্‌টের দরজা টেনে দিল লিফ্‌টম্যান। সুব্রতা 'লেডিজ', তাই বোঝার উপর শাকের আঁটির মত সবশেষে আশ্রয় পেয়েছে। হাসি চাপতে পারেনি সুব্রতা। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে সুব্রতার মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি বিপুল বেগে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল। ইস্! ভদ্রলোকের মুখখানা তখন কেমন করুণ দেখাচ্ছিল।

একটু ইতস্তত: করল সুব্রতা। তারপর কখন যে ট্যাক্সিটার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল, তা নিজেই ভাবতে পারে না। ভদ্রলোক ঐ বৃষ্টির মধ্যে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন তাকে তুলে নেবার জন্য। সম্ভ্রম জাগে সুব্রতার মনে।

সে ডাইনে চেপে ঠিক হয়ে বসবার আগেই ভদ্রলোক সিটে বসে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ট্যাক্সিটা বার কয়েক গোঁ গোঁ করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়ল; তারপর চলতে সুরু করল সোজা দক্ষিণ মুখো।

এক গাড়ীবারান্দা মেয়ে-পুরুষ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওদের ট্যাক্সিটার দিকে। যুবকেরা তো সুব্রতার কাঁধের ডাগর এক ফালি সাদা অংশের স্মৃতি অনেকক্ষণ ধরে রোমন্থন করল। নেহাৎ একালে চোখের আগুনে মানুষ ভস্ম হয় না, তাই যুবকটি বহাল তবিয়তে ট্যাক্সিতে সুব্রতার পাশেই বসে রইল।

ঠিক যাচ্ছে তো? ভদ্রলোক প্রথম মুখ খুললেন। মুখে তার বিজয়ীর হাসি।

মাথা নাড়ল সুব্রতা। জিজ্ঞেস করল জানলেন কি করে?

সে কথা থাক। নামবেন কোথায় তাই বলুন। ভদ্রলোক বেশ সপ্রতিভ।

এতই জানেন যখন সেটা কি আর জানেন না? সুব্রতার চোখে মুখে কৌতুক ফুটে ওঠে। —তুললেন যখন নামিয়েও নিশ্চয় দেবেন।

নিশ্চয়ই। —হো হো করে ভদ্রলোক হেসে ওঠেন। বেশ দিলখোলা হাসি।

বাইরে বৃষ্টি বেশ জোরে নেমেছে।

আপনি কতদূর যাবেন? সুব্রতা পাল্টা প্রশ্ন করে।

আপনি যতদূর।

সে কী! আমি তো নাকতলায় যাব। আপনিও নাকতলায় থাকেন নাকি! সুব্রতা বিস্মিত হয়। আপিসে আসা যাওয়ার পথে এঁকে কোনদিন দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না তার।

নাকতলায় না থাকলেও রথতলায় থাকতে পারি তো। কিংবা গাছ-তলায়। সুব্রতা অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকায়। আপিসের আশে পাশে, সিঁড়িতে, লিফ্‌টে তাকে দেখেছে বটে। কিন্তু একই পথে থাকেন অথচ একদিনও দেখা হয়নি। ভাবে, সবার সঙ্গে যে সব সময় দেখা হবে এমন তো কথা নেই। ভদ্রলোক হয়ত দেরী করেই আপিস যান। কিন্তু ফেরেন? মাঠে ময়দানে যেতে পারেন। বেশ স্বাস্থ্য। এক কালে হয়ত খেলাধুলো করেছেন। এখনও করেন কিনা কে জানে।

ভয় পেলেন? কোন তলাতেই থাকি না। হেসে ওঠেন ভদ্রলোক। বেশ দিল খোলা হাসি।

আপনি ওদিকে কোন কাজে যাচ্ছিলেন বুঝি? একটু উদাসীন সুরে কথা বলে সুব্রতা। ছেলেদের প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল; সে ভাবে।

আপনাকে পৌঁছে দেওয়াও তো একটা কাজ।

তা তো বটে। কিন্তু হঠাৎ এক অপরিচিতা মহিলাকে গায়ে পড়ে বাড়ী পৌঁছে দিতে চললেন কেন? সুব্রতার ইচ্ছা করছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে একচোট ঝগড়া করে।

আপনি অপরিচিতা হবেন কেন?

অপরিচিতা বই কি, আলাপ তো নেই।

মুখের আলাপই কি একমাত্র আলাপ?

সুব্রতা কোন জবাব দিতে পারে না। সত্যি তো ভদ্রলোকের সঙ্গে কতদিন কতবার চোখাচোখি হয়েছে। বিশেষ করে লিফ্‌টে দরজা বন্ধ করবার দৃশ্য কোনদিন ভুলবার নয়।

আচ্ছা ধরুন, যদি বৃষ্টি আরো জোর নামে। ভদ্রলোকই আবার কথা শুরু করেন।

নামল ; আমরা তো ট্যাক্সিতে রয়েছি। সুব্রতা উত্তর দেয়।

রাস্তায় দারুণ জল জমে যায়, আর গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ে। ভদ্রলোক মৃদু হাসেন। সত্যিই তো। সুব্রতা তো সেকথা ভাবেনি। সে কাঁচের গায়ে চোখ রেখে বাইরে দেখতে চেষ্টা করে, বৃষ্টি কত জোরে নামছে। কী বিপদেই না পড়ল সে। আকাশটাকে ও ভাল করে দেখতে পারছেনা। কাঁচে জল জমেছে। ট্যাক্সিতে না ওঠাই ভাল ছিল। এখন তো আর এই জলের মধ্যে নেমে পড়তে পারে না। সেটা ভারি অভদ্রতা হবে। কিন্তু ভদ্রলোকের এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য কী ?

গাড়ী জোরে চলতে পারছে না। জল কাটিয়ে এগুতে হচ্ছে। চাকার দুপাশে ফোয়ারা দিয়ে জল উঠছে। দুপাশে জলে ঢেউ তুলে গাড়ী এগুচ্ছে। দেখতে ভারি ভাল লাগছে। একখানা ডবল ডেকার কেমন দুলকি চালে রাজহাঁসের মত বেরিয়ে গেল। ড্রাইভার কি ভাটিয়ালি গান ধরেছে ! বাংলাদেশের লোক বুঝি। বেচারা এখনও পদ্মার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কোলকাতায় না এলে হয়ত ঝড় তুফানে পদ্মার বুকে পাল তুলে দিয়ে পাড়ি জমাত। নামুক বৃষ্টি জোরে—আরো জোরে। ডুবুক রাস্তা—ভাসুক কোলকাতা। ভদ্রলোককে তার হঠাৎ খুব ভাল লাগল। বৃষ্টির দিনে সঙ্গী না পেলে সব মাটি। আর সে সঙ্গী যদি মনের মত হয়। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের জন্য তার মনটা কেমন করে ওঠে।

সত্যি যদি গাড়ী না চলতে পারে । সুব্রতার কথা শেষ হতে না হতে

গাড়ী ক্যাঁচ করে আর্তনাদ তুলে এক ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আকস্মিকতায় সামলাতে পারেনা সুব্রতা। সে বাঁ দিকে কাত হয়ে ভদ্রলোকের গায়ে এসে পড়ে। ইস্ ! চালচুলো জানা নেই। চেনাজানা কেউ দেখে ফেলে যদি। ড্রাইভারটা কী পাজি ! নিশ্চয় ওদের কথাবার্তা শুনছে। ভদ্রলোক তাকে কী ভাবছে ! ছি—ছি—।

কী হলো সর্দারজি? ভদ্রলোক ড্রাইভারের ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে। পরে সুব্রতাকে বলে, আহা! লাগল আপনার?

সামনে পর পর অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। কড়্—কড়্—
—কড়্—কড়াৎ। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। তীব্র আলোর ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। সুব্রতা কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয়। এর চেয়ে ভাল ছিল বারান্দার নীচে।

ভয় পেলেন নাকি? এই দুর্যোগের মধ্যে ভদ্রলোককে মৃদু হাসতে দেখে সুব্রতার রাগবেড়ে যায়। তার গা পিত্তি জলতে থাকে যেন।

আচ্ছা, আমি কতবার আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি। আপনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক সুব্রতার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে।

ও, তাই বুঝি আজ বৃষ্টির সুযোগ বুঝে পিছু নিয়েছিলেন।.

যদি তাই-ই হয়।

আমার সঙ্গে আলাপ করে আপনার লাভ?

লা—ভ! আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমার লাভ! সত্যি লাভের কথা জিজ্ঞেস করছেন? তারপর একটু থেমে সুব্রতার মুখে চোখ রেখে বলে, আপনি কুমারী সুব্রতা দত্ত আর আমিও কুমার সঞ্জীব বসু।

এক ঝলক সতেজ রক্ত প্রবাহ সবেগে ছিটকে পড়ে সুব্রতার সমস্ত চোখে মুখে। তার টানাটানা চোখের দৃষ্টি কী যেন খুঁজতে নেমে আসে তার নিজেরই পায়ের কাছে। পায়ের নখ দিয়ে দাগ কাটতে থাকে গাড়ীর কঠিন বুকে। বাইরে ঝড় বৃষ্টির দাপাদাপি বেড়ে চলেছে। শোঁ শোঁ শব্দ কানে যেন কত কুমার কুমারীর দীর্ঘশ্বাস ঢেলে দেয়। কল্লোলিনী কোলকাতা তার সমস্ত পরিচিত জগৎ নিয়ে বৃষ্টির জলের কলরোলে কোলাহল করে ওঠে।

কুমার সঞ্জীব বসুর জন্য সুব্রতার কুমারী হৃদয় সহানুভূতি বোধ করে। একটি মুখচোরা যুবকের স্মৃতি রোমন্থন করে'। সঞ্জীব বসুকে চিনতে চেষ্টা করে সুব্রতা। নরম স্বরে সে বলে, আর যদি আপনার সঙ্গে আমার দেখানা হয়।

কেন হবেনা? খুব হবে, অনেকবার হবে। একই বিল্ডিংসে তো চাকরি করি। নির্বোধের মত সঞ্জীব বলে ওঠে।

সঞ্জীব ভাবে সুব্রতা বুঝি তাকে ঠাট্টা করছে।

যদি বলি আমার সম্বন্ধে অনেকটা জানলেও সবটা জানেন না। মৃদু স্বরে বলে সুব্রতা। গলাটা একটু কেঁপে যায় তার। আমি কোলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সুব্রতা হারিয়ে ফেলেছে কিছুক্ষণ আগের চটুলতা। কেমন আড়ষ্ট বোধ করে। কোলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন? আজকাল কেউ কোলকাতা ছাড়ে? ট্রান্সফার নাকি? আমার উপর রাগ করলেন? সঞ্জীব নিজেকে অপরাধী ভাবে। অভিমানীসুরে বলে, তাহলে আমি নেমে যাই।

সঞ্জীব দরজা খুলতে হাত বাড়ায়। ভদ্রলোক কি সত্যি সত্যি নামবেন! সুব্রতা বাঁ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে। এখন কোথায় নামবেন এখানে? আর ট্যাক্সিটা তো আপনি—কথা শেষ না করে হাসতে হাসতে তার হাত ছেড়ে দেয় সুব্রতা বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকস্মিক আঘাতে সে কেমন অবসন্ন বোধ করে। বাড়ীতে একদিন সে এমনি শক্ খেয়েছিল।

কাজটা সে বুঝি ভাল করেনি। মিষ্টি সুরের কলহাস্য কেমন যেন বেসুরো লাগে কানে। আজ আপিস থেকে বেরুবার সময় তার মনটা ভাল ছিল না। একদিকে প্রায়াগত ভবিষ্যৎ জীবনের অচেনা জগৎ অপরদিকে কর্মক্ষেত্রের পরিচিত পরিবেশ। আর্থিক আত্মনির্ভরতার জগৎ থেকে নির্বাসিতা হয়ে কেমন কাটবে দিনগুলো। চাকরি বজায় রেখে চলা সম্ভব হলে তার তো এই দুশ্চিন্তা ছিল না। চাকরি আপাততঃ ছাড়েনি বটে কিন্তু রাখতে পারার-ও কোন নিশ্চয়তা নেই।

আপনি ঠাট্টা করছেন; আমি কিন্তু খুব সিরিয়াসলি কথাটা বলেছি। গম্ভীর মুখে বলে সঞ্জীব।

মেয়েটাকে তাদের বিল্ডিংসে পাঁচতলায় আপিসে দেখার পর থেকে আজ দু বছর ধরে কত চেষ্টা করছে সে আলাপ করবার জন্য। ঠিকমত সুযোগ জোটেনি। আজ আপিসের শেষে বৃষ্টি নামতে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। ট্যাক্সি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টি। জলের বুকে জল ছল্ ছল্ শব্দে পড়ে চলেছে। গাড়ী তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অচল কোলকাতা শহরকে দেখে মনে হয় গোটা বিশ্বসংসারই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সুব্রতা মুখ তুলে তাকায় সঞ্জীবের দিকে। সে স্বাচ্ছন্দে কোলকাতা থাকতে পারত। চাকরি ছাড়ার প্রশ্নও দেখা দিতনা। সে তার ভাগ্যের জন্য দায়ী করে বসে সঞ্জীবকে। আর

আর তিন দিন পরে তাকে কোলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিতে হবে জয়পুর। সঞ্জীবের অনেকগুলো চোখ অনেক দিক থেকে সুব্রতার দিকে থেকে তাকিয়ে আছে মনে হল তার। কিন্তু সেখানে পৌরুষের চিহ্ন কোথায়। আজ যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছে, এতদিনে তার সামান্যতম প্রকাশ যদি ঘটত সঞ্জীবের মধ্যে তাহলে তো তাকে ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের কুমারত্বের পরিচয় দিতে হতনা।

কী ভাবছেন ? সেই ভদ্র নরম কণ্ঠ সঞ্জীবের। এই কণ্ঠকে ভরসা করতে পারে না সুব্রতা।

ভাবছি, একালের পুরুষেরা কত সেন্টিমেন্টাল। সুব্রতার কথায় উদাসীনতা।

আপনিও তো একালের মেয়ে।

একালের মেয়ে বলেই চিনতে কষ্ট হয় না একালের ছেলেদের। একটা অনাবশ্যক শুষ্কতা সুব্রতার গলায়।

আমিও তো বাঙালী। আর এই জন্যই জাতিধর্ম সেন্টিমেন্টালিটিটা ছাড়তে পারি। শাস্ত্রেই বলেছে, স্বধর্মে নিধনংশ্রেয়....

হ্যাঁ, আপনাদের নিধনই শ্রেয়। অকস্মাৎ সুব্রতা যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। জানেন, আপনাদের মত বাঙালি ছেলেদের জন্য বাঙালী মেয়েদের আজ কত দুর্দশা। বিপন্না মেয়েদের লিফ্‌ট দিতে আপনাদের পৌরুষ কাজ করে না, কাজ করে স্বার্থবোধ। আহত সঞ্জীব হাসতে হাসতে বলে, এই জন্যই কি আপনি কোলকাতা ছাড়ছেন ?

যদি বলি তাই। বাইরের দিকে চোখ রেখে বলে সুব্রতা।

কোথায় যাবেন ? সুব্রতার রাগ দেখে সঞ্জীব কৌতুক বোধ করে।

কেন, সেখানেও একটা লিফ্‌ট দেবেন নাকি ?—পরিহাসের সুরে সুব্রতা তর্ক করে।

যদি বৃষ্টি নামে ; আর .....

পথঘাট যদি জলে ডোবে। বাধা দিয়ে বলে সুব্রতা। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়লেও কোলকাতা থেকে জয়পুর যাবার রাস্তা জলে ডুবছে না।

আপনি জয়পুর যাচ্ছেন ? কোলকাতা থেকে জয়পুর চাকরি !

চাকরি নয় মরণ।

মরণ ! আঁৎকে ওঠে সঞ্জীব।

হ্যাঁ ; কারণ, আপনি কাপুরুষ। কোলকাতার ছেলেরা কাপুরুষ। তারা

প্রেম করতে চায়, অথচ বিয়ে করতে ভয় পায়। —একটু চুপ করে থাকে সুব্রতা। পরে মৃদু হেসে বলে, আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে। ভদ্রলোক জয়পুর থাকেন।

এই সময় একই সঙ্গে ডাইনে-বামে, সুমুখে-পিছনে সব গাড়ীগুলো নানান্ সুরের ঐকতান তুলে সাড়া দিয়ে উঠল। চারিদিক থেকে গাড়ীর হেড লাইটের তীব্র আলোর বাঁধ ভাঙা জোয়ার পড়ল এদের চোখে মুখে। ড্রাইভার বাঁহাতে ষ্টার্টারটি টেনে এ্যাক্‌সিলেটরটি ডান পায়ে চাপ দিতে গাড়ী হ্যাঁচকা সামনে একলাফ দিয়ে চলতে শুরু করল সোজা দক্ষিণ দিকে চারুমার্কেট—তারপর ফাঁড়ি—তারপর—তারপর—।

ভারতনেত্রী ইন্দিরা গান্ধী

সুষমা মৈত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৫২ সালে শ্রীমতী রুজভেল্ট দিল্লী এসে তিনমূর্তি ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইন্দিরা গান্ধীর মধুর ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকে বাবার সঙ্গে গিয়ে চার্চিলের পাশে বসেন। চার্চিল ভারতীয়দের ঘৃণা করতেন।

ইন্দিরা গান্ধীর দিকে ফিরে চার্চিল বললেন, 'এটা ভাবতে অবাক লাগে আমরা কিছুদিন আগে পরস্পরকে ঘৃণা করতাম'—সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'আমরা কিন্তু আপনাকে ঘৃণা করিনা।'

চার্চিল বললেন, 'আমি করি কিন্তু কেন তা জানি না।' ভারতের আদর্শ 'হিংসায় কভু হিংসার নিবৃত্তি হয়না—তার যোগ্য উত্তর দিয়ে ভারতের গৌরব বাড়ালেন ইন্দিরা।

পর বছর বাবা রাশিয়া যাবেন, ফেরার পথে ইন্দিরা রাশিয়া ঘুরে দেখে এলেন রাশিয়ার পরিস্থিতি কেমন!

ইন্দিরা একবার দিল্লী একবার লক্ষ্মৌ ছোটাছুটি করতে ছেলেদের নিয়ে তার খুব কষ্ট হয় এজন্তে স্বামী তাকে বললেন, বরং আমিই দিল্লী গিয়ে কাটিয়ে কাটিয়ে আসব। তোমার অতদূর থেকে ছুটাছুটি সাইবেনা। সেই ব্যবস্থাই হল।

শৈশবে মা বাবার কাছে থাকতে না পাবার অপরিমেয় বেদনা যে কী তিনি তার ভুক্তভোগী। বস্তুত রাজীব ও সঞ্জয়কে কাছছাড়া করে এই বেদনা তিনি দিতে চান না তাদের। ছেলেদের লালন পালন, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধূলা তাদের সঙ্গে নিয়ে বেড়ান সব ভারই নিজের হাতে তুলে নিলেন। ফিরোজ গান্ধী চেয়েছিলেন ছেলেরা ইঞ্জিনিয়র হোক। তাঁর সে আশাপূর্ণ হয়েছে—কিন্তু অকালে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নেওয়ায় তিনি তা দেখে যেতে পারেননি।

১৯৫১ সালের নির্বাচনে ফিরোজ গান্ধী লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হন উত্তর প্রদেশের বেরিলী কেন্দ্র থেকে। তিনি তিন মূর্তি ভবনে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি এম, পি দের জন্ত কোয়াটারে উঠে গেলেন। ক্রমে খাবা-

পিনা করতেন তিনমূর্তি ভবনে। বাগান করার সখ ফিরোজ গান্ধীর। সুন্দর করে সাজালেন কোয়াটারটি।

কিন্তু এ-ও বেশীদিন চলল না। ইন্দিরা বাবার সঙ্গে দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। ছেলে দুটি দেরাদুনে ভর্তি হয়েছে। ফিরোজ গান্ধী বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করেন নিজেকে। এ নিয়ে অতি স্বাভাবিক কারণেই স্বামী স্ত্রী মন কষাকষি, বাক্‌বিতণ্ডা লেগেই আছে।

এভাবে আর চলে না কথাটা ইন্দিরাকে বললেন ফিরোজ

ইন্দিরার যুক্তি—'আমি কি কেবল তোমার স্ত্রী? আমি মা-ও। এছাড়া বাবার দেখাশুনা সব কিছু হাতের কাছে গুছিয়ে দেওয়া—নিত্য হাজারো রকমের ঝক্কি ঝামেলা নিতে হয় নাহলে বাবা রেগে যান।'

'কিন্তু ঘর সংসার আগে না দেশের কাজ আগে! তুমি তো ঘরের বৌ।' ফিরোজের কথার যুক্তি বুঝল ইন্দিরা কিন্তু কি করবে—বাবাকেও দেখাশুনা না করলে নয়; বাবার দিকটাও তো ভাবতে হয়। 'আমি ছাড়া...ভবিষ্যৎ ভারতের রূপকার জওহরলাল নেহেরুকে মেয়ে ছাড়া আর কেউ তাঁকে বাগে আনতে পারবেনা—'পাপু, তোমার কিন্তু এত রাগ করা উচিত নয়'—অমনি বাবা ছোট্ট শিশুর মত শান্ত হয়ে গেলেন।'

ইন্দিরা তাঁর সমস্যার কথা স্বামীর মুখের উপর বলে দিলেন। ফিরোজ গান্ধী আকণ্ঠ নিমজ্জিত করলেন। কিন্তু প্রচণ্ড খাঁটা খাটুনীতে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। ইন্দিরা সব সময় স্বামীর কাছে আসতে পারেনা—বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হয়। নানারকম কানাঘুষা চলতে থাকে—স্বামীর সঙ্গে ইন্দিরার সদ্ভাব নেই। বুঝি বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়!

হঠাৎ ফিরোজ গান্ধী অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ইন্দিরা নেপাল থেকে ছুটে এলেন। সেবা দিয়ে স্বামীকে সারিয়ে তুলল। স্বামীকে নিয়ে কাশ্মীরে গেল হাওয়া পরিবর্তনের জন্য। স্ত্রী পুত্র সান্নিধ্যে ফিরোজ অচিরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। পুরানো দিন ফিরে পেলেন ওঁরা।

তবু কিন্তু তিনমূর্তি ভবনে ফিরতে হল ইন্দিরাকে। ফিরোজ আবার কাজে ডুবে গেলেন। বাগ্মী হিসাবে এবং ব্যবসায়ী হরিদাস মুন্দ্রাকে কেসে ফাঁসিয়ে দিয়ে খুব সুনাম কিনেছে ফিরোজ। অভিযোগ জীবন বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—তা থেকে হরিদাস মুন্দ্রাকে বে-আইনী প্রর ঋণ দিয়ে সরকার ভীষণ অন্যায় করেছে। এতে জওহরলালজীর একান্ত বিশ্বস্ত

অর্থমন্ত্রী টি.টি কৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ফিরোজ গান্ধীর দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হল। নিজেই গাড়ী চালিয়ে হাসপাতালে গেলেন। ১৯৬০ সাল। ২রা সেপ্টেম্বর। অসহ্য বুকে ব্যথা। কেবল ইন্দিরাকে খুঁজছে। ইন্দু কোথায় ?

ইন্দিরা গেছে তখন কেরলে কংগ্রেসের কাজে। খবর পেয়ে তক্ষনি ছুটে এলেন সব কাজ ফেলে—সারারাত স্বামীর পাশে জেগে তাঁর সেবা করলেন। স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে ১৯৬০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ফিরোজ গান্ধী চিরতরে বিদায় নিলেন। পুত্র রাজীব পিতার মুখাগ্নি করে। পার্শীদের নিয়মানুসারে মৃতদেহ 'টাওয়ার অব সাইলেন্সে' নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ফিরোজের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে পোড়ানো হয়।

ইন্দিরা শোকে মুহ্যমান। জওহরলাল আকস্মিক শোকে বিহ্বল। বললেন, এত অল্প বয়সে ফিরোজ চলে গেল ! মাত্র ৪৮ বছর বয়স ! ইন্দিরার বয়স তখন ৪২ বছর।

আত্মকথায় হোম জার্নাল পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা বলেন, 'স্বামীর সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, স্বামীর ঘর ছেড়ে আমি চলে এসেছি—এমনি নানা কথা, কানাঘুসা আমার কানেও এসেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমাদের বিয়ে অবশ্য আদর্শগত সুখের বিয়ে হয়নি। তবু আমরা সময়ে সময়ে খুব সুখী হয়েছিলাম। সময়ে সময়ে আমরা দুজনে ঝগড়াও করেছি। এর কারণ আমরা দুজনেই ছিলাম রগচটা মানুষ। জেদী। একরোখা। আর কিছুটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। অদ্রলোকেরা বিশেষ করে বন্ধু আত্মীয়স্বজনেরা ছিলেন সবচেয়ে খারাপ। তাঁরা বলে বসতেন :—

'কি অমুকের স্বামী হয়ে এখন কেমন লাগছে ! তাতে উনি খুব ঘাবড়ে যেতেন। আমাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সাধ্য সাধনা করতে হত সে রাগ ভাঙাতে। স্বামীর পুরুষ-অহমিকায় আঘাত দেবার মত সব চাইতে বেশী পাপ বিবাহিত জীবনে আর নেই। শেষের দিকে আমরা এসব কাটিয়ে উঠেছিলাম অনেকটা। এবং ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে বুঝতে শিখেছিলাম।'

পিছুটান আর কিছুই রইল না। অদৃশ্য শক্তির অমোঘবিধানে ইন্দিরা নিঃশেষে নিজেকে এখন দেশের কাছে সঁপে দিলেন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রচারের কাজে। কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের কাজে বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করেন।

১৯৫৯ সালে ইন্দিরা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের সভাপতি পদে ভূষিতা হন। ইন্দিরা চতুর্থ মহিলা সভাপতি। এর আগে আইরিশ কন্যা অ্যানি বেসান্ত (১৯১৭) সরোজিনী নাইডু (১৯২৫) ও নেলী সেনগুপ্তা (১৯৩৩) কংগ্রেসের সভাপতি পদে বিভূষিতা হন।

স্বীয় কন্যার কংগ্রেস সভাপতি হবার পর জওহরলাল বলেছিলেন :—'আমি ওকে এত নিকটভাবে জানি যে, আমার পক্ষে কিছু বলা কঠিন। আমি জানি না, সে আমার কন্যা বলে আমি আজ গর্বিত। আমি গর্বিত, সে আমার কমরেড। আমি গর্বিত। সে আজ আমার নেতা।' (অনুবাদ—নিখিল সেন)

কংগ্রেস সভাপতি হয়ে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেন। এগুলি তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় বহন করে। সেকালের রাজনীতির অবস্থা তখন অত্যন্ত ঘোরালো। কংগ্রেস সভাপতি হয়েই ইন্দিরা গান্ধী কেরলে যান। কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের স্বপক্ষে মতামত দেন। কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হল। এরপর ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বোম্বাই গিয়ে তদন্ত করে বোম্বাইকে দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করার পক্ষে রিপোর্ট দিলেন। জন্ম হল মহারাষ্ট্র আর গুজরাট। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাব মেনে নিলে বোম্বাই প্রদেশ ভাগ হয়ে দুটি প্রদেশের জন্ম হল। ভাষা নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার হাত থেকে দেশ রেহাই পেল।

এভাবে অত্যধিক খাটাখাটুনীর জন্তে ইন্দিরার শরীর খারাপ হয়। তিনি দ্বিতীয়বার অনুরোধ সত্বেও আর কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করেন নি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ইউ. এন. ঢেবর।

১৯৬২ সালের ২০শে অগাষ্ট চীন অতর্কিতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এই ঘটনায় নেহেরুর মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইন্দিরা তখন আমেরিকায়। কৃষ্ণা হাতি সিং তখন দাদার কাছে ছিলেন। নেহেরুর নিদারুণ অসুস্থতার খবর দিয়ে ইন্দিরাকে টেলিগ্রাম করে দিলেন। ইন্দিরা সব প্রোগ্রাম বাতিল করে ছুটে এলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পণ্ডিত নেহেরুকে চিকিৎসা করতে দিল্লী ছুটে গেলেন। তিনি পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী হলে কি হবে তিনি নেহেরু পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসায় নেহেরু অনেকখানি সুস্থবোধ করেন। কাজকর্মও শুরু করেন। কিন্তু সেভাবে আর কাজকর্ম করতে পারছেন না। তাঁর বিশ্বস্ত প্রাক্তন মন্ত্রী লালবাহাদুরকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী নিযুক্ত করে দিলেন।

ইতিমধ্যে নেহেরুর পর কে প্রধানমন্ত্রী হবেন জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। অনেকে নেহেরুকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন না।

কন্যা ইন্দিরাকে উত্তরাধিকারী করে যেতে চান কিনা—এ প্রশ্নও তাঁকে করা হল। কিন্তু তিনি উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী নন।—তবে বললেন, 'কোন দায়িত্বশীল পদের যোগ্য সে নয়—একথা বলা চলে না। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সে ভাল কাজই করেছে।

সাংবাদিকদের উত্তরে কন্যা সম্বন্ধে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছেন :—

আমার চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সে আপন ইচ্ছামত কাজ বেছে নিয়েছে। আমি পছন্দ না করলেও তাই বেছে নিয়েছে। কোন কোন বিষয় আমরা একমত হতে পারিনা।

ইন্দিরা খুব স্বাধীনচেতা মেয়ে। নিজের পথ ধরে সে চলে। কারো নির্দেশ মেনে নেয়না। আমার তো মনে হয় ঠিকই সে করে।'

একদা কন্যা স্নেহাতুর পিতা কন্যাকে সূর্যের মত বড় হবার স্বপ্ন দেখে সেইমত শিক্ষা দিয়েছিলেন—আজ কন্যাকে বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী দেখে পিতৃগর্বে তাঁর উদ্বেলিত হৃদয় ভরে উঠল। কংগ্রেস সভাপতি হয়ে কন্যা পিতার নেতা হয়েছে। সর্বদা পাশে থেকে পিতার ধাত্রীরূপে সেবা করে কত বন্ধুর পথ অনায়াস অতিক্রম করার প্রেরণা জুগিয়েছে। ভুল ধরিয়ে শুধরিয়ে দিয়েছে। আশৈশব কত না ঝড় ঝাপটা গেছে কিন্তু কখনও বিচলিত হয়নি। বাপের মতই চারিত্রিক দার্ঢ্যে অনুপম কন্যা দেশের কাজে উৎসর্গিত প্রাণা মহিমান্বিতা বীরাঙ্গনা।

এ সুন্দর ভুবন থেকে বিদায় নিতে এখন বুঝিবা পিতার কোন খেদ নেই। দশপুত্র সম কন্যা—মাতৃস্নেহ নিয়ে বাবাকে প্রধান মন্ত্রীর বিরাট দায়িত্বশীল কর্মবহুল জীবনের অংশভাগী হয়েছে। ধন্য পিতা, ধন্য কন্যা। ধন্য ভারতবাসী। নিরবচ্ছিন্ন যে কর্মের মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন জওহরলাল জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কন্যাকে দিয়ে গেলেন সেই সমুজ্জ্বল দৃপ্ত কর্মের কঠিন মালিকা।

ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। বক্তৃতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর বক্তৃতা থেমে গেল। তিনি

বক্ষের উপর মাথা রেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পাশে কন্যা উৎকণ্ঠা নিয়ে শুনছিলেন বাবার বক্তৃতা—তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনে বাবাকে নিয়ে দিল্লী চলে এলেন।

কিন্তু জাতির সে চরম দুর্দশার দিনটি ছিল ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে। প্রিয়নেতা জওহরলাল আর নেই। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দিয়ে কোথাও লুকালেন তিনি! অথচ কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, এখনও এ মর্ত্যধামে অনেকদিন ভারতবাসীর সুখদুঃখের সঙ্গে মিলে থাকবেন বেঁচে!

প্রিয় নেতার মৃত্যুর এ আকস্মিকতায় সমগ্র দেশবাসী ক্ষণিকে বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সমগ্র বিশ্বের মহান নেতারা শোকবার্তা পাঠাতে থাকলেন। উড়ে এলেন বিশ্বের বাঘা বাঘা প্রথম সারির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্যে।

প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার সামনে থেকে এক ফুৎকারে কে যেন সব আলো নিভিয়ে দিল। বাবার শবদেহের পাশে বসে রইলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়া। কি যেন ঘটে গেল—কি যেন জীবন থেকে হারিয়ে গেল অথচ যা না থাকলে প্রাণধারণ দুঃসহ।

হঠাৎই বাবার শবের পাশ থেকে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে অজস্র অশ্রুপাত করলেন কন্যা। চারিদিক চেয়ে দেখলেন কোথাও কেউ নেই। সেই ঠাকুরদার মৃত্যুশোক দেখেছেন ইন্দিরা—বাবা তখন জেলে। কতনা সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছেন। মা-ও যখন চলে গেলেন তখনও সঙ্গে নিয়ে কত দেশ বিদেশের গল্প গাথা বীরত্ব কাহিনী বলে মেয়ের শোক ভুলাতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি জীবন সঙ্গী স্বামী ফিরোজের মৃত্যুর পরও যতদূর চোখ যায় কেউ নেই! কিন্তু একী কোথা থেকে সেই স্নেহ সত্তার সুরভি মিশ্রিত ঠাকুরদা মতিলালের মৃত্যুর পর লেখা চিঠির কিয়দংশ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল :—

'আমরা তাঁর জন্য শোকার্ত, প্রতিমুহূর্তে তাঁর অভাব বোধ করছি। তাঁর অভাব অসহ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি এটা চাননি। চাননি যে শোকে আমরা ভেঙে পড়ি। তিনি যেখানে দুঃখের সম্মুখীন হয়েছেন এবং দুঃখকে জয় করেছেন আমরাও যেন তাই করি, এই তিনি চেয়েছিলেন। তিনি যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাই করে গেলে তবেই তিনি তৃপ্ত হবেন।'

আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত

চলার পথের পদাবলী

সুরেন্দ্র নাথ দাশ

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাসের একটি সন্ধ্যা। পূর্ব জব্বলপুরের সিদ্ধিনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছি। সিদ্ধিনাথ মন্দির ঘুরে নিকটবর্ত্তী উঁচু পাহাড়টায় উঠছি এমন সময়ে দেখি, একটি যুবতী রমণী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর চারদিকে কি যেন খুঁজছেন। রমণীর সঙ্গে তিন চার বৎসরের একটি শিশু।

আমাকে দেখতে পেয়েই তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। কাছে এসে তিনি বললেন—আরে! তুমি এখানে?

আমি বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি।

ভদ্রমহিলা বললেন—বেশ মজা ত! তুমি আমাকে চিনতেই পারছ না? আমি ইন্দ্রানী।

আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছি। ইন্দ্রানী আমার হাত ধরে টানতে টানতে একটি উঁচু পাথরের কাছে নিয়ে গেল।

উঁচু পাথরটায় দুজনে বসেছি। ইন্দ্রানী বলতে লাগল—ভাগ্যিস্ তোমার সাথে দেখা হ'লো। আমি অন্ধকারের মধ্যে রাস্তা ভুলে গিয়েছি। তুমি কি পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার রাস্তা চেন?

হাঁ চিনি।

ইন্দ্রানী বলেন—তুমি বুঝি প্রায়ই এসব পাহাড়ে বেড়াতে আস?

আমি বলি—হাঁ৷ জব্বলপুরে যত পাহাড় আছে, সব পাহাড়েই গিয়েছি এবং রাস্তাঘাট চেনি।

ইন্দ্রানী—জব্বলপুরে এসে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি। কলকাতায় ইডেন গার্ডেন, আউটরাম ঘাট, লেক্ বোটানিক্যাল্ গার্ডেন, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়—এসব একেবারে এক ঘেঁয়ে হয়ে গিয়েছিল। এসব স্থানে গেলে যে আনন্দ পেতাম না, তা নয়, তবে তার মধ্যে প্রাণ-প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে যে আনন্দ পাই, তার মধ্যে একটা উদ্দামতা আছে, ইংরেজীতে যাকে বলে থ্রিলিঙ্। তোমার কেমন লাগে?

আমি—তোমার সঙ্গে আমি একেবারে, মানে সেণ্ট পারসেণ্ট, একমত।

ইন্দ্রানী—এতদিনে মনের মত লোক পেলাম। তুমি আমাকে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরবে ?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আমরা পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম। আমি আগে আগে. ইন্দ্রানী তার শিশুর হাত ধরে পিছনে পিছনে। একটু পরে ইন্দ্রানী আমার ডান হাত ধরে বলল—ভীষণ ভয় করছে. কী অন্ধকার!

ইন্দ্রানী আমার হাত ধ'রে সমস্ত পাহাড়ী রাস্তা নেমে এল। বাড়ীতে ফিরলে বাড়ীর কর্তা শ্রীমজুমদার বললেন—ইন্দ্রানী তোমার এত দেরী যে ?

ইন্দ্রানী তখন বলল—পাহাড়ের পথ ভুলে গিয়েছিলাম। ইনিই আজ বাঁচিয়েছেন।

গৃহস্বামী বললেন—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমি—এখন তবে আসি।

ইন্দ্রানী—এত তাড়াতাড়ি কিসের ? মেসে একদিন না খেলে বুঝি ঘুম হবে না ? আজ এখানে খেয়ে যাবেন। আর দেখুন মশায়. আমাকে ইন্দ্রানী বৌদিদি ব'লে ডাকবেন।

আহার পর শেষ হ'লো। শ্রীমজুমদার বললেন—আপনি ইন্দ্রানীকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে প্রত্যহ ঘুরে আসবেন। আমার সময়ও নেই। তাছাড়া, পাহাড়ের গান আমার ভালও লাগে না।

ইন্দ্রানীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ইন্দ্রানী ছিল আমাদের চেয়ে সিনিয়র। ইন্দ্রানী তখন ভারতীয় ইতিহাসে এম-এ পাশ ক'রে রিসার্চ করছিল। সেটা চার বৎসর আগেকার কথা। লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়মের জন্য প্রাচীন প্রস্তর ভাস্কর্য ও লোক-শিল্পের নিদর্শনও সংগ্রহ করতাম আমি। মিউজিয়মের জন্য যে সব প্রস্তর ভাস্কর্য সংগ্রহ ক'রেছিলাম, তন্মধ্যে কার্তিকের, বিষ্ণু গৌরী পার্বতী, উমা-মহেশ্বর প্রভৃতি খুবই মূল্যবান। এই সব সংগ্রহ দেখে গবেষিকা ইন্দ্রানী আমার একজন ভক্ত হয়ে উঠল। ইন্দ্রানী আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা করত। এমনি ক'রে তার সঙ্গে একটা গভীর অন্তরঙ্গতার ভাব গড়ে উঠেছিল। এটা কিন্তু আমাদের সহ-পাঠিনী শর্মিলার ভাল লাগত না। তারপর ইন্দ্রানীকে অনেক দিন মিউজিয়মে

দেখা গেল না। একদিন সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনে লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে শর্মিলা বলল—তুমি বোধহয় শোননি, ইন্দ্রানীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে এখন কাশ্মীরে।

ইন্দ্রানীর কথা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

অতঃপর প্রায়ই ইন্দ্রানীকে নিয়ে জব্বলপুরের পাহাড়ে ঘুরতাম। ইন্দ্রানী তখন কত গল্প শোনাত। বিয়ের পরে ইন্দ্রানীরা গিয়েছিল কাশ্মীরে, সেখান থেকে দেরাদুনে। তারপর শিলঙে। আপাততঃ এসেছে জব্বলপুরে।

কয়েক দিন ইন্দ্রানীদের ওখানে যেতে পারিনি। একদিন শ্রীমজুমদার আমাদের মেসে হাজির। তিনি বললেন—আবার পুনায় বদলি হচ্ছি। তুমি অবশ্যি অবশ্যি দু এক দিনের মধ্যে আমাদের ওখানে আসবে। আমাদের বদলির চাকরি। ভেবেছিলাম, এখানে বেশ কিছুদিন থাকব।

পরের দিনই ইন্দ্রানীদের ওখানে গেলাম। ইন্দ্রানী বলে—বেশ লোক ত! একেবারে ডুব! এরি মধ্যে ইন্দ্রানীবৌদিদিকে ভুলে গেলে? কার চি[illegible] করছিলে? কলকাতার শর্মিলার? আমরা ত পুনায় চললাম। আবা[illegible]র দেখা [illegible]বে জানি না। তোমাকে একটা অনুরোধ করব। রাখবে কি?

'বল।'

ইন্দ্রানী—তোমার [illegible] আর একা একা এভাবে পাহাড়ে বেড়ান চলবে না। তোমাকে সত্বর বিয়ে করতে [illegible]ত হবে। আর নতুন বৌ যেদিন আসবে অবশ্যই আমাকে নিমন্ত্রণ করবে। ত[illegible]বেই আমি পরম আনন্দ পাব।

আমি সম্মতি দিয়ে বিদায় [illegible]নিলাম।

[illegible]সা[illegible]

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

জব্বলপুরের পূর্বদিকে অব[illegible]হাড় ঘেরা খামারিয়াতে নতুন ফ্যাক্টরী এবং বাড়ী হচ্ছে। একজন বড় [illegible]ন্ট্রাক্টারের অধীনে মঙ্গল প্রসাদ একজন অভিজ্ঞ ওভারসিয়ার। তারই ত[illegible]নে বিরাট ঘর, রাস্তা তৈরী হচ্ছে। [illegible]ছে মেয়ে ও পুরুষ। রেজায় কাজ মিস্ত্রীরা পুরুষ। যোগাড়ীদের মধ্যে [illegible] করে স্ত্রীলোক।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলে। [illegible] এদের থাকার জন্ত ঠিকাদার ছোট ছোট কুঠরী তাঁবুর ছাউনী তৈরী করেছে [illegible] রাত্রে আহারাদি শেষ হলেই গি[illegible] এই কর্মীরা নাচ গান করে।

তখন গ্রীষ্মকাল। মঙ্গল প্রসাদ বলে—[illegible] এলো না একদিন রাত্রে আমাদের

হবে। সেখানে দেখবে, গ্রামীণ নরনারীর নাচ গান।

আমরা মঙ্গল প্রসাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। সন্ধ্যার পরেই মঙ্গল প্রসাদের তাঁবুতে পৌঁছলাম।

মঙ্গল প্রসাদ ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। আহারান্তে রাত্রি এগারটায় আমরা নাচের আসরে গেলাম।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা মাঠের মধ্যে আসর বসেছে। আসরের কেন্দ্র স্থলে নাচের জায়গা।

চারিদিকে গোলাকার ভাবে দর্শকেরা বসেছে। আসরের কেন্দ্রস্থলে আমরা গিয়ে বসলাম।

দুইজন ঢুলী ঢোলক বাজায়, সঙ্গে তানপুরার সুর। নর্তকী আসরে আসছে। নর্তকীর চোখে হাসি, তার সর্বদেহে হাসি। মেয়েটি যেন নাচতে নাচতেই আসছে। তার পায়ের নুপুর ঝুমঝুম বাজছে। ভরা যৌবনের অবয়বখানি। গায়ের রঙ্ কালোও নয়, ফর্সাও নয়, মাঝারি রঙ্। বয়স বিশ বাইশের মত। তার নয়ন দুটি স্বপ্নময়।

মঙ্গল প্রসাদ বলে—যমুনাবাঈ আজ রাসনৃত্য দেখাও।

ঢোলক বেজে উঠল। তানপুরায় সুরের হিল্লোল। যমুনাব'
হাসি। যমুনার পায়ের নুপুর বেজে উঠল। যমুনার শরীর
জোয়ার খেলে যায়। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেঁপে উঠছে।
ফুলে ফুলে উঠছে। বাজনার ছন্দের সঙ্গে, সুরের স
নাচতে থাকে।

যমুনা যেন জীবন্ত রাধিকারূপে কৃষ্ণের
আমরা যমুনাকে দেখে ভাবতে থাকি, এই কি
আমরা সকলে নির্বাক, স্তব্ধ, বিস্ময়ান্বিত।

প্রায় এক ঘণ্টা এই নৃত্য চলল। শেষে
বিদায় নিল। চারিদিক থেকে করতালি (

গভীর রাত্রে আমরা তাঁবুতে ফিরে
—যমুনার মত সুন্দর লোক-শিল্পী বিরল।

মঙ্গল প্রসাদ বলে—যমুনাবাঈ আমা
বড় মিস্ত্রীকে সাহায্য করে। এ কাজেও
তের বৎসর বয়স, তখন তার একজন শ্র

...ঘুম
...কে ইন্দ্রানী
আপনি ইন্দ্রানীকে সঙ্গে
সময়ও নেই। ছাড়াছাড়ি,

...। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়'র
...নিয়র। ইন্দ্রানী তখন ভারতীয়
...রছিল। সেটা চার বৎসর আগেকার
... সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়মের
...শিল্পের নিদর্শনও সংগ্রহ করতাম আমি।
... সংগ্রহ করেছিলাম, তন্মধ্যে কার্তিকের,
... প্রভৃতি খুবই মূল্যবান। এই সব সংগ্রহ
...জন ভক্ত হয়ে উঠল। ইন্দ্রানী আমার
...লাচনা করত। এমনি ক'রে তার সঙ্গে
... উঠেছিল। এটা কিন্তু আমাদের সহ-
...তারপর ইন্দ্রানীকে অনেক দিন মিউজিয়মে

স্বামী ছিল পাঁড় মাতাল—তার উপর অন্য নারীতে আসক্ত। যমুনা যখন যৌবনবতী হয়ে উঠল, তখন ওর স্বামী যমুনাকে গ্রহণ না ক'রে ওর প্রণয়িনীকে নিয়ে ঘর বাঁধল। কাজেই জীবিকা নির্বাহের জন্য যমুনা আমাদের এখানে যোগাড়ী মেয়ের কাজ নিল। তার কাজের নিপুণতায় জন্য এখন প্রবীণা রেজা হিসেবে উন্নীতা হয়েছে। ও আর বিয়ে করেনি।

বললাম—এমন সুন্দর নাচ কিভাবে শিখেছে ?

মঙ্গল প্রসাদ বলে—মধ্য প্রদেশের পান্না জেলায় একটি গ্রামে যমুনাদের বাড়ী ছিল। সেই গ্রামে ছিল একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেবাদাসীদের নৃত্য হতো। পিতার সঙ্গে যমুনা যেত মন্দিরে আরতি ও নৃত্য দেখতে। মন্দিরের নৃত্য দেখে দেখে বাড়ীতেও সে চর্চ্চা করত। আমি তার নৃত্য কুশলতার আবিষ্কার করি। আমাদের আসরে তাকে নৃত্য পরিদর্শনের সুযোগ দেই। নিয়মিত অনুশীলনে তা এত সুন্দর হয়েছে।

বললাম - পান্না হচ্ছে হীরাপান্নার দেশ। পান্না জেলার যমুনাবাঈ জীবন্ত

... যমুনা কি শ্রমিকদের কুঠরীতে থাকে ?

...দ—না। আমার এই তাঁবুর সঙ্গেই রান্নাবান্নার জন্যে ছোট্ট

...। সেখানেই যমুনা থাকে।

...এর বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় না ?

...কথা শুনে শুধু হাসতে থাকে।

...র বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। তার নববধূকে

...সিল্কের শাড়ী নিয়ে গেলাম।

... আর যমুনাবাঈ এসে জোড় হাতে

...দয়ে ছিলেন, তাই হয়েছে। আমা-

... বলেছিলাম—যমুনা, তোমার

আজ তুমি আর মঙ্গল প্রসাদ

...য়ে উঠল।

...য়েছিলাম। অমর নাথ বলল

...। চল না রাধা দেবীর আশ্রম

আমি সম্মা...

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

জব্বলপুরের পূর্বদিকে অব...

এবং বাড়ী হচ্ছে। একজন বড়

অভিজ্ঞ ওভারসিয়ার। তারই ও...

মিস্ত্রীরা পুরুষ। যোগাড়ীদের মধ্যে

করে স্ত্রীলোক।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলে।

ছোট কুঠরী তাঁবুর ছাউনী তৈরী করেছে

এই কর্মীরা নাচ গান করে।

তখন গ্রীষ্মকাল। মঙ্গল প্রসাদ বলে—